# ভারতবর্ষ সেরা সংগ্রহ

বারিদবরণ ঘোষ

# ভারতবর্ষ সেরা সংগ্রহ


সংকলন ও সম্পাদনা

**বারিদবরণ ঘোষ**


**মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ**

১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদপট

সুব্রত মাজী

BHARATBARSHA SERA SANGRRAHA

A selection of best writings from 'Bharatbarsha (an old famous monthly magazine) of various interest edited by Bandharan Ghosh Published by Mitra & Ghosh Publishers Private Ltd 10 Shyama Charan De Street Kolkata 700 073

Price Rs 400/-

ISBN 978-93-5020-042

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩
হইতে পি দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও অটোটাইপ, ১৫২ মানিকতলা মেন রোড
কলকাতা-৭০০ ০৫৪ হইতে জ্ঞান সেন কর্তৃক মুদ্রিত।

## :: সূচিপত্র ::

নাট্যরচনা



কবিতা

# ভারতবর্ষ

## সেরা সংগ্রহ

## সম্পাদকীয়

'দেখুন অধবদা, আপনি চাকরিটি ছেড়ে দিন তো দেখি'—দ্বিজেন্দ্রলালের মুখে হঠাৎ এই অদ্ভুত অনুরোধ শুনে আত্মীয় অধরচন্দ্র মজুমদার তো অবাক। সবিস্ময়ে তিনিও তাই বলে উঠলেন—'ওকি, চাকবি ছেড়ে কি অমনি অমনি চুপ করে বসে থাকবো? একটা কিছু তো করতেই হবে।'

এবার ভাবনায় পড়লেন দ্বিজেন্দ্রলাল স্বয়ং। পরে একটু ভেবে নিয়ে বললেন—

'হুঁ। সেটা একটা কথা বটে। তা দেখুন আমিও ভাবছি, এই চাকরীটার ২৫ বছর পূর্ণ হলে,—আর তা' হতেও বড় বাকি নেই,—এ কাজ থেকে পেন্সন নেব। তখন, বেশ ধীরেসুস্থে, মনের মতন করে' বেশ একটা নূতন ধরনের Ideal ('আদর্শ') মাসিক কাগজ বার করা যাবে। লেখকের তো আর অভাব নাই? এই ধরুন না—রাঙ্গাদা, সেজদা, অক্ষয় মৈত্রেয়, পাঁচকড়ি, সুরেশ, দেবকুমার, বিজয়, সুরেন মজুমদার, অক্ষয় বড়াল, আপনি, দাদামশায়, আমি তো আছিই—তা ভিন্ন আরও-সব কতই তো জানাশোনা নামজাদা লেখক সব রয়েছেন। সকলে মিলে যদি কোমর বেঁধে', তেমন ভাবে লিখতে শুরু করি ত' আর ভাবনা কি?...দেখবেন অধরদা, এমন কাগজই বার কর্ব যে, দেশশুদ্ধ লোকের একেবারেই 'তাক্' লেগে যাবে। আপনিও তখন আমার মত এই কাজ নিয়েই ব্যাপৃত থাকতে পারবেন; আর অমন গোলামি করার দরকার হবে না।'

কথা হচ্ছিল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সুরধাম'-এ বসে দুজনে অন্তরঙ্গে। এখানে রাঙ্গাদা হলেন হরেন্দ্রলাল বায, সেজদা জ্ঞানেন্দ্রলাল রায এবং দাদামহাশয় প্রসাদদাস গোস্বামী। দ্বিজেন্দ্রলালের মাথায় এই পত্রিকা-প্রকাশের খেয়াল চেপেছিল 'ইভনিং-ক্লাবের' এক প্রস্তাব থেকে। এই ক্লাবের সম্পাদক ছিলেন প্রমথনাথ ভট্টাচার্য। তাঁব ইচ্ছে হয়েছিল ক্লাবেব মুখপত্র হিসেবে একটা ক্লাব-ম্যাগাজিন প্রকাশ করাব। বিখ্যাত পুস্তকপ্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র হরিদাস চট্টোপাধ্যায এই ক্লাবের একজন উৎসাহী সভ্য এবং দ্বিজেন্দ্রলালের খুব প্রিয়ভাজন ছিলেন। তাঁকে বলা হল একটা ক্লাব ম্যাগাজিন বের করতে কিরকম খবচ পড়বে। তিনি যা হিসেব দিলেন তাতে একটা ক্লাবের পক্ষে এমন কাগজ বের করা অসম্ভব মনে হল। সবাব মন খারাপ হল তাতে। তা দেখে হবিদাসবাবু একটি প্রস্তাব দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে রাখলেন—

'আপনি যদি স্বযং সম্পাদক হ'তে স্বীকার কবেন ত' আমি নিজ ব্যয়ে, বাঙ্গলা দেশে প্রকাশিত আর-সমস্ত মাসিক পত্রের চেয়ে বড় ও আপনারই নামের যোগ্য, একখানি উৎকৃষ্ট মাসিকপত্র বাহির করার ভার-গ্রহণে সম্পূর্ণ রাজী আছি।'

শুনে সোল্লাসে দ্বিজেন্দ্রলাল বললেন—'বেশ, তা হলে এ কাগজ এখনই বাহির হউক। আমিও খুব শীঘ্র পেন্সন লইয়া নিজেকে ইহার সম্পাদকপদে নিযুক্ত করিয়া দিব।' এই শুভ প্রস্তাব থেকেই 'ভারতবর্ষ'-এর জন্ম। প্রথমে ঠিক ছিল বৈশাখ মাসেই কাগজ বের হবে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের পেন্সনের আবেদন মঞ্জুর হতে দেরি হল বলে 'ভারতবর্ষ' প্রকাশিত হল ১৩২০ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে। ঠিক হয়েছিল 'কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ যুগ্ম-সম্পাদক' হবেন। ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ৭ই চৈত্র বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের উদ্দেশ্যে একটি প্রচারপত্র ছেপে বিলি করলেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় :

'বাঙ্গালা দেশে যে সর্বাঙ্গসুন্দর পত্রিকার অভাব আছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অন্যান্য সভ্যদেশের তুলনায় আমাদের দেশে মাসিক পত্রিকার সংখ্যা যে কম তাহা আর বলিতে হইবে না। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া আমরা একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর মাসিক পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা করিয়াছি। বঙ্গ সাহিত্যের জনৈক সুপ্রতিষ্ঠিত মনীষী আমাদের সঙ্কল্পিত পত্রিকার সম্পাদনভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।'

বলা বাহুল্য তখন 'প্রবাসী'র মতো পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে চলেছিল, তবুও এই বিজ্ঞাপন। তাছাড়া, এই 'জনৈক মনীষী'ই যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—তা বলে দেবারও প্রয়োজন নেই। 'ভারতবর্ষে'র স্বত্বাধিকারী হরিদাস চট্টোপাধ্যায় প্যারাগন প্রেসে তাঁর কাগজ ছাপতে দিলেন। কিছু টাকা অগ্রিমও দিলেন। ৪/৫ ফর্মার কম্পোজ উঠলো। প্যারাগন প্রেসের ম্যানেজার জলধর সেন প্রথম ফর্মার পেজ সাজিয়ে যেদিন দ্বিজেন্দ্রলালের বাড়িতে পাঠিযে দিলেন, জলধর সেন স্মৃতিচারণা করে লিখেছেন—'সেই দিনই সেই ফর্মার প্রুফ দেখতে দেখতেই অকস্মাৎ দ্বিজেন্দ্রলাল অমরধামে চলে গেলেন।' প্রসঙ্গত, পরিকল্পিত পত্রিকার প্রুফ দেখতে দেখতেই দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু হয়েছিল—এমন দাবি করেছেন জলধর। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনীকারেরা—দেবকুমার রায়চৌধুরী এবং নবকৃষ্ণ ঘোষ—দুজনেই লিখেছেন—স্বপ্রণীত 'সিংহল-বিজয়' নাটকের পাণ্ডুলিপি সংশোধন করতে করতেই তিনি রোগাক্রান্ত হন।

নানা বাগ্‌বিতণ্ডার পর স্বদেশপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলালের প্রস্তাবমতো পত্রিকার নামকরণ হয়েছিল 'ভারতবর্ষ'। কিন্তু সেই পত্রিকার সম্পাদকরূপে তাঁকে আব পাওয়া গেল না। তাঁর প্রবর্তিত আদর্শ ও নীতি অনুসারে পত্রিকা প্রকাশ করার জন্য গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ব্যগ্র হয়ে পড়লেন। পত্রিকা প্রকাশিত না হলে তাঁদের প্রকাশনাও বিরাট সঙ্কটের সম্মুখীন হবে। দ্বিজেন্দ্রলালের সমকক্ষ সাহিত্যিক কে আছেন, যে তাঁকে এই দায়িত্ব দেওয়া যায়। সম্পাদক হিসাবে অন্তত দ্বিজেন্দ্র-নীতি অনুসরণ করে চলবেন এমন একজন সম্পাদকের জন্য অনুসন্ধান চলতে লাগল। নানা নাম প্রস্তাবিত হল—বিশেষ করে হাইকোর্টের জজ সারদাচরণ মিত্রের নাম। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুরেশচন্দ্র সমাজপতির নাম 'স্বতই উদয়' হয়েছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল জলধর সেনের নাম। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ তো ছিলেনই। জলধর বিনয়ের সঙ্গে লিখেছেন

তাঁকেই 'সহযোগিতা' করার জন্য তাঁব নাম প্রস্তাবিত হয়েছিল। আসলে জলধরই হলেন মুখ্য সম্পাদক শেষ পর্যন্ত। দুজনের যুগ্ম সম্পাদনায় ভারতবর্ষ আষাঢ় ১৩২০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম পর্ব প্রথম খণ্ডের আখ্যাপত্রে মুদ্রিত হয়েছিল :

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত / ভারতবর্ষ / সচিত্র মাসিক পত্র / প্রথম বর্ষ—প্রথম খণ্ড / আষাঢ়-অগ্রহায়ণ / ১৩২০ / -সম্পাদক / শ্রীজলধব সেন, শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ / -প্রকাশক / শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স / ২০১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা / আর ছাপা হয়েছিল ঃ

'২০২ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও ২০৩/১/১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট "প্যারাগন প্রেস" হইতে শ্রীগোপালচন্দ্র রায় দ্বারা মুদ্রিত।'

॥২॥

দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুতে সম্ভাব্য সম্পাদকের পদে বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রের (১৮৪৮-১৯১৭) নাম প্রস্তাবিত হয়েছিল নানা কারণে। এই প্রসিদ্ধ বিদ্যানুরাগী আইনজীবী বিদ্যাপতির পদাবলীর সটীক সংস্কবণ প্রকাশ করে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। 'উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য', 'ভারতরত্নমালা' ইত্যাদি পুস্তক তাঁকে খ্যাতি এনে দিয়েছিল। কিন্তু এই পদে তাঁর মনোনয়ন সেকালেব পাঠক-লেখকগোষ্ঠী অনুমোদন করতে পারেননি। এ বিষয়ে শরৎচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া জানতে পারি রেঙ্গুন থেকে বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লেখা (ডাকমোহর ২৪ মে ১৯১৩) একটি চিঠি থেকে। এই চিঠিতে 'দ্বিজুদার মৃত্যুসংবাদে ..স্তম্ভিত' শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গক্রমে লিখেছিলেন :

'তোমাদেব 'ভারতবর্ষে'ব সত্যই বড় দুরদৃষ্ট। আমি ভাবিয়াছিলাম, হয়ত এ কাগজ আর বাহির হইবে না। বাহির হইলেও খুব সম্ভব টিঁকিবে না। কারণ ইহার আসল আকর্ষণই অন্তর্হিত হইয়া গেল। যদি সম্ভব হয় অন্য সম্পাদক করিয়ো না। সারদা মিত্র কি কবিবেন? তিনি ভাল জজ এবং তৃতীয় শ্রেণীর সমালোচক। 'কমপাইলার'ও বটে, লেখা অত্যন্ত মামুলি ও পুরান ধরনের। তিনি খুব সম্ভব 'ফেলিওর' হইবেন। সাহিত্য-পরিষদের মোড়ল হওয়া এক, মাসিক কাগজের সম্পাদক হওয়া আর। তিনি সাহিত্যিক নন এট' মনে রাখিয়ো। অবশ্য তোমরা কলিকাতায় থাক, আমরা মফঃস্বলে থাকি ; এসব মতামত আমরা দিতে পারি না। দিলেও তোমাদের কাছে সেটা বোধকরি তেমন গ্রাহ্য হইবে না—যাই হোক, যাহা ভাল বুঝিলাম, বলিলাম। এবং তাঁহাকে সম্পাদক করিলে যাহা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহাই জানাইলাম।'

এই অবস্থায় শরৎচন্দ্রেব নিজেরই ইচ্ছে হয়েছিল, 'কোন নামজাদা সম্পাদকের আড়ালে থাকিয়া কাগজটা 'এডিট' কবিয়া দু-এক মাস চালাইয়া দিতে।' দূব রেঙ্গুনে থাকায় সে ইচ্ছা পূরণ হবাব ছিল না। সারদাচারণ মিত্র সম্পার্কে তাঁর আশঙ্কা ৩১ মে ১৯১৩ তারিখের চিঠিতেও তিনি ব্যক্ত করেছিলেন—'এ কি সারদাবাবুর দ্বাবা হবে? ওর চেয়ে

তোমার যোগ্যতা বেশী।...এ 'সিলেকশন' একেবারেই ভাল হয়নি।'—ইত্যাকার। এবং সারদাচারণ সম্পাদক থাকলে তিনি লিখবেন না—এমন ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন।

অনুমান করি এমনতর আরও মতামত প্রকাশকদের বিচলিত করে তুলেছিল। তাই সারদাচরণকে বাদ দিয়ে তাঁরা জলধর সেনের কথা ভাবলেন। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ তো আগে থেকেই নির্বাচিত হয়েছিলেন। এখন তাঁর সহযোগী করে নির্বাচন করা হল জলধব সেনকে। কিন্তু জলধর কেন?

নানা পত্র-পত্রিকায় লিখে জলধর ইতিমধ্যে সাহিত্যিক হিসাবে সুপরিচিত হয়েছিলেন। 'ভারতবর্ষ' প্রকাশিত হবার আগে তিনি 'ভারতী ও বালক', ভারতী, সাহিত্য, নবপর্যায় জাহ্নবী, মানসী, ধ্রুব, বিজয়া, প্রদীপ, দাসী, নির্মাল্য, ঢাকা রিভিউ ও সম্মেলন প্রভৃতি পত্রিকায় লিখে যথেষ্ট নাম করেছিলেন। প্রবাসচিত্র, হিমালয়, নৈবেদ্য, পথিক, হিমাচলবক্ষে, দুঃখিনী, পুরাতন-পঞ্জিকা, বিশুদাদা, হিমাদ্রি, সীতা দেবী, করিম সেখ, আমার বর ও অন্যান্য ছোটগল্প প্রভৃতি পুস্তকেব রচযিতা হিসাবে লেখক হিসাবেও সুপ্রতিষ্ঠিত। 'প্রবাসচিত্র' পুস্তকের পরিবেশক এবং 'হিমালয়' প্রভৃতি পরবর্তী গ্রন্থাদির প্রকাশ ইত্যাদিসূত্রে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর পুত্র হরিদাসেব সঙ্গে এর আগেই জলধরের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ঘটেছিল। এ বিষয়ে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ একটি চমকপ্রদ বিবরণ লিখে গেছেন ঃ

'প্রসিদ্ধ পুস্তক-প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রকাশক হইয়া জলধরবাবুর সহিত তাঁহার হিতৈষী অভিভাবকের মত ব্যবহার করিতেন। একবার জলধরবাবু পুস্তক বিক্রয়ে তাঁহার প্রাপ্য আনিতে যাইলে—যখন তাঁহাকে হিসাব ও প্রাপ্য টাকা দেওয়া হইল, তখন গুরুদাসবাবু তাঁহার প্রিয় কর্মচারীকে ডাকিয়া বলিলেন, "অনন্ত, আন ত।" অনন্ত একগাছি স্বর্ণহার আনিলে গুরুদাসবাবু তাহা জলধরবাবুকে দিয়া বলিলেন, "এটি বৌমাকে দিবেন।" সেই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে জলধরবাবু কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। গুরুদাসবাবু মৃদুস্বভাব ছিলেন—জলধরবাবুকে বলিলেন, "সাবধানে নিয়ে যাবেন—পথে যেন না হারান।" '

যদি ভাবি, এই ব্যক্তিগত যোগাযোগ জলধরকে সম্পাদক হিসাবে নির্বাচনে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল, তবে উভয়ের প্রতিই অবিচার করা হবে। আসলে জলধরেব লেখক-সত্তার অতিরিক্ত একটি সম্পাদক-সত্তা তাঁকে পত্র-পত্রিকা জগতে যথেষ্ট লোভনীয় কবে তুলেছিল। জলধরের একটি দীর্ঘ-সম্পাদক জীবন ছিল। ভারতবর্ষ-সম্পাদনের আগে সম্পাদক হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল প্রায় তিরিশ বছরের। ছ'টি নানাধবনের পত্রিকা সম্পাদনাসূত্রে শিক্ষক জলধরেব জীবন সম্পাদকের জীবনে পর্যবসিত হযে গিয়েছিল। তাঁর জীবনের মর্মমূলে বসে যে মানুষটি তাঁকে নিত্য প্রেরণা দিয়ে এসেছিলেন সেই কাঙাল হরিনাথ (হরিনাথ মজুমদার) সম্পাদিত 'সাপ্তাহিক গ্রামবার্তা-প্রকাশিকা' পত্রিকাতেই তাঁর প্রথম রচনা 'ভজহরির মেলা দর্শন'-এর প্রকাশ এবং পত্রিকা-সম্পাদনায় হাতেখড়ি (বৈশাখ ১২৮৯)। বন্ধু অক্ষযকুমার মৈত্রেয়ের সহযোগিতায় তিনি আশ্বিন ১২৯২ পর্যন্ত এই পত্রিকার পরিচালনভার গ্রহণ করেছিলেন। তখন বয়স তাঁর তেইশ বছর প্রায়। অবশ্য

এখানের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা বিষয়ে জলধর মন্তব্য করে গেছেন—'গ্রামবার্তা'র সে শিক্ষানবিশী ভবিষ্যতে সংবাদপত্র সেবায় আমাকে বিশেষ কিছু সাহায্য করেনি।...কলিকাতায় সংবাদপত্র-ক্ষেত্রে প্রবেশকে আমি নূতন ক্ষেত্রে প্রবেশ বলে মনে করেছিলাম।'

॥৩॥

'ভারতবর্ষ'-এর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার পরিকল্পনা, লেখা নির্বাচন, এমনকি সম্পাদকীয় পর্যন্ত রচনা করে গেছিলেন স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রলাল। কাজেই এখানে যুগ্ম-সম্পাদক জলধর এবং অমূল্যচরণের সম্পাদকীয় হাতের কোনো স্পর্শ পাওয়া যাবে না। তবুও ইতিহাস হিসাবে সংখ্যাটির গুরুত্ব অপবিসীম। এটিতেই শিল্পী দ্বিজেন্দ্র গোস্বামী অঙ্কিত 'ভারতবর্ষ' নামে একটি চিত্র (সমুদ্রের ঢেউ থেকে ভারতমাতা উঠছেন। মাথায় মুকুট। গলায় সাতনরি হার। ডান হাতে শস্যগুচ্ছ। আকাশে একপাশে উদীয়মান চন্দ্র ও অন্যদিকে বিলীয়মান সূর্য) দ্বিজেন্দ্রলাল-রচিত বিখ্যাত কবিতা ভারতবর্ষ-এর (যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি। ভাবতবর্ষ। পৃ. ৩-৪) স্বরলিপিসহ মুদ্রিত হয়ে পত্রিকার নামকরণকে সার্থক করেছিল। মোট ১৫২ পৃষ্ঠার মধ্যে পাঁচটি পূর্ণপৃষ্ঠা রঙীন ছবি পত্রিকার সৌন্দর্যপ্রকাশক। একটি ছবির নীচে দ্বিজেন্দ্রলালের উক্তি মুদ্রিত—'উজল কবিয়া আছে দূরে সেই আমার কুটিবখানি।'

দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু হল। "তখন চারিদিকে হৈ হৈ পড়ে গেল। 'ভারতবর্ষে'র কর্ম্মকর্ত্তাগণ কি করবেন স্থিব করতে পাবলেন না। অনেকের নাম প্রস্তাবিত হল। অবশেষে হরিদাসবাবু আমাকেই দ্বিজেন্দ্রলালেব শূন্যপদে জোর করে বসিয়ে দিলেন। আমি এ সৌভাগ্যের আশাও করিনি এবং এজন্য কোন চেষ্টাও করিনি।" (স্মৃতিতর্পণ, ভারতবর্ষ, ভাদ্র ১৩৪৩)

দ্বিজেন্দ্রলালের শূন্যপদে এসে বসলেন তাঁরই সহপাঠী জলধর। তাঁকে প্রথম বছরে সহযোগিতা করলেন অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। পত্রিকার পৃষ্ঠায় উভয়কেই যুগ্ম-সম্পাদক হিসাবে ঘোষণা করা হল। তাঁরা যে দ্বিজেন্দ্রলালের উচ্চ আদর্শকে ধরে রাখতে উদ্যোগী এবং সমর্থ হয়েছিলেন তা প্রথমবর্ষের সমস্ত সংখ্যার সূচীপত্র লক্ষ্য করলে সহজেই অনুধাবন করা যায়। প্রথম সংখ্যার উল্লেখনীয় লেখকগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন অনাথকৃষ্ণ দেব, অশ্বিনীকুমার দত্ত, আব্দুল করিম, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর সেন, দীনেন্দ্রকুমার রায়, নিখিলনাথ রায়, নিরুপমা দেবী, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, প্রতিমা দেবী, বিজয়চাঁদ মহাতাব, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিহারীলাল সরকার, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধুশেখর শাস্ত্রী, বিপিনবিহারী গুপ্ত, ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, হরিদাস পালিত, হেমনলিনী দেবী,

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, কৃষ্ণদয়াল বসু, জগদানন্দ রায়, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, বিশ্বপতি চৌধুরী, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, সুরূপা দেবী এবং আরও বহুজনের সঙ্গে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের জন্য ভারতবর্ষকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। সে প্রসঙ্গ যথাস্থানে। ছবি এঁকেছিলেন অন্যান্যদের মধ্যে ভবানীচরণ লাহা, স্পার্ট, আর্থার সি. বেল, ফণীন্দ্রনাথ বাগচি, চারুচন্দ্র রায়, পি. ঘোষ, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, শ্রীশচন্দ্র পালিত প্রমুখ শিল্পীগণ। এছাড়া K. V. Seyne & Bros থেকে প্রচুর ছবি এনে ছাপানো হয়েছিল।

পত্রিকার প্রকাশকদের সঙ্গে মতভেদের ফলে অমূল্যচরণ যুগ্ম-সম্পাদকের পদ থেকে সবে এলেন। একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই তিনি ভাবতবর্ষের সমতুল্য একটি পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হয়ে ১৩২১ বঙ্গাব্দে চারুচন্দ্র মিত্রের সহযোগে 'সংকল্প' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। আটটি সংখ্যা প্রকাশের পর অর্থনৈতিক কারণে এটি বন্ধ হয়ে যায়। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার দীর্ঘজীবনের পশ্চাতে অর্থনৈতিক বল ও নিরাপত্তা একটা মুখ্য কারণ ছিল।

প্রথমবর্ষের শেষে "ভারতবর্ষে"ব গত বর্ষ নামে একটি সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল ঃ

'বাঙ্গালায় যাঁহারা সাহিত্যের ধুরন্ধর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের রচনাসম্ভারে "ভারতবর্ষ" এই এক বৎসবকাল অলঙ্কৃত হইয়াছে।...এতদ্ভিন্ন নবীন লেখকের রচনারাশিও 'ভাবতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়া তাহাকে যে কেবলই নিন্দিত করিয়াছে, এমন কথা আমাদেব কোনও সমালোচকও বলেন না। এই সকল লেখকেব বচনা ব্যতীত ভারতবর্ষে অনেক নূতন বিষয় নূতন প্রণালীতে দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

"ভারতবর্ষ" যখন আসরে নামিল, তখন একটা কথা উঠিয়াছিল, এই শ্রেণীব মাসিকপত্রের কি অভাব আছে? ঠিক এই প্রশ্নের আবৃত্তি প্রতি নূতন মাসিকপত্রের আবির্ভাবকালেই হয়।...

মাসিকপত্রের অবস্থা এখন যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, সকলেই পাঁচফুলে সাজি সাজাইয়া পাঠক-দেবতার সেবায লাগাইতেছেন...। একটা ধুযা উঠিয়াছে, লোকে গল্প-কবিতা-নাটক-উপন্যাসে মশগুল হইয়া পড়িযাছে, তাই গভীর বিষয়ের আলোচনা পড়িতে চায় না...আমরা কিন্তু সে কথা মানি না। হাটে বল করিযা দাঁড়াইতে হইলে ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, সমালোচনা প্রভৃতি কোন বিষয়ই তো বাদ দিতে পারা যায় না।...'

এই আদর্শ অনুসরণ করেই ভারতবর্ষ পরবর্তী বর্ষে পদার্পণ করল। দ্বিতীয় বর্ষের আরম্ভে পণ্ডিত অমূল্যচরণ চলে গেলে 'বঙ্গনিবাসী'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার সহযোগী হলেন। তৃতীয় বৎসরে তিনিও চলে গেলেন। সেই থেকে সুদীর্ঘকাল আমি একাকী 'ভারতবর্ষ' নিয়ে বসে আছি।"' (স্মৃতিতর্পণ, ভারতবর্ষ, ভাদ্র ১৩৪৩)

॥ ৪ ॥

অতএব চতুর্থ বর্ষের সূচনা থেকে (আষাঢ় ১৩২২) আমৃত্যু জলধর ছিলেন 'ভারতবর্ষের অবিসংবাদী সম্পাদক। দীর্ঘ চব্বিশ বছরের একক দায়িত্বে ভারতবর্ষ ক্রমশ উন্নতির সোপানে আরোহণ করতে লাগল। দ্বিতীয় বর্ষ থেকেই তিনি আরও নবীন-প্রবীণ লেখক-লেখিকাকে 'ভারতবর্ষে' ঠাঁই দিতে শুরু করলেন। অমলা দেবী, অম্বুজাসুন্দরী দাশগুপ্ত, অক্ষয়কুমার সরকার, অনঙ্গমোহিনী দেবী, ইন্দিরা দেবী, কাঞ্চনমালা দেবী, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ সোম [ বস্তুত বাংলায় মধুসূদন-চর্চার সূত্রপাত জলধর সেনের উদ্যোগেই আরম্ভ হয়েছিল ], পরমেশপ্রসন্ন রায়, প্রফুল্লময়ী দেবী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বটুকনাথ ভট্টাচার্য, বিনয়কুমার সরকার, বিভূতিভূষণ ভট্ট, মন্মথনাথ ঘোষ, যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, রাধাগোবিন্দ চন্দ্র, রামপ্রাণ গুপ্ত, শশাঙ্কমোহন সেন, শিবরতন মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ লেখকদের রচনায় ভারতবর্ষ সমৃদ্ধ হয়েছিল। পরবর্তী বৎসরগুলিতে একই প্রক্রিয়ায় নবীন-প্রবীণদেব আহ্বান-আমন্ত্রণ অব্যাহত থাকল। ফলে অচিরেই 'ভারতবর্ষে-র' আকর্ষণ বাঙালি পাঠকের কাছে অনিবার্য হয়ে উঠল। সঙ্গের একবর্ণ ও বহুবর্ণ চিত্রসম্পদ ভারতবর্ষের নান্দনিক প্রসাদবর্ধনে নিরলস থাকল। প্রতি মাসের প্রথমেই পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ যেন প্রবাদে পরিণত হল। এর পাশে প্রবাসী ছাড়া অন্য পত্রিকাগুলি যেন ম্লান। 'যমুনা'র কথা স্মবণ কবে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিকথায় একটি তুলনামূলক চিত্র এঁকেছেন ঃ

'তখন অভাব-অসুবিধার উভয়কূল-ব্যাপী বালুকারাশির মধ্যে 'যমুনা' নিতান্তই শীর্ণকায়া। গ্রাহক-সংখ্যা শ' দুই-আড়াইয়ের বেশি নয়, নগদ বিক্রয় তদপেক্ষাও কম! কার্তিক মাসেব পূজার সংখ্যা বাজাবে নামে পৌষ মাসে...বিনা পয়সার কমপ্লিমেন্টারি কাগজ প্রতিমাসে বোধহয় শ' দেড়েক-দুই বিতবিত হয়।. চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা, অব্যবস্থা; শান্তি-সন্তুষ্টি কোনোদিকেই দেখা যায় না, একমাত্র বিনা-পয়সাব খদ্দেরদেব দিক ছাড়া।'

শুধু যে অর্থ এবং লেখক থাকলেই পত্রিকা সম্পাদনা করা যায় না, চিরদিনেব সম্পাদক জলধব সে-কথা জানতেন। পত্রিকাকে তিনি পাঠকেব গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য বিবিধপ্রকার আয়োজন করতেন। বাঙালি প্রীতি ছিল তাঁব প্রবাদস্থলীয় কিন্তু ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশ এবং বিশ্বকে বঞ্চিত করে যে পত্রিকার তথা বাংলাসাহিত্যের উন্নতি করা যাবে না, তাও তিনি জানতেন। শুধু বাণিজ্য-সফল পত্রিকা সৃষ্টি তাঁর লক্ষ্য ছিল না, ছিল বাংলা সাহিত্যকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করার পরিকল্পনা। তিনি নিজে একজন সাহিত্যিক ছিলেন, তাই সাহিত্যের মর্যাদা ও প্রসার তাঁর লক্ষ্য ছিল। 'ভারতী' গোষ্ঠীর লেখকেরা বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে কেমন করে বিশ্বসাহিত্যের সংযোগ ঘটিয়ে চলেছেন তা তিনি লক্ষ্য কবেছিলেন। 'ভারতবর্ষেও অনুবাদ এবং বিদেশী নানা সংবাদ পরিবেশিত হতে থাকল। 'নিখিল প্রবাহ' ও 'বৈদেদিকী' নামক দুই স্তম্ভ ভারতবর্ষের বিদেশ-চর্চার অন্যতম নিদর্শন। কবি নবেন্দ্র দেব তাঁকে এ-বিষয়ে সহযোগিতা করতেন অন্যান্যদের মধ্যে। একইসঙ্গে প্রাদেশিক সাহিত্যচর্চার

মাধ্যমে যে একটা জাতীয় সংহতি গড়ে ওঠে, তা বহুপূর্বেই তিনি অনুধাবন করেছিলেন। তাছাড়া তুলনামূলক সাহিত্যচর্চার একটা দিগন্তও এতে উন্মোচিত হয়। উদাহরণস্বরূপ পূর্ণদায়িত্ব নেবার পরই প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অধ্যাপক রসিকলাল রায় মাঘ ১৩২২ এবং বৈশাখ ১৩২৩ সংখ্যায় দুটি সুদীর্ঘ সচিত্র প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন যথাক্রমে 'হিন্দি-সাহিত্য ও তাহার সেবকগণ' এবং 'গুজরাতী সাহিত্যের ক্রমবিকাশ' নামে। 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত সাময়িকীতে ধরা আছে সে সময়ের ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক নানা বিচিত্র সংবাদ—যা বাদ দিয়ে ভারতের ইতিহাস রচনা করা যায় না। তার সঙ্গে 'শোকসংবাদ' শিরোনামায় বিখ্যাত মানুষদের সচিত্র জীবনী প্রকাশ করে বাঙালির জাতীয়জীবনের একটি ধারাবাহিক আলেখ্য সংযুক্ত করে গেছেন। বহু সংখ্যার প্রচ্ছদচিত্রই ছিল সেরা বাঙালির রঙিন চিত্র। অনেক সময় তাঁদের সম্পর্কে চমৎকার জীবনী রচিত হয়েছে (বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ তাঁর 'সন্ধ্যা'র সহযোগী, তাঁর মতোই কানে কিছুটা বধির—এগুলির মধ্যে অনেকগুলির রচয়িতা) ভিতরের পৃষ্ঠায়। বস্তুত প্রচ্ছদচিত্রগুলির বিবরণ ইতিহাসের বিষয় হয়ে রয়েছে। পৌষ ১৩৩২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল কেশবচন্দ্র সেনের প্রতিকৃতি। এ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছিল :

'এবারের 'ভারতবর্ষ'-এর প্রচ্ছদপটে যে মহাত্মার প্রতিকৃতি সুশোভিত হইল, বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই পৌষ মাসে তিনি পরলোকগত হইলেও আজ পর্যন্ত বঙ্গদেশবাসী—শুধু বঙ্গদেশবাসী কেন ভারতবাসী তাঁহার নাম, তাঁহার অবদান বিস্মৃত হয় নাই—তিনি মহাত্মা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়। এখনও এতকাল পরে কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে তাঁহার সেই জলদগম্ভীর বক্তৃতা, তাঁহার প্রাণস্পর্শী বাণী।'

প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ পত্রিকা জলধর সেনের সম্পাদকতায় বাঙালির দুষ্প্রাপ্য অ্যালবামে পরিণত হয়েছিল। যে চিত্র অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না, তার জন্যে ভারতবর্ষে সন্ধান হয়তো ব্যর্থ প্রচেষ্টা নাও হতে পারে।

॥ ৫ ॥

লেখক আবিষ্কার ও লেখক সৃষ্টি প্রথম শ্রেণীর সম্পাদকের অন্যতম কর্তব্য। এ বিষয়ে জলধরের ভূমিকা তর্কাতীত। বহু লেখকের প্রথম লেখা এর পৃষ্ঠাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। এঁদের পরবর্তী সাহিত্যজীবন ছিল ফলপ্রসূ। উদাহরণ স্বরূপ 'পরশুরাম'-খ্যাত রাজশেখর বসুর কথা বলতে পারি। তাঁর প্রথম গল্প 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' ভারতবর্ষেই প্রথম প্রকাশিত হয় (১৩২৯)। প্রবোধকুমার সান্যালের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে 'ভারতবর্ষে' 'মহাপ্রস্থানের পথে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের পর। নতুন লেখকদের সম্পর্কে তাঁর একটা আশ্চর্য সহানুভূতি ছিল। কাউকেই তিনি কটু কথা বলতে অথবা 'রচনা মনোনীত হয়নি তাই ছাপা হয়নি' এমনতর কথা বলে আঘাত দিতে চাইতেন না। উৎসাহ দিতেন, সংশোধন করে নিতেন অথচ মনোনীত না হলে ছাপার কথা ভাবতেন না। কবিতার ব্যাপারে প্রায় সব সম্পাদকের মতো তিনিও বিশেষত্ব সম্পন্ন ছিলেন। কারণ বাংলাদেশে চিরকালই কবিতা ছাপাবার আগ্রহ সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। কেউ কবিতা দিলে সেটি

নিয়েই পকেটস্থ করতেন। ধীরে পকেট উঁচু হয়ে উঠত। কিছুদিন পরে সেসব অমনোনীত রচনা 'রজকালয় থেকে নিস্পাপ শুভ্রতার রূপ নিয়ে ফিরে আসত' বলে কেউ কেউ অনুযোগও করেছেন। আবার কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাক্ষ্য দিয়েছেন—রচনা একটু চলনসই হলেই তিনি তরুণদের আশা উৎসাহ ও সৎপরামর্শ দিয়ে তুষ্ট করতেন এবং সেটিকে একটু আধটু পরিবর্তিত করে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশ করতেন। সে কারণে উল্টে অন্য ক্রিটিকদের কাছে কত কথাই না শুনতেন। শুনে হেসে বলতেন—'ভারতবর্ষকে মহাদেশ বললে গুরুতর ভুল হয় না। তার পক্ষে ভালমন্দ থাকবে বইকি!' আমরা 'ভারতবর্ষে' লিখেছেন—এমন কয়েকজনের সাক্ষ্য এখানে তুলে ধরি :

**দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ঃ** ভ্রমণ-বিবরণ-কথা-সাহিত্যে আমি তাঁহার অযোগ্য অনুবর্তী। তাঁহার সম্পাদিত যুগ-প্রবর্তক 'ভারতবর্ষ' পত্রে আমার 'য়ুরোপে তিনমাস' প্রথম প্রচারিত। সেই উৎসাহে পরে 'প্রবাস-পত্র', 'দক্ষিণ আফ্রিকার দৌত্য কাহিনী', 'জেনিভা ভ্রমণ' ও 'স্মৃতিরেখা' প্রকাশিত হয়।...নবীন সম্পাদক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের আনুকূল্যে 'য়ুরোপে তিনমাস' ভারতবর্ষে প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। এই জন্য আমি তাঁহার নিকট ঋণী।

**মুণীন্দ্র দেবরায় ঃ** "ভারতবর্ষে" আমার প্রথম প্রবন্ধ "বংশবাটী" বা 'বাঁশবেড়িয়া' প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ আলাপ ঘটে নাই—সাক্ষাৎ জানাশুনা নাই অথচ দাদার আমার প্রতি দয়ার অবধি নাই।'

**যোগেশচন্দ্র বাগল ঃ** 'বিখ্যাত পার্শী ধনী ও দানবীর রুস্তমজী কাওয়াসজী সম্বন্ধে একটি তথ্যভিত্তিক বড় প্রবন্ধ রচনা করিলাম।...দ্রুত প্রকাশনার নিমিত্ত ব্রজেন্দ্রনাথ আমার এ প্রবন্ধের বিষয় জলধরদাকে বলিলেন। জলধরদা আমার প্রবন্ধটি সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং 'ভারতবর্ষের' পরবর্তী সংখ্যায় উহার অর্ধেকটা প্রকাশিত হইল (চৈত্র ১৩১৮)। দ্বিতীয়ার্ধ বাহির হয় পরবর্তী জ্যৈষ্ঠ মাসে। এই আমার প্রথম নাম সংযুক্ত মুদ্রিত রচনা। প্রথম লেখা এইরূপ দ্রুত প্রকাশে কত যে উৎসাহিত হইযাছিলাম বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। একদিন দেখি জলধবদা স্বয়ং. "ভায়া, এই নাও" বলিয়া পকেট হইতে একখানি দশ টাকার নোট বাহিব করিয়া আমার বুক পকেটে গুঁজিয়া দিলেন। বুঝিলাম ইহা আমার লেখার দক্ষিণা। ..জলধরদার নিকট সেদিন যে উৎসাহ ও প্রেরণা পাই, জীবনে তাহা পাথেয স্বরূপ হইয়া আছে। এইরূপ কত তরুণই না তাঁহার নিকট হইতে উৎসাহ লাভ করিয়াছিল।'...

**অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ঃ** 'ওদিকে সবচেযে জনপ্রিয় ছিল "ভাবতবর্ষ"—কাটতির জনশ্রুতি পরিস্ফীত। আশাতীতরূপে সেখানে একদিন ডাক দিলেন জলধর সেন। সর্বকালের সর্ববয়সের চিরন্তন দাদা। অতি আধুনিক সাহিত্যিক বলে কোনো ভীরু সংস্কার তো নেইই ধরং যেখানে শক্তি দেখলেন সেখানেই স্বীকৃতিতে উদার-উচ্ছল হয়ে উঠলেন। মুঠো ভরে শুধু দক্ষিণা দেয়া নয়, হৃদয়ের দাক্ষিণ্য দেওয়া।...একজন রায়বাহাদুর, প্রখ্যাত এক পত্রিকার সম্পাদক, সর্বোপরি কৃতার্থম্মন্য সাহিত্যিক—অথচ অহংকারেব অবলেশ নেই। ছোট বড় কৃতী-অকৃতী—সকলের প্রতি তাঁর অপক্ষপাত পক্ষপাতিত্ব। বাংলা

সাহিত্যের সংসারের একমাত্র জলধর সেনই অজাতশত্রু।...সম্পাদকের লেখা প্রত্যেকটি চিঠি তিনি স্বহস্তে জবাব দিতেন—আর সবচেয়ে আশ্চর্য, ছানিকাটানো চোখেও প্রুফ দেখতেন বর্জাইস টাইপের। কানে খাটো ছিলেন...কিন্তু প্রাণে খাটো ছিলেন না।...চেঁচিয়ে বলছিলুম এতক্ষণ যাতে সহজে শোনেন। হঠাৎ গলা নামালুম, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ করলুম, আর, আশ্চর্য, অমনি শুনে গেলেন সহজে। খবর পেলুম গল্প পড়া ছাড়া ছাপা শেষ হয়ে গেছে। কাল কাগজ বেরুবে তা বেরোক, আজ যখন এসেছ আজকেই টাকাটা নিয়ে যাও।'

**নলিনীকান্ত সরকার** ঃ 'জলধর সেন মহাশয় তখন 'সুলভ সমচার'-এর সম্পাদক। একটি কবিতা...পাঠিয়ে দিলাম...মাসখানেকের মধ্যেই কবিতাটি প্রকাশিত হলো।...সেই জলধর সেন মহাশয় হলেন 'ভারতবর্ষের' সম্পাদক।...একটি হাসির গান 'ভারতবর্ষের' জন্য তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। ও হরি, সেই জলধর সেন মহাশয় এবারে আমার হাসির গানটি ফিরিয়ে দিলেন।...একটি রসরচনা লিখলাম। লেখাটি অবিলম্বে 'ভারতবর্ষে' (আষাঢ় ১৩২৬) বেরিয়ে গেল।...ইচ্ছা হলো 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসি।...ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলাম সম্পাদক মহাশয়কে।...সম্পাদক জলধর সেন মহাশয় স্নেহ-সম্ভাষণে বললেন, 'বোসো ভাই, বোসো। লেখাটেখা কিছু এনেছো?' "...লেখা তো কিছু আনতে পারিনি, কেবল আপনাকে দর্শন করতে এসেছি।" দর্শন করবে আর দর্শনী দেবে না—এ কেমন কথা? তা হবে না। কাগজ দিচ্ছি, কলম দিচ্ছি—ঐখানে বসে যা হয় একটা কিছু লিখে দিয়ে যাও।" '

**চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য** ঃ 'একটা প্রবন্ধ খাড়া করিলাম, নাম—শর্কড়িতত্ত্ব।...তখন সবে 'ভারতবর্ষ' প্রকাশিত হইয়াছে; জলধর সেন সম্পাদক। তাঁহার সহিত পরিচয় নাই। প্রবন্ধটি 'ভারতবর্ষে' প্রকাশের জন্য ডাকে পাঠাইলাম, খুব ভয়ে ভয়ে।·সঙ্গে যে পত্র লিখিলাম তাহার শেষে লেখা ছিল যে সপ্তাহের মধ্যে উত্তর না পাইলে ধরিয়া লইব যে উহা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইবে না।..তৃতীয় দিনে জলধরবাবুর নিকট হইতে উত্তর আসিল। তাহাতে লেখা—"আমরা সম্পাদক শ্রেণীর জীব, চিঠির উত্তর বড় দিই না। কিন্তু আপনার চিঠি পাইয়াই উত্তর দিতেছি, সুতরাং জানিবেন আপনার শকড়ি, মাথায় করিয়া লইয়াছি।"

এমনি আরও পঞ্চাশটি সাক্ষ্য উপস্থিত করতে পারি। তার প্রযোজন কি। উদ্ধৃত অংশগুলি থেকে সম্পাদক জলধরের চরিত্রটি স্পষ্টতই অনুধাবন করা যায়। আসলে জলধর কোনোদিন গুরুগিরি করতে চাননি। তাঁর দায়িত্ববোধ, দূরদর্শিতা এবং দক্ষতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সুরুচি ও ঋজু বিচক্ষণতা। পত্রিকার আঙ্গিক, সৌষ্ঠব বৃদ্ধি, মুদ্রণে পারিপাট্য, আলোকচিত্র, অঙ্কিত চিত্র, কাগজ বাঁধাই—সব কিছুকেই রচনাবৈচিত্র্যের সঙ্গে পাঠকদের মনোগ্রাহী করে তুলেছিলেন। তারই সঙ্গে আদর্শবোধ ছিল সদাজাগ্রত। যা নিজে বুঝতেন না, তা নিয়ে অকাবণ খবরদারি করতেন না।

'দেশ'-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় সাগবময় ঘোম এ-বিষয়ে তাঁর একটি কৌতুককর অভিজ্ঞতার কথা 'সম্পাদকের বৈঠকে' সরস করে পরিবেশনা করেছেন ঃ

'শরৎচন্দ্রের জয়ন্তী উৎসব ঘটা করে করবার উদ্যোগ চলছে। শিল্পীবন্ধু সুকুমারদা...এই উপলক্ষে কাঠের উপর তেলরঙ দিয়ে শরৎচন্দ্রের একটি জবরদস্ত পোর্ট্রেট এঁকে আমায় বললেন—'এই সময়ে কলকাতার কোনো পত্রিকায় ছবিটা ছেপে দাও।'

মনে পড়ল 'ভারতবর্ষে'র কথা।...ছবিখানি হাতে করে সটান চলে এলাম কলকাতায়, একেবারে ভারতবর্ষের অফিসে।...

—'শরৎবাবুর একটা রঙিন পোর্ট্রেট এনেছি, একবার যদি দেখেন।' খবরের কাগজের ভাঁজ খুলে ছবিটি তার হাতে তুলে দিলাম।

ছবিটি হাতে নেওয়া মাত্রই জলধরদার চোখ-মুখের সেই প্রশান্ত ভাব নিমেষে অপ্রসন্নতায় ভরে উঠল। দু হাতে ছবির দুটো ধার ধরে একবার চোখের কাছে নিয়ে আসেন, আবার দুই হাত সটান সামনের দিকে প্রসারিত করে দূরদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন।...তারপরেই ছবিটাকে উল্টো করে ধরে ভ্রূকুঞ্চিত তন্ময়তায় কি যেন একটা খুঁজে বার করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন।...

অবশেষে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব মুখে এনে ছবিটা টেবিলের উপর ধপাস করে ফেলে জলধরদা বললেন—

'না হে, ও আমার কম্মো নয়। আসুক হরিদাস, এ-সব শান্তিনিকেতনী আর্ট ও-ই বুঝবে ভালো।'

ক্ষীণকণ্ঠে সভয়ে আমি বললাম—'আজ্ঞে না। এটা শান্তিনিকেতনী আর্ট নয়, কণ্টিনেন্টাল আর্ট। একেবারে মডার্ণ ইটালিয়ান স্কুল।'

গর্জন করে উঠলেন জলধরদা। '—এসব ইস্কুলের ছেলেছোকরাদের ছবি, তা আমার কাছে এনেছ কেন? 'মৌচাক' 'শিশুসাথী'তে গেলেই তো পারতে।'

॥ ৬ ॥

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জলধরের একটা প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ যে বেশি লিখেছেন, এমন কখনই নয়। তবে এর প্রথম বর্ষ থেকেই কবি যুক্ত ছিলেন। 'ভারতবর্ষও' পক্ষ-বিপক্ষ না মেনেই রবীন্দ্রচর্চা অব্যাহত রেখেছিল। ১৩৩৮ পৌষ সংখ্যার সূচনাতেই কবির পূর্ণ পৃষ্ঠা ছবি মুদ্রিত হয়েছিল। কবির 'বাঁশরী' নাটকটি সম্প্রতি মুদ্রিত হয়েছিল এর ১৩৪০ সালের কার্তিক-পৌষ সংখ্যাগুলিতে। এ প্রসঙ্গে কবি নির্মলকুমারী মহলানবিশকে একটি চিঠিতে লিখেছিল—

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

সঙ্কটে পড়েচি। ভারতবর্ষওয়ালারা ফরমাশ করেচে সেই 'কপালের লিখন' গল্পটা, অর্থাৎ বাঁশরীর পূর্ব্বজন্মের লীলাটাকে তাদের আশ্বিন সংখ্যার জন্যে। রথী কলকাতায় গিয়ে

পেটের দায়ে তাদের কাছ থেকে তিনশো টাকার চেক পকেটে করে এসে আমাকে বলে সেই গল্পটা দাও। আমি বাক্স তোরঙ্গ আলমারি ডেস্ক বালিশের নীচে তক্তপোশের তলায় ছেঁড়া কাগজেব ঝুড়িতে খোঁজ করে পেলাম না—তিনশো টাকা পুনরুদ্ধার করবার মতো সাহস ও শক্তি নেই। এক একবার অত্যন্ত ঝাপসাভাবে মনে হচ্ছে খাতাটা হয়তো বা তোমার করকমলে আশ্রয় পেয়েচে—জোর গলায় বলতে পারচিনে, কেননা আমাব স্মরণশক্তির 'পরে আমার শ্রদ্ধামাত্র নেই। কিন্তু যদি সেখানা তোমারই করুণছায়ায় বক্ষা পেয়ে থাকে তবে পত্রপাঠমাত্র রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠিযে দিযে মান রক্ষা করো—পোস্টেজের খরচ কত লাগল জানবামাত্র সেই তিনশো টাকা থেকে শোধ কবে দেব—এবং কাজ উদ্ধাব হলেই খাতাটিকে তোমাব হাতে সমর্পণ কবে তাব খাতাজন্ম সার্থক হতে দেব—ইতি

৪ ভাদ্র ১৩৪০ কবি

একই সমযে বিচিত্রাতে গল্প লিখেও কবি সমপরিমাণ টাকা পেতেন (দ্র নির্মলকুমারী মহলাবিশকে লেখা ৬ কার্তিক ১৩৩৯ তাবিখেব চিঠি, দেশ, ১২ আগস্ট ১৯৬১, পৃ ১২৪)। এর পরই প্রমথ চৌধুরি লেখক হিসাবে ভাবতবর্ষে যোগ দেন। সানন্দে কবি প্রমথ চৌধুরিকে লিখেছেন :

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

পেয়েছি ভাবতবর্ষ। সাবাস্। খুব ভালো হযেছে। অর্থাৎ তোমাব শিলমোহরেব ছাপ পড়েছে অতএব এব দাম কম নয। এ ধবনের লেখা আর কাবো কলমে কুটতে পারে না। সাহিত্যে যাবা জালিযাতি কবে দিন চালায তারা হতাশ হবে। ইতি ৩ শ্রাবণ ১৩৪৪।

ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব

জলধব সেনেব প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত ববীন্দ্রনাথ জলধব সেনেব ৭৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত 'জলধব কথা'ব সূচনায লিখেছিলেন :

ওঁ

যিনি বাংলা সাহিত্যসমাজে আপন স্নিগ্ধ সহৃদযতাগুণে বর্তমান সাহিত্যসাধকদের হৃদয জয কবিযাছেন সেই প্রবীণ সাহিত্যতীর্থ পথিক শ্রীযুক্ত জলধব সেনেব সম্মাননাব উদ্দেশে উৎকৃষ্ট প্রশস্তি পুস্তকে এই কযেকছত্র অর্ঘ্যরূপে পাঠাইলাম। ইতি ২৩ আষাঢ ১৩৪১

ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব

আর জলধরের পরলোকগমনের সংবাদ শুনে লিখেছিলেন:

**জলধর**

বাঙালীর প্রীতি অর্ঘ্যে তব দীর্ঘ জীবনের তরী
স্নিগ্ধ শ্রদ্ধাসুধারস
নিঃশেষে লয়েছে পূর্ণ করি।
আজি সংসারের পারে, দিনান্তের অস্তাচল হোতে
প্রশান্ত তোমার সৃষ্টি
উদ্ভাসিত অন্তিম আলোতে॥

পুরী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৬.৪.৩৯

॥ ৭ ॥

একদিকে রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যদিকে শরৎচন্দ্র—দুই শ্রেষ্ঠ বাঙালি সাহিত্যিককে 'ভারতবর্ষে'ব পৃষ্ঠায় আকর্ষণ ও আবদ্ধ করে জলধর এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন কবে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে শবৎচন্দ্রকে আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠার মূলে জলধরের (অবশ্যই হরিদাস চট্টোপাধ্যায়েরও) ভূমিকা প্রবাদের স্থান গ্রহণ করতে পাবে। ১৩০৯ বঙ্গাব্দের কুন্তলীন পুরস্কারের বেনামী শরৎচন্দ্রের 'মন্দির' নামে যে গল্পটি প্রথম পুরস্কার পায়,—ঘটনাচক্রে তার নির্বাচক ছিলেন জলধব সেন।

আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি 'ভারতবর্ষ' প্রকাশের সময় শরৎচন্দ্রের মনোভাব নানা কারণে অনুকূল ছিল না। বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লেখা চিঠিপত্রগুলি থেকে (দ্র শরৎচন্দ্র, তৃতীয় খণ্ড, গোপালচন্দ্র রায়) তার প্রমাণ পাওয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু হওয়ায় অনেকেই ভারতবর্ষের 'স্ট্যাবিলিটি' সম্পর্কে সন্দিহান হন। তবুও প্রমথনাথের টানে শরৎচন্দ্র ভারতবর্ষে লিখতে সম্মত হন। আসলে সে সময়ে তিনি 'যমুনা' এবং 'ভারতবর্ষে'র মধ্যে দোটনায় পড়েছিলেন। ..পর অবধি 'যমুনাব' সঙ্গে তিনি সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেন এবং বস্তুত বিদ্বিষ্ট হয়ে ওঠেন। ধীরে ধীরে 'ভাবতবর্ষে'র প্রতি তাঁর মন অনুকূল হয়ে ওঠে এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁর রচনার সিংহভাগ এর পৃষ্ঠাতেই প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম যে রচনা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয়, সেটি ছিল 'বিরাজ বৌ' (পৌষ ও মাঘ ১৩২০)। পরে পরে পণ্ডিতমশাই, মেজদিদি, দর্পচূর্ণ, আঁধাবে আলো, দেওঘরের স্মৃতি, পল্লীসমাজ, বৈকুণ্ঠের উইল, অবক্ষণীয়া, শ্রীকান্ত, দেবদাস, নিষ্কৃতি, একাদশী বৈরাগী, দত্তা, গৃহদাহ, দেনাপাওনা, নববিধান, শেষ প্রশ্ন, অনুবাধা, শেষের পরিচয় (অসমাপ্ত) প্রভৃতি রচনা প্রকাশিত হয়ে বাংলা সাহিত্যের এই হোলটাইমারকে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে। এর পিছনে জলধরের ভূমিকা ছিল সর্বাগ্রগণ্য। স্বভাবত অলস শরৎচন্দ্রকে ক্রমাগত তাগাদা দিয়ে লেখানোর ব্যাপারে তাঁর ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপ সম্পাদক হিসাবে তাঁকে আদর্শ করে

তুলেছিল। 'ভারতবর্ষ' অফিসে এলে ঘর অর্গলবদ্ধ করে, সামতাবেড়-পানিত্রাসে লাঠি হাতে গিয়ে রাত্রিবাস করে, কখনও রুষ্ট, কখনও তুষ্ট হয়ে শরৎচন্দ্রকে দিয়ে তিনি লিখিয়ে না নিলে বাংলা সাহিত্য দরিদ্র হয়ে পড়ত। সেকথা শরৎচন্দ্রও বুঝতেন। তাই তাঁব এই দাদাটিকে তিনি সমীহই করতেন। জলধর সম্বর্ধনা পত্রটি রচনা করে তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধাকে তিনি উচ্চারণ করেছিলেন। উল্লেখ করার বিষয় জলধর যেখানে থেমে গেছেন আর তাগাদা দিতে পারেননি, সেখানেই শরৎচন্দ্রেব সাহিত্যসৃষ্টিও থেমে গেছে। প্রসঙ্গত শরৎচন্দ্রের মৃত্যু হলে জলধর 'ভাবতবর্ষে'র ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩৪৪ সংখ্যায় 'সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র' নামে যে বিশেষ ক্রোড়পত্র বের কবেন—তার তুলনা হয় না। শরৎচন্দ্র এখানে সমগ্রত ধরা পড়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ, ক্ষিতিমোহন সেন, বাজেন্দ্রপ্রসাদ, সি. এফ অ্যান্ড্রুজ, বি. গোপাল রেড্ডি, সুভাষচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, তুলসীচন্দ্র গোস্বামী, লর্ড ব্রাবোর্ন, খগেন্দ্রনাথ মিত্র এবং দীনেশচন্দ্র সেনের শ্রদ্ধাঞ্জলিব সঙ্গে মুদ্রিত হয়েছিল প্রবোধচন্দ্র সান্যাল, মুরলীধর বসু, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শচীন সেন, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, সোমনাথ মৈত্র, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, হুমায়ুন কবির, অবনীনাথ বায়, বিশ্বপতি চৌধুরি, অপরাজিতা দেবী, নরেন্দ্র দেব, রাধারানি দেবী, যতীন্দ্রমোহন বাগ্চি, শিবরাম চক্রবর্তী প্রভৃতি বহু জনেব রচনা। শরৎচন্দ্রের নানা দুষ্প্রাপ্য ছবি এবং হাতেব লেখার ব্লক এই সংখ্যার মূল্য বৃদ্ধি করেছিল।

এই প্রসঙ্গে নিবেদনযোগ্য যে, জলধর এর আগে ভাবতবর্ষের আবও একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছিলেন। ১৩২২ সনের কার্তিক সংখ্যাটি 'মহিলা সংখ্যা' রূপে চিহ্নিত হয়। প্রকৃতপক্ষে 'ভারতবর্ষ' লেখিকাদের স্বর্গ বাজ্য ছিল।

॥ ৮ ॥

জলধর সেনের মৃত্যু ঘটে ১৫ মার্চ ১৯৩৯ তারিখে। সম্পাদকীয় দায়িত্ব নিলেন ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুধাংশুকুমার চট্টোপাধ্যায। সুধাংশুবাবুর পর ফণিবাবুব সঙ্গে সহযোগিতা করেন শৈলেনকুমাব চট্টোপাধ্যায়। বাংলা তেরো শতকের সাতের দশক পর্যন্ত ভারতবর্ষ পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে—শেষেব দিকে কিছু অনিয়মিতও। কিন্তু পঞ্চাশেরও বেশি বছর ধরে মাসিক পত্রিকা জগতে 'ভারতবর্ষ' একটা স্থায়ী আসন লাভ করে গেল। প্রবাসী'র সঙ্গে তুলনা না করেও বলা যায়—এই পত্রিকার গৌরব প্রায় প্রবাসীর সমতুল্য। এতোগুলো বছর ধরে ভারতবর্ষ প্রায় একশোটি উপন্যাস, হাজার দেড়েক ছোট গল্প, এবং আনুপাতিক নাটক, দু-হাজারেরও বেশি মননশীল প্রবন্ধ, আজ কবিতা, গান, ছোটদের বচনা, রস-রচনা—সাহিত্যের সর্বশাখা স্পর্শ করে প্রবাদস্থলীয় হয়ে উঠেছে। গ্রন্থসমালোচনা, ভ্রমণ কাহিনি, সাহিত্য সংবাদ, বিজ্ঞান প্রসঙ্গ, নিখিল প্রবাহ, বিশ্বজগৎ, চলচ্চিত্র ও নাটক সমালোচনা, খেলাধুলোর বিশ্বকে প্রতিমাসে পাঠকের কাছে পৌছে দিয়েছে। কত প্রতিষ্ঠিত লেখক প্রসাবিত হযেছেন, কত নতুন লেখক প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন।

এই বিপুল রত্নভাণ্ডার থেকে কিছু নমুনা নিযে আমাদের এই আয়োজন। পঞ্চাশ বছর ধরে প্রায় এক কোটি পৃষ্ঠা ধরে যে আযোজন ঘটেছিল, তাকে অর্ধসহস্র পৃষ্ঠায় আস্বাদ

করা প্রায় অসম্ভব। তবুও একালের পাঠকের কথা ভেবে সেই অসম্ভব কাজটিই আমাদের করতে হয়েছে। প্রায় বিশ বছর ধরে এই পত্রিকাটির জীর্ণ পৃষ্ঠাতে আমার বহুতর বিচরণ ঘটে চলেছে। ফলে এর সেরা সম্ভার সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে উঠছে। সেই সংবাদ ভানুদার কর্ণগোচর করেছিলেন কেউ। অথবা তাঁর মতো চক্ষুষ্মান প্রকাশক তো দুর্লভ। তাই এই বাছাবাছির কাজটা আমাকে দিয়েছেন তিনি।

আমি জানি, সচেতন পাঠক এতে খুঁত খুঁত করতে পারেন। সত্যি বলতে কি, তিনিও জানেন—এই দায়িত্ব পেলে তিনিও সবাইকে খুশি করতে পারবেন না। সকলেই বলে থাকেন—'ভালো হতো আরও ভালো হলে'। রবীন্দ্রনাথ পারেননি, আমরা তো...

তবুও একটা জায়গায় আমরা দাঁড়াতে চলেছি। 'ভারতবর্ষ' বিষয়ে একটা আন্দাজ দেবার চেষ্টা করেছি—পুরোনো অভিজ্ঞতা পুনশ্চ উপস্থিতও করেছি। নানাবিধ রচনা—উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, রসরচনা, ভ্রমণ কাহিনি, কবিতা—নানা শাখায়িত 'ভারতবর্ষ' অতঃপর বাঙালি কাছে সমুপস্থিত। ভরসা করি তার কদর করবেন পাঠকবৃন্দ।

বারিদবরণ ঘোষ

# গল্প

# অভিশপ্ত নীলা

## নীহাররঞ্জন গুপ্ত

বাহিরে আকাশ ভাঙ্গিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে।

এই অল্পক্ষণ হয় হাসপাতাল হইতে ফিরিয়াছি। ধড়াচূড়াগুলি এখনও গা হইতে নামান হয় নাই। কেবলমাত্র গা হইতে ভারি কোটটা খুলিয়া চেয়ারের হাতলে ঝুলাইয়া একটা সিগারেট ধরাইয়াছি।

সহসা এমন সময় দরজায় কড়া নাড়িবার শব্দ।

নাঃ—জ্বালালে দেখছি। মুহূর্তে মনটা বিগড়াইয়া গেল। এ লোকগুলির বিবেচনা বলিয়া কি একটা পদার্থ নাই।

একবার ভাবিলাম দূর হোক্ গে ছাই। সাড়া দিব না, ফিরিয়া যাক। আবার পরক্ষণেই মনে হইল, সরকারের গোলাম—কে জানে কেন ডাক পড়িয়াছে।

ততক্ষণ বাহিরের দরজায় কড়া দুটা আবার যেন কে আরও জোরে নাড়া দিল। একান্ত অনিচ্ছার সহিতই বিরক্তচিত্তে বন্ধ দরজাটার দিকে আগাইয়া গেলাম। দরজাটা খুলিতেই প্রবল একটা ঝড়ো হাওয়ার ঝাপ্‌টার সাথে সাথে কে একজন যেন আমাকে একপাশে ঠেলিয়াই ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

তাড়াতাড়ি দরজাটা চাপিয়া খিল লাগাইয়া দিলাম।

দরজাটা বন্ধ করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইতেই আগন্তুক আমার দিকে তাকাইয়া হাত দুটি জড়ো করিয়া মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করিল, নমস্কার!

প্রত্যুত্তরে আমিও কোনমতে প্রতি-নমস্কার জানাইলাম।

বসুন। হাত দিয়া সম্মুখের একখানি চেয়ার দেখাইয়া দিলাম।

ভদ্রলোক আমার নির্দেশমত সম্মুখের চেয়ারখানিতে গিয়া উপবেশন করিলেন। সিলিং ল্যাম্পের খানিকটা আলো আগন্তুক ভদ্রলোকটির মুখের এক অংশে তির্যক্‌ভাবে আসিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

এতক্ষণে ভদ্রলোকটির দিকে বেশ একটু ভাল করিয়াই তাকাইলাম।

তাহার বয়সটা সঠিক যে কত, তাহা অনুমান করা খুবই কঠিন। তবে চল্লিশের কোঠাতেই সামান্য একটু এদিকওদিক বলিয়া বোধ হয়।

কি মর্মস্পর্শী তাহার শীণ চোখের দৃষ্টিটুকু।

চোখের পাশের হাড়টা বিশ্রীভাবে ঠেলিয়া স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কালো চোখের মণি দুটা সেই কোথায় ঢুকিয়া গিয়াছে।

চক্ষু দুটি ছোট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু দৃষ্টিটা যেন আরও প্রখর ও আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সে চোখের দৃষ্টির কাছে কিছুতেই যেন নিজেকে ঠিক রাখা যায় না।

এক মাথা ভর্তি কাঁচা পাকা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। এলোমেলো ও বিস্রস্ত! চুলের ফাঁকে ফাঁকে ফাঁকে এই অল্পক্ষণ আগেই ভিজিবার দরুণ বৃষ্টির জলকণাগুলি ল্যাম্পের অনুজ্জ্বল আলোয় ঝিকমিক্ করিতেছে।

গালের দুই পাশের মাংসপেশী অত্যন্ত বিশ্রীভাবে চুপসাইয়া যাওয়ায় সেখানকার হাড় দুটি সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া ব-এর আকার ধারণ করিয়াছে।

গায়ের শার্টটার উপরের দুইটি বোতামই ছিঁড়িয়া যাওয়ায় ভিজা জামার কলার দুটো নেতাইয়া বুকের উপর আসিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে।

বুকের অনেকটা অংশই বেশ পরিষ্কার দেখা যায়।

ঘাড়ের দুই পাশের কণ্ঠা দুটি সুস্পষ্টভাবে দুই পাশে ঠেলিয়া উঠিয়াছে।

কণ্ঠের শিরা-উপশিরাগুলি সজাগ ও সুস্পষ্ট।

ঘরের অস্পষ্ট আলোয় তাহার সমগ্র মুখখানি ব্যাপিয়াই যেন একটা অতি উগ্র ও রুক্ষ ঋজু ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তাহাকে দেখিলে প্রথম দৃষ্টিতেই মনে হয়—না জানি কি এক কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধি নিশিদিন অনুক্ষণ তাহার ভিতরে ভিতরে তাহাকে নিঃশেষে একেবারে ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছে।

ভদ্রলোকটি নিজেই প্রথমে ঘরের মৃত্যুর মতই ভারি নিস্তব্ধতাকে ভাঙ্গিয়া প্রশ্ন করিলেন, সিগারেট আছে?

নিঃশব্দে পকেট হইতে সিগারেটের কেসটা ও দিয়াশলাই বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে আগাইয়া দিলাম।

কেস্ হইতে একটা সিগারেট লইয়া ভদ্রলোক তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিবার জন্য দুই ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেটটি ঈষৎ চাপিয়া ধরিয়া দিয়াশলাই জ্বালাইলেন।

দেখিলাম, তাহার বাঁ হাতের শীর্ণ অনামিকায় একটা নীলার আংটি। আংটিটা যেন একটা সাপের মত শীর্ণ অঙ্গুলিটা জড়াইয়া কাঠির আগুনের উজ্জ্বল আভায় নীলাটা সাপের চোখের মতই চক চক করিয়া উঠিল। এত বড় আকারের নীলা আমি ইতিপূর্বে আর দেখি নাই।

জ্বলন্ত কাঠিটা ফুঁ দিয়া নিভাইতে নিভাইতে ভদ্রলোকটি আমার মুখের দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করিলেন—আমার আংটির নীলাটা দেখছেন?

আমি মাথা দোলাইয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম।

ভদ্রলোক আংটিসুদ্ধ অনামিকাটি আপন চোখের উপর দৃঢ় করিয়া ধরিয়া কতকটা যেন আপন মনেই কহিতে লাগিলেন—হাঁ এটি রক্তমুখী নীলা, একবার এক সঙ্গে পাঁচশ টাকা দিয়ে এই আংটিটা আমি কিনি। এটি আমার বড় প্রিয়।

সহসা যেন একটা চাপা নিঃশ্বাস ভদ্রলোকটির বুক কাঁপাইয়া ঠেলিয়া বাহিরে আসিল!

আমিও একদৃষ্টে আংটির নীলাটির দিকে তাকাইয়া রহিলাম।

কি একটা অদ্ভুত সম্মোহন শক্তি যেন সেই পাথরটার।

একদৃষ্টে পাথরটির দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে সহসা মাথাটার মধ্যে যেন কেমন একপ্রকার ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল।

সহসা এমন সময় ভদ্রলোকটি বসিয়া থাকিতে থাকিতে একটা যন্ত্রণাকাতর শব্দ করিয়া বাঁ হাত দিয়া ডান দিক্‌কার বুকটা সজোরে চাপিয়া ধরিলেন।

আমি চমকাইয়া বলিলাম—কি হ'ল?

ভদ্রলোক যন্ত্রণাকাতর একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া কহিলেন—ওঃ ডাক্তার! সেই! আবার সেই বেদনাটা বুঝি উঠল!—উঃ!

আমি ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম।

ভদ্রলোক অসহ্য যন্ত্রণায় বুকটা চাপিয়া ধরিয়া টেবিলটার উপর ততক্ষণে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। মাঝে মাঝে তাহার সর্বশরীর কি এক দারুণ ব্যথায় বুঝি কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। আমি শুধু নিরুপায় অবস্থায় চুপটি করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ পরে ভদ্রলোক যেন কতকটা সুস্থ হইলেন।

তাহার সমগ্র মুখখানি জুড়িয়া তখনও বেদনার যেন একটা অতি সুস্পষ্ট ছাপ!

আরও কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোকটি বলিলেন, এই ডান বুকে কি যে একটা ভীষণ বেদনা!

উঃ অসহ্য! একেবারে 'আনবেয়ারেবল্'! মুখের ভাষায় আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারছি না।

উঃ ব্যথায় বুকের পাঁজরাগুলি যেন একেবারে গুঁড়িয়ে যায়! কত ডাক্তার, কত বদ্যি, কত কবিরাজ, কত ঔষধ! কত মালিশই যে লাগালাম! কিছু না! সবই বৃথা!

একটা অস্বাভাবিক গভীর উত্তেজনায় তাহার কণ্ঠস্বরটা ভাঙ্গিয়া পড়িল। ভদ্রলোকটি হাঁপাইতে লাগিলেন!

উঃ এক দিন নয়, দু দিন নয়, এক মাস বা দু মাস নয়, দীর্ঘ পাঁচ-পাঁচটা বছর এই অসহ্য যন্ত্রণা আমি ভোগ করছি। আমায় বাঁচান ডাক্তারবাবু! যন্ত্রণা আর আমি সহ্য করতে পারি না।

সহসা এক সময় ভদ্রলোকটি চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িয়া চঞ্চল পদবিক্ষেপে ঘরের মেঝেয় পায়চারি শুরু করিয়া দিলেন।

ধীরে ধীরে এক সময় আবার তাহার সেই উত্তেজনার ভাবটা যেন একটু একটু করিয়া কমিয়া আসিল। টেবিলটার কাছে আগাইয়া আসিয়া কেস্ হইতে আর একটা সিগারেট লইয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলেন।

আপন মনেই সিগারেটটায় গোটাকয়েক টান দিয়া সহসা আমার মুখের দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করিলেন, আপনি কি মনে করেন?

আজ্ঞে কি বলছেন?

কিন্তু এটা ত ঠিকই যে অসুখ আমার একটা আছেই, তা সে যে অসুখই হোক! নইলে এই অসহ্য ব্যথাটা আসে কোথা হতে! এ ত আর আপনাআপনি গজিয়ে উঠতে পারে না! কিন্তু কি আশ্চর্য দেখুন! আমি একেবারে কিন্তু ভুলেই গেছলাম, বলিতে বলিতে হঠাৎ

পরক্ষণেই যেন ভদ্রলোক অত্যন্ত সজাগ হইয়া জামার নিচেকার পকেটটায় হাত চালাইয়া কি একটা বস্তু বাহির করিতে অতি মাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং হাতের মুঠোয় গোটা দুই তিন দশটাকার নোট বাহির করিয়া আমার সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিতে রাখিতে কহিলেন, হিয়ার ইজ ইওর ফিজ (Here is your fees); সত্যি! আমি আপনার ফিজের কথাটা একেবারে ভুলেই গেছলাম। Excuse me!

আমি লজ্জিত হইয়া উঠিলাম, না না, তার জন্য আর কি?

হ্যাঁ! কি বলছিলাম? হ্যাঁ। আপনার কি মনে হয়?

ডাক্তারেরা কি বলেন? I mean আপনি আমার আগে যাঁদের দেখিয়েছিলেন?

কিন্তু আমার মনে হয় কি জানেন?

কি?

মনে হয় আমার বুকের ভিতর নিশ্চয়ই কোন ফাঁকটাক দিয়ে খানিকটা হাওয়া ঢুকে গেছে। এখন কোন না কোন উপায়ে যদি সেটা puncture করে বার করে দেওয়া যেত, তবে বোধ হয় আমার এ রোগ সারত...মাঝে মাঝে যখন সেই হাওয়ার চাপ বৃদ্ধি পায়, তখনই বেদনাটা feel করি! ...ডাক্তাররা আমার কথা শুনে হাসে। কিন্তু ডাক্তার তুমি একটা সিরিঞ্জ দিয়ে আমার বুকের সেই জমা বিষাক্ত হাওয়াটা any how বের ক'রে দিতে পার? তুমি যা চাও তাই দেব! বলিতে বলিতে ভদ্রলোক সহসা যেন কেমন একপ্রকার অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। তোমরা যাই বল, আমি স্পষ্টই টের পাই সেই বদ্ধ হাওয়াটা বেরুবার কোন পথ না পেয়ে ক্রুদ্ধ আক্রোশে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করে বেড়ায়। মুক্তির জন্য তার কি দুর্জয় গর্জন। তোমরা শুনতে পাও না কিন্তু আমি পাই। দেখ! এই ঠিক—হাঁ এইখানটায়—বলিতে বলিতে ভদ্রলোকটি সহসা দুই হাত দিয়া বুকের জামাটা সরাইয়া হাড়পাঁজরা বাহির করা বুকখানা চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত করিয়া ধরেন—'দেখ দেখি একটিবার কান পেতে, শুনতে পাবে তা'হলে কি সে দুর্জয় গর্জন! কি সে ক্রুদ্ধ আক্রোশ! উঃ! যেন একটা আগ্নেয়গিরি! ...একটানা কথাগুলি বলিয়া ভদ্রলোক হাঁপাইতে লাগিলেন!

কথায় ফাঁকে অনমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম। যখন জ্ঞান হইল চাহিয়া দেখি সম্মুখের চেয়ারটি খালি, ভদ্রলোক নাই! ঘরের দুয়ারটা খোলা! শুধু তখনও সেই নোট তিনখানি ঠিক তেমনিই টেবিলটার উপর পূর্বের মত পড়িয়া! সহসা খোলা দরজা দিয়া একটা জোলো বাতাসের ঝাপ্‌টা আসিয়া টেবিলের উপর হইতে নোট তিনখানি উড়াইয়া ঘরের কোণে লইয়া গিয়া ফেলিল!

তারপর বহুদিন চলিয়া গিয়াছে, একদা সেই বর্ষারাতের আগন্তুকের স্মৃতিটা মনের কোণে ক্রমে অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইয়া অবশেষে প্রায় মুছিয়াই গিয়াছিল।

সেদিনটাও ছিল একটা ধারামুখর দ্বিপ্রহর! বাহিরের ঘরে চুপচাপ একটা আরাম কেদারায় হেলান দিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া মৃদু মৃদু টান দিতেছি। চারিদিক আঁধার করিয়া মুষলধারায় বৃষ্টি নামিয়াছে। রান্নাঘরের টালির চালে ছাতের পাইপ হইতে একটা

মোটা জলের ধারা অবিশ্রাম ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। মাঝে মাঝে জলকণাবাহী এক একটা হাওয়ার ঝাপটা হা হা শব্দে ছুটিয়া আসিয়া হাড় পর্যন্ত কাঁপাইয়া তোলে।

এই অবিশ্রাম বর্ষণমুখর প্রকৃতির দিকে তাকাইয়া কেন না-জানি মনটা অকারণেই উদাস ও ভারাক্রান্ত হইয়া ওঠে। গত জীবনের তুচ্ছাদপি তুচ্ছ ব্যথা ও বেদনাগুলি যেন মনের আনাচে কানাচে ব্যর্থতার একটা আলোড়ন জাগায়। জীবনের দীর্ঘযাত্রাপথে হাঁটিতে হাঁটিতে আজ কোথায়ই বা আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, আর কোথায়ই বা চলিয়াছি! আবোল তাবোল এলো মেলো কত কি ভাবিতে ভাবিতে কোথায় কত দূরে যে চলিয়া গিয়াছিলাম, সহসা কে যেন পশ্চাৎ হইতে ডাকিল—

ডাক্তারবাবু!

চম্‌কাইয়া মুখ ফিরাইলাম, কে!

নমস্কার! আমায় চিনতে পারছেন না?

চাহিয়া দেখি একটি ভদ্রলোক আমার আরাম-কেদারার একপাশে দাঁড়াইয়া। গায়ে একটা ভিজা বর্ষাতি! বর্ষাতির গা বাহিয়া জলের ধারা নামিয়াছে। মাথায় একরাশ বড় বড় চুল ভিজিয়া এলোমেলো ভাবে কপালের ও মুখের চারিপাশে নামিয়া আসিয়াছে। ...কুৎসিত হাড়-জাগানো রুক্ষ মুখখানির দিকে তাকাইয়া মনে হইল, কবে যেন এমনিই একখানি মুখ কোথায় দেখিয়াছি! ভদ্রলোকটি ততক্ষণে গায়ের ভিজা বর্ষাতিটা গা হইতে নামাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। বর্ষাতিটা গা হইতে খুলিয়া রেলিংয়ের উপর রাখিয়া তিনি আমার মুখের দিকে তাকাইলেন, চিনতে পারছেন না?

তাহার চোখের দিকে তাকাইয়া বিস্মিত হইলাম।

কি অতলস্পর্শী তীব্র চাউনি! ধারালো ছুরির ফলার আলো পড়িলে যেমন ঝক্ ঝক্ করে, তাহার চোখের তারা দুটিও তেমনি ঝক্ ঝক্ করিতেছে; যেন নিমেষে মনের সবখানিই পড়িয়া নিতে পারে। এ দৃষ্টি যেন মুহূর্তে অন্তরের অন্তস্তলে একেবারে দাগ কাটিয়া বসিয়া যায়। এই তীব্র চোখের দৃষ্টি যেন কোথায় দেখিয়াছি। ...কবে? কার!

সহসা বিদ্যুৎ চমকের মতই বহুদিন আগেকার একটি বর্ষণমুখর রাত্রের স্মৃতি আমার মানসপটে ভাসিয়া উঠিল!

আমি চমকিত হইয়া উঠিলাম, হাঁ! হাঁ! মনে পড়েছে বটে! বসুন! বসুন!

ভদ্রলোক একটুখানি মৃদু হাসিয়া আমার সম্মুখের একখানি চেয়ার অধিকার করিয়া বসিলেন। সম্মুখের টিপয় হইতে সিগারেট কেস্‌টা তুলিয়া তাহার দিকে আগাইয়া দিলাম, সিগারেট, ধন্যবাদ! ...ভদ্রলোক সিগারেট কেস্ হইতে একটা সিগারেট লইয়া অগ্নিসংযোগ করিয়া ধীরে ধীরে টানিতে লাগিলেন। মনে হইল তিনি যেন হঠাৎ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন।

'আপনার অসুখটা আজকাল কেমন?'

আমার ডাকে ভদ্রলোক চম্‌কাইয়া মুখ ফিরাইলেন—'য়্যাঁ, কি বললেন?'

আপনার অসুখ?

ভদ্রলোক অত্যন্ত বিমর্ষভাবে কহিলেন—কই আর! তেমনই আছে বরং আজকাল আরও একটা নূতন উপসর্গ জুটেছে। এই উপসর্গটা শেষ পর্যন্ত আমায় সত্যি সত্যিই বুঝি পাগল ক'রে তুলল।

আমি তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম।

ভদ্রলোক যেন এ কয় বৎসরে আরও শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন। মুখটা আগের চাইতে আরও বেশি কৃশ ও লম্বা হইয়া পড়িয়াছে। গায়ে একটা সিল্কের পাঞ্জাবি চাপান ছিল। সেই সিল্কের পাঞ্জাবির তল হইতে তাহার নিরতিশয় রুগ্ন অস্থিময় দেহাবয়ব বিশ্রীভাবে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিতেছিল।

সহসা একসময় ভদ্রলোক মুখের দিকে তাকাইয়া অল্প একটু হাসিয়া কহিলেন, আপনি বাইরে থেকে আমার এই শীর্ণ দেহটা দেখে ভাবছেন, আমার ভিতরটা বুঝি একেবারে সব নিঃশেষে শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু মোটেই তা নয়; এখনও আমি অনায়াসেই আমার সাড়ে তিন মণ বারবেলটা মাথার উপরে তুলতে পারি! কিন্তু শক্তির দিক দিয়ে ক্ষয় না হলেও আমি যে তিল তিল কবে একেবারে চির-নিঃশেষ হয়ে যেতে বসেছি, সে যে আমি কিছুতেই মন থেকে মুহূর্তের জন্যও মুছে ফেলতে পারছি না। আমি বুঝতে পারছি, প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু আমাকে গ্রাস করবার জন্যে অক্টোপাশের মতই অসংখ্য শুঁড় দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরাবার জন্যে ছুটে আসছে। সে মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবী গতি আমি কেমন করে আটকাব! বলিতে বলিতে ভদ্রলোক যেন হাঁপাইয়া উঠিলেন।

আর আমি শুধু নির্বাক বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলাম। লোকে বলে কিন্তু আমি নিজে আজিও বিশ্বাস কবে উঠতে পারিনি ও ভবিষ্যতে কোন দিন পারবও না! এই যে দেখছেন নীলার আংটি। ...বলিতে বলিতে ভদ্রলোক আংটি সমেত ডান হাতখানি আমার চোখের সম্মুখে টেবিলের উপর তুলিয়া ধরিলেন।

একটু আগে সুইচ টিপিয়া আলোটা জ্বালিয়া দিয়াছিলাম।

অত্যুজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় আংটির নীলাটা ঝক্ ঝক্ কবিয়া উঠিল।

সেদিন দেখি নাই, কিন্তু আজ ভাল করিয়া দেখিলাম। একটা সাপ আংটি। সাপটা দুই প্যাঁচ দিয়া আপনার শরীর আপনি জড়াইয়া ধরিয়াছে। সেই সাপেরই বিস্তৃত ফণার উপর নীলাটি বসান। আকারে নীলাটি অনেকটা একটা বাদামের মত। ভদ্রলোকের অতি শীর্ণ হাড়সর্বস্ব অঙ্গুলিটাকে যেন সাপটা একান্ত কুৎসিত ভাবে জড়াইয়া ধরিয়াছে। —এই আংটি একবার আমি বম্বের এক সেল থেকে কিনি। সে আজ দশ-বারো বছরের কথা হবে, আমার ব্যবসাসংক্রান্ত একটা কাজে হঠাৎ একবার আমায় বম্বে যেতে হয়েছিল। এই আংটিটা ছিল একটা ইহুদির। সেই ইহুদিও নাকি এক সেল থেকেই এই আংটিটা কেনে। ইহুদি ছিল প্রভূত অর্থের মালিক। এই আংটিটা কিনবাব পর থেকেই তার ঘরে অর্থ যেন হুহু করে চারিদিক থেকে বন্যাব জলের মতই আসতে লাগল। কিন্তু এই নীলার আংটিটা নাকি অভিশপ্ত! এই নীলার প্রভাবে প্রভূত অর্থ আসবে বটে, কিন্তু নিজে সে এক কপর্দকও ভোগ করতে পারবে না ; আর শুধু তাই নয়, ক্রমে তাবই জন্যে একে একে এ সংসারে তার সকল প্রিয়জন

হয় আত্মহত্যা বা অন্য কোনভাবে জীবন দেবে এবং সর্বশেষে সে নিজে হবে আত্মঘাতী! ইহুদির ব্যাপারেও হয়েছিল ঠিক তাই এবং তার আগে এর মালিক এক সাহেবেরও ঘটেছিল তাই। তার সংসারে একমাত্র স্ত্রী তারই দুর্ব্যবহারে গলায় ফাঁস দিয়ে প্রাণ দিল এবং শেষটায় সে নিজে নিজের প্রাণ নিল রিভলবারের গুলি চালিয়ে! ইহুদির বাড়ির যাবতীয় জিনিসপত্র বেচে যা টাকা হল এবং ব্যাঙ্কে নগদ যা ছিল তা তার আত্মীয়স্বজনেরা ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিল। কিন্তু আংটিটা কেউ নিতে চাইল না, সেই জন্যে এটা অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে সেলে উঠল। আমিও সেই সেলে উপস্থিত ছিলাম; পাঁচশ টাকায় আমি আংটিটা কিনে নিলাম!

আংটিটা কেনবার সময় আমায় অনেকেই এর অলৌকিক প্রভাব সম্বন্ধে সতর্ক করে এটা কিনতে বারণ করেছিল। ছেলে বেলা থেকেই কোন রকমের কুসংস্কারই আমি মানি না। আমি সকলের কথায় একবার মাত্র হেসে আংটিটা কিনে নিয়ে এলাম।

বাড়িতে এসে স্ত্রী সুজাতাকে যখন সেই আংটিটা দেখালাম, সে অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়ে আমার শুধাল—বাঃ! ভারি সুন্দর ত আংটিটা, কত দাম পড়ল?

আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে অল্প একটু হেসে বললাম, দাম যতই হোক না কেন? তোমার আংটিটা পছন্দ হয়েছে যখন, এস তোমার আঙ্গুলেই আংটিটা পরিয়ে দিই! বলতে বলতে সাদরে তার ডান হাতখানি তুলে ধরে তার ডান হাতের অনামিকায় আংটিটা পরিয়ে দিলাম।

সেদিন রাত্রে শুয়ে এই আংটির গল্পটা তাকে হাসতে হাসতে বললাম। সুজাতা শিক্ষিতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের দু-দুটো ডিগ্রি সে বিয়ের আগেই জুটিয়েছিল। আংটির গল্প শুনে সে ত আমার সঙ্গে হাসতে লাগল।

বললে, লেখাপড়া শিখে জ্ঞানের আলো পেয়েও মানুষ এমন 'সুপারস্টিসাস্' হয়! কিন্তু আশ্চর্য!

দিন কয়েক বাদে ব্যবসা-সংক্রান্ত কি একটা জরুরি কাজে বেরুব বলে কাপড়-জামা পরে প্রস্তুত হচ্ছি, সুজাতা ম্লান চিন্তিত মুখে আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

তার চিন্তাক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্নকণ্ঠে শুধালাম, কি খবর সু?

সে আমার মুখের দিকে চেয়ে ইতস্তত করতে লাগল। বেশ বুঝতে পারলাম, সে যেন আমার কাছে কি বলতে চায় অথচ কোন কারণে মুখ ফুটে সেটুকু বলতে পারছে না।

বিস্মিত হলাম। বললাম তুমি কি আমায় কিছু বলবে সু?

সে একটু আম্‌তা আম্‌তা করে বললে, হাঁ—না; আচ্ছা, তুমি ঘুরে এস। এমন বিশেষ কিছুই নয়।

সে যেন বেশ একটু চিন্তান্বিতভাবেই ঘর ছেড়ে চলে গেল।

আমিও সেদিকে আর বিশেষ মন না দিয়ে নিজের কাজে বেরিয়ে গেলাম।

আমি আর সুজাতা একই ঘরে দু'জনা শুলেও পাশাপাশি দুটো আলাদা খাটে শুতাম। সুজাতা খোকাকে নিয়ে শুত। খোকার অসুখের জন্যেই এ ব্যবস্থা হয়েছিল।

গভীর রাত্রে সেদিন হঠাৎ একটা দীর্ণ আকুল চিৎকারে সহসা আমার ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। আমি ধড়ফড় করে শয্যার উপর উঠে বসলাম। দেখি, ঘুমের মধ্যে সুজাতা অমন করে চেঁচাচ্ছে। ছুটে সুজাতার খাটের কাছে গেলাম। ধীর আবেগে তাকে ঠেলা দিয়ে চিৎকার করে ডাকলাম সুজাতা! সুজাতা!

সুজাতা তখনও চিৎকার করছিল, আমায় বাঁচাও! ওগো আমার বাঁচাও!

আমার ঠেলা ও ডাকাডাকিতে সুজাতার ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। সে চোখ মেলে ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে আমার মুখের দিকে তাকাতে লাগল। তার চোখ ও মুখের চেহারা দেখে মনে হল সে যেন ভীষণ ভয় পেয়েছে! ঘামে তখন তার সর্ব শরীর ভিজে জল হয়ে উঠেছে। সমগ্র দেহখানি তখনও থেকে থেকে কেঁপে উঠছে।

সহসা এক সময় সুজাতা দুই হাত দিয়ে আমার গলাটা আঁকড়ে ধরে আমার বুকে মুখ গুঁজে ডুকরে কেঁদে উঠল।

আমি সস্নেহে তার মাথায় পিঠে গায়ে হাত বুলাতে লাগলাম, কি হয়েছে সু? হঠাৎ এমন ভয় পেলে কেন? এই ত আমি! ছিঃ কাঁদে না! চুপ কর! একটু স্থির হও!

অনেকক্ষণ ধরে আমার বুকে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদবার পর যেন কতকটা সুস্থির হল।

পরের দিন সকালে আমি চায়ের টেবিলে চা খেতে খেতে সুজাতাকে শুধালাম, কাল 'রাত্রে হঠাৎ অমন করে চেঁচিয়ে উঠেছিলে কেন সু?

প্রথমে সে ত আমার কথার জবাবই দিতে চায় না, অবশেষে অনেক পীড়াপীড়ির পব বললে, আজ কয়দিন থেকেই রাত্রে ঘুমুলেই আমার মনে হয় যেন আংটির সাপটা আমার গলাটা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ধরছে। আর সেই প্যাঁচে প্যাঁচে আমার দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে! আমি দু'হাত দিয়ে প্রাণপণে যত গলা থেকে সেই সাপটাকে ছাড়াতে চেষ্টা করি, সাপটা যেন ততই জোরে ও কঠিনভাবে আমার গলায় চারপাশে পাকিয়ে যায়।

সুজাতার কথায় আমি হোঃ হোঃ করে হেসে উঠ্লাম।

শেষটায় তুমিও! যত উচ্চশিক্ষাই পাও, তুমি যে নারী ছাড়া আর কিছুই নও, শেষ পর্যন্ত এটাই কিন্তু তুমি একেবারে বিশদভাবেই প্রমাণ করলে। যা হোক, তোমার আর ও আংটি পরে কাজ নেই। দাও, আমিই আংটিটা পরি!

সুজাতা যেন একান্ত করুণভাবেই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললে, না থাক। সে আংটি পবতে হবে না! আমি সেটা বাক্সে তুলে রেখেছি।

উঃ, তুমি এত ভীতু! আংটি একেবারে বাক্সের মধ্যে পুরেছ! যাও! আংটিটা নিয়ে এসো! আংটির পূর্ব ইতিহাস শুনে আমার যত কৃতুহল না হোক, তোমার কথা শুনে সত্যি আমি আর ও আংটিটা আঙ্গুলে না পরে সোয়াস্তি পাচ্ছি না। যাও আংটিটা আমায় এনে দাও।

নাই না পরলে ও আংটি!

সুজাতার যে কোথায় গলদ তা আমার চোখে জলের মতই পরিষ্কার থাকলেও আমার যেন কেমন একরকম আংটিটার উপর জেদ বেড়ে গেল!

শেষ পর্যন্ত একান্ত বিমর্ষচিত্তেই অনিচ্ছাভরে সুজাতা বাক্স খুলে আংটিটা আমায় এনে দিল। আমি কতকটা হৃষ্টচিত্তে আংটিটা পরে কাজে বেরিয়ে গেলাম।

সেদিন কাজে বেরিয়েই একটা অভাবিত মোটা রকমের লাভের অর্ডার পেলাম। মনটা ভারি প্রফুল্ল হয়ে উঠল। আংটিটার দিকে তাকিয়ে খানিকটা বেশ আপন মনেই হেসে নিলাম।

পরের দিন গভীর রাত্রে একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। যেন অসংখ্য সাপে আমার সারাটা দেহ একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে চলছে। যে সাপটা আমার গলাটা পেঁচিয়ে ধরেছিল সেটার চোখের দিকে চাইতেই আমি চম্‌কে উঠ্‌লাম। তার চোখটা যেন অবিকল আমার আঙ্গুলের আংটির নীলাটার মত!

এর দিন দুই বাদে হঠাৎ এক দিন মাঝ রাত্রে আমার স্ত্রীর ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। চেয়ে দেখি আমার বুকের উপর একেবারে ঝুঁকে আমার স্ত্রী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে।

আমি চোখ চাইতেই সুজাতা আকুলস্বরে শুধাল—কি হয়েছে, অমন কোকাচ্ছিলে কেন?

আমি বিস্মিত হলাম, বললাম, কোকাচ্ছিলাম?

স্ত্রী চুপ করে গেল!

কিছু দিন থেকেই আমি বেশ টের পাচ্ছিলাম, আমার স্বভাবটা যেন কেমন একপ্রকার খিট্‌খিটে হয়ে পড়ছে। কারও সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগে না। হাসি গল্প গান এসব যেন আমার কাছে একেবারে অসহ্য হয়ে উঠ্‌তে লাগল।

একদিনের ঘটনা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে।

সেদিন কি একটা কারণে বেশ একটু সকাল সকালই আপিস থেকে ফিরেছি।

উপরে উঠতেই কানে এল, আমাব স্ত্রীর ঘরে গ্রামোফন রেকর্ড বাজছে।

ইদানিং আমার বাড়িতে রেকর্ড বাজান একপ্রকার বন্ধই ছিল। আর বিশেষ করে সে সময়টাও আমার ফিরবার সময় নয়।

গানশোনা মাত্রই কিন্তু আমার মনটা যেন হঠাৎ কেমন অকারণেই উত্ত্যক্ত হয়ে উঠল। আমি দ্রুত পদবিক্ষেপে দুম্ দুম্ করে জুতার আওয়াজ করতে করতে যে ঘরে গ্রামোফন বাজছিল, সেই ঘরে ঢুকে এক ধাক্কা দিয়ে সাউন্ডবক্সটা ঘূর্ণমান রেকর্ডের উপর থেকে সরিয়ে দিলাম।

একটা অতি বিশ্রী ক্যাঁচ্ শব্দ করে গানটা থেমে গেল।

পাশেই আমার চার বছরের ছেলে সুধাংশু একটা সোফায় বসেছিল, তাড়াতাড়ি ভয় পেয়ে দুই হাত দিয়ে তার মাকে গিয়ে জড়িয়ে ধরল।

সুজাতাও যেন কেমন একরকম বিব্রত হয়ে ত্রস্তভয়চকিত পদবিক্ষেপে ভয়ার্ত সন্তানকে বুকে চেপে নিঃশব্দে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

আমিও শ্রান্ত হয়ে সামনেই একটা সোফায় গা এলিয়ে দিলাম।

ক্রমে ক্রমে শেষটায় এমন হয়ে উঠ্‌ল যে, একটু জোরে কথাবার্তা পর্যন্ত আমার কানে অসহ্য ঠেকত।

আমি বাড়িসুদ্ধ সকলকে বকে বকে চিৎকার করে একেবারে তটস্থ করে তুলতাম। চাকরদাসী ত দূরের কথা, এমন কি আমার নিজের স্ত্রী-পুত্র পর্যন্তও আমার ছায়া দেখলে যেন সন্ত্রস্ত হয়ে পালাবার পথ খুঁজত।

গভীর রাত্রে একদিন আপিস্ থেকে বাড়ি ফিরে দেখি, আমার স্ত্রী একখানি কালীর পটের সুমুখে গলবস্ত্র হয়ে কি যেন আপনমনে প্রার্থনা করছে।

ভারি কৌতূহল হল। আড়ালে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতে লাগলাম। শুনলাম, আমার স্ত্রী বলছে, আমার স্বামীকে ভাল করে দাও মা! আমার দেবতার মত স্বামী! তাঁর দিকে যে আর চাওয়া যায় না...সহসা কেন জানি আমার দুই চোখের কোল জ্বালা করে উঠল। আমি সেখান থেকে চুপি চুপি নিজের শোয়ার ঘরে পালিয়ে এলাম।

ঘরে ঢুকে চেয়ারটায় বসতে যাব, সহসা উজ্জ্বল বৈদুতিক আলোয় আমার চোখের সামনে আংটির নীলাটা ঝলমল করে উঠল!

সত্যই কি তবে এই আংটিটাই একটা নিষ্ঠুর অভিশাপ! আমার এই পরিবর্তনের জন্যে শেষ পর্যন্ত কি-না সামান্য এই একটা পাথরই হল দায়ী! ...কিন্তু আমার আলোকপ্রাপ্ত শিক্ষিত মন যেন কিছুতেই একথা মানতে চাইল না!...না না, এ অসম্ভব! সামান্য একটা নীল পাথর!...আর সত্যিই যদি তার এতই ক্ষমতা হয়, তবে আমিও দেখতে চাই শেষ পর্যন্ত এ আমায় কত দূর টেনে নিয়ে যেতে পারে। শেষটায় যদি এতে আত্মঘাতীও হতে হয় তবু এ আংটি আমি আঙ্গুল থেকে কোন মতেই খুলব না।...মাথার মধ্যে তখন যেন আমার একটা খুন চেপে গেছে।

আমি পাগলের মতই সোফা ছেড়ে উঠে ঘরময় পায়চারি করে বেড়াতে লাগলাম। আমার শরীরের সমগ্র শিরা উপশিরা বেয়ে একটা দুর্দান্ত জিদের নেশা যেন আগুনের তরল স্রোতের মতই বয়ে বেড়াচ্ছে।

আমি বুঝতে পারছি সব, টের পাই তবু যে কেন এমনই করে নিজেকে একান্ত অসহায়ের মত নিজের খেয়ালে চলতে দিতে বাধ্য হই—তা আজও আমি বুঝতে পাবি না!

যতই দিন যেতে লাগল আমার বাড়িটা যেন ক্রমে ক্রমে একটা অস্বস্তির আগার হয়ে উঠতে লাগল। একটি মুহূর্তও বাড়ি যেন আর ভাল লাগে না। একদিকে পারিবারিক জীবনটা যেমন দিনের পর দিন অস্বস্তিতে ভরে উঠতে লাগল, ব্যাঙ্কের হিসাবটাও ঠিক সেই পরিমাণে ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল। টাকা যেন আজকাল আমার কাছে একটা নেশার মতই দাঁড়িয়ে গেছল।

সদাসর্বদাই মনের মাঝে ঘুরত, টাকা! টাকা আর টাকা!

টাকা আসাব সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে নূতন একটা উপসর্গ এসে জুটল। সন্দেহ বাতিক। বাড়ির প্রত্যেককেই আমি সন্দেহ করতে লাগলাম। মন হত, আমার চাকর-দাস-দাসী, মায় আমার নিজের স্ত্রী-পুত্র পর্যন্ত সকলেই যেন দিবা রাত্রি চব্বিশ ঘণ্টাই আমার চারিপাশে ওত পেতে আছে—কেমন করে আমার যথাসর্বস্ব চুরি করে আমায় পথে বসাবে।

কাউকে আমার বিশ্বাস হত না।

সব চোর! জুয়াচোর! সব ভণ্ড!

এ সংসারে স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-স্বজন কেউই আপনার নয়। সকলেই যে যার আড়ালে বসে ছুরি শানাচ্ছে, কেমন করে আমার বুকে ছুরি বসাবে!

এই সন্দেহ-বাতিকেই শেষটায় আমায় যেন একেবারে পাগল করে তুললে।

আমার সিন্দুকের চাবি দেওয়ালের আয়রনচেস্টে রেখে তার চাবি সদাসর্বদা নিজের কোমরে বেঁধে রাখতাম।

শেষে এমন দাঁড়াল যে, রাত্রে ঘুমুতে পর্যন্ত পারতাম না। খুট করে ঐ বুঝি কোথায় কিসের শব্দ হল!...কোথায় গাছ থেকে পাতা পড়ার শব্দ!...ঐ কার পায়ের শব্দ! সারাটি রাত আমার বিনিদ্রই কেটে যেত। দুই চোখ ফেটে ঘুম আসছে অথচ ঘুমুবার উপায় নেই!

রাতের পর রাত এমনই করে নিদ্রাহীন অবস্থায় কাটিয়ে কাটিয়ে ক্রমে শরীর হয়ে উঠ্‌তে লাগল শীর্ণ, কঙ্কালসার!...তার পর এক দিন—

সে দিন সবেমাত্র একটু চোখের পাতা দুটো বুজিয়েছি, হঠাৎ একটা মৃদু স্পর্শে আমার ঘুমটা গেল ভেঙ্গে! চেয়ে দেখি আমার দেহের উপর ঝুঁকে পড়ে সুজাতা যেন কি করছে!

মুহূর্তে আমার মনের মধ্যে একটা বিশ্রী সন্দেহ জেগে উঠল ; নিশ্চয়ই সুজাতা আমার কোমর থেকে চাবি চুরি করে আমার সিন্দুক থেকে টাকা চুরির মতলবে এখানে এসেছে! রাগে আমার সর্বশরীর রি রি করে জ্বলে উঠল। বিপুল এক ধাক্কা দিয়ে সুজাতাকে খাট থেকে নিচে ফেলে দিলাম। একটা অস্ফুট যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে সুজাতা অদূরে অবস্থিত লোহার সিন্দুকটার গায়ে গিয়ে ছিট্‌কে পড়ল। আমিও তাড়াতাড়ি খাট থেকে লাফিয়ে নেমে সুইচ টিপে আলোটা জ্বেলে দিলাম। কিন্তু আলো জ্বালতেই আমার কণ্ঠ চিরে একটা ভয়মিশ্রিত অস্ফুট চিৎকার বেরিয়ে এল। লাল তাজা রক্তে সমস্ত মেঝেটা একেবারে ভেসে গেছে। আর সেই রক্তস্রোতের উপর এলিয়ে পড়ে অভাগিনী সুজাতা! অত রক্ত দেখে সহসা আমার মাথার মধ্যে যেন কেমন করে উঠল।

আমি তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে জ্ঞানহীন সুজাতার লুণ্ঠিত মস্তকটি নিজের কোলে তুলে নিলাম! আমার চিৎকারে লোকজন সব ছুটে এল। সেই রাতেই ডাক্তার এল! কিন্তু সুজাতার জ্ঞান আর ফিরে এল না। ডাক্তার বললে, ব্রেনের একটা শিরা ছিঁড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে!

..শ্মশানে নিয়ে গিয়ে সুজাতাকে চিতায় তুলে দিতে যাচ্ছি সহসা আমার নজর আমার আঙুলের আংটিটার উপর গিয়ে পড়ল। দেখি খানিকটা রক্ত নীলাটার গায়ে কালো হয়ে তখনও চাপ বেঁধে আছে। হঠাৎ কেন যেন আমার মনে হল, তবে কি নীলাটা সত্যিই অভিশপ্ত! এমন সময় হঠাৎ ডান বুকে অসহ্য একটা বেদনা অনুভব করলাম। কি তীব্র সে বেদনা! দুই হাতে বুক চেপে সেইখানে চিতার পাশেই আমি মুহ্যমানের মত বসে পড়লাম।

তারপর আর আমার মনে নেই।

যখন জ্ঞান হল, চেয়ে দেখি, নিজের ঘরে খাটের উপর শুয়ে আছি।

পরে ভেবেছি, হয়ত আমার হাত থেকে নীলাব আংটি খুলবার জন্যই সুজাতা রাত্রে চুপি চুপি চোরের মত আমার ঘরে এসেছিল।

... ... ... ...

সুজাতার মৃত্যুতে আমার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড পরিবর্তন এল! আগেকার সেই খিট্‌খিটে ভাব ও সন্দেহ বাতিকটা যেন ক্রমে নিস্তেজ হয়ে আসতে লাগল।

কিন্তু বাড়ির কেউই যেন আমায় আর বিশ্বাস করে উঠতে পারত না! তাদের মনের মাঝে যেন একটা সন্দেহের বীজ সর্বদাই খচ খচ করত।

আগে যেমন মানুষের সঙ্গ তাদের কথাবার্তা আমার কাছে একেবারে বিষের মতই ঠেকত, এখন সুজাতার মৃত্যুর পর আমার মন যেন সর্বদাই মানুষের সঙ্গ-লিপ্সায় আকুলি বিকুলি করত।

মনে হত, এই এত বড় দুনিয়ায় আমি যেন একা—বড় একা, একেবারে নিঃস্ব! কেউ যেন আমার নেই! আমি যেন কারুরই নই!

ইচ্ছা হত, ছেলে সুধাংশুকে ডেকে কাছে বসিয়ে আদর করি, কোলে নিই।

কিন্তু সুধাংশু আমায় দেখতে পেলেই এমনভাবে চিৎকাব করে উঠত যে কার সাধ্য তার কাছে যায়। বুঝতাম, পূর্বের বিভীষিকা আজিও তার সমগ্র কচি মনটিকে একেবারে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

নীরব অশ্রুতে চোখের কোল দুটো আমার ভিজে উঠত।

এমনি করেই দিন যাচ্ছিল। সহসা এমন সময় এক দিন বিকালের দিকে কি মনে করে ছাতে গেছি—গিয়ে দেখি একটা ফুটবল নিয়ে সুধাংশু আপন মনে একা একা সেখানে খেলা করছে। আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছেলের খেলা দেখতে লাগলাম। হঠাৎ এক সময় খেলতে খেলতে আমার প্রতি খোকার নজর পড়তেই সে ভীষণভাবে ভয় পেয়ে একটা চিৎকার করে উঠল এবং পরক্ষণেই আমার সকল নিষেধ ও বাধা উপেক্ষা করে সিঁড়ির দিকে ছুটল! তাড়াতাড়ি ছুটে যেতে গিয়ে আচমকা পায়ে পা বেধে ছিট্‌কে দশ-বারটা সিঁড়ি টপকে নিচে গিয়ে পড়ল। আমি তাড়াতাড়ি ছুটে নিচে গেলাম!

সেই রাত্রেই সুধাংশুর জ্বর এল।

এবং পাঁচ দিন অজ্ঞান অবস্থায় থেকে মাঝে মাঝে ভুল বকতে বকতে সেও আমার কাছ থেকে চির-বিদায় নিয়ে চলে গেল।

সেদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ আবার সেই বুকের বেদনাটা দেখা দিল এবং এর পর থেকে প্রায়ই সেই বেদনাটা দু-চার সপ্তাহ বাদ দেখা দিতে লাগল। উঃ! কি অসহ্য সে যাতনা!

... ... ... ...

তারপর সেই বেদনাটা আরও ঘন ঘন দেখা দিতে লাগল। কত চিকিৎসা কত ঔষধ কত অর্থ ব্যয়—কিছুই হল না। একটা মূর্তিমান বিভীষিকাব মতই এই তীব্র বেদনা আমায় তাড়া করে ফিরতে লাগল।

উঃ! এ যেন একটা দুঃস্বপ্ন!..

...  ...  ...  ...

কিন্তু এই মাসখানেক থেকে আর একটা নূতন উপসর্গ এর সঙ্গে এসে জুটেছে। নিজেকে খুন করবার একটা তীব্র বাসনা যেন অহোরাত্র আমায় ভূতের মতই পিছু পিছু তাড়া করে নিয়ে ফিরছে।

উঃ কি সে দুর্জয় ইচ্ছাশক্তি!

আমার সমস্ত সংযম সমস্ত মনোবল যেন নিমেষে সে ইচ্ছাশক্তির কাছে বন্যার মুখে কুটোর মতই ভেসে যায়।

আমি জানি, আমি বুঝতে পারছি, আত্মঘাতী আমায় হতেই হবে। আর কোন উপায়ই নেই। পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে গেলেও আমার রক্ষা নেই। আমার নিজের হাতেই আমার প্রাণ নিতে হবে। এই আমার জীবনের নির্মম বিধিলিপি! কঠিন অনুশাসন এই নীলার। কেউ এর থেকে নিস্তার পায়নি। প্রথমে সেই সাহেব, তারপর সেই হতভাগ্য ইহুদি। এবং এবারে আমার পালা। এ যেখানে যাবে ঠিক এমনি করেই নির্মম অভিশাপের আগুন জ্বালিয়ে সব পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়ে যাবে। কিন্তু তবু, তবু এ আংটি আমি কোন মতেই আঙুল থেকে খুলতে পরিচি না ডাক্তার।

গভীর উত্তেজনায় তাহার গলায় স্বর কাঁপিতে কাঁপিতে ভাঙিয়া পড়িল।

প্রতিমুহূর্তে কি যে দুর্জয় ইচ্ছা জাগে, মনে হয় রিভলবারের গুলি চালিয়ে, নয় গলায় ফাঁস দিয়ে, নয় ত নিজের হাতেই নিজের গলা টিপে ধরে এ অভিশপ্ত প্রাণটা শেষ করে দিই ; কিন্তু পারি না। শেষ পর্যন্ত কি-না একটা তুচ্ছ পাথরই হবে মানুষের উপর জয়ী।

তারপর যেন কতকটা আত্মগতভাবেই বলিতে লাগিলেন, তবু আমায় মরতেই হবে! এমনি করে প্রতি মুহূর্তে মরণের সাথে যুদ্ধ করে বাঁচা চলবে না। মরতে আমায় হবেই।

বলিতে বলিতে সহসা ভদ্রলোক চেয়ার হইতে উঠিয়া একপ্রকার ঝড়ের মতই যেন ছুটিয়া বাহিরে আঁধাব প্রকৃতিতে মিলাইয়া গেলেন।

আমি মুহ্যমানের মত চেয়ারটায় একাকী বসিয়া রহিলাম।

বাহিরে তখন আবাব মুষল ধারায় বৃষ্টি নামিয়াছে।

*ভাদ্র, ১৩৪৫*

# অহিংসা এণ্ড কম্প্যানি

## মানিক ভট্টাচার্য

গজানন আগে মাংস বড়ই ভালবাসিত। দুই বেলায় অন্তত নাকি একসের মাংস নহিলে তাহার কোন দিনই চলিত না। মাংস হইলেই যথেষ্ট—কিসের মাংস সে সম্বন্ধে গজানন কোন দিন মাথা ঘামাইত না। লোকে তাহার মাংসলোলুপতার দোষ দিলে সে মোটেই দমিত না; উপরন্তু জোর গলায় বলিত যে মাংসবর্জ্জনের ফলেই এ দেশ স্বাধীনতা হারাইয়াছে ও ক্রমশ নির্জীব হইয়া পড়িতেছে। গজানন ক্রমশ বিখ্যাত বক্তা ও দেশপ্রেমিক হইয়া উঠিল এবং উচ্চকণ্ঠে সর্বত্র প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল যে, মাংসই ভারতবাসীর একমাত্র কাম্য ও ভোজ্য হওয়া চাই। এই এক মাংসভক্ষণ হইতেই তাহাদের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সবগুলাই একসঙ্গে মিলিবে। যে দিন হইতে ভারতবাসীর মাংস খাওয়ার অভ্যাস শিথিল হইয়াছে, সেই দিন হইতে তাহারা অধীনতার শৃঙ্খল পরিতে শুরু করিয়াছে। বৈষ্ণবধর্মের উপর সে জাতক্রোধ। তাহার মতে বৈষ্ণবদের কাটিয়া ফেলিলেও দোষ নাই; তাহাতে আর কিছু না হউক মাংসভোজনের পথের কণ্টক দূর হইবে। তাহাব দৃঢ় বিশ্বাস বৈষ্ণবধর্মের অভ্যুত্থান না হইলে ইংবেজ ভারতবর্ষ জয় করিতে পারিত না এবং মুসলমানেরাও বেশি দিন ভারতবাসীদের দাবাইয়া রাখিতে পারিত না।

এ হেন গজাননের হঠাৎ ব্লাড প্রেসার বাড়িয়া গেল এবং হু হু করিয়া ক্রমাগত বাড়িতেই লাগিল। গজানন তখন রীতিমত দেশপ্রেমিক। বিনা ফিয়ে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ডাক্তারেবা আসিয়া গজাননকে পরীক্ষা করিতে লাগিল এবং প্রতিদিন নিয়মিতভাবে তাহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বুলেটিন বাহির হইতে লাগিল। অবশেষে ডাক্তাররা একমত হইয়া ব্যবস্থা দিলেন যে, গজাননকে মাংস-মৎস্য এবং এমন কি নিরীহ ডিম্ব পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হইবে।

মৎস্যকে জলবাস পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিলে তাহাব যে দুঃখ বা অসুবিধা হয় গজাননেব দুঃখ বা অসুবিধা তাহার চেয়ে কোন অংশ কম হয় নাই। গজানন—যে গজানন মাংসগতপ্রাণ—মাংস-সর্বস্ব, এক খণ্ড মাংস কম হইলে যে ক্রোধে দিশাহারা হইত, দৈবাৎ একদিন আহারের সময় মাংস না পাইলে যে দুটি চক্ষে অন্ধকার দেখিত, সেই গজানন আর মাংস খাইতে পাইবে না! কিন্তু গজানন দেশপ্রেমিক। দেশের জন্য তাহাকে বাঁচিতেই হইবে। কাজেই গজাননকে মাংস ছাড়িতে হইল।

ক্রমে গজানন দেখিল, স্বদেশী করিয়া আর কোন লাভ নাই। শুধু লাভ নাই নহে, অলাভ যথেষ্ট। সুতরাং স্বদেশী করা অসহ্য। কারণ, সে মাংস খাইবে না, কিন্তু তাহার সহকর্মীরা দিনরাত্রি মাংসের শ্রাদ্ধ করিবে। রুধিরলিপ্ত জবাকুসুমসংকাশ বলদৃপ্ত মাংসের দেহ মনোহর মূর্তি সে নিত্য দেখিবে। রাঁধা মাংসেব মুনিমনলোভা গন্ধ তাহাব ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের

মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া তাহার উপবাসী চিত্তকে নিত্য পাগল করিবে—আর সে গরু ও ছাগলের খাদ্য চিবাইয়া ও গিলিয়া বাঁচিয়া থাকিবে! ধিক তাহার জীবনে এবং ততোধিক ধিক তাহার দেশসেবায়!

জীবন—বিশেষত দেশসেবকের জীবন—তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল। সে যাহা আদৌ খাইবে না, অপবে তাহা চর্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয় করিয়া খাইবে! অতএব গজানন দেশসেবা ছাড়িয়া দিল এবং ধর্ম ও সমাজ লইয়া পড়িল। অচিরে সে একজন বিখ্যাত সমাজসংস্কারক হইয়া পড়িল।

(২)

মহাবীর দগ্ধমুখ হইলে সান্ত্বনার জন্য সীতা দেবী তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে মহাবীর প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে তাঁহার স্বজাতির সকলেই যেন দগ্ধমুখ হন—যাহাতে কেহই তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে না পারে। মাংসবর্জনে বাধ্য হইয়া গজাননের প্রাণান্ত চেষ্টা হইল যাহাতে ভারত হইতে—অন্তত বাংলাদেশ হইতে মাংসভোজন উঠিয়া যায়। যে মধুর খাদ্য হইতে সে বঞ্চিত হইয়াছে, আর কেহ যেন সে খাদ্য খাইতে না পায়। জগাই-মাধাই রাতারাতি পরম বৈঞ্চব হইয়া উঠিল।

গজানন কলিকাতা হইতে সামান্য দূরে ঢাকুরিয়ায় এক আশ্রম স্থাপিত করিল। শিষ্য এবং শিষ্যা জুটিতে বিলম্ব হইল না। একটু সুবিধা করিয়া লইয়াই গজানন আগাইয়া আসিয়া 'রক্ষাকালীস্থানে' একটি শাখা আশ্রম খুলিয়া দিল। আশ্রমের প্রতিষ্ঠা ইহাতে আরও বাড়িয়া গেল। চারিদিক হইতে শিষ্য ও শিষ্যার দল ক্রমশ ভিড় করিয়া দাঁড়াইল।

নূতন কোন সত্য বা তথ্যের সন্ধান পাইবাব পূর্বে গজানন খুব বেশি ঘুমাইত। শয়নগৃহ তো দূরের কথা, শয্যা পর্যন্ত সে ত্যাগ করিত না। যে যৎসামান্য আহারের প্রয়োজন তাহা শিষ্যদের নির্বন্ধাতিশয্যে শয্যার উপরেই সম্পন্ন করিতে হইত। বাথরুম ঠিক শয়ন কক্ষের সহিত সংলগ্ন ছিল; কিন্তু সেখানে তাহাকে কেহ যাইতে দেখে নাই। সুতরাং আমরা ঠিক বলিতে পারিব না, সেই অবশ্যপ্রয়োজনীয় স্থানে যাইবার তাহার কোন প্রয়োজন হইত কি-না। রক্ষাকালীস্থানে আসিবার পর হইতেই গজাননের নিদ্রালুতা ভয়ঙ্করভাবে বাড়িয়া গেল। শিষ্যগণ তৎক্ষণাৎ বুঝিয়া লইল, বেদাদির মত নূতন একটা কিছু গুরুদেবের মনোমাঝে উঁকি মারিতেছে। এসবের পূর্বে যেমন বেদনা, অপূর্ব জ্ঞানোন্মেষের পূর্বে তেমনি গুরুদেবের নিদ্রা। তাহারা হর্ষ, বিষাদ ও উদ্বেগে দিন কাটাইতে লাগিল।

চতুর্থ দিনে গজাননের ঘুমঘোর কাটিল। প্রেমানন্দ ও বৃন্দার তৎক্ষণাৎ ডাক পড়িল। দুজনে স্বামী-স্ত্রী—গুরুগতপ্রাণ। প্রেমানন্দ সকলই গুরুপদে সমর্পণ করিয়াছে, কেবল দেহটা—তাও কালো এবং রুক্ষ বলিয়া নিজের জন্য পৃথক রাখিয়াছে।

কক্ষে উভয়ে প্রবেশ করিয়া দেখিল গুরুদেবের চক্ষু ঈষৎ রক্তবর্ণ, মুখে ভ্রূকুটি। প্রণাম করিয়া দুজনে করযোড়ে বসিতে গজানন কহিল, বৃন্দা, পারবে?

প্রেমানন্দ আগেই কহিল, নিশ্চয়ই পারব গুরুদেব। কি আদেশ করুন।

বৃন্দাও ঐ কথা কহিল, কিন্তু চোখে। বৃন্দা মুখের চেয়ে চোখেই বেশি কথা কহিয়া থাকে।

গজানন বলিল, রক্তস্রোত দেখেছ বৃন্দা? কাতরদৃষ্টি লক্ষ্য করেছ প্রেম?

প্রেমকে আহ্বান করিতে সে প্রায় গলিয়া গেল। পুরাপুরি না বুঝিলেও কাল বিলম্ব না করিয়া উত্তর দিল, খুব লক্ষ্য করেছি, প্রভু। কি বল বৃন্দা?

বৃন্দা মুখে কিছু বলিল না। শুধু ক্ষণেকের জন্য শিহরিয়া উঠিয়া দুই হাতে দুটি চক্ষু ঢাকিল এবং হস্ত প্রসারিত করিয়া গুরুদেবের পাদপদ্ম স্পর্শ করিল। ভাবটা—আমার দেখাশোনা সব তোমারই চরণে দিয়াছি।

ব্যাপারটা আর একটু স্থূলভাবে বলা প্রয়োজন ভাবিয়া গজানন বলিল, মায়ের মন্দির ঐ রক্তস্রোতে কলুষিত। ঐ রক্ত বন্ধ করা চাই। পারবে? 'না' বল্‌লে চল্‌বে না। পারতে হবেই। দুজনে যাও, সবাইকে আমার বাণী বল। কাল থেকে কাজ আরম্ভ করা চাই। প্রেম, তুমি আগে যাও। আশ্রমের সকলকে এই কথা বলগে।

প্রেম উঠিয়া গেল।

বৃন্দা বসিয়া রহিল। গুরু তাহাকে আরও গুহ্য কথা বুঝাইয়া দিল।

বৃন্দা চতুরা। চট করিয়া সব কথা বুঝিয়া ফেলিল।

এক সম্প্রদায় লোক আছে যাহাদের বিশ্বাস যে নারীর বুদ্ধি যখন তীক্ষ্ণ হইয়া ওঠে তখন সেই বুদ্ধি পুরুষের ক্ষুরধার বুদ্ধিকেও ম্লান করিয়া দেয়। কেহ কেহ এমন সন্দেহও করিয়া থাকে যে, যেহেতু ভগবান নারীকে অবলা করিয়াছেন সেই হেতু তিনি হয়ত ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ তাহাদের মগজে একটু বেশি বুদ্ধি দিয়া ফেলিয়া থাকিবেন। গজানন্দের অভিজ্ঞতা হইয়াছিল প্রচুর। বোধ করি সেই জন্যই তাহার বৃন্দার বুদ্ধির উপর অধিকতর আস্থা ছিল।

বৃন্দা তাহার কার্য সাফল্যের দ্বারা সহজেই প্রমাণ করিয়াছিল যে এই আস্থা বা শ্রদ্ধা অপাত্রে অর্পিত হয় নাই।

(৩)

পরদিন সারা কলিকাতা শহরে ও পার্শ্ববর্তী শহরতলিতে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। তাহার চেয়েও বেশি আন্দোলন পড়িয়া গেল সংবাদপত্রের কল্যাণে—দূর দূরান্তরে। সকলেই জানিল, স্বামী গজানন্দ ছাগকুলের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। মন্দিরের পুজারীরা কাতর হইয়া উঠিল; অধিকারীরা সন্ত্রস্ত হইল। গজানন্দের শিষ্যসম্প্রদায় ভীষণ চিন্তায় পড়িল, কি করিয়া এই রক্তস্রোত বন্ধ করা যাইবে। অপর পক্ষ ব্যাকুল হইল—এ রক্তস্রোত বন্ধ হইলে তাহাদের উপায় কি হইবে এই ভাবিয়া।

কাগজে কাগজে স্বামীজির ছবি বাহির হইল। তাঁহার নিদারুণ স্বার্থত্যাগ লইয়া কবিতা প্রকাশিত হইল। ভক্তগণ ভক্তবৎসলের জীবনহানির আশঙ্কায় কাতর হইল; কসাই সম্প্রদায় চঞ্চল হইয়া পড়িল—কি জানি যদি হিন্দুরা সবাই একযোগে মাংসই ছাড়িয়া

দেয়। মাংসাহারীগণ মনে মনে খুশি হইল, ক্রেতার সংখ্যা কমিয়া গেলে মূল্য নিশ্চয়ই কমিবে। যাহারা নিরামিষ মাংসাশী অর্থাৎ—অনাগত শাবক ডিম্ব ভক্ষণ করিয়া থাকে তাহারা পর্যন্ত মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিল, পাছে গজানন্দজি আর এক পা আগাইয়া গিয়া বলিয়া বসেন ডিম্বের ভিতরেও প্রাণ থাকে; অতএব ডিম্বভক্ষণে ভ্রূণহত্যার পাপ আসিতে পারে।

এইরূপ সারা শহরটায় একটা দারুণ আশঙ্কার ছায়া ঘনাইয়া আসিল। খাইয়া কাহারও সোয়াস্তি নাই—যেন কখন কি অঘটন ঘটিয়া বসে। যেখানে দুইজন একত্র হইয়াছে সেখানেই ঐ এক কথা—কি হইবে?

আজকাল জনমতের যুগ। কাজেই জনমতটা আগে জানিয়া রাখা প্রয়োজন। মধ্যবিত্ত ও স্বল্পবিত্ত লোকেরাই তো জনমত গঠিত করে এবং তাহাদের সবাইকেই প্রায় পাওয়া যায় মাছ-তরকারির বাজারে। এক ক্রেতা দুই পয়সার অতি ক্ষুদ্র চিংড়ি মাছ কিনিয়া এবং তাহার উপর অনেক অনুরোধে মৎস বিক্রেত্রীর নিগ্রহ সহ্য করিয়া মাত্র চারিটি ফাউ সংগ্রহান্তে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আর মশাই, কাল হয়ত শুন্‌ব গজাননজি বলেছেন, ঘুসো চিংড়ি খেলে শিশুহত্যার পাপ হবে এবং পুঁই সহযোগে চিংড়ি খেলে তিনি অনশন ব্রত গ্রহণ করে সৃষ্টি ধ্বংস করবেন।

অপর একজন ছোট চিংড়িও সংগ্রহ করিতে না পারিয়া বলিল, বলেন কেন মশাই, পরশু হয়ত শুনবেন আইন-সভায় মৎস্যমাংসরক্ষণ বিল পাশ হয়ে গেছে এবং মৎস্য ও পশুহত্যা নবহত্যার মতই হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের ভবিষ্যতের অবশ্য ভরসা ছাত্রসম্প্রদায়ের মত জানিবার জন্য কলেজ স্ট্রিটের বা তাহার কাছাকাছি যে কোন রেস্তরাঁয় সন্ধ্যাকালে গিয়া বসিলে শুনিবেন মাংসের চপে এক কামড় দিয়া একটি ছাত্র বলিতেছে—চপ নইলে জীবন বৃথা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার প্রবন্ধ ছুঁড়ে মারলেও 'পাদমেকং ন গচ্ছামি।'

অপর একটি ছাত্রটি চপ সমাপ্ত করিয়া চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়া বলিল, কিন্তু এখন কি করবে? গজানন্দ যে এবার ধ্যানে বসেছেন। মন্দির ছেড়ে তিনি যখন কসাইখানার দিকে এগুবেন কি হবে? মাংসের চপ ছাড়া মাংসের মুড়ি (মাথা নহে) পর্যন্ত যে ক্রমশ অমিল হয়ে উঠবে।

পূর্বোক্ত চপরত ছাত্রটি প্রথমধৃত চপটি ব্যবধানে শেষ করিল ও অপরটি হস্তে ধারণ করিয়া কহিল, আরে রেখে দাও তোমার গজানন্দ। বুদ্ধদেব অত বড় রাজার ছেলে—রাজ্য স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করে চপের বিরুদ্ধে লাগ্‌লেন, পারলেন কি? "চপং জীবনো মরণঃ।"

পিছন হইতে একজন মৃদুস্বরে বলিল, ইতি মনু স্মৃতিঃ। বি এ-তে সংস্কৃতে অনার্স ছিল নাকি বন্ধু?

চায়ের পেয়ালায় আর একবার চুমুক দিয়া প্রথম যুবক ছাত্রটি কহিল, দেখ না ভাই, পৃথিবীতে দুর্নীতির অন্ত নাই। আর কোনটাই গজানন্দের নজরে পড়ল না—পড়ল কেবল এই ছাগ হত্যার উপর। আরে, মানুষ যে মানুষের টুঁটি ধরে কামড়াচ্ছে—তার বেলায় কি কচ্ছেন?

এবার গজানন্দের আশ্রম বা অহিংসা এণ্ড কম্প্যানির আফিসের সন্ধান লওয়া যাউক্। একটি পুরাতন কিন্তু বড়ো ত্রিতল বাড়িতে গজানন্দের আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। দিবারাত্রি লোকের অন্ত নাই। দ্বিতলের একটি কক্ষে তিনি অনশনে বসিয়াছেন। দুই-তিনটি কক্ষ পার হইয়া এক কক্ষে পৌঁছিতে হয়। নিচে উপরে রীতিমত সত্যাগ্রহের আফিস বসিয়াছে। নিচের তলে দুইজন স্বেচ্ছাসেবক দুয়ারের দুই পাশে দুর্গাপুরের মোড়া পাতিয়া বসিয়া আছে। কেহ সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তাহার নাম, ধাম ও উদ্দেশ্য লিখিয়া লইয়া একজন স্বেচ্ছাসেবক চট্ করিয়া উপরে চলিয়া যায়। দ্বিতলে উঠিতেই প্রথম কক্ষে উপবিষ্ট প্রেমানন্দকে সেই কাগজ দিতে হয়। প্রেমানন্দ উঠিয়া দ্বিতীয় কক্ষে উপবিষ্টা বৃন্দাকে তাহা দিবে। বৃন্দা অবস্থা বুঝিয়া হয় নিজে হইতে আদেশ দিবে, না হয় তাহার কক্ষে যেখানে গজানন্দ শয্যাপরে শয়ান সেখানে গিয়া আদেশ লইয়া আসিবে।

এই অপরূপ সত্যাগ্রহের প্রথম দিনে ব্যাপারটা সবাই পুরাপুরি চট্ করিয়া বুঝিতে পারে নাই। ছাগ বলিদান দেওয়াইতে আমি, খাঁড়া সজোরে নামাইতেছে কামার, কাটিতেছে ধারাল ইস্পাতের খাঁড়া (ভোঁতা নহে যে ছাগ শিশুর কষ্ট হইবে) ইহাতে কাহারও চট্ করিয়া মাথা ব্যথা হইবার কারণ ঘটে নাই। তাহার উপর মাংস খাইতে খাইতে জিভ ও দাঁত যেমন অভ্যস্ত হইয়া যায়, ছাগমাংস দেখিতে দেখিতে চক্ষুও তেমনি অভ্যাস করিয়া বসে। তদুপরি মাংস খাইয়া খাইয়া মাংসাশীদেব কাছে ছাগ মেষ ইত্যাদি ক্রমশ লাউ-কুমড়ার মতই সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এই লঘু ব্যাপারটাকে ঘনাইযা এবং পাকাইয়া তুলিল লেখকেরা ও কাগজওয়ালারা। তৃতীয় দিন হইতেই তাই অহিংসা এণ্ড কম্প্যানির আফিসে এতখানি ভিড় কমিয়া গেল। ছাগলের জন্য যাহাদিগকে পয়সা থাকিলে আমবা নিত্য না হউক্, মাসে অন্তত এক-আধবার কিনিয়া হউক্ বধ করিয়া হউক্ খাইয়া থাকি—যে মহাপুরুষ আপনার 'জীবন্ত' প্রাণ দিতে উদ্যত তিনি দেখিবার বস্তু সন্দেহ নাই। সিদ্ধার্থ যে বংশ উজ্জ্বল করিয়া জন্মিয়াছিলেন সে বংশ এখনও বর্তমান কি-না সন্দেহ; মহাপ্রভুর সত্যকার বংশ না থাকাই সম্ভব; কারণ তিনি বংশরক্ষার পূর্বেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর কলিযুগেব এই প্রায় অন্তিম অবস্থায যে মহাপুরুষ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন তিনি এখন স্বয়ং সশরীরে বর্তমান। এ মহাত্মা দর্শনেব প্রলোভন প্রায় মাংসাহাবের প্রলোভনের সঙ্গে সমান। এই জন্যই অহিংসা অফিসের বাহিবে ভিতরে এই অপূর্ব জনতা।

চতুর্থ দিনেব প্রভাত। শীতকাল; তাই ছয়টা বাজিলেও পথে লোক চলাচল বেশী হয় নাই। তথাপি অত ভোরে জনার্দন অধিকারী স্বয়ং অহিংসা আফিসে আসিয়া উপস্থিত। তিনি মন্দিরের লভ্যাংশের বাহান্ন ভাগের এক ভাগের অধিকারী, প্রকৃত অধিকারীদের ভাগিনেয়। মাতুলবংশ নিঃসন্তান অবস্থায় স্বর্গে যাওয়ায় এই অংশটুকু তিনি উত্তরাধিকাবী সূত্রে পাইয়াছেন।

অধিকারী মহাশয় 'ঠাকুর' দর্শনের অভিলাষ করিলে স্বেচ্ছাসেবক কাগজ ও পেনসিল আগাইয়া দিল। অধিকারী লিখিলেন—জনার্দন অধিকারী, মায়ের অন্যতম সেবাইত। দর্শনের উদ্দেশ্য—প্রভুর অমূল্য জীবনরক্ষাব চেষ্টা।



53098
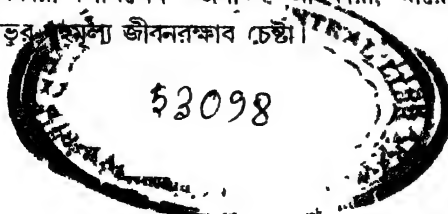
একজন স্বেচ্ছাসেবক দুয়ার আগুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অপরে কাগজের টুকরা লইয়া দ্বিতলে গিয়া প্রেমানন্দের হাতে দিল। প্রেমানন্দ নাম দেখিয়াই চটিয়া গেল। তাহার মাথায় তখনই প্রবেশ করিল, এ শত্রুপক্ষের লোক; ছলে বলে আন্দোলন বন্ধ করাই ইহার উদ্দেশ্য। গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া প্রেমানন্দ বলিল—বল, দেখা হবে না।

স্বেচ্ছাসেবক বলিল, আপনি তবু একবার অন্তত দিদিকে দেখিয়ে আনুন তো!

বৃন্দা শিষ্যবর্গের দিদি—অবশ্য প্রেমানন্দ ছাড়া।

কাজেই 'দিদি'কে দেখাইবার জন্য তাহাকে উঠিতে হইল। দ্বিতীয় ঘরে তখন কেহ ছিল না। প্রেমানন্দ বুঝিল, বৃন্দা তৃতীয় কক্ষে—গুরু-সকাশে। দুয়ার ভিতর হইতে ভেজানো। প্রেমানন্দ অতি ধীরে দুয়ারের উপর দুইবার মধ্যমা অঙ্গুলির আঘাত করিল। উত্তর আসিল—দাঁড়াও—দুই মিনিট।

প্রেমানন্দ তৎক্ষণাৎ দুই হাত সরিয়া আসিয়া স্থাণুর মত দণ্ডায়মান রহিল।

দুই মিনিটের স্থলে প্রায় পাঁচ মিনিট হইল। বৃন্দা দুয়ার খুলিয়া ফিরিল। আসিয়াই স্বামীকে দেখিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, কি খবর?

প্রেমানন্দ বৃন্দাব হাতে কাগজখানি দিল। পড়িয়া বলিল, নিয়ে এস। প্রেম বলিল, লোকটা কিন্তু মন্দিরের সেবাইৎ। দেখা করলেই গোলমাল বাধাবে।

বৃন্দা তাচ্ছিল্যভরে বলিল, তোমার যেমন বুদ্ধি। যাও, নিয়ে এস। সঙ্গে করে আন্‌বে। আর কারও সঙ্গে কথা কইতে দেবে না।

বুদ্ধির ভুলটা কোথায় তাহা ভাবিতে ভাবিতে প্রেমানন্দ নামিয়া গেল ও কিছুক্ষণ পরে লোকটিকে সঙ্গে আনিয়া বৃন্দার জিম্মা করিয়া দিল।

বৃন্দা ততক্ষণে মুখমণ্ডলে এমন করুণ ভাব আনিয়া ফেলিয়াছিল যাহা দেখিয়া অধিকারী ভাবিল, হয়ত বা অনশনে এতক্ষণ স্বামীজির নাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে। ভয়ে ভয়ে সে জিজ্ঞাসা করিল, প্রভুর অবস্থা কি খুবই—'খারাপ' একথাটা আর অধিকারী মুখে আনিতে পারিল না।

বৃন্দা মুখ ফিরাইয় একবার অতি সংক্ষেপে ফিক করিয়া হ'সিয়া ফেলিল—যাহার আভাসও অধিকারী জানিল না। পরে মুখখানা ম্লানতর করিযা বলিল, এর জন্য আপনারাই তো দায়ী।

অধিকারী প্রায গলিযা গিয়া কহিল, কিন্তু আমাদের কি অপরাধ বলুন। মায়ের সেবাইৎ আমরা। মায়ের সেবা তো আমাদের অবশ্য কর্তব্য। বলিদান শাস্ত্রের বিধান। শাস্ত্রবাক্য—এতকালকার বিধি—আমরা কি করে লঙ্ঘন করি?

এক মহাত্মাব অমূল্য প্রাণ আপনারা নষ্ট করতে বসেছেন—এই তো আপনাদের শাস্ত্রবাক্যপালন। একজন মহাত্মার প্রাণ নষ্ট করা মানে—একশ নারী হত্যা করা, তা জানেন?

অধিকারী অতি মাত্রায় সংকুচিত হইয়া বলেন, তা হ'লে প্রভুর বাঁচবাব কি আর কোন উপায নেই?

বৃন্দা হতাশার সুরে বলিল, আর কি আছে বলুন! আপনারা যদি বলেন এবং লিখে দেন যে আজ থেকে মন্দিরে ছাগবলি বাদ, তবেই উনি অনশন ভঙ্গ করবেন; নইলে উনি প্রাণত্যাগ করতে কৃতসংকল্প।

অধিকারী একটু ঢোক গিলিয়া বলিল, অন্য কোন উপায়ে কি ওঁকে অনশন ব্রত ত্যাগ করানো যায় না?

বৃন্দা একটু ভাবিবার ভান করিয়া বলিল, আর কি উপায় হতে পারে তা-তো জানি না।

অধিকারী একবার একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, বলিদান পাপ—এই ভেবেই না উনি এ কাজ করতে বসেছেন? পাপ নিবারণ এক হিসেবে পুণ্য উপার্জন। ধরুন, উনি যদি টাকা দিয়ে একটা কোন বড় রকমের পুণ্য কর্ম ক'রে ফেলেন—পুণ্য কর্ম তো কতই আছে—তা হলে কি চলে না?

বৃন্দা একটু ভাবিয়া বলিল, সে রকম পুণ্য কর্ম কিইবা আছে যাতে এই প্রতিদিনকার পাপ দূর হতে পারে, আর তত টাকাই বা ইনি কোথায় পাবেন?

অধিকারী কহিল, আচ্ছা টাকা যদি কোন ভক্ত এঁকে স্বেচ্ছায় দেয়। বলিয়া একশত টাকার পাঁচখানি নোট বৃন্দার আরক্ত করতলের উদ্দেশে ভূমিতলে রক্ষা করিয়া কাতর দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিল। বৃন্দার মুখ সুন্দর। চাহনি সুন্দরতর। সে মুখের পানে খানিকটা চাহিয়া থাকিতেও মন্দ লাগে না। কাজেই অধিকারী চট্ করিয়া দৃষ্টি নামাইল না। বরং একটু বেশি কাতর হইয়াই বলিল, দেখুন কাচ্ছাবাচ্ছা নিয়ে বাস করি। কাল থেকে আমার পালা আরম্ভ। এই কদিন মাত্র সারা বছরের ভরসা। এই সময়েই আপনারা এসে এক নূতন ঢেউ তুললেন। মন্দির বন্ধ গেলে কি অবস্থা হবে আমাদের একবার ভেবে দেখুন।

বৃন্দা আর একবার ভাবিল। অধিকারীর বেশ একটু বয়স হইলেও মনে হইল বৃন্দার ভাবনাটুকুও বেশ সুন্দর, অনেকটা যেন নবীন মেঘের মত। মেঘ অপসারিত করিয়া বৃন্দা বলিল, দেখুন, এ সমস্তই প্রভুর ইচ্ছা। তাঁর অনুমতি না হলে আমি কিছুই বলতে পারিনে। দেখি যদি কিছু হয়।

নোট কয়খানা হতাদরে ভূমিতলেই পড়িয়া রহিল। অধিকারী কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বৃন্দা সম্মুখের ক্ষুদ্রকক্ষে—যেখানে গুরুদেব কত লোকের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করিতেছেন সেখানে—প্রবেশ করিয়া দুয়ার রুদ্ধ করিল। রুদ্ধ দুয়ারের বাহিরে বর্ধিত কৌতূহলের সহিত অধিকারী উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিল।

ভিতরে প্রবেশ করিতে গজানন্দের শায়িত মূর্তি ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। কক্ষে শব্দহীন বাণী ফুটিয়া উঠিল—কি হল?

বৃন্দাও সেই মত নিশব্দে লেখা কাগজখানি দেখাইয়া বাঁ হাতের পাঁচটি অঙ্গুলি উঠাইল।

আঁখিতে পুনরায় প্রশ্ন জাগিল, কি করা যায়?

বৃন্দা গুরুর চরণের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল। ভাবটা তুচ্ছ নোট কয়খানাকে শ্রীচরণে আশ্রয় দিন। কি করিবেন? ভক্তের উপহার।

গুরু শব্দহীন সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। বৃন্দা বাহিরে আসিল, কিন্তু মুখখানির ভাব বাহিরে আসিতে আসিতে অদ্ভুতভাবে পরিবর্তিত হইয়া গেল।

অধিকারী জিজ্ঞাসুভাবে চাহিতে বৃন্দা নিরাশার সুরে বলিল, নিলেন না; আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান।

অধিকারী হাতযোড় করিয়া প্রায় বৃন্দার পায়ের উপর গড়াইয়া পড়িল। বৃন্দা মুখ ফিরাইয়া মৃদু হাসিয়া একটু পিছাইয়া আসিল। পরে মৃদুস্বরে বলিল, আমার কি দোষ, বলুন? আপনার কথা বলতে গিয়ে আমি ঠাকুরের কাছে বকুনি খেয়ে এলাম। অধিকারী কাতর হইয়া বলিল, আপনি আমার উপর দয়া করুন। ও ক'খানা আপনার কাছেই রাখুন। সুবিধামত ওঁর কাজে লাগাবেন। আর আমি যেন পথে না বসি এইটুকু দেখ্‌বেন।

বলিয়া অধিকারী হাতযোড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অত্যন্ত অনিচ্ছার ভাব দেখাইয়া বৃন্দা নোট কখানা তুলিয়া রাখিল।

অধিকারী একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া পাছে বৃন্দা আবার মত বদলাইয়া ফেলে—বুঝি বা সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল এবং দ্রুতপদে নিচে নামিয়া গেল।

বৃন্দা তৎক্ষণাৎ হাস্যমুখে গুরুর কক্ষে আসিয়া তাঁহার শয্যাপ্রান্তে নোট কয়খানা ফেলিয়া দিল। গুরু প্রসন্নমুখে কাগজ কয়খানা তুলিয়া লইয়া সাবধানে গণিয়া বালিশের নিচে রাখিলেন।

আর আধঘণ্টা পরে আবার বৃন্দা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দুয়ার ভেজাইয়া দিয়া শয্যাপ্রান্তে দাঁড়াইল। অতি মৃদুস্বরে গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন, কি?

বৃন্দা বলিল, মোড়ের মাথার রেস্তরাঁর মালিক ধনপতি দাস এসেছে।

গুরু প্রশ্ন করিলেন, কি বলে?

বৃন্দা বলিল, তাহার নাকি খদ্দের কম হচ্ছে। পাছে আরও কম হয় সেজন্য আপনার উপবাসে উদ্বিগ্ন হয়ে এসেছে।

গুরু। তার পর?

বৃন্দা। বলে, ভরসা পেলে কিছু প্রণামী দেয়। এনেছে একশো।

গুরু। বলে দাও, অর্থ নিষ্ফ! ধনপতি একমাসে এর দশগুণ লাভ করে।

উক্ত কথোপকথন অতি মৃদুস্বরে হইয়াছিল। শেষের দিকে একটু উচ্চকণ্ঠে বৃন্দা বলিল, আপনি বেশি কথা কহিবেন না, উত্তেজিত হবেন না; আমি এখনই ওদের সরিয়ে দিচ্ছি।

বৃন্দা গুরুর কক্ষ ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল এবং তাহার কক্ষ পার হইয়া প্রেমানন্দের কক্ষে আসিয়া তাহার পার্শ্বে উপবিষ্ট ধনপতির কাছে আগাইয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলিল, কেন আপনারা গুরুদেবের এই দুর্বল শরীরের উপর অত্যাচার করেন? আর এরকম অত্যাচার করতে আসবেন না।

বলিয়া আপনার কক্ষে ফিরিয়া আসিল।

ধনপতি সাহ জাতিতে বেণিয়া। গয়া জেলার লোক। বিশ বৎসর কলিকাতায় থাকিলেও এখনও সে কোঁচার খুঁটে টাকাপয়সা বাঁধিয়া রাখে। বৃন্দা চলিয়া গেলে সে খানিকটা কপালে হাত দিয়া ভাবিল। পরে প্রেমানন্দের অনুমতি লইয়া আবার বৃন্দার কক্ষে প্রবেশ করিল ও অত্যন্ত বিনয়ের সহিত প্রণামী দ্বিগুণ করিয়া দিল।

অত্যন্ত অনিচ্ছার ভাব দেখাইয়া বৃন্দা প্রণামী গ্রহণ করিল এবং গুরু যদি গ্রহণ করেন সেই চেষ্টা দেখিতে গুরুর কক্ষে প্রবেশ করিল।

প্রণামী যথাস্থানে সঞ্চিত হইলে ফিরিয়া আসিয়া বৃন্দা কহিল, যান, অতিকষ্টে রাখতে অনুমতি পেয়েছি। কিন্তু আপনারা সাবান আনেন না কেন? যেখানে সেখানে টাকা নোট রাখছেন—এসব ধুতে হবে না? এসব স্পর্শ গুরুদেবকে কাঁটার মত বেঁধে।

ধনপতি তৎক্ষণাৎ দশবাক্স সাবান আনিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া বিদায় লইল।

এইরূপে আরও কয়েকজন আসিল ও গেল। তাহাদের সকলের কথা বলিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়।

ঠাকুরের প্রাণরক্ষার জন্য কেবল কমলালেবুর রস ঠাকুরকে দেওয়া হইতেছিল। কিন্তু অনশন ব্রতের জন্য ঠাকুরের ক্ষুধার প্রাচুর্য ঘটিয়াছিল যাহাতে বাজারে কমলালেবুর দাম দশগুণ বাড়িয়া গেল। গৃহস্থঘরের রোগীদের জন্য কমলালেবুর একটি কোয়া পর্যন্ত দুর্লভ হইয়া উঠিল। কিন্তু তথাপি ঠাকুরের দেহ যেন ক্রমশ ক্ষীণ হইতে লাগিল।

ঠাকুরের দেহ মূল্যবান্। ততোধিক মূল্যবান্ ঠাকুরের প্রাণ। এই দুইটি অমূল্য পদার্থ রক্ষার জন্য ভক্তগণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন ঠাকুরের জীবনরক্ষা-সমিতি গঠিত হইল যাহার সভ্য ও সভ্যা হইল প্রেমানন্দ, বৃন্দা ও চরিত্রসিংহ। প্রথমোক্ত দুইজনকে আমরা ভাল করিয়াই জানি। তৃতীয় চরিত্রসিংহ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ। ধনবান্ ও বুদ্ধিহীন। বহু অর্থ ঠাকুরের সেবায় লাগাইয়াছে। জীবনরক্ষা-সমিতির গুপ্ত অধিবেশনে চরিত্রসিংহ বলিল, ঠাকুরের বাল্য ও যৌবনের দেহ ও মন অতিরিক্ত মাংসাহারে পুষ্ট। হঠাৎ মাংস ছাড়িয়া দেওয়ায় শরীর আরও ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। ঠাকুরকে কোন একটা বলকারক কিছু দেওয়া প্রয়োজন। অতএব কমলালেবুর রসের সহিত কুক্কুটশাবক সূপ দেওয়া হউক।

বৃন্দা বলিল, হিন্দুর মন্দিরে কুক্কুট বলিদান দেওয়া হয় না। অতএব ঠাকুরের নীতির সহিতও ইহার বিরোধ ঘটিবে না!

চরিত্রসিংহ একেবারে সাধু ভাষায় কথা কহে। বলিল, বিরোধ ঘটিলেও ঠাকুরেব প্রাণবক্ষার জন্য তাহারও প্রয়োজন।

প্রেম বলিল, নিশ্চয়ই।

বৃন্দা বলিল, তবে ঠাকুর যেন জানিতে না পারেন।

চরিত্র ঘাড় নাড়িয়া আশ্বাস দিল—সে ভার তাহার।

ঠাকুর রক্ষা পাইলেন। বহুকাল পরে মাংসেব আস্বাদ পাইয়া ঠাকুর যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। অনশন ব্রতের শেষের কয়টা দিন বেশ কাটিতে লাগিল।

কিন্তু দেবতার নামে এতটা ফাঁকি সহিল না। একদিন ঠাকুর হঠাৎ মাথার যন্ত্রণায় অস্থির হইলেন। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, ব্লাড্‌প্রেসার অসম্ভবভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। উপবাসে ব্লাড্‌প্রেসাব কমিবার কথা হঠাৎ বাড়িল কেন কেহ ভাবিয়া পাইল না। সমস্ত দোষ তখন পড়িল গিয়া নিরপরাধ কমলালেবুর উপর।

ঠাকুরের জীবন এবম্বিধভাবে বিপন্ন দেখিয়া ওঁকার মঠের সহকারী আচার্য

শ্রীমদ্ বিপুলানন্দ ব্রহ্মচারী, বাংলার অন্যতম মন্ত্রী মহাশয়, কবি নাগুচির এক প্রতিনিধি এবং আমাদের প্রিয়তম কবির এক নিদারুণ ভক্ত সকলে একযোগে আসিয়া ঠাকুরের হাতে পায়ে (কেহ হাতে ও কেহ পায়ে) ধরিল। তাহাতে অনন্যোপায় হইয়া ভক্তবৎসল ঠাকুর অনশন ব্রত আপাতত স্থগিত রাখিলেন।

বলিদানের পক্ষাবলম্বী লোকেরা অবহিত রহিবেন, বলিদান আবার বাড়িতে দেখিলেই ঠাকুর জীবন ত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়া পুনরায় কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন।

সকলেই ইহাতে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

*ফাল্গুন, ১৩৪৬*

# কিরণের কথা

## মণীন্দ্রলাল বসু

(১)

লীলা চা তৈরি শেষ করিয়া টেবিলের এক কোণে বসিল। কিরণ অনমনস্ক ভাবে একখানা ছেঁড়া কাগজ কুড়াইয়া লইয়া একটা ছবি আঁকিতেছিল।

"চা যে জুড়িয়ে গেল।"

"ও—"

দুই চামচ চা খাইয়া কিরণ আবার ছবিতে মন দিল। লীলা উঠিয়া আসিয়া, হাত হইতে কাগজখানি টানিয়া লইয়া, কুটিকুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

"কার ছবি আঁকা হচ্ছিল, দেখলে, অমন করে ছিঁড়তে না।"

"দেখেছি।"

"ওটা কিন্তু ভাবি সুন্দর হত।"

লীলা দাদাকে কত বলিয়া এক রঙের-বাক্স উপহার দিয়াছিল। সেই হইতে তাহার ছবি আঁকা শুরু। তার পর নয় বছর ধরিয়া কত গল্প-গান, কত ছবি-আঁকা, ছবি-ছেঁড়া, কত কথা-কাটাকাটি, কথা-বাধানাধির মধ্য দিয়া এই দুইটি জীবন জড়াইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। এই কিশোর-কিশোরীর তরী দুইখানি পাশাপাশি ভাসিয়া, যৌবনের ঘাটে আসিয়া হঠাৎ থামিল। প্রভাতের রঙিন আলোয় যাহারা স্বপ্ন লোকের মাঝখান দিয়া বাহিয়া আসিয়াছিল, সহসা তাহারা মুখে-মুখে চাহিয়া দাঁড়াইল;ভাবিয়াছিল, তাহাদের পাল বুঝি এক, হাল বুঝি এক;—এবার যে বোঝা-পড়ার সময় আসিল। দুই তরীর মাঝে জলের গর্জন যে বাড়িতেছে, ব্যবধান যে বড় হইতেছে,—এবার হালে-হালে পালে পালে এক করিয়া এক দাঁড়ে না টানিলে, সম্মুখের অকূল সমুদ্রের ঊর্মি-উন্মাদনার কোন স্রোতে কে ভাসিয়া যাইবে।

কিরণ তাই বাঁধিতে চায়, কিন্তু লীলা যে চায় না। কিরণ আজ এক বিখ্যাত ভারতীয় চিত্রশিল্পী , রঙের পর রঙ গুলিয়া, তুলির পর তুলি বুলাইয়া, সে বিশ্বের মর্মাধিষ্ঠাত্রী সৌন্দর্যময়ীর সন্ধানে চলিয়াছে।—লীলা সেই সন্ধানের পথে আসিয়া দাঁড়াইতে চায় না। কিরণ মাঝে-মাঝে ভাবিত, হয় ত সে, অজন্তা-গুহায় যাহারা চিত্র আঁকিয়াছে, সেই শিল্পীদলের মধ্যে ছিল,—তা না হইলে ভারতের অন্তরবাসিনী সৌন্দর্য-লক্ষ্মী তাহাকে এমন করিয়া মুগ্ধ করিল কেন? কোন্‌টা সত্য—সেই মানসী, না লীলা?

বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে,—কালো মেঘের ফাঁক দিয়া দুই-তিনটি তারা অন্ধকার, বিজন মন্দিরের পূজারতির প্রদীপের মত জ্বল-জ্বল করিতেছে। রাত্রি তখন বারোটা,—লীলা তাহার ডায়রীতে লিখিল—

"না।" ব্যথা পেলে,—তোমায় আমি ব্যথা দিতেই চাই।

যে হাতে তোমার হাতে রঙের তুলি তুলে দিয়েছি, সে হাতে ফুলের মালা পরানো যায় না যে! আজ যে তুমি নিছক সৌন্দর্যের চর্চা করছ, ও রঙের মায়া কাটিয়ে, নারীর রূপের স্বপ্ন ভেঙ্গে, কবে তুমি বেরুবে—মানব-অন্তরের বেদনাকে মূর্তিমতী করবে! বাঁশকে কেটে, দগ্ধ শলাকা দিয়ে পুড়িয়ে, গর্ত না করলে বাঁশি বুঝি হয় না,—হৃদয়কে না ফাটালে গান বুঝি ঝরে না,—রঙের সঙ্গে প্রাণের রক্ত না মেশালে রাত্রি-শেষের ঊষার আলোককে আঁকতে পারা যায় না! তোমার কলা-লক্ষ্মীর পাশে আমি আসন গ্রহণ করতে চাই না, এই আমার গর্ব। শিল্পী, বেদনার পর বেদনা দিয়ে তোমায় জাগিয়ে তুলব।"

খোলা জানালার পাশে এসে দাঁড়িয়ে, সে কিরণের বাড়ির ছাদের দিকে তাকাইয়া রহিল। আকাশের তারাদলের মত তাহার চোখ-দুটি জ্বলজ্বল করিতে লাগিল।

(৩)

ইহার পর তিন মাস কাটিয়া গেছে। শ্রাবণের মেঘাবগুণ্ঠিত দিনটি সন্ধ্যার তীরে আসিয়া সহসা ছিন্ন-মেঘের স্তূপে, অরুণ-আলোর লীলার অপরূপ আভা-মণ্ডিত।

লীলা ছাদে বসিয়া সেই সোনালি-আলোয় ব্রাউনিং এর Paracelsus পড়িতেছিল,—কিরণ ধীরে আসিয়া ঢুকিল।

লীলা আপন মনে পড়িতে লাগিল। কিরণ ছাদের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অনেকক্ষণ ঘুরিয়া, লীলার সামনে একখানি চেয়ারে বসিল।

"এবার শেলি ছেড়ে ব্রাউনিংএ পেয়েছে—"

বই হইতে মুখ না তুলিয়া লীলা বলিল, "বেশ ভাল লাগে, যদিও কিছু বুঝি না।"

কিরণ চুপ করিয়া বসিয়া পাঠনিরতা লীলাকে ও পশ্চিমগগনের মেঘ-শয্যায় সূর্যের বিহার দেখিতে লাগিল।

সূর্যের শেষ স্বর্ণবিন্দু স্তব্ধ ঘন মেঘে মিলাইয়া গিয়াছে। আকাশের এক কোণে একটি তারা জ্বলজ্বল করিতেছে। লীলা বইখানি টেবিলে রাখিয়া উঠিল।

"একটা আলো নিয়ে আসি,—আচ্ছা, তুমি এই Paracelsus-এর মৃত্যু-শয্যার একখানা ছবি আঁকো না!"

"থাক্" আলো আন্‌তে হবে না—তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে—।"

কিরণের স্বর শুনিয়া লীলা বসিল। সে বুঝি আজ একটা বোঝা-পড়া করিয়া লইতে চায়।

লীলা হাসিমাখা সুরে স্তব্ধতা ভাঙ্গিল, "আমার শিল্পীর খবর কি?"

"ঠাট্টা রাখো, আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।"

হাসিভরা চোখে কিরণের মুখের দিকে চাহিয়া লীলা বলিল, "কি হোলো আবার।"

কিরণ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তারপর বলিল "লীলা সত্য কথা বলো দেখি। আচ্ছা, তোমার ভয় কি আপত্তি কি?"

"আবার! এই তিনবার হোলো : দেখো, তুমি যে ছেলেমানুষটি এসেছিলে, তা নেই। এবার বল্লে কথা বন্ধ।"

"না, আজ আমার একটা জবাব দাও,—আমি আর দোলায় দুলতে পারি না।"

"কি সেন্টিমেন্টাল তুমি—"

"তোমার লীলা রাখো, লীলা। আজ আমি শেষ বোঝাপড়া করব, না হলে—"

"না হলে কি?—দেশত্যাগী হবে? সন্ন্যাসী হবে? সে ভয় নেই—"

"সে ভয় নেই বলেই তো আমায় এম্নি করছ!"

"কি করছি?"

তার পর টেবিলের উপর হইতে কিরণের হাতটি তুলিয়া লইয়া, আদরের সহিত হাসিয়া বলিল, "আমরা দু'জন বন্ধু, কি বলো? মনে নেই, সেই আট-বছর আগে দাদা যখন আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়,—আমরা কি সম্পর্ক পাতিয়েছিলুম? বলেছিলুম, যে সে সম্পর্ক প্রথম ভাঙ্গবে সে যেন—"

"থামো লীলা, থামো। আচ্ছা, আমি প্রথম ভাঙ্গছি, —কি করবে তুমি কর।"

লীলার মুখ কালি হইয়া গেল। সে ভাঙ্গা স্বরে বলিল, "কিরণ!"

"লীলা!"

"কি বলছিলে বলো—"

"তুমি সুখী হবে না?"

"হব বল—"

"আচ্ছা তুমি আমার—"

"সেই জন্যেই তো রাজি হচ্চি না—"

"ও, আবার তোমার হেঁয়ালি!"

"হেঁয়ালি নয়,—তবে শোনো বলি। তোমাকে আমি এতটা শ্রদ্ধা করি যে, তোমার স্বপ্নকে আমি ভাঙ্‌তে চাই না—।"

"ওঃ, তোমার পূজার কি শেষ হবে না—ঠাট্টা?"

"ঠাট্টা নয়,—তোমায় আমি সত্যি এত ভক্তি করি যে, আমরা যদি মিলি, আর তুমি যদি খুব ব্যথা দাও, দুর্ব্যবহার কর, তবু তুমি আমায় অসুখী করতে পারবে না। কিন্তু দেখো,---"

"আবার 'কিন্তু'। আচ্ছা, আমি তর্ক করব, কিন্তু বলো?"

"হ্যাঁ, আজ আমি সব বলব। তোমার জীবনের সঙ্গে আমার জীবন জড়িয়ে বাঁধলে, তুমি আমার জন্যে ত্যাগ করতে আরম্ভ করবে—তোমার রঙের উৎসের ওপর আমি পাথর হয়ে থাকব, সে আমি সইতে পারব না—"

"সে ত খুব সুন্দর জিনিস। জানি, দুটো স্বাধীন মনকে এক গেরোয় বাঁধতে গেলে, দুজনের স্বাধীনতা একটু কমে আসে। —দু'জনে ত্যাগ করে মিলবে, দুজনেই ছাড়বে, তবেই ত তাদের সত্যি ভালবাসা প্রমাণ হবে—"

"সেটা আমি মোটেই চাই না।"—

"তুমি কেবল সাফ্রাজিস্টদের বাঁধা বুলি বলছ—তাদের কথায় প্রতিধ্বনি করছ।"

"হয় ত—"

"হয় ত নয়, তুমি সত্যি ভেবে বলো—"

"দেখো, আমরা দু'জনেই এত বিভিন্ন—"

"আবার সাফ্রাজিস্ট সাহিত্যের বাংলা তর্জমা—

"তুমি জানো, মাঝে-মাঝে আমার অশান্ত 'আমি' জেগে ওঠে, তখন আমায় সেটাকে দলে পিষে মেরে ফেলতে হবে, আর—"

"তুমি বলতে চাও,—আমার অনেক-খানিটা তোমার ভালো লাগে, অল্প-খানিকটা পছন্দ হয় না—"

"তুমি কাতর হয়ো না। আমি জানি আমার চেয়ে তুমি কত বড়। আমার জন্যে তোমাকে ছোট করে টেনে আন্‌তে পারব না। তুমি বুঝছ না—"

"না, তোমার হেঁয়ালি কোনো কালে আমি বুঝব না।"

"দেখো, আমাদের দুজনের মধ্যে ব্যক্তিত্ব বড় সুস্পষ্ট। আমরা প্রত্যেকে বিশেষ,—প্রত্যেকেরই জীবনের এক বিশেষ উদ্দেশ্য, আদর্শ, সাধনা আছে—"

"সেই জন্যেই তো তোমায় ভালোবাসি—"

"সেই জন্যেই তো আমরা মিলতে পারি না—"

"এত লোক মেলে কি করে?"

"জানি না,—হয় ত সব ফাঁকি দিয়ে—"

"তবে তুমি আমায় চাও না?"

লীলা কিরণের হাত ছাড়িয়া করুণ সুরে বলিল, "মেনে নাও তাই।" তার পর থামিয়া বলিল, "না কিরণ, আমায় একটু ভাববার সময় দাও, কাল বলবো।"

মাথার উপর নীলাকাশ তারায় ভরিয়া গিয়াছে, শুক্লা দ্বাদশীর চন্দ্র হইতে পূর্বদিকের পুঞ্জীভূত মেঘের দলে জ্যোৎস্না ঝরিয়া পড়িতেছে,—দুইজনে মগ্ন হইয়া বসিয়া রহিল। লীলার যখন চমক ভাঙ্গিল,—সামনের চেয়ার, চাহিয়া দেখিল, শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। ভিজে ছাদে নতজানু হইয়া চেয়ারের উপর মাথা গুঁজিয়া সে পড়িয়া রহিল। চোখের তটে যে অশ্রুর বান রুদ্ধ ছিল, তাহা উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

(৪)

সারারাত্রি বিছানায় ছট্‌ফট করিয়া, কিরণ ভোর বেলায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। কি একটা স্বপ্ন দেখিয়া যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন আটটা বাজিয়া গিয়াছে। উঠিয়া কি করে ভাবিয়া পাইল না। টেবিলে একটা অসম্পূর্ণ ছবি পড়িয়া ছিল ; সেইটা লইয়া বসিল। ছবিখানা হাতে লইয়া বসিল, তুলি আর বুলাইল না। সহসা দরজার দিকে চাহিয়া দেখিল, লীলা সিঁড়ি দিয়া তাহার ঘরের দিকে উঠিয়া আসিতেছে। সে ভাবিল, এ কি ভ্রম!" যদিও এই মূর্তিটিই

সারারাত্রি ধরিয়া, ছেঁড়া-ছেঁড়া ঘুমের মধ্য দিয়া বার-বার আসিয়াছে, তবু দিনের আলোয় যে এরূপ ভ্রম হইতে পারে, তাহা সে ভাবে নাই। উঠিয়া দরজার কাছে যাইতেই দেখিল, সত্যই লীলা আসিয়াছে।

লীলা আসিয়াছে! তবে কি সে গত সন্ধ্যায় যা কিছু বলিয়াছিল, সব মিথ্যা, সব মায়া—সব তার লীলা! কিরণ আনন্দের আতিশয্যে তাহার দিকে ছুটিয়া গেল, কিন্তু দরজার গোড়ায় থমকিয়া দাঁড়াইল। এ কি লীলার সাজ! নগ্ন পদ শুষ্ক মুখ, রুক্ষ কেশ,—ঝড়ে-ছেঁড়া লতার মত! অপরূপ আঁখি দুটি এমন অস্বাভাবিক উজ্জ্বল, এমন কালো ছায়াময় কেন? সেও কি কিরণের মত সারারাত্রি জাগিয়াছে? লীলা উন্মাদের মত আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া, সামনের এক চেয়ারে নির্জীবের মত বসিয়া হাঁপাইতে লাগিল। তাহার কালো মুখের দিকে চাহিয়া কিরণের কণ্ঠ শুকাইয়া গেল, স্বর বাহির হইল না। অতি কষ্টে ভাঙ্গা গলায় বলিল, "লীলা, কি হয়েছে?"

"দাদাকে ধরে নিয়ে গেছে।"

"কি?—কে?"

"পুলিশে।"

কশাহত অশ্বের মত কিরণের সর্ব দেহ শিহরিয়া উঠিল! সে পাশের চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবার পর লীলা কিছু সুস্থ হইলে, কিরণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কখন?"

"আজ ভোর বেলা।"

"তুমি এমন করে এলে কেন,—একটা খবর পাঠালে পারতে! তোমার মাকে এক্‌লা ফেলে এলে? তুমি একটু বিশ্রাম করে নাও, আমি একটা গাড়ি ডাক্‌তে বলি।"

"না, সে কিছুতেই হবে না,—আমাদের বাড়িতে তোমার যাওয়া অসম্ভব।"

"কি বলো লীলা, তোমার মার কাছে আমার যে এখন যাওযা চাই-ই। কাল রাত্রির কথা সব ভুলে যাও এখন—"

লীলার মুখে কে যেন ছিপটির পর ছিপটি মারিল। সে অতি জোরের সহিত আপনাকে দমন করিযা বলিল, আমি ভেবেছিলাম, পুলিশ তোমার এখানেও এসেছে বুঝি, তাই ছুটে এলুম। আমাদের বাড়িতে তোমার কিছুতেই যাওযা হতে পারে না--পালাও, তুমি পালাও—"

অদম্য আবেগে সে চেয়ার হইতে উঠিয়া কিরণের পাশে ছুটিয়া আসিল। তাহার হাত দুটি ধরিয়া ভাঙ্গা গলায় বলিয়া উঠিল, "তুমি শিগগির পালাও ভাই, লক্ষ্মী ভাইটি আমার কথা শোনো! পুলিশ যে এখনও তোমার বাড়ি আসেনি—আশ্চর্য! আজ না এলে, কাল আসবে। দাদাকে যখন ধরেছে, তোমায় ছাড়বে না,—এক্ষুনি যাও তুমি।"

কিরণ মন্ত্রাহতের মত দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। এ যেন লীলার স্বর নয়,— যেন কোন্ দূর অজানা লোক হইতে করুণ কণ্ঠের ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে।

লীলা আবার আপনাকে সংযত করিযা, শ্রান্ত হইযা চেযারে বসিযা পড়িল।

কিরণ বলিল, "এমন সময় তোমাদের ছেড়ে আমি করে যাবো? আর, তুমি মিছে ভয় করছ।"

"মিছে ভয় নয়। দাদাকে যখন ধরেছে, তোমায় নিশ্চয় ধরবে। তোমাদের বই, লেখা-খাতা সব নিয়ে গেছে, আমার বাক্স শুদ্ধ search হয়েছে। তোমার চিঠির তাড়া নিয়ে গেছে। আর ঘরময় জিনিসপত্র উল্টে, বই, কাগজ, কাপড় ছড়িয়ে, একাকার করে গেছে।"

"কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ নেই।"

"Intern করতে প্রমাণের দরকার হয় না।"

"কিন্তু তোমার মাকে— তোমাদের—"

"আমার জন্যে ভাব্না নেই, মাকে আমি দেখব। আর তুমি ত আমাদের দেখতে পাবে না,—কেন জেলে পচবে! আর যদি solitary cellএ রাখে—"

লীলার মাথার কেশগুচ্ছ ফুলিয়া উঠিল,—সারা দেহ ক্ষোভে, ক্রোধে, শঙ্কায় শিহরিয়া উঠিল।

"তুমি কি করতে বলো?"

"আমি ত বল্‌ছি পালাতে।"

"পুলিশের হাত থেকে কোথায় পালাব? না; আমায় একটু ভাববার সময় দাও।"

"ভাববার সময় নেই,—পণ্ডিচারি যাও, চিন-জাপান যেখানে হয় যাও,—আফ্রিকার জঙ্গলে যেতে পারো, South seaর দ্বীপগুলোয়—ভারত ছেড়ে পালাও।"

"না, আমায় একটু ভাববার সময় দাও। চলো তোমার মাকে একবার দেখে আসি—"

"আচ্ছা, একটিবার তাই,—আমি তোমার জিনিসপত্র গুছিয়ে দিচ্ছি,—তুমি একটু বিশ্রাম করে নাও।"

সেইদিন এক তরুণ যুবক এক তরুণীর নিকট বিদায় লইয়া, জগতের বিচিত্র দুর্গম পথে বাহির হইয়া পড়িল। যাবার সময় কিরণ লীলাকে জীবনের প্রথম চুম্বন করিয়া গেল। সে কি লীলাকে চুম্বন,—সে বাংলার তরুণী প্রাণকে চুম্বন!

( ৫ )

ইয়োরোপগামী ইটালিযান জাহাজে কিরণ পলাইতেছে। ডেকের উপর আকাশ, বাতাস, আলো, জলের খেলা দেখিয়া তাহার দিন কাটে। শান্ত সমুদ্রের উপর দিয়া জাহাজখানি উড়িয়া চলিতেছে—যেন সুনীল তরঙ্গায়িত পথ দিয়া কোন্ নৃত্যময়ী অভিসারিকা সুদূর দেশের সন্ধানে চঞ্চল পদে ছুটিয়াছে। প্রতিদিন প্রভাত-সূর্য স্বর্ণ তুলি দিয়া তাহার পথে স্বপ্নছবি আঁকে। রাত্রির তারারা তাহাকে ডাকিয়া লইয়া যায়। তাহার পদতলে শুভ্র পুষ্পময় সাগর কাঁপিয়া, দুলিয়া দিনে-রাতে কখনো ভৈরবী সুরে, কখনো মল্লার তানে গান শোনায়।

একটা তুলি ও কাগজ লইয়া কিরণ সন্ধ্যায় সময় ডেকে বসিয়া ছিল। গলিত স্বর্ণের মত সিন্ধুর সহিত অরুণ বর্ণ আকাশ এক হইয়া পশ্চিম-গগন-কোণে মায়াদেবীর আলয় সৃষ্টি করিয়াছে,—সেই দিকে চাহিয়া সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল। প্রতিদিন সে তুলি লইয়া

বসে,—কিন্তু ছবি আর আঁকা হয় না। অসীম সাগরের শান্ত জলেও তাহার মন স্নিগ্ধ হইতেছিল না। কেন সে লীলাকে ছাড়িয়া আসিল,—তাহার দেশকে ছাড়িয়া আসিল? এই কি মুক্তি? নির্জন কারাগারবাসে মুক্তি ছিল,—আজ যে আনন্দময় বিচিত্র পৃথিবীতে তাহার মুক্তি নাই, জগৎ-জোড়া কারাগার কেন আপনার হাতে সে গড়িল! জাহাজটা যদি আবার বাংলায় ফিরিয়া যায়, সে বাঁচে!

সহসা তাহার চিন্তাস্রোতে বাধা পাইল। একটি ময়ূর কণ্ঠ শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল,—"আপনার বুঝি আর ছবি আঁকতে ভাল লাগছে না।" মুখ তুলিয়া দেখিল, একটি বিদেশিনী যুবতী তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিরণ তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহাকে বসিতে অনুরোধ কবিল।

"ধন্যবাদ, আমি একটু বেড়াচ্ছি—"

তার পর দু'জনে সন্ধ্যা-সাগরের দিকে চাহিয়া, রেলিং-এ ঠেস দিয়া দাঁড়াইল।"

বিদেশিনীটি বলিল, "আপনি আর্টিস্ট বুঝি?"

"রং গুলে খেলা করি।"

"আপনাকে আরও তিনদিন এম্নি করে বসে থাকতে দেখেছি।"

"ছবি আঁকার চেয়ে, ছবি দেখা আমার ভাল লাগে।"

সে বিদেশিনীর দিকে চাহিযা দেখিল। সাগরের নীল জলের মত তাহার চোখ দু'টি স্নিগ্ধ নীল,—সন্ধ্যা-সূর্যের স্বর্ণ কিরণধারার মত তাহাব কেশ গুচ্ছ!

"সন্ধ্যাটি কি সুন্দর!"

"হ্যাঁ, খুব কি সুন্দর!"

"কিন্তু আমার একটি ছোটখাট কালো ঝড় দেখতে ইচ্ছে করে—"

"আমিও কখনো সাগরের ঝড় দেখি নি,—আমারও ইচ্ছে হয়।"

"অবশ্য, জাহাজ ডুববে না; কিন্তু ইঞ্জিনটা ভেঙ্গে যাবে। তার পর wireless সাহায্যে আসবে।"

কিরণ বলিল, "সে ত নিশ্চয়।"

"সমুদ্র এখন কি শান্ত দেখুন। দেখে মনেই হয় না, এ ক্ষুধিতা রাক্ষসীর মত কত জাহাজ ডুবিয়েছে, কত মানুষ খেয়েছে।"

"পৃথিবীর আদিকাল থেকে এই বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কত নাবিক অজানা দেশ খুঁজে ডুবে মরেছে। বলুন দেখি, কত ঝড়ে কত যাত্রী মরেছে,—কত ধন সাগরের তলে গেছে,—কত সেনা, রণতরী ডুবেছে!"

"মনে করুন, সেই সব তরীগুলো,—সেই সব নাবিক, যাত্রী, সেনা, বণিকদের নিয়ে আজ সাগরের উপব ভেসে ওঠে,—হঠাৎ যদি ঝলমল নীল জল থেকে প্রতি দেশের, প্রতি যুগের, সভ্যতার প্রতি পর্বের মানুষেরা কতরকম রূপ, মূর্তি, কতরকম বেশ-ভূষা পরে, কত রকম অদ্ভুত, বিচিত্র জাহাজে করে উঠে আসে!"

কিরণ বলিল, "বেশ একটা আঁকবার ছবি হয়।"

দুইজনে আবার নীরব হইল। ঠিক সেই সময় খাবার ঘণ্টা পড়াতে দুইজনেই যেন বাঁচিয়া গেল।

দুইদিন কাটিয়া গিয়াছে,—বিকালে কিরণ ও বিদেশিনী ডেকে বেড়াইতেছিল।

Diana কাতর স্বরে বলিল, "ওঃ, বড় গরম!"

"হ্যাঁ, কাল থেকে বড় গরম পড়েছে। বাতাস ত একেবারে বন্ধ। আপনার বড় কষ্ট হচ্ছে!"

"সাগরটায় যেন একটা নীল সিল্কের ওড়না পাতা রয়েছে,—একটুও কাঁপছে না।"

দুইজনে দুইখানি চেয়ারে চুপ করিয়া বসিল।

কিরণ বলিল, "ইঞ্জিন্ ঘরের temperature ১১৫° হয়েছে।"

"সূর্যের রংটা দেখুন—তামার মত—ওঃ!"

"খালাসিগুলো লোহার শেকল নাড়তে কি ভয়ঙ্কর আওয়াজ করছে,—ইঞ্জিনটা কি বিশ্রী শব্দ করছে!"

"ঠিক যেন একটা লোহার কঙ্কালে-গড়া লোহার মাংসপেশী ও স্নায়ুময় বিরাট দৈত্য বেদনায় ছটফট করে আর্তনাদ করছে।"

"একটু হাওয়া বয়না,—পশ্চিমের আকাশটা হলদে হয়ে গেছে—"

ভীষণ গরমে সকলের মেজাজ খারাপ হইয়া গিয়াছে,—কথাবার্তা কহিতে ইচ্ছা করিতেছে না ; তাহারা চেয়ারে ঠেস দিয়া, চোখ বুজিয়া বসিয়া পড়িল।

কয়েক ঘণ্টা পরে Diana যখন চোখ মেলিল, সে চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া, চিৎকার করিয়া উঠিল, "কি ভয়ঙ্কর কালো।"

কিরণ চোখ চাহিয়া বলিল, "কি?"

"ওই যে আকাশের ওই কোণটায়!"

"হাঁ, কি কালো মেঘ,—সাগরের কোণে স্থির হয়ে পড়ে রয়েছে,—ঝড় আসবে বোধ হয়।"

"কালোর এমন রং আমি ক্‌খ্‌না দেখি নি। একটা ড্রাগন যেন চুপ করে, হাঁ করে পড়ে রয়েছে।"

"আর জাহাজটা দেখছি মন্ত্রমুগ্ধের মত ওর মুখের মধ্যে টলতে টলতে চলেছে—"

"দূর থেকে কি একটা শব্দ আসছে! তারাগুলো কি বড় দেখাচ্ছে! যেন তাদের খুব কাছে এসে পড়েছি! কি কাঁপছে—" সে হতাশের মত চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

সহসা তাহাদের চেয়ার নড়িয়া উঠিল। সমস্ত জাহাজ দুলিল। কিরণ না ধরিলে, বিদেশিনী ছিট্‌কাইয়া চেয়ার হইতে পড়িয়া যাইত। জাহাজের আলোগুলি কাঁপিয়া উঠিল। মাস্তুলে সন্ সন্ শব্দ হইতে লাগিল। কেবিনের দরজা-জানালাগুলি ভীষণ শব্দ করিয়া বার-বার খুলিতে ও বন্ধ হইতে লাগিল। কিরণের হাত হইতে একখানি কাগজ উড়িয়া সাগরের জলে পড়িয়া গেল।

"ওঃ! কি গরম হাওয়া!" বলিয়া Diana কেবিনের দিকে ছুটিল।

কিরণ সে হাওয়ার মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না—এক মাস্তুলের পাশে আশ্রয় লইল।

বাতাস বহিতে লাগিল। জাহাজ দুলিতে লাগিল। আকাশের তারাগুলি উল্কার মত যেন তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে, যেন কোন ডাইনি উদ্বেলিত সাগরের কালো জল মন্ত্র পড়িয়া ফুটাইতেছে।

তারারা কোথায় মিলাইয়া গেছে। জাহাজটা মাতালের মত এক ঘন অন্ধকার-ভরা গহ্বরে আসিয়া ঢুকিতেছে। সহসা ঘন তমিস্রপুঞ্জ বিদ্যুৎ বিদীর্যমান হইল,—সংগ্রামের প্রথম আহ্বানের মত বজ্রধ্বনি হইল। মাস্তুলগুলি কাঁপিয়া উঠিল। এক প্রচণ্ড ঢেউ আসিয়া ডেক ভাসাইয়া দিয়া গেল। কিরণ এক মাস্তুল হইতে আর একটা মাস্তুলে ছিট্‌কাইয়া পড়িল,—তাহার সর্ব দেহ ভিজিয়া গেল। ভাবিল, ডেক ছাড়িয়া নিচে যায়। কিন্তু ডেকের উপর দিয়া পর্বতের ভারের মত ঝোড়ো হাওয়া ঠেলিয়া যাইতে সাহস হইল না। একটি মোটা দড়ি দিয়া সে মাস্তুলে নিজেকে জোরে বাঁধিল। সম্মুখে উদ্বেলিত সিন্ধু ও ঝঞ্ঝাময় আকাশ মিলিয়া প্রলয়-নৃত্য শুরু করিল। অন্ধকারের পর্দার পর পর্দা পড়িতে লাগিল। তার পর আবার বজ্রধ্বনি হইয়া বৃষ্টি নামিল। সে কি বৃষ্টি! এক-এক ফোটা জল যেন এক-একটি লোহার দানার মত ভারি, সূচের মত তীক্ষ্ণ!—সমস্ত আকাশ লক্ষ-লক্ষ প্রপাতের বাহু মেলিয়া, ঝরিয়া পড়িয়া, সাগরকে আলিঙ্গন করিতে গেল। মাস্তুলগুলি বেণুবনের মত কাঁপিতে লাগিল! কিরণের মনে হইল যদি সে মাস্তুলের চূড়ায় বাঁধা থাকিত!

সহসা দূরে একটা মাস্তুল ভাঙ্গিয়া পড়িল। বিদ্যুতের আলোয় কিরণ দেখিল, কাপ্তেনের কেবিনের সামনে ভাঙ্গা মাস্তুল আঁকড়াইয়া এক শুভ্রমূর্তি কাঁপিতেছে। ঝড়ের আঘাতে মূর্তিটি ডেকে লুটাইয়া পড়িল,—এক নব-পরিচিত কণ্ঠের করুণ ধ্বনি কানে আসিল।

কিরণ থাকতে পারিল না। সে নিজের দেহ হইতে দড়ির বন্ধন খুলিয়া ফেলিল। তার পর রজ্জুর শেষ প্রান্ত মাস্তুলের গায়ে বাঁধিয়া সেই ভাঙ্গা মাস্তুলের দিকে টলিতে টলিতে চলিতে লাগিল। কিছুদূর যাইতেই, তাহার পায়ের উপর দিয়া এক ঢেউ বহিয়া গেল,—তাহার আঘাতে সে ডেকে শুইয়া পড়িল। আবার এক ঢেউ আসিয়া তাহার উপর দিয়া বহিয়া গেল। অনেক কষ্টে গড়াইয়া সে সেই ভাঙ্গা মাস্তুলের কাছে আসিয়া পৌঁছিল দেখিল, এক নারীদেহ মাস্তুলের গায়ে আট্‌কাইয়া রহিয়াছে। জোব করিয়া দাঁড়াইয়া সেই নারীদেহ বুকে জড়াইয়া তুলিতেই, আর একটা ঢেউ দুজনকেই ডেকের উপর ভাসাইয়া দিল। কিরণ মূর্ছিতা নারীতনুকে বুকে করিয়া জড়াইয়া, স্রোতের সহিত যুঝিতে লাগিল। আর এক ঢেউ,—এইবার বুঝি দুইজনেই অতল সমুদ্রে ভাসিয়া যায়! তাহার বিবেচনা-শক্তি, পর্যবেক্ষণ-শক্তি, অনুভব-শক্তি চলিয়া গেল,—শুধু নিজে অস্পষ্ট, অন্ধ আবেগে পরিচালিত হইয়া সে এক হাতে দড়িটি আব এক হাতে সেই নারীকে ধরিয়া রহিল। এক নিমেষের জন্য সে সব ভুলিয়া গেল। তাহার সমস্ত অতীত জীবন বায়স্কোপের ছবির মত এক সেকেন্ডের মধ্যে চোখের উপর ভাসিয়া গেল—লীলার মুখখানি —তার পর সব অন্ধকার।

বোধ হইল, যেন এক বিপুল, বিশাল, শক্তিমান বাহু তাহাদের দুইজনকে টানিয়া তুলিতেছে। যখন চোখ মেলিল, তাহারা দু'জনেই কাপ্তানের কেবিনের দরজার গোড়ায় লুটাইয়া পড়িয়া রহিয়াছে,—তাহাদের পাশে এক বিশাল কৃষ্ণমূর্তি দাঁড়াইয়া।

আবার, জাহাজ দুলিয়া উঠিল,—সে মূর্তি কোথায় সরিয়া গেল। কিরণ কেবিনের পাশে আশ্রয় পাইয়া, আশায় শক্তিমান হইয়া উঠিল। নারীদেহকে আপনার কোলে টানিয়া লইয়া, oilskin কোট জড়াইয়া, আপনার দেহের তাপ দিয়া তপ্ত করিতে লাগিল।

"Diana- "

Diana চোখ মেলিল না। কিরণ তাহার হাত-পা ঘষিয়া দেহ গরম করিতে লাগিল।

"Diana–"

Diana চোখ মেলিল ; অস্ফুট স্বরে বলিল, "বড় বড়—বড় শীত—"আবার চোখ বুজিল।

কিরণ আনন্দে তাহাকে আরও নিকটে টানিয়া লইল।

ঝড় বহিতে লাগিল। সম্মুখের ডেক হইতে সব জিনিস ক্ষুধিত ঢেউয়ের দল টানিয়া লইতে লাগিল।

আর একটা মাস্তুল ভাঙ্গিয়া পড়িল,—ব্রিজের একটা দিক ভাসিয়া গেল। এইবার জাহাজ সজীব হইয়া উঠিল। এতক্ষণ সে লোহার কলের জাহাজে ছিল,—স্টিমে চলিতেছিল;—আর সে লোহাব আর কাঠের তৈরি জাহাজ নয়,—সে যে মানব-সভ্যতার ধাত্রী,—যুগে-যুগে, নব-নব যাত্রীদের ক্ষুধিত সিন্ধুর বুক হইতে সেই ত রক্ষা করিয়াছে। সাগরের সহিত লড়াই করিয়া সেই ত দেশের সহিত দেশকে. জাতির সহিত জাতিকে বাঁধিয়াছে! ক্রুদ্ধা সিংহিনীর মত আপন বক্ষের ভীত মানব যাত্রীদের বাঁচাইবার জন্য সে রুখিয়া দাঁড়াইল,—তাহার বক্ষ বিদীর্ণ না করিলে এ মানবযাত্রীদের সে ত্যাগ করিবে না।

ঝড় বহিতে লাগিল, জাহাজ দুলিতে লাগিল। Diana বলিল, "ওঃ, কি কালো মেঘ!"

"বিদ্যুৎবালারা আনন্দে হাসছে আর নাচছে।"

"আর তরঙ্গ-দানবেবা তাদেব সঙ্গে হাত ধরাধরি করে প্রলয়-নৃত্যে যোগ দিয়েছে!"

"আকাশটা বুঝি সাগরের বুকে ভেঙে পড়ে!"

"বড় শীত করছে!—"

কিরণ Dianaকে আরও কাছে জড়াইয়া ধরিল। কে ভাবিয়াছিল, অকূল সমুদ্রে ঝড়ের দোলায় একটি বঙ্গদেশের যুবক ও একটি আইরিশ যুবতী এমন করিয়া হাত জড়াইয়া দুলিবে! অসীম ব্যোমে ভ্রাম্যমাণ একটি তারা যেমন লক্ষ-লক্ষ যুগ ঘুরিতে-ঘুরিতে নিমেষের জন্য আর একটি তারার অতি কাছাকাছি আসিয়া, তার পর আপন পথে চলিয়া যায়,—অনন্তকাল আর তাহাদের দেখা হয় না,—তেমনি কি তাহারা দুজন ক্ষণিকের জন্য অতি পাশাপাশি আসিয়া পড়িয়াছে?

কিছুক্ষণ হইল ঝড় থামিয়া গেছে। কিরণ কেবিনে অসিয়া ঢুকিল। বোতলে জিনিস পুরিয়া নাড়িলে জিনিসগুলো যেমন মিশাইয়া যায়, ঘবের জিনিসপত্র তেমনি মিশাইয়া গেছে। পায়ের জুতা বিছানার উপর উঠিয়াছে, বিছানার বালিশ মেঝেয় লুটাইতেছে।

টেবিলের বই-কাগজ চারিদিকে ছড়ানো। ছন্নছাড়া ঘরের মূর্তিটি দেখিতেছে, এমন সময়ে এক খানসামা আসিয়া তাহার সাম্‌নে দাঁড়াইল। কিরণ অবাক হইয়া তাহার দিকে তাকাইল। এ কি সেই কালো মূর্তি, যে তাহাদের হাত ধরিয়া টানিয়া বাঁচাইয়াছিল? আরও ভালো করিয়া দেখিতে যাইয়া সে আরও বিস্মিত হইল,—এ মুখ যে চেনা!

বলিল "করিম না কি?"

"হাঁ দাদাবাবু।"

করিম তাহার মামার বাড়ির 'বয়' ছিল।

"তুমি?"

"এই জাহাজের কাজ নিয়ে আমেরিকা যাচ্ছি।"

"কেন?"

সে এক বিখ্যাত Cinema-star-এর নাম করিল। তাহাকে দেখিবার জন্য, তাহার কোম্পানিতে তাহার ভৃত্য রূপে অভিনয় করিবার জন্য, সে নিজের গ্রামের জমি বেচিয়া আমেরিকা চলিয়াছে।

"দেশ ছেড়ে বেরিয়েছ,—আজ যদি মরতে?"

"সেই জন্যেই বেরিয়েছি—"

"তুমিই কি আমাদের টেনে তুলেছিলে?"

"আল্লা বাঁচিয়েছেন দাদা বাবু!"

কালো সমুদ্রের উপর কালো মেঘ স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছে। ভগ্ন-ইঞ্জিন মাস্তুলহীন জাহাজের বেগ মন্দ। পূর্ব-তোরণ-দ্বারে উষার নিষ্প্রভ তারার দিকে চাহিয়া কিরণ ভাবিল, জীবনের এই ঝড়ের রাত্রিটি তাহার সকল সুখ-দুঃখ, লাভ ক্ষতি,—সকল চিন্তা-সাধনার বাইরে।

(৬)

কিরণের ডায়ারি হইতে—

ভেনিস,

৩রা-

এই দুই মাস ইটালির নগরের পর নগর ঘুরে-ঘুরে এই ভেনিসে এসে একটু শান্তি পেয়েছি। এই আড্রিয়াটিকের রানি সুন্দরী ভেনিস সাগরের ওপর স্বপ্নের মত উঠেছে। এই সৌন্দর্যময়ীর রূপই বা ক'দিন ভুলিয়ে রাখবে? মুক্তি আমার নেই,—এই জগৎ-জোড়া কারাগারে আনন্দ খুঁজে পাচ্ছি না,—বাংলায় ফিরে যেতে চাই। লীলা, সে কে আমায় এমন করে তাড়ালো? যে কারাগারে বন্ধু রয়েছে, তারি পাশে যে আমার সত্য মুক্তি।

এই তিন দিন ধরে ভেনিসের খালে-খালে, লেগুনে-লেগুনে gondola-য় ঘুরে বেড়িয়েছি, তরঙ্গ-গীত-মুখর সিন্ধু এর পায়ে লুটিয়ে পড়েছে। এর চারিদিকে অবিরাম জলের কলগান উঠছে—তাই দিন-রাত শুনতে ইচ্ছে করে। মোটরের ভক্‌-ভক্‌, গাড়ির খট্‌-খট

ঝন্-ঝন্ শব্দ নেই। পাথরে-বাঁধানো, ধুলো-ভরা পথ নয়। ইন্দ্রধনু-গড়া হারের মত খালের পর খালে একে জড়িয়ে রয়েছে। এই ঢেউ-খেলানো জলের পথের ওপর রাত্রিদিন আলোর ঝলমল, দাঁড়ের ঝপ্-ঝপ্ যাত্রীদের কোলাহল। শতাব্দীর পর শতাব্দী এই জলের দর্পণে রেনেসাঁস্ শিল্পীর আনন্দের সাধনায়-গড়া আপন অপরূপ রূপ দেখিয়া সে কি আপনি মুগ্ধা হইয়া গিয়াছে।

কাল St. Markএর এক কোণে গিয়ে মনে, হল এ জায়গাটা যেন পরিচিত,—বহুদিন আগে যেন এখানে এসেছিলুম! Grand Canal দিয়ে, Rialtoব নিচে দিয়ে, Ducal Palaceএর পাশ দিয়ে যখন সাগরের মাঝে এসে পড়লুম,—সম্মুখে অপ্সরীর মত ভেনিস দাঁড়িয়ে,—তাহার মন্দির-চূড়া, প্রাসাদশ্রেণী স্বচ্ছ, সুনীল আকাশের শুভ্র মেঘ-স্তূপের মধ্যে মিলাইয়া গিয়াছে। ওই হর্ম্যগুলি বুঝি মেঘের মত শুভ্র মুক্তা দিয়া তৈরি। তার পর সন্ধ্যা নামল। রক্তপট্টবসনা সলজ্জা বধূর মত ভেনিস দাঁড়াইল। তাহার পায়ের জল অলক্তকরাগমাখা, তাহার মাথার উপর স্বর্ণ-কেশগুচ্ছ। ধীরে রাত্রি নামিল। চন্দ্র প্রেম-প্রদীপ জ্বালাইয়া সাগরের চিরবধূকে নূতন করিয়া তারার মালা পরাইল।

এই ভেনিসকে আমি যেন স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম,—এত পরিচিত মনে হয়। হয় ত ভেনিসের শিল্পীদলের মধ্যে আমিও ছিলাম। Tinteretto, Titianএর যুগে আমি এখানে জন্মিয়াছিলাম। এই চিরনবীনা নগরী আমাবও সাধনার সৃষ্টি। এই বিংশ শতাব্দী পিছাইয়া গিয়া সেই যুগটা আসে না? যখন গ্রিসের আর্টের আলো, খ্রিস্টের ধর্মেব আলো, দুই আলোব আলোয় ইয়োরোপের দেশে দেশে সকলের প্রাণে-প্রাণে আনন্দের দেয়ালি-উৎসব আরম্ভ হইয়াছিল।

৯ই—

কালো চোখ,—ভেনিস-সুন্দরীদের মন-ভোলানো কালো চোখ,—gondolaয় দুলে দুলে-রঙেব খেলা দেখা,—প্রাসাদগুলোর ছাযার কাঁপন দেখে চোখ দুটো রঙের নেশায় মাতাল হয়ে উঠেছে।

১১ই--

সুন্দবী আর যে ভুলতে পারছি না! আমার মাথার ভেতব যেন পাখির দল উড়ে চলেছে। হাওয়ার মুখে পাখিদের ডানার শব্দের মত সমস্ত দেহের রক্ত যেন কোন্ অশান্ত ছন্দে নৃত্য করছে। বসন্তের শেষে যে হাঁসেব দল মানস-সরোবর ছেড়ে উড়ে চলে যায়, তারা কোন্ অদম্য আবেগের প্রেরণায় যায়, কোন্ অজানা সঙ্গী এই অনন্ত আকাশের মধ্য দিয়া তাহাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়,—সেই অদম্য অজ্ঞাত শক্তির হাতে হাল ছেড়ে দিয়ে ভেসে যেতে চাই।

আর্ট কি শুধু সৌন্দর্যের চর্চা? শিল্পী কি শুধু তরুণী। মুখকে, ফুলের রংকে, আলো আঁধারের লীলাকে আঁকে। এতদিন কেবল বং নিয়ে খেলেছি, সুন্দবীর মুখ এঁকেছি। এবার জগতের দুঃখকে আঁকতে ইচ্ছে করে,—অধীনতার অপমান, পদাহতের অধিকার, নিরন্নের ব্যথা, চাষী-মজুরের কর্মজীবন, পতিতাব বেদনাকে মূর্তিমতী করতে চাই।

জগতের দুঃখ দূর করতে শিল্পী কি করতে পারে? তাহার কাজ জাগানো,—তাহার কাজ আনন্দ-সৃষ্টি। ধরণী যে সুন্দরী,—জীবনের সংগ্রামের পথ যে অপরূপ—এই বোধের দেশকে উদ্বুদ্ধ কবা।

ধনীরা বলে, "ধনই সব চেয়ে বড়, জীবনকে ভোগ কর।" মধ্যবিত্তেরা বলে, "জীবনের দুঃখকে ভুলতে চেষ্টা কর।" ধনহীনেরা বলে, "দুঃখই পৃথিবীর সত্য,—নতশিরে তাহাকে বহন কর।"

আচ্ছা, কোন্‌টা সত্যি? কালিদাসের কাব্য, না একটা লোহার কল? অজন্তার চিত্রশালা, না একটা কয়লার খনি? রবীন্দ্রনাথের গানগুলো, না এক মোটরকার? কোন্‌টা চাই?—র‍্যাফেলের ছবিগুলো, না এক এয়ারোপ্লেন? বৈষ্ণব-পদাবলী, না একটা howitzer? বাউলের গান, না বারুদের কারখানা? দুটোই চাই। কিন্তু মিলের ইঞ্জিনের শব্দের সঙ্গে সেতারের ঝঙ্কার কে বাঁধতে পারে?

১৫ই—

ডাক্‌ছে,—কে আমায় ডাক্‌ছে। বলছে, "শিল্পি, আজ তোমার মেকি লাল নীল রং রেখে দাও—মানুষের রক্তের লাল রং দিয়ে বারুদের কালো রং দিয়ে ইয়োরোপ জুড়ে যে সত্যিকার ছবি আঁকা চলছে, সেইখানে এসে যোগ দাও দেখি?' আমি দেখছি, সন্তানরক্তসিক্তা, যুদ্ধাগ্নিদগ্ধা, অশ্রুময়ী ইয়োরোপ কোন্ নবপ্রভাতের জন্য করুণ নয়নে তাকিয়ে আছে,—দুঃখিনী মাতার দেহ যুদ্ধ-মত্ত জাতির দল ছিন্নবিচ্ছিন্ন করছে,—তাহার শ্যামল অঙ্গ অগ্নিতে পুড়ে গিয়েছে,—স্বর্ণ-অঞ্চল ভস্মীভূত। তাহার কালো কেশ কামানের ধূমরাশিতে মিশিয়া গিয়াছে। তাহার বুকের প্রদীপটি উদ্দাম ঝোড়ো বাতাস হইতে সে সযত্নে রক্ষা করিতেছে। এই মাতা গ্রিসকে আপন স্তন্যদানে পুষ্ট করিয়া ছিল,—রোমকে আপন স্নেহচ্ছায়ায় বর্ধিত করিয়াছিল। আজ অশ্রান্ত বিদ্রোহী সন্তানদের মিলাইবার জন্য পূর্বতোরণ দ্বারে করযোড়ে চাহিয়া তপস্বিনীর মত মঙ্গল-মন্ত্র জপিতেছে।

১৮ই—

কাল সারা রাত ধরে রঙের লড়াই দেখেছি,—সাত রং সাত তুলি মিলে ঝগড়া আরম্ভ করেছে,—সে কি হোলি-খেলা!

লাল বলে, আমি প্রভাতের আকাশের রং, সন্ধ্যার রং সূর্যের রং, আমি রক্তের রং, আগুনের রং, আমি জীবনের রং; আমি অশান্ত জীবনকে নব-নব রূপে বিকশিত, বিবর্তিত করে চলেছি।

নীল বলে, আমি সমস্ত আকাশের রং, সমস্ত সাগরের রং, আমি অনন্ত ব্যোমে, অসীম সিন্ধুতে চিরচঞ্চল।

সবুজ বলে, আমি মাটির গায়েব অঞ্চল, আমি প্রাণের তাজা রং, গাছ-পালা ঘাসকে সুন্দর করি।

কালো বলিল, আমার বুক হইতে তোমরা সব উৎসারিত হয়েছ· আমিই শ্রেষ্ঠ।

এমনি সাত রং-এর এক রামধনু চোখের উপর ঘুরিতে লাগিল! সহসা তাহার মাঝ হইতে

লীলার মুখ পদ্মের মত ফুটিয়া উঠিল। তারপর সাদা রং আসিয়া বলিল, আমি আলোর রং আসিয়াছি—সব কোথায় মিলাইয়া গেল।

২০শে—

Your first duties are to humanity— Mazzini.

এ কি অশান্তি, জীবন-দেবতা! কোথায় আমায় নিয়ে যেতে চাও? আমি যেখানেই যাই, আমি যা কিছু করি,—সব যে ব্যর্থ হচ্ছে। আনন্দ কৈ?

সুখের জন্য আমায় সৃষ্টি কর নি,—দুঃখকে বহন করবার জন্য, মৃত্যুকে বরণ করে জীবনের জয় গাবার জন্য কি আমায় এই সুন্দরী পৃথিবীতে পাঠালে?

দুঃখ-সংগ্রামময় জগতের যজ্ঞে যদি জীবন উৎসর্গ করতে হবে, তবে শিল্পী করে মোহিনী ধরণীর রঙের সুধায় মাতিয়েছিলে কেন?

২১শে—

আচ্ছা, আয়ারল্যাণ্ডটা কেমন? সে কি Dianaর মত রহস্যময়ী, মাধুর্যময়ী, সুন্দরী?

(৭)

"তুই যে কিছু খাচ্ছিস না লীলা?"

"কৈ মা?"

"না মা, অমন করলে চলবে কেন?"

"খেতে যে ভালো লাগে না মা—"

"কি আর করবি মা—"

"তুমিও ত কিছু খাচ্ছ না মা?"

"আমার কথা ছেড়ে দে,—গারদ থেকে তোর দাদার কোনো খবর আসে নি?"

"না মা।"

"হাঁরে, কিরণের কোনো খবর পেলিনি,—সে কোথায় নিরুদ্দেশ হোলো?"

"কৈ না।"

টেবিলের ওই কোণ্‌টায় কিরণ বসিয়া লিখিয়াছিল, "লীলা, তুমি কখনও কি" সেই কোণটার দিকে চাহিলে তাহার মুখে রুটি উ' 'ত না। তাহার উপর কিরণের নাম হওয়াতে সে আর খাবার টেবিলে বসিযা থাকিতে পারিল না। আধ বাটি চা আর অভুক্ত রুটি মাখন রাখিয়া, চোখের জল কোনো মতে চাপিয়া, আপনার ঘরের দিকে ছুটিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে মা ডাকিলেন "লীলা, আজ কি পড়বি নে?"

"যাই মা।"

রোজ বিকালে মা ও কন্যা যখন ছাদে ''সন তখন বলিবার কথা খুঁজিয়া পান না। কোন দিন মার চোখের জলের বান আসে, কন্যা গলা জড়াইয়া সান্ত্বনা দেয়, কোনো দিন কন্যার অশ্রুসাগর উদ্বেলিত হয়, মাতা সান্ত্বনা দেন। এইরূপ অশ্রুসমাচ্ছন্ন দীর্ঘ সন্ধ্যা এড়াইবার জন্য লীলা ঠিক করিয়াছিল, রোজ মাকে কোনো বই পড়িয়া শুনাইবে।

সেই ছাদে সন্ধ্যার সোনালি আলো তেম্‌নি আসিয়া পড়িয়াছে,—শরতের স্বচ্ছ আকাশের পশ্চিম কোণে সূর্য ঢলিয়া পড়িয়াছে। লীলা মার পাশে বসিয়া Browning এর Paracelsus তর্জমা করিয়া শোনাইতে লাগিল।

ঠিক সেই সময়ে আয়ারল্যাণ্ডে Londonderyতে সিন্‌ফিন ও পুলিসের মধ্যে ভয়ানক মারামারি হইতেছিল। কিছুদূরে এক খোলা মাঠের উপর ভাঙ্গা গির্জার মধ্যে কতকগুলি সিন্‌ফিন্ একটি আহতকে লইয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে। এক আইরিশ যুবতী আহতের অচৈতন্য দেহটির ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিতেছিল। ময়লা কালো সার্জের সুট-পরা যুবকের দীর্ঘ দেহ গির্জার ভাঙ্গা মেঝের ওপর শায়িত, হস্তপদ ক্ষতবিক্ষত, দীর্ঘ কুঞ্চিত অসংযত কেশ রক্তমাখানো। মাথাটি চার্চের পাথর হইতে কোলে তুলিয়া যুবতী কাতর স্বরে বলিল, "কই, ডাক্তার এখনো এলেন না?"

চারিদিকে কয়েকটি যুবক উৎকণ্ঠিত হইয়া দাঁড়াইয়া; ধীর স্বরে কথাবার্তা হইতেছিল।

যুবতী আবার বলিল, "গুলিটা কি গভীর ক্ষত করে গেছে?"

"সেই রকম তো বোধ হয়।"

"এঁকে তো আমরা কখনো দেখিনি,—ভারতীয় বলে বোধ হয়।"

"মারামারি ঠিক শুরু হয়েছে—উনি হঠাৎ পেছন থেকে মরিয়ার মত ছুটে পুলিসের মাঝে গিয়ে পড়লেন।"

"এক হাতে একটা ছোট লাল পতাকা, আর এক হাতে ছোটো এক রিভল্‌ভার,—এত পা কাঁপাছিল যে, আমি ভাবলুম, এই বুঝি পড়ে যান।"

"একটা গুলি ছুঁড়তে হয় নি,—উনিই আজকের মারামারিতে প্রথম আহত হন।"

"পুলিশরা ধূলিলুণ্ঠিত দেহ ধরবার জন্যে একেবারে ছুটে এসেছিল।"

মেয়েটির দিকে চাহিয়া একজন বলিল, "আপনি অমন করে ছুটে গিয়ে না তুলে আনলে—"

কিরণ একবার মাথা নাড়িয়া চোখ মেলিল, অস্ফুট সুরে বলিল "লীলা—"

"না, আমি Diana—"

নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে কিরণ চারিদিকে চোখ চাইল, "ও তুমি Diana।" তার পর কম্পিত হস্তে আপন বুকের পকেট হইতে কি বাহির করিতে চেষ্টা করিল,—রক্তহীন হাত অবশ হইয়া পড়িয়া গেল।

Diana পকেটে হাত দিয়া একটি ছবি বাহিব করিল। সেটি Dianaকে model করিয়া আঁকা আয়ারল্যাণ্ডের ছবি। জাহাজের চারিদিকে যেমন ঝড় উঠিয়াছিল, তেমনি তাহাকে ঘিরিয়া ঝড়ের রাত ঘনাইয়াছে,—তাহার মধ্যে কে আলোকের তপস্বিনী অকলঙ্কা ঊষার মত দাঁড়াইয়া।

"উঃ—"

"বড় কষ্ট হচ্চে?"

"না Diana, এমনি যদি বাংলার কারাগারে মরতুম!"

"আমি বাংলাকে ভালবাসি।"

"বেশ সুখে মরছি, লীলা—লী—বাং—লা—"

আর কথা ফুটিল না।

Diana চোখ দুটি বন্ধ করিয়া রক্তমাখা হাত দুটি বুকের উপর জোর করিয়া দিয়া নিজের বুক হইতে ক্রুশ বাহির করিয়া চুম্বন করিতেই, সকল যুবক মৃত্যু-পথিক শিল্পীর চারিদিকে নতজানু হইয়া বলিল। সকলে করযোড়ে প্রার্থনা করিল। প্রার্থনা শেষে Diana অশ্রুমাখা কণ্ঠে বলিল, "প্রভু, ইঁহার মত আমাদের মরিবার শক্তি দাও।"

*আশ্বিন, ১৩২৭*

# জমিদার

## শৈলজা মুখোপাধ্যায়

এক

জমিদার দূরে বাস করিতেন, কাজেই তাঁহার জমিদারির এক প্রান্তে কয়েকখানা ক্ষুদ্র গ্রামে প্রজাশাসন এবং খাজনা আদায় বেশ সুচারুরূপে হইতেছিল না। অধিকন্তু, তৎসংলগ্ন প্রায় ছয়-সাত ক্রোশব্যাপী একটা প্রকাণ্ড শালবনের উৎপন্ন:ফলমূল এবং গাছপালা গ্রামবাসীরাই ভোগ করিতেছিল,—জমিদারের কোন কাজেই লাগিতেছিল না। না লাগিবারই কথা। বৎসরের কিস্তি আদায় করিবার জন্য দুই বার জমিদারের যে কর্মচারী মহাশয়ের সেখানে শুভাগমন হইত, তিনি প্রায় সমস্ত লুট করিয়া নিজ বাড়িতে লইয়া গিয়া, জমিদারকে বুঝাইয়া দিতেন, দরিদ্র প্রজাদের নিকট হইতে কোন কিছু পাইবার প্রত্যাশা করা বৃথা। কিন্তু হুজুর যদি তাহাকে উক্ত তালুকের যে কোন একটা গ্রামে কাছারি-বাড়ি প্রস্তুত কবিয়া নায়েবের মত বাস করিতে হুকুম দেন, তাহা হইলে তিনি অবাধ্য প্রজাগণকে দুরস্ত করিয়া দিতে ত পারেনই, এমন্ কি, এক বৎসরের মধ্যে জমিদারির আয় যদি পূর্বাপেক্ষা কিছু বাড়াইয়া দিতে না পারেন, তাহা হইলে আজীবন বিনা বেতনে গোলামি করিবেন।

জমিদার হুকুম দিলেন।

ফলত, দরিদ্র প্রজাগণের দণ্ড-মুণ্ডের বিধানকর্তা রূপে নায়েব মহাশয় জমিদারিতে সপরিবারে পাইক পেয়াদা সহ বাস করিতে লাগিলেন; এবং উৎকট দরিদ্র-পীড়নের যত প্রকার কূট পন্থা তাঁহার জানা ছিল, তৎসমুদায় প্রয়োগ করিয়া এক বৎসবের মধ্যে জমিদারকে খুশি করিয়া ফেলিলেন; এবং নিজের জন্য যাহা করিলেন, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

শালবনের কয়েকটা বড়-বড় শাল ও মহুয়া গাছ কাটাইয়া, প্রজাদের গরুর গাড়িতে বোঝাই দিয়া নায়েব মহাশয দেশে পাঠাইতেছিলেন। একদা এক চাপরাশি আসিয়া সংবাদ দিল,—হুজুর, জঙ্গলকা ইস্‌তরফ সাঁওতাল লোগন্ সব মোকান বনাইসে,—ডাঙ্গা কাট্‌কে জমি তৈয়ার করছে,—এত না বড়া-বড়া ধানকা গাছ ভি হুয়া জঙ্গলসে লকড়ি ভি কাটতা, শুখা পাতা ভি লয়ে যাচ্ছে, আউর, হাম লোগ ডাকছে তো বাৎমে ভি পিসাব কর দিচ্ছে। .

'জমিদারির মধ্যে বাস করিয়া জমিদারের চাপরাশির হুকুম মানে না, প্রজার এত বড় উদ্ধত প্রতাপ অসহ্য। নায়েব মহাশয় দাঁত মুখ খিঁচাইয়া, চিৎকার করিয়া কহিলেন,—তোম শালা ছাতুখোর লোককে তবে কি জন্যে রেখেছি রে হারামজাদা! সব বেটাকে জোর করে ধরে নিয়ে আয় আমার কাছে,—দেখি কেমন কথা না শোনে।

যো হুকুম হুজুর। বলিয়া চাপরাশি মহাপ্রভু লাঠি লইয়া বাহির হইয়া গেল। কিন্তু সে

জানিত না, যাহাদিগকে সে গায়ের জোরে বাঁধিয়া আনিতে চলিল, ভারতের সেই আদিম অনার্য আধিবাসী হয় ত মিষ্টি কথার গোলাম হইতে পারে, কিন্তু দুনিয়ায় কাহারও চোখ-রাঙানির অনুশাসন মানিয়া চলে না।

শেষ ফল যাহা দাঁড়াইল, তাহা অন্তত প্রবল প্রতাপান্বিত নায়েব মহাশয়ের পক্ষে নিতান্ত অপমানসূচক। প্রায় দশ বারো জন চাপরাশি বড়-বড় লাঠি লইয়া তাহাদিগকে শাসন করিতে গিয়া, প্রথমে তাহাদের দুর্বোধ্য আধা-বাঙলা আধা হিন্দি ভাষায় যে সব কথা বলিল, তাহার এক বর্ণও সাঁওতালগণ বুঝিতে না পারিয়া বলিল, কি বলছিস তুরা, আমরা বুঝতে লাচ্ছি।

বুঝনে নেই সেকেগা তো হাম্‌লোগ কেয়া করেগা হারামজাদা। বসিয়া একজন চাপরাশি এক সাঁওতাল যুবকের কানে ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া কিয়দ্দূর টানিয়া আনিল। এবং তৎক্ষণাৎ ক্ষমতা-প্রাপ্ত অন্যান্য চাপরাশিগণের হস্ত-ধৃত বংশযষ্টিগুলা সমবেত নিরীহ সাঁওতালদের উপর সশব্দে পড়িতে এবং উঠিতে লাগিল।

বিনাদোষে এ অত্যাচার তাহাদের সহ্য হইল না। সম্মুখে যে যাহা পাইল, উঠাইয়া লইয়া, মার মার শব্দে স্ত্রী-পুরুষ সকলে মিলিয়া, জমিদারের চাপরাশিদিগকে ভাগাইয়া দিল।

আগুন জ্বলিয়া উঠিল! সংবাদ পাইয়া নায়েব মহাশয়ের আপাদ-মস্তক রাগে গিস্ গিস্ করিতে লাগিল। কহিলেন,-- আজ আমি নিজে সেখানে যাব,—তোরা যাস্ আমার সঙ্গে।

## দুই

গোধূলি-ধূসর ম্লান সন্ধ্যায় শীতের বাতাস হিল্ হিল্ করিয়া বহিতেছিল। ঘন বিন্যস্ত শাল, তমাল ও মহুয়াবনের বুক চিরিয়া, নাম-না-জানা কত বনফুলের মিষ্ট গন্ধভরা যে সঙ্কীর্ণ বনপথটি আঁকিয়া-বাঁকিয়া অদূরে সাঁওতালপল্লীর নিকট গিয়া পৌঁছিয়াছে, সেই পথ ধরিয়া পাইকপিয়াদা সঙ্গে লইয়া, নায়েব মহাশয় চলিয়াছেন। কঙ্করময় কঠিন প্রান্তরের উপর সোনালি রঙের পাকা ধানের ক্ষেতগুলি প্রথমেই তাঁহার নজরে পড়িল। গায়ের জোরে যে এমন পাথরের উপরেও সোনার ফসল জন্মিতে পারে, এ ধারণা তাঁহার ছিল না। আরও একটুখানি অগ্রসর হইতেই, সম্মুখে সমুন্নত-শীর্ষ তরুরাজির স্নিগ্ধ-শ্যামল ছায়ায় ঘেরা শান্ত সুন্দর ক্ষুদ্র পল্লীর উপর দৃষ্টি পড়িতেই, সেই নৃশংস পাষণ্ডের প্রাণে হিংসা জাগিল। সুস্থ সবল পুরুষ রমণীগণ মনের আনন্দে এমন ভাবে কাজ করিতেছিল, যে, দেখিয়া বিশ্বাস হইল না যে, আজিকার মধ্যাহ্নবেলায় ইহাদেরই মাথার উপর একটা প্রবল অত্যাচারের ঝড় বহিয়া গেছে!

পুনরায় সেই অত্যাচারীর দল এক ভদ্রবেশী যুবককে সঙ্গে লইয়া তাহাদেরই কুটিরের দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া পুরুষ রমণী সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

কয়েকটা কুকুর সমস্বরে ঘেউ-ঘেউ করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিতেই, জনৈক বৃদ্ধ সাঁওতাল তাহাদিগকে চুপ করিবার ইঙ্গিত করিয়া, অগ্রসর হইয়া আসিল।

নায়েব জিজ্ঞাসা করিল, তোরা কতদিন আছিস্ এখানে?

বৃদ্ধ বলিল,—কেনে,...এনেক দিন।

নায়েব বৃদ্ধের প্রতি একটা ক্রোধ কটাক্ষ হানিয়া কহিলেন,—ক' বছর?

—অত সব জানি না। ...কি করতে এসেছিস্ তুই?

—আমার লোকের কথা শুনিস্ নি কেন?

বৃদ্ধ রাগিয়া কহিল,—উয়ারা যদি তুর লোক হয় তাহলে তুখেও মারব। উয়ারা মেরেছে আমাদিকে।... ওরে লখাই, ডোমনা!...

তাহার ডাক শুনিয়া আরও দুইজন সাঁওতাল তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।

নায়েব-মহাশয় একটু জোরে-জোরে বলিলেন, আমি কে জানিস?

বৃদ্ধ কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় একটা চাপরাশি বলিল,—উনি গাঁয়ের রাজা আছেন, জানিস? হামরা উনার চাপরাশি আছি।

ডোম্না বলিল, আছিস্ ত' আছিস্...আমাদের কি?

নায়েব কহিলেন,—তোদিকে আমার গাঁয়ে খাট্‌তে হবে,—জমির খাজনা দিতে হবে।

—ধেৎ, উসব আমরা কখনো করছি নাই,—উসব আমাদের নাই।

একজন চাপরাশি লাঠি লইয়া তাহাদের কাছে আসিয়া বুঝাইয়া বলিল, তাহলে এই জায়গাটি ছোড়ি দিতে হবে।

একজন সাঁওতাল কহিল,—কিস্‌কে? ই জায়গা কারু লয়। আমরা বনের কাঠে ঘর করেছি,—মাটি কেটে জমি করেছি,—চাষ করেছি, তুই কে বেটিস?...যা বাবু, তুই ঘরকে যা।

ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন সাঁওতাল সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। নায়েব-মহাশয় একটু সরিয়া আসিয়া চাপরাশিদিগকে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, চলে আয় সব,—এর পর আর একদিন দেখা যাবে।

...প্রতিপদের চাঁদ উঠিতে তখনও একটুখানি দেরি ছিল! চারিদিকের ধূসর আকাশ গাঢ় হইয়া আসিয়াছে!

বনের পথে প্রবেশ করিয়া নায়েব দেখিলেন, পশ্চাতে ঘন গাছের সারি ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। পকেটে গুলিভরা পিস্তলটা একবার হাত দিয়া দেখিয়া লইলেন।

যে পথ ধরিয়া তাহারা চলিতেছিল, সেই পথে এক সাঁওতাল যুবতী মাটিব কলসে জল লইয়া গৃহে ফিরিতেছিল। হঠাৎ বনের মাঝে এতগুলা লোক দেখিয়া, এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। সামান্য ঘোলাটে অন্ধকারে মেয়েটাকে বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। নায়েব দুইজন চাপরাশিকে হুকুম করিলে,—লে আও জলদি।...দেখো, চিল্লায় মাৎ।

আজ্ঞা পাইবামাত্র চাপরাশি দুইজন মাথার পাগড়ি খুলিয়া অতর্কিতভাবে রমণীর মুখে চাপিয়া ধরিতেই তাহার বাকস্ফূর্তি হইল না। তাড়াতাড়ি আর একটা পাগড়ি দিয়া তাহার হাতে পায়ে বাঁধিয়া একজন তাহাকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া নিবিড় বনের পাতার ভিড়ের ভিতর কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। অপর একজন যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে তাহার পশ্চাতে চলিল।

অন্যান্য সকলকে লইয়া নায়েব মহাশয় ধীরে ধীরে রাস্তা ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। একজন কলসিটা বনের ভিতর ভাঙিয়া দিয়া আসিল।

নায়েব, বাড়ি ফিরিয়া দেখিলেন, তাহারা ইতিমধ্যে মেয়েটাকে লইয়া বৈঠকখানায় বন্দিনী অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়াছে এবং হুজুরের অপেক্ষায় দরজায় বসিয়া বসিয়া গল্প করিতেছে।

## তিন

বৈঠকখানা বাড়িতেই মদ আসিল,—পানপাত্র আসিল। নায়েব-মহাশয় একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন লইয়া সেইখানে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই হাতের আলোটা তুলিয়া ধবিয়া মেয়েটার দিকে একবার কটাক্ষপাত করিয়া দেখিয়া লইতেই চমকিয়া উঠিলেন। সাঁওতাল যুবতীর ভরা যৌবনের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ঢল-ঢল কান্তি এবং রূপ লাবণ্য দেখিয়া এই মদ্যপায়ী পাষণ্ডের চমকিয়া উঠিবারই কথা।

পরিপূর্ণ একটা মদ্যপাত্র গলাধঃকরণ করিয়া, পকেট হইতে গুলিভরা পিস্তলটা উঠাইয়া লইয়া একবার আলোর নিকট ধরিয়া মেয়েটার দিকে নলটা বাঁকাইয়া ধবিয়া কহিলেন, খবরদার একটি কথা কইবি কি গুলি করে ফেলব। আমি তোর মুখের বান্ধন খুলে দিচ্ছি। বলিয়া বাম হাত দিয়া মুখের কাপড়টা খুলিয়া ফেলিতেই মেয়েটা কহিল, তুই কেনে আমাকে ধরে আন্‌লি বাবু? ...

মেয়েটা জোর কবিয়া সরিয়া গিয়া কহিল, খবরদাব।

ইস্ আমার উপর চোখ রাঙানি বুঝি? বলিয়া, পিস্তলটা পুনরায় তাহার দিকে উঠাইয়া ধরিতেই, একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে, তাহাকে গিন্নি-মা একবার ডাকিতেছেন।

গিন্নিকে ভয় তিনি যথেষ্ট করিতেন। মদের নেশা একটুখানি চটিয়া গেল। ভৃত্যের পশ্চাৎ বাহির হইয়া, একটা চাপরাশিকে ডাকিয়া বৈঠকখানার দরজার দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া কহিলেন,—যাও।

...গিন্নির কানে কি প্রকারে যে এ সংবাদ গিয়া পৌঁছিয়াছিল, তাহা তিনি ঠাহর করিতে পারিলেন না; কহিলেন, —কি খবর?

মাতাল স্বামীকে একটু তিরস্কার করিয়া গিন্নি কহিলেন, লজ্জাও করে না তোমার, ছিঃ!

তাঁহার আদেশ অমান্য করিয়া সমস্ত রাত্রির মধ্যে একটিবার মাত্র নায়েব মহাশয় বাড়ির বাহির হইতে পাইলেন না।

...পরদিন অতি প্রত্যূষে নায়েব শয্যাত্যাগ করিয়াই দেখিলেন সাঁওতাল পুরুষ-রমণী বালক-বালিকায় তাঁহার উঠানটা প্রায় ভরিয়া গেছে। তাহাদের প্রত্যেকের হাতে তির ধনুক। নায়েবকে দেখিবামাত্র তাহারা সমস্বরে কহিয়া উঠিল, আমাদের টেবিকে তুই ধরে এনেছিস্,—দে, বার করে দে। তা না হলে বুখে বিঁধেই মারব।

নায়েবের মনে-মনে ভয় হইল। ভৃত্যকে আদেশ দিলেন চাপরাশিদিগকে চুপি চুপি বল, তারা যেন মেয়েটাকে ছেড়ে দ্যায়।

চাপরাশিদিগকে বলিতে হইল না; মেয়েটা তালা বন্ধ বৈঠকখানা ঘরের মধ্যেই বন্ধন-মুক্ত অবস্থাতেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সাঁওতালদের গোলমাল শুনিয়া সে নিজেই ভিতর হইতে চিৎকার করিয়া কহিল,—আমি এইখানে আছি।

সকলে মিলিয়া দরজার কবাট দুইটা টানিয়া ছাড়াইয়া টেবিকে উদ্ধার করিল। টেবি সাঁওতালি ভাষায় তাহার পিতাকে যাহা কহিল, তাহা শুনিয়া সকলে রাগে ফুলিতে লাগিল এবং কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া তাহাকে লইয়া কাছারি ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

পথে একজন মুরুব্বি গোছের সাঁওতাল টেবির বাবার কানে-কানে চুপি চুপি কহিল,—তাহলেও টেবির কি দণ্ড জানিস্?

কন্যার শাস্তির কথা শুনিয়া, পিতার বুকখানা ধড়াস করিয়া উঠিল, কহিল,—কি দণ্ড?

—উয়ার বেঁচে থাকা আর মরে' যাওয়া দুই-ই সমান। উয়াকে কাঁড়ে বিঁধে মেরে দিব।

টেবির পিতা লখায়ের মুখখানি শুকাইয়া গেল! কহিল,—যা করবি কর—আমি কিছুই জানি না।

....সন্ধ্যার পর, টেবিকে বনের একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষে বাঁধা হইল। লখাই এ ভয়াবহ দৃশ্য দেখিতে পারিবে না বলিয়া দূরে সরিয়া গেল।

একজন সাঁওতাল যুবকের উপর বিষাক্ত তির বিঁধিয়া টেবিকে হত্যা করিবার ভার দেওয়া হইল।

যুবক টেবির মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, না, আমি লার্‌ব।

অবশেষে এক প্রৌঢ় সাঁওতাল নিজে তীক্ষ্ণ-ধনুক তুলিয়া লইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে টেবির বক্ষের উপর বিষ-বাণ বিদ্ধ করিল। কিছুক্ষণ পরে টেবি গাছের গায়ে লুটাইয়া পড়িল।

সকলে মিলিযা শুকনো গাছ কাটিয়া গহনবনের কোন এক নিভৃত স্থানে টেবির চিতা জ্বালাইয়া তাহার শেষ চিহ্নটুকুও লোপ করিয়া দিয়া আসিল।

আগুন জ্বলিয়া উঠিল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই বনের বোঙার (দেবতার) পূজা দিয়া চিতার অঙ্গার লইয়া শপথ করিল, এ অত্যাচারের প্রতিশোধ না লইলে তাহাদের শান্তি নাই। রাজার যে কোন লোক তাহাদের ত্রি-সীমানা মাড়াইবে, তাহাকেই এই টেবিব মত নিষ্ঠুর ভাবে বিষাক্ত বাণে হত্যা করা চাই।..

সম্মুখে প্রজ্জ্বলিত চিতার উপর এক নিরীহ যুবতীর শবদেহ,—চারিদিকে গভীর অবণ্য। মাথার উপরে আকাশ ভরা নক্ষত্র। সর্দার আর একবার ভাল করিয়া সকলকে প্রতিজ্ঞার কথা শুনাইয়া দিল। একে একে সকলেই তির-ধনুক স্পর্শ করিয়া পুনরায় শপথ-বাণী উচ্চারণ করিল। স্তব্ধ বনানী শিহরিয়া উঠিল। বনেব ধারে যে সব শৃগাল ডাকিতে শুরু করিয়াছিল, তাহারা ভয়ে ভয়ে সরিয়া গেল।

## চার

সেদিন বনে কাষ্ঠ কাটিতে গিয়া সাঁওতালদের গুপ্তবাণে নায়েবেব এক চাপরাশির মৃত্যু হইল। কোথা হইতে কোন্ দিক দিয়া যে বাণটা আসিয়া গায়ে লাগিল কেহ ঠাহর করিতে পারিল না।

তাহার পর একদা এক অন্ধকার গভীর নিশীথে নিরীহ সাঁওতালদের এই কুঞ্জ-কুটিরগুলি সহসা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। পাতার কুঁড়ে নিমিষেই পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। নিকটে জল ছিল না, আর থাকিলেই বা এই অন্ধকার বনানী-প্রান্তে মাটির কলসি দিয়া জল আনিয়া এক সঙ্গে এতগুলা ঘর তাহারা কেমন করিয়া বাঁচাইবে? স্ত্রী-পুত্র কন্যা লইয়া সকলেই নিজ নিজ প্রাণ বাঁচাইবার জন্য উন্মুক্ত প্রান্তরের উপর আসিয়া দাঁড়াইল।—এই আলোক উদ্ভাসিত বনপ্রান্তে দাঁড়াইয়া স্বচক্ষে এই বিরাট অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া মনের বেদনা মনে-মনে চাপিয়া রাখা ব্যতীত আর কোন উপায় ছিল না।

সর্দার বলিল,—ইখানে থেকে আর কি করবি,—চল।

ব্যথিত স্বরে সকলেই বলিল,—চল।

গৃহহীন নিঃসম্বল অনন্ত পথযাত্রীর মতন তাহারা বনের ধারে ধারে সরু পথ ধরিয়া চলিতে শুরু করিল।

কোথায় তাহাদের পথচলার শেষ এবং কোথায় তাহাদের রাত্রি প্রভাত হইবে, আবার কোথায় কার নিরুপদ্রব জঙ্গলের ধারে এই স্বাধীন-চেতা আত্মবিশ্বাসী অনার্যের দল কুটির বাঁধিবে, ভগবান জানেন!

কিন্তু একটা লোক পশ্চাতে পড়িয়া থাকিল। যে টেবিব বাবা লখাই।

বনের ভিতর যেখানে তাহার কন্যাকে হত্যা করা হইয়াছিল এবং যেখানে তাহাকে পুড়াইযা নিঃশেষ করিযা দিয়া আসিযাছে, সমস্ত রাত্রিটা উন্মত্তের মত লখাই 'মা' 'মা' বলিয়া সেই স্থানে ছুটিয়া বেড়াইল।

পরদিন প্রভাতে নাযেবের লোক আসিয়া দরিদ্র পীড়নেব এই বীভৎস চিহ্নটুকু দেখিয়া গেল। আগুনেব তেজে গাছগুলা ঝলসিয়া গিয়াছে,—তখনও জ্বলন্ত আগুনের ফিনকি বাতাসে উড়িয়া সেই ভস্মস্তূপের উপর খেলা কবিতেছিল। বৈকালে পাকা ধানগুলি কাটিয়া গাড়ি বোঝাই করিয়া জমিদারের সরকারী খামারবাড়িতে গিয়ে উঠিল।

দিন দুই পরে, গ্রামময় রাষ্ট্র হইল, নায়েবেব ছয সাত বছরের কন্যাকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

কেহ বলিল, সাঁওতালেরা চুরি কবিয়া লইয়া গেছে। কেহ বলিল জলে ডুবিয়াছে। কেহ বলিল, বাঘে খাইয়াছে। চাবিদিকে নানা লোকের মুখে মুখে এইরূপ জনরব উঠিল। দিকে দিকে তাহার সন্ধানে লোক ছুটিল। জেলেরা পুকুরে জাল ফেলিযা সন্ধান কবিতে লাগিল।

নায়েবের স্ত্রী স্বামীকে শুনাইয়া বলিলেন, মেয়ে যাবে না? তোমার সর্বস্ব যাবে। যে অত্যাচার আরম্ভ করেছ, ভগবান সইবেন কেন?

* * *

পরদিন সন্ধ্যার অন্ধকাবে গা ঢাকিয়া লখাই কাছারির দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল,—তাহার কোলে নায়েব মহাশয়ের অপহৃতা কন্যা!

ভৃত্য দৌড়িয়া ঘরের ভিতব সংবাদ দিল। নায়েব ও নায়েবের গিন্নি ছুটিয়া প্রাঙ্গণের

উপর আসিয়া দাঁড়াইতেই লখাই মেয়েটিকে ধীরে-ধীরে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া বলিল,—আমিই চুরি করে নিয়ে গিইছিলুম। লে, ফিরে লে। মন করলেই উয়াকে খুন করে দিতে পারথম, কিন্তুক না, আমার সর্বনাশ করেছিস,—সেই ভাল।

নাযেব ফ্যাল ফ্যাল কবিয়া বৃদ্ধের মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন। মেয়েটা ছুটিয়া গিয়া মায়ের কোলে উঠিল।

লখাই কহিল,—উয়াকে খেতে দেগা যা। কাল আর আজ সারাদিন বনের ফল আর জল খেঁয়ে আছে।

লখাই পশ্চাৎ ফিরিয়া চলিয়া যাইতেছিল; তাঁহারও উপবাস-ক্লিষ্ট দেহে আর শক্তি ছিল না।

নায়েবের স্ত্রী কহিলেন, ওগো, ও বেচারাকে কিছু খেতে দাও, আব আমি ওকে শ'খানেক টাকা দিচ্ছি।

কথাটা লখাইএর কানে গিয়াছিল; চলিতে-চলিতে কহিল,—না না, তুর মতন বাজার কাছে কিছু লিতে নাই রে—কিছু চাই না আমরা। তুই আমাকে খুব দিয়েছিস্ রাজা!

তাহাব বেদনার্ত কণ্ঠে কান্নার সুর বাজিযা উঠিল। উর্ধ্বে একটা হাত তুলিযা লখাই বলিল—ইয়াব ফল বোঙার (দেবতার) কাছে একদিন হাতে-হাতে পাবি ভুরা! বলিয়া যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে নামিয়া—লখাই দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল।

*আষাঢ়, ১৩৩০*

## ॥ ডিটেকটিভের গল্প ॥

### সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

রবিবারের সকাল ...

প্রোফেসর সত্যশরণের ঘরে জমাট আসর...রবিবার-সকালের বাঁধা রুটিন। সে আসরে সদ্য-ফোটা আধুনিক কবি তরুণকান্তি থেকে পেন্‌সনি-ডেপুটি রায় বাহাদুর পর্যন্ত...পদমর্যাদা ভুলে সাম্য-মৈত্রীর ঢালা-বিছানা পেতে এক হয়ে মিশে বসেন।

পাশের বাড়ির পুলিশ অফিসার শান্তি সেন বললেন—কালকের কাগজে ঐ ট্রেন-খুনের খবর পড়েছেন কেউ? উকিল চিত্তবিহারী বললে—ইয়েস্ ঐ মার্চান্ট-প্রিন্স তালুকদারের কথা বলচেন তো? ঐ আসাম-মেলে?

—হ্যাঁ।

তরুণকান্তি বললে—কমুনাল ব্যাপার! ভদ্রলোক ছিলেন একা ফার্স্টক্লাশ কামরায়। রানাঘাটে ট্রেন থামলে একটা কুলি কি করে' তাঁকে দেখে—বেঞ্চের নিচে মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছেন। দেখে সে-ই দেয় রেল-পুলিশকে খবর!

কমুনিস্টদলের বীরেন রায় ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে—কমুনাল বলে রায় দিলে যে...হেতু?

তরুণকান্তি বললে—না হলে দেখুন না, তাঁর কাগজপত্র এতটুকু তছনছ নয়—হাতের ঘড়ি, আংটি, পকেটের পার্শ...কোয়ায়েট ইন্‌ট্যাক্ট! খুনের মোটিভ শুনি?

ললাটে ভ্রূকুটি-রেখা...বীরেন বললে—মোটিভ খুঁজে পেলেনা, অতএব কমুনাল! চমৎকার! তোমরাই আরও এমনি মনের বিষে কমুনাল বিষটাকে জমিয়ে রাখো!

এমনি বাদানুবাদের মধ্যে শান্তিময় সেনকে উদ্দেশ করে প্রোফেসর সত্যশরণ প্রশ্ন নিক্ষেপ করলেন—ব্যাপারখানা খুলে বলো তো শান্তি!

শান্তি সেন বললে —খবরের কাগজটা আপনি একবার পড়ে দেখুন...তারপর...

—বেশ!

সত্যশরণ কাগজ পড়লেন; পড়ে বললেন—এতে শুধু খবর দেখছি আসাম-মেল রানাঘাটে পৌঁছুলে একটা কুলি দেখে, কামরার কোণের সিটের নিচে ভদ্রলোক মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছেন। তারপর পুলিশ এলো, এসে দেখে—ভদ্রলোকের ডান-রগে চোট্...অথচ কামরার মধ্যে কোনো অস্ত্র পাওয়া যায়নি।...এর পরে?

এ প্রশ্নটা তিনি সকলকে লক্ষ্য করেই বর্ষণ করলেন।

শান্তি সেন বললে—আমার অভিজ্ঞতা থেকে নানা রকম অনুমানই করতে পারি...কিন্তু সে অনুমান মিথ্যা হবে, কারণ প্রমাণের নামগন্ধ এখনো কিছু পাওয়া যায়নি!

প্রোফেসর বললেন—হুঁ! শুধু অনুমান! কিন্তু ফ্যাক্ট ছাড়া কল্পনার উপর অনুমান খাড়া

করা চলে না! বাজে অনুমানে পৃথিবীতে নিত্য কত অবিচারই না চলেছে।...আচ্ছা, আমি কতকগুলো কথা বলি...খবর যা পাচ্ছি তা থেকে বুঝছি যে—খুনি সে ঐ ট্রেন রানাঘাটে থামবার আগেই সরে পড়েছে...তার অস্ত্রসমেত। কুলি যখন দেখে, তখন কামরার দরজা বন্ধ ছিল কি খোলা ছিল, সে খবর আমরা পাচ্ছি না। আচ্ছা, এমন তো হতে পারে, ভদ্রলোক কামরার জানলা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে কিছু দেখছিলেন সেই সময় লাইনের ধারে কোনো শক্ত জিনিসের সঙ্গে রগে লাগল ধাক্কা! মাথার ডানদিকে চোট্...উনি বসেছিলেন এঞ্জিনের দিকে মুখ করে'!...এ পর্যন্ত...হুঁ...কিছু না হে, এ থেকে কোনো অনুমান করতে আমি রাজি নই! তুমি কি বলো শান্তি?

মৃদু হেসে শান্তি সেন বললে—আমি ও নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাইনি। ...পুলিশ-তদারকিতে কিছু খবর বেরুক তখন আমি চিন্তা করবো।

একটু চিন্তিতভাবে সত্যশরণ বললেন—তা ঠিক। তবে ব্যাপারটা বেশ মিস্টিরিয়স্ মনে হচ্ছে।

তরুণকান্তি চাইলো গোবর্দ্ধন ঘোষের দিকে। গোবর্দ্ধন ঘোষ এ-যুগের পসারওয়ালা ডিটেকটিভ উপন্যাসের লেখক...সে-সব উপন্যাস লিখে অজস্র পয়সা রোজগার করছে। উপন্যাসের মালমশলা কতক সংগ্রহ করে শান্তি সেনের কাছ থেকে—তারপর তাতে রঙ চড়ায়,...আইন-কানুন জানে না, ইগনরান্স ইজ ব্লিস্...অবাধে কলমের ডগায় থ্রিল্ কাবিয়ে চলে! বলে—মানুষ পড়তে পড়তে ভোঁ হয়ে যাবে...আইন-কানুনের তোয়াক্কা রাখবে না!

গোবর্দ্ধনের দিকে তাকিয়ে তরুণকান্তি বললে—তুমি কি বলো হে গোবর্দ্ধন? তুমি তো ক্রিমিনলজিতে এক্সপার্ট! শ্লেষের জ্বালা দু'চোখে ভরে' গোবর্দ্ধন নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলো শুধু তরুণকান্তির দিকে...কোনো জবাব দিলে না!

পরের বুধবার সন্ধ্যাবেলা। প্রোফেসরের ঘরে রেগুলার আসর।

পেন্সনি ডেপুটি রায় বাহাদুর উপনিষদ পড়ছেন...চাকরি-জীবনে পুলিশকে তুষ্ট রাখতে বিচারের নামে অবিচারের বহু পাপ সঞ্চয় করেছেন, উপনিষদের শ্লোকে সে পাপের কতক যদি স্খালন হয়—পরলোক যদি থাকে, সেখানে এ পাপের জন্য নিগ্রহ ভোগ যদি উপনিষদের ছোঁয়ায় লঘু হয়...

একটি শ্লোকের ছত্র নিয়ে তিনি আলোচনা জমিয়ে তুলেছিলেন, এমন সময় শান্তি সেন এসে দেখা দিলেন—এসেই বললেন প্রোফেসরকে লক্ষ্য করে—সেই ট্রেন মার্ডার!... মার্চান্ট-প্রিন্স তালুকদার...মনে আছে?

স্তম্ভিত নিশ্বাসে সকলে তাকালো শান্তি সেনের পানে...উপনিষদের জটিল অরণ্য ছেড়ে থ্রিলের রোমাঞ্চ রেখা!

শান্তি সেন বললে—আমার উপর তদারকের ভার পড়েছে!

সত্যশরণ শান্তকণ্ঠে বললেন—বটে!

শান্তি সেন বললেন—রেল-পুলিশ যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করেছে বলি...আগ্রহের ভারে ঘর হল স্তব্ধ...সকলের চোখে কৌতূহল উজ্জ্বল শিখায় ঝক্‌ঝক্ করে উঠল।

শান্তি সেন বললেন—তালুকদারের ঐশ্বর্য অগাধ হলেও সংসার প্রায় শূন্য! স্ত্রী নেই,...একটিমাত্র ছেলে...ছেলেকে তিনি কারবারে ঢুকিয়েছেন—তবে ছেলে চলে নিজের গোঁ-ভরে...বাপের ওপর খুব ভক্তিশ্রদ্ধা আছে, তা নয়, তবে বিরোধও নেই! বহু বিষয়ে বাপের সঙ্গে ছেলের মতবিরোধ...এ-বিরোধ ব্যবসার ক্ষেত্রে নয়...সামাজিক আচার-ব্যবহারে। ছেলের নাম বিনয়...বয়স ত্রিশ-বত্রিশ—এখনো বিবাহ হয়নি!...ছেলের জবানবন্দি নিয়েছে রেল-পুলিশ। ছেলে বলেছে, ঐ আসাম-মেলেই সে সেদিন বারাকপুরে যায়—সেদিনটা বারাকপুরে থেকে পরের দিনে বেরিয়ে নৈহাটি ব্যাণ্ডেল হয়ে বর্দ্ধমানে যাবার কথা...তারপর বর্দ্ধমান থেকে হাজারিবাগ!...শিকারের উদ্দেশে। বারাকপুর স্টেশনে এসে খবরের কাগজ পড়ে বাপের এই অপমৃত্যুর খবর পায়,—তার ফলে বর্দ্ধমানে যাওয়া বন্ধ...ছেলে তখনি বাপের সন্ধানে কলকাতায় আসে...বাপের লাশ তখন কলকাতায় এসেছে পোস্ট-মর্টেমের জন্য! ছেলে বিনয় আরও বলেছে, বাপ তালুকদার আসাম-মেলে শিলঙ যাচ্ছিলেন—পনেরো দিনের জন্য...জাস্ট ফর এ চেঞ্জ!...এ ছাড়া আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি!

সত্যশরণ বললেন—তোমার ফার্স্ট মুভ এখন?

শান্তি সেন বললেন- -তাঁর বাড়িতে গিয়ে সকলকে প্রশ্ন করা...কে শত্রু ছিল? অফিসে কাকেও তাড়া দিয়ে ডিস্‌মিস করেছেন, কিম্বা.. তাঁর মুখের কথা লুফে নিয়ে থ্রিলার লেখক গোবর্দ্ধন বললে—তালুকদার-মশাই উই-ডোয়ার যখন—নিশ্চয় তখন প্রণয়-ঘটিত কোনো রকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা!

গোবর্দ্ধনের পানে তাকিয়ে তরুণকান্তি বললে -তুমি এর মধ্যে তোমার "তালুকদার খুন" উপন্যাস লিখতে শুরু করে' দেছ—এ্যাঁ?

এ কথায় চকিতে সঙ্কুচিত হয়ে গোবর্দ্ধন বললে—ঐ তো...সব তাতেই ঠাট্টা! এভরি-ডে লাইফ নিয়ে আমি কস্মিনকালে নভেল লিখিনা।

সঙ্গে সঙ্গে তরুণকান্তির টিপ্পনী—ঠিক কথা! লাইফের পরিচয় নেবার জন্য যে চোখ আর যে মনের দরকার, তোমার মতো লেখক ও দুটি বস্তু থেকে যে চিরবঞ্চিত!

—তার মানে? গোবর্দ্ধন রুখে উঠল যেন!

তরুণকান্তি সহজ কণ্ঠে বললে—ফুলস্ রাশ ইন্ হোয়্যার এঞ্জেল্‌স্ ফিয়ার টু ট্রেড!

সত্যশরণ বাধা দিলেন, গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—আঃ, কি ছেলেমানুষি কর তোমরা! আর দুদিন পরে. .

শান্তিময় এসে আবার রিপোর্ট দাখিল করলেন—তালুকদারের পুত্র বিনয় যখন আসাম-মেলে গিয়ে ওঠে, তখন আসাম-মেল সদ্য প্ল্যাটফর্ম ছাড়তে শুরু করেছে...বিনয় তালুকদার গার্ডের কামরার ঠিক আগে যে থার্ডক্লাশ কামরা, তার ফুটবোর্ডে উঠে দরজা ঠেলে কামরার মধ্যে ঢোকে-- তার হাতে ছিল ছোট এ্যাটাচি আর একটা বন্দুকের বাক্স! সে যে ব্যারাকপুরে নেমেছিল, তার কোনো প্রমাণ মেলেনি। বিনয়কে প্রশ্ন করায় সে বলে, ব্যারাকপুরে নেমেছিল, নেমে কোথায় গিয়েছিল এবং সে রাতটা ওখানে কার বাড়িতে ছিল, সে সম্বন্ধে

সম্পূর্ণ নীরব। সে সম্বন্ধে বিনয় কোনো কথা বলবে না—অসম্ভব জেদ,... বলে, না বলার জন্য তাকে যদি পুলিশ খুনের চার্জে সন্দেহবশে গ্রেফতার করে, সে তাতে সাবমিট্ করবে।... আর একটি খবর জানা গেছে, তালুকদারের এক বন্ধু মহেন্দ্র মিত্র তালুকদারের হাতে প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে যান...মৃত্যুর সময় এ টাকাটা তালুকদার তার ব্যবসায় খাটাবে বলে। মহেন্দ্র মিত্রের বিধবা স্ত্রী আছেন এবং একটি মেয়ে আছেন...মেয়েটির বিবাহ হয়নি। বিনয় চায় সেই মেয়েকে বিবাহ করতে—বাপ তালুকদার এ-বিবাহ কিছুতে হতে দেবেন না বলে' ধনুর্ভঙ্গ পণ করেছিলেন। ছেলেকে শাসিয়েছিলেন এ বিবাহ করলে বিনয়কে তিনি ত্যাজ্যপুত্র করবেন—একটি পাই-পয়সা দেবেন না! এবং মহেন্দ্র মিত্রের যে টাকা তাঁর ব্যবসায় খাটছে, সে টাকা তখনি ফেলে দেবেন! এই ব্যাপার নিয়ে বাপে-ছেলেতে বিরোধ—এমন বিরোধ যে দুজনে বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ! যেদিন ঐ আসাম যাত্রা, সেদিন বেরুবার আগে মহেন্দ্র মিত্রের মেয়ের ব্যাপার নিয়ে দুজনে ভয়ানক একটা শিন্ হয়েছিল বাড়িতে। বাড়িতে যে সরকার আছেন—দীননাথ...বহুকালের পুরোনো কর্মচারী—সেই দীননাথকে বহু জেরা করে' জানা গেছে, কর্তা বিনয়কে বলেছিলেন, মণিমালার সঙ্গে বিনয়ের নিত্য দেখাশুনা চলেছে, এ খবর তিনি পেয়েছেন—এবং মণিমালার বিবাহের জন্য কর্তা একটি পাত্রও ঠিক করেছেন—শিলঙ থেকে ফিরে সেই পাত্রের সঙ্গে তিনি দেবেন মণিমালার বিবাহ! এ কথায় বিনয় যেন ক্ষেপে ওঠে এবং দুজনে ভয়ানক বাগবিতণ্ডা চলে!

গোবর্দ্ধন প্রশ্ন করলে—মণিমালা বুঝি ঐ মহেন্দ্র মিত্রের মেয়ে?

শান্তিময় বলেন—হ্যাঁ।

তাচ্ছিল্যভরা কণ্ঠে গোবর্দ্ধন বললে—হুঁ! তাহলে তো মিস্ট্রি ইজ ক্লিয়ার...এ্যাজ ক্লিয়ার এ্যাজ ডেলাইট!..প্রণয়ে বিঘ্ন—শিলংয়ের পথে বিনয় তাই বিঘ্ন-বিমোচন করেছে! ঐ যে বন্দুক নিয়ে বেরুলো...এর ঐ একটিমাত্র অর্থ!

পেন্সনি-ডেপুটি রায় বাহাদুর বললেন—বিনয় তালুকদারকে এখনো এ্যারেস্ট করনি শান্তি?

শান্তি সেন বলেন—না!

পেন্সনি রায় বাহাদুর যেন আকাশ থেকে পড়েছেন, এমনি বিস্ময়-বিহ্বল তাঁর ভাব! বললেন—অন্যায়! সেক্সন্ ফিফটি ফোর তোমার সহায় রয়েছে...আর ঘটনাচক্রও যখন এমন...

সত্যশরণ বললেন—এ থেকে সন্দেহ জাগবার হেতু?

পেন্সনি রায় বাহাদুর বললেন—ছেলের লাভ-এ্যাফেয়ার, বাপের বাধা,...ঘটনার খানিক আগে ঝগড়া...তারপর এক ট্রেনে যাত্রা...ছেলের হাতে বন্দুক...এবং...

সত্যশরণ বললেন—মানছি, কিন্তু সে বন্দুক থেকে কখন কোথায় গুলি ছুটলো বাপকে লক্ষ্য করে'...তার তো কোনো সন্ধান মিলছে না!

পেন্সনি রায় বাহাদুর বললেন—সে সন্ধান মিলবে ছেলেকে গ্রেফতার করে' হাজতে আটকে রাখলে.. মার্ডার চার্জ...নন বেইলেবল্ অফেন্স! ছেলে প্রমাণ দিক, সে মারেনি...তার বন্দুকের গুলিতে বাপের মৃত্যু হয়নি।

রিটায়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট এ্যাণ্ড সেশন্ জজ মাখন দত্ত দুটি চক্ষু বিস্তারিত করে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—বাট্ দি ওনাস্ ইজ উইথ ইউ...বিনয় আসামি...সে কোনো কথা বলতে বাধ্য নয়...দ্যাট্স ল!

পেন্সনি ডেপুটি উষ্মাভরে বললেন—রেখে দিন আপনার ল! সিভিল কোর্টে ল'য়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করে' চলেন—ক্রিমিনালে তা চলে না। ক্রিমিনালে শুধু ধরো আর মারো!...পুলিশ যাকে ধরে চালান দিচ্ছে তাকেই আমি চিরদিন সাবড়ে এসেছি...এমন সাবাড় যে আপিলেও সে সাবড়ানির ঘাবড়ানি চলেনি! অত আইন দেখতে গেলে কি এ্যাডমিনিস্ট্রেশন্ চালাতে পারত ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট।

তরুণকান্তি বললে—যা বলেছেন রায় বাহাদুর, আপনাদের এমনি বিচার-মহিমার জন্যই সেকালে একটা কথা ছিল বটে ডেপুটিদের সম্বন্ধে যে—নো কনভিকশন, নো প্রোমোশন। কিন্তু কালের চাকা আজ ঘুরে গেছে, রায় বাহাদুর!

সত্যশরণ বললেন—বাজে কথা যাক—তুমি খোলা-মন নিয়ে এ্যাণ্ড উইথ নো প্রেজুডিস্ তদন্ত কর শান্তি! একজন নিরীহ মানুষের জীবন গেছে দুর্বৃত্ততার ফলে সত্য, কিন্তু তা বলে এর জন্য আর একজন নিরীহের নির্যাতন আব হত্যা—এর সমর্থন চলে না!

শান্তি সেন বললেন—নিশ্চয়! পুলিশে চাকরি করছি বলে কসাই হতে হবে, এর মানে বুঝি না!

তরুণকান্তি চাইল গোবর্দ্ধনের পানে—গোবর্দ্ধন স্তব্ধ—তার মাথার মধ্যে যেন কল্পনার তরঙ্গ বয়ে চলেছে! তরুণকান্তি বললে—তুমি বলে দাও গোবরচন্দ্র...এ-সবের হদিস তো তোমার নখদর্পণে...চ্যাপটারের পর শুধু চ্যাপ্টার খুলে যাওয়া।

গোবর্দ্ধন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো তরুণকান্তির পানে...সত্যশরণ দিলেন ধমক—আবার তরুণ!

তরুণকান্তি বললে—কি জানি, আমার ঐ ডিটেকটিভ নভেলগুলোর উপর কেমন দারুণ আক্রোশ...মানুষের কথা এরা লিখবে, অথচ সে লেখায় না থাকবে এতটুকু সেন্স! যা-তা পাগলের মতো।

সত্যশরণ বললেন—আঃ। তাঁর দুচোখে ভ্রূকুটি। তারপর সত্যশরণ প্রশ্ন করলেন শান্তি সেনকে—হাজারিবাগে শিকার করার কথাটা সম্বন্ধে?

শান্তি সেন বললেন—বিনয় বলেছেন, বর্দ্ধমানে থাকেন ওঁর বন্ধু শান্তনু...বর্দ্ধমান থেকে শান্তনুকে নিয়ে হাজারিবাগে শিকার করতে যাবেন—এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়।—শান্তনুকে সে-সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করেছো?

—করেছি। শান্তনু বললেন—শিকার করতে হাজারিবাগে যাওয়ার কোনো কথাই হয়নি বিনয় তালুকদারের সঙ্গে।

পেন্সনি ডেপুটি বলে' উঠলেন—এ লাই...লেম এক্স্কিউজ!

শান্তি সেন বললেন—বিনয় তালুকদার বলেন, আগে থাকতে শিকারে যাবার এনগেজমেন্ট না করলেও বর্দ্ধমানে গিয়ে শান্তনুকে পাওয়া কঠিন ছিল না! কারণ

শান্তনুরও শিকারের সখ আছে এবং তাঁর সঙ্গে বিনয় তালুকদার দু-চারবার শিকারে গেছেন—একবার বাদায় পাখি মারতে এবং একবার যশোরের দিকে বরা মারতে।

ডিস্ট্রিক্ট-সেশন-জজ প্রশ্ন করলেন—তার কারোবরেশন্ মিলেছে শান্তনুর কাছে?

শান্তি সেন বললেন—হুঁ...

সত্যশরণ বললেন—তাহলে তো ও-ব্যাপার চুকে গেল! শিকারের জন্যই বিনয় বন্দুক নিয়ে বেরিয়েছিলেন—ইট্ এক্সপ্লেন্‌স্!

পেন্সনি রায় বাহাদুর বললেন—কিন্তু ঐ ব্যারাকপুর?

সত্যশরণ বললেন—তুমি যে মণিমালার কথা জেনেছো, সেই মণিমালা কোথায় থাকেন?

শান্তিময় সেন বললেন—তিনি আর তাঁর মা থাকেন ভুবনেশ্বরে। তালুকদারের সরকার দীননাথ মণি-অর্ডারের রসিদ দেখালেন এই মাসের টাকা তিনি রিসিভ করেছেন ভুবনেশ্বরে...দেড়শো টাকা—এ টাকাটা তালুকদার মাসে মাসে পাঠান, মহেন্দ্র মিত্রের যে-টাকা কারবারে খাটছে, তারি লাভের অংশ!

সত্যশরণ বললেন—তাহলে ঐ ব্যারাকপুরই হল মিস্ট্রি!

শান্তিময় বললেন—হুঁ!

বিনয় তালুকদারের ধনুর্ভঙ্গ পণ...ব্যারাকপুর সম্বন্ধে কোনো কথা বলবেন না—তার জন্যে যা ঘটে, ঘটুক।

বড়কর্তার আদেশে শান্তিময় করলেন বিনয় তালুকদারকে গ্রেফতার। কাগজে কাগজে সে খবর বিরাট-সমারোহে প্রচারিত হল...আদালতে জামিন মিললো না...খুনের চার্জ..প্রত্যক্ষ প্রমাণ না মিললেও ঘটনাচক্রে বিনয়কে কেন্দ্র করেই সন্দেহ ঘনায়িত.. কাজেই...

শুনে সত্যশরণ বললেন—অন্যায় হল শান্তি...

শান্তিময় সেন বললেন—কি করি, বলুন? আই হ্যাভটু ওবে.

নিশ্বাস ফেলে সত্যশরণ বললেন—এতে রহস্য-ভেদ হবে না...একজন নিরীহকে অনর্থক নিগ্রহ করা। কেস যদি কোর্টে যায়, কনভিকশন্ হবে?

—অসম্ভব।

কানুনের চাকা যাঁরা চালান—চালানোটুকু নিয়েই তাঁদের কারবার—ঠিক পথে কি ভুল পথে চাকা চলেছে, সেদিকে লক্ষ্য রাখবার প্রয়োজন আছে, ভাবেন না! তার ফলে কিন্তু এ হল দর্শনের কথা—আমরা দার্শনিক আলোচনা করছি না, আমরা বলছি কাহিনি।

দশ বারো দিন শান্তি সেনের দেখা নেই. .প্রোফেসরের ঘরে আসর বসে নিয়মিত,—সে-আসরে পেন্সনি-ডেপুটি থেকে থ্রিলার লেখক গোবর্দ্ধন—সকলে আসেন-—গল্প হয়,

আলোচনা হয়—তার সঙ্গে কত চায়ের পেয়ালা হয় খালি, কত সিগারেট পুড়ে ছাই হয়ে যায়...দেখা নেই শুধু শান্তিময় সেনের!

সেদিন আসর ভাঙ্গবার ঘণ্টা খানেক পরে শান্তিময় সেন এসে উপস্থিত...ভারি ক্লান্ত ভদ্রলোক!

সত্যশরণ বললেন—কি খবর শান্তি?

শান্তিময় সেন বললেন--বাইরে গিয়েছিলুম...অনেক তথ্য আছে—বলি :

তথ্য যা বললেন, তার মর্ম : ভুবনেশ্বরে মণিমালার মায়ের সন্ধানে গিয়েছিলাম—সেখানে কারো দেখা পাননি, না মণিমালার, না তাঁর বিধবা মায়ের। সেখান থেকে খবর সংগ্রহ করে শান্তিময় গেছলেন নবদ্বীপ—নবদ্বীপ থেকে ব্যারাকপুর। স্টেশনের পুব-দিকে মাঠবাট ভেঙ্গে তিন ক্রোশ দূরে বিজন গ্রাম—সেই গ্রামে থাকেন যদু ভট্টাচায্যি—মণিমালার মায়ের দীক্ষাগুরু...তাঁর ওখানে মণিমালা আর তাঁর মা বাস করছিলেন ভুবনেশ্বর ছেড়ে। এখানে বাসের হেতু—তালুকদার শিলং যাবার মাসখানেক আগে আলটিমেটাম জানিয়ে ছিলেন, বিনয়কে গ্রাস করা চলবে না...ছেলের বিবাহ-সম্বন্ধে তাঁর আকাঙ্ক্ষা স্বতন্ত্র রকম...বন্ধুর কন্যা বলে মণিমালার উপর তালুকদারের স্নেহ গভীর হলেও তাঁর ছেলের বিবাহ তিনি এমন-ঘরে দিতে চান, যে-ঘরের নাম দেশের বুকে হীরকাক্ষরে জ্বল্-জ্বল্ করছে—এবং সে-বিবাহের ব্যবস্থাও তিনি করে' রেখেছেন। বিনয় সম্বন্ধে দুরাশা ত্যাগ করে' তালুকদারের নির্দিষ্ট পাত্রে মণিমালাকে অর্পণ না করলে তালুকদার তাঁদের সমস্ত টাকা প্রত্যর্পণ করবেন এবং তাঁদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখবেন না। ...এতে কঠিন প্রতিবাদ উঠল বিনয়ের তরফ থেকে...বিনয় বললে—বাপের সব আদেশ শিরোধার্য করতে রাজি থাকলেও এ ব্যাপার আমি মানতে পারবো না—তার জন্য যদি বিষয়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হই--সহ্য হবে! মণিমালাও বললেন—বিবাহ না হয় হবে না, তা বলে' যাকে উনি ধরে এনে দেবেন, তাঁকে? কখনো না! এ অবস্থায় বিনয়ের পরামর্শে ওঁরা ব্যারাকপুরে আসেন—গুরু যদু ভটচায্যির গৃহে। নবদ্বীপ হল মহেন্দ্র মিত্রের পৈত্রিক বাসভূমি—কিন্তু ব্যারাকপুর কলকাতার কাছে—মনে করলে যাতায়াত চলে—তাই ব্যারাকপুরে আসা। বিনয় এখানে প্রায় আসা-যাওয়া করছিলেন—এবং তালুকদার যে-আলটিমেটাম দিয়েছিলেন, শিলঙ থেকে ফিরেই মণিমালার গতি—তা থেকে রক্ষা পাবার জন্য বিনয় ব্যবস্থা করেন, বাপ শিলঙে থাকতে থাকতে মণিমালাকে বিবাহ করবেন...

সত্যশরণ বললেন—বুঝলুম—কিন্তু একটা বিষয় এখনো রহস্যে রয়ে যাচ্ছে। তাই যদি স্থির হয়ে থাকে তো হাজারিবাগে শিকার অভিযান?

শান্তিময় বললেন—বিনয়কে প্রশ্ন করেছিলুম, জবাব মেলেনি। তিনি কোন কথার জবাব দেবেন না পণ করেছেন।

সত্যশরণ বললেন—এখনো তাঁর জামিন মেলেনি?

—না...

সত্যশরণ কি ভাবলেন, তার পর বললেন—মণিমালা এখন কোথায়?

—ব্যারাকপুরেই আছেন। তবে মা আর মেয়ে এমন হয়ে আছেন যে দেখলে চমকে উঠবেন।

সত্যশরণ বললেন—তোমার সুপিরিয়র অফিসার কি বলেন?

—তিনি বলেন, চালান লিখে কোর্টে পাঠাও কেস...কতদিন আব ঐ নিয়ে মাথা ঘামাবো! কোর্টের বিচারে যা হয় হোক!...

সত্যশরণ বললেন—বিচারে খালাস পাবে...কারণ এটুকু প্রমাণে...প্রমাণ মানে অনুমান মাত্র...মানুষের সাজা হতে পারে না। ...তবে খালাস পাওয়াই তো কথা নয়—কোর্টে চালান দিলে সম্মান-মর্যাদাটুকু জন্মের মতো খোয়া যাবে!...সাধারণে ভাববে, খুন করেছিল ঠিক...উকিল ব্যারিস্টারের জোরে ফস্‌কে বেরিয়ে গেছে!

শান্তিময় বললো—হুঁ...

তারপর আসর বসলো না ক'দিন...বিশেষ কাজে সত্যশরণকে কদিন ছুটোছুটি করতে হল—কেষ্টনগর আর কলকাতা, কলকাতা আর কেষ্টনগর!...

শেয়ালদার ট্রেনে চড়ে বারাকপুর আর রানাঘাট পেরিয়ে কেষ্টনগর যাতায়াত! তালুকদারের অপমৃত্যু, বিনয়ের গ্রেফতার. .এগুলো বুকে ফুটে আছে কাঁটার মতো! অবসর পেলে মনে ঐ এক চিন্তা...হাজার তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়! ট্রেনের কামবায় বসেন পশ্চিম দিক ঘেঁষে...এঞ্জিনের দিকে মুখ করে'...তালুকদার তাঁর ফার্স্ট ক্লাশ কামরায় যে-ভাবে বসেছিলেন বলে' শুনেছেন—সেই পোজিশনে! বরাবর লাইনের ধারে নজর রাখেন—লাইনের ধারে কোনো রকম কিছু যদি...! মনে হয় ব্যারাকপুরের আগেই যদি গুলি ছুটে থাকে? সবটাই তো অনুমান...এমন প্রমাণ তো পাওয়া যায়নি যে মৃত্যু ঘটেছে ব্যারাকপুর স্টেশন পার হবার পর!...

একটা জিনিস চোখে পড়েছে ক'বারই...পলতা আর ইছাপুর স্টেশনের মধ্যে ফাঁকা একটা মাঠ...সেই মাঠের পূর্বে-পশ্চিমে, উত্তরে-দক্ষিণে পোঁতা বন্দুক-প্রাকটিসের টার্গেট পোস্ট...কাঠের থাম্বায় গাঁথা বড় বোর্ড...বোর্ডের গায়ে কালো কালো চক্র আঁকা...সেই আঁকা-গণ্ডির মধ্যে তাগ করে' গুলি লাগানো চাই! হঠাৎ সেদিন মনে হল ঐ টার্গেট-প্রাকটিস করতে এসে যদি...

মাথার মধ্যে মস্ত-এক সম্ভাবনার বিদ্যুৎ চমক দিয়ে গেল যেন...এবং সেদিন বাড়ি ফিরেই তিনি দেখা করলেন শান্তিময়ের সঙ্গে। তাঁকে বললেন...মনে যে সম্ভাবনার ইঙ্গিত জেগেছিল! এবং...

পরের দিনই বেরিয়ে পড়লেন শান্তিময়কে নিয়ে। ট্রেনে চড়ে এসে নামলেন পলতা-স্টেশনে। নেমে লাইন ধরে গেলেন টার্গেট প্রাকটিসের মাঠে। সেখানকার অফিসে দেখা হল মালীর সঙ্গে, বেয়ারার সঙ্গে। তাদের জিম্মায় ছিল লগ-কেতাব—এ কেতাবে কে কবে

এলো প্রাকটিস করতে, কতক্ষণ প্রাকটিস চললো...কটা গুলি কবে খরচ হল—সে গুলি-চালানোর ফলাফল...সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ লেখা থাকে।

লগ-বুক পরীক্ষা করলেন বেশ হুঁশিয়ার হয়ে। পরীক্ষায় খবর মিললো, যেদিন তালুকদারের মৃত্যু ঘটেছে, ঐদিন বেলা সাড়ে বারোটায় এসেছিল হপকিন্স বলে' এক সাহেব টার্গেট-প্রাকটিস করতে। হপকিন্স মাঠে নামে পৌনে একটায়—প্রাকটিস করেছিল সমানে বেলা একটা চল্লিশ মিনিট পর্যন্ত। খবর মিললো, পাঁচটা ট্রাই করেছিল...তার মধ্যে একটি লাগে বোর্ডে, তিনটে আশে-পাশে—টার্গেট-পোস্টের পিছনে কাঁটাল গাছে...তাতে একটা লাইনের ধারে একটা বাছুর ঘাস খাচ্ছিল, সেই বাছুরের পায়ে একটা, আর একটা লাইনের গায়ে উঁচু মাটিতে—বাকি পাঁচ-নম্বরটা কোথায় লাগল তার হদিস মেলেনি!

সত্যশরণ বললেন—হদিস মেলেনি?

বেয়ারা বললে—জি নহি।

সত্যশরণ চাইলেন শান্তিময়ের পানে, বললেন— মেডিকেল রিপোর্টগুলির পার্টিকুলার্স পেয়েছো?

—নিশ্চয়।

সত্যশরণ বললেন বেয়ারাকে—সাহেব কি গুলি ব্যবহার করেছিল, বলতে পাবো?

—জি। সে সব স্টোরের কিতাবে লিখা থাকে।

—দেখাতে পারো?

—জি!

দেখে নোট করা হল .শান্তিময় সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন সত্যশরণের দিকে। সত্যশরণ বললেন—মেডিকেল রিপোর্ট যে-গুলির খবর পেয়েছো, মিলিয়ে দেখো তো তার সঙ্গে...আমার মনে হয়..

শান্তিময় সেন বললেন—কি মনে হয়?

সত্যশরণ বললেন—খুন নয়..এ্যাক্সিডেন্ট...হপকিন্সের প্রাকটিস গুলি গিয়ে লেগেছে অতর্কিতে তালুকদারের রগে—তিনি কামরার এদিক ঘেঁসে বসেছিলেন খোলা জানালার ধারে...এ্যাণ্ড আই অ্যাম সিয়োর ইট ওয়াজ হপকিন্স-বুলেট দ্যাট হ্যাড...

বেয়ারার কাছে আরও খবর মিললো। হপকিন্স ভয়ানক আনাড়ি.. ওর তাগা কোন দিকে লাগবে— ঠিক-ঠিকানা থাকে না কোনো কালে। তিন চার মাস প্রাকটিস করছে সাহেব—তবু যেমন আনাড়ি তেমনি রয়ে গেছে।..সেবারে এমন গুলি ছুঁড়লো, পোল্ তো এদিকে—গুলি গিয়ে লাগল ওদিকে এক কুলি ঘাস কাটছিল, তার পায়ে একেবারে!..

এ লাইনে সমস্যা-পূরণ হল! গুলির মেক্ আর মাপ দুই গেল মিলে—হপকিন্স প্রাকটিস করছিল যে-সময়ে, ঐ সময়েই আসাম-মেল ফিল্ড পাশ করছিল—হপকিন্স স্বীকার করলো। তার ছোঁড়া একটি গুলির সন্ধান মেলে নি।

লালবাজারেই মামলার ফয়শালা হল—বিনয় পেলেন মুক্তি এবং তার পর কিন্তু বিবাহের কথা লেখাবার আমাদের প্রয়োজন সেই—সে হল প্রজাপতির নির্বন্ধ। খুশি হলেন সকলে—আমার থেকে এত বড় সমস্যার মীমাংসা...

গোবর্দ্ধন শুধু বিচলিত...ইতিমধ্যে সে এই মৃত্যু-রহস্য নিয়ে দুশো পাতার এক থ্রিলার লিখে ফেলেছে—সে লেখার ছত্রে ছত্রে দারুণ সাস্‌পেন্স...বেচারি সগর্বে বলেছিল সে যা লিখেছে—

শুনছি, সে-লেখা রোমাঞ্চ-শিহরণ-সিরিজের ১৪৭ নম্বর উপন্যাস-রূপে ছেপে বেরুবে চাঁপাতলা পাবলিশিং হাউস থেকে। যাঁদের রুচি হয় পড়ে দেখবেন।

*আষাঢ়, ১৩৫৫*

# তিরশ্চী

## অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সবাইর মুখের উপর সটান বলে বসলুম বিয়ে যখন আমিই করছি, মেয়েও আমিই দেখতে যাবো। তোমরা সব পছন্দ করে এলে পরে আমি গিয়ে হয়কে নয় করে দিয়ে এলুম—সেটা কোনো কাজের কথা নয়। মাথায় দিকে হোক্ ল্যাজের দিকে হোক্ পাঁঠাটা যখন আমার, আমাকেই কাটতে দাও। যা থাকে কপালে আর যা করেন কালী।

প্রস্তাবটায় কেউ আপত্তি করলে না। তার প্রধান কারণ আমি চাকরি করছি, আর সেটা বেশ মোটা চাকরি।

বাবা দিন ও সময় দেখে দিলেন, আমার মামাতো ভাই রাধেশ আমার সঙ্গে চললো।

বলা বহুলতর হবে, সেদিনের সাজগোজের ঘটাটা আমার পক্ষে একটু প্রশস্তই হয়ে পড়েছিল। ইদানিং বিয়ের কথা-বার্তা হচ্ছিল বলে আমি আমার কোঁচায় ঝুলটা পঞ্চাশ ইঞ্চিতে নামিয়ে এনেছিলুম, কিন্তু সেদিন যেন পঞ্চাশ ইঞ্চিতেও আমার পায়ের পাতা ঢাকা পড়ছিল না। চাকরকে বিশ্বাস নেই, জুতোয় নিজেই বুরুশ করতে বসলুম। এবং রাধেশ যখন আমাকে তাড়া দিতে এলো, দেখলুম, মুখটা নির্মূল নির্মল করে এক মুঠো কিউটিকুরা ঘষে' আমি তার ছায়ায় এসেও দাঁড়াতে পারিনি।

ব্যাপারটা নির্জলা ব্যবসাদারি, তবু মনে নতুন একটা নেশায় আবেশ আসছিল। বলতে গেলে, বইয়ের থেকে মুখ তুলে সেই আমার প্রথম বাইরের দিকে তাকানো। শরীরে-মনে এত সচেতন হয়ে জীবনে এর আগে কোনোদিন কোনো মেয়ের মুখ দেখেছি বলে মনে পড়ে না। বিয়ে করবো এই ঘটনাটার মধ্যে ততো চমক নেই, কিন্তু মুখ ফুটে একবার একটি 'হ্যাঁ' বললেই এত বড়ো পৃথিবীর কে একটি অপরিচিতা মেয়ে এক নিমেষে আমার একান্ত হয়ে উঠবে—এটাই নিদারুণ চমৎকার লাগছিল। আমি ইচ্ছে করলেই তাকে সঙ্গে করে আমার বাড়ি নিয়ে আসতে পারি, কারুর কিছু বলবার নেই, বাধা দেবার নেই। অহরহই তো আমরা 'না' বলছি, কিন্তু সাহস করে একবার 'হাঁ' বলতে পারলেই সে আমার।

গ্রহ-নক্ষত্রদের চক্রান্তে অন্ধ, অভিভূত হয়ে রাধেশের সঙ্গে কালিঘাটের ট্রাম ধরলুম।

ভাগ্যিস রাধেশ গোড়াতেই আমাকে কন্যাপক্ষীয়দের কাছে চিহ্নিত করে দিয়েছিল, নইলে, তার সাজ-গোজের যে বহর, তাকেই তাঁরা পাত্র বলে মনে করতেন, অন্তত মনে করতে পারলে সুখী যে হতেন তাতে সন্দেহ নেই। তবে, পুরুষের শোভাই নাকি তার চাকরি, সেই ভরসায় রাধেশের ভ্রাতৃভক্তিকে ভূয়সী স্তুতি করতে-করতে ভদ্রলোকদের সঙ্গে দোতলায় উঠে এলুম।

যবনিকা কখন উঠে গেছে, রঙ্গমঞ্চে আমাদের আবির্ভাব হল। প্রকাণ্ড ঘরটা যেন

রুদ্ধশ্বাস নিঃশব্দতায় পাথর হয়ে আছে। মেঝের উপর ঢালা ফরাস, তারই মাঝখানে ছোট একটি টিপয়ের সামনে হাতলহীন নিচু একটি চেয়ার। টিপয়ের উপর কড়া-ইস্ত্রির ফর্সা একটি ঢাকনি; একপাশে দোয়াত-দানিতে কালি-কলম, অন্য দিকে স্তূপীকৃত কতোগুলি বই। অদূরে ছোট একটি অর্গ্যান। সেটিংটা নিখুঁত। ওধারে লম্বাটে একটা খালি টেবিলের দু'ধারে যে অবস্থায় মুখোমুখি ক'খানা চেয়ার সাজিয়ে রাখা হয়েছে, মনে হল, ওখানে উঠে গিয়েই আমাদের মিষ্টিমুখ করবাব অবশ্যকর্তব্যটা পালন করতে হবে। মনে হল, রিহার্স্যাল দিয়ে-দিয়ে ভদ্রলোকদের পার্টগুলি আগাগোড়া সব মুখস্থ।

টিপয়টার দিকে মুখ করে পাশাপাশি দু'খানা চেয়ারে দু'জন বসলুম।

অভিনয় দেখবার জন্যে দর্শকের, সত্য করে বলা যাক, দর্শিকার অভাব দেখলুম না। জানলার আনাচে-কানাচে মেয়েদের চোখের ও আঙুলের সঙ্কেতগুলি রাধেশের প্রতি এমন অজস্র ও অবারিত হয়ে উঠতে লাগল যে হাতে নেহাৎ চাকরিটা না থাকলে তাকে জায়গা ছেড়ে সটান বাড়ি চলে যেতুম। রাধেশ যে বছর দুয়েক ধরে বি-এ পরীক্ষার খাবি খাচ্ছে সেইটেই আমার পক্ষে একটা প্রকাণ্ড বাঁচোয়া।

হ্যাঁ, মেয়েটি তো এখন এসে গেলেই পারে। ভদ্রলোকদের সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তা সেরে কখন থেকে হাঁ করে বসে আছি।

চক্ষু থেকে শ্রবণেন্দ্রিয়টাই এখন দ্রুত ও তীক্ষ্ণ কাজ করছে। অস্পষ্ট কবে অনুভব করলুম পাশের ঘরেই মেয়ে সাজানো হচ্ছে—বিস্তৃত শাড়ির খসখস ও চুড়িব টুকরো-টুকরো টুং-টাং আমার মনে নতুন বৃষ্টির শব্দেব মতো বিবশ একটা তন্দ্রার কুযাশা এনে দিচ্ছিল। একসঙ্গে অনেকগুলি চাপা কণ্ঠের অনুনয ও তাব অনুচ্চারিত গভীরে কাব যেন রঙিন খানিকটা লজ্জা। সেই লজ্জা গায়ের উপর স্পর্শের মতো স্পষ্ট টেব পেলুম।

বাধেশের কনুইয়ের উপর অলক্ষ্যে একটা চিম্‌টি কাটতে হল।

কব্জির ঘড়ির দিকে চেয়ে ব্যস্ত হয়ে রাধেশ বল্‌লে—বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে। সাড়ে ন'-টা পর্যন্ত ভাল সময়।

তাডা খেয়ে ভদ্রলোকদের একজন অন্তঃপুরে প্রবেশ কবলেন। ফিবতে তাঁব দেবি হল না, বললেন, আসছে।

এবং নতুন করে প্রস্তুত হবাব আগেই মেযেটি ঢুকে পডল। ঠিক এলো বলতে পাবি না, যেন উদয় হলো। অনেকক্ষণ বসে থাকার জন্যে ভঙ্গিটা শিথিল, ক্লান্ত হয়ে এসেছিল. তাকে যথেষ্ট বকম ভদ্র কবে তোলবার পর্যন্ত সময় পেলুম না। সবিস্ময়ে রাধেশের মুখেব দিকে তাকালুম।

দেখলুম রাধেশেব মুখ প্রসন্নতায় বিশেষ কোমল হয়ে আসে নি। তা না আসুক, আমি কিন্তু এক বিষয়ে পবম নিশ্চিন্ত হলুম। আর যাই হোক মেয়েটি রাধেশেব যোগ্য নয়। আব যাই থাক বা না থাক, মেয়েটির বয়স আছে।

টিপয়ের সামনেকাব চেয়াবটা একবাবে লক্ষ্যই না করে মেয়েটি ফবাসের এককোণে হাঁটু মুডে বসে পড়ল। এব আসা ও বসার এই তরাটা একটা দেখবাব জিনিস। তার শরীবে

লজ্জার এতটুকু একটা দুর্বল আঁচড় কোথাও দেখলুম না। প্রাণশক্তিতে উজ্জ্বল, চঞ্চল সেই শরীর একপাত নিষ্ঠুর ইস্পাতের মতো যেন ঝকঝক্ করছে। কোনো কিছুকেই যেন সে আমলে আন্‌ছে না, সব কিছুর উপরেই যেন সে সমান উদাসীন।

বৃথাই এতক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে তার সাজগোজের শব্দ শুনছিলুম, আমার জীবনের আজকের ভোরবেলাটির মতোই মেয়েটি একান্ত পরিচ্ছন্ন, বোধহয় বা বিষাদে একটু ধূসর। পরনে আটপৌরে একখানা শাড়ি, খাটো আঁচলে দুই কাঁধ ঢাকা, হাতে দু'-এক টুকরো ঘবোয়া গয়না, কালকের রাতের শুকনো খোঁপাটা ঘাড়ের উপর এখন অবসন্ন হয়ে পড়েছে। এই তো তাকে দেখবার। এড়িয়ে এসেছে সে সব আয়োজন, ঠেলে ফেলে দিয়েছে উপকরণের বোঝা; সে যা, তাই সে হতে পারলে যেন বাঁচে। কিন্তু কেন এই ঔদাস্য? মনে-মনে হাসলুম। আমি ইচ্ছে করলে এক মুহূর্তে তার এই বিষাদের মেঘ উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারি। আর তাকে লোলুপদৃষ্টি পুরুষের সামনে রূপের পরীক্ষা দিতে এসে এমন ক্লান্ত, বিবক্ত, কলুষিত হতে হয় না।

গায়ের রঙটা যে রাধেশের পছন্দ হয় নি তা প্রথমেই তার মুখ দেখে অনুমান করেছিলুম। বিনয় করে লাভ নেই, মেয়েটি দস্তুরমতো কালো। চামড়ার তারতম্য বিচারের বেলায় এমন বঙকে আমরা সাধারণত কালোই বলে থাকি। শুদ্ধ ভাষায় শ্যামবর্ণ একে বলতে পারো বটে, কিন্তু টুইড্‌ল্‌ডাম ও টুইড্‌ল্‌ডিতে কোনো তফাৎ নেই।

ভদ্রলোকদের পার্ট সব মুখস্থ। একজন অযাচিত বলে বসলেন : এমনিতে গায়ের রঙ ওর বেশ ফর্সা, কিন্তু পুরীতে চেঞ্জে গিয়ে সমুদ্রে স্নান করে'-করে' এমনি কালো হয়ে এসেছে।

কিন্তু, মনে-মনে ভাবলুম, এর জন্যে এত জবাবদিহি কেন? মেয়েরা যেমন শুধু আমাদের অর্থোপার্জনের দৌড় দেখছে, তাদের বেলায় আমরাও কি তেমনি শুধু তাদের চামড়ার বুনট দেখবো?

ভদ্রলোকদের একজন আমাকে অনুবোধ করলেন, কিছু জিগ্‌গেস করুন না?

একেবারে অথই জলে পড়লুম। এমন একখানা ভাব করলুম, যেন, আমাকেই যদি আলাপ করতে হয়, তবে ঘরে রাজ্যের এত লোক কেন?

ভদ্রলোকদের আরেকজন টিপয় থেকে একটা বই তুলে বললেন,—কিছু পড়ে শোনাবে?

আমার কিছু বলবার আগেই রাধেশ এগিয়ে এলো; না। ফার্স্ট ডিভিশনে যে ম্যাট্রিক পাশ করেছে তাকে পড়াশুনোর বিষয় কিছু প্রশ্ন করাটাই অবান্তর হবে। চেয়ারের মধ্যে রাধেশ উসখুস করে উঠল, গলাটা খাঁখরে মেয়েটিকে জিগ্‌গেস করলে; তোমার নাম কি?

কী আশ্চর্য প্রশ্ন! ম্যাট্রিক পাশের খবর পেয়েও তার নামটা কিনা সে জেনে রাখে নি।

দেয়ালের দিকে মুখ করে মেয়েটি নির্লিপ্ত গলায় বললে,—সুমিতা ঘোষ।

মনের মধ্যে যুগপৎ দু'টো ভাব খেলে গেল। প্রথমত, দিন কয়েক পরে নাম বলতে গিয়ে দেখবে তার ঘোষ এখন আমারই মিত্র হয়ে উঠেছে—দেহে-মনে এমন কি নামে

পর্যন্ত তার সে কী অদ্ভুত পরিবর্তন! দ্বিতীয়ত, রাধেশের এই ইয়ার্কি আমি বার করবো। তার মাস্টারের এই সম্মানিত, উদ্ধত ভঙ্গিটা যদি সুমিতার পায়ের কাছে প্রণামে না নরম করে আনতে পাবি তো কী বলেছি!

আলাপের দরজা খোলা পেয়ে রাধেশের সাহস যেন আরও বেড়ে গেল। বল্লে,—খবরের কাগজ পড়ো?

সুমিতা চোখ নামিয়ে গম্ভীর গলায় বললে,—মাঝে মাঝে।

তবু রাধেশের নির্লজ্জতাব সীমা নেই। জিগ্গেস করলে : বাঙলা গভর্নমেন্টের চিফ্ সেক্রেটারির নাম বলতে পারো?

ভুরু দু'টি কুটিল করে সুমিতা বললে,—না।

—উনিশ শো বাইশে গয়ায় যে কংগ্রেস হয়েছিল তার প্রেসিডেন্ট কে ছিল?

সুমিতা স্পষ্ট বললে,—জানি না।

বাধেশের তবু কী নিদারুণ আস্পর্দ্ধা! জিগ্গেস করলে : আন্নামালায়ে যে একটা নূতন ইউনিভার্সিটি হয়েছে তার খবর রাখো? জায়গাটা কোথায়?

সুমিতা বললে,—কী করে বলবো?

রাধেশ যেন তার দু' বছবের পরীক্ষা-পাশের অক্ষমতার শোধ নেবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। সেখানে বসে তার কান মলে দেয়া সম্ভব ছিল না, গোপনে আরেকটা চিমটি কেটে তাকে নিরস্ত করলুম।

সত্যিকারের দেখাটা মানুষের সুদীর্ঘ উপস্থিতিতে নয়, তার আকস্মিক আবির্ভাবে ও অন্তর্ধানে। সুমিতাকে তাই লক্ষ্য করে বললুম,—এবাব তুমি যেতে পারো।

যা ভেবেছিলুম তাই, তার সেই শরীরের নির্ঝরিণীতে ভঙ্গুর, বিশীর্ণ কটি রেখা মুক্তির চঞ্চলতার ঝিক্মিক্ করে উঠল। বসার থেকে তাব সেই হঠাৎ দাঁড়ানোব মাঝে গতির যে তীক্ষ্ণ একটা দ্যুতি ছিল তা নিমেষে আমার দু'চোখকে যেন পিপাসিত করে তুললে। সুমিতা আর এক মুহূর্তও দ্বিধা করলো না, যেন এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচে, এমনি তাড়াতাড়ি পিঠের সংক্ষিপ্ত আঁচলটা মুক্তিতে আলুলায়িত করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ঠিক চলে গেল বলতে পারি না, যেন গেল নিবে, গেল হারিয়ে।

মনে-মনে হাসলুম। দিন কয়েক নেহাৎ আগে হ'য়ে পড়ে, নইলে ঐ তার পাখির পাখার মতো মুক্তিতে বিস্ফারিত উড়ন্ত আঁচলটা মুঠিতে চেপে ধরে অনায়াসে তাকে স্তব্ধ করে দিতে পারতুম, কিম্বা আমিও যেতে পারতুম তার পিছু-পিছু। আজ যে এত বিমুখ, সে-ই একদিন অবারিত, অজস্র হয়ে উঠবে ভাবতেও কেমন একটা মজা লাগছে। যে আজ পালাতে পারলে বাঁচে, সে-ই একদিন আমার কণ্ঠতট থেকে তার বাহুর ঢেউ দু'টিকে শিথিল কবতে চাইবে না।

আমি যেন ঠিক তাকে চলে যেতে বললুম না, তাড়িয়ে দিলুম—ভদ্রলোকের দল চিন্তিত হয়ে উঠলেন। একজন বললেন,—অন্তত গানটা ওব শুনতেন। স্কুলে ও উপাধি পেয়েছে গীতোর্মিমালিনী।

আরেকজন বললেন,—এই দেখুন ওর সব সেলাই। স্কার্ফ, মাফলার, টেপেস্ট্রি—যা চান।

আরেকজন যোগ করে দিলেন : অন্তত ওর হাতের লেখার নমুনাটা একবার—

রুমাল দিয়ে ঘাড়টা সবলে রগড়াতে-রগড়াতে বললুম—কোনো দরকার নেই। এমনিতেই আমার বেশ পছন্দ হয়েছে।

রাধেশের মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, তার চেয়ে তার পিঠে একটা ছুরি আমূল বসিয়ে দিলেও যেন বেশি আরাম পেতো।

পুরাঙ্গনারা, যারা এখানে-ওখানে উঁকি-ঝুঁকি মারছিল, সমমুহূর্তে সবাই কলধ্বনিত হয়ে উঠলো তার মাঝে স্পষ্ট অনুভব করলুম একজনের সলজ্জ, সুন্দর স্তব্ধতা।

তারপর শুরু হল ভোজনের বিরাট রাজসূয়। এত বড়ো একটা ভোজের চেহারা দেখেও রাধেশের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল না।

২

আমি যে কী ভীষণ অজবুক ও আনাড়ি, বাড়িতে ফিরে রাধেশ সেইটেই সাব্যস্ত করতে উঠে-পড়ে লেগে গেছে। এক কথায় মেয়ে পছন্দ করে এলুম, অথচ খোঁপা খুলে না দেখলুম তার চুলের দীর্ঘতা, না বা দেখলুম হাঁটিয়ে তার লীলা-চাপল্য। সামান্য একটা হাতের লেখা পর্যন্ত তার নিয়ে আসি নি।

—তারপর, রাধেশ মুখ টিপে হাসতে লাগল : এমন তাড়াতাড়ি ভাগিয়ে দিলে যে মেয়েটার চোখ দুটো পর্যন্ত ভালো করে দেখতে পেলুম না। দেখবার মধ্যে দেখলুম শুধু একখানা গায়ের রঙ।

বাড়ির মহিলারা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন : কী রকম, আমাদের মিনির মতো হবে?

রাধেশের একবিন্দু মায়া-দয়া নেই, অভদ্র, রূঢ় গলায় বললে,— Apologeticallyও নয়। আমাদের মিনি তো তার তুলনায় দেবী।

আমার রুচিকে কেউ প্রশংসা করতে পারলো না। বাড়ির মহিলারা, যাঁরা তাদের যৌবনদশায় এমনি বহুতর পরীক্ষার ব্যূহ ভেদ করে অবশেষে আমাদের বাড়িতে এসে বহাল হয়েছেন, টিপ্পনি কাটতে লাগলেন : এমন মেয়ে-কাঙাল পুরুষ তো কখনো দেখি নি বাপু। এমন কী দুর্ভিক্ষ হয়েছে যে খাদ্যাখাদ্যের আর বাছ-বিচার করতে হবে না। সাধে কি আর পাত্রকে গিয়ে নিজের মেয়ে দেখাতে দেয়া হয় না? ডবকা বয়সের একটা যেমন-তেমন মেয়ে দেখলেই কি এমনিধারা রাশ ছেড়ে দিতে হয় গা?

প্রশ্রয় পেয়ে রাধেশ তার রসনাকে আরও খানিকটা আলগা করে দিলো; মা হয়তো বা কোনোরকমে পার হলেন কিন্তু তাঁর মেয়েদের আর গতি হচ্ছে না এ আমি তোমাদের আগে থাকতে বলে রাখছি।

সেই অপরিচিতা মেয়েটির হয়ে শুধু আমি একা লড়াই করতে লাগলুম। তাকে পছন্দ না করে যে আর কী করতে পারি কিছুই আমি ভেবে পেলুম না। আমার চোখ না থাক, অন্তত চক্ষুলজ্জা তো আছে'

মা প্রবল প্রতিবাদ শুরু করলেন; কালো বলেই ওরা অতো টাকা দিতে চায়। কিন্তু তোর টাকার কী ভাবনা? আমি তোর জন্যে টুকটুকে বৌ এনে দেবো।

হেসে বললুম—টাকা অবিশ্যি আমি ছেড়ে দেবো, মা, কিন্তু মেয়েটিকে ছাড়তে পারবো না। তাকে যখন আমি দেখতে গেছলুম, তখন তাকে বিয়ে করবো বলেই দেখতে গেছলুম। একটি মেয়েকে তেমন আত্মীয়তার চোখে একবার দেখে তাকে আমি কিছুতেই আর ফেরাতে পারবো, না। তোমরা তাকে পরীক্ষা কবতে পার, কিন্তু আমার শুধু পছন্দ করবার কথা।

এই যে আমার কী এক অন্যায় খেয়াল, আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সবাই সন্দিহান হয়ে উঠল। কিন্তু বাবা আমাকে রক্ষা করলেন। বললেন, ওর ওখানেই মত হয়েছে, তখন ওখানেই ওর বিয়ে হবে।

তোমরা ঠাট্টা করতে পারো, কিন্তু বলতে আমার দ্বিধা নেই, সুমিতাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি। এটা একটু হয়তো রূঢ় শোনাচ্ছে, কিন্তু ভালো লাগার একটা বিশেষ অবস্থার নামই কি ভালোবাসা নয়? তাকে এতো ভালো লেগেছে যে তার সমস্ত ত্রুটি সমস্ত অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও তাকে আমি বিয়ে করতে চাই। এইটেই কি আমার ভালোবাসার প্রমাণ নয়?

সুমিতা কালো, এবং তারি জন্যে সমস্ত সংসার প্রতিকূলতা করছে, মনে হল, এ-ব্যাপারে সেইটেই আমার কাছে প্রধান আকর্ষণ। সুমিতাকে যে আমি এই অপমান থেকে রক্ষা করতে পারবো সেইটেই আমার পুরুষত্ব।

বাবা দিন-ক্ষণ ঠিক করে ওদের চিঠি লিখে দিলেন।

পাশাপাশি সে কটা দিন-বাত্রি আমার একটানা একটা তন্দ্রার মধ্য দিয়ে কেটে গেল। কে কোথাকার একটি অচেনা মেয়ে পৃথিবীর অগণন জনতার মধ্যে থেকে হঠাৎ একদিন আমার পাশে এসে দাঁড়াবে তারি বিস্ময়ের রহস্যে মুহূর্তগুলি আচ্ছন্ন হয়ে উঠল। তার জীবনের এতগুলি দিন শুধু আমাবই জীবনের একটি দিনকে লক্ষ্য করে তার শরীরে-মনে স্তূপে-স্তূপে সঞ্চিত হয়ে উঠেছে। পুরীতে যখন সে সমুদ্রে ডুব দিতো, তখনো সে ভাবে নি তীরে তার জন্যে কে বসে আছে। ঘটনাটা এমন নতুন, এমন অপ্রত্যাশিত যে কল্পনায় অসুস্থ হয়ে উঠতে লাগলুম। কাজের আবর্তে মনকে যতোই ফেনিল করে তুলতে চাইলুম, ততোই যেন অবসাদের আর কূল খুঁজে পেলুম না।

হয়তো সুমিতারও মনে এমনি দক্ষিণ থেকে হাওয়া দিয়েছে। বাইরে থেকে কে কোথাকার এক অহঙ্কারী পুরুষ নিমেষে তার অন্তরের অঙ্গ হয়ে উঠবে এর বিস্ময় তাকেও করেছে মুহ্যমান। হয়তো সেদিনের পর থেকে তার চোখের দীর্ঘ দুই পল্লবে কপোলের উপর ক্ষণে-ক্ষণে লজ্জার শীতল একটু ছায়া পড়ছে, হয়তো আয়নাতে চুল বাঁধবার সময় তার শুভ্র সীমান্তরেখাটিব দিকে চেয়ে সে একটি নিশ্বাস ফেলছে, হয়তো আমারি মতো রাতের অনেকক্ষণ সে ঘুমুতে পারছে না।

৩

বলা বাহুল্য, নইলে এ গল্প লেখার কোনো দরকার হতো না, সুমিতার সঙ্গে আমার বিয়েটা শেষ পর্যন্ত ঘটে ওঠে নি।

কেন ওঠে নি, সেইটেই এখন বলতে হবে।

বাবা সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে মেয়েকে পাকা দেখতে বেরোবেন, সকালবেলার ডাক এসে হাজির। আমারই নামে খামে মোটা একটা চিঠি। মোড়কটা ক্ষিপ্রহাতে খুলে ফেলে নিচে নাম দেখলুম : সুমিতা।

বলতে বাধা নেই, সেই মুহূর্তটা আনন্দে একেবারে বিহ্বল হয়ে গেলুম। বিয়ের আগে এমন একখানি চিঠি যেন বিধাতার আশীর্বাদ।

তারপরে লুকিয়ে একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসে গেলুম চিঠিটা পড়তে। মেয়ের চিঠি, তাই চিঠিটা একটু বিস্তারিত। সুমিতা লিখছে :

মান্যবরেষু,

আপনাকে চিঠি লিখছি দেখে নিশ্চয়ই খুব অবাক হবেন. কিন্তু চিঠি না লেখা ছাড়া সত্যি আর আমার কোনো উপায় নেই; রূঢ়তা মার্জনা করবেন এই আশা করেই চিঠি লিখছি।

আপনি যে আমাকে পছন্দ করবেন, কেউই যে আমাকে এইভাবে পছন্দ করতে পারে, একথা আমি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারি নি। আপনার আগে আরও অনেকের কাছে আমাকে রূপের পরীক্ষা দিতে হয়েছিল, কিন্তু সব জায়গাতেই আমি সসম্মানে ফেল্ করে বেঁচে গিয়েছিলুম। শুধু আপনিই আমাকে এই অভাবনীয় বিপদে ফেললেন। আপনি আবার এত উদাব, এত মহানুভব যে আমাব বর্ণমালিন্যের ক্ষতিপূরণস্বরূপ ভয়াবহ একটা টাকা পর্যন্ত দাবি করলেন না। সব দিক থেকেই আমার পালাবার পথ বন্ধ করে দিলেন। এর আগে আর কাউকে চিঠি লেখবার আমার দরকাব হয় নি, একমাত্র আপনাকে লিখতে হল। জানি আপনি মহানুভব, তাই আমি এত সাহস দেখাতে সাহস পেলুম।

আপনি আমাকে মুক্তি দিন, এই বিপদ থেকে আপনি আমাকে উদ্ধার করুন। বিয়ে করে নয়, বিয়ে না করে। পরিবারের সঙ্গে সংগ্রাম করে-করে আমি ক্লান্ত, প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়েছি—কী যে আমি করতে পারি, কোনোদিকে পথ খুঁজে পাচ্ছি না। জানি, এই ক্ষেত্রে আপনিই শুধু আমাকে বাঁচাতে পারেন, তাই কোনোদিকে না চেয়ে শেষকালে আপনার কাছেই ছুটে এসেছি।

কেন বিয়ে করতে চাই না, তার একটা স্থূল স্পর্শসহ কারণ না পেলে আপনি আশ্বস্ত হবেন না জানি। সে-কারণ আপনাকে জানাতে আমার সঙ্কোচ নেই।

আমি একজনকে ভালোবাসি—কথাটা মাত্র লিখে আমি তার গভীরতা বোঝাতে পারবো না। তার জন্যে আমাকে আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে। যতোদিন না সে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারে, ততোদিন তারি জন্যে, আমাকে নানা কৌশল করে এই সব ষড়যন্ত্র পার হতে হচ্ছে। রূপের পরীক্ষার চাইতেও সে কী কঠিনতর সাধনা!

আশা করি, আপনি একজন উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক, আপনার কাছে আমি সহানুভূতি না পেলেও করুণা পাবো। আমার এই অসহায় প্রেমকে আপনি মার্জনা করুন। একজন বন্দিনী বাঙালি মেয়ে আপনার কাছে তার প্রেমেব পবমায়ু ভিক্ষা করছে।

তবু, এতোতেও যদি আপনি নিরস্ত না হন তো আমার পরিণাম যে কী হবে আমি বুঝতে পারছি না ইতি।

বিনীতা সুমিতা

চিঠি পড়ে প্রথম কিন্তু মনে হল সুমিতার হাতের লেখাটি ভারি সুন্দর, লাইন কটি সোজা ও পাশাপাশি দুটো লাইনের অন্তরালগুলি সমান! বানানগুলি নির্ভুল এবং দস্তুরমতো কমা, দাঁড়ি ও প্যারাগ্রাফ বজায় রেখে সে চিঠি লেখে। তার উপর শ্রদ্ধা আমার চতুর্গুণ বেড়ে গেল। এবং যে-পাত্রী আমি মনোনীত করেছি, সে যে নেহাৎ একটা যা-তা মেয়ে নয়, সে-কথাটা বাড়ির মহিলাদের কাছে সদ্য-সদ্য প্রমাণ করতে এ-চিঠিটা তাঁদেরকে দেখাবার জন্যে পা বাড়ালুম।

কিন্তু পবমুহূর্তেই মনে পড়লো, তার চিঠির কথা নয়, চিঠির ভিতবকার কথা। সুখ হল না দুঃখ হল চেতনাটার ঠিক স্বাদ বুঝলুম না। খানিকক্ষণ স্তম্ভিতের মতো সামনের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

ওদিকে বাবা দলবল নিয়ে প্রায় বেরিয়ে যাচ্ছেন। তাড়াতাড়ি চোখ-কান বুজে তাঁব কাছে ছুটে গেলুম। বললুম থাক, ওখানে গিয়ে আর কাজ নেই। ও-মেয়ে আমি বিয়ে করবো না।

বাবা তো প্রায় আকাশ থেকে পড়লেন; সে কি কথা?

—হ্যাঁ, আমি আমার মত বদলেছি।

সে একটা বীভৎস কেলেঙ্কারিই হল বলতে হবে, কিন্তু সুমিতাব জন্যে সব আমি অক্লেশে সহ্য কবতে পারবো।

কথাটা দেখতে-দেখতে ছড়িয়ে পড়লো। সবাই আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে ছেঁকে ধরলে, মত বদলাবার কাবণ কী?

বললুম,—বড্ড কালো।

হাসবে না কাঁদবে কেউ কিছু ভেবে পেলো না, বললে,—বা, এই কালো জেনেই তো এত তড়পেছিলি। এই কালোই তো ছিল ওর বিশেষণ!

কী যুক্তি দেবো ভেবে পাচ্ছিলুম না। বললুম,— বিয়েতে আমাব টাকা চাই।

—বেশ ছেলে যা হোক্ বাবা। তুইই না বলতিস বিয়েতে টাকা নেয়ার চাইতে গণিকাবৃত্তিতে বেশি সাধুতা আছে। ভদ্রলোকদের কথা দিয়ে এখন পিছিয়ে যাবাব মানে কী?

বললুম,—বেশ তো, তাদেব অকারণ মনস্তাপের দরুণ না হয় যথাযোগ্য খেসারৎ দেয়া যাবে।

সবাই বিদ্রূপ করে উঠল : এদিকে পণ নিয়ে বিয়ে করবার মতলব, ওদিকে গরচা খেসারৎ দেয়া হচ্ছে! মাথা তোব বিগড়ে গেল নাকি?

কিন্তু এদের পাঁচজনকে আমি কী বলে বোঝাই? নিজের মনকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে গিয়ে চুপি-চুপি বোঝাতে পারি; সুমিতাকে আমি ভালোবেসেছি।

সুমিতাকে আমি ভালোবেসেছি, নিশ্চয় ভালোবেসেছি তার ঐ প্রেম। তাই, তাকে অপমান করি, আমার সাধ্য কী! তাকে যে আমার কেন এতো পছন্দ হয়েছিল, এ কথা এখন কে বুঝবে?

আমার সঙ্গে তার বিয়ের সম্ভাবনাটা সমূলে ভেঙে দিলুম। নিরীহ একটি মেয়ের অকারণ সর্বনাশ করছি বলে চারদিক থেকে একটা নিদারুণ ধিক্কার উঠল, কিন্তু আমি জানি, ঈশ্বর জানেন, আমার এই আত্মবিলোপের অন্তরালে কার একখানি বেদনার সুন্দর মুখ সুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কাউকে ভালো না বাসলে আমরা কখনো এতখানি স্বার্থত্যাগ করতে পারি না। সুমিতাকে এত ভালোবেসেছিলুম বলেই তার জন্যে নিজের এত বড়ো ঐশ্বর্য অনায়াসে ছেড়ে দিয়ে এলুম। আমার প্রেম তার ত্যাগের মতোই মহান হয়ে উঠুক।

প্রাগ্‌বিচার করা বৃথা, জীবনে সত্যিই সুমিতা সুখী হতে পারবে কিনা; কিন্তু প্রেমের কাছে সুখের কল্পনাটা সূর্যের কাছে দেয়াশলাইর একটা কাঠি। তার সেই প্রেমকে জায়গা ছেড়ে দিতে আমি আমার ছোট সুখ নিয়ে ফিরে এলুম।

৪

তারপর বছর তিনেক কেটে গেছে, আমি বারাসত থেকে দুবরাজপুরে বদলি হয়ে এসেছি।

বলা বাহুল্য ইতিমধ্যে আমার বৈবাহিক ব্যাপারটা সম্পন্ন হয়ে গেছে এবং এবার অতি নির্বিঘ্নে। বলা বাহুল্য এবার আমি নিজে আর মেয়ে দেখতে যাইনি, মা তাঁর কথামতো দিব্যি একটি টুকটুকে বৌ এনে দিয়েছেন। নিতান্ত স্ত্রী বলেই তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহিত হতে পারছি না।

আমার স্ত্রী তখন তাঁর বাপের বাড়ি, আসন্নসন্তান-সম্ভবা। আমার কোয়ার্টারে আমি একা, নথি-নজির নিয়ে মশগুল।

এর মধ্যে যে কোনো উপন্যাসের অবকাশ ছিল তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারতুম না।

সেরেস্তাদার তাঁর এক অধীনস্থ কেরানির নামে আমার কাছে নালিশের এক লম্বা ফিরিস্তি পেশ করলেন। পশুপতির চুরিটা অবিশ্যি আমিই ধরে ফেলেছিলুম। আমারই শাসনে এতদিনে সেরেস্তাদারের যা-হোক ঘুম ভাঙল।

নতুন হাকিম, মেজাজটা সাধারণতই একটু ঝাঁজালো, পশুপতিকে আমি ক্ষমা করলুম না।

আমারই খাসকামরায় পশুপতি দু'হাতে আমার পা জড়িয়ে লুটিয়ে পড়লো, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললে—হুজুর মা বাপ, আমার চাকরিটা নেবেন না। এমন কাজ আর আমি কক্‌খনো করবো না—এই আপনার পা ছুঁয়ে শপথ করছি।

পা দুটো তেমনি অবিচল কঠিন রেখে রুক্ষ গলায় বললুম,—তুমি যে-কাজ করেছ, আর শত করবে না বললেও তার মাপ নেই।

পশুপতি আমাকে গলাবার আরেকবার চেষ্টা করলো : ভয়ানক গরিব হুজুর, তারি জন্যে ভুল হয়ে গেছে।

আমারও উত্তর তৈরি : ভুল যখন করেছ, তখন ভয়ানক গরিবই থাকতে হবে।

কিন্তু পশুপতি আরও যে কতো ভুল করতে পারে তা তখনো ভেবে দেখি নি।

রাত্রে শোবার ঘরে লণ্ঠনের আলোতে খুব বড়ো একটা মোকদ্দমার যোজনব্যাপী একটা রায় লিখছি, এমন সময় দরজায় অস্পষ্ট কার ছায়া পড়লো। স্ত্রীলোকের মতো চেহারা। অকুণ্ঠ পায়ে ঘরের মধ্যে সোজা ঢুকে পড়ছে।

কোনো আফিসারের স্ত্রী বেড়াতে এসেছেন ভেবে সসম্ভ্রমে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অপ্রতিভ হয়ে বললুম, —আমার স্ত্রী তো এখানে নেই—

স্ত্রীলোকটি পরিষ্কার গলায় বললে,—আমি আপনার কাছেই এসেছি।

লণ্ঠনের শিখাটা তাড়াতাড়ি উস্কে দিলুম। গলা থেকে আওয়াজটা খানিক আর্তনাদের মতো বেরিয়ে এলো : এ কী? তুমি, সুমিতা? তুমি এখানে কী করে এলে?

তাকে চিনতে পেরেছি দেখে যেন খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে সুমিতা সামনের একটা চেয়ারে বসলো। ঘরের চারদিকে বিষণ্ণ চোখে তাকাতে লাগল যেখানে খাটে পাতা রয়েছে আমার বিছানা, যেখানে দেয়ালে টাঙানো রয়েছে আমার স্ত্রীর ফটো।

আবার জিগগেস করলুম : তুমি এখানে কী করে এলে?

সুমিতা আগের মতো তেমনি চোখ নামিয়ে বললে— ভাসতে-ভাসতে।

তার এই কথায় তার চারপাশে মুহূর্তে যে আবহাওয়া তৈরি হয়ে উঠল তারই ভিতর দিয়ে তার দিকে তাকালুম। দেখলুম সেই সুমিতা আর নেই। যেন অনেক ক্ষয় পেয়ে গেছে। আগে তার শরীরে বয়সের যে একটা বোঝা ছিল তা-ও যেন খসে শিথিল হয়ে পড়েছে। সে আজ শুধু কালো নয়, কুৎসিত। পরনের শাড়িটাতে পর্যন্ত আটপৌরে একটা সৌষ্ঠব নেই। হাত দু'খানি দু'টি মাত্র শাঁখায় ভারি রিক্ত, অবসন্ন দেখাচ্ছে।

গলা থেকে হাকিমি স্বর বার করলুম : আমার কাছে তোমার কী দরকার?

ম্রিয়মাণ দুটি চোখ তুলে সুমিতা বললে,—আমার স্বামীকে আপনি রক্ষা করুন।

মনে-মনে হাসলুম। একবার তাকে রক্ষা করেছিলুম, এবার তার স্বামীকে রক্ষা করতে হবে। আদালত সাক্ষীকে যেমন প্রশ্ন করে তেমনি নির্লিপ্ত গলায় জিগ্‌গেস করলুম : তোমার স্বামী কে?

সুমিতা স্বামীর নাম মুখে আনতে পারে না, চোখ নামিয়ে চুপ করে রইলো।

শেষে নিজেকেই অনুমান করতে হল : তোমার স্বামীর নাম কি পশুপতি?

—হ্যাঁ।

চিত্রার্পিতের মতো তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। সেই সুমিতা আর নেই। হাসি মিলিয়ে যাবার পর সে যেন একরাশ স্তব্ধতা। তার ভঙ্গিতে নেই আর সেই ত্বরা, রেখায় নেই আর সেই তীক্ষ্ণতা। মুখের ভাবটি তৃপ্তিতে আর তেমন নিটোল নয়। তার জন্যে মায়া করতে লাগল।

জিগ্‌গেস করলুম : কদ্দিন তোমরা বিয়ে করেছ?

যেন বহুদূর কোন সময়ের পার হতে উত্তর হল : এই তিন বছর।

কথাটার বলার ধরনে চমকে উঠলুম। বললুম,— শেষপর্যন্ত তোমার সেই নির্বাচিতকেই পেলে?

—না।

—না? তবে পশুপতি তোমার কে?

সুমিতার চোখ দুটো জলে ঝাপসা হয়ে উঠল। বললে,—আমার স্বামী।

—হুঁ! একটা ঢোঁক গিলে ফের প্রশ্ন করলুম : একে বিয়ে করলে কেন?

—না করে পারলুম না।

—ওকেও চিঠি লিখেছিলে?

—লিখেছিলুম, কিন্তু শুনলেন না।

—শুনলেন না?

—না।

চোখ দুটো যেন অন্ধকারে জ্বালা করে উঠল : শুনলেন না কেন?

সুমিতা বললে,—তাঁর দৃষ্টি ছিলো তার নিজের সুখের দিকে।

—নিজের সুখ?

—হ্যাঁ, টাকা। বিয়ে করে তিনি কিছু টাকা পেয়েছিলেন।

রুক্ষ গলায় বললুম—তুমিই বা নিজের সুখ দেখলে না কেন? কেন গেলে ওকে বিয়ে করতে?

—পারলুম না, হেরে গেলুম। একেক সময় মানুষে পারে না। সুমিতা নিচের ঠোঁটটা একটু কামড়ালো।

বললুম—আমার বেলায় তো মরবার পর্যন্ত ভয় দেখিয়েছিলে, তখন মরলে না কেন?

হাসবার অস্ফুট একটি চেষ্টা করে সুমিতা বললে,—মরতে আর কী বাকি আছে।

—না, না, তোমার এই ফ্যাসানেব্‌ল মরা নয়, সত্যি সত্যি মরে যাওয়া। প্রেমের জন্যে তবু একটা কীর্তি রেখে যেতে পারতে।

রূঢ় আঘাতে সুমিতা যেন আমূল নড়ে উঠল। কথার থেকে যেন অনেক দূর সরে এসেছে এমনি একটা নৈরাশ্যের ভঙ্গি করে সে বললে,—কিন্তু সে-কথা থাক, আমার স্বামীকে আপনি বাঁচান।

—তোমার স্বামীকে বাঁচাবো? তোমার স্বামীকে বাঁচিয়ে আমার লাভ?

তবু কী আশ্চর্য। সুমিতা হঠাৎ দু হাতে মুখ ঢেকে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে। বললে,—অবস্থার দোষেই এমন করে ফেলেছেন। এবারটি তাকে মাপ করুন। তাঁর চাকরি গেলে আমরা একেবারে পথে ভাসবো। জলে ভরা চোখ দুটি সে আমার মুখের দিকে তুলে ধরলো।

নথির দিকে চোখ নিবিষ্ট করে বললুম,—তোমার মতো আমারও এর মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। আমি আর তেমন উদার ও মহানুভব নই।

—না, না, আপনি মুখ তুলে না চাইলে—

বাধা দিয়ে বললুম—কার দিকে আর মুখ তুলে চাইবো বলো? তুমি আমাকে যে অপমান করলে—

—অপমান? সুমিতা যেন ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল।

—হ্যাঁ, এতদিন অন্য সংজ্ঞা দিয়েছিলুম, কিন্তু এখন একে অপমান ছাড়া আর কী বলবো? তোমার জন্যে, তোমার প্রেমের জন্যে আমি যে স্বার্থত্যাগ করলুম তুমি তার এতটুকু সুবিচার করলে না, এতটুকু সম্মান রাখলে না। শেষকালে পশুপতি কিনা তোমার স্বামী। তোমার স্বামী কিনা শেষকালে পশুপতি! এর পর তুমি আমার কাছ থেকে কী আশা করতে পারো?

কিন্তু, সুমিতা আমার পায়ের কাছে বসে পড়লো; তবু, আপনি দয়া না করলে—

চেয়ার ছেড়ে এক লাফে উঠে দাঁড়ালুম। বললুম—কেন দয়া করতে যাবো? তুমি আমার কে?

—কেউ না হলে কি আর দয়া করা যায় না?

—না। তুমিই বলো না, কী দেখে আমাব আজ দয়া হবে? কঠিন, কটু গলায় বললুম,—তোমার মাঝে দেখবার মতো আর কী আছে?

সুমিতা উঠে দাঁড়ালো। আজ তার বসার থেকে এই দাঁড়ানোব মাঝে কোনো দীপ্তি নেই। সঙ্কোচে নিতান্ত ম্লান হয়ে প্রায় ভয়ে-ভয়ে বললে,—সেদিন কী দেখেছিলেন?

উত্তপ্ত গলায় বললুম—সেদিন দেখেছিলুম তোমার প্রেম।

নথি-পত্রের মধ্যে ডুবে যাবার আগে একটা হাকিমি ডাক ছাড়লুম : নগেন।

নগেন আমার পিওন।

বললুম,—এঁকে আলো দিয়ে পশুপতিবাবুর ওখানে পৌঁছে দিয়ে এসো। দেরি কোর না।

মুমূর্ষু দীপশিখার মতো সুমিতা একবার কেঁপে উঠল। কী কথা বলতে গিয়ে চমকে বলে ফেল্‌লে, —না, আলোর দরকার হবে না। আমি একাই যেতে পারবো।

দরজার কাছে এসে সুমিতা তবু একবার থামলো। ঘরের চারদিকে মৃত, শূন্য চোখে চেয়ে একবার চোখ বুজলো। কী যেন আরও তার বলবার ছিল, কিন্তু একটি কথাও সে বলতে পারলো না।

তার সঙ্গে অস্পষ্ট চোখোচোখি হতেই তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিলুম।

*ফাল্গুন, ১৩৪০*

# তুষার-মামি

## আশাপূর্ণা দেবী

আমাদের প্রতিদিনকার পথে কত ঘটনা ঘটে, কত মানুষ আসে যায় ; যারা পথ হতে সরে যায় তাদের কাউকে আমরা একেবারে হারিয়ে ফেলি, ভুলে যাই ; আবার কাউকে কখনো সম্পূর্ণ বিস্মৃত হতে পারিনে ; কারণে অকারণে মনে পড়ে যায়, আর হারানোর ক্ষতিটা যেন বড় বেশি লাগে। কত তীব্র অনুভূতি কোমল হয়ে আসে, সন্ধ্যামেঘের মত আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়। আবার তুচ্ছ কোন ঘটনা চিরদিনের মত মনে দাগ রেখে যায়।

ছোট বেলার কথা ভাবতে গেলেই আমার সব প্রথম মনে পড়ে তুষার-মামির কথা। তিনি সকলের মধ্যে থেকেও কেমন যেন অসাধারণ ছিলেন, আর তাঁর সেই সাদা পাথরে গড়া প্রতিমার মত মুখে এমন একটা মহিমময়ী ভাব ছিল, যা আমাকে অভিভূত করে দিত। কিম্বা সেটা হয়তো আমার অভিভূত হবারই বয়স। নইলে সকলেই তো তুষার মামিকে দেখেছে ; মুগ্ধ হওয়া দূরের কথা, সকলেব মুখেই তাঁর সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনা শুনেছি। আমার অন্য মামিরা বলতেন তুষার বৌয়ের নাকি অত্যন্ত অহঙ্কারী স্বভাব। কেউ বলতেন রূপের, কেউ বলতেন বিদ্যের। তা ছাড়া আর তো অহঙ্কার করবার ভগবান তাঁর জন্যে রাখেন নি কিছু। আমি তাকে দেখি আমার মামাব বাড়িতে এক রকম আশ্রিতার মত। দূর সম্পর্কের জ্ঞাতিদের বৌ তিনি, স্বামী নাকি তাঁর তখন নিরুদ্দেশ। বুড়ো এক শ্বশুর ছিলেন ; আমার মামার বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে তাঁদের পুরোনো আমলের দোতলা কোঠা অনেক জায়গা ভেঙে চুরে গিয়েছে—সেইখানে তুষার-মামি প্রতিদিন দুবেলা শ্বশুরকে খাবার নিয়ে গিয়ে খাইয়ে আসতেন। পরের অন্ন গ্রহণ করতে তাঁর লজ্জা ছিল না, কিন্তু পরের বাড়ি এসে প্রতিদিন পাত পেতে খেতে তাঁর নাকি অপমান বোধ হত। রান্নাঘরের পিছন দিয়ে একটা রাস্তা ছিল সেই খান দিয়ে গেলে তুষার-মামিদের বাড়ি খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যেত। রান্নাবান্না শেষ হলেই ভাত বেড়ে নিয়ে বাড়ির একটা ছোট ছেলেকে সঙ্গে করে তিনি শ্বশুরকে খাওয়াতে যেতেন, একদিনের জন্যও তার ব্যতিক্রম হত না। পরে শুনেছিলাম তুষার-মামির শ্বশুর, মামার ঐ ছোট কাকা নাকি ভয়ানক মাতাল ছিলেন বলেই মামি সেখানে থাকতে পারতেন না। সত্যি তাঁর রাজরানির মত গম্ভীর মুখের ভাবে আশ্রিতার দীনতা একেবারেই স্পর্শ করত না। তাই পরের বাড়ি থাকাটা যেন তাঁকে মোটেই মানাত না। আমার ছেলে বয়সের কল্পনাপ্রবণ মনে মনে হত—ইচ্ছে করলেই তুষার-মামি এখুনি অদ্ভুত একটা কিছু করে ফেলতে পারেন, সকলে দেখবে যাকে আমরা নেহাৎ সাধারণ মেয়ে বলে ভেবেছি সে এক ছদ্মবেশিনী রাজকন্যা। শ্বেত হস্তী এসে পিঠে তুলে নিয়ে যায়। এমন আরও সব রূপকথায় পড়া ঘটনার সঙ্গে তুষার মামিকে মিলিয়ে অনেক কিছু কল্পনা করেছি।

তুষার-মামিকে আমি দেখেছিলাম মাত্র মাস চারেক; তারপরই তাঁর জীবন নাট্যের শেষ যবনিকা পড়ে গেল। বাবার সঙ্গে থাকতাম দূর প্রবাসে, জ্ঞানে প্রথম বাংলাদেশে আসি তের বছর বয়সে। দীর্ঘকালের ব্যবধানে মার আবার সন্তান-সম্ভাবনায় বাবা ব্যস্ত হয়ে আমাদের মামার বাড়ি পাঠিয়ে দেন, দাদামশাই দিদিমা তখনো বেঁচে। আসবার সময় আমার যে কি একটা অদ্ভুত আনন্দ হচ্ছিল তা বর্ণনাতীত। ছোটবেলার জীবনটা আমার বেশির ভাগ কেটেছে গল্পের বইয়ের মধ্যে—তাই সব জিনিসে কল্পনার রং চড়িয়ে দেখা আমার স্বভাব ছিল। তাই এই প্রথম মামার বাড়ি যাওয়া ও বাংলা দেশ দেখার মধ্যে যে উত্তেজনা ছিল তা আমার বয়সের মেয়েরা ঠিক অনুভব করতে পারবে না। মাকেও দেখলাম; বাসা থেকে আসবার আগে কদিন ধরে যে বিষণ্ণ নিরানন্দ ভাব ঘিরে রেখেছিল সেটা গাড়িতে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই কমে এল। খানিকটা দূর যেতেই বাপের বাঁড়ির আত্মীয় স্বজনের কথায় ছোট বেলার খুঁটিনাটি গল্পে একেবারে মেতে উঠলেন। বাবা প্রথমটা না হুঁ করে উত্তর করছিলেন, এক সময় দেখলাম ঘুমিয়ে পড়েছেন। বাবার মুখের দিকে চেয়ে কষ্ট হল। আহা আমরা না হয় নতুন জায়গায় যাবো, কত সব নতুন কিছু দেখবো বলে এত আনন্দ হচ্ছে, কিন্তু বাবাকে তো আবার দু'দিন পরে এই পথ দিয়ে একলা ফিরতে হবে। আমাদের মিরাটেব বাসায় বাবা আছেন, অথচ আমরা নেই একথা যেন ভাবাই যাচ্ছিল না। কিন্তু মাব আনন্দেও দোষ দেওয়া যায় না; মা নাকি এই ন বছর পরে বাপেব বাড়ি যাচ্ছেন। যেমন আমার তেমন তো তাঁরও বরং আরও বেশি—ভাই বোন দাদা দিদি আরও কত কি তাঁর আছে যা আমার নেই।

বাবা ঘুমিয়ে পড়ার পর মার সঙ্গে চুপি চুপি গল্প করতে করতে—মামার বাডিব প্রায় সকলকেই চিনে নিলুম এবং মনে সন্দেহ রইল না দিদিমা দাদু মামা মাসিদের কথা তো ছেড়েই দাও, গ্রামের সকলের সঙ্গেও যেন আর নতুন করে পরিচয় করতে হবে না।

মার নতুন ঠানদি 'রাঙাখুড়ি' 'পদ্মদিদি' 'বিপিন ভাইপো' 'ও-বাড়ির ছোটকাকা' আর রাজীব দাদাকে অনায়াসেই চিনে ফেলতে পারবো। এমন কি সন্দেশের দোকানে চিন্তামণি ময়রাটাকে পর্যন্ত, যদি বেঁচে থাকে। মা তো বলেন তখনই খুব বুড়ো ছিল। মা বললেন, চিন্তামণির ছোট ছেলে লালমোহনের সঙ্গে মা নাকি ছোটবেলায় অনেক খেলেছেন। আশ্চর্য রকমের অবাক হয়ে যাই। মার এখনকার এই জীবনের সঙ্গে এ কথাটাকে যেন কিছুতেই খাপ খাওয়ানো যায় না।

মায়ের এদিকটা যেন একটা চাবি দেওয়া বন্ধ বাক্স ছিল, হঠাৎ ডালা খুলে গিয়ে সব এক সঙ্গে ছড়িয়ে পড়তে চায়। এত কথাই বা মাব সঙ্গে কবে কইতে পেরেছি? সেখানের সেই রুটিন বাঁধা সময়ে লেখাপড়া সেলাই গান, ইত্যাদির ফাঁকে ফাঁকে মাকে যতটুকু পেতাম তাতে সম্পূর্ণতা ছিল না। কোন কোন ভদ্রমহিলা বেড়াতেও আসতেন মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে মার যা গল্প সে অমি মুখস্থ বলে দিতে পারতাম—এমনি কেতা দুরস্ত একঘেয়ে কথাবার্তা।

মামার বাড়ি গিয়ে কি করতে হবে না হবে, সে সবও কিছু শিক্ষা হল। যদিও সেটা

নেহাত গণ্ডগ্রাম নয়—কলকাতারই কাছাকাছি একটা জায়গা, তবু বাংলা দেশের পল্লীগ্রামে তো আমাদের দূর দূরান্তর প্রবাসজীবনের সঙ্গে অনেক প্রভেদ!

গাড়ি থেকে নেমেই সেটা কিছু কিছু বুঝতে পারলাম। আমরা আসবো বলে পাড়ার অনেক লোক মামার বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন—কারণ মার বাপের বাড়ি আসাটা একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা। গাড়ি থেকে নামতেই একটু কেমন যেন হাসাহাসির ভাব দেখলাম সকলের মধ্যে; দমে গেলাম বেশ কিছু। একেই তো আমার মুখচোরা স্বভাবের জন্যে এত লোক দেখেই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, তার পর এই হাসাহাসি। পরে জেনেছিলাম বাবার আদর করে দেওয়া প্রকাণ্ড 'ডলটা' কোলে করে নামাই নাকি আমার ভয়ানক ভুল হয়ে গিয়েছিল। এতবড় লম্বা মেয়ে ফ্রক পরে চুলে রিবন বেঁধে পুতুল কোলে করে গাড়ি থেকে নামা—এসব দিকের লোকের চোখে বিসদৃশ ঠেকবে মা বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু বাবাব ভয়ে কিছু বলতে পারেননি। বাবা ফিরে যাবার পর আমি বেশির ভাগ সময়ই শাড়ি পরে কাটিয়েছি।

প্রণাম আশীর্বাদ নানারকম কাণ্ড কারখানা একটু কমতেই দিদিমা আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন—মেয়ে যে তোর মাথা ছাড়াল কমলি। খুব শে মেম তৈরি করছিস দেখছি, সায়েব জামাই পাবি তো? মা হাসলেন।

দিদিমাকে দেখলে মোটেই মনে হয় না আমার মায়ের মা। ছোটখাট রোগা গড়ন, খনখনে গলা। তবে বেশ হাসিখুসি ভাব, মোটের উপর মন্দ লাগল না। এই সময় প্রথম দেখি তুষার মামিকে একটা থামের আড়ালে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলেন, এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে বললেন—চল মীরা হাত মুখ ধোবে। মাকে সুন্দরী বলে আমার মনে মনে বেশ কিছু গর্ব ছিল, তুষার-মামিকে দেখে সে গর্ব অনেকটা কমে গেল; ওর এই তুষারের মত সাদা রঙের জন্যই নাকি এই নাম। বড় হয়ে মনে হল মনটাও তাঁর ছিল চির-তুষারাবৃত।

তাঁর সঙ্গে ঘরে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। তিনি আমাব হাত থেকে পুতুলটা নিয়ে একটা আলমারির মাথায় তুলে রেখে বললেন—এটা এখন এখানে থাক্, পরে খেলা কোরো—বুঝলে? এস মুখ ধুয়ে ও মাটানা ছাড়বে, শাড়ি নেই তোমার?

বল্লাম—আছে আমার সুটকেসে, কিন্তু সিল্কের।

সিল্কের? আচ্ছা তা হোক তোমরা অনেক দিন পরে এসেছ কিনা, নানা রকম লোক আসবে দেখতে, শাড়ি পবে থাকলে বেশ দেখাবে কেমন?

নেহাৎ বোকা ছিলাম না, উদ্দেশ্য যে খালি ভাল দেখানোতেই নয়, কিছু কিছু বুঝলাম। সেই মুহূর্তেই তুষার-মামিকে খুব আপনার মনে হল।

এই তুষার মামির কথা মার মুখে আগে শুনিনি, মোটে নাকি সাত বৎসর তাঁর বিয়ে হয়েছে, তার পক্ষে কিন্তু একটু বড়ই দেখায়। মা.' সই রাজীব দাদার স্ত্রী ইনি। রাজীব মামা নাকি চিরকালই একটু উড়ো উড়ো স্বভাবের। অনেক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থেকে হঠাৎ বাড়ির লোককে না জানিয়ে এই বিয়ে করে আনেন। হয়তো মামির অসাধারণ রূপ তার কারণ। তাবপর কিছুকাল বেশ ভাল ভাবে নাকি সংসার করেছিলেন, চাকরিও করেছিলেন

কিছুদিন! তবে বাপ মাতাল বলে বাপের সঙ্গে তাঁর বনত না; মাঝে মাঝে ঝগড়া করে পালিয়ে যেতেন। এখন প্রায় একবৎসর হল আর আসেননি।

গ্রামে রাষ্ট্র যে সন্ন্যাসী হয়ে নাকি এক সাধুর সঙ্গে চলে গেছেন। কিন্তু তলে তলে সকলেই বলতো স্বদেশী দলে নাকি যোগ ছিল তাঁর, পুলিশের ভয়ে লুকিয়ে আছেন। কিন্তু মামিকে আর কেউ ভাল চক্ষে দেখতে পারল না, যেন এই দুর্ঘটনার জন্য মামিই দায়ী। মামির শ্বশুরও দুটিবেলা খেতে বসে এমন সব দুর্বাক্য বলতেন—আমার রাগে মনে হত—মামি যদি ভাত নিয়ে না আসেন বুড়ো না খেয়ে শুকিয়ে থাকে তো বেশ হয়। আমি আসার পর থেকেই সঙ্গে আসাটা আমার অবশ্য কর্তব্যে দাঁড়িয়েছিল। এই পথটুকু মামিকে একলা নিজস্ব করে পাবো সেই লোভে। এক একদিন রাত্রে বুড়ো এমন 'বে-এক্তার' হয়ে থাকতেন যে খাবার ছড়িয়ে বাটি গেলাস ছুঁড়ে চেঁচিয়ে মেচিয়ে একাকার করতেন; মামির কিন্তু বিরক্তি দেখিনি; তিনি নিঃশব্দে বাসনগুলো কুড়িয়ে নিয়ে চলে আসতেন। আমি প্রায় জিগ্যেস করতাম, মামিমা, তোমার রাগ হয়না? তিনি আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসতেন। সকলের থেকে তাঁর হাসিটা যেন আলাদা ছিল। কেমন লজ্জা করতো। কোনদিন বা বলতেন—গুরুজনেব ওপর কি রাগ করতে আছে? সহ্য করতে হয়।

এই শিক্ষাই তো তাঁর ছিল; কিন্তু শেষকালটায় যা করলেন তা' যেন রহস্যাচ্ছন্ন হয়ে বইল আমার কাছে।

আমার নিজের বড়মামিকে কিন্তু মোটেই ভাল লাগতো না। সব সময়ে তাঁর মুখে চোখে একটা ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ভাব লক্ষ্য করেছি। মার সঙ্গে অবশ্য তাঁর পরিহাসেরই সম্বন্ধ; কিন্তু পরিহাস আর উপহাস এক জিনিস নয়, সেটা তখনই বেশ বুঝতে পারতাম।

আমি সর্বদা তুষার-মামির কাছে থাকতে ভালবাসতাম বলে বড়মামি প্রায়ই নানারকম কথা বলতেন—একদিন স্পষ্টই বললেন, বিদূষী কলাবতীর কাছে দিনরাত্তির থেকে থেকে মেয়েটির তোমার পরকাল ঝরঝরে হয়ে গেল ঠাকুরঝি। এইবেলা সাবধান হোয়ো। আমি তো বাড়ির একটা মেয়েকেও ওদিক মাড়াতে দিই না।

মা হেসে বললেন—তুষার-বৌ নাকি বোনার কাজ বেশ জানে, তাই শেখে ভাই; লেখাপড়ার দফা তো গযা হচ্ছে বসে বসে, একটা কাজের যদি চর্চা থাকে মন্দের ভাল।

বড়মামি মুখ টিপে হেসে—ভাল হলেই ভাল, বলে চলে গেলেন। মার মুখেব দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালাম, কিন্তু মা বারণ কবলেন না কিছু।

আর একদিন দিদিমার বোনঝি, মার পদ্মদিদি আমাকে আড়ালে ডেকে বললেন---দিনরাত ও ছুঁড়ির সঙ্গে ফুসফুস গুজ্‌গুজ্ করিস কিসের লা? 'ছেলে' 'ছেলের' সঙ্গে থাকবে, তা নয় সমবয়সী খেলুড়িদের সঙ্গে ঠ্যাকারে কথাই কওয়া হয়না। দিনরাত বুড়োমাগির ন্যাজ ধরে থাকা। ওর সঙ্গে মিশোনা বাছা, পেটে ওর অনেক শয়তানী।

আমার কিন্তু মনে হল আসলে তুষার-মামিব দোষ ছিলনা; রাজীবমামা চলে যাওয়াতে উনি গলগ্রহ হয়েছিলেন বলেই সকলের জাতক্রোধ।

সমবয়সীদের সঙ্গে মিশবার চেষ্টা করে দেখেছি—কোথায় যে বাধে বুঝতে পারিনা কিন্তু মিশতেও পারিনি। তাই সকলের বারণ সত্ত্বেও আমার এই নিরাপদ আশ্রয়টি আঁকড়ে

ধরে রইলাম। মা বলতেন তুষার-মামি স্বামীকে দেবতার মত দেখেন। তখন ঠিক বুঝতে পারতাম না কিন্তু কিছু যেন অনুভব করতাম। কখনো কোনো সময়ে আমার সঙ্গে গল্প করতে করতে রাজীবমামার কথা উঠলে মুখটা যেন তাঁর আলো হয়ে উঠতো। একদিন বললেন—মীরা তোমার সঙ্গে গল্প করতে আমার খুব ভাল লাগে, তুমি এখানের মেয়েদের মত পাকা নও; এইরকম সরল মেয়েই আমার পছন্দ হয়।

অথচ বড়মামি মেজমামি যখন তখন বলতেন—এতবড় মেয়ে তোমার কি 'ন্যাকা' ঠাকুরঝি?

তুষার-মামির গলায় একটা লকেট দেওয়া সরু সোনার চেনহার ছিল। আমার যেমন সব সৃষ্টিছাড়া প্রশ্ন ছিল—একদিন বললাম—আচ্ছা মামিমা, রাজীবমামা কি রকম দেখতে ছিলেন? মামি একটু ইতস্তত করে লকেটটা খুলে দেখালেন। ছোট্ট ফটো, ভাল বোঝা গেল না, মুখটা তো ভালই মনে হল। মামি লকেটটা বন্ধ করে মাথায় ঠেকিয়ে সেমিজের মধ্যে নামিয়ে দিলেন; তার পরই অন্য কথা পেড়ে সে কথা চাপা দিয়ে ফেললেন। নিজেকে প্রকাশ কবতে চাইতেন না তিনি মোটেই। রাজীবমামা যে তাঁকে এত দুঃখের মধ্যে ফেলে রেখে গেছেন, তার জন্য অনুযোগ করতেন না কখনো। মাসের মধ্যে দুটি দিন ছিল তুষার মামির ছুটি; ওঁর শ্বশুর শহরে যেতেন পেন্সন আনতে, কোন্ বন্ধুর বাড়ি উঠতেন জানিনা, পরদিন আসতেন। পেন্সন যা পেতেন তাতে নাকি তাঁদের দুজনের স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারতো; শুধু মদ খেয়ে নষ্ট করতেন বলেই ওঁদের এত কষ্ট।

এমনি একদিন সন্ধ্যেবেলা একটা হ্যারিকেন হাতে করে তুষার-মামি আমায় বললেন—মীরা একবাব যাবে আমার সঙ্গে ও বাড়ি?

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম—কেন আজকে তো ছোট ঠাকুর্দা নেই?

তা' হোক—এমনি চল না, ঠাকুরঘরে আলো দিয়ে আসবো, আজ লক্ষ্মীপূজো কিনা।

আমরা বেরুচ্ছি, পদ্মমাসি হেঁকে বললেন—কি গো, কোথায় যাওয়া হচ্ছে ভরসন্ধ্যেবেলা?

এত সামান্য কথায় ভয় পাবাব কি আছে। দেখলাম তাঁব মুখটা ভয়ে নীল হয়ে গেছে। শুকনো গলায় বললেন—আজ লক্ষ্মীপূজো, ঠাকুর ঘরে একবার 'সন্ধ্যেদীপ' দেব, তাই—

আমরা বেরুতেই শুনলাম পদ্মমাসির গলা—'নক্ষির' কপাল আজ ফিবলো লো বড়বৌ বলে না সেই "রাখালী কত খেলাই দেখালি।" সাতজন্মে তো এসব হুঁশ হয় না। দুটি ধিঙ্গিই হয়েছেন সমান। কমলি মেয়ের আখেরটি খেলে। আরও কি বললেন কে জানে, আর শুনতে পেলাম না।

আমিও কিন্তু সেদিনকাব ব্যবহাব তার বুঝতে পাবলাম না। ওবাড়ি গিয়ে তুলসী তলায় প্রদীপ দিয়ে ঠাকুর ঘরে প্রদীপ দিয়ে, বেরিয়ে এসে মামিমা হঠাৎ আমার হাতটা চেপে ধরে বললেন—তুমি একবারটি এখানে একলা থাকতে পারবে মীরা, লক্ষ্মী মেয়ে আমি শুধু ওপবটা দেখে আসবো!

সত্যি কথা বলতে কি এই অন্ধকাব পড়ো-বাড়ির দিকে চেয়ে আমার সাহসে কুলোল না। ভয়ে ভয়ে বললাম, আমিও যাই না। মামিমা কেমন যেন ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলেন,

না না, লক্ষ্মী মেয়ে সোনা মেয়ে তুমি আলোটা নিয়ে থাকো, আমি এমনি যাচ্ছি একবারটি—পারবে না? কি মিনতির স্বর।

বুকের রক্ত হিম হয়ে এলেও ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিলাম। মামিমা অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেলেন। একটু পরে যখন এলেন স্পষ্ট দেখলাম হাত পা ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। গলার স্বরও কাঁপা, বললেন—মীরা, লক্ষ্মী মেয়ে—আমি ওপরে গিয়েছিলাম বোলো না কাউকে? তুমি যদি আমায় একটুও ভালোবাসো, বোলো না, তাহলে ভয়ানক বিপদ হবে। বলবে না বল, এই আমার হাত ছুঁয়ে বল।

এরকম কথাবার্তা তাঁর মুখে কখনো শুনিনি; ঘাড় নেড়ে রাজি হলাম, কিন্তু মনের মধ্যে খট্‌কা থেকে গেল। গেলেই বা ওপরে, নিজেরই তো বাড়ি, এতে দোষ কি? আজো বুঝতে পারি না—কি হয়েছিল সেদিন। আরও একদিন ছোট ঠাকুর্দাকে ভাত দিয়ে আমায় বললেন—মীরা একটু দাঁড়া আসছি আমি, বলে ওঁদের যে একটা গোয়ালের চালা ছিল তার পাশ দিয়ে কোথায় চলে গেলেন। যখন এলেন, দেখি মুখ রাঙা, চোখ ছলছলে ভারি। তার চুলে গায়ে ছোট ছোট খড়ের কুটি লেগে রয়েছে; মুখ দেখে প্রশ্ন করতে সাহস হলনা—মনে হল খড়ের গাদায় পড়ে কেঁদেছেন নাকি।

ক'দিন পরে হঠাৎ একদিন সকালে উঠে দেখি—বাড়ির যেন কি রকম একটা বিশ্রী থম্‌থমে ভাব—সকলেই চুপ। মা আমাকে ডেকে বারণ করে দিলেন—তুষার-মামির ঘরে যেন না যাই বা তাঁর সঙ্গে না মিশি।

একটু পরে বড়মামি এলেন আমাদের ঘরে, বললেন—দেখলে তো ঠাকুরঝি, তখনি বলেছিলাম? তোমার ভাই, সাদা মন, ও সব বুঝতে পারোনি। ওই দুঃখে রাজীব ঠাকুরপো দেশত্যাগী হল; নইলে অমন সুন্দরী বৌ—আপনি পছন্দ করে বিয়ে করলে, মানুষ কি আর অমনি ছেড়ে চলে যায়?

মা গম্ভীরভাবে বললেন—কি জানি বড়বৌদি, মানুষ চেনাই দায়। প্রতিমার মত মুখ, দেখে কে বলবে তার ভেতরে পাপ আছে।

বড়মামির দেখলাম যেন খুব খুশি খুশি ভাব, বললেন—ওগো ওই রূপ দেখে সবাই মজে। জন্ম জন্ম যেন এমনি কুচ্ছিত হই বাবা। হুঁঃ।

ছোটদের কাছে কেউ কিছু না বললেও দেখলাম—জানতে কারুর বাকি নেই ব্যাপারটা। আমিই বোকা। মামাতো বোন বিভা আমারই বয়সী হবে—আমায় চুপি চুপি বললে—জানিস, তুষার-কাকি রাত্তিরে চুপি চুপি কোথায় চলে গিয়েছিল, ভোর বেলা এসেছিল।

আমি থতমত খেয়ে বললাম—তাতে কি হয়েছে ভাই? বিভা মিনা শৈলি ঠেলাঠেলি করে হাসতে লাগল, বললে—কি বোকা রে 'মিরিটা'? তুষার-কাকি 'খারাপ মেয়ে' মানুষ। ওই জন্যেই তো আমরা মিশিনা বুঝলি?

'খারাপ মেয়েমানুষের' অর্থ ভাল করে বোধগম্য হবার বুদ্ধি আমার ছিলনা তখন, তবু কি যেন একটা অজানা আশঙ্কায় হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এল।

রান্নাঘরে দুধ খেতে গিয়ে দেখি পদ্মমাসি রান্না চাপিয়েছেন। অন্যদিন তুষার-মামিই রান্না করেন। আমার কেন জানিনা চোখে জল এল—দুধ না খেয়ে পালিয়ে এলাম।

পদ্মমাসি পিছন থেকে তাড়া দিয়ে উঠলেন—চলি গেলি ক্যান লা! দুধ খেয়ে যা? বাব্বাঃ কম্‌লির মেয়ে যেন ধিঙ্গি—অবতার। রুপুসি হলেই অনেক ঠাট্‌ হয়।

তুষার-মামির ওপর একটা অবোধ অভিমানে আমার সমস্ত দিন বারে বারে চোখে জল আসছিল। কেন তিনি অত ভাল হয়েও খারাপ মেয়ে মানুষ হলেন? যদি খারাপ মেয়েমানুষ হলেন কেন আমাকে অত ভালবাসলেন? সমস্ত দিন তুষার-মামিকে কেউ খেতেও ডাকলে না। একবার একবার দেখছিলাম ভাঁড়ার ঘরের পাশের ছোট ঘরটায়, যেখানে রাজ্যের পুরোনো লেপ তোষক ভাঙা বাক্স টাক্স গাদা করা আছে—চুপ করে বসেছিলেন জানলায়। আমার এক একবার মনে হচ্ছিল, ঠিক যেন সেই অশোক বনে সীতার ছবিটা।

সারাদিনই বাড়িতে একটা চাপা কথাবার্তা, তলে তলে কি যেন সব কাণ্ড ঘটতে লাগল।

সন্ধ্যেবেলা আবার বিভা হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বললে—জানিসরে, তুষার-কাকিকে আর আমাদের বাড়ি রাখা হবে না। দাদুটাদু সবাই বলেছেন। আমি বাইবের ঘরের পিছনের জানালা দিয়ে শুনলাম লুকিয়ে লুকিয়ে। দাদু বললেন 'খারাপ দৃষ্টান্ত' নাকি, দৃষ্টান্ত মানে কি রে!

আমার তখন মানে বলবার অবস্থা নয়। কানে একটি কথা বাজছিল 'এবাড়িতে আর রাখা হবে না'। বললাম—তা'হলে কোথায় থাকবেন?

বিভা অবজ্ঞায় ঠোঁট ওল্টে বললে—যেখানে ইচ্ছা। ছোট্‌দাদুও ত বলেছে—বাড়ি ঢুকলে জুতো পেটা করবো হারামজাদিকে—

বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হবে বোধ হয়।

পরদিন সকালে কিন্তু আর কিছু চাপাচাপি থাকল না; তুষাব-মামি নাকি নিজেই চলে গেছেন রাত্রে। শুধু তাই নয়, দিদিমার বাক্স থেকে নাকি দশটা টাকা চুরি করে নিয়ে গেছেন, এখন যার যা ইচ্ছে হল তাই বলতে লাগল। বিন্দু ঝি পর্যন্ত বললে, ওনার পেটে পেটে অনেক 'ছেনালি' গো—আমি বলি উনি ঘরের বৌ, আমি ঝি মনিষ্যি—বললে ভাল দেখাবে না; এই ক'দিন আগে রেতেব বেলা দেখি কাপড়ের তলায় কলাপাতে মুড়ে কি নিয়ে হন হন্‌ করে চলেছে পুকুব ঘাটের পানে। আমি বলি—হেঁগা বৌদিদি, রাত দুপুরে কোথায় যাচ্ছো? দেখে যেন ভূত দেখলে এমন চমকানি, বলে "এই ছেলেদেব এঁটোপাত কখানা নিয়ে একেবারে ঘাটে যাচ্ছি গা ধুতে। বান্নাব পর গা না ধুলে ঘুম আসে না, যা গরম।" আমি বলি হবেও বা, কিন্তু কেমন বাবু সন্দ হল। চোখে না দেখলে তো কিছু বলতে নেই মা। কে না কি পাড়ার একজন গিন্নি একদিন ভাঙা শিব মন্দিবেব ওখানে লুকিয়ে দুজন মানুষকে কথা বলতে শুনেছিলেন—এমনি আরও সব ছাই পাঁশ কথা। এর পর একবাক্যে স্থির হয়ে গেল, ওরকম খারাপ স্ত্রীলোক গ্রামে আর নেই। বিদেয় হয়েছে লোকের হাড় জুড়িয়েছে। না হলে নাকি গাঁয়ের সর্বনাশ হত।

কিন্তু গ্রাম থেকে বিদেয় তিনি হননি; একটু বেলা হলেই সে কথা জানা গেল।

'চৌধুরীদেব চণ্ডিমণ্ডপ' বলে একটা ভাঙা মস্ত দালান ছিল মামাব বাড়ির কাছে; তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেল তুষাব-মামিকে। কড়ির গায়ে ঝাড় লণ্ঠন ঝোলাবাব যে বড় আংটা লাগান ছিল তাতেই দড়িব ফাঁস লাগিয়ে গলায় দিয়ে ঝুলছেন। সে কি বীভৎস! অত সুন্দব মুখ ওরকম হয়ে যায়—এ শুধু দেখেছি বলেই বিশ্বাস কবতে পারি।

তারপর যেন একটা ঝড় বয়ে গেল মামার বাড়ির ওপর দিয়ে। পুলিশ এল, দারোগা এল। পাড়ার লোক ভেঙে পড়লো। মামারা ছুটোছুটি করতে লাগলেন। মাকে সকলে বারণ করেছিল দেখতে, তবু নাকি ছাত থেকে দেখেছিলেন। ভয় কেবল কেবল মূর্ছা হতে লাগল মার; ভোর রাত্রে শুনলাম, আমার নাকি একটি ভাই হয়েছিল মরা। মার শরীরও খুব খারাপ। অনেক ডাক্তার আসতে লাগল। এর জন্যও সবাই তুষার-মামিকে দায়ী করতে লাগল। আমারও তখন সে কথা মনে হয়েছিল। ভাইটিকে দেখতে পেলাম না বলে এত কষ্ট হয়েছিল যে তুষার-মামিকে হারানোর দুঃখ কমে গেল। রাগ হল তাঁর ওপর, তিনি এই সব কাণ্ড না করলে তো মার কিছু হতনা? বড় হয়ে বুঝেছি, যার যা নিয়তি তা' ঘটবেই, যার কপাল মন্দ সেই নিমিত্তের ভাগী হয় মাত্র।

তুষার-মামি এমনি দুর্ভাগিনী ছিলেন, যে মরেও কারুর করুণা পেলেন না।

এর পরই আমরা বাবার সঙ্গে মিরাটে চলে এলাম। মার অসুখ শুনেই ছুটি নিয়ে গিয়েছিলেন—আসবার সময় দিদিমা কাঁদতে লাগলেন; বললেন "বাবা, বড় মুখ করে রেখে গিয়েছিলে—আমার কপাল মন্দ তাই এমন হল।" বাবা অবশ্য মুখে বললেন—আপনি কি করবেন যা' ভাগ্যে ছিল হবে তো? কিন্তু আর কখনো পাঠান নি আমাদের মামাব বাড়ির দেশে, যা গিয়েছি কলকাতায় ছোটমামার বাড়ি।

মা একদিন তুষার-মামির কাহিনি বলেছিলেন বাবাকে, বাবা কিন্তু শুনে বললেন—তোমাদের নিশ্চয় কোথাও ভুল হয়েছে, মন্দ হলে গলায় দড়ি দেবেন কেন? চলে গেলেও তো পারতেন?

মা বললেন—হয়তো সাহস হয়নি, নয়তো যার ভরসায় যাবে সে উপযুক্ত নয়।

বাবা বললেন—তাকে ভাল হবার সুযোগ না দিয়ে লাঞ্ছনা করে সকলে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলে! তুমি সৎসাহস দেখিয়ে এখানে নিয়ে আসতে পারলে বুঝতুম।

মা হাসলেন; বললেন—দেখনি তাই বলছো। তাহলে হয়তো শেষ পর্যন্ত আমাকেই গলায় দড়ি দিতে হতো।

বাবা কি উত্তর দিলেন শুনিনি; বললেন—মীরা একগ্লাস জল আনো।

এসে আর সে কথা শুনলাম না।

রহস্যময়ী তুষার মামি আমার কাছে চিররহস্যই রয়ে গেলেন। কত দিন চলে গেল, আজো মামাব বাড়িব সেই রান্নাঘরেব রোয়াকটা স্মরণ করলেই মনে হয়—তুষার-মামি মুখ বাড়িয়ে হেসে বলছেন—কি মীরা দুধ খাবে? মুখ ধোওয়া হয়েছে?

ধব্‌ধবে মুখ—আগুন তাতে রাঙা হয়ে উঠেছে, আর সেই ফটো দেওয়া লকেটটা সকালের রোদ পড়ে ঝকঝক করছে। সেই প্রতিমার মত মুখ, সে কি কলঙ্কিনীর?

মৃত্যুমলিন বীভৎস ভয়ানক মুখ সে যেন আর কারোর—আমার তুষার-মামির নয়।

কিছুদিন পরে দিদিমাব চিঠিতে জানলাম, রাজীব মামা নাকি নিজে ইচ্ছে করে পুলিশে ধরা দিয়েছেন, মরুকগে যাক্ কে তাঁর কথা নিয়ে মাথা ঘামায়?

তুষার-মামিই যখন নেই, তখন আর—?

*ভাদ্র, ১৩৪৫*

# দেবী-মাহাত্ম্য

## কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীবামপুব জাযগাটা ইংবাজি আমলেব First Chapter এব জিনিস,—তাই আশপাশেব গ্রাম বা সহবগুলিব অনেকটা অগ্রগামী, অনেক সম্ভ্রান্ত সম্পত্তিশালী আধা-সম্পত্তিশালী“ বাস। আযেসেব সামগ্রীগুলো এই সব স্থানেই আড্ডা খোঁজে। তাই 'চা' টাও চট্ কবে এখানে চলে গিছলো। এখানে সকলেই একটু উঁচু চালে চলতে চায।

ক্ষেত্তব বাবুদেব বৈঠক্ থেকে তাসেব আড্ডা ভেঙে যখন প্রফুল্ল উঠে পডল'—তখন বাত প্রায এগাবটা। সঙ্গীবা সঙ্গ নিলে, বাস্তায বেবিযে বল্লে- শীতে কালিযে গিছি, চল, তোমাব ওখানে এক কাপ চা খেযে যাওযা যাক্।

প্রফুল্ল বললে—আমাব মুখেব কথাটা কেডে নিযে তোমবাই বলে ফেললে।

একটু তফাৎ থেকে আওযাজ এল,— "এ অন্তর্যামীটি কে?"

সকলেই সোৎসাহে বলে উঠল--খুডো না কি! আসুন--আসুন,—Welcome।

খুডো—না বাবাজি, বাত হেযে গেছে—তোমবাই যাও।

অবিনাশ—ইস, বেজায স্ত্রৈণ হযে পডচেন দেখছি—

খুডো— জৈন মত ধবতে হযেছে যে বাবাজি। আব Cruelty to animals কেন? ওব প্রাযশ্চিত্তেব পাত্তা যে পুঁথিতেও পাই না। সর্বভুক ইংবেজ বাহাদুবও—কাঁকডাব দাঁডা ভাঙাটা, দণ্ডবিধিব বেডাজালে ফেলে দিযেছেন। তবু বক্ষে—যদি দযা কবে একটু কামডায।

অবিনাশ—কেন?

খুডো -সব পাপটা চাপে না,—কিছু ক্ষয হয। মধুলিপিও বলচেন না—

—"নিবস্ত্র যে আবে —
নহে বথীকুলপ্রথা আঘাতিতে তাবে।"

অবিনাশ—ওঃ past all recovery একদম দুবাবোগ্য!

প্রফুল্ল – এখন আসুন তো, দু ছিলিম গুডুক খেযে যেতেই হবে।

খুডো— ছোঁযাচ ধবতে পাবে বাবাজি—

প্রফুল্ল—সে ভয বাখবেন না, আমাদেব মিন-মিনে মীনবাশি নয খুডো,—এ সব সিংহবাশি।

খুডো—"স্ত্রী আচাবে" বটে।

প্রফুল্ল—এখন চলুন তো,- -দু খানা গবম গবম কডাইশুঁটিব কচুবি খেযে যেতেই হবে। ও সব বৈঠকি-কথা বৈঠকে বসে শোনা যাবে।

খুডো— ভযেব না কি?

প্রফুল্ল—কতক্ষণ লাগবে? দু'ছিলিম্ চলতে চলতেই এসে পড়বে।

খুড়ো—বাজার থেকে?

প্রফুল্ল—খুড়োর মাথা খারাপ হল দেখছি! বাড়িতে এদের কাজটা কি?

খুড়ো—তা বটে। ওঁদের আবার কাজটা কি? ওঁদের নিজের কাজ ত নেই-ই বটে!

বারবাড়ির দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। অবিনাশ আশ্চর্য হয়ে বললে—"এ কি রকম! এত রাত হয়েছে— দরজা খোলা! এটা ত ভাল ব্যবস্থা নয় প্রফুল্ল; এক হপ্তার মধ্যে তিন্ তিন্ জায়গায় চুরি হয়ে গেল—শোন নি কি?"

প্রফুল্ল—শুনে ফল?

অবিনাশ—বুঝলুম না।

ইতিমধ্যেই বৈঠকখানায় আলো দেখা দিলে। "বসঁবে এস,—এসে বলচি" বলেই প্রফুল্ল বাড়ির মধ্যে চলে গেল।

রাত সাড়ে এগারটা,—পাড়া নিস্তব্ধ; বাড়ির মধ্য থেকে স্পষ্ট শোনা গেল—প্রফুল্ল বলচে, চট করে খান কতক কড়াইশুঁটির কচুরি আর পাঁচ কাপ চা বানিয়ে ফেল। অপেক্ষাকৃত নিচু সুরে বলা হল—আর তাওয়াদার এক ছিলিম তামাক বৈঠকখানার দোরগোড়ায় বেখে এলেই আমি নিয়ে নেব অখন। এইটে আগে,—বুঝলে!

রমণী-কণ্ঠে শোনা গেল—এত রাত্তিরে খুকি আর বিভূতি একমুড়োয় পড়ে থাকবে,—তাদের কাছে যে কারুর থাকা দরকার।

প্রফুল্ল—ঘরে আলো ত জ্বলচে।

রমণী সকাতরে বল্লেন—যদি ভয়টয় পায়—তুমি এক একবার দেখো—

প্রফুল্ল বিরক্ত হয়ে জবাব দিলে—আচ্ছা, সে হবে এখন; তুমি চট্ করে নাও,—ভদ্দরলোকদের দেরি করাতে পারব না। আর দেখ—আমার তবে আজ আর আলাদা লুচি ভেজে কাজ নেই, ওই কচুরি হলেই হবে।

প্রফুল্লর রাত্রে লুচি খাওয়া অভ্যাস; যত রাত্রই হোক সেটা গরম গবম ভেজে দিতে হয়। তাই বমণী বল্লেন, সে কি হয—তোমাব তা হলে খাওয়াই হবে না। তোমার তরে দু'খানা লুচি ভেজে দিতে আমার আর কতক্ষণ লাগবে।

তা যা হয় কর,—আর অমনি গোটাকুড়িক পান সেজে, গড়গড়ায় সঙ্গে রেখে এসো—বলতে বলতে প্রফুল্ল বেরিয়ে এলো।

( ২ )

"হল বলে" বল্‌তে বল্‌তে প্রফুল্ল বৈঠকখানায় প্রবেশ করেই টেবিলের ওপর থেকে একজোড়া ঝক্‌ঝকে তাস মাইফেলের মাঝখানে ফেলে দিয়ে বললে—ততক্ষণ দু'হাত চলুক্।

কুমুদ বললে—বাঃ—দেখি দেখি, এ জিনিস কোথা থেকে জোগাড় করলে,—বেঙ্গল-ক্লাব থেকে বুঝি?

খুড়ো—বললেন—মেকিঞ্জি-লায়েস্ বজায় থাকুক, প্রফুল্ল অভাব কি! মার্কাটা দেখেছ—বাজের ওপর ঘুঘু বসে— ভারি rare (দুর্লভ) জিনিস্, আবার তেমনি পয়মন্ত! প্যারিসের পণ্ডিতেরা ওর নামকরণ করেছিলেন—"রমণী-নিগ্রহ"! বড়লোকের বৈঠক-খানাতেই ওঁর বাস;—বাবাজির সময় ভাল।

"খুড়ো এইবার খুলচেন" বলে, প্রফুল্ল একখানা তুলে নিয়ে, খুড়োর সামনে এলিয়ে ধরে বল্লে—একবার গ্লেজ্‌টা (মসৃণতাটা) দেখুন।

খুড়ো—ও আর দেখাতে হবে না বাবাজি,—আমার কপালের চেয়েও গ্লেজ্‌টা বেশি দেখচি;—কোথাও কিছু ঠেক্ খায় না—ছোঁবার আগেই পিছলে যায়।

উপেন তাসাতে গিয়ে, তাসগুলো বৈঠকখানাময় ছড়িয়ে গেল।

খুড়ো বললেন—জিনিস্ বটে! বোধ হয় ভিজিয়ে খ্যালে।

উপেনকে "জানোয়ারটা" বলে কুমুদ কুড়ুতে লেগে গেল।

"ওঃ" বলেই প্রফুল্ল ভেতরদিকের দোরটা খুলে তাওয়াদার গুড়ুক সহিত গড়গড়াটা আর রূপোর পানের ডিপে, আসরে হাজির করে দিলে।

খুড়ো বললেন—ঝি-মাগি এত রাত অবধি রয়েছে না কি! সাধে বলেছি—প্রফুল্লর সময় ভাল!

প্রফুল্ল—ঝি আবার কোথায় দেখলেন! সে বেটি বেলাবেলি সন্ধ্যে জ্বেলেই—নিজের আলো নিবিয়ে দেয়!

খুড়ো—তুমিত বাবাজি বৈঠকে বসে—তবে তামাক সাজলে কে?

প্রফুল্ল—কেন—আর কেউ সাজতে পারে না না কি! সাধে বলেচি—খুড়োর মাথা খারাপ হতে আরম্ভ হয়েছে।

খুড়ো—সম্প্রতি অনেকের মুখেই ওই কথাটা শুনচি। আনন্দ এই যে,—মাথাটা তাহলে আগে ভাল ছিল। দেখচি নিজে সেটা না ধরতে পেরে—ছেলেবেলা থেকে কত ভাল জিনিসই খুইয়ে এসেছি!

উপেন—তার আর ভুল নেই খুড়ো—হাতি যদি নিজের দেহটা দেখতে পেত—তা' হলে—

খুড়ো বাধা দে বললেন—ঐ "তাহলে'টা আর ভেঙ্গে বলতে হবে না বাবাজি;—মানুষ আর্শি তয়ের করে দেশের অতিকায় ছেলেগুলোর কি উপকার করে দিয়েছে—

উপেন ছিল স্থূলকায়। একটা বড় রকমের হাসি পড়ে গেল। তরঙ্গটা মিলিয়ে এলে, অবিনাশ বল্লে—কথাটা ভুলেই গিছলুম,—হ্যাঁহে প্রফুল্ল, তখন জিজ্ঞেস করলুম—এত রাত পর্যন্ত সদর দোরটা অমন খোলা রয়েছে, অথচ চারদিকে চোরের উপদ্রব চলেছে,—শোননি কি? তুমি বললে—"শুনে ফল"! তার মানে কি?

প্রফুল্ল—এমন কিছু না। একদিন রাত্রে বেড়িয়ে এসে ডাক্‌লুম—দু'মিনিট হয়ে গেল উত্তরও নেই—দোর খোলাও নেই! রাত তখনো সাড়ে বারোটা হয়নি হে; —রাগে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে গেল। সজোরে একটা লাথি মারতেই খিলটা কোথায় ছট্‌কে গেল।

খুড়ো—মায়ের দুধ খেয়েছিলে বটে! তার পর?

প্রফুল্ল—দেখি, লাণ্ঠান্ নিয়ে ছুটে আসচেন। খুকিটে চিল চেঁচাচ্ছে;—বরদাস্ত করতে পারলুম না,—লাণ্ঠানটা ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম।

খুড়ো—আমিও ঠিক্ তাই ভাবছিলুম,—ও সময়ে ওছাড়া আর কিছু আসতেই পারে না fitও করে না। আমি নিজে না পারলেও, তোমাকে দুষ্‌তে পারি না। দাব থাকা চাই বই কি? তা না ত স্ত্রী পুরুষে প্রভেদ থাকে কোথায়?

প্রফুল্ল—শুনুন,—তার পর সাড়ে তিন মাস হয়ে গেল,—আজো দোরের খিলটে হল না! সেটাও কি আমার কাজ?

খুড়ো—তুমি যে অবাক্ করলে বাবাজি! তুমিই ভাংবে, আবার সারাতে হবেও তোমাকেই! তাহলে ত যার অসুখ তাকেই ডাক্তার ডাকতে—তাকেই ওষুধ আনতে যেতে হয়! এ ত সংসার নয়, এ যে শাঁখের করাত! তোমার ত তা হলে বাঁচোয়া নেই দেখচি।

অবিনাশ—ও জাতই ঐ রকম।

খুড়ো—তাইত, —বিষময—বিষময়! আচ্ছা, অতবড় ছেলে—সেটা করে কি? নেন্টো ছ'বছরের হল না! এই ত মুচিপাড়ার পাশেই গুপে ছুতরের ঘর,—বড় জোর দেড় পো পথ। সদর রাস্তার ওপরেই,—এত ভয কিসের! বউ-মা নিজে যেতেও ত' পারেন—

প্রফুল্ল—অদেষ্ট খুড়ো—অদেষ্ট; টাকা রোজগারও করব', আবার ছুতোর খুঁজতেও ছুটবো—

খুড়ো—মজা মন্দ নয়! না, তা আমি নিজে যাই হই, এতে সায় দিতে পারি না বাবাজি।

প্রফুল্ল—সব ত' শোনেন নি,—সেদিন গরুটো থানায় গিছলো, আমি না ছাড়িয়ে আনলে ত' আসবে না! চুলোয় যাক্—নিলেম হয়ে গেছে, বেঁচেছি।

খুড়ো—বল' কি—অমন পোষা গরুটো নাহক অন্যের গর্ভে গেল। দু'পা গিয়ে খালাস্ করে আনতেও কি দু' ছেলের মা'র ভয়। ওঁরা যে আমাদের রক্ষক,—এটাও কি এতদিনে বোঝেন নি!

উপেন—দোরের খিল্‌টে করিয়ে নিতে যারা পারে না, তারা গরু ছাড়াতে যাবে—

প্রফুল্ল—চুলোয় যাক্ —চোরে নে যাক, ওরই যাবে,— রাখতে পারে ওরই থাকবে,—ও সব আর আমি ভাবি না।

খুড়ো—বেশ করেছ, আমিও ঐ ব্যবস্থা দিতে যাচ্ছিলাম। তা না ত' ও-জাত জব্দ হবে না বাবাজি।

কুমুদ—বলচেন বটে,—কিন্তু ও-জাতটিকে বাগাতে ভীমার্জ্জুনও পারেন নি।

খুড়ো—ও কথা আমি মানি না। তারা লেখাপড়া শিখলে কবে বাবা। ওঁদের প্রোফেসার ছিলেন ত' সেই দুধের কাঙাল দ্রোণাচার্য। সারা মহাভারতখানা ঢুঁড়ে একখানা Row's Hints-এর খোঁজ মেলে না। উচ্চশিক্ষা না পেলে হবে কেন? 'কৌশলকুমার' (Bachelor of arts) অন্তত 'প্রথম কৌশলী' (First arts) হওয়াটা চাই। আমি হ'টে গেলুম কেন! কৌশলে কুলোয় না বলেই ত'। তা' ব'লে তোমরা কেন

হটবে; তোমরা ত' 'প্রথম কৌশলের' কোর্স পেরিয়ে পড়েছিলে, বাবাজি! লেগে থাকলেই পারবে—শনৈঃ পর্বত লঙ্ঘনম্।

কুমুদ—পারচি কই খুড়ো! এই ত' গেল রবিবারের কথা,—নিতাইদের বৈঠকে পাশা চলছিল,—কি জমেই ছিল! তিন চার কাপ্ চা'ও চলে গেল—

খুড়ো—তা চলবে না,—ওটা হল ভদ্রলোকের বাড়ি! তার পর!

কুমুদ—সে ছেড়ে কি ওঠা যায়—

খুড়ো—উঠ্‌তে বলে কে! "ওঠবার কথা ত' কোথাও নেই,—মহাভারতে ত' তার দরাজ ব্যবস্থা রয়েছে। তবে শুধু মূর্খের মত খেললেই হয় না—আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য থাকা চাই। পাণ্ডবদের পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে একটু বুদ্ধি ধরতেন বড়টি—তাই ও জাতকে বিদেয় করবার সহজ উপায় খেলার মধ্যেই খুঁজে নিছলেন—আর তা করে তবে উঠেছিলেন। তোমরা পথ থাকতে অন্ধ! হিন্দু শাস্ত্র ত' পথ বাতলাতে বাকি রখেন নি; moral courage চাই বাবাজি, মরেল করেজ চাই।

উপেন—খুড়োর মাথা বটে!

খুড়ো—এই যে বাবা, একটু আগে মাথা বিগড়েচে বলে দমিয়ে দিছলে. যাক—Paradise regained। তার পর।

কুমুদ—বাড়ি এলুম—স'দুটো! বড় গরম বোধ হতে লাগল! ছেলে-মেয়েগুলো—চিল্ চেঁচাচ্চে! মেয়ে গুলোকে অন্নপূর্ণার স্তোত্র শেখান হয়েছে কি না—তারি সুর তুলেছে। ও বেটা আলাউদ্দিন খিলজির কুলজি নিয়ে খই ভাজ্‌চে— পাড়া মাথায় করেছে! লোক বাড়ি আসে ঠাণ্ডা হবার জন্যে; —সর্বশরীর জ্বলে গেল। এক দাব্‌ড়িতে সব থামিয়ে দিয়ে, মিনিটাকে জিজ্ঞেস করলুম—"তোর মা কোথায়?" বললে—"দুটো বেজে গেল দেখে, তাড়াতাড়ি পুজোটা সেরে নিতে বসেছেন; তুমি এলে, আমাকে তেল দিতে বলেচেন; কি তেল মাখবে বাবা,—ফুলেলো না জবাকুসুম আনবো?" সামলে বল্লুম—শীগ্‌গির আসতে বল্ আগে,—একটু পা টিপে দিক্; ঠাণ্ডা না হয়ে নাইতে পারব না। মেয়েটা ফিরে এসে বল্‌লে কি না—"মা বলচে, আর দু'মিনিট্—প্রণামটা সেরেই যাচ্চি।" আমি ততক্ষণ পা টিপে দিচ্চি বাবা। এই ব'লে এগুতেই—ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিয়েই, বেরিয়ে পড়লুম। মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে ডাকতে লাগল—বাবা যেও না—মা এসেছেন,—এত বেলায় যেও না বাবা—

খুড়ো—ফেরনি ত?

কুমুদ—সে বান্দাই নই!

খুড়ো—আমার বরাবরই ধারণা, তোমাতে পদার্থ আছে।

কুমুদ—তার পর কিন্তু মেয়েটার তরে—

খুড়ো—never mind,—ওইগুলো হল weakness; এখন থেকে পাকানো চাই হে। কোন জেগুয়ারের হাতে পড়বেই ত'। তাঁর বাপ নেবেন রক্ত (টাকা) আর তিনি নেবেন জান্,—না পাক্‌লে প্রাণ বাঁচবে কিসে?

প্রফুল্ল—খুড়ো এইবার "মহৎ" হলেন দেখচি—ক্রমশ মিস্টিক হচ্চেন,—"জেগুয়ার" আবার কি?

খুড়ো—ঐ যে কি বলে, কুমুদ যা হে,—গ্রাজুয়েট—গ্রাজুয়েট।

একটা হাসির মধ্যে কথাটা চাপা পড়ে গেল। আঘাতটা কিন্তু কুমুদকে লেগেছিল, সে উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করলে—আপনাদের শাস্ত্রে বলে না—স্ত্রীলোকের স্বামীই দেবতা?

খুড়ো—বলে বই কি বাবাজি; তবে যুগ-ধর্মও আছে কি না, সেটা মান ত? সবই এখন বাড়মুখো (Progressive); দেখ না—আগে ছিলেন নবগ্রহ,—পরে প্রচুর প্রমাণ সহিত জামাতারা দশমের দাবি করেচেন; পঞ্চভূত—এখন ভূতের আড্ডায় দাঁড়াচ্ছে; নবধা কুললক্ষণম্ এখন শতধায় অগ্রসর। পূর্বের চেয়ে বেড়ে চলেছে সবাই—কমচে কেবল সুখ। দেবতাও বেড়েছে বাবাজি,—এখন স্ত্রীলোকের শুধু স্বামী দেবতা নেই,—অপদেবতা, উপদেবতা, কাঁচাখেগো দেবতাও জুটেছে। সেকেলে দেবতারা এখন নবাবি আমলের টাকা—অচল! যদি কেউ সংস্কার দোষে মানেন ত'—সন্ধ্যার সময় শাঁখ বাজিয়ে—আধ পয়সার বাতাসা দেখিয়ে চায়ে ফ্যালেন! কিন্তু অপদেবতার আরতির আয়োজন নিশুতি রাতে। তাঁরা হাত পা বার করে খান,—খুঁৎ হলেই ঘাড় ভাঙেন। সদাই জাগ্রত।

সকলে হাসিমুখে শুনলেও কথাটার মধ্যে জ্বালা ছিল, অবিনাশ বলে উঠল—এসব ত' এক তরফা ডিক্রি—দেবীদের কাজটা শুনি।

খুড়ো—এক কথায়,—পেটভাতার নিরেট বিশ ঘণ্টা দাসী-বৃত্তি, অর্থাৎ সকলকে খাইয়ে যদি বাঁচে সেইটাই আহাবেব Scale। নীরবে দোষ বহনের ভাঙা কুলো, আর স্বামীদের আত্মরক্ষার শিখণ্ডী হয়ে থাকা।

অবিনাশ—অর্থাৎ?

খুড়ো—অর্থাৎ! সব দোষই তাঁর। যখন দু'পয়সা আনে, আর লুচি হালুয়া, পোলাও কালিয়া চলে, তখন সেটা নিজেদের কৃতিত্ব, আব বিদ্যা বুদ্ধির সুফল; যখন অভাব, তখন—পরিবার আগোছানে—লক্ষ্মীছাড়া! অর্থাৎটা এই সব।

উপেন—টাকা রাখতে কেউ বাবণ করে না কি!

খুড়ো—এইবার ঠকিযেছ বাবাজি। যা'তা বলে অধর্ম বাডাতে পাবব না,—এইটে তাঁদেব খুব দোষ, এ স্বীকার করতেই হবে। আমিও ভাবছিলুম—রোজগার ত' কেউ কম কব না—কেউ ৮০, কেউ ১০০, এই মুটো মুটো টাকা আনচো, অথচ দরকারে পাবে না। —খরচটা কি? রোজ ৩।৪ টাকাই হোক, কোনদিন না হয ৫।৭ হল। ফি মাসে ত' আর জুতো জামা কিনতে হয়না,—গড়ে, ১০ টাকা মাস ধরলেই ঢের। তাতেও যদি টাকা না বাখতে পারেন, তার আর জবাব নেই।

অবিনাশ—খুড়ো হিসেবের বাগ্ দেখছি!

খুড়ো—কেন বাবাজি, ভুল কবলুম না কি?

প্রফুল্ল—কেন ওসব শুনচো,—পরিবার সম্বন্ধে ওব একটু weakness আছে।

কুমুদ—একটু।

উপেন—বিলক্ষণ! ন্যাওটো বল্‌তে পার।

প্রফুল্ল—আচ্ছা,—কেন বলুন ত' খুড়ো—ও জাতটা কি এতই দুষ্প্রাপ্য!

খুড়ো—তোমরা বুঝবে না প্রফুল্ল,—তোমাদের কেউ artist; কেই জেগুয়ার—I mean গ্রাজুয়েট;—আমি যে বাবাজি দুয়ের বার। আমার গেলে ত আর হবে না। তোমাদের ডিগ্রির ডোবায় অনেকেই সদক্ষিণা দেবী বিসর্জন দিতে ছুটবে। আর আমার একটা ঝি জোটে ত তার fee জুটবে না। বাড়িতে শয়তানের ঝাঁক চব্বিশ ঘণ্টাই বর্গির হাঙ্গাম চালাচ্চে; সামলাবে কে বলো! আর দিনরাত নিজের মুখ বুজে, আর সবার মুখ খোলবার ব্যবস্থা করবেই বা কে বাবাজি! এই দেখই না বাবাজি—এই তিন পোর রাতে, কোন মাসির-মার কুটুম্‌ দেবতাদের জন্যে কড়াইশুঁটির কচুরি ভাজতে বসেছেন। তবে দুঃখ করতে পার বটে,—এত সুবিধেতেও পয়সা রাখতে পারেন না। ব্যাঙ্ক রয়েছে, সেভিং ব্যাঙ্ক রয়েছে, দুপা গিয়ে কেবল রেখে আসা। ভাবলে বড় দুঃখ হয় বাবাজি।

অবিনাশ—না রাখেন নিজেই ভুগবেন, after me the deluge.

খুড়ো—তাত' বটেই, শাস্ত্রই বলচেন- –সম্বন্ধ জীবনাবধি। ঠিকুজি দেখিয়েছ ত?

অবিনাশ—এ আবার কি ঠিকুজি দেখিয়ে জানতে হয়।

খুড়ো—তা বটে, ওটা আমারি ভুল হয়েছে বাবাজি। যারা তৃতীয় প্রহরে মুখে সেরেফ্‌ একটু জল দেয়,—যাদের খাওয়া না খাওয়ার খোঁজ নেবার কেউ নেই, যারা ১০৪ জ্বরেও দুবেলা খেজমৎ খাটে,—রেঁধেও খাওয়ায়; যাদের কোথাও অসুখের অবসরই নেই—খাটুনি, আর হুকুম তামিলেই সর্বাঙ্গ ভরা, তারা মরবার সময় পারে কখন। ঠিকই ত,—ঠিকুজি দেখতে হবে কেন? Life Insure করনি ত'?

অবিনাশ—রাম কহো।

খুড়ো—বাঃ—কি শান্তি! বেড়ে আছ বাবাজি!

প্রফুল্ল—কিন্তু আপনার না কি একটা আছে।

খুড়ো—আমার কথা ছেড়ে দাও বাবাজি, —না মনিষ্যি, না জন্তু। ঘরে একপাল কাল-ভৈরব—শেষ পেটের জ্বালায় তোমাদেরি ঘরে সিঁদ দেবে যে; আর তোমাদের খুড়ি, কোথাও শাসন বাসন আর রন্ধন নিয়ে শিবপূজার সুখভোগ করবেন।

উপেন—দেখচো খুড়ো কতটা কাহিল!

অবিনাশ—আসল কন্যারাশি।

খুড়ো—প্রফুল্ল—"মেষ রাশি' বলে ভুলটা শুধরে দাও। কিন্তু বাবাজি, ৪০ বছর আগে আমার এ অপবাদ ছিল না।

প্রফুল্ল—এখন বয়সটা কত খুড়ো?

খুড়া—পিসিমার হিসেবে ১৮।১৯. ঠিকুজিতে দেখি ৩৬, কোন্‌টা ঠিক—কি করে বলবো। গুরুজনের কথায় অবিশ্বাসও করতে পারি না! তবে আমার এমনটা হবার কারণ,—আমার শ্বশুরবাড়ির তরফ থেকে ওষুধ করেছিল, তার প্রমাণও পিসিমা পেয়েছিলেন। জানই ত, বাবাজি, আমাদের সংসার বরাবরই একটানা স্বচ্ছল, বিবাহটাও

হয়ে গেল একদম্ খাঁটি সমান ঘরে। তারাও যেমন বসন্তকালের জন্যে হাঁ করে থাকে,—আমরাও তাই।

প্রফুল্ল—কেন?

খুড়ো—কোকিলের ডাক শোনবার তরেও নয়, দক্ষিণে হাওয়া পাওয়ার জন্যেও নয়,—শজনে খাঁড়ার জন্যে বাবাজি; তাতে ২।৩ মাস বেশ কেটে যায় কি না,—তোমাদের মোষ কাটা খাঁড়ায় দিন কাটে না বাবাজি। বসন্তে ভ্রমণং পথ্য এই শাস্ত্রবাক্য রক্ষা করতে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে পড়ি। দেখি, কোথায় বেদান্ত আয়ত্ত করবার কি সুব্যবস্থাই হয়ে রয়েছে,—যা দেখি, সর্বত্রই একমেবাদ্বিতীয়ম্। সুক্তো, ছেঁচকি, ছ্যাঁচড়া, ঝোল অম্বল—ডাঁটার ডেঁড়ে-সলাই! অবস্থার কৃপায় অভ্যাস দুরস্ত ছিল,—সাদরে সাপটে নিলুম। অভাবে ছিবড়ে ফ্যালার বদ-অভ্যাস কস্মিনকালে ছিল না। কিন্তু বাড়ি ফিরে তার ফুট ধোরল। পাঁচু ডাক্তার সামলে দিলে, কিন্তু পিসিমার সঙ্গে তাঁর মতের মিল হল না। বামাল পেয়ে ডাক্তার ঠিক করলেন—বদহজম; পিসিমা বল্লেন—ওগুলো ওষুধের শেকড়! এখন দেখচি পিসিমাই রাইট্! তা না ত' পুরুষসিংহের এ দশা দাঁড়াবে কেন। বুঝি সব বাবাজি কিন্তু কাজের বেলায় সেই শেকড়ে আটকায়। তা নাহলে সেদিন—থাক্— তোমরা আবার কি বলবে—

প্রফুল্ল—না খুড়ো, বলতেই হবে,—তাতে আর হয়েছে কি।

খুড়ো—কথাটা কিছুই নয়; জানই ত'—আমাদের বিনোদ বাবুরও আজকাল সময় ভাল,—ইস্টাকিন্ পোরে পাইখানায় যায়; সন্ধ্যে বেলায় বৈঠকে দশজন আসে,—বিশ কাপ চা বিশ ছিলিম তামাক, ৬০ খিলি পান, আর এন্‌তার জরদা সুরতি, ফুর্তিতে চলে। আমাদের এক পাঁচিলেই বাস; তাঁর বৈঠকখানা সদল রাস্তার ওপরেই—

কুমুদ—অত বোঝাতে হবে না—আমরাই ত' তার Daily passenger—

খুড়ো—বটে! শুনলাম, দিন পনের থেকে বিনোদের পরিবারের বিকেল হলেই মাথা ধরে আর ঘুস্‌ঘুসে জ্বর হয়। ওটা অবশ্য শোনবার কথা নয়; মেয়ে মানুষের অসুখ করে হয় করে যায়,—পুরুষদের সে খোঁজ রাখ্‌তে গেলে আর সংসার চলে না কারণ—সত্যিই চলে না! সে দিকটায় চোখ বোজাই সমীচীন!

প্রফুল্ল—ব্যাপারটা কি?

খুড়ো—উতলা হবার মত কিছু নয় বাবাজি! গত রবিবার তিনটের পর আমার সব্‌জিবাগের বেড়া বেঁধে এসে, নিজের কামরায় তামাক সাজতে বসেছি, ব্রাহ্মণী দাওয়ায় বসে বড়ি তুলছেন, অপর একটি স্ত্রীকণ্ঠ কানে এলো। তিনি অতি কুণ্ঠিতভাবে বলচেন,— "দিদি, দয়া করে তোমার খ্যাংরাকে যদি আমার একটি কাজ করে দিতে বলো। আজ কদিন বাড়ি ঢুকেই একবার করে শোনান—বৈঠকখানার বারদিকের চাতালটা যে বড়ই অপরিষ্কার হয়ে রয়েছে—দেশ-শুদ্ধু লোক দেখে যাচ্ছে! কোন দিন বলেন—রাস্তা থেকে দেখলে ছোট লোকের বাড়ি বলে মনে হয়। একদিন বললেন—ভদ্রলোকেরা আসেন—লজ্জায় মরে থাকতে হয়। সে দিন বললেন—কি পাপই করেছি—এ নরকবাস আর ঘুচলো না! আজ দু'দিন সদর দিয়ে না এসে খিড়কি দিয়ে

বাড়ি আসেন, মনও খুব ভার ভার, অকারণেই চোটে ওঠেন। কাল বললেন,—"সোমবার থেকে 'মেসে' থাকবো ঠিক্ করেচি, কালকের রাতটে দয়া করে উদ্ধার করে দাও,—যাঁরা আজও এই ম্যাথরের বাড়ি আসেন, তাঁদের চারটি পোলাও আর মাংস খাইয়ে ছুটি নিয়ে বাঁচি।

এই বলে বিনোদ বাবুর স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে বললেন—এই জ্বর-গায়ে যদি ১৫।১৬ দিন পাঁচটা ঘর, গোয়াল, উঠোন, বাসন—সব পরিষ্কার রাখতে পারি ত' ১০ হাত চাতালটা ঝাঁট্ দেওয়াই কি পারি না। সদর রাস্তার ওপর বাড়ি,—সাম্‌নে হরে স্যাক্‌রার দোকানে রাতদিন ভদ্রলোকের ভিড়, দিনের বেলা বেরুই কি করে। সন্ধ্যে না হতেই বৈঠকে ওঁর বন্ধুরা আসেন—১২টা রাতে খেলা ভাঙে। তার পর ওঁকে খাইয়ে সব সারতে দেড়টা বেজে যায়,—তখন একলাটি রাস্তার ওপব যেতে ভয় করে দিদি। আবার ভোর পাঁচটা না বাজতে ৫।৭ জন চা খেতে আসেন। এখন আমি কি করি বল দিদি! আমি কি বুঝচি না—এত কথা, এত কাণ্ড, কেবল ওই র'কটুকু ঝাঁট দিতে পারিনি বলে।

ব্রাহ্মণী বল্লেন—কি এমন কাজটা, দু'মিনিটও ত' লাগে না! ও টুকু তাঁর নিজে করে নিলে কী হয়! এর তরে এত পর্ব—দুসপ্তা ধরে উল্‌টো পাক! কি অধর্ম!

বিনোদ বাবুর স্ত্রী চোখ মুছতে মুছতে বল্‌লেন—আমাব উপায় থাকলে ওকে বলতে হবে কেন। গেল বছর নগর-সংকীর্তন দেখতে বৈঠকখানার জানালায় এসে দাঁড়িয়েছিলুম। তাতে আমার আর কি বাকিটে ছিল,—সবই জান ত' দিদি। এখন তুমি না বাঁচালে—আমার যে কি অদৃষ্টে আছে জানি না, বলে কাঁদতে লাগলেন। ব্রাহ্মণী তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,—আমি এক্ষুণি খেন্তিকে পাঠিয়ে দিচ্চি বোন্‌ এ আবার একটা বড় কাজ না কি!

বিনোদ বাবুর স্ত্রী বললেন—বন্ধুদের বল্‌তে বেরিয়েছেন বেশি দেরি নাও হতে পারে—তাই আমার তাড়া; আমি আর দাঁড়াব না দিদি—বল্‌তে বল্‌তে দ্রুত চলে গেলেন।

আমি ঘরে বসে টিকের ফুঁ দিতে দিতে শুনছিলুম কখন যে ফুঁ বন্ধ হয়ে গেছে জানি না; দেখি, তামাক পুড়ে—সব নিবে ছাই! ফেলে রেখে উঠলুম। খেন্তি শজনে ফুলের সন্ধানে বেরিয়েছে—কখন ফিরবে ঠিক্ নেই। ঝাঁটাগাছটা নে বেরুলুম। ব্রাহ্মণী বললেন—কোথা যাও? বললুম—আসচি।

গিয়ে দেখি, রকের ওপর—তামাকের গুল আর ছাই, সিগারেটের শেষটা, দেশালায়ের কাটি, পানের ছিব্‌ড়ে। দু' আঁচড়েই সাফ হয়ে গেল—দু'মিনিটও লাগল না। সেগুলো যথাস্থানে ফেলে দিয়ে ফিরে এলুম। তামাক সাজতে সাজতে ভাবতে লাগলুম,—আচ্ছা, এতে বিনোদের আটকাচ্ছিল কোন্‌খানটায়! করলে ত' মনটা প্রফুল্লই হয়; তবে—না করে এতটা কষ্ট, এতটা অশান্তি ভোগ করবার কারণ কি?

কুমুদ—আপনি সেটা বুঝবেন না খুড়ো—

খুড়ো—না বাবাজি,—পারচি আর কই। এতে খারাপ ত কিছু খুঁজে পাচ্ছি না; বরং (অন্যের হলেও) করে পেলুম, একটু আনন্দ।

উপেন—সকলেরি মান সম্ভ্রম বলে একটা দরকারি জিনিস আছে,—সেটা গরিব দুঃখীরাও বজায় রেখে চলতে চায়।

খুড়ো—বটে! কেবল স্ত্রীলোকের বুঝি সেটা নেই, বা থাকা উচিত নয়? তোমাদের গুরুরা এমন কথা কোথাও বলেচেন কি? তাঁদের ত ঘোড়া টওলতে, বাগান কোপাতে, পত্নীর বুটের তলায় হাত দিয়ে গাড়ি চড়াতে দেখেচি বাবাজি।

প্রফুল্ল—That's another thing.

খুড়ো—তা হলেই বাঁচি। যা হক্ বাবাজি ভাবতে লাগলুম,—চৌধুরি মশাই তবে কোন্ নজিরে সেদিন বলে ফেললেন,—Your hand is never the worse for doing your own work. There was never a nation great until it came to the knowledge that it had nowhere in the world to go to for help—বোধ হয় except to wife কথাটা চেপে গিছলেন।

অবিনাশ—আরে বাস্—Bravo! কে বলে—

খুড়ো—না বাবাজি—সে অপবাদ দিও না; বেণী মাস্টার মানে বুঝিয়ে দিছলেন, আমার ওই মুখস্থটুকুই দাবি। যা হোক্ বাবাজি, সেদিন গুড়ুকে অভদ্রা পড়েছিল, তামাক খাওয়া আর হয়নি। ধরানো টিকেখানার দু'ফোঁটা চখের জল পোড়ে ছ্যাঁক্ কোরে উঠে। ব্রাহ্মণী বলে উঠলেন—"এখন আবার রান্নাঘরে ঢুকলে কেন? ওই ক'খানা কুমড়ো ভাজ্‌তে, এখনি আধ-পলা তেল ঢেলে বোস্‌বে।"

কুমুদ—তা হলে ও-কাজও—

খুড়ো—তা করতে হয় বই কি,—দরকার হলেই করতে হয় বাবাজি; তা না ত' দুঃখের ভাত মুখে উঠবে কেন! করতে কি দ্যায়,—ঐ Co-operationএর বিশ্বাসটুকুই যে তার সুখ—

হঠাৎ ছেকল নাড়ার শব্দ হওয়ায়, প্রফুল্ল অন্দরের দিকেব দোরটি খুলতেই, দু'থাল গবম গরম কচুরি, এক রেকাবি হালুযা এগিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ কাপ্ চা, তার পরই তাওয়াদার তামাকের সুগন্ধ!

খুড়ো চা খান না, একটু উঁচু গলায় বল্‌লেন—দু'চার থালা। আলাদা করে রেখ মা। নারায়ণকে দেবার ক্ষমতা হয় না, তোমাদের কল্যাণে আজ তাঁকে নিবেদন করে প্রসাদ পাব।

প্রফুল্ল—সে কি! এখন খাবেন না!

খুড়ো—না বাবাজি। নতুন জিনিসটে যদি তোমাদেব কল্যাণে জুটলো, বাড়িতে নারাযণ রয়েছেন, তাঁকে দিয়ে—

প্রফুল্ল—তাইত, মিছে এতটা কষ্ট দিলুম—

খুড়ো—তুমি দাওনি বাবাজি, আমি ইচ্ছে করেই নিলুম,—তা না ত' তোমাদের তাড়ায়—এমন পরিপাটি জিনিস তয়ের হত না--ওগুলোর সঙ্গে মায়েবও হাতটা পা'টা পুড়তো! তোমরা ত' জান না বাবাজি, কত ধানে কত চাল হয়—হুকুম আর হুম্‌কিটাই অভ্যাস করেছ! যাক্, তোমাদের উত্তেজনা আসে, এমন একটা কিছু নিয়ে ২।৩ ঘণ্টা বাজে বোকে যদি না তোমাদের বসিয়ে রাখতুম,—যতই সব অতিষ্ট হতেন আর হাই তুলতেন,—তোমার তাগাদাও ততই উগ্র হয়ে বউমার উপর উচ্চগ্রামে গিয়ে পৌঁছুতো আর এই পরিশ্রমের পুরস্কারটা, অকারণ তিবস্কারের রূপই ধোরত।

কুমুদ—সেইটে সামলাবার জন্যেই বুঝি বসেছিলেন?

খুড়ো—সত্যই তাই বাবাজি! তা না ত, আমি কি জানি না কাদের সঙ্গে তর্ক করচি; আমি কি বুঝি না বাবাজি, যে, তোমরা যা করে থাক', সেটা অনেক পড়ে-শুনে হাসিল করেছ;— সেটা academyর আবিষ্কার; তার ওপর কথা কওয়া আমার বিদ্যের কাজ নয়! রাত দুটো পর্যন্ত সময়টা যাতে কেটে যায়, উতলা হয়ে প্রফুল্লকে না চঞ্চল করে বোসো, তাই বাজে কথাটা তুলে ব্যথা দিয়েছি, কিছু মনে কোর না বাবাজি। শুনিচি ত বড় বড় ঘসিটি বেগম পর্যন্ত চিরজীবন ঘাস কেটেছিলেন; রুক্মিণীও পাকশালার পাক খেয়ে 'বড় রাঁধুনি' নাম পেয়েছিলেন—যাদের যা কাজ। সংসারের কাজ ত' সায়েস্তা খাঁদের নয়,—তাঁদের সেরেফ্ শাসন,—তবে না রাজ্য চলে?

অবিনাশ—খুড়ো এতক্ষণে ধাতে এসেছেন!

খুড়ো—অধর্মের ভয়টা রাখতে হয় যে বাবাজি, পরজন্ম মানি যে!

উপেন—Nothing is too late—এখন পথে আসুন খুড়ো,—পায়ের ধুলো দিন্।

খুড়ো—আশীর্বাদ করি—সুমতি হোক্!

*কার্তিক, ১৩৩০*

# বঞ্চনা

## শক্তিপদ রাজগুরু

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। শহরতলির গাছগাছালির মাথায় পাখির ডাক থেমে গেছে; আঁশফল গাছের ঘন কালো পাতায় আঁধার নামা রাত্রি, আকাশের আঙ্গিনায় ফুটে রয়েছে দু একটা তারাফুল; ঊষার মনে গুন গুন একটা গানের কলি। বাস থেকে নেমে বাড়ির দিকে ফিরছে; খোয়াঢাকা পথের দুপাশে এখনও সবুজের ঘন পুঞ্জ; দত্তদের বাগানে কোথায় ফুটেছে হাস্‌নুহানা ফুল। রাতের বাতাসে ব্যাকুল সৌরভ ওর মিশে আছে নীরব কান্নার রেশে। সুপুরি গাছের মাথায় দমকা বাতাস ঝড় তোলে।

ঊষার মনে একটা চাপা খুশির আমেজ; সমস্ত মন ছেয়ে সেই সুরটা অদেখা অনুভূতির সঙ্গে মিশে রয়েছে। মিটমিটে আলো জ্বলছে রাস্তায়—একটা থেকে অন্যটা অনেক দূরে; জীবনের পথ যেন অমনি, খুশির হাওয়া—পাওয়ার আনন্দ, অমনি আলোর মত দূরে দূরেই ছড়ান, একটা থেকে অন্যটায় যাবার পথ অন্ধকার হতাশায় ঢাকা, আলো-আঁধারিতে মেশামেশি। কোথায় একটা পাখি ডেকে উঠল—রাতজাগা কোকিল। কি মাস! বাতাসে ছড়ানো তারই ইশারা, আমের বোলে মধুসঞ্চয়, গুনগুন উড়ছে মৌমাছি, বাতাবিফুলের গন্ধ লাগে। বসন্তকাল।

মোটা থ্যাবড়া-নাক হেডদিদিমণির বুলডগের মত মুখখানা মনে পড়ে; অকারণেই আজ খুশি হয়ে ওঠে বেলাদি। চোখদুটো গালের জমাট মাংসস্তরের আড়ালে হারিয়ে যায়, হাসলে মানুষকে এত কুৎসিত দেখায় এর আগে জানে নি ঊষা; কুশ্রী মোটা বেঢপ বেলাদি নাকি এককালে একটি ছেলেকে ভালবেসেছিল; কথাটা ভাবলেই হাসি পায় ঊষার; দুঃখ হয় ছেলেটার জন্য। ওই নীরস কর্কশ মদ্দা মেয়েকে ভালবাসার বিড়ম্বনা সহ্য করবে কোন্ পুরুষ—একথাটা ভাবতেই কেমন লাগে। শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেছে বেচারা—মরে বেঁচে গেছে। ওর ভয়েই বোধ হয় আঁৎকে উঠে হার্ট-ফেল করেছিল। বাপরে কি গলা! যেন বাঁশ ফাটছে। ইস্কুলের মাস্টারদের হাজরিখাতা আগলে বসে থাকে দশটা থেকে—কে কখন আসছে তার দিকে কড়া নজর, সেদিন সুলতার ছেলের অসুখ, দেরিতে এসেছে। ছাত্রীদের সামনে কি নাকালই না করলে তাকে। বেচারি তো চোখের জলে নাকের জলে।

বেলাদি গজগজ করে—ঘর-সংসার আর চাকরি দুটো একসঙ্গে হয় না, দুধও খাবো তামাকও খাবো—এটা কি ভালো কথা সুলতা?

কেমন যেন জ্বলছে সারাটাদিন, হিংসায় ফেটে পড়ে ওদের দেখলে, আড়ালে রমা বলে—বুঝলি, ও ভয়ানক হিংসুক। বিশেষকরে বিয়ে থা যারা করেছে।

ঊষা কথা বলে না, মনে হয় কথাটা খানিকটা সত্যি, একদিনের ব্যর্থতা ও ভুলতে পারে নি। সেই বেলাদি আজ নিজে এসে তাকে সংবাদটা জানায়, ঊষা এ্যাসিসট্যান্ট

হেডমিস্ট্রেস হচ্ছে, মাইনে খাতির দুই বাড়লো।...কোকিলটা তখনও ডাকছে। আবছা চাঁদের আলোয় বাতাবি ফুলের গন্ধমাখা বাতাস কাঁপে থরথর মুকুলঝরা আম বাগানে—পথ হারিয়ে। আর চারটে লাইট পোস্ট—বাঁশ বনটা দেখা যায়, ওর পাশেই তার বাড়ি। সাধুখাঁয়ের বৌদের চাকরিটা ছেড়ে দেবে এইবার।

হালি বড়লোক, বাড়ির কর্তা এখনও ঠেটি গামছা পরে। চাকামত মুখখানা হাড়ির তলার মত, কালো কুচকুচে গলায় একটা সরুহার। বৌগুলোও তেমনি মাংসের ডেলা; ছিরি ছাঁদ নেই, গড়ন পেটনের বালাই নেই, যেমনি চেহারা কিম্ভূতকিমাকার, তেমনি রুচি। গায়ে একতাল করে সোনার বেঢপ গহনা চাপানো। আধুনিক হবার জন্য বাড়িতে মাস্টার রেখেছে; পড়াশোনা এক আধটু আর সেলাই ফোড়াইও শেখাবে, সেই সঙ্গে চালচলনও।

উষা যেন ওই জগদ্দল বাড়ির মাঝে একটা বাইবের আলো হাওয়ার স্পর্শ। নোতুন মেশিন কিনে বৌরা সেলাই শিখছে। শিখছে তো হাতি। নামেই শেখা।

বাড়ির আলো দেখা যায়, গেটের মাথায় মাধবীলতার সবুজ সবুজ পুঞ্জে ফুলের শুভ্রতা, আবছা অন্ধকারে দু একটা রজনীগন্ধার স্তবক মাথা তুলে রয়েছে। লেখার সুর শোনা যায়। রেওয়াজ করছে লেখা। জানলার পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় ওর মুখের একপাশ, সুন্দব টকটকে রং, নীল শাড়িতে মানিয়েছে চমৎকার।

বারান্দা দিয়ে বাইরের ঘরে এগিয়ে গেল উষা, অশোক ঢুকছে বাড়ির গেটে, তার পিছু পিছুই। বাল্যবন্ধু ললিতার ভাই।

—তুমি!

—হ্যাঁ, একটু দরকার ছিল তোমার কাছে।

উষা আবছা অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এগিয়ে আসে। সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা, আলোকের দিকে চেয়ে কি ভাবছে; তাকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখে ভিতরে আসে সে।

—বসো, আসছি।

—এই ফিরলে বুঝি? অশোক একটা চেযার টেনে নিয়ে পুরানো মাসিকের পাতা ওলটাতে থাকে।

এ বাড়িতে এসেছে সে বহুবার, উষার বাবা মারা যাবার সময় সেই সমস্ত কাজকমের ব্যবস্থা করে, নানা ভাবে দুটি পরিবার একসঙ্গে যেন জড়িয়ে আছে। ললিতার বিয়ের সময় উষাই কথাটা জানায়—বোনটি চলে গেল পরের ঘরে, তাই বলে আমি তো যাই নি। যোগাযোগটা রেখো বুঝলে?

অশোকও ভোলেনি উষার কথা, নিজের বোনের মতই নানাভাবে সাহায্য করেছে তাকে। অভাবের সংসার, কলেজের মাইনে পরীক্ষার ফি—এমন কি কলম-বই পর্যন্ত দিয়ে সাহায্য করেছে উষা।

—ললিতার ভাই তুমি, আমার কি কোন দাবি নেই?

ওর কথায় আর অমত করতে পারে নি অশোক, বহুদিন বহুভাবে উষা তাকে ঋণী করে রেখেছে।

জানলার পর্দাটা দুলছে—ওপাশের ঘর থেকে ভেসে আসে সুরের রেশ; সন্ধ্যার স্তব্ধ অন্ধকারে সৌরভমদির বাতাসে নিঃশেষে হারিয়ে গেছে সেই সুর। যেন অসংখ্য ভ্রমর উড়ছে গুনগুনিয়ে।

একটা মৃদু শব্দ—শাড়ির ঘসঘসানি; টিপয়ের উপর প্লেটটা নামাল উষা; কয়েকটা সন্দেশ—আর দু কাপ চা।

—নাও, মিষ্টিমুখ করো।

অশোক ওর দিকে চেয়ে থাকে, এরই মধ্যে স্নান সেরে এসেছে। চুলে মিশে রয়েছে হালকা সুবাস, চোখের তারায় একটা শ্যাম সজীবতা। হাসছে উষা...মিষ্টি একটু হাসি।

—হ্যাঁ, প্রমোশন হল যে, এ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিস্ট্রেস।

—ওরে বাবাঃ , এইবার ওই দেহে মেদ মাংস লাগবে। ফুলে ফেঁপে বুলডগের মত হয়ে উঠবে।

হাসছে উষা; তবু ওর কথায় মনে মনে যেন শিউরে ওঠে। বেলাদির মুখখানা অকারণেই চোখের সামনে ভাসে। ওর জীবনের একদিনের ব্যর্থ কাহিনি, যে প্রেম কোন সার্থকতা পায় নি, তারই বেদনা ওর দেহ মন ঘিরে আজও লেগে রয়েছে অভিশাপের মত। ব্যর্থ করুণ একটি কান্নার সুর। কৃত্রিম কোপে চটে ওঠে উষা।

—যাঃ, যা তা বলছে। কই মোটা হচ্ছি আমি?

কেমন যেন অভিনয় করছে উষা, ইস্কুলের কড়া দিদিমণি রাতের সৌরভমদির বাতাসের দোলায় যেন দুলছে—মাধবীলতাব ঝোপে হারানো চন্দনফুলের মত। অশোক সন্দেশ চিবুতে চিবুতে বলে, হওনি—হতে কতক্ষণ?

—না, হবো না আমি। বুঝলে মশাই। উষা অকারণেই হাসে।

অশোকের হাতে তুলে দেয় টাকাগুলো; এ দেওয়ায় যেন অপরিসীম আনন্দ আছে, কি একটা কাজে বাইরে যেতে হচ্ছে তাকে কদিন, হঠাৎ কিছু টাকার দরকার। অশোককে দেবার জন্যই যেন উষা পথ চেয়ে ছিল। সেবার এম-এ পরীক্ষার ফিস যোগাড় হয়নি; জমা দেবার দিনও পার হয়ে যাচ্ছে; কথাটা ললিতার কাছে শুনে নিজেই গিয়ে হাজির হয়; চুপ করে বসে আছে অশোক, দু একটা টুইশানি মাত্র সম্বল, তারাও সময়মত দিতে পারেনি, ছাপোষা গৃহস্থ।

উষা ওর মাথার চুলগুলো ধরেই নাড়া দেয়—বলোনি কেন? লজ্জা করে, না?

একশো টাকা তুলে দেয় ওর হাতে; অশোক কি যেন বলতে যায়, বাধা দেয় উষা—দুম করে খাটের উপর বসে—ওর পাশেই।

—ধরো দিকি, ললিতার কাছ থেকে আসছি। বাপরে কি পথ; হাঁপিয়ে গেলাম। যা লাগে জমা দিও, বাকি রেখে দাও, পরীক্ষা দিতে যাবে এই ভোঁতা পাইলট কাঁধে করে? একটা কলম কিনে নিও, বুঝলে।

ঝড়ের মত আবার বের হয়ে এসেছিল উষা। কোথায় যেন একটা দাবি তার জন্মে গেছে।

লেখার রেওয়াজ থেমে গেছে। বাতাসে হাজারো মৌমাছির গুনগুনানিও স্তব্ধ হয়ে গেছে। অশোক উঠে পড়ে।

—রাত হয়েছে চলি।

ঊষা এগিয়ে দেয় তাকে গেট পর্যন্ত। লেখার দরজার কাছে এসে দেখে বইখাতা বের করে পড়ছে লেখা। দুপাঁচবছরের তফাৎ; নামেই যেন পিসিমা। ...তবু লেখা কোথায় একটা সম্মানের গণ্ডী টেনে রেখেছে। ঊষাকে দেখে মুখ তুলে চাইল, এতক্ষণ নিবিড়ভাবে পড়ার মধ্যে ডুবে রয়েছে সে। ...হাসছে ঊষা।

—কি রে, গান আর পড়া, এছাড়া দুদণ্ড কি করবার কিছুই নেই। বাইরে একটু বেরুলেই তো পারিস। সিনেমায় টিনেমায়—

—ধ্যাৎ, ও সব ভালো লাগেনা আমার; সেই প্যানপ্যানে প্রেম, আর নাকিসুরে গান: কি যে গান। কানে গেলে বেসুরো ঠেকে।

ঊষার মনে হালকা স্বরের রেশ, চাঁদ ওঠা রাত্রি, নারকেল গাছের বিরলপাতার পিছনে পড়ে তার আভা; কেমন যেন অদ্ভুত ভাল লাগে তার। দুঃখ হয় লেখার জন্য—চাপা একটা সহানুভূতি; জীবনের একটা স্পর্শ থেকে আজও বঞ্চিত রয়েছে সে।

বৌদি দাদা মারা যাবার পর লেখাকে তার কাছে আনে ঊষা। মনের মত করে মানুষ করে তুলবে। দাদাকে শান্তি দেয়নি বৌদি। দজ্জাল ঝগড়াটে মেয়ে তুচ্ছ ব্যাপার নিয়েই আকাশ ফাটিয়ে ফেলতো, সামান্য ব্যাপার থেকেই সংসারে অশান্তির একটা স্থায়ী কালো ছাপ জেঁকে বসেছিল। অভাব অভিযোগ সহ্য করেও মানুষ বাঁচবার জন্য সংগ্রাম করে; কিন্তু অহরহ; অশান্তি আর দুর্ভোগ মানুষের বুক পুড়িয়ে ছাই করে দেয়—দাদাও তাই বোধ হয় অকালে মারা যান। বৌদি যায় তার কিছু দিন পরই।

—আর রুটি দোব? লেখার কথায় মুখ তুলে চাইল ঊষা। রাতে সে ভাত খায় না, মোটা হয়ে যাবে বোধ হয়, এই ভয়ে। হাসে লেখা—মোটা হবার এত ভয় তোমার: আমিতো ভাবছি কি করে মোটা হওয়া যায়। ঊষা ওর দিকে চেয়ে থাকে, হালকা সুঠাম শরীর। সারা দেহে যৌবনের একটা নিবিড় ছাপ। মায়ের রূপই পেয়েছে লেখা; সুন্দরী ছিপ্ ছিপে পাতলা চেহারা।

হাসে ঊষা—একবার মোটা হতে সুরু করলে আর থামবি না।

—এ হাড়ে মাংস লাগবেনা, বুঝলে। লেখার মনে কোথায় যেন একটা আক্ষেপ।

"কাজ আর কাজ। শুকনো নীরস কাজের চাপে বেলাদি শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, কর্কশ স্বরে দাবড়ে বেড়ায় যাকে তাকে। নিজের চারিপাশে ঊষর-তর একটা পরিবেশ, দুনিয়ার সব কিছুর উপরই বিতৃষ্ণা, এ স্বজনের অন্তহীন নিঃশেষ ঘৃণা আর অবহেলাই তাকে অভিশাপগ্রস্ত করে গেছে।

ঊষা গুনগুন করে সুর ভাঁজে; কোথায় এই অনুভূতি, প্রাণটুকু হারাতে চায় না সে। ক্লাসের মধ্যেই মেয়েরা হাসি তামাশা করে। কে যেন বিশেষ দরকারে এখনিই বাড়ি চলে গেল। মেয়েদের স্কুলে এমনি দরকার প্রায়ই পড়ে অনেকের। গম্ভীর হবার চেষ্টা করে ঊষা—এই মেয়েরা; লতা, বার করো ইংরাজি পোয়ট্রি।

ক্লাসে গম্ভীর হবার চেষ্টা করে উষা, সাজা রাজা; তবু ভাল লাগে ক্ষণিক এই রুক্ষ কর্কশ হবার প্রচেষ্টা।

সাধুখাঁদের মেজবৌ সেলেট পেন্সিল নামিয়ে রেখে হাফ ছেড়ে বাঁচে।

—দাগ বুলিয়ে কি হবে উষাদি? মেয়েদের লেখা পড়াতো বিয়ের জন্য, তাতো হয়ে গেছে কি বল! তা তুমি এত লেখাপড়া শিখলে বিয়ে করোনি কেন?

হাসে উষা—লোক পাচ্ছি কই?

হাসে মেজবৌ—ধ্যাৎ, লোকের অভাব।

সেজবৌএর সংসারে হিংসা আছে, বছর বছর বিইয়ে চলেছে, এরি মধ্যে তিনছেলের মা। চেহারা হয়ে উঠেছে পোড়াকাঠ, ঘরে ঢুকে কয়েকটা ফ্রকের কাপড় মেলে ধরে মেজবৌএর বই খাতায় উপর। বেশ পাকাগিন্নির মত ফরমাইস করে—হেমটিচ না কি বলে, তাই করে দিতে হবে দিদিমণি. ভাল প্যাটার্নের।

উষা কথা বললো না; তবু কেমন যেন মন সায় দেয় না এই দর্জিগিরি করতে। এমাস থেকে এতবড় ইস্কুলের এ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিসট্রেস হয়েছে সে। এই কাজ আর ভাল লাগেনা; তবু কেমন যেন চুপ করে যায়। মাসে ক'দিন এসে গল্পগুজব করেই পঞ্চাশ টাকা নিয়ে যায়; লেখার গানের মাস্টারের মাইনে, অশোকের বইকেনার খরচ। বই পাগল ছেলে—এমনিতে কিছু নিতে সহজে চায় না; বইএর দোকানে গিয়ে বদলে যায়; দাও না ওই বইখানা কিনে'—কামুর বিখ্যাত বই 'প্লেগ'। আরে এযে কল্ডওয়েলের 'ইলিশন এণ্ড রিয়ালটি'। সাতশিলিং দাম? আছে সাত বারোং চুরাশি আনা—ধর পাঁচটাকা।

উষার ভাল লাগে এই সব মেটানো। তার জন্য মেশিনে বসে একঘণ্টা প্যাডেল করতেও সহ্য হয়। সেজবৌ-এর কথায় বলে ওঠে –আচ্ছা, রেখে যাও, করে দোব।

মেজবৌ ও চলে যাবার পর গজগজ করে—কেন, করতে যাবে এসব। দর্জিতো বাড়িতেই আসে। তাকে দিলেই তো পারে। তা নয় ওর দখল জানানোর ফন্দি। এক নম্বর হিংসুটে।

মেজবৌ চা খাবার এনে দেয়, সারা মনে ওর একটা চাপা বিক্ষোভ, পুঞ্জীভূত হতাশা। এখনও সন্তানের মা হয়নি। কেন হয়নি তার কারণও মেজবৌ না জানতে পারে—উষা অনুমান করে। ওর স্বামীকে দেখেছে—বড়লোকের বকাটে ছেলে। সব দোষগুলি পেয়েছে, খেসারত দিচ্ছে হতভাগা মেয়েটা।

—ছেলেপুলে হবার জন্য মানসিক করেছি দিদিমণি; ডাক্তারও বলে হবে। কিন্তু কোন লক্ষণই তো নাই।

উষা কথা বলে না, কি জবাব এর দেবে! আপনমনে কল চালাতে থাকে, বেগে সূচটা ওঠা নামা করছে : সাদা সুতোগুলো জালবুনে চলেছে কাপড়ের উপর। একটু দম নিয়ে বলে উঠে—হবে বৈকি, সময়তো যায় নি।

—আর হবে! হতাশায় কালো হয়ে ওঠে মুখখানা।

উষার মনে একটা অদম্য কৌতূহল চাপা নিরাশার সুর ফুঠে, ওঠে ওই ব্যর্থ নারীর

জীবনের সুর কোথায় যেন তার মনের এক নীরব কান্নায় মিশে যায়—একাকার হয়ে; ম্লান জোনাকি-জ্বলা রাত। তারার আকাশপিদিম ধরানো পথে ফিরছে সে সারাদিনের কর্মক্লান্তির পর। মাঝে মাঝে এমনি একটা উৎকণ্ঠাহীন হতাশার কালো ছায়া তার মনের সজীবতা ঘিরে ফেলে।

মাথার মাঝখানের চুলগুলো উঠে যাচ্ছে; সযত্নে চুলগুলোকে টেনে এনে ঢেকে রাখে সেই টাকটুকু। জামার ছাঁটকাটের দিকে অজানাতেই সে নজর দিয়েছে। বসন্তের হালকা বাতাসে ঝরা পাতা উড়ছে দেবদারু গাছ থেকে। একদিন তারাও সজীব সবুজ ছিল। আজ খসে যাবার পালা এসেছে তাদের।

বকুলের ম্লান সৌরভ আজ সেই দীর্ঘশ্বাসের রব আনে।

বাড়িটা স্তব্ধ, লেখাব ঘরেও আলো জ্বলেনি, বারান্দাটা অন্ধকার। একটু অবাক হয়ে যায় উষা। গেটটা খুলে এগিয়ে গেল। পায়ের সাড়া পেয়ে ঝি এগিয়ে আসে।

—লেখা কোথায়?

—বৈকালে বের হয়েছে, বলে গেছে ফিরতে দেরি হবে।

কথা কইল না উষা। চুপ করে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। কেমন যেন সব অগোছাল। বই খাতাগুলোও সাজিয়ে তোলেনি লেখা, ঝি তো পেয়ে বসেছে। সারাদিন খেটে খুটে এসে এসব করতে মেজাজ থাকে না।

—মনোর মা! সারাদিন কি করিস তুই? ফাঁকি দিয়েই চলবে সব কিছু? ঝি দিদিমণির দিকে চেয়ে থাকে। আজ যেন হঠাৎ উষা কেমন বদলে গেছে। চোখে মুখে একটা কঠিন কঠোর ভাব। মনোর মা বইখাতাগুলো তুলতে থাকে। লেখাই এসব করে, আজ আর হয়ে ওঠেনি।

গজগজ করছে উষা, ঘরের সবকিছু দোষ ত্রুটি গুলো ফুঠে ওঠে চোখের সামনে। মরা ফুলগুলো নিয়ে যা; দুটো ফুলই যদি না আনতে পারিস বাইরে থেকে, এই সং দাঁড় করিয়ে রেখে লাভ কি?

রাত হয়ে গেছে—লেখা আজ খুশিতে উপচে পড়ছে। রেডিও স্টেশনে অডিশন দিতে এসেছে। জোর করেই ঠেলে পাঠিয়েছে একজন। দুঃসহ লজ্জা তার পায়ে পায়ে জড়ায়—না পারবো না আমি।

—ঠিক পার্বে।

পেরেছেও। প্রোগ্রাম ডিরেক্টর নিজে ওর গান শুনে খুশি হয়েছেন। দুএকদিনের ভেতরই সংবাদ যাবে, সেই সঙ্গে কন্ট্রাক্টফর্ম। সই করে পাঠালেই ওরা ব্যবস্থা করে দেবে। বাতাসে বাতাসে কিসের কানাকানি। বকুল-ঝরা পথে এগিয়ে আসে লেখা।

গুনগুন সুরের রেশ তার মনে। বাহারের একটা টুকরো অকারণেই মনে আসে। বাতাসে বাতাসে ভ্রমরের গুঞ্জন—আমবাগানের একটা মিষ্টি সুবাস। জোনাকি জ্বলা রাত্রি—তারা জ্বলা আকাশ।

হঠাৎ ঘরে পা দিয়ে একটু চমকে ওঠে ঊষার দিকে চেয়ে। গম্ভীর থমথমে মুখ—কেমন যেন অন্য মানুষ।

—কোথা গিয়েছিলি লেখা?

যে মানুষটি তাকে বলেছিল কোথাও বেড়িয়ে আসতে, এ সেই সন্ধ্যার মানুষ নয়। ঊষার দিকে লেখা রেডিও স্টেশনের চিঠিখানা এগিয়ে দেয়, যেন ওর কৈফিয়তের উত্তর দিচ্ছে।

—আজ অডিশন দিয়ে এলাম।

ঊষা বেশ ভরাটি গলায় বলে ওঠে—কদিন পরই তোর পরীক্ষা! এসময় অডিশন?

—হয়ে গেল। মাসে একদিন প্রোগ্রাম, তা যেমন্ করে হোক ম্যানেজ করে নোব।

কথা বলল না ঊষা; স্থিরদৃষ্টিতে ওর খুশিতে উপছে-পড়া মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

দেবদারু গাছের পাতা ঝরছে। একদিন যারা সাজিয়েছিল ওই বনস্পতিকে সবুজ কিশলয়ে, বসন্তের বাতাসে যাদের খুশি উপছে উঠেছিল—অন্য বসন্তের সর্বনাশা হাওয়া তাদের সরিয়ে দিচ্ছে—ছিটিয়ে দিচ্ছে অবাধে।

কেমন যেন গালে একটা কর্কশ অনুভূতি আসে, আয়নার সামনে বসে ঊষা দু-আঙ্গুলের ডগায়, ক্রিম নিয়ে ঘসছে মসৃণ-গতিতে; চোখের কোলে জমেছে চশমার কালি, আস্তে আস্তে ঘসছে আঙ্গুল দুটো সেখানে।...মাথার চুলগুলো টেনে টেনে মধ্যিখানের টাকমত ফাঁকটুকু ঢেকে দেখছে। হ্যাঁ—বেমালুম ঢাকা পড়ে। চোখের তারায় হাসির আভা আজও ঝলসে ওঠে! মরেনি ঊষা, আজও বেঁচে আছে—ফুলদানির বুকে রাখা রজনীগন্ধার মত সজীব সৌরভমদির একটি অনুভূতি।

...হঠাৎ দরজা ঠেলে কে যেন ঢুকছে। চমকে ওঠে ঊষা, কি যেন গোপন সঞ্চয় তার ধরা পড়ে যাবে ওর কাছে। ...একমুহূর্তেই সামলে নেয় নিজেকে।

লেখা দাঁড়িয়ে আছে, আটপৌরে শাড়িখানা গায়ে জড়ানো; গায়ের ব্লাউজ পরেনি বোধ হয়।

শাড়ির ফাঁক দিয়ে দেখা যায় অফুরান যৌবনের নিটোল পূর্ণতাব আভাস—মাতাল যৌবনের ছড়ানো অপব্যয়। ...বুভুক্ষু কাঙ্গালের দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে থাকে ঊষা। পরক্ষণেই চোখ নামাল। শাসনের সুরে বলে—খালি গায়ে থাকিস কেন?

—যা গরম, এই নেয়ে উঠলাম। চল খাবাব জায়গা হয়েছে।

সুলতা, রমা, বাসন্তী হাসাহাসি করে। হঠাৎ কি যেন হাল্‌কা আলাপ করছে তারা টিচার্স কমনরুমে, রমার স্বামী কি বলেছে—তাই নিয়ে হাসছে ওরা। মা হতে চলেছে রমা, হঠাৎ দরজা ঠেলে ঊষাকে ঢুকতে দেখে থামল তারা। এককালে কিছুদিন আগে পর্যন্ত ওরা সমানে ইয়ার্কি মেরেছে। কার জীবনের কি গোপনকথা আছে তার আভাসও দিয়েছিল ওরা। হঠাৎ আজ ঊষাকে দেখে ওরা চুপ করে যায়; তাদের মধুময় স্বপ্নজগতের বাসিন্দা ঊষা নয়; এই পার্থক্যটাই ঊষার চোখে বড় হয়ে ওঠে। ঊষাও গম্ভীর সুরে বলে ওঠে—অন্য কিছু বলবার মত না পেয়ে—তোমার ক্লাসের ইংরাজির রেজাল্ট্ অত্যন্ত খারাপ রমা, সেদিন খাতাগুলো দেখলাম। একটু কেয়ার নাও।

সেকেন্ড পিরিয়ডের ঘণ্টা বাজছে, টেবিল থেকে চক ডাস্টার নিয়ে উষা বের হয়ে গেল। হঠাৎ দরজার কাছে গিয়ে কানে আসে সুলতার কথা।

—বেলাদি, দি সেকেন্ড।

—যা বলেছিস!

একটা চাপা হাসির শব্দ গরম শিসের মত কানে আসে উষার। সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরায়, দরজা ঠেলে বারান্দায় বের হয়ে গেল। ...ক্লাসে মেয়েদের কলরব শোনা যায়।

দিনের আলো কাঁপছে পামগাছের পাতায়; ন্যাড়া অশত্থগাছটার ডালে ঠোকর মারে একটা কাক, বিশ্রী টাকপড়া মাথা—কর্কশ স্বরে ডাকছে বারবার।...

ক্লাসের দরজায় এসে থমকে দাঁড়াল, ক্লাস টেনের মমতা গান গাইছে এই কয়েকমিনিটের অবসরেই—মোর জীবনপাত্র উছলিয়া; গা জ্বালা করে উষার; ক্লাসে ঢুকেই হুকুম করে—তোমার অঙ্ক এনেছো মমতা?

মাথা নিচু করে সে। সারাদিন গান গেয়েই কাটায়—সে অঙ্ক কষবে কখন। ছোট ভাইকে লজেন্স দিয়ে সিনেমা দেখিয়ে ম্যানেজ করে। আজ তাও হয়ে ওঠেনি। উষা যেন বোমার মত ফেটে পড়ে— এতবড় ধিঙি মেয়ে, লজ্জা করে না?

এ কণ্ঠস্বর যেন উষার নিজেরই অচেনা: ক্লাসের মেয়েবাও চমকে ওঠে।

কালবৈশাখীব প্রথম মেঘজমা সন্ধ্যা; সাধুখাঁয়ের বিরাট বাড়ির কাছাকাছি যেতেই ঝড় উঠেছে। আকাশ মাটি কাঁপানো ঝড়। ধূলো আর ঝরাপাতা পাক খেয়ে চলেছে; কালো আকাশ ফুঁড়ে ঝলসে ওঠে বিদ্যুতের আভা—গাছ-গাছালির মাথায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কোন রকমে উষা গিয়ে ওদের বাড়িতে ঢোকে।

নিস্তব্ধ অন্দর মহল। দোতালার বারান্দা দিয়ে চলছে সে। আলোগুলোও সব জ্বালা হয়নি। ঝড়ের দাপটে আছড়ে পড়ছে জানালা দরজাগুলো। ...বৃষ্টির ধারা নেমেছে, আকাশ ছাওয়া প্রথম বর্ষণ। তৃষিত মাটির বুক থেকে উঠছে ভিজে সোঁদা গন্ধ, শুকনো বিবর্ণ রোদপোড়া পাতাগুলো বৃষ্টির সামনে নিজেদের আত্মসমর্পণ করে নিশ্চুপ আবেশে ওই প্রথম বর্ষণের স্পর্শসুখে বিভোর।

আবছা আঁধাবে ওদিককার দরজাটা ঠেলে উষা—মেজবৌ-এর ঘরেই গিয়ে বসে সে। আজও অভ্যাসমত এসে দরজায় ধাক্কা মারে; একটা অস্ফুট কণ্ঠস্বর শোনা যায়, দবজাটা খুলে গেল—কালো ছায়ামূর্তিটা বেগে অন্ধকার বারান্দার কোণে অদৃশ্য হয়। চমকে উঠে উষা। সেজবাবুর চাকর বনমালীর মতই মনে হল ওকে।

মেজবৌএর দিকে চেয়ে চোখ নামাল উষা; বিছানায় একটা ঝড় বয়ে গেছে; মেজবৌ কাপড়চোপড় গুছিয়ে নিয়ে অভ্যর্থনা জানায়।

—এসো উষাদি। কাঁপছে ওর কণ্ঠস্বর। মুখে একটা অপরিসীম দৈন্যের কালো ছায়া তখনও মুছে যায়নি। বলবার চেষ্টা করে—এই ঝড়ে?

—এসে পড়লাম। উষা মাথা নিচু করে। মেজবৌ-এর উদ্দাম দেহ এখনও যেন কাঁপছে ঝড়ে-কাঁপা পাতার মত। কেমন যেন শিউরে ওঠে উষা।

বাইরে বৃষ্টির ধারা কমে এসেছে। ...থেকে থেকে ঝলসে উঠছে বিদ্যুতের আভা; উঠে পড়ে সে—কাল আসবো, আজ চলি। আবার বৃষ্টি নামতে পারে।

মেজবৌ কথা কইল না, খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। তার মনের ঝড় তখনও নিঃশেষে থামেনি।

লেখা স্বপ্ন দেখছে। এমনি ঝড়ো হাওয়ায় বাদল সন্ধ্যায় সারামন তার কেঁপে ওঠে একটি মধুর স্বপ্নময় সুরের অনুভূতিতে। সে রাতের কথা ভোলেনি। একজনের হাসি তার একটু স্পর্শ তাকে সব ভুলিয়ে দিয়েছে। গোপন মনের শরম জড়ানো একটু চাওয়া; বারবার পেতে ইচ্ছে করে সেই স্পর্শ। বসন্তরাগিণীর এই সুরাবেশ থামতে দিতে চায় না সে। একটি মনের নিভৃত সঙ্গ কামনা—তার স্বাদ সে পেয়েছে। সার্থক হয়ে উঠেছে তার স্বপ্ন।

ছোট্ট একটি নীড়; সন্ধ্যার আকাশে জেগে উঠবে তারার আলো, পাখি-ডাকা সন্ধ্যা—বকুলগন্ধ-মাখা বাতাসে তারা দুজনে দুজনের মাঝে মিশে যাবে। শহরেব কোলাহলের বহু দূরে—তারা বাসা বাঁধবে।

ঝড় থেমে গেছে। বাতাসের সব সৌবভ মুছে গেছে। স্তব্ধ পথটা দিয়ে ফিরছে উষা, সারা মনে স্তব্ধ কামনায় জ্বালা; পথ দিয়ে জল গড়িয়ে চলেছে, বৃষ্টির জলস্রোত।...আলোয় ধিকধিক করছে পথটা। একটা দৃশ্য বার বার মনে পড়ে...ভুলতে পারে না সে। কামনা-ব্যাকুল মেজবৌএর সেই রূপ। চুলগুলো খুলে পড়েছে, কাপড়-চোপড়ও এলোমেলো, চোখে ওর বৈশাখের নিদারুণ শুষ্ক তৃষ্ণা; বুক জুড়ে সেই তৃষ্ণার সংক্রমণ।

লেখা পড়ছে; চুপ করে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে চলে উষা, ক্লান্ত পরিশ্রান্ত সে। পাউডারের দাগ ধুয়ে গেছে, ঝড়ো বাতাসে চুলগুলো উস্কোখুস্কো, চোখের নিচে স্পষ্ট কাল দাগটা প্রকট হয়ে উঠেছে, চোখে ফুটে উঠেছে সেই দৃশ্যটার...একটা ব্যর্থ শোচনীয়তা।...মনের উষর রুক্ষতার প্রকাশ তার গালের কর্কশ চামড়ার ভাঁজে ভাঁজে, চোখের চাহনিতে।

হঠাৎ ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল। টিপি টিপি বৃষ্টি নেমেছে আবার। তারই বিছানায় শুয়ে আছে অশোক, সিগারেটের গন্ধে বন্ধ ঘরখানা ভরে উঠেছে। বৃষ্টির ঝাপ্টার জন্য জানালাগুলো বন্ধ।..

—তুমি? কেমন ইন্টারভিউ দিলে?

অশোক উঠে বসে বিছানায়; সিগারেটের টান দিতে দিতে বলে—চাকরিটা নেহাৎ জুটে গেল, শো চারেক মাইনে আপাতত, পরে বাড়বে। বসো।

—সত্যি! উষা যেন খুশিতে উপছে পড়ে।

মুখে চোখে তার হালকা হাসির স্পর্শ; বৃষ্টির ছাট আসছে। দরজার পর্দা টেনে দিয়ে এসে বসল খাটের উপর। মিষ্টি ক্ষীণ আলোয় ঘরখানা ভরে উঠেছে। অশোকের প্রশস্ত

ললাটে— চোখে আজ খুশির আবেশ। উষা বলে ওঠে— দেখি তোমার হাতখানা; চাকরির যোগটা কেমন?

উষার অজ্ঞাতেই তার বয়স কমে গেছে কয়েক বছর; হাতখানা হাতে নিয়ে যেন কাঁপছে সে। সারা শরীরে একটা বিস্ময় অনুভূতি; স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে অশোকের দিকে। অশোক বলে ওঠে—আর একটা রেখা ফুটে উঠেছে দেখেছো ওতে?

হঠাৎ যেন ঔৎসুক্য বেড়ে যায় ছোট্ট মেয়েটির—কি, দেখি?

হাতটা দেখতে থাকে, অশোক বলে ওঠে—বিয়ের রেখা।

চমকে ওঠে উষা; কাঁপছে তার সারা দেহ অসহ্য নীরব একটা রেশে; কোথায় বৃষ্টির ঝরা রাতে ডাকছে সেই রাতজাগা কোকিল—শেষ বসন্তের একক সঙ্গী। ...বাতাসে ভেসে ওঠে হাসনুহানার সুবাস। জাগর-রাত্রির বাসক-সজ্জিকা।

অশোক বলে ওঠে—তুমি যদি রাজি থাকো তাহলেই সব হয়ে যায়। কোনদিক থেকেই কোন আপত্তি নেই।

ডাগর অসহায় দুটো চোখ তুলে চেয়ে আছে অশোক তার দিকে, করুণ মিনতিভরা সে চাহনি। উষার মনে অসহ্য আনন্দের পূর্ণতার সুর। নিজেকে যেন এতদিন সে চিনতে পারেনি; এই পুঞ্জীভূত কামনার বোঝা সে বয়ে ফিরেছে এতদিন—এত অধীর প্রতীক্ষায়। ওর হাতটা তার হাতে; চোখের পাতা কাঁপছে—জলভরা বাদল মেঘের মত টলটলো।

একটা বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ ঝলক শান্ত আঁধার আকাশ ফাটিয়ে গেল—দূর ক্রন্দসীর কান্নাভেজা বুক টুকরো টুকরো করে, বাতাসে বাতাসে রুদ্র গর্জন। কাঁপছে পৃথিবী—কোন সর্বনাশা ধ্বংসের মাতনে। চমকে উঠেছে উষা; এতদিনের স্বপ্ন এক নিমেষেই চূর্ণ হয়ে যায়; অশোক বলে ওঠে— লেখারও কোন অমত নেই, পাত্র হিসেবে আমিও অযোগ্য নই। এখন তুমি যদি মত দাও।

স্বপ্নের ঘোরে উষা যেন বিড় বিড় করছে, পাংশু বিবর্ণ রক্তশূন্য হয়ে উঠেছে সারা মুখ; চোখের কোলে জমাট কালির দাগ। ..অশোকের হাতটা কখন ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। অশোক চেয়ে থাকে তার দিকে বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে।

লেখা!...এতদিন তার অন্তরালে এতবড় একটা নাটকের মহলা চলেছে সে দেখেনি, আজ শেষ দৃশ্যে তাকে প্রয়োজন হয়েছে। অশোকের দিকে চেয়ে থাকে উষা—কাছ থেকে ঠিক দেখতে পায় না, চশমাটা লাগাতে হয়। স্থির তির্যক দৃষ্টি; লেখা—অশোক কেউ যেন ওই গম্ভীর ভরাটি স্থূল মেয়েটিকে চেনে না।

একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে, উষা যেন সচেতন হয়ে উঠেছে। উদ্‌গত নিঃশ্বাস চেপে সহজ কণ্ঠেই সায় দেয়; জলস্রোতকে বাধা দেবার ক্ষমতা তার আজ আর নেই।

দেওদারু গাছের ঝরা পাতাগুলো ছিটিয়ে পড়েছে বাগানময়, কাদা আর জলে মাখামাখি—আবার ডালে ডালে নোতুন পাতা গজিয়েছে। গাঢ় হলুদ চিকন পাতা—বাতাসে তারা শেষ বসন্তকে প্রণতি জানায় মাথা নেড়ে।

আর বেশি কাজ করবার প্রয়োজন তার নেই; কেউ গোপন সন্ধ্যার গন্ধমদির বাতাসে এসে তার পাশে দাঁড়াবে না—বই এর দোকানে গিয়ে রাজ্যি শুদ্ধ বই হাঁটকে বগলে তুলতেও যাবে না। সাধুখাঁয়ের বাড়ির চাকরি ছেড়ে দিয়ে স্কুল নিয়েই পড়ে আছে ঊষা। বেলাদি রিটায়ার করার পর সেই-ই হয়েছে হেড মিস্ট্রেস। অজানতেই মোটা হয়ে গেছে—চোখের কোলে পড়েছে কালি, মাথার টাকটা আর ঢাকা যায় না, ঢাকবার দরকারও বোধ করে না ঊষা সেন। আয়নার দিকে চায় এ যেন অন্য মানুষ।

হঠাৎ সেদিন সাধুখাঁ বাড়ির মেজবাবুকে মস্ত গাড়ি হাঁকিয়ে স্কুলে আসতে দেখে চমকে ওঠে; একটি বর্ষামুখর সন্ধ্যা—বিচিত্র নেশা-লাগানো একটা অনুভূতি! ঊষা সেন ওর দিকে চেয়ে আছে। দামি কাঁচি ধুতি, গিলে-করা মিহি পাঞ্জাবি গায়ে; পাঁচ আঙ্গুলে ঝকমক করছে ক'টা হীরা-বসানো আংটি, আলো ঠিকরে পড়ে তার থেকে, চোখ ধাঁধানো আলো।

নমস্কার করে এগিয়ে আসে বিনোদিনী স্কুলের হেড মিসট্রেসের টেবিলের দিকে।...

—বসুন। গম্ভীর সুরে ঊষা চেয়ারখানা দেখিয়ে দেয়।

ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বলে ওঠে মেজবাবু। ঊষা ওর কথাগুলো শুনে চলেছে মান্থলি রিটার্নের কাগজ থেকে মুখ তুলে।

—আমার ছেলের অন্নপ্রাশন, উনি আপনার ছাত্রী ছিলেন, তাই বারবার করে বলে দিলেন যদি কাল সন্ধ্যায় একটিবার যান—

একটি বর্ষামুখর সন্ধ্যা; সামনে ওই কদর্য লোকটা!... মেজবৌএর মুখখানা মনে পড়ে। ...ঝড় ওঠা মন...কাঁপছে সারা দেহ! একটা ঘৃণা জন্মে ওঠে সারা মনে। পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ রাজ্যি-জোড়া ভণ্ডামি আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে। বলে ওঠে ঃ

—আমার যাওয়া সম্ভব নয়, বলবেন ওঁকে—

—একটিবার?

—এইখান থেকেই আশীর্বাদ করছি—আপনার সন্তানের কল্যাণ হোক।

মেজবাবু বের হয়ে গেল। ...একা ঘরে বসে কি ভাবছে ঊষা, আশীর্বাদ! ...শুকনো একটা বঞ্চনায় বিক্ষুব্ধ—মনের নীরব স্তোক প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। তার জীবন ঘিরে অসীম শূন্যতা, ঊষর মরুভূমির রুক্ষ বঞ্চনা, নিষ্ফল হাহাকার। তবু সে অশোক-লেখাকেও আশীর্বাদ করেছে।

ক্ষণিকের জন্য মনটা কেমন করে ওঠে—অসহ্য একটা জ্বালা।

আবার কাজে মন দেয় ঊষা সেন।

*কার্তিক,* ১৩৬৬

# বিজিতা

## প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

রমেন্দ্র শনিবারে বাড়ি আসিত, রবিবার থাকিয়া সোমবারে আবার কলিকাতায় চলিয়া যাইত।

শৈলেন কথাটা বড় মিথ্যা বলে নাই। স্ত্রী হইতেই সে অধঃপাতে গিয়াছিল। বাড়ির সকলেই ইহা জানিত। সুষমা পূর্ণিমাকে অনেক বুঝাইয়া নরম করিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ণিমা অবিচলিতা।

রমেন্দ্রর হৃদয় যখন ভাবের তুফানে ভরিয়া উঠিয়াছিল, তখন সেই ভাব ব্যক্ত করিতে সে ছুটিয়া গিয়াছিল পূর্ণিমার কাছে। বড় কল্পনাপ্রবণ ছিল সে,—ভাবিয়াছিল, এবার তাহার কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইবে,—তাহার স্বপ্ন সত্য হইবে। কিন্তু আশা তাহার ভাঙ্গিয়া গেল,—পূর্ণিমা তাহার হৃদয়ে বড় আঘাত দিল। স্ত্রীর সহিত প্রথম আলাপেই সে বুঝিতে পারিল, সে যাহা চাহিয়াছিল, এ তাহা নহে। সে আকণ্ঠ সুধা পান করিতে চাহিয়াছিল; গরল উঠিয়া তাহাকে জর্জর করিয়া তুলিল।

নিদারুণ ব্যথার সে লুটাইয়া পড়িল। সেই আঘাতেই তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল, আর সে উঠিতে পারিবে না; কিন্তু আবার সে উঠিতে পারিল। লাভের মধ্যে এই হইল, তাহার মনুষ্যত্ব একেবারে সে হারাইয়া ফেলিল। পত্নীর উপর অত্যন্ত রাগ করিয়াই সে অধঃপতনের পথে নামিয়া গেল। পূর্ণিমা স্বামীকে নিজের দোষে পঙ্কিলতার মাঝে বিসর্জন দিল।

সে বড় গর্বিতা ছিল,—সেই গর্বই তাহার সর্বনাশের মূল কারণ। একবাব দোষ করিয়াছিল সে, তাহার পরে যদি সে স্বামীর পদতলে লুটাইয়া পড়িত, ক্ষমা প্রার্থনা করিত,—সকল গোলমাল মিটিয়া যা.্ত। রমেন্দ্র এই মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষাও করিয়াছিল। যখন দেখিল. সে আসিল না, ক্ষমা চাহিল না,—তখন স্ত্রীকে একেবারেই মন হইতে সে তাড়াইয়া দিল।

সে নিজের চরিত্র হারাইলেও, দাদাকে সে ভয় করিত, ভালবাসিত। সর্বাপেক্ষা বেশি ভালবাসিত সে অমিয়কে। শুধু তাহারই জন্য সে বাড়ি আসিত,—নচেৎ আসিবার কোনই দরকার তাহার ছিল না।

সে নিজে যাহা উপার্জন করিত, তাহাতে তাহার নিজেরই চলিত,—বাড়িতে সাহায্য করিবার কখনও প্রয়োজন হয় নাই। আর যখনি সে বাড়ি আসিত অমিয়ের জন্য কিছু না কিছু লইয়া আসিত।

পূর্ণ চার বৎসব এইরূপে কাটিয়াছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে কোনও বিবাদ আছে, তাহা কেহই বুঝিতে পারিত না। সামনা-সামনি দুই চারিটা নেহাৎ আবশ্যক প্রশ্নোত্তর চলিলেও, তাহার মধ্যে ঘৃণার ভাবটাই বর্তমান ছিল।

অমিয়ের উপর স্বামীর টান দেখিয়া পূর্ণিমা জ্বলিয়া যাইত,—সুষমার প্রতি স্বামীর ভক্তি তাহার বক্ষে ছোরা বসাইত। মুখ ফুটিয়া কথা বলিতে পারিত সে কেবল মেজ বউয়ের কাছে। এত বড় বাড়িটার মধ্যে একমাত্র মেজ বউই তাহাকে সহানুভূতি দেখাইত।

রাত নয়টার ট্রেনে রমেন্দ্র বাড়ি আসিল। গত সপ্তাহে সে কলিকাতা যাইবার সময় অমিয়ের কাছে প্রতিশ্রুত হইয়া গিয়াছিল, তাহাকে একখানা ট্রাইসাইকেল আনিয়া দিবে। প্রতিশ্রুতি সে রক্ষা করিয়াছে। অমিয় তখন পড়া শেষ করিয়া সবেমাত্র শুইতে গিয়াছিল,—ট্রাইসাইকেল আসিয়াছে শুনিবামাত্র সে লাফাইয়া নিচে আসিল।

বাড়ির সামনেই খোলা মাঠ। রাত্রিটিও বেশ জ্যোৎস্না-মাখা। সেই রাত্রেই রমেন্দ্র তাহাকে সাইকেলে উঠাইয়া, সেই মাঠে বেড়াইতে লাগিল। অমিয় তাহার চিরবাঞ্ছিত এই সাইকেলটি পাইয়া, কাকাবাবুর প্রতি যে কতদূর কৃতজ্ঞ হইল, তাহা বলা যায় না।

পূর্ণিমা উপরে নিজের গৃহের মুক্ত বাতায়ন পথে দাঁড়াইয়া থাকিয়া জ্বলন্ত চক্ষে এই দৃশ্য দেখিতেছিল। খানিক দাঁড়াইয়া সে সশব্দে জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া নিজেব বিছানায় শুইয়া পড়িল।

রাত যখন এগারটা, তখন রমেন্দ্র ভেজানো দরজা ঠেলিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। একটু আগে পূর্ণিমার বেশ এক ঘুম হইয়া গিয়াছিল,—এখন সে জাগিয়াই ছিল, তথাপি উঠিল না, বা নড়িল না; চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নীরবে পড়িয়া রহিল। তাহার মনে একটু ক্ষীণ আশার রেখা জাগিতে ছিল, রমেন্দ্র তাহাকে ডাকিবে।

কিন্তু তাহার আশা সফল হইল না। রমেন্দ্র একবার কপট নিদ্রাভিভূতা পত্নীব পানে তাকাইল মাত্র। ঘৃণা তাহার মুখে কতকগুলি রেখা চিত্রিত করিয়া দিল। দবজাটা বন্ধ কবিয়া দিয়া, আলো কমাইয়া, সে নিজের বিছানায় নীরবে শুইয়া পড়িল।

পূর্ণিমা দেখিল,—অভিমানে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। দেয়ালের ঘড়িতে ঢংঢং করিয়া বারটা বাজিয়া গেল। আর তো চুপ করিয়া থাকা চলে না। বলিবার মত অনেকগুলি কথা আছে। এবার রমেন্দ্রকে কালই কলিকাতায ফিবিতে হইবে,—এখন দুই মাস আসিতে পারিবে না,—পূর্ণিমা তাহা জানিত। কথা যাহা ছিল, তাহা আজই বলা চাই; কারণ, এমন সুযোগ আর পাওয়া যাইবে না।

দুই-একটা হাই তুলিয়া, সদ্য নিদ্রোত্থিতের ন্যায় যে উঠিয়া বসিল। রমেন্দ্র তখনও ঘুমায় নাই; স্ত্রীর ব্যাপারখানা দেখিবার জন্য সে-ই এখন নিদ্রিতের ভানে পড়িয়া রহিল। পূর্ণিমা আলোটা বাড়াইয়া দিল; স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। কি বলিবে, কেমন করিয়া ডাকিবে, তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। নিজেকে এমন করিয়া অবনতা করিতে তাহাকে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইতে হইয়াছিল; কিন্তু উপায় নাই যে। মেজদির সঙ্গে পরামর্শ হইয়াছে,—মেজদি মেজ-ঠাকুরের ভার গ্রহণ করিয়াছে। সে এখন নিজের স্বামীকে দলে টানিতে পারিলে বাঁচে। কায়দায় পড়িয়া আজ তাহাকে অতিরিক্ত নিচু হইতে হইয়াছে যে।

স্বামীর কাছে স্ত্রীর যতখানি অধিকার পাওয়া সম্ভব সে তাহা হারাইয়াছে বলিয়াই অতিরিক্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল। একবার সে মৃদু কণ্ঠে ডাকিল, "শুনছো—একটা কথা

আছে তোমার সঙ্গে।" রমেন্দ্র শুনিয়া গেল বটে, কিন্তু জাগ্রতের কোনও লক্ষণ দেখাইল না। পূর্ণিমা স্থাণুর ন্যায় আবার খানিক দাঁড়াইয়া রহিল। অভিমান তাহাকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছিল; কিন্তু স্বার্থচিন্তা যে সকলের আগে। সেই চিন্তা আসিয়া অভিমানকে দূরে তাড়াইয়া দিল।

পূর্ণিমা আবার ডাকিল "ওঠো, আমার একটা কথা শোন।"

এবার রমেন্দ্র চক্ষু চাহিল। সামনেই দেয়ালে আলোটা জ্বলিতেছিল বড় উজ্জ্বল ভাবে। সেইদিকে চাহিয়া বিরক্ত ভাবে রমেন বলিয়া উঠিল, "কি আপদ! আলোটা কমিয়ে দিলুম, আবার বাড়ালে যে! একটু ঘুমবার যো নেই?"

পূর্ণিমার গায়ে কথাটা বড় বাজিল; কিন্তু এখন দর্প করিবার সময় নেই। নরম সুরে সে বলিল, "আমিই বাড়িয়ে দিয়েচি; তোমায় একটা কথা বলব বলে ডেকেছি।"

রমেন্দ্র উঠিয়া বসিল। একটু ব্যাঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিল, "মাইরি, এমন কপাল আমার? সত্যি-সত্যি এত রাত্রে আমার ডাকছো তুমি? আমার কপাল এতকাল পরে হঠাৎ এত সুপ্রসন্ন হল যে পূর্ণিমা?"

পূর্ণিমার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, তবুও নীরবে সে এই ব্যঙ্গোক্তি সহিয়া গেল। কারণ, আজ সে নিজের স্বার্থে আসিয়াছে।

রমেন্দ্র পত্নীর নীরবতা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "যা খুশি তোমার বলতে পারো,—আমার কোনও আপত্তি নেই। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবার মানে কিছু নেই। আমি কান পেতেই তো আছি। কতকগুলো কড়া কথা শুনাবে তো?"

পূর্ণিমা আর সহ্য করিতে পারিল না। বলিযা উঠিল, "তুমি কেবল কড়া কথাই শুনেছ আমার কাছে?"

রমেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "না, বড় সুন্দর ব্যবহার করেছ তুমি,—যাতে প্রাণ আমার একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গ্যাছে। কোন্ দিন তুমি সদ্ব্যবহার করেছ পূর্ণিমা?"

পূর্ণিমা একটু থামিয়া বলিল, "তুমি যদি সৎ হতে, নিশ্চয়ই সদব্যবহার পেতে আমার কাছ হতে। ভক্তি-ভালবাসা যে নিতে চায়, তাকে ঠিক তেমনি আধার করে নিজেকে গড়ে নিতে হয়।"

রমেন্দ্র ভাল হইয়া বসিল; তীব্র নেত্রে পূর্ণিমার পানে চাহিয়া বলিল, "ঠিক কথা। এইবারই যথার্থ কথা বলেছ বটে যে, ভক্তি-ভালবাসা যে নিতে চায়, তাকে নিজেকে তেমনি আধার করে গড়ে তুলতে হয়। কথাটা সত্যি তো? আচ্ছা, যদি তাই হয় পূর্ণিমা, তুমিও তো তেমনি করে নিজেকে গড়ে তুলতে পারতে। যখন প্রাণভরা আশা নিয়ে তোমার পাশে ছুটে গেলুম, কি পেলুম তার পরিবর্তে? বজ্রাঘাত নয় কি? মনে কর একবার সে দিনকার রাতটা, যেদিন এমনই এ চাঁদের আলোয় সারা বিশ্বখানা স্নাত। সেই পাপিয়া-কোকিলা-গীতি-মুখরিত রাতে, আমি আমার অমল-ধবল প্রাণখানা তোমায় উৎসর্গ করতে গেছলাম। তোমার কাছে আমার কতকালের সঞ্চিত বাসনা ব্যক্ত করতে গেছলুম। বল দেখি, কি করে ফিরিয়ে দিলে আমায়, —কি আঘাত দিলে আমার প্রাণে,

যাতে আমার চক্ষের সামনে তেমন শোভাময়ী, তেমনি আলোকোজ্জ্বল রজনীটি নিমেষে গভীর অন্ধকারে ঢেকে গেল; আমার কল্পনা ভেঙ্গে গেল। আমি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সরে পড়লুম। মনে পড়ে কি পূর্ণিমা, না ভুলে গ্যাছ? তুমি ভুলতে পেরেছ পূর্ণিমা কিন্তু আমি ভুলি নি। আমার বুকে সে দাগ চিরতরেই আঁকা রয়েছে।"

পূর্ণিমা নীরব। রমেন্দ্র আবার বলিল, "আমায় পিশাচ রূপে পরিবর্তিত করেছে তুমিই। নিজের দোষের কথা কিছু না মনে করে, এখন আমায় এসেছ শাসন করতে? তার আগে তোমার বোঝা উচিত ছিল।"

পূর্ণিমা নীরবে স্বামীর কথা শুনিয়া গেল। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "যা হয়ে গ্যাছে, তার আর হাত নেই। আমি তোমায় বকতে আসিনি,—একটা কথা বলব বলে এসেছি।"

নরম ভাবে রমেন্দ্র বলিল, "কি কথা বলতে চাও?"

পূর্ণিমা বলিল, "মেজদি দিন কয়েকের মধ্যে পৃথক হয়ে যাবেন। বট্‌ঠাকুর সব বিষয় ভাগ করে দেবেন। তুমি কি বলতে চাও এতে?"

রমেন্দ্র ভ্রূ টানিয়া বলিল, "তোমারও বোধহয় খুব ইচ্ছে আছে পৃথক হবার জন্যে?"

পূর্ণিমা একটু অনিচ্ছার সঙ্গে বলিল, "আমার ইচ্ছে নিয়ে তো কোনও কাজ হবে না। তুমি তো আমায় দেখতেই পারো না,—আমার ইচ্ছে কি তুমি নেবে? তুমি যা ভাল বিবেচনা করবে তাই হবে। আমার মত যদি নিতে চাও, তবে বলি, এই সময়ে নিজের যা, তা বুঝে নেওয়া উচিত। এর পরে সব হারাবে। চাকরিই তখন একমাত্র সম্বল হবে, তা জেনে রেখো।"

রমেন্দ্রর চোখ একবার জ্বলিয়া উঠিল। তখনই সে দৃষ্টি নরম করিয়া বলিল, "তোমার ইচ্ছা বুঝলুম। আমার কী মত, তাই এখন জানতে চাও তুমি? আচ্ছা, বল দেখি, এ সব অর্থ কার উপার্জিত? তুমি জানো নিশ্চয়ই—তোমার স্বামীর উপার্জিত একটি পয়সাও আজও এ সংসারে আসে নি। এ সমস্তই দাদা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, কলকাতার পথে পথে বেড়িয়ে সঞ্চয় করেছেন। তাঁরই এ সব; তিনি যে আমাদের দয়া করে খেতে-পরতে দিচ্ছেন, লেখা-পড়া শিখিয়েছেন, সে তাঁরই মহত্ত্ব। এখন আমাদেব চাকরি করে দিয়েছেন,—বের করে দিলেই পারেন বাড়ি হতে। তাঁর এতটা করবার মানে কি? তিনি তবু আমাদের সব এক জায়গায় রাখতে চান কেন? এতে তাঁর যথেষ্ট ক্ষতি হচ্ছে,—তবু তিনি সে ক্ষতি সহ্য করছেন কেন? আমি তোমায় কতক চিনেছিলুম পূর্ণিমা,—আজ খুব ভাল করেই চিনলুম। মেজ বউদি আলাদা হতে চান, হতে পারেন,—তুমি আলদা হতে পারবে না। আজীবন তোমায় বড় বউদির দাসী হয়েই কাটাতে হবে। কারণ, আমি কিছুতেই পৃথক হব না। যদি তোমার ইচ্ছে হয়, তুমি বাপের বাড়ি চলে যেতে পারো,—এখানকার সম্পর্ক একেবারে উঠিয়ে দিয়ে।"

বড় বউয়ের দাসী স্বরূপ থাকিতে হইবে, এই কথাটা শুনিয়াই পূর্ণিমা রাগে জ্ঞান হারাইয়াছিল। তাই রাগত সুরেই বলিল "তোমার ইচ্ছে না হয়, পৃথক হ'য়ো না। কিন্তু এটা মনে রেখো, আমি কখনই বড়দির সেবা করতে পারব না।"

শান্ত ভাবে রমেন্দ্র বলিল, "কেন, মাথা কাটা যাবে তাতে? বড় অপমান হবে বুঝি তাতে?"

পূর্ণিমা ঠোঁটের উপর ঠোঁট চাপিয়া শক্ত উত্তর দিল, "নিশ্চয়।"

রমেন্দ্র বলিল "বড় বউয়ের জিনিস তাহলে এখনও খাও পরো কি করে? আমায় যে পৃথক হবার পরামর্শ দিতে এসেছ,—কি নিয়ে পৃথক হবে, শুনি। কি নিয়ে আমি পৃথক হব? বাপের অর্থ নয় যে সমান ভাগে চার ভাইয়ে ধর্মানুসারে পাব। এ বড়দার স্বোপার্জিত সম্পত্তি। তিনি আমায় এক পয়সা না দিয়ে, যদি গলাধাক্কা দিয়ে এ বাড়ি হতে তাড়ান, তাতেও কারও একটা কথা বলবার অধিকার নেই। আব বড় বউদির সেবার কথা বলছো? তোমরা কে কয়বার তাঁর কাজ করে দাও,—তাঁর একটু সেবা কর বলো দেখি? তিনি নিজেই যে লক্ষ্মী.—নিজেই সকলের সেবা করে বেড়াচ্ছেন। এ পর্যন্ত—তাঁর যখন জ্বর হয়—কখনও তো দেখি নি, তুমি তাঁর একটু মাথাটা টিপে দিয়েছ।"

পূর্ণিমা উচ্ছ্বসিত রাগের সহিত বলিল "না—তা করব কেন,—বড়দি যে যাদু জানে। কিঁ মন্ত্রে সে সব বশ করেছে তা জানি নে। মেজদি ঠিক কথাই বলেছে—"

বাধা দিয়া ক্রুদ্ধভাবে রমেন্দ্র বলিল, "সাবধান, পূর্ণিমা, মাতৃরূপা বড় বউদির নিন্দে কোরো না আমার আছে। জেনো, তিনি আমাদের মা। এটা বুঝো— যেমন ব্যবহার করবে. তেমনি ব্যবহার পাবে। তুমি যে আমার স্ত্রী,—তুমি আমায় নিজের করতে পারলে না শুধু তোমার মন্দ ব্যবহারে। আর কিছু বলবার আছে তোমার?"

পূর্ণিমা মাথা নাড়িল। ধীরে ধীরে সে আবাব নিজ স্থানে ফিরিয়া গেল। বমেন্দ্র নিশ্চিন্ত হইয়া শুইয়া পড়িল। একবাব স্ত্রীর পানে চাহিয়া বলিল, "পার তো আলোটা নিভিয়ে দাও দয়া করে।"

পূর্ণিমা গুম হইয়া বসিয়া রহিল, নড়িল না।

(৭)

নৃপেন যে দিন বাড়ি ফিরিল. সেই দিনই মেজবউ সুলতা প্রস্তাব করিল, "আমি আর সংসারে থাকবো না।"

নৃপেন তখন মহা আবামে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া একটা সিগারেট টানিতে-টানিতে, একখানা মজাব উপন্যাস পড়িতেছিল। স্ত্রীব কথা শুনিয়া মহা বিস্ময়ে সে বই হইতে চোখ উঠাইল, "ব্যাপারখানা কি তোমার?"

সুলতা গম্ভীরভাবে বলিল, "ব্যাপার কিছুই না। তুমি কি ইচ্ছা কর. আমাকে এত কথা শুনেও এখানে সয়ে থাকতে হবে: তোমাব ভাই আমাকে যা না তাই বলে যাবে কেন বল দেখি?"

নৃপেন বলিল, "কে? শৈলেন:"

সুলতা বলিল, 'হ্যাঁ'।

নৃপেন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—"আঃ সেটার কথা ছেড়ে দাও। বদ্ধ পাগল সেটা; একটু বুদ্ধি থাকত. তবে—"

সুলতা মুখখানা রক্তবর্ণ করিয়া বলিল, "কি তবে? বুদ্ধি নেই, তোমারই যত বুদ্ধি আছে—না? তুমি যদি বুদ্ধিমান হতে, তবে এত কষ্ট কেন আমার? লোকের কথাই বা সইতে হবে কেন আমায়? বাড়ির গিন্নি যিনি, তিনি তো দু' চোখ দিয়ে আমায় দেখতে পারেন না। তোমরা পুরুষ,—সামনে আদর দেখলেই গলে যাও একেবারে; মনে ভাব, বউদি বড ভাল। ও যে ভিজে বিড়াল, তা তো জান না। সেয়ানা চালাক যাকে বলে, ও তাই। মনে অথচ জিলিপির প্যাঁচ,—মুখে কেমন মধু ঢালে; আমরা অমন মুখে মধু মনে গবল রাখতে পারি নে বলেই না আমাদের এই দুর্দশা? বউদি বলতে গলে যেয়ো না,—একটু ভেবে দেখ। সংসারে কাউকে বিশ্বাস করতে নেই, তা বলছি।"

নৃপেন চুপ করিয়া পত্নীর এই দীর্ঘ লেকচার শুনিয়া গেল। সে আর সকলের কথা বিশ্বাস করিতে রাজি আছে, কেবল বউদির কথা বিশ্বাস করিতে এখনও রাজি নয়। তিনি যে মনে গরল রাখিয়া মুখে মধু বর্ষণ করিবেন, ইহা একেবারেই অসম্ভব।

সুলতা বলিল "আ' ওই যে প্রতিভা ছুঁড়ি রয়েছে, ওটি বড় গিন্নির ভগ্নদূত। যেখানে যেটি হবে, আর কারও চোখে না পড়লেও, ঠিক ওর চোখে পড়ে যাবেই। আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে তা বড় গিন্নির দরবারে পেশ হয়ে যাবে। তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের মত গম্ভীর ভাবে অমনি মাথাটি নাড়বেন। সেজবউ যা বলে, তা একটুও মিছে না। ওই ছুঁড়িই যত অকল্যাণের গোড়া। ও এসে পর্যন্ত—"

বাধা দিয়া অধীর ভাবে নৃপেন বলিল, "আহা, আবার তাকে জড়াচ্ছো কেন? ছেলেমানুষ—সামনে যা দেখে, সেটা গিয়ে বড় বউদির কাছে বলে আসে। বড অভাগিনী সে,—তাকে কোনও ব্যাপারে টেনে এনো না।"

সুলতা ক্রুদ্ধভাবে বলিল, "ছেলেমানুষ? ষোলো সতের বছর বয়েস হয়েছে,— ছেলে মানুষ কিসে? ও বড গিন্নির চেলা,—অনেক কাল আগেই ও মেয়ে পেকে গ্যাছে। ছেলেমানুষি ওর মধ্যে একটুও নেই। তোমরা বোকার জাত যে,—দেখবে উপরটা,—ভেতরটা ত দেখ না। বারবার বলচি মানুষ চিনতে শেখো,—কাউকে বিশ্বাস কোর না,-ওতে নিজেই ঠকবে। আমার কথা কেয়ার কবা হয় না, যেন আমি মানুষই নই। দেখ, স্পষ্ট কথা বলছি তোমায়,—আমি এক সংসারে এই সব গণ্ডগোল, ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে কিছুতেই বাস করতে পারব না। হয় আমায় পৃথক করে দাও, নয় বাপের বাড়ি একেবারে পাঠিয়ে দাও।"

নৃপেন মাথা চুলকাইতে লাগিল। সে বমেন্দ্র নহে। স্ত্রীকে সে যেমন অত্যন্ত ভালবাসিত, ভয়ও তেমনি করিত। সুলতা মুখ অন্ধকার করিলে, বিশ্বজগৎ তাহার চোখে অন্ধকার হইয়া আসিত। এখন সে কবিবে কি, বলিবে কি—ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না।

সুলতা তাহার স্তম্ভিত মুখখানার পানে চাহিয়া বলিল, "হাঁ করে ভাবছ কি? আমার কথা কেয়ার হয় না,—সামান্য দাসী শ্রেণীর লোক পেয়েছ আমায়? আমি কি তোমাদের অসভ্য গ্রাম্য স্ত্রীলোক যে, অবজ্ঞা করলে তাও আদর করে মাথায় তুলে নেব?"

নৃপেন স্তম্ভিত ভাবটা দূব করিয়া দিয়া বলিল, "তোমার কথা কোন্ দিন না শুনি সু?

যখনি যা বলছ, তখনি তাই করছি। বললে, কতকগুলো শেয়ার তোমার নামে করে দিতে,—আমি তাই করলুম। বড়দাকে না জানিয়ে তোমার নামে—”

উদ্ধত ভাবে সুলতা বলিল, “তবে তো বড্ড কাজই করেছ। কেন করেছ তুমি,— কেন শেয়ার কিনেছ? কেন আলাদা ব্যবসা করতে গেছ? তোমার বড়দার কাছে লুকোবার দরকার তো নেই কিছু। দাওগে সব তোমার বড়দাকে ফিরিয়ে। তোমার দান এক পয়সা আমি চাই নে।”

অত্যন্ত রাগের সহিত উঠিয়া, ড্রয়ার খুলিয়া কয়েকখানা কাগজপত্র নৃপেনের সামনে ছুড়িয়া ফেলিয়া, দুপদাপ করিয়া সে সেজবউয়ের কাছে চলিয়া গেল। হতভাগ্য নৃপেন স্তম্ভিত হইয়া তাহার গমন পথ পানে শুধু চাহিয়া রহিল। তাহার পর পতিত কাগজপত্রগুলার পানে চাহিল।

সে যে কতদূর জুয়াচুরি করিয়াছে,—এখনও করিতেছে, তাহা সুলতা বুঝিল না,— তাহা সুলতা জানিল না। মেয়েরা এমনই অবুঝ বটে। তাহারা নিজেদের দিকটাই দেখিয়া যায়,—নিজের জিনিসই কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া লয়। পরে যে কতখানি দিল, তাহা তাহারা চাহিয়া দেখে না। নৃপেন তাহার জন্য না করিযাছে কি? দেবতার তুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, লক্ষ্মণের তুল্য ছোট ভাই দুটি,—তাহাদের প্রবঞ্চনা করিয়াছে,—আজও কবিয়া আসিয়াছে। সুলতার জন্য নিত্য তাহাকে মিথ্যা লইয়া কারবার করিতে হইতেছে। সুলতা ইহা বুঝিল না,- -সুলতা তাহার পানে একবার চাহিল না। নিদারুণ অভিমানে নৃপেনের বুকটা দগ্ধ হইতে লাগিল।

কিন্তু না, সে বড তেজস্বিনী। সত্যই সে পিত্রালযে চলিয়া যাইতে পাবে। এ সব কথা যদি শ্বশুরালয়ে যায়, তাহা হইলে সে আব সেখানে মুখ দেখাইতে পারিবে না। অথচ এই শ্বশুরবাড়ি লইযাই তাহার কাজ। তাহার জ্যেষ্ঠ শ্যালক চন্দ্রনাথ ব্যবসার ব্যাপারে তাহাব প্রধান বল। আজও ভবানীপুব হইতে আসিবার সময় তাহার শাশুড়ি তাহাকে বারবার করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, সুলতা বড় অভিমানিনী —কোনও মতে তাহার সেই অভিমানে যেন আঘাত না দেওযা হয়।

আর সে চলিযা গেলে নৃপেন বাঁচে কি করি য়া। যখন যেখান হইতে সে বাড়ি আসে, হৃদযটা তখন তাহাব বড উৎফুল্ল হইয়া উঠে,—বাড়ি গিযাই সে তাহার হৃদয়নন্দদায়িনীকে দেখিবে। সুলতার কথা তাহার হৃদয় শীতল করিয়া দিবে। সে চলিয়া গেলে নৃপেনের উপায কি হইবে?

তাহার কথামতই কাজ করিতে হইবে। দাদা একটু দুঃখ কবিবেন বই তো নয। ছোট ভাইয়েরা বাগ করিবে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই। ভাই-ভাই কখনও এক থাকিতে পাবে না। একটা মূল হইতে বহু কাণ্ড উৎপন্ন হয়,—সবগুলিই পৃথক হইয়া যায়,—এক থাকে না। ভাইয়েবাও তেমনি পৃথক হইয়া যাইবে,—এক কখনই থাকিবে না। দু'দিন আগে আর দু'দিন পিছে, এই মাত্র।

নৃপেন অনেকক্ষণ মাগায হাত দিয়া বসিয়া ভাবিল। এ কথাটা বড়দার সামনে কি

করিয়া তোলা যায়? বড়দা যখন মুখখানা অন্ধকার করিয়া ব্যাকুল চোখে চাহিবেন, তখন সে তাহা দেখিবে কি করিয়া? না জানাইলেও তো উপায় নাই; এ কিন্তু বলা যায় কি করিয়া?

অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে একখানা পত্র লিখিতে বসিল। অনেক কষ্টে তাহাতে মনের ভাবটা সে ফুটাইয়া তুলিল। পত্রখানা সামনে পড়িয়া রহিল,—সেই দুই হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

কখন যে সুলতা আসিয়া, পিছনে দাঁড়াইয়া পত্রখানা পাঠ করিল, তাহা সে জানিতেও পারিল না। তীব্র কণ্ঠে সুলতা বলিল, 'এ কি, এ পত্র কাকে লেখা হচ্ছে?'

চমকিয়া নৃপেন পিছন ফিরিল। স্ত্রীর চোখে যে আগুন সে জ্বলিতে দেখিল, সেরূপ আগুন সে কখনও দেখে নাই। স্বামীর পত্র দেখিয়া সুলতা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল, কাপুরুষ স্বামী নিজের মুখে কোনো কথা দাদাকে বলিতে ভয় পায়,—তাই পত্র লিখিয়া প্রকাশ করিতে চায়। স্বামীর এই কাপুরুষতা দেখিয়া তাহার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গিয়াছিল। আপনার অন্তরের ক্রোধ সে আর কোনো মতে চাপা দিয়া রাখিতে পারিতেছিল না।

অপরাধীর মতই নৃপেন মাথা হেঁট করিল। সুলতা পত্রখানা তুলিয়া লইয়া, তাহা শতখণ্ড করিয়া স্বামীর সামনে ফেলিয়া দিয়া দীপ্ত কণ্ঠে বলিল, "তোমাকে যে কি বলব ভেবে পাচ্ছি নে। পত্র লিখতে যাচ্ছিলে কাকে?"

নৃপেন চুপ করিয়া রহিল।

সুলতা আদেশের সুরে বলিল, "চুপ করে থাকলে চলবে না,—উত্তর দাও বলছি।"

নৃপেন মুখ তুলিল "দাদাকে।"

সুলতা ক্রোধাগুনটাকে চাপা দিবার চেষ্টা করিয়া শান্তভাবে বলিল, "কিসের জন্যে?"

নৃপেন স্পষ্ট উত্তর করিল "তোমার জন্যে।"

"আমার জন্যে?" ঘৃণায় সুলতার মুখখানা বীভৎস হইয়া উঠিল, "আমার জন্যে তুমি এগুচ্ছো? তা যদি হয় তবে নিজের মুখে বলতে পারছ না? পত্র লিখে জানাতে চাচ্ছো? ছিঃ, তোমায় আর বলব কি,—তোমার মুখ দেখতেও আমার ঘৃণা বোধ হচ্ছে। আমি তোমার মুখ দেখতে চাই নে আর। যদি আমার উপযুক্ত স্বামী হতে পার, তবে মুখ দেখিও,—নচেৎ নয়।"

সে ফিরিতেছিল,—আর্ত কণ্ঠে নৃপেন ডাকিল, "সুলতা সু—" সুলতা মুখ ফিরাইয়া বলিল, "কেন ডাকছো?"

নৃপেন অত্যন্ত কাতর হইয়া বলিল, "আমি কাপুরুষ নই তার প্রমাণ তোমায় দেব। বড়দাকে আমি নিজের মুখে স্পষ্ট বলব। কিন্তু কি কথা নিয়ে এ কথা তুলব? কি কারণ আমি দেখাব? একটা কিছু দেখানো চাই তো।"

সুলতা গম্ভীর মুখে বলিল, "কারণের অভাব নেই।"

নৃপেন বলিল "আজকের মত মাপ কর আমায়। সাতটা দিন সুলতা—সাতটা দিন অপেক্ষা কর। এর মধ্যে যদি সব না করতে পারি,—তুমি ভবানীপুরে চলে যেয়ো। জন্মের

মতই তোমাকে বিদায় করে দেব আমি। কিন্তু এই সাত দিন, পারবে না কি সুলতা—পারবে না কি দেরি করতে।

সুলতা গম্ভীর ভাবে বলিল, "বেশ, সাতটা দিন দেখতে আমি রাজি আছি।"

বিবাদটা এখানেই মিটিয়া গেল।

রমেন্দ্র মাতাল, বদমাইস,—কিন্তু তাহার হৃদয় আছে, তাহার জ্ঞান আছে। নৃপেন্দ্র বুদ্ধিমান কিন্তু তাহার ভাল-মন্দ জ্ঞান ছিল না। স্ত্রীকে সে জগতের উপরে স্থান দিয়াছে। শুধু তাহার প্রশ্রয়েই যে সুলতা বড় বেশি দূরে চলিয়া গিয়াছে, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। স্ত্রীলোক কাদা মাত্র—তাহার হৃদয়ে যে ভাব সঞ্চারিত করা যায়, যে ভাবে তাহাকে গড়িয়া তুলা যায়, সেও নিজকে সেই ভাবে চালনা করে। তাহারা স্বভাবত কলহপ্রিয়া; কিন্তু ইহার প্রতিবিধানের ভার স্বামীর উপর অর্পিত। এক সংসারে বাস করিতে অনেকেই প্রথমে রাজি হয় না, তাহাদের সে বক্র পথ হইতে ফিরাইয়া, সোজা পথে চালিত করা স্বামীর কার্য। স্বামী ইচ্ছা করিলে স্ত্রীকে দেবী বা দানবী মূর্তিতে পরিবর্তিত করিতে পারেন। নৃপেন দৃঢ় ছিল না, বড় হালকা প্রকৃতির ছিল বলিযাই, সুলতা অতটা মাথা তুলিতে পারিয়াছিল। স্বামীকে পর্যন্ত সে দমনে রাখিয়াছিল। নৃপেন নিজের মর্যাদা পর্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়াছিল।

*শ্রাবণ, ১৩২৯*

# বিলাত ফেরত সম্বন্ধী

## মোহাম্মদ এস্‌হাক

(১)

নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ, সকাল ন'টা। নবাবগঞ্জ উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় সংলগ্ন ছাত্রাবাসে যেন মৌচাকে ঢিল পড়িয়াছে। বাৎসরিক পরীক্ষা আসন্ন—ছাত্রাবাসের ছাত্রেরা একমনে পাঠে রত। কেহ ঢুলিয়া ঢুলিয়া, কেহ বালিশ ঠেস্ দিয়া অর্ধশায়িত অবস্থায়, কেহ বা সম্মুখে টেবিলের উপর রক্ষিত দর্পণে প্রতিফলিত আপন মুখমণ্ডলের দিকে চাহিতে চাহিতে বিভিন্ন ভাবে বিচিত্র ভঙ্গীতে অধ্যয়নে রত। কেবল একটি মাত্র কিশোরবয়স্ক বালকের পাঠে মন বসিতেছে না। বেচারি অনেকদিন বাড়িছাড়া—মায়ের জন্য তার প্রাণ কেমন করে। মা-আদুরে ছেলে সে—অনবরত মায়ের চিন্তা করিতে করিতে মুখের উপর এমনি একটি কারুণ্যের ছাপ পড়িয়াছে যে দেখিলেই মমতা হয়। বাড়ির চিঠিপত্রও অনেক দিন পায় নাই—গত রাত্রে মায়ের স্বপ্ন দেখিয়াছে—তাতে প্রাণটা আরও উতলা। বোর্ডিংয়ে পিয়ন আসিবার সময় হইয়াছে, সে বারান্দার রেলিংয়ের উপর ভর দিয়া আন্‌মনা রাস্তার দিকে চাহিয়া আছে, এমন সময় দেখিল কোট্-প্যান্টপরা, সুটকেশ-হাতে একজন ভদ্রলোক সদর রাস্তা হইতে বোর্ডিংয়ের গেটে ঢুকিলেন। প্রথমে ইঁহাকে দেখিয়া তাহার সাহেব বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল, কিন্তু নিকটবর্তী হইয়া তিনি যখন স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া কোমলস্বরে বলিলেন, "কি খোকা, ভাবছ কি? মায়ের কথা? এই ত বড়দিনের ছুটি এল বলে।" তখন তাহার ভ্রম দূরীভূত হইল এবং যুবকটির আচরণে কিঞ্চিৎ বিস্মিত না হইয়াও পারিল না—তিনি তার মনের কথা জানিলেন কি করিয়া? ততক্ষণে যুবকটি নিকটবর্তী হইয়া একখানা হাত বালকটির কাঁধের উপর রাখিলেন এবং সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামু থাকে কোন্ ঘরে?" বালকটি প্রথমে বুঝিতে পারিল না—"রামু? রামু কে?" তিনি কৃত্রিম রোষের সহিত বলিলেন, "ওহে তোমাদের মাস্টার, রামরঞ্জন দত্ত। বুঝলে? বোকা ছেলে কোথাকার।" বালকটি একটুখানি সলজ্জ হাসি হাসিয়া সসম্ভ্রমে বলিল, "আসুন স্যার, আমার সঙ্গে।"

বালকটিকে অনুসরণ করিয়া আগন্তুক ছাত্রাবাসের সর্বদক্ষিণ একটি কোণের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘরটি ছোট এবং নির্জন। একপ্রান্তে তক্তাপোষের উপর একটি শুভ্র শয্যায় একখানা পুরু কম্বলে দেহ আবৃত করিয়া একজন শ্যামবর্ণ প্রিয়দর্শন যুবক শায়িত। মুখ দেখিয়াই বেশ বুঝা যাইতেছে যে তিনি পীড়িত। আগন্তুক ঘরে প্রবেশ করিতেই তাঁহার মুখের মৃদু হাসি মিলাইয়া গেল—ব্যগ্রভাবে পীড়িত যুবকের মাথার নিকট বসিয়া ডান হাতখানি কপালের উপর রাখিলেন, ও ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামু, এখন কেমন আছিস?"

নাটোর নিবাসী অনুকূলচন্দ্র সোম একজন নামজাদা বড়লোক। জমিদারি, কোঠাবাড়ি, দাস-দাসী, চাকর-চাকরানী, সব কিছুরই তিনি অধিকারী। অনুকূলবাবু বড়লোক, কিন্তু বিলাসী নন। যে যে গুণে মানুস পশু হইতে পৃথক, তা তাঁর যথেষ্টই আছে। তাঁর পরহিতৈষণা ও দানধ্যানের কথা লোক-প্রসিদ্ধ। তিনি এক কথায় গরিবের বাপ মা। তাঁহার জমিদারি—সদিরাজপুর, বেরামপুর, সোনাবাজু প্রভৃতি অঞ্চলের প্রজারা কতবার যে অজন্মার অজুহাতে বাকি খাজনা মাফ পাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই; জমিদার-গৃহিণী সুহাসিনী দেবীও যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। কত অতিথি অভ্যাগতকে যে তিনি নিজ হাতে তৃপ্তি সহকারে আহার করাইয়াছেন, কত অভাবগ্রস্ত অনাথা বিধবার যে তিনি মাতৃস্বরূপা, কে তাহা নির্ণয় করিবে? স্বামী-স্ত্রীর এরূপ মধুর মিলন খুব অল্পই পরিদৃষ্ট হয়। এই দেবতুল্য পরিবারের দুইটি মাত্র সন্তান—একটি ছেলে ও একটি মেয়ে।

ছেলেটি ২১ বৎসর বয়সে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে সসম্মানে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়; মেয়েটি তখন অধুনালুপ্ত উমাশশী গার্লস্ স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী। ছেলেমেয়ে দুটি বিশেষত ছেলেটি বাপ-মায়ের অধিকাংশ গুণের অধিকারী হইয়াছে। এমন নিরভিমান, খোলাপ্রাণ ধনীর দুলাল বড় একটা দেখা যায় না। পিতার মতই দীর্ঘ, গৌরবর্ণ চেহারা—প্রথম দৃষ্টিতে বিদেশীয় বলিয়া ভ্রম হয়। আত্মার প্রসন্ন জ্যোতি মুখে প্রতিফলিত হইয়া মুখখানাকে আরও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। এই সুন্দর মুখে একটি মৃদু অথচ চটুল হাসি সর্বদাই বিরাজমান। একুশ বৎসরের উচ্চশিক্ষিত যুবক, অত বড়লোকের ছেলে—কিন্তু এতটুকু আত্মাভিমান নাই— নিতান্ত ছেলেমানুষের মত সরল—মুটে মজুর, উড়িয়া, কাবুলি সকলেই তার বন্ধু, সকলেরই সে আপন।

কাবুলিদের সঙ্গে মিশিয়া তাদের কথাবার্তা বলিবার মত ভাষা সে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। দরিদ্র উড়িয়া চাকরদের সঙ্গে সে গান করে—তাদের ব্যারাম পীড়ায় নিজ হাতে ঔষধ আনিয়া দেয়। পূজা পার্বণের সময় সে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকদের সঙ্গে মিশিয়া নৌকা-প্রতিযোগিতায় সমান উৎসাহে বৈঠা চালায়। তার নিরভিমান ছেলেমানুষি দেখিয়া লোকে বলে 'পাগলা বাবু'। এটি তাদের দেওয়া, বড় আদরের নাম। মানুষ ত দূরের কথা, সেই হাসি-উচ্ছল মুখখানা যেন পারিপার্শ্বিক ইতর প্রাণীগুলিকে পর্যন্ত ডাকিয়া বলে, "স্বাগতম্।"

পিতামাতাও একমাত্র পুত্রের এই অবাধ আচরণ সানন্দ মৌনের সহিত সহ্য করিয়া যান, বিশেষত আত্মাভিমান জিনিসটা তাঁদের বিশেষ প্রবল নয় বলিয়া তাতে বড় একটা আঘাত বোধও ছিল না। পিতার একান্ত ইচ্ছা ছেলেকে বি-এ পাশের পর ব্যারিস্টারি পড়াইবার জন্য বিলাত পাঠান, কিন্তু মাতা রাজি না হওয়ায় তা এতদিনও সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। ঠিক এমনি সময় এরূপ একটি ঘটনা ঘটিল যার ফলে তার বিলাত যাত্রার পথে কোন অন্তরায়ই রহিল না, অধিকন্তু সেটা কতকটা বাধ্যতামূলকই হইয়া পড়িল।

অতর্কিতে, মাত্র পাঁচ দিনের ব্যবধানে এই সুখী দম্পতি (অনুকূল বাবু ও তাঁহার স্ত্রী)

দুরন্ত বিসূচিকা ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া, খ্যাতনামা বহুদর্শী চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা বিফল করিয়া ঊর্ধ্বলোকে প্রস্থান করিলেন। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় পুত্রকন্যা হতভম্ব হইয়া পড়িল—চিরসুখে অভ্যস্ত, স্নেহপুষ্ট হৃদয় যেন শোকে মুহ্যমান হইয়া উঠিল। পিতা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার পূর্বে কন্যাকে পুত্রের হাতে সঁপিয়া দিয়া গেলেন, "উহাকে পাত্রস্থ করিও, ভালবাসিও" এই শেষ কথা বলিয়া।

(৩)

উল্লিখিত ঘটনার পর পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। পিতার শেষ আদেশ মোহিতকুমার যথারীতি পালন করিয়াছেন। ভগ্নী শেফালিকাকে তিনি সৎপাত্রেই অর্পণ করিয়াছেন। রামরঞ্জন দত্ত তাঁহার সহপাঠী বন্ধু—প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে, একসঙ্গেই বি-এ পাশ করেন। রামরঞ্জনের সংসারে বিশেষ কেহ ছিল না। মেধাবী ছাত্র হওয়ায় তিনি অধিকাংশ পরীক্ষাতেই সরকারি বৃত্তি লাভ করেন। ইহাতেই তাঁহার কলিকাতা বাসের খরচ অনেকটা কুলাইয়া যাইত। যা কিছু কম পড়িত, মোহিতের পিতা তাহা সানন্দে পূরণ করিতেন। পুত্রবন্ধু, এই বিনয়ী ছেলেটির উপর অনুকূলবাবুর পূর্ব হইতেই দৃষ্টি ছিল এবং পিতার মনোগত বাসনাও মোহিত বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন।

ভগ্নীর বিবাহের পর ভগ্নীপতির হাতে সংসারের ভার দিয়া তিনি বিলাত যাত্রা করেন—কোন কিছু উদ্দেশ্য লইয়া নয়—বাপ মায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁব হৃদয়খানি দমিয়া গিয়াছিল। বিদেশ ভ্রমণে হৃদয়ভাব দূরীভূত হইতে পারে এবং কতকটা তাঁর পূর্বের সংকল্প অনুসারেও তিনি সাগর পাড়ি দেন। বিলাত প্রবাসকালে এক আর্মেনিয়া দেশীয় সুন্দরী যুবতীকে ভালবাসিয়া তাঁর পাণিগ্রহণ করেন। অর্ধাঙ্গিনীকে সঙ্গে করিয়া ইউরোপের নানাস্থানে ভ্রমণের পর মাত্র মাস ছয়েক পূর্বে তিনি দেশে ফিরিয়াছেন। এই প্রবাসজীবনে মোহিতের চরিত্রে কোনই পরিবর্তন ঘটে নাই—সেই হাস্যচটুল প্রাণবন্ত উদার ব্যবহার—হৃদয়ের প্রসার যেন আরও একটু বাড়িয়াছে। ইউরোপ ভ্রমণ তাঁকে একটুও আত্মাভিমানী করে নাই। তাঁর অনুপস্থিতিতে ভগ্নীপতি বন্ধু গৃহের অলস জীবন যাপনে অসহিষ্ণু হইয়া নবাবগঞ্জ উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে একটি শিক্ষকের পদ সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন। মোহিতকুমার বাড়ি আসিলে পর তিনি কয়বার নাটোর আসিয়াছেন। এই চাকরি গ্রহণ কবায় মোহিতকুমার তাঁর প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট নন্। তাঁর ইচ্ছা তাঁরা চারটি প্রাণী গৃহের নিরিবিলি জীবনের মধ্যেই কাল কাটাইয়া দেন, বিশেষ কোন অভাব অভিযোগ যখন নাই। কিন্তু তিনি রামরঞ্জনকে এ বিষয়ে রাজি করিতে পারেন নাই—স্বোপার্জিত অর্থে পরিবারের ভরণ পোষণ করা তাঁর একান্ত ইচ্ছা। মোহিতকুমারও তাঁর স্বাধীন ইচ্ছায় বিঘ্ন উৎপন্ন করিতে বিশেষ প্রয়াস পান নাই।

রামরঞ্জনের চাকুরী প্রায় চারি বৎসর হইয়া গেল, কিন্তু তিনি এখনও কর্মস্থলে একাই থাকেন—স্ত্রী মোহিতের ওখানে।

রামরঞ্জন ছাত্রাবাসের নির্জন একটি কক্ষে বাস করেন। আটদিন যাবৎ তিনি জ্বরে

কাতর। সবেমাত্র গতকল্য জ্বর ছাড়িয়াছে, আজ অনেকটা সুস্থ আছেন। 'ক্যাজুয়েল লিভ বিশেষ পাওনা নাই। 'সিক লিভে'র দরখাস্ত করিতেও সাহস পান না। বাৎসরিক পরীক্ষা অতি নিকটবর্তী। সেক্রেটারি যেরূপ কড়া লোক তাহাতে সম্ভবত আর ছুটি মঞ্জুর করিবেন না—মিছিমিছি অপ্রস্তুত হইতে হইবে—বিশেষত রামরঞ্জনের আত্মসম্মান-বোধটাও একটু বেশি। বোর্ডিংয়ে তাঁহার চিকিৎসার ও সেবা শুশ্রূষার কোন ত্রুটি হইতেছে না তবু এই প্রবাসজীবনে পীড়িত অবস্থায়, স্ত্রীর বিদায়কালীন করুণ মুখখানি, তিন বৎসরের মেয়েটির আধো আধো বুলি মনে পড়িয়া তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলে। তিন দিন পূর্বে আভাসে নিজের পীড়ার সংবাদ জানাইয়া তিনি স্ত্রীকে পত্র লিখিয়াছিলেন। তারই ফলে আজ বিলাত-ফেরত সম্বন্ধীর ব্যস্তসমস্তভাবে নবাবগঞ্জে আগমন।

বলাবাহুল্য আমরা যাঁহাকে ইতপূর্বে ছাত্রাবাসের ছেলেটির সহিত রামরঞ্জনের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাব পার্শ্বে বসিতে দেখিয়াছি, তিনিই মোহিতকুমার।

(৪)

ছাত্রাবাসে মোহিতকুমারেব সহিত রামরঞ্জনের সাক্ষাতের ঘণ্টাখানেক পরেব কথা। স্থানীয় কোন একজন বড়লোকেব বৈঠকখানায় মোহিত উপবিষ্ট। সম্মুখে একখানা আরাম কেদারায় স্বয়ং সেই গৃহস্বামী—দোহারা গডন—পাকা কাঁচা চুলদাড়ি—মাথাব মধ্যভাগে টাক—গায় একটি ফতুয়া—চোখে চশমা—রাশভারি মানুষ—দেখিলেই শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। নাম আনোয়ারুল হক চৌধুরি। ইনি স্থানীয় গভর্নমেন্ট প্লিডার, দাতব্য চিকিৎসালয়েব সেক্রেটারি, বালিকাবিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট এবং নবাবগঞ্জ উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়েব সেক্রেটারি। আরও বহুবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত ইনি সংশ্লিষ্ট—উদারপ্রাণ পরহিতৈষী মানুষ, তবে একটুখানি বদরাগী।

বৈঠকখানা-সংলগ্ন, অন্দরের দিকে আর একটি কক্ষ। উভয় কক্ষের মধ্যবর্তী খোলা দরজার মুখে একটি নানা বঙে রঞ্জিত পর্দা টাঙান। এই পর্দার আড়ালে দাঁড়াইয়া জনৈক সুবেশা বর্ষীয়সী রমণী পরম কৌতুকেব সহিত ইঁহাদের কথাবার্তা শুনিতেছেন। ইনি চৌধুরি গৃহিণী। বহুদিন পূর্বে যৌবন অতিক্রম করিলেও, এক সৌম্য স্নেহসিক্ত ভাব ইঁহাব মুখমণ্ডলকে সুন্দর করিয়া রাখিয়াছে।

চৌধুরি সাহেবের মধ্যমপুত্র সফিউর রহমান বিলাত ফেবত আনকোরা ব্যারিস্টার মোহিতের প্রায় সমবয়সী, বিলাত প্রবাস কালে মোহিতের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব। সেই জন্য মোহিত রামরঞ্জনের নিষেধ সত্ত্বেও সেক্রেটারির নিকট আসিয়াছেন—ছুটি তিনি মঞ্জুর করাইবেনই এই প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছেন। বাড়িতে স্বামীর অসুস্থতার সংবাদে বোনটি তাঁহার বিষয় চিন্তাক্লিষ্ট। সুতরাং মোহিত অনর্গল বলিয়া যাইতেছেন—"...আমাকে আপনার কাছে আসতে দিতে চায় না স্যার, বলে কিনা তুই পাগল-ছাগল গিয়ে যা-তা বলে তাঁর মেজাজ বিগড়িয়ে দিবি। আমি বললাম, 'তুই থাম্ দিকিন, হাজার হলেও আমি তাঁর ছেলের 'ফ্রেন্ড'—পাগল হলেও বাঁচি পাঠাবেন না, ছাগল হলেও জবাই করবেন না, এ তুই ঠিক

জানিস।' আর কি বোল্‌বো স্যার, দেখ্‌তেন যদি আমার সেই বোনটির কান্না। হতভাগাকে এত করে বলি বাসা কর, একটা বাসা কর্‌, না হয় আমার কাছ থেকেও দু'দশ টাকা নিস; কিন্তু কিছুতেই ও তাতে কান দেবে না। বলে কি না 'এতদিন করি নি, এখন যেন কেমন ঝকমারি লাগে। আর স্ত্রীপুত্রকে দূরে রাখার মধ্যেও বেশ একটা রোমাঞ্চ আছে, তা দুই বুঝবিনে—যতবার যাই তাদের নূতন করে পাই—এই এক জীবনে শতেক জীবনের স্বাদ তুই বুঝবি কিরে মুখ্যু' তুই তো তোর বিবিকে ছেড়ে মুহূর্তও কোথাও যাস্‌নি। বলুন ত স্যার এ কথার কি উত্তর দি? দুঃখের বিষয় আপনাদের কাছে এতদিন থেকেও ও মানুষ হ'তে পারল না। আর আপনাদেরই বা দোষ কি বলুন—যার যা স্বভাব, গাধা পিটে কি আর ঘোড়া বানান যায়?

চৌধুরি সাহেব মুখে রুমাল দিয়া হাসিতে লাগিলেন, তাঁর স্ত্রীও অন্তরাল হইতে সেই হাসিতে যোগ দিলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই এই উচ্চশিক্ষিত নিরভিমান, খোলাপ্রাণ পুত্রবন্ধুকে ইতিমধ্যেই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছেন।

সহাস্য বদনে চৌধুরি সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ বাবা, বোনটি তোমার ছোট না বড়?"

হাত নাড়িয়া মোহিত উত্তব করিলেন, "আমরা ওসব বড় ছোট মানি না স্যাব। আমরা স্বামী স্ত্রী আর ওরা স্বামী-স্ত্রী, এ সব 'তুই' সম্বোধন—একেবারে আদিম যুগ আর কি। এ কীর্তির অধিকারী একমাত্র আমি-ওরা তিনজনের একজনও নয়। তবে হ্যাঁ, বোনটি আমাব ছোট—বড় অবিশ্যি নয়।"

চৌধুরি সাহেব প্রশংসমান দৃষ্টিতে মোহিতের দিকে কিছুক্ষণ চাহিযা রহিলেন, তারপবে বলিলেন, "মোহিত, তুমি মা লক্ষ্মীকে ঘরে এনেছ তা হ'লে।"

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া মোহিত উত্তর দিলেন, "এনেছি, কিন্তু আপনার সে 'মা লক্ষ্মী' দেশী নয়—বিদেশী—বিলাত-প্রবাসিনী এক আর্মেনিয়া বালিকাকে ভালবেসে বিয়ে করে বসেছি স্যার। সে আমাব চার বছরের ছোট। উভয়েই উভয়কে নিয়ে পাগল, শেষে বিয়ে। দোব বল্‌তে আমার ওই একটাই—অবশ্য যদি এটাকে দোষ বলেন। আর কোন দোষ আমার মধ্যে পাবেন না স্যার। তাই সবাই আমাব প্রশংসা কবে, কেবল ওই রাম..." কথার মধ্যে হঠাৎ আসিয়া মোহিত নিম্নকণ্ঠে অপ্রস্তুতের মত বলিলেন, "ও যা আত্মপ্রশংসা করে' ফেলেছি, তা ছাড়া কার কাছে কি সব কথা। আমার ওই আর একটা দোষ—কথা বল্‌তে বোস্‌লে স্থান কাল পাত্র জ্ঞান থাকে না—মাফ কোর্‌বেন স্যার।"

চৌধুরি সাহেব শেষের কথায় কান না দিয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন মোহিত, বিদেশী মহিলাকে বিয়ে করে' কি তুমি ঠকে গিয়েছ? আজ কাল ত বিলাত-ফেরতেরা এতে মোটেই কোন দোষ দেখেন না।"

আবেগভরে মোহিতকুমাব বলিতে লাগিলেন, "ঠকে গিয়েছি? আমি? রামঃ! বিদেশী মেয়েকে বিয়ে করেছি বলে ত আমার মনেই হয় না। আপনি এরূপ বিয়ে অনুমোদন করেন কিনা ভেবেই আমি ও কথা বললাম। মনে হয কি জানেন স্যার, আমরা যেন চিরকালের

জানাশুনা—ও ছাড়া অন্য কেউ আমার বউ হ'তে পারে এ চিন্তাই এখন আমার কাছে আজগুবি লাগে। সত্য বলতে কি স্যার, অনেক দেশ ঘুরে ফিরে, অনেক কিছু দেখে শুনে আমার একটা দৃঢ় ধারণা হয়েছে, আপনি-পর, স্বজাত-পরজাত, স্বদেশ-বিদেশ, ওগুলি কৃত্রিম বাঁধ। মানুষের মধ্যকার যে সনাতন আসল রূপটি তা জাতিধর্ম নির্বিশেষে অভিন্ন। ভালবাসার চাইতে উচ্চতর ধর্ম ও আর কিছুই দেখি না। দূরকে নিকট, পরকে আপন যা করে, সেই ত ধর্মের ভিত্তিভূমি। পরশ পাথরের অস্তিত্ব আছে কিনা জানি না—কিন্তু ভালবাসা যে পরশপাথরধর্মী তা কে অস্বীকার করবে...কিন্তু ও যা ধান ভান্‌তে শিবের গীত! এলাম ভগ্নীপতির দরখাস্ত মঞ্জুর করাতে, আরম্ভ করলাম আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বকুনি। আর তা ছাড়া...” মোহিত হঠাৎ থামিয়া গেলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন, “যাবেন স্যার একদিন এই গরিবের বাড়িতে? আপনার পায়ের ধূলি পেলে আপনার ‘মা লক্ষ্মী’ খুব খুশি হবে। তা ছাড়া দেখবেন বিদেশী মহিলা বলে মনেই হবে না—চালচলন বেশভূষায় একদম খাঁটি বাঙালি।”

এতক্ষণে চৌধুরি সাহেবের স্ত্রী পর্দার অন্তরাল হইতে আত্মবিস্মৃত অবস্থায় ভিতরে আসিয়াছেন এবং স্বামীর পার্শ্বের একটি শূন্য আসন অধিকার করিতেই মোহিত অনুমানে বুঝিলেন—তিনি কে এবং দাঁড়াইয়া উঠিয়া সসম্মানে তাঁহার পায়ের ধূলি লইলেন। চৌধুরি গৃহিণীর হৃদয়ে মাতৃস্নেহ যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাঁহার মাতৃত্বের ছাপ। মাথার হাত দিয়া তিনি মোহিতকে আশীর্বাদ করিলেন, “সুখী হও বাপ্‌, খোদা তোমার মঙ্গল করুন।” মনুষ্যত্ব মনুষ্যত্বের নিকট অবনমিত হইল। সকলের প্রভু অন্তর্যামী এই ক্ষুদ্র ঘটনায় বোধ করি রুষ্ট হইলেন না।

* * *

যেদিনকার ঘটনা উপরে বিবৃত হইল, সেইদিনই বৈকালে চার ঘটিকার সময় নাটোর জংশন হইতে একখানি জুড়িগাড়ি মোহিতকুমারের বাড়ির ফটকে আসিয়া থামিল। চালক দরজা খুলিতেই মোহিতকুমার ও বামরঞ্জন গাড়ি হইতে নামিলেন। নবাবগঞ্জ স্কুলের সেক্রেটারি, আনোয়ারুল হক্ চৌধুরি বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক রামরঞ্জন দত্তকে পূর্ণ বেতনে পুরা দুই সপ্তাহের ‘সিক লিভ’ ত মঞ্জুর করিয়াছেনই, অধিকন্তু সস্ত্রীক মোহিতকুমারের গৃহে আসিবার প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত দিয়া দিয়াছেন। গাড়ি থামিতেই দারোয়ান সহাস্যে সম্ভ্রম জানাইয়া ভিতরকার জিনিসপত্র নামাইতে লাগিল। বাড়ির ‘গেটে’ ঢোকামাত্র মোহিতকে দেখিয়া বাড়ির পোষা কুকুরটি লাফাইয়া আসিয়া উল্লাসে লেজ নাড়িতে লাগিল। বারান্দায় উঠিতেই খাঁচার টিয়াটি আহ্লাদে চিৎকার করিয়া উঠিল। মোহিতকুমার কুকুরটির পায় হাত বুলাইয়া, টিয়াব খাঁচা উঁচু করিয়া ধরিলেন, সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করিয়া বলিলেন, ‘পুঁটি, এই তোর বর নে।” শেফালিকা ওরফে পুঁটি গাড়ির শব্দ শুনিয়া আগেই দরজায় দাঁড়াইয়াছিলেন—সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলিয়া যাইতেই চারি চক্ষের মিলন'

*ভাদ্র, ১৩৫১*

# ভাংচি

## গজেন্দ্রকুমার মিত্র

স্টেশন হইতে গ্রাম অনেকটা দূর, কাছাকাছি কোথাও বসতির চিহ্নমাত্র নাই, শুধু মাঠ আর ধানের ক্ষেত। দূর বনান্তরালে দুটি একটি মাত্র সাদা বাড়ি ও খড়ের চালা স্টেশন হইতে দৃষ্টিগোচর হয়, অথচ গ্রাম বেশ বর্ধিষ্ণু; অনেকখানি দূর বলিয়াই তাহার আয়তন এখান হইতে চোখে পড়ে না।

কিন্তু স্টেশনের কাছে একেবারেই কিছু নাই বলিলে ভুল বলা হইবে। স্টেশনের গোটা দুই কোয়ার্টার আছে, একটা পাকা বাঁধান ইঁদারা আছে, আর আছে একটি মাত্র চালায় দুইটি দোকান। অপেক্ষাকৃত যেটি বড়— সেটিতে চা, ডাব, কেক-বিস্কুট হইতে সুরু করিয়া তেলে ভাজা ও ঘিয়ে ভাজা খাবার, কিছু কিছু মনোহারী জিনিস, এমন কি ডিম ও আলু পটল পর্যন্ত বিক্রয় হয়। আর ছোটটিতে পান বিড়ির দোকান দেয় আশু পণ্ডিত।

' আশু যে পণ্ডিত কি হিসাবে আখ্যা পাইল তাহা বোধ করি স্বয়ং অন্তর্যামীরও অনুমান করা শক্ত। তবে পণ্ডিত না হইলেও সময় বিশেষে পুরোহিতের কাজ সে করে এবং প্রয়োজন হইলে কুলাচার্যেরও। গ্রামে পুরোহিত বা কুলাচার্য আরও আছে সুতরাং প্রায়-নিরক্ষর আশুর পক্ষে শুধু ঐ কাজের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা-অর্জন সম্ভব নয়, সেই জন্যই বাধ্য হইয়া তাহাকে বিড়ির দোকান দিতে হইয়াছে, এই তিনটি বৃত্তি জড়াইয়া কোনমতে তাহার জীবনধারণের খরচাটা ওঠে।

তাই সেদিন পাঁচটার ট্রেনের সময় শ্রীশ মুখুজ্জেকে স্টেশন হইতে বাহির হইয়া তাহারই দোকানের সামনে গতি মন্থর করিতে দেখিয়া আশু উল্লসিত হইযা উঠিল। এক লাফ দিয়া দোকান হইতে নামিয়া ভাঙ্গা টুলটা কোঁচার খুঁট দিয়া ঝাড়িয়া দিয়া কহিল, বসুন বসুন বড়বাবু।

শ্রীশবাবুর এক হাতে ছিল প্রকাণ্ড বাজারের পুঁটলি আর এক হাতে ছাতা, ইলিশ মাছ ও কিসের একটা ঠোঙ্গা; সুতরাং তিনি বসিলেন, কহিলেন, আর বসব না পণ্ডিত, তুমিই শোন—। আমার ছেলেটার কি করলে?

আশু মুখ কাঁচুমাঁচু করিয়া কহিল, চেষ্টা ত করছি বাবু, ভালো মেয়ে যে পাই না। যা-তা ত আর আপনাকে গছিয়ে দিতে পারি না।

শ্রীশবাবু কহিলেন, না না। আমার সুন্দরের বাড়ি, পণ নষ্ট আমি করব না কিছুতেই, তাতে ছেলে চিরকাল আইবুড়ো থাকে তাও ভাল।

শ্রীশবাবু চুপ করিলেন। আশু ঠিক কী বলা উচিত ভাবিয়া পাইল না, শুধু বোকার মত হাসিতে হাসিতে কহিল, তাইত, তাইত। আপনাদের কি যে-সে বাড়ি!

শ্রীশবাবু বলিলেন, শোন এখন যা বলতে এসেছি। জৌগ্রামে একটা নাকি সুন্দর মেয়ে আছে, আমাদের পাল্‌টি ঘর, শাণ্ডিল্য গোত্র—সব ঠিক ঠিক মিলে গেছে। সবাই বলছে মেয়ে সাক্ষাৎ পরী। একবার দেখে আসতে পারো?... আমি ত আর বরের বাপ হয়ে যেচে যেতে পারি না। তুমি যেন এম্‌নি গেছ মেয়ের খবর পেয়ে, হাতে অনেক ছেলে আছে তাই—তারপর কথায় কথায় আমাদের কথা তুল্‌বে। তখন একদিন গিয়ে দেখে আস্‌ব, বুঝলে না? তাতে মনে হবে যে তুমিই আমাকে জোর ক'রে ডেকে নিয়ে গেছ।

তারপর অর্থপূর্ণ ভাবে একটু হাসিয়া কহিলেন, ও পক্ষ থেকেও তাতে তোমার দুপয়সা পাওনা হবে, বুঝলে না?

আশু ভাল রকমই বুঝিল এবং আরও বিনীতভাবে হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

শ্রীশবাবু কহিলেন, তাহলে তুমি কালই দুপুরের গাডিতে চলে যাও, খবর নিয়ে এসো—গোপাল চক্রবর্তী মেয়ের বাপের নাম, কলকাতার বড় ডাকঘরে কাজ করে, বাড়ি খুঁজে নিতে কষ্ট হবে না। কাল ছুটি আছে, চক্রবর্তীকেও বাড়িতে পাবে বোধ হয়।

আশু কহিল, যে আজ্ঞে, কালই যাবো।

শ্রীশবাবু পুঁট্‌লিটা টুলে নামাইযা রাখিয়া পকেট হইতে একটি আধুলি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন; বলিলেন, তোমার যাওয়া আসার খরচা সাত আনা আর এক আনা চায়ের খরচা—পুরোই দিলুম।

আশু পরের দিনই জৌগ্রাম যাত্রা করিল। গোপাল চক্রবর্তীর বাড়িও খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইল না। কিন্তু গোলমাল বাধাইলেন চক্রবর্তী নিজে। কহিলেন, ওসব ঘটক-টটকের কাজ নয় ঠাকুর। কত ঘটকই এল, আর কত ঘটকই গেল। মিছিমিছি হাঙ্গামা।

আশু ক্ষুণ্ণ হইল। একটু যেন উষ্ণভাবেই কহিল, ঘটক ঢের দেখেছেন বটে কিন্তু আশু পণ্ডিতকে দেখেন নি। হাতে পাত্তর না থাকলে সে মেয়ের বাপের কাছে আসে না।

গোপাল চক্রবর্তী কহিলেন, পাত্তরের অভাব নেই বাংলা দেশে তা আমি জানি। অভাব হচ্ছে আমার টাকাব, পয়সা আমি একটিও দিতে পারব না, সাফ্ কথা। এর পরেও আমার কাজ করতে চাও?

আশু কহিল, টাকাও খরচা করবেন না আবার মেজাজও দেখাবেন? এ মন্দ নয়।

তাহার পর বিনা নিমন্ত্রণেই দাওয়ার উপর জাঁকিয়া বসিয়া কহিল, সে মরুকগে, ব্রাহ্মণ সন্তানকে এখন এক ঘটি জল খাওয়াবেন, না পুকুরে যেতে হবে?

গোপাল এবার লজ্জিত হইলেন। বাড়ির ভিতর হইতে দুটি দেশীয় মোণ্ডা ও এক ঘটি জল নিজেই আনিয়া দিলেন, চাকরকে বলিলেন তামাক সাজিতে।

জলপান শেষ করিয়া সহসা আশু যেন ধমক্ দিয়া উঠিল, কিন্তু পয়সা খরচই বা করবেন না কেন? বড় চাকুরি ত করেন শুনলুম।

গোপাল ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে কহিলেন, এ খবরটি আবার কে দিলে?

যে মেয়ের খবর দিলে, সেই ওটাও দিয়েছে—

গোপাল ঈষৎ হাসিয়া কহিল, যেই দিক, একটু ভুল খবর দিয়েছে। বড় ডাকঘরে কাজ করি বটে, কিন্তু বড় চাকরি করিনে। যাই হোক্—সে আয় ব্যয়ের হিসেবে দরকার নেই এখন। একেবারে বিনা পয়সায় পারো ত দেখ—

আশু যেন বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িল, মনে মনে অর্ধস্ফুট স্বরে কহিল, তাইত, শক্তিগড়ের মুখুজ্জেদের ছেলেটা চারটে পাশও করেছে আবার সরকারী চাকরিও করে, পাত্তর হিসেবে ফাস্ট কেলাস বটে তবে একেবারে শুধু হাত ওখানে মুখে উঠ্‌বে না। গোপালপুরের শশী গাঙ্গুলির ছেলে কোন্ কলেজে যেন মাস্টারি করে, তারও একটু খাঁই আছে,—হয়েছে। আমাদের গাঁয়েই ত রয়েছে। কাছের লোক কিনা, তাই একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম। শিরিষ মুখুজ্জের ছেলে ত রয়েছে। হ্যাঁ বাবু, মেয়েটি আপনার দেখতে কেমন বলুন দেখি?

গোপাল চক্রবর্তী খোঁচা না দিয়া কথা বলিতে পারেন না। কহিলেন, আমার খবর যেখান থেকে পেলে সেখানে কিছু শোননি? না, না শুনেই দুপুর রোদে এতদূরে ছুটে এসেছ? মেয়ে আমার দেখতে ভালই—

আগেকার খোঁচাটা গায়ে না মাখিয়া আশু যেন লাফাইয়া উঠিল, ব্যাস তা যদি হয় তাহলে ত আর কথাই নেই। শিরিষ মুখুজ্জের ধনুক ভাঙা পণ—ঘর থেকে খরচা করে তাঁর ছেলের বৌ আন্‌তে হয় তাও সই, মোদ্দা কুচ্ছিৎ মেয়ে ঘরে আনবে না কিছুতেই। ওরা সুন্দরের বংশ কিনা! ছেলে, বাবু, যাকে বলে ময়ূর ছাড়া কার্তিক। যেমন রূপ, তেম্‌নি গুণ—

কি করে তোমার শিরিষ মুখুজ্জের ছেলে?

কী করে? বলেন কি বাবু? চারটে পাশ করেছে সে ছেলে। অনার না কি বলে তাও পেয়েছে, এখন শুধু বাপের অফিসে ঢুকতে যা দেরি।

গোপাল ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন, বাপ কি করেন?

সরকারী চাকরি করে গো, কাস্টম অফিসে, বেশ মোটা মাইনে। ওর বাপ ছিল সেকালের গ্রেহাম কোম্পানির মুচ্ছদ্দি। পয়সার অভাব নেই ওদের।

গোপাল একটুখানি যেন ভাবিয়া বলিলেন, শিরিষ কি তাহলে প্রাণধন মুখুজ্জের ছেলে?

ঠিক ধরেছেন বাবু! দেশের আদ্ধেক জমিই ত ওদের। জমিদার আছেন নামে।

গোপাল জবাব দিলেন, শিরিষের ভাই আমার সঙ্গে পড়ত, সে মারা গেছে। এখন চিন্‌তে পারলুম। যাক্ দেখ যদি লাগাতে পারো। মোদ্দা একেবারে শুধু হাতে কি ওরা ছেলে ছাড়বে। মুখে অনেকেই বলে প্রথমে, কাজের বেলা এসে আড়াই হাজার টাকার ফর্দ দেয়—

কণ্ঠস্বরে জোর দিয়া আশু কহিল, ছাড়বে বাবু, ওরা ও রকম লোক নয়। তবে মেয়ে সুন্দর হওয়া চাই, তা বলে রাখছি।

গোপাল কহিলেন, মেয়ে আমার পছন্দ হবে, এ গ্যারান্টি দিতে পারি।

আশু একবার মাথাটা চুলকাইয়া কহিল, সে দেখুন প্রায় সব মেয়ের বাপই বলে, কিন্তু কাজের বেলা দেখি অন্যরকম।

খোঁচাটা বুঝিয়া গোপাল কহিলেন, বেশ ত, সে সন্দেহে আর কাজ কি, মেয়েকে আমি এখনই ডাক্‌ছি—নিজে চোখে একবার দেখে যাও, যেমন আছে তেমনি আস্‌বে, সাজ-গোজ কিছুই করা নেই—দেখেই যাও একবার। তুমি একে বুড়ো মানুষ তায় ঘটক—তোমার কাছে বেরোবে তাতে আর লজ্জা কি?

তাহার পরই হাঁক দিলেন, মাধু, ওমা মাধু রে!... ও মাধু—

কী বাবা? বলিয়া মাধুরীলতা একেবারে বাহিরের দাওয়ায় বাহির হইয়া আসিল। কি একটা ঘরের কাজে ব্যস্ত ছিল, হাতে একটা ময়লা কাপড়ের টুকরা ন্যাতার মত পাকানো, আঁচলে কাপড়টা কোমরে জড়ানো, যাহাকে বলে গাছ-কোমর বাঁধা। আর কেহ নাই মনে করিয়া সে ঐ ভাবে বাহির হইয়া আসিয়াছিল; এখন বাবার সঙ্গে অপরিচিত লোককে দেখিয়া লজ্জিত ভাবে তাড়াতাড়ি ন্যাক্‌ড়াটা ফেলিয়া দিয়া আঁচলের কাপড়টা লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল।

আশুর কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি ছিল না। সে মুগ্ধ অপলক নেত্রে মেয়েটিকে দেখিতেছিল, চৌদ্দ-পনের বৎসর বয়স তাহার, প্রথম কৈশোরের আগুন লাগিয়াছে তাহার সারা দেহে। স্নিগ্ধ গৌরবর্ণ, ভাসাভাসা চোখ, তুলি দিয়া আঁকার মত ভ্রূ, পাত্‌লা ঠোটের মধ্যে মুক্তার মত দাঁত, সুগঠিত সুশ্রী দেহ। পিঠ ঢাকিয়া পড়িয়াছে একরাশ প্রতিমার মত ঢেউ খেলানো কালো চুল, তাহারই দুই একটি সুন্দর ললাটে স্বেদবিন্দুর সহিত জড়াইয়া গিয়া সে মুখকে আরও লাবণ্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে।...আশু আর চোখ ফিরাইতে পারিল না।

কী বাবা?

আর একবার মাধুবী প্রশ্ন করিল। গোপাল কহিলেন, কিছু না, তুই যা।

মেয়েটি একরকম ছুটিয়াই পলাইয়া গেল। চক্রবর্তী কহিলেন, দেখলে ত ঠাকুর? চলবে এ মেয়ে?

আশুর এতক্ষণে চৈতন্য ফিরিয়াছিল। সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, এ মেয়ে চলবে না, বলেন কি?... সাক্ষাৎ উমা যেন মহাদেবের জন্য অপেক্ষা করছেন! আমাদের সুহাসের সঙ্গে খাসা মানাবে।

গোপাল কহিলেন, দেখ, যদি লাগাতে পাবো—আমার বরাত আর তোমার হাত যশ!

আশু ছাতাটি বগলে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমি এখনই যাচ্ছি। যাতে রবিবার দেখতে আসে তারই বন্দোবস্ত ক'রে ফেলি—মোদ্দা বাবু, আমাব বিদেয়টা মোটা পাবো ত?

গোপাল হাসিয়া অভয় দিলেন।

ট্রেন হইতে নামিয়া আশু সোজা শ্রীশবাবুর বাড়ি উপস্থিত হইল। পাঁচশ' বিড়ি আর কয়েক খিলি পান সুধীরেব দোকানে দেওযা আছে; তাছাড়া সেটা ছুটির দিন, স্টেশন অঞ্চলে খরিদ্দারের ভিড় কম। সুতরাং দোকান খোলার বিশেষ তাড়া ছিল না।

শ্রীশবাবু তাহার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন, সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন, কেমন দেখলে পণ্ডিত? চলবে?

আশু বসিয়া পড়িয়া ছাতাটাতেই মুখটা মুছিয়া কহিল, এখন আমার বখশিশটার ব্যবস্থা করুন দেখি আগে, তারপর অন্য কথা। আমি কিন্তু একশ' টাকার কম ছাড়ছিনে।

শ্রীশের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। হাসিয়া কহিলেন, বখশিশ ত আমারই পাওয়া দরকার হে, আমিইত সন্ধান আনলুম।...যাক্‌গে, তার জন্যে আটকাবে না, এখন মেয়ে কেমন দেখলে তাই বলো।

আশু জবাব দিল, সে মেয়ে যে কেমন দেখতে তা আপনাকে বোঝাতে পারব না বড়বাবু, আমার ত মনে হ'ল সাক্ষাৎ দুগ্‌গো ঠাকরুন চালচিত্তির থেকে নেমে এলেন, ঠিক তেম্‌নি রূপ! আমাদের সুহাসের সঙ্গে যা মানাবে, যেন হর-পার্বতী মিলন।

শ্রীশ তখনই উঠিয়া অন্তঃপুরে সংবাদটা দিয়া আসিলেন, পণ্ডিতের জন্য চা ও সন্দেশের ব্যবস্থাও হইল; তাহার পর ফিরিয়া আসিযা কহিলেন, তার পর, কথাবার্তা কিছু হ'ল নাকি?

আশু সগর্বে কহিল, আজ্ঞে হ্যাঁ। আশু পণ্ডিত যখন গেছে তখন পাকা ব্যবস্থা না ক'রে কি আসে?...রবিবার আপনারা দেখতে যাবেন বলে এসেছি। আপনাকে চেনে, আপনার ভায়ের সঙ্গে নাকি পড়েছিল।... মোদ্দা এক পয়সাও দেবে না বডবাবু, সেকথা আগেই ব'লে দিয়েছে—

এক পয়সাও দেবে না? বলো কি?

সে কথা বারবার ব'লে দিয়েছে, মানুষটাও মনে হলো একরোখা গোছের।

শ্রীশ একটু যেন চিন্তিত হইয়া কহিলেন, ছেলেব বিয়ের সব খরচা ঘর থেকে কবতে হবে....তাইত!...কিন্তু কিছুই কি আর দেবে না, নিজের মেয়ে, অন্তত গায়েও দুখানা একখানা সাজিয়ে দেবে ত!...যাক্‌গে, মেয়ে যখন অত সুন্দরী বল্‌ছ—

আশু জোর করিয়া কহিল, সে মেয়ে ঘর থেকে পয়সা খরচ ক'রে আনবার মতই বাবু, ও নিয়ে আর মন খারাপ করবেন না।

আচ্ছা, তাই হবে। রবিবারেই দেখ্‌তে যাবো তাহলে।

আশু সোজাসুজি দোকানে না গিয়া নিজের বাড়িতে আসিল আগে। সারা দুপুরটা রোদে রোদে ঘোরা হইয়াছে, একটুখানি বিশ্রাম প্রয়োজন। কিন্তু বাড়ির তালা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেই কেমন যেন মনটা বিষাক্ত হইয়া গেল। বাড়ি মানেই পৈত্রিক ভিটাটা আছে এই পর্যন্ত। সারা উঠানটা জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে, মধ্যে মধ্যে ইট পাতা আছে তাই কোনমতে ঘরে পৌঁছানো যায়। ঘরের অবস্থাও তথৈবচ, ধূলায় ও জঞ্জালে যেন এক হাঁটু।

অথচ এককালে আশু খুব সৌখিনই ছিল। কোথাও এতটুকু ময়লা সে সহিতে পারিত না। সংসার তাহার চিরকালই ছোট—মা, স্ত্রী আর একটি ছেলে, সুতরাং কাজ ছিল কম। দুইজনে পরিশ্রমও করিতে পারিত খুব, চারিদিক তক্‌-তক্‌ করিত তাহাদের খবরদারিতে। মা চার পাঁচদিন অন্তরই কাপড় জামা-বিছানা সোডা সাজিমাটি প্রভৃতি দিয়া ফুটাইয়া লইতেন, ফলে বাড়িতে কেহ আসিলে কোন দিনই দরিদ্রের সংসার বলিয়া টের পাইত না।

শুধু কি তাই? এই উঠান আজ আগাছায় ভরিয়া গিয়াছে অথচ তাহারা থাকিতে কুমড়া, লাউ, ঝিঙ্গা প্রভৃতি কত ফসলই হইত এখানে, শাক-সবজির জন্য কোন দিনই হাটে বাজারে যাইতে হয় নাই। এমন কি বাহিরে কলা গাছ পেঁপে গাছ প্রভৃতি হইতে কিছু কিছু আরও হইত। আর এখন? বাহিরের জঙ্গলে বাঘ লুকাইয়া থাকাও বিচিত্র নয়।

আশু ছাতাটা ঘরের এক কোণে রাখিয়া কোনমতে চাদর জামা খুলিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। বিছানা যেমন ময়লা, তেমনি তাহাতে ছারপোকার উপদ্রব, তবু তাহার উপরই শুইতে হয়। নেহাৎ অসহ্য হইয়া উঠিলে কুড়ি-পঁচিশ দিন অন্তর এক একদিন ঘর সাফ করিতে বসে কিন্তু অনভ্যস্ত হাতে অর্ধেক ময়লা যায়, অর্ধেক যায়না। বালিশের ওয়াড় ধোপাবাড়ি দিলে কালি বালিশই মাথায় দিতে হয়, কাচিয়া আসিলেও, পরাইতে পরাইতে দশদিন কাটিয়া যায়—এমন অবস্থা।

অথচ--থাক্ সে কথা! আশুর এখন ভাবিতেও আর ভাল লাগেনা, কষ্ট হয়।

কেমন করিয়া যে কী হইল, আশ্চর্য! সাজানো বাড়ি, সুখের সংসার, নিমেষে যেন কাহার অভিশাপে পুড়িয়া গেল। মা গেলেন কলেরায়; স্ত্রী সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল কিন্তু সাত মাস যাইতে না যাইতে তাহাকেও দুর্দান্ত নিউমোনিয়ায় ধরিল। বাকি রহিল ছেলেটা, তাহাকে তাহার দিদিমা আসিয়া লইয়া গেলেন, আশু নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু ভগবানের রোষদৃষ্টি যাহার উপর পড়িয়াছে, সামান্য সুকুমার শিশুকে কি সে বাঁচাইতে পারে? মাসতিনেক যাইতে না যাইতে চিঠি আসিল টাইফয়েড হইয়াছে তাহার। আশু স্ত্রীর শেষ চিহ্ন বালা জোড়া বিক্রয় করিয়া ছুটিল শ্বশুরবাড়িতে, সেখানে যতটা চিকিৎসা সম্ভব সমস্তই হইল কিন্তু তবু সে গুঁড়াটুকুকে বাঁচানো গেল না। আত্মীয় বলিতে আর কেহ রহিল না—এই বিশাল পৃথিবীতে জীবনের বোঝা বহিতে বহিল শুধু সে একা।...

আশু আর কিছুতেই শুইয়া থাকিতে পারিল না। ছট্‌ফট্ করিয়া উঠিয়া পড়িল। ঘরের কোণে গিয়া তামাকের সরঞ্জাম বাহির করিয়া সাজিতে বসিল। বিড়ির দোকান আছে বটে তাহার, কিন্তু বিড়ি সে খাইতে পারে না—

তামাক সাজিতে সাজিতে মনে পড়িল এ কাজও, যতদিন স্ত্রী ছিল, তাহাকে করিতে হয় নাই। হাতে যত কাজই থাক্ না কেন, একটা হাঁক মারিলেই সে আসিয়া সাজিয়া দিয়া যাইত, কোন দিন তাহার জন্য বিরক্ত হয় নাই। আশু হয়ত জানে না, ভাত খাইতে বসিয়াছে সে, তামাকের কথা কানে যাইতে ভাত ফেলিয়া হাত ধুইয়া আসিয়া তামাক সাজিয়া দিয়াছে।...

না, নিজের সংসার যাহার নাই—সেবা করিবার যত্ন করিবার জন্য কেহ আর বাঁচিয়া নাই—জীবন ধারণ তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা!

তবু ত আশু বাঁচিয়া আছে। খোকাটাও যখন মারা গেল তখন সকলেই ভাবিয়াছিল যে আশু পাগল হইয়া যাইবে। অথচ সে শুধু যে বাঁচিয়া আছে তাই নয়, নিয়মমত সে দোকানও খুলিতেছে, ব্যবসাও করিতেছে, পূর্ব অভ্যাস মত মনসা পূজা, লক্ষ্মী পূজা প্রভৃতিও ঠিক চলিতেছে; এমন কি ঘটকালি করিয়া অর্থোপার্জনের চেষ্টাও বাদ যাইতেছে না। কাহারও জন্য কাহারও আটকায় না, জীবনটা কিছু বিড়ম্বিত হয়, এই মাত্র।..

তামাকও আশুর ভাল লাগিল না। কয়েক টান দিয়াই হুঁকা রাখিয়া সে উঠিয়া পড়িল। ঘরে-দরজায় তালা দিয়া অভ্যাসমত দোকানের পথ ধরিল। সন্ধ্যার আর দেরি নাই, সুধীর একটু পরেই দোকান বন্ধ করিবে, তাহার নিকট হইতে পয়সা-কড়ি বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। কিন্তু খানিকটা দূর গিয়াই শেঠেদের ঝিলের ধারে তাহার গতি মন্থর হইয়া আসিল। ভাল লাগিতেছে না, কিছুই ভাল লাগিতেছে না তাহার। আজ যেন অকস্মাৎ সমস্ত কিছুই বিস্বাদ হইয়া গিয়াছে।

শেঠেদের ঝিলের বাঁধানো চত্বর তখন জন বিরল, বাগানের নিবিড় ছায়ার ফাঁক দিয়া মেঘমলিন জ্যোৎস্নার আভাস পাওয়া যাইতেছে, তাহারই আলোয় ঝিলের শান্ত কালো জল বড় সুন্দর দেখাইতেছে আজ।

আশু ছাতা দিয়া চত্বরের একাংশ ঝাড়িয়া ইঁটের বেদীতে ঠেস দিয়া বসিল. এমন ভাবে আর কতদিন চলিবে তাহার? এই ভবঘুরের মত জীবন যাত্রা? ...সুধীরদের বাড়ি সে খায় তাহার জন্য মাসে পাঁচটি টাকা দিতে হয়; তাছাড়া চা, জলখাবার প্রভৃতিতেও কম যায় না, অথচ এই অসুবিধা। রাস্তার ভিখারিরাও বোধ হয় ইহার চেয়ে আরামে থাকে।...

আচ্ছা,—যে কথাটা কয়দিন ধরিয়াই মনের অবচেতন গহ্বরে উঁকি মারিতেছিল আজ তাহারই মূর্তি ধরিল, আর একবার সংসাব পাতিলে কি হয়? বয়স গিয়াছে? কত আর বয়স তার, চুয়াল্লিশের ত বেশি নয়। এই বয়সে কী এমন বুড়া হইয়াছে সে, যে আর সংসার পাতা চলে না? ...গোপাল চক্রবর্তীর যেন ভিমরতি ধরিয়াছে তাই সে অনায়াসে আশুকে বুড়া বলিয়া দিল; কিন্তু আশু ত তাহার বয়স জানে! মাথার চুল ত কত লোকের অকালে পাকে! পয়সাও সে কম রোজগার করে না, কুড়ি, পঁচিশ এমন কি কোন কোন মাসে ত্রিশ পর্যন্ত হয়, ইহাতে একটা ছোটখাট সংসার চলে না? খুব চলে।

সে কল্পনানেত্রে তাহার নূতন সংসারের ছবি দেখিতে লাগিল। নূতন বধূ মাথায় ঘোম্‌টা টানিয়া কাজকর্ম করিয়া বেড়াইতেছে, ফায় ফরমাশ করিলে নতমুখে আদেশ পালন করিতেছে আর রসিকতা করিলে মুখ টিপিয়া হাসিতেছে শুধু। আবার ঘর-দ্বার হইয়া উঠিয়াছে শ্রী-মণ্ডিত, উজ্জ্বল। বিছানা পরিষ্কার, বাগানে আগের মতই ফুল ফল ফসলের বাহার, সময় মত পান জল ঠিক আসিতেছে—পোড়ো বাড়ির কদর্যতার মধ্যে নিঃসঙ্গ জীবনযাত্রা সহসা আবার আনন্দমুখর হইয়া উঠিয়াছে তাহার!...

না, বিবাহ সে করিবেই আবার, কাহারও কোন কথা শুনিবে না।...

আচ্ছা, নূতন বৌ কেমন দেখিতে হইবে কে জানে! ...বয়স কমই হইবে, বেশি বয়সের মেয়েকে পোষ মানানো যায় না।... আশু তাহার নূতন বধূকে যত রকম করিয়াই কল্পনা করে, কোথা দিয়া কী করিয়া যেন মাধুরীলতার ছবিটাই চোখের সামনে আসিয়া পড়ে। অমন মেয়ে পাইবার কোন সম্ভাবনাই নাই তাহার, এ সত্য কথা; আশুর চেয়ে সে কথা বেশি করিয়া আর কেহ জানে না, তবু সেই লজ্জাবনতমুখী কিশোরীর ছবিটিই কল্পনার সহিত বার বাব মিশিয়া যায়।

আশু নিজেকে মনে মনে ধমক্ দিয়া উঠিল, স্পর্ধা ত খুব দেখি! যে মেয়ে রাজার মুকুটে মানায় তাহাকে তুমি লোভ করো?

তা নয়। তবে অল্পবয়সী মেয়েই সে আনিবে! দক্ষিণপাড়ার কেনারাম ভট্‌চার্যের মেয়েটি বিবাহের উপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে নাকি। দেখিতে তত ভাল নয়, রংও কালো, তবু অল্পবয়স তাহার, আর বেশ কাজ-কর্মের। কেনারামের যা অবস্থা, আশু বলিলে হাতে স্বর্গ পাইবে সে। এখন ত মেয়েটা দুইবেলা ভাতই পায় না, আশুর ঘরে সে হইবে একা গৃহিণী—কেনারামের পক্ষে এমন পাত্র পাওয়া ভাগ্যের কথা।

উত্তেজনায় আশু উঠিয়া দাঁড়াইল। আজই সুধীরের কাছে কথাটা পাড়া যাক্— কেনারাম নাকি সুধীরের কী রকম জ্ঞাতি হয়।

দশ মিনিটের পথ পাঁচ মিনিটে অতিক্রম করিয়া সে সুধীরের দোকানে যখন আসিয়া পৌঁছিল তখন দোকানে কেহ নাই। ছয়টার গাড়ি চলিয়া গিয়াছে, সাতটার গাড়ির তখনো সময় হয় নাই, এমন সময় কেহ থাকাও সম্ভব নয়।

সুধীর আশ্চর্য হইয়া কহিল, ব্যাপার কি আশুদা, তুমি যে দিন কাবার ক'রে এলে।

আশু ক্লান্তভাবে তাহার বেঞ্চিটায় বসিয়া পড়িয়া কহিল, এসেছি অনেকক্ষণ, শরীরটা ভাল লাগছিল না ব'লে বাড়িতে গিয়ে শুয়ে পড়েছিলুম। আর পারি না ভাই সুধীর!

সুধীর উদ্বিগ্ন কণ্ঠে কহিল, অসুখ-বিসুখ কিছু—

না, না, অসুখ নয়—এমনি। একা একা এই ভাবে দিন কাটানো আর কি চলে? এখন বয়স হচ্ছে একটু যত্ন-আত্তি দরকার ত! এখন কোথায় পাঁচজনের সেবা নেব না এখনই পড়লুম একা।

কথার স্রোতটা কোন্ দিকে যাইতেছে বুঝিতে না পারিয়া সুধীর চুপ করিয়া রহিল। আশুও ভাবিয়াছিল সুধীরই এইবার কথাটা পাড়িবে; সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া যেন ঈষৎ উত্তপ্ত কণ্ঠেই কহিল. না, সুধীর আমি ভেবে দেখলুম, যে যাই বলুক, আমি আবার সংসার করব!

সুধীর অবাক্ হইয়া তাহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, হঠাৎ যে এ মতি হ'লো?

আশু তখনও বেশ ঝাঁঝের সাহিতই বলিল, হঠাৎ আবার কি? ...কী আমার এমন বয়স হয়েছে যে এখন থেকেই আমি বাউণ্ডুলে হয়ে থাক্‌ব? চুয়াল্লিশ বছর বয়স, এখনও কতকাল বাঁচব তার ঠিক কি! সময়ে ভাত জল নেই, ঘরটা ঝাঁট দিয়ে দেবার লোক নেই, এমন করে মানুষ থাক্‌তে পারে? তারপর, আজ যেন শরীর ভাল আছে, অসুখ হলে দেখবে কে?

সুধীর চোখ তুলিয়া যেন একটু বিস্মিত ভাবেই কহিল, তোমার মোটে চুয়াল্লিশ বছর বয়স?

না, আশি বছর! আশু তীব্রকণ্ঠে কহিল, তোদের চোখে কি হয়েছে, চাল্‌শে ধরেছে এই বয়সেই। আমাকে কি একেবারে খুখুড়ে বুড়ো দেখায়!

সুধীর কহিল, রাগ করছ কেন আশুদা, এমনি জিগ্যেস্ করছি। চুলগুলো সব পেকে গেছে কিনা—

আশু কহিল, কেন তোর মাস্তুতো ভাই সন্তুর চুল পাকেনি? কত বয়স তার, তুই-ই ত বলিস্ এখনও কুড়ি হয় নি।

তা বটে!...তবে কি জানো এ বয়সে সংসার করার বিপদ আছে, সামলাতে পারবে সব দিক? তা ছাড়া ভাল মেয়েও পাবে কি না সন্দেহ। তার চেয়ে একটা কাউকে এনে ঘরটরগুলো—

আশু মাথা নাড়িয়া বলিল, না না অন্য লোকের কাজ নয়। একটু দেখাশুনো করার লোক চাই, যত্ন আত্তি—অন্য লোকে কি কববে?

সুধীর খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, পাঁচজনে কিন্তু ঠাট্টা করবে আশুদা। তাছাড়া বয়স ত তোমার নেহাৎ কমও নয়—এ বয়সে একটা কচি মেয়ে বিয়ে করে পোষ মানাতে পারবে? আর যদি ভাল মন্দ কিছু হয়—সে মেয়েটা ত পথে বসবে। জমি জায়গা বলতে ত তোমার ঐ ভিটেটুকু।

আশু প্রায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, একটা কটূক্তি করিয়া বলিল, সব তাতে ফুট কাটিস্ কেন বল? পাঁচজনের আর কি, ঠাট্টা করেই খালাস; খেতে দেবে আমাকে তারা—অসময়ে দেখবে?

সুধীরের এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। সেও একটু চড়া মেজাজে জবাব দিল, বেশ ত বিয়ে করো, যা করো, আমার তাতে কি? করো না—তোমাব ছাগল তুমি ন্যাজের দিকে কাটবে, আমার কি! তোমার ভালর জন্যেই বলা। আমি কি এর আগে চেষ্টা করিনি ভাবছ? কেনারাম কাকা খেতে পায় না, বলতে গেলে ভিক্ষে করে খায়, আর ঐ ত মেয়ের ছিরি—তবু তোমার কথা বল্‌তে জবাব দিয়েছিল, না বাবাজি, সে আমি দেবো না। ঐ ত ঘাটের মড়া, কদিনই বা বাঁচবে, তারপর আমার মেয়েকে আবার ত সেই ভিক্ষে করতে হবে? দাঁড়াবে কোথায়, ওর আছে কি?'

কেনারাম কাকাই যদি ঐ কথা বলে, ভাল মেয়ে তুমি পাবে কোথায়?

আশু যেন পাথব হইয়া গিয়াছিল, কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল, একথা কবে হলো তোদের?

সে অনেক দিন, তখনও খোকা বেঁচে আছে—

হুঁ।

আশু ধীরে ধীরে আবার বাড়ির পথ ধরিল।

সুধীর কহিল, ও কি, চললে কোথায়? হিসেব বুঝে নেবে না?

আজ থাক্ সুধীর, শরীরটা ভাল নেই। কাল সকালে হবে।

তাহার পর সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তোর মা যেন আজ আর বসে না থাকে, আজ আর কিছু খাবোও না।

সুধীর কাছে গিয়া হাতটা ধবিয়া বলিল, রাগ করলে নাকি আশুদা?

আশু হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, পাগল! শরীরটাই খারাপ।.. তবে এ-ও জানিস্ সুধীর, আশু পণ্ডিত যদি মনে করে, এখনও দুপায়ে মেয়ে জড়ো করতে পারে। তোর ঐ অকাল কুষ্মাণ্ড কাকাকেও বলিস্!...এই অঘ্রাণের মধ্যে যদি আমি আবার সংসার পাততে না পারি ত আশু পণ্ডিত আমার নাম নয়!

সে আর কথা না কহিয়া হন্ হন্ করিয়া গ্রামের পথ ধরিল।

আবার সেই বাড়ি। বন্ধ ঘরের ভ্যাপসা গন্ধ, মলিন শয্যা, ছারপোকার কামড়। আরশোলাগুলো আসবাবপত্রের মধ্যে খড় খড় করিয়া বেড়াইতেছে, ইঁদুরের উপদ্রবও কম নয়. বাড়ি ঢুকিবার সময় উঠানের মধ্য হইতে কী একটা সর্-সর্ করিয়া চলিয়া গেল, তাহার অবয়বটা দেখা না গেলেও অনুমান করা শক্ত নয়। এক-কথায় পোড়ো বাড়ি বলিতে যা বোঝায়।

আশুর চোখে জল আসিয়া পড়িল। এমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি?

অথচ, মবিব বলিলেই ত মরা যায় না! কত বছর পরমায়ু কে জানে, যদি সত্তর বছরই বাঁচে, কিংবা আরও বেশি? আরও ত্রিশ বছর এইভাবে কাটাইতে হইবে? সে কি সম্ভব!

আশু উঠিয়া হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া আলোটা জ্বালিল। হ্যারিকেনের চিম্‌নিও মার্জনার অভাবে ধূমমলিন, তবু তাহারই আলোতে ছোট আয়নাটা ধরিয়া প্রাণপণে আশু নিজের মুখ দেখিতে লাগিল। কী এমন বুড়া হইয়াছে সে? চুলগুলা পাকিয়া গিয়াছে বটে কিন্তু সে বোগে। দাঁত একটা ছাড়া আর সবই এখনো আছে, চামড়াও বুড়াদের মতো কুঞ্চিত হইয়া পড়ে নাই। বিপিন হালদার, গৌরী ভট্‌চায্—ইহারা যে সব তৃতীয় পক্ষ বিবাহ করিল, শ্মশান ঘাটে একটা পা দিয়া—কই, তাহাতে ত কেহ কিছু বলিল না। যত দোষ তাহাব বিবাহে! হ্যাঁ, তাহাদের অনেক জমিজমা আছে এটা ঠিক, কিন্তু পয়সাটাই কি সব? তাছাড়া, সে ত উপার্জন করিতেছে এখনও, স্ত্রীব জন্য কিছু সংস্থান রাখিয়া যাইতে পারিবে না? যত সব—হুঁ!! বিবাহ সে করিবেই, দেখিবে কে আটকায়।

কিন্তু আবারও শয্যার শুইয়া অন্ধকারে ভাবিতে ভাবিতে তাহার উত্তাপ ক্রমশ কমিয়া আসিল। জানাশুনার মধ্যে যত মেয়ে আছে, তাহাকে কেহ দিবে বলিয়া ত মনে হয় না। ছিল এক কেনারামের মেয়েটা, তাহারও ত ঐ চ্যাটাং চ্যাটাং বুলি। তাহা ছাড়া, তাহাব আত্মীয়ের মত স্নেহভাজন সুধীবেবই যদি ঐ মনোভাব হয় তাহা হইলে সহানুভূতি আর কোথায় পাইবে সে? সবাই ঠাট্টা করিবে, হয়ত বা ভাংচি, এমন কি বাধাও দিবে—

নাঃ। আশু যতই ভাবিয়া দেখিল ততই বুঝিল যে আবার সংসার পাতিবার আশা তাহার সুদূরপরাহত। মা থাকিলেও কথা ছিল, কিংবা তেমন কোন আত্মীয়-আত্মীয়া! এই ভাবেই তাহাকে চিরজীবন কাটাইতে হইবে—অ'ব কোনও উপায় কোথাও খোলা নাই। অবশ্য এভাবেও থাকা চলিবে না, সে এ ভিটা বেচিয়া দিবে, ববং সেই টাকাটা সুধীরকে দিয়া সুধীরেরই বাহিরের ঘরটায় বাসা বাঁধিবে, কিম্বা ঐ টাকাটা সম্বল করিয়া কোন তীর্থস্থানে পাড়ি দিবে, হোটেল ত কেহ ঘুচায় নাই, বিড়ির বাবসাও সর্বত্র চলে। যাহার ঘর নাই, সংসার নাই—দেশভুঁইয়ে তাহার কিসের টান?

একথা সেকথা ভাবিতে ভাবিতে ক্রমশ ভোর হইয়া আসিল। মনে পড়িল মাধুরীর কথা। সুহাস আর মাধুরী। সুহাসের অল্প বয়স, মাধুরীরও তাই। দু'জনের চমৎকার মিল হইবে। দুজনেরই রূপের সীমা নাই, অবস্থাও ভাল। ভাবনা-চিন্তা দুঃখ কিছুই নাই—শুধু দিনরাত দুটিতে প্রণয়-লীলাস্রোতে ভাসিয়া চলিবে।

সে কল্পনা নেত্রে মাধুরীদের সংসার যাত্রা দেখিতে লাগিল। সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত, কখনও গোপনে, কখনও প্রকাশ্যে ফষ্টি-নষ্টি চলে দুজনের। আর তাহারই ফাঁকে ফাঁকে মাধুরীর ছোটখাট সেবা, সুহাসের জীবনকে সার্থক করিয়া তোলে। আহা, এ মেয়ের হাতের সেবা যে পাইল, তাহার আর ইহজীবনে কী কাম্য থাকিতে পারে? বাড়িতে দাসদাসী থাকা সত্ত্বেও, সুহাসের নিজস্ব কাজগুলি মাধুরী নিশ্চয় নিজের হাতে করিবে। তাহার জন্য সুহাস অনুযোগ করিলেও শুনিবে না।

ভাবিতে ভাবিতে সে বহু দূরে চলিয়া গেল। প্রণয়-নাট্যের সম্ভব-অসম্ভব অনেক দৃশ্যই সে দেখিতে লাগিল মনে মনে। একদিন সুহাসের কলিকাতা হইতে কী কারণে ফিরিতে দেরি হইয়াছে, বাড়ির লোকে তত ভাবিতেছে না, কিন্তু মাধুরী, মাধবীলতার মতই পুষ্পিতা সঞ্চারিণী সেই সুন্দরী মেয়েটি নিজের ঘরের জানালায় বাহিরের অন্ধকারের দিকে চোখ মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা! তারপর রাত্রে ফিরিয়া সুহাস যখন তাহার উদ্বেগ দেখিয়া পরিহাস করিবে, তখন অভিমানে আসিবে তাহার চোখে জল, সুহাস আবার কত আদর করিয়া সেই মুখেই সুখের হাসি ফুটাইয়া তুলিবে। আবার চলিবে সারারাত ধরিয়া তাহাদের গল্প, প্রণয়-গুঞ্জন!

কিসের একটা অব্যক্ত বেদনায় আশু যেন অস্থির হইয়া উঠিল। বিছানায় উঠিয়া বসিয়া জানালাটা ভাল করিয়া খুলিয়া দিতেই দেখিল যে পূর্বাকাশে রক্তিমাভা দেখা দিয়াছে, ভোরের আর বেশি দেরি নাই। ভাবিতে ভাবিতে সারা রাতই কখন কাটিয়া গিয়াছে জানতে পারে নাই।

আর ঘুমাইবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া সে উঠিয়া পড়িল।

ভাল করিয়া সকাল হইবার আগেই সে শ্রীশবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হইল। তখনও আর কেহ ওঠে নাই, শ্রীশবাবু একা বাহিরের ঘরে বসিয়া গত দিনের কাগজখানায় চোখ বুলাইতেছিলেন। আশুকে দেখিয়া বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, পণ্ডিত যে এত সকালে, কি মনে করে?

আশু কাছে বসিয়া একেবারে হাত দুইটি জোড় করিয়া কহিল, বাবু, কাল লোভে পড়ে বড্ড একটা অপরাধ করে ফেলেছি এবারের মত মাপ করতে হবে। আরও বিস্মিত হইয়া শ্রীশ কহিলেন, ব্যাপার কি হে? খুলে বলো তবে ত বুঝি—

আজ্ঞে, ঐ গোপাল চক্রবর্তীর মেয়ে—

শ্রীশ কহিলেন, হ্যাঁ গোপাল চক্রবর্তীর মেয়ে কি? দেখতে ভালো নয়?

জিভ্ কাটিয়া আশু কহিল, আজ্ঞে না, দেখতে খুবই ভালো।

তবে?

আশু ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, ওদের সব খবরই নিয়ে ছিলুম কাল! মেয়ের মাতামহরা পাগলের বংশ—ওর দিদিমা ছিলেন পাগল, এক মামাও পাগল, সে এখনও বেঁচে আছে—

শিহরিয়া উঠিয়া শ্রীশবাবু কহিলেন, ওরে বাপ্‌রে! পাগলের বংশ থেকে মেয়ে আমি কিছুতেই নেব না। সাক্ষাৎ অপ্সরী হলেও না। আমার জ্যাঠাইমাকে পাগলের বাড়ি থেকে আনা হয়েছিল, তার জন্যে সেই ঠাকুর্দা থেকে শুরু করে আমরা পর্যন্ত কী জ্বালাই জ্বলেছি। ও কাজ আর নয়।

আশু চুপ করিয়া রহিল। শ্রীশবাবু প্রশ্ন করিলেন, এ কথা কাল বলোনি কেন?

আশু কাতরকণ্ঠে জবাব দিল, আজ্ঞে টাকার লোভে। গোপাল চক্রবর্তী আমাকে একশ' টাকা কবুল করেছিল।...কী বলব বাবু, কাল আপনাকে কথাটা গোপন করে পর্যন্ত আমার সে কি অস্বস্তি তা আর কাউকে জানাবার নয়। সারারাত ঘুম হলো না, ভাবলুম বড়বাবু আমাকে এত বিশ্বাস করেন তাঁকে ঠকালে আমার ইহকালও নেই, পরকালও নেই। তাই ভোর্‌ না হতে ছুটে এসেছি—এবারটি মাপ করুন বাবু!

আশুর শুষ্ক মুখ, আরক্ত চক্ষু দেখিয়া শ্রীশবাবুর কথাটা বিশ্বাস হইল। কোমল কণ্ঠে কহিলেন, টাকার লোভ মস্ত বড় লোভ আশু, সামলানো কি সহজ কথা। মুনিরও পদস্খলন হয়।...তুমি যে শেষ অবধি সে লোভ জয় করেছ, এইতেই বাহাদুরি দিচ্ছি।... যাক্—ও কথা আর ভেবোনা। তুমি অন্য মেয়ে দেখো—

ফতুয়ার পকেট হইতে একখানা পাঁচটাকার নোট বাহির কবিয়া জোর করিয়া আশুর হাতে গুঁজিয়া দিলেন। কহিলেন, একশ' টাকা লোকসান হলো তোমাব, তার জাযগায় অবিশ্যি এ কিছু নয়—তবে ছেলের বিয়ে হলে আরও কিছু পাবে, তা তুমিই সম্বন্ধ কবো, আর অন্য লোকই করুক।

আশু তাঁহাকে নমস্কার করিয়া দোকানের পথ ধরিল। ক্লান্ত শরীর, অবসন্ন মন। তবু যাইতেই হইবে, সাতটায় গাড়ির সময় হইয়াছে। চলিতে চলিতে মুঠার মধ্যে পাঁচটাকাব নূতন নোটখানা মচ্‌মচ্‌ করিতে লাগিল।

*শ্রাবণ, ১৩৫০*

# মঞ্জরীর বেহায়াপনা

## আশা দেবী

সেদিন মহিলা-সমিতিতে সমিতির কাজ বড় বেশি দূর অগ্রসর হইতেছিল না। কারণ সেদিকে বড় কাহারও মনোযোগ ছিল না। মেয়েরা যে কথাটা লইয়া এতক্ষণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা ও অশেষবিধ মন্তব্য করিতেছিলেন, তাহা সমিতির আয়ব্যয়ের হিসাবও নয়, বন্যাপীড়িতদের জন্য সাহায্য, চরকা স্কুলের জন্য দান বা দুঃস্থ বিধবাদের মাসোহারার বন্দোবস্তও নয়। তাঁহাদের আজিকার আলোচনার বিষয় মঞ্জরীর বেহায়াপনা। সম্পাদিকার সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ পাঠ অনেকক্ষণ হইয়া গেছে। গুটি তিন চার ছোট ছোট মেয়ে অর্গ্যানের কাছে দাঁড়াইয়া "জনগণমনঅধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা" গানটি গাহিতেছে। কিন্তু গানের দিকে কাহারও মনোযোগ নাই। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। চাকরে ল্যাম্প জ্বালাইয়া টেবিলের উপর রাখিয়া গেল। অন্য দিন সন্ধ্যা লাগিতে না লাগিতে সমিতির মেয়েরা বাড়ি ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। আজ সেদিকেও বিশেষ কাহারও লক্ষ্য নাই। তাঁহাদের এত ঔৎসুক্যময় আলোচনার কারণটা যাহা ঘটিয়াছিল, সে কথাটা খুলিয়া বলিতে গেলে, তাহার পূর্ব-ইতিহাসও কিছু বলিতে হয়।

এখানকার দেওয়ানি কোর্টের বড় উকিল সুরসুন্দর, স্ত্রী বাঁচিয়া থাকিতে বরাবর উগ্র রকম সাহেবি ভাবাপন্ন ছিলেন এই লইয়া তাঁহার স্ত্রীর সহিত কত দিন হইয়াছে কত মনোমালিন্য, কত রাগারাগি। স্ত্রী ছিলেন খাঁটি পল্লীগ্রামের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরের মেয়ে। অবশেষে রফা হইয়াছিল। তিনি থাকিতেন আপন অন্তঃপুরে আপন নিয়ম আচারের গণ্ডির মধ্যে। আর সুরসুন্দব বহির্বাটিতে তাঁহার নিজস্ব বন্ধুবান্ধবমণ্ডলী থানা পার্টি ইত্যাদি লইয়া। কিন্তু অকস্মাৎ সেই শুদ্ধান্তঃপুরিকা শুচিবায়ুগ্রস্তা স্ত্রী যখন ইনফ্লুয়েঞ্জা হইতে ডবল নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইয়া সাত দিনের মধ্যে মারা গেলেন, তখন সকলেই আশা করিয়াছিল সুরসুন্দরেব অতি-আধুনিক চালচলনের নৌকাখানায অন্দর হইতে এতদিন যেটুকু বাধা-বাঁধনের নোঙর ছিল, এইবারে সেইটুকু নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। এখন হইতে তাঁর স্বাধীনতার আর আদি অন্ত থাকিবে না।

কিন্তু এই সুনিশ্চিত সম্ভাবনার পরিবর্তে সকলে অবাক হইয়া দেখিল, অন্তরের কোন নিগূঢ় প্রতিক্রিয়াবশত সুরসুন্দরের সাহেবি ধরন-ধারণের সমস্তই বদলাইয়া আসিতেছে। ঠিক যাহা আশা করা গিয়াছিল, তাহার উলটা দাঁড়াইয়াছে। সুরসুন্দর এখন প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করেন, শিখা রাখিয়াছেন। আতপ চাউলের অন্ন এবং নিরামিষ আহার করেন। সন্তানের মধ্যে তাঁহার দুইটি মাত্র মেয়ে। বড় মেয়ের মা বাঁচিয়া থাকিতেই বিবাহ দিয়াছিলেন কলিকাতার এক বিলাত ফেরত ব্যারিস্টারের সহিত। যে অবিবাহিতা বারো বছরের মেয়েটি এখন বাড়িতে আছে তাহার নাম মঞ্জরী।

সুরসুন্দর মঞ্জরীকে আরও কাছে টানিয়া লইলেন। নিজের সহিত আচারে বিচারে, আতপ চালের অন্ন গ্রহণে মেয়েকে করিতে চাহিলেন সাথী। কিন্তু গোল বাধাইল মঞ্জরী।

মা বাঁচিয়া থাকিতে সে মায়ের দিক ঘেঁষিত না,—বাবার কাছেই মানুষ হইয়াছে। তাহার সেই পূর্বতন কালের বাবা তাহাকে নিজে ইংরাজি শিখাইয়াছেন গান শিখিতে উৎসাহ দিয়াছেন। বারো বছরেও বেণী দুলাইয়া, ফ্রক পরিয়া সে স্কুলে গিয়াছে। আজই হঠাৎ তাহার বাবা তাহাকে স্কুল ছাড়াইয়া লইতে চান। হালফ্যাশানের ফ্রকের বদলে আসিয়াছে শাড়ি। মাসিকপত্র ও গল্পের বইয়ের পরিবর্তে শ্রীমদ্ভাগবত, চণ্ডীর বাংলা অনুবাদ বাড়িতে আসিতেছে।

মঞ্জরী বিদ্রোহ করিল। বেণী দুলাইয়া কহিল, "বারে, আমি বুঝি এখন থেকেই স্কুলে নাম কাটাব। এই সেদিনও হেড মিস্ট্রেস আমাকে বলছিলেন, মঞ্জরী তোমার এতো বুদ্ধি, ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ তুমি নিশ্চয়ই পাবে। সে তো এখনও তিন বছর, বাঃ রে, এরই মধ্যে বুঝি.. না না...নাম আমি কিছুতেই কাটাব না..."

সুরসুন্দর স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন, "মঞ্জরি! আমার শোয়ার ঘরে তোমার মায়ের বড় অয়েল পেন্টিং আছে, সেইখানে খানিকক্ষণ চুপ করে বসো গে' আপনি মন স্থির হবে।"

মঞ্জরী শয়নঘরে যাইবার পরিবর্তে ড্রেসিং আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া মাথায় পরিপাটি করিয়া ফিতা দিয়া স্কুলের বাসে চড়িল। কিন্তু ক্রমশ এত শাসন বাঁধনের মধ্যে থাকা তাহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইল। তাহার বড় দিদি কলিকাতা হইতে একদিন তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। কেবল চিঠিতে নিমন্ত্রণ নয়, দিন কয়েক পরে জামাইবাবু নিজে তাহাকে লইতে আসিলেন।

বাবার পুরোপুরি সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই মঞ্জরী তাহার জামাইবাবুর সহিত কলিকাতাগামী এক্সপ্রেসের একখানা সেকেন্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টে উঠিয়া পড়িল।

ইহার পর হইতে সুরসুন্দর তাঁহার শূন্য গৃহে কোর্টে যাওয়া, মক্কেলের কাগজপত্র দেখা এবং জপ তপ আহ্নিক লইয়া নিমগ্ন রহিলেন।

মঞ্জরী কলিকাতার ডায়োসেসন্ স্কুলে ভর্তি হইল। তাহার পরে সে ম্যাট্রিক পাশ করিল, আই-এ পড়িতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু এই দীর্ঘ কালের মধ্যে একবারও দিদির বাড়ি ছাড়িয়া বাবার কাছে গেল না। দিদিরও ছিল না ছেলেপুলে' তিনি তাঁহার গৃহসংসারের কেন্দ্রটিতে মঞ্জরীকে প্রতিষ্ঠা করিলেন। মঞ্জরীর কৌতুক হাস্যে, তাহার দ্রুতধাবনে, তাহার সঙ্গীতে সে বাড়ি মুখরিত হইয়া থাকিত।

এত দিন অবধি একরকম কাটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু মঞ্জরীর বয়স যখন সতের বৎসর, দিদি ও জামাইবাবুর সহিত শিমুলতলায় বেড়াইতে গিয়া একদিন প্রভাতবেলায় একজনের সহিত দেখা হইয়া গেল। তিনি বাড়িওয়ালা নরেশবাবু। বাড়িওয়ালা বলিতেই যে চিত্র চোখের উপর ভাসিয়া উঠে, নরেশের সহিত তাহার কোনখানে মিল নাই। তাহার বয়স বছর ছাব্বিশ সাতাশ। পায়ে কটকি কাজ-করা শুঁড়তোলা নাগরা জুতা, গায়ে আলোয়ান এবং চোখে চশমা। সে বাড়ি ভাড়ার টাকার জন্য তাগাদা করিতে আসে নাই,

আসিয়াছিল মঞ্জরীর জামাইবাবু সীতেশবাবুদের কোন প্রকার অসুবিধা হইতেছে কি না, জানিতে। হাতে তাহার ছিল একটি গোলাপ ফুলের তোড়া। শিমুলতলায় নরেশবাবুদের যত বাড়ি আছে সে সমস্তই গোলাপ বাগানের সংলগ্ন।

দেখা করিতে আসিয়া সবচেয়ে প্রথমেই দেখা হইয়া গেল যাহার সঙ্গে;—নরেশ অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল এত দীর্ঘ দিন রাত্রি তাহাকে না দেখিয়া কাটিয়াছে কেমন করিয়া।

মঞ্জরী বাগানে বেড়াইতেছিল, বারান্দার সিঁড়িতে এক পা এবং ঘাসের উপর এক পা রাখিয়া প্রশ্ন করিল, "কাকে খুঁজছেন?...জামাইবাবু? ও, তিনি বুঝি এখনও ঘুম ভেঙ্গে ওঠেন নি। ততক্ষণ আপনি আমাদের বসবার ঘরটায় একটু বসতে পারেন।"

নরেশ নির্বিবাদে আসিয়া বসিল। হাতের তোড়াটা টেবিলের উপর রাখিল।

মঞ্জরী বলিল, "চমৎকার ফুল!"

তা, যত বড় এবং যত উচ্চ প্রেমের কাহিনিই হোক, প্রথম আলাপে কি কথা হইয়াছিল, তাহার পর্যালোচনা করিতে গেলে ইহার চেয়ে বেশি পুঁজিও বুঝি আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

কিন্তু প্রথম আলাপের বাঁধুনি যত সামান্য কথা দিয়াই হোক, তাহা ক্রমশ দ্রুতগতিতে এমন স্থানে আসিয়া পৌঁছিল যে, দু'জনেই অবাক হইয়া নিঃশব্দে নিজের অন্তস্তলের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, এ কে? ইহাকে কিছু দিন আগে তো চিনিতামও না। ইহারই মধ্যে এমন করিয়া এ জীবনের সহিত জড়াইয়া গেল কী করিয়া!

শিমুলতলায় নির্জন পার্বত্য প্রকৃতি, বনময় আবেষ্টন, ফাল্গুনের ঈষদুষ্ণ বাতাস, আকাশের ঘন নীল—এ সমস্তই একযোগে মঞ্জরী ও নরেশের চিত্তকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া তুলিতে লাগিল।

অবশেষে একদিন নরেশ বেড়াইতে বাহির হইয়া মঞ্জরীর জামাইবাবুর কাছে একটা কথা পাড়িল।

বাড়ি ফিরিয়া সীতেশ স্ত্রীকে কথাটা বলিল।

মঞ্জরীর দিদি উৎসাহিত হইয়া কহিলেন, 'বেশ তো, ভালোই তো। নরেশের মত এমন পাত্র সহজে চোখে পড়ে না। সে যদি নিজে থেকে মঞ্জরীকে বিয়ে করবার প্রস্তাব করে থাকে, সে তো ভাগ্যের কথা। বড়লোক, মাথার উপর তেমন অভিভাবকও কেউ নেই...' কিন্তু অতিমাত্রায় উৎসাহিত হইযা উঠিতে-উঠিতে হঠাৎ কি ভাবিয়া একটু চিন্তান্বিতা হইয়া মঞ্জরীর দিদি কহিলেন, "কিন্তু নরেশরা মৈত্র নয়? বারেন্দ্র শ্রেণী। আমরা তো রাঢ়ী। এ বিয়েতে বাবার মত হ'লে হয়।"

সীতেশ একটু গম্ভীর হইয়া কহিল, "অমন বিয়ে আজকাল হামেশাই হচ্ছে। এই তো আমার বন্ধুদের মধ্যে—"

বাধা দিয়া তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, "সে তো আমিও জানি। আমার বাবাও এককালে এই ধরণের বিবাহের পক্ষ নিয়ে সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করেছিলেন, কাগজে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। কিন্তু আজকালকার ধরন-ধারণ তো জান।"

সীতেশ বলিল, "তোমার বাবা যদি অত সেকেলে, তাহলে মঞ্জরীকে আমাদের কাছে এনে রেখে এমন ভাবে মানুষ করা আমাদের অন্যায় হয়েচে। তোমার বাবার আপত্তির ফলে নরেশের সঙ্গে যদি ওর বিয়ে না হয়, আর সে অসুখী হয় তবে—"

মঞ্জরীর দিদি মাথা নাড়িয়া, কর্ণভূষা দোলাইয়া কহিলেন,—"ইস তাই হতে দিলে তো।"

কার্যকালে ঠিক তাহাই হইল। মঞ্জরীর পিতা কিছুতেই রাজি হইতে চাহিলেন না প্রথমটায়। সীতেশের কলিকাতার বাড়িতেই বিবাহের সমস্ত উদ্‌যোগ আয়োজন হইতে লাগিল।

মঞ্জরী আনন্দ এবং বিষাদের মধ্যবর্তী অবস্থায় দুলিতে লাগিল। আনন্দ যে জন্য তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আর ক্ষণে ক্ষণে বিষণ্ণ হইয়া যাইতে লাগিল এই মনে করিয়া যে তাহার মা নাই, বাবা আছেন কিন্তু তাহার জীবনের সর্বপ্রধান শুভদিনে তিনিও তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন।

কিন্তু বেশিক্ষণ মন ভার করিয়া বসিয়া থাকিবারও যো ছিল না। দিদি তাহাকে টানিয়া তুলিয়া ট্যাক্সিতে পুরিয়া নিউমার্কেট, চাঁদনি, এমনতরো হাজারটা দোকানে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছিলেন।

সেদিনও সন্ধ্যার সময় এমনি সমস্তদিনব্যাপী ঘোরাঘুরি ও পরিশ্রমের পর মঞ্জরী শ্রান্ত হইয়া তাহার বসিবার ঘরে আসিয়া বসিয়াছে, মাথার উপর পাখা ঘুরিতেছে, এমন সময় নিচের গাড়িবাবান্দায় একটা পরিচিত স্বর শোনা গেল।

মঞ্জরী চমকিয়া উঠিল।

এ যে তাহার বাবার গলার আওয়াজ। হয় তো ভুল হইয়াছে মনে করিয়া সে তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া নিচে নামিবার উপক্রম করিল। কিন্তু পরক্ষণেই সুরসুন্দর ঘরে ঢুকিলেন। মঞ্জরী অনেক দিন তাহাকে দেখে নাই। এখন চাহিয়া দেখিল তাঁহার শীর্ণ মুখে বেদনার ছায়া। তাঁহার পায়ের কাছে প্রণতা মঞ্জরীকে তিনি যখন ধরিয়া তুলিলেন, তখন তাঁহার চোখে জলের আভাস।

দুয়ারটা ভেজাইয়া দিয়া সুরসুন্দর বলিলেন, "মা বোসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

দু'জনেই কিছু কাল নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। তাহার পর সুরসুন্দর বলিলেন, "আমার উপর রাগ করেচ মা? কিন্তু আমার কথা সমস্ত না শুনে আমার উপর রাগ করতে পাবে না তা বলে দিচ্ছি। তোমার মা মারা যাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত বুঝতে পারি নি তাঁকে কত ভালোবাসতুম। যখন বুঝতে পারলুম, তখন বোঝাটা একতরফাই হোল। আর কাউকে বোঝাতে পারলুম না। তিনি তখন সমস্ত বোঝা না বোঝার বাইরে চলে গেছেন। কিন্তু আমার কেমন মনে হোল আমার জীবনে সমস্ত খুঁটিনাটি তিনি যেন দূর থেকে দেখচেন। এর পর থেকে তাঁর অপ্রিয় কাজ কিছুতেই করতে পারতুম না। বন্ধুরা অনেক ঠাট্টা করেচে আমার জপ তপ আহ্নিকের কৃচ্ছ্রসাধনা দেখে। আত্মীয়েরা করেছে বিদ্রূপ, পরিচিত অনেক

বলেচে, খামখেয়ালি। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও থামতে পারতুম না। খুব যে ভালো লাগত তা'ও নয়। কিন্তু কে যেন আমাকে দিয়ে জোর করে করিয়ে নিত।"

মঞ্জরী মুখ তুলিয়া চাহিল,—এতক্ষণ সে মাথা নিচু করিয়া ছিল। চাহিয়া দেখিল, যে বাবার সহিত এত দিন ভালো করিয়া একটাও কথা বলে নাই,—অনুদার, সঙ্কীর্ণ, খামখেয়ালি বলিয়া যৎপরোনাস্তি অবজ্ঞা করিয়াছে,—আজ তাঁহারই সজল চক্ষুপ্রান্তে এবং সমস্ত মুখশ্রীতে এমন একটি দীপ্যমান আভা যে, আপনা হতেই মাথা নত হইয়া আসে।

সুরসুন্দর কিছু কাল চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু মা, একটা ভুল আমি বরাবরই করে এসেচি। তোমার মা প্রাণহীন যে আচার-নিয়মগুলোকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে থাকতেন, সেইগুলোকে তাঁর জীবিতকালে যারপরনাই ঠাট্টা করে তাঁকে যে মনোবেদনা দিয়েচি, তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে সেই সব আচার নিজে পালন করে মনে করতুম তাঁকে খুব সন্তুষ্ট করা হয়েচে। কিন্তু তাঁর প্রাণবান স্নেহের ধনগুলিকে তেমন করে মনের সঙ্গে মেনে নিই নি কেন? এই প্রশ্ন আজ ক'দিন ধরেই আমার মনে জাগছে। মঞ্জরী, তুমি যাকে ভালোবেসেচ, তার ঘর আলো করে থাক। আমি কোনো বাধা দেব না।"

"বাবা, তা'হলে তুমিই আমাকে সম্প্রদান করবে, বলো?"

"আচ্ছা, তা'ও করব মা।"

... ... ...

তাহার পরে মঞ্জরীর বিবাহ হইয়া গেলে, স্বামীর সহিত শিমুলতলায় চলিয়া যাইবার আগে সুরসুন্দর কিছুদিনের জন্য তাহাদের দুইজনকে নিজের কাছে লইয়া গেলেন। অনেক দিন পরে নির্জন নিরানন্দ তাঁহার বাড়ি তরুণ-তরুণীর আনন্দ কলোচ্ছ্বাসে ভরিয়া উঠিল। বাড়ির মোটরটা এখন ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে যত্র তত্র ঘুরিতে লাগিল। গম্য স্থান যে কোথায়, সে বিষয়ে ঠিক ঠিকানা রহিল না। এই নিরুদ্দেশ যাত্রার পার্টিতে যে দুইটিমাত্র আরোহী, তাহাদেরও মনের দিশা পাওয়া ভার। স্নানের জল বারংবার ঠাণ্ডা হইয়া যায়, তবুও পুরাতন ভৃত্য গোকুল দিদিমণি ও জামাইবাবুর কোন হদিস পায় না। ধূলি উড়াইয়া ঊনপঞ্চাশ বায়ুর বেগে যখন যে মোটরখানা গেটের সামনে আসিয়া দাঁড়াইবে, আর কখনই বা দরজাটা খুলিয়া মঞ্জরী সহাস্য মুখে নামিয়া আসিতে আসিতে বলিবে, "তাই তো গোকুল, তুমি সেই থেকে আমাদের জন্যে ব'সে রয়েচ? এ কিন্তু তোমার ভারি অন্যায়!"—গোকুল তাহা আজও ঠাহর করিতে পারে নাই।

কিন্তু সুরসুন্দরের বহু কাল হইতে নির্জন বাড়ি ঠিক যে পরিমাণে আনন্দ-মুখর হইয়া উঠিল,—শহরের সর্বত্র সেই অনুপাতে একটা নিন্দার গুঞ্জন উঠিল। সুরসুন্দরের বারলাইব্রেরির বন্ধুরা কহিলেন, "তুমি শেষে এত দুর্বলচিত্ত হলে কেমন করে হে? একফোঁটা একরত্তি মেয়ে, সেই শেষে ভাসিয়ে দিলে তোমার এতদিনের নিষ্ঠা, এতদিনের মতামত, সংকল্প!"

আজ মহিলা-সমিতিতেও সেই গুঞ্জনেরই আভাস শোনা যাইতেছিল। বিশেষ করিয়া সেই দু'জনের নির্লজ্জ যৌবনের বেহিসেবি আনন্দের তরঙ্গ এ কয় দিন ধরিয়া ইঁহারা

সর্বত্রই কোনখানে না কোনখানে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কখনও তাঁহাদেরই কাহারো বাড়ির সুমুখ দিয়া মিনার্ভা কারটা হুস্ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। পিছন দিকের আসন শূন্য; আর সামনের দিকের আসনে যে দুইজনে বসিয়া আছে, তাহাদের উদ্ভাসিত মুখের ছবিটা ক্ষণকালের জন্য তাঁহাদের নয়ন মনকে চকিত, উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিয়াছে।

কখনো কোম্পানির বাগানে, কোনদিন টিলাকুঠিতে, কোনদিন জলের কলে এই দুইটি প্রাণীকে কেহ না কেহ নিত্যই কোন স্থানে না কোন স্থানে দেখিয়াছেন।

সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাবের খাতাটা মুড়িয়া রাখিয়া একটু টিপিয়া হাসিয়া সরমা কহিল, "কাল আমরা মোটরে করে সুলতানগঞ্জের ওদিকে গিয়েছিলুম, সেখানেও একটা টিলার উপর ব'সে সেই দুই মূর্তি।"

সম্পাদিকার বয়স অনেকটা হইয়াছে,—রাশভারি মানুষ! তিনি গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "মঞ্জরীব বাপকে আমরা বরাবর ধীর স্থির বিবেচক বলে জানতুম। তিনি যে হঠাৎ এমন অসামাজিক একটা বিবাহ দেবেন, রাঢী বারেন্দ্র সমাজে একাকার হয়ে চলৎ হয়ে যাবার পক্ষে সাহায্য করবেন, তা কে মনে করেছিল?"

ওপাশ হইতে যোগেশবাবুর স্ত্রী কল্যাণী কহিলেন, "ঠিক বলেচেন মাসিমা, এমনটা যে হবে তা কে ভাবতে পেরেছিল? কিন্তু তাও বলি, আজকালকার ছেলে মেয়েদের সুশিক্ষা আদৌ হচ্ছে না। মা-বাপেব কথামত আজকাল কে চলে বলুন? ধরুন সুরসুন্দর বাবু সম্মত না হয়েই বা কি করবেন? তাহলেও কি মঞ্জরী শুনত? যেমন করে হোক জোর করে, পালিয়ে যেয়ে লভ্ ম্যারেজ ও করতই। মাঝখান থেকে হয় তো লোক-জানাজানি গোলমাল হোত। সুরসুন্দর বাবুকে বোধ হয় অনেকটা দায়ে পড়েই এমনধারা করতে হয়েচে।"

"তা বই কি।"

ইত্যাকার নানা আলোচনা এবং মন্তব্যের মাঝে সেদিনকার মত সভা ভাঙ্গিয়া এইবারে একে একে সকলে উঠিলেন

সম্পাদিকার মোটর গেটের কাছে দাঁড়াইয়া অধীর ভাবে ঘন ঘন হর্ন দিতেছিল। তিনিও গাত্রোত্থান করিলেন।

তাঁহার পুত্র সুবিমল ড্রাইভারের পরিবর্তে সেদিন নিজেই মোটর চালাইয়া আনিয়াছিল। তিনি গাড়িতে উঠিবামাত্র সে কহিল, "মা, সোজা বাড়ি যাব না। রেস কোর্স দিয়ে একটু ঘুরে চল।"

"চল।'

তখন শীতের শুক্ল পক্ষের জ্যোৎস্না শুভ্র উত্তরীয়ের মত পৃথিবীর সর্বত্র একটি সূক্ষ্ম, স্বচ্ছ আবরণ বিস্তার করিয়াছিল। আকাশের তারা পাণ্ডুর। সুমিত্রা দেবী এইবারে ফার্‌কোটটা গায়ে দিলেন এবং শালের ভাঁজ খুলিয়া পায়ের উপর পর্যন্ত টানিয়া দিলেন।

রেসকোর্সের ছায়াময় পথে আসিয়া গাড়িটা দাঁড়াইল। সুমিত্রা নামিলেন। সুবিমল মোটর লইয়া চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল।

সুমিত্রা ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ ছায়াঙ্কিত জ্যোৎস্নায় একটা ঘন পল্লববিশিষ্ট অশ্বত্থ গাছের তলায় আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। অদূরে পাথরের উপর দুইজনে বসিয়া। তাহারা পরস্পরের মাঝে এত আবিষ্ট, এত তন্ময় যে তাহাদের সামনে দিয়া কেহ চলিয়া গেলেও হয়ত তাহারা টের পাইবে না।

মেয়েটির পিছনের দিকের চুল বাঁধিবার ধরন ও কাপড পরিবার ভঙ্গি হইতে তাহাকে মঞ্জরীর মতই মনে হইল। সুমিত্রা তাহাকে অবশ্য অনেকদিন ভালো করিয়া দেখেন নাই। এই সেদিন রায়-সাহেবের পার্টিতে মিনিট কয়েকের জন্য একবার দেখিয়াছিলেন, কিন্তু সে অত্যন্ত অল্পক্ষণের জন্য। তিনি আসিয়া পৌঁছিবার পরেই সে চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ভালো করিয়া দেখুন বা নাই দেখুন, সেই অনতিস্ফুট চাঁদের আলোয় যে ছেলেটি ও মেয়েটি পরস্পরের মাঝে এমন নিবিড় অতলস্পর্শী তন্ময়তায় ডুবিয়া ছিল,—সেই দু'জন কে? তাহাদেরই নিন্দার খ্যাতিতে আজিকার সভা এতক্ষণ মুখর হইয়াছিল।

কিন্তু সভা ভাঙ্গিবার পরে এই নির্জন প্রান্তরে, জ্যোৎস্না-প্লাবিত প্রকৃতির মাঝে এই নিন্দিত দুইটি নর-নারীর নিকটে দাঁড়াইয়া সুমিত্রার মনের গতি হঠাৎ অন্যদিকে বহিতে লাগিল। সম্পাদিকার উপযুক্ত গাম্ভীর্য এবং বিবেচনা-শক্তি তিনি হাতের কাছে খুঁজিয়া পাইলেন না। একটু দূরে সরিয়া আসিয়া একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া দাঁড়াইতেই আজ অনেকদিন পরে অনেক বিস্মৃত কথা তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল।

অনেক কাল আগে শীতপাণ্ডুর এমনি এক শুক্ল জ্যোৎস্না রাত্রিতে একজনের কাছে নির্জনে বলিয়াছিলেন,..."সেই ছোট থেকে নিজের মনের মত করে গড়ে তুলে শেষকালে আমাকে নিলে না।"...

তাহার উত্তরে আর একজন বহুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া বলিয়াছিল, "এ কথার উত্তর যে কী দেব আমি তা জানিনে সুমিত্রা। কিন্তু আকাশের তারার নিচে আজ এই কথা যে আমাকে বললে, সংসারে আর সমস্ত কথা আর সবাই ভুলবে, কিন্তু এ কথা কখনো ভুলতে পারব না।"

"কিন্তু তাতে আমার দুঃখ পড়বে না চাপা।"

"সুমিত্রা, তুমি তো সবই জান। বাপ মায়ের একেবারে মত নেই।"

"—থাক, আর বলতে হবে না।"—

বহুদূর অতীতের যবনিকাব অন্তরাল ছিন্ন করিয়া কত টুকরো টুকরো কথা, কত স্মৃতি, কত কাহিনি আর ঠিক সেদিনের মত করিয়া তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। যেদিনে সুমিত্রা আজিকার মত স্থূলাঙ্গী সুখসৌভাগ্যগর্বিতা বিখ্যাত ব্যারিস্টার-পত্নী ছিলেন না, যেদিনে তন্বী কিশোরী এমনি প্রথম ফাল্গুনের ঈষৎ শীতজড়িত জ্যোৎস্নাময় সন্ধ্যার দিকে চাহিয়া বিমনা হইয়া যাইতেন।

কিন্তু বেশিক্ষণ এমন করিয়া স্মৃতির সমুদ্র আমন্থন করিবার সময় হইল না। অদূরে মোটরের তীব্র হেড্‌লাইট্ দেখা দিল। সুবিমল তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া নামিয়া আসিয়া কহিল, "খোলা মাঠে যত খুশি স্পিড্ দাও কিছু পরোয়া নেই। মা চল।"

সুমিত্রা উঠিয়া আসিয়া মোটরে বসিলেন। মোটরের সেই সুখস্পর্শ, আশেপাশে সিল্কের কুশন, পায়ের নিচে বহুমূল্য কার্পেট, আরাম করিয়া হেলান দিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিতে থাকিতেই সে সমস্ত এলোমেলো চিন্তা সুমিত্রার মন হইতে নিঃশেষে মুছিয়া গেল। বরঞ্চ মনে পড়িয়া গেল আগামী শনিবারে কমিশনারের স্ত্রীকে ফেয়ারওয়েল দেওয়া হইবে বলিয়া যে সমস্ত অভিনয়, সঙ্গীত, পার্টি ইত্যাদির বন্দোবস্ত হইয়াছে, সে বিষয়ে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতে মিসেস রায় ও মিসেস চ্যাটার্জির আজ সন্ধ্যায় তাঁহার ওখানে আসিবার কথা আছে। কে জানে হয় ত তাঁহারা আসিয়া এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আছেন।

তাঁহার অনুমানই ঠিক। মোটর হইতে নামিয়া তিনি দেখিলেন একখানা ব্রুহাম ও আর একখানা মোটর তাঁহার গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে। মিসেস রায় ও চাটার্জি তো আসিয়াইছেন, আর তাঁহারা ছাড়াও তাঁহার স্বামীর জুনিয়রি করেন, মিস্টার মিত্রের স্ত্রী আসিয়াছেন।

ড্রইংরুমে ঢুকিতে ঢুকিতে তিনি তাঁহার বড় বধূকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, "বেয়ারাকে বলে দাও তো বৌমা, কাপ তিন চার চা এখানে দিয়ে যাবে।"

রেসকোর্সের মাঠে দাঁড়াইয়া সুমিত্রা যখন স্মৃতিভারাক্রান্ত চিত্তে অতীতের মাঝে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, তাহারই হয় তো ঠিক মিনিট কুড়ি পরে ড্রইংরুমের সোফায় বসিয়া চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে তিনি জুনিয়ারের স্ত্রীর কথার উত্তরে বলিতেছিলেন, "ঠিকই বলেচেন, মঞ্জরীর বেহায়াপনা আমাদেব মেয়েদের আদর্শ হয়ে না দাঁড়ায়। ওর দৃষ্টান্ত চোখের সুমুখ থেকে যত সরে যায় ততই মঙ্গল। কাল সন্ধ্যের এক্সপ্রেসে ওরা শিমুলতলা যাচ্ছে, ভালোই।"

*বৈশাখ, ১৩৪১*

# রাঙাদিদি

## তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

একে পটুয়ার মেয়ে—তার উপর বৃদ্ধের তরুণী-ভার্যা। ঠিক যেন জীর্ণ প্রাচীন সহকার-বিহারিণী আলোকলতা। জীর্ণ সহকারকে আপনার দেহজালের জটিল জালে আচ্ছন্ন করিয়া যেমন আলোকলতার অগ্রভাগগুলি সাপিনীর মত আশপাশের সরস সহকারগুলির দিকে উদ্যত হইয়া নাচে, বৃদ্ধ গণপতি পটুয়ার তরুণীভার্যা সরস্বতীও ঠিক তেমনি করিয়া হেলিয়া দুলিয়া যেন নাচিয়া ফেরে।

গণপতি পটুয়া এ অঞ্চলের পটুয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে বিখ্যাত গুণী। তাহার হাতের আঁকা পট সাহেব-সুবায় কিনিয়া লইয়া যায়;—এমন নিখুঁত পটল-চেরা চোখ, ঠিক তিলফুলটির মত নাক, এমন মুঠিতে-ধরা কোমর, এমন সুডৌল কলসির মত বুক—এ আর কাহারও তুলিতে ফুটিয়া ওঠে না। গণপতি শুধু তুলির টানে পট আঁকিতে বা হাতের কৌশল পুতুল প্রতিমা গড়িতেই ওস্তাদ নয়, তাহার রচনা করা পটমাহাত্ম্যগান, দেবদেবীর নানা লীলার গানও বিখ্যাত। তাহার গান নাকি গেজেটে ছাপা হইয়াছে। 'দুর্গাঠাকরুণের শাঁখা পরা' 'শিবের মাছধরা' 'শিবের চাষ' 'শ্রীকৃষ্ণের মৃত্তিকাভক্ষণ' প্রভৃতি অনেক পালাগানই সে রচনা করিয়াছে। এ অঞ্চলের পটুয়া-সম্প্রদায়ের মধ্যে ধনে-মানে-গুণে গণপতি শ্রেষ্ঠ লোক। বৃদ্ধ বয়সে সেই লোক, সরস্বতী পটুয়ানিকে দেখিয়া দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়া শেষ পর্যন্ত তাহাকে বিবাহ করিয়া বসিল। সরস্বতীর বাপ-মা গণপতির টাকা দেখিয়া অমত করিল না, অনেকগুলি টাকা দিয়া বুড়া সরস্বতীকে ঘরে আনিয়া তুলিল। বুড়ার কয়জন সম্পর্কিত নাতি নিজেরা পয়সা খরচ করিয়া মুচিদের ডাকিয়া বাজনা বাজাইয়া দিল—ঢাক ও শিঙা! বুড়া গণপতি কিন্তু অদ্ভুত লোক, সে ইহাতে রাগ করিল না, নাতিদের আদর করিয়া বসাইয়া পেটপুরিয়া মিষ্টি খাওয়াইয়া ছাড়িল।

কথাতেই আছে—"পটোনি আর নটোনি চাল-চলনে এক ছন্দ, কে ভাল তার—কে মন্দ!" 'পটোনি' অর্থাৎ পটুয়ার মেয়ে, আর 'নটোনি' অর্থে নটিনী এ দুই-ই নাকি এক; চলনে বলনে, রীতে করণে, ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে, হাসিতে-কাশিতে—ইহাদের পার্থক্য বিশেষ নাই। যেটুকু আছে তাহাকে এপিঠ ওপিঠ বলিলেই চলে—নকশিপাড় শাড়ির সদর মফস্বলেব মত। সরস্বতীও পটুয়ার মেয়ে, নববধূ হইয়াও সে মুখ বাঁকাইয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া মুখ ফিরাইল। তাহার ম্যাজেন্টার রঙমাখা ঠোঁটেব অন্তরাল হইতে মিশিদেওয়া দাঁতগুলি সেই যে কলঙ্করেখার মত আত্মপ্রকাশ করিল, সে আর কোনদিন আত্মগোপন করিল না। সকলের উপর আশ্চর্য—তাহার ওই হাস্যকলঙ্কচিহ্নিত মুখের উপর কখনও দুখের কৃষ্ণপক্ষ নামিয়া আসে না; চকিত অবগুণ্ঠনের লঘু মেঘেও কখনও সে মুখ ক্ষণিকের জন্য আবৃত হয় না।

বেলা দশটা বাজিতেই রাঁধা-বাড়া শেষ করিয়া পটুয়াদের মেয়েরা ব্যবসায়ে বাহির হয়। কাচের চুড়ি, মাটির পুতুল, পুঁতির মালা, কারঘুনসি, কাচপোকা-সোনাপোকা ডালায় সাজাইয়া তাহারা গ্রামে গ্রামান্তরে ফিরি করিয়া বেচিতে যায়। রঙিন ছিটের খাটো কাঁচুলিধরণের জামাব উপর মুসলমানি ঢঙে ফেরতা দিয়া কাপড় পরিয়া মাথায় ডালাটি তুলিয়া লয়। অভ্যাস এমনই হইয়া গেছে যে, ডালাটা ধরিবার পর্যন্ত প্রয়োজন হয় না, দু'খানি হাতই দিব্য দুলাইয়া হেলিয়া দুলিয়া অতি সঙ্কীর্ণ পথেও তাহারা চলিয়া যায়। গ্রামে প্রবেশ করিয়া বেশ এক বিচিত্র সুরে হাঁকে—চাই রে-শমি চুড়ি—! সোহা—গি—নী। নী—ল্ মা-নিক। গুল্ বা-হা-র!

চুড়িগুলির রঙের পার্থক্য অনুযায়ী বিভিন্ন নাম-করণ উহারা নিজেরাই করিয়া থাকে। হলুদ রঙের চুড়িগুলির নাম সোহাগিনী, গাঢ় সবুজগুলিকে বলে নীলমানিক, গুল্‌বাহার চুড়ির রঙ গোলাপি। ঘোর লালের নামের বাহার সব চেয়ে বেশি—'মন্‌চোরা'!

পুতুলেরও নাম আছে—'কেশবতী', 'চম্পাবতী' 'কালিন্দী'। কেশবতীর মাথায় বেঢক রকমের খোঁপা, চম্পাবতীর গায়ের রঙ হলুদ, নীলরঙের পুতুলের নাম কালিন্দী। মাথায় হাঁড়ি 'গোয়ালিনী, হাতে সাজি 'মালিনী', এ তো পুরানো নাম। এ ছাড়া পক্ষীরাজ-ঘোড়া, বাঘ, সিংহ, লক্ষ্মীপেঁচা এসবও আছে। সরস্বতী নিজেই পুতুল গড়ে; গণপতি তাহাকে সখ করিয়া একাজ শিখাইয়াছে।

ফিরি করিয়া ব্যবসা করিতে গেলে, মুখও দেখাইতে হয়, মুখরাও হইতে হয়; কিন্তু সরস্বতীব সবই স্বতন্ত্র; মুখের সঙ্গে মাথায় কোঁকড়া চুলেব খোঁপাটাও সে বাহির করিয়া রাখে, মিশি-দেওয়া দাঁতের হাসি তো কলঙ্ক রেখার মত দেখাই যায় এবং সে কলঙ্করেখা শুধু রূপেই বিকাশমান নয়, রবেও প্রকাশমান। সে রূপ ও রবের স্পর্শে তাহার জাতি-সুলভ মুখরতা নটিনীর পায়ের নূপুরের মত উচ্ছল মাদকতাময় এবং নিঃসঙ্কোচ। হাটে সে লোককে ডাকিয়া জিনিস বিক্রি করে। মনিহারীর দোকানে যে যুবকটি সাবান কিনিতেছে তাহাকে ডাকিয়া সে হাসিয়া বলে—চুড়ি নিবে না—চুড়ি?

—চুড়ি! সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে—চুড়ি?

—হ্যাঁ চুড়ি। সোহাগিনী, নীলমানিক, গুলবাহাব মনচোরা! কি লিবে দেখ! সরস্বতীর মিশি দেওয়া দাঁত মৃদু হাসিতে ঈষৎ বাহির হইয়া কাল বিদ্যুতের মত ক্ষণে ক্ষণে ঝিলিক হানে, লোকটি চুপ করিয়া থাকে কিন্তু সরিয়া যাইতে পারে না। সরস্বতী বলে— বোস দেখ, চুড়ি দেখ; কেমন রঙ বল তোমার বউয়ের, আমি পছন্দ কবে দি দেখ। আমার মত গোবো রঙ?

লোকটা এবার মুচকি হাসিয়া বলে—না!

—তবে? কচি কলাপাতার মত শ্যামলা? না, আরও কালো? কালো জামের মত ঘোর কালো?

শেষ পর্যন্ত তাহাকে সে ঘোর লাল রঙের 'মনচোবা' রেশমি চুরি বিক্রি করিয়া ছাড়ে।

আরও একটি ব্যবসা আছে পটুয়ার মেয়েদের। ভদ্রগৃহস্থের বাড়িতে মধ্যে মধ্যে ডাক পড়ে, পুরানো কাপড়ে কাঁথা তৈয়ারি করিয়া তাহার উপর নকশা তুলিবার জন্য। ছোট-বড় তিন-চার রকমের সূচ হাতে করিয়া তাহারা গৃহস্থের বাড়িতে যায়, গৃহস্থ কাপড় দেয় কস্তা দেয়—তাহারা ক্ষিপ্র নিপুণ হাতে কাঁথা তৈয়ারি করিয়া তাহার উপর নকশা তোলে ঠিক যেন যন্ত্রের মত। নকশাগুলিও তাহাদের মুখস্ত। লতাপাতা, পাখি-ফুল, খেজুরছড়ি, বরফি কাটা, বৃন্দাবনি, জলতরঙ্গ প্রভৃতি ছক তাহারা চোখ বুজিয়া তুলিতে পারে। পাঁচ বছরের পটুয়ার মেয়ে মা-ঠাকুরমার কাছে উঠানে বসিয়া ধুলার উপর আঙুল দিয়া নকশা আঁকিয়া শেখে, মুখস্ত করে। গৃহস্থ বাড়ির বউ-ঝিয়েরা স্পর্শদোষ বাঁচাইয়া দূরে বসিয়া তাহাদের অবলীলায় চালিত সূচের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, গ্রাম গ্রামান্তরের দশের বাড়ির গল্প শোনে। মুখরা পটুয়ার মেয়ে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া সূচ চালাইতে চালাইতে বলিয়া যায় কোন্ গ্রামের কোন্ বাড়ির বউয়ের নতুন চুড়ি হইয়াছে, সে চুড়ির প্যাটার্ন কি; কাহার বাড়ির বউয়ের হাতের চুড়ি হঠাৎ অন্তর্হিত হইয়াছে। কোন্ বাড়ির গিন্নির কণ্ঠস্বর কুরুক্ষেত্রের কোন্ শঙ্খের মত; কোন্ বাড়ির বধূর কথাগুলির ধার শাঁখের করাতের মত, ভাল মন্দ দুই ধারাতেই না কাটিয়া ছাড়ে না; ইত্যাদি ইত্যাদি।

সরস্বতী ইহার উপরে বউদিদি দিদিমণিদের লইয়া ঠাট্টা তামাসা করে; মুচকি মুচকি হাসিয়া ছড়া কাটে, কত নূতন লীলা রঙ্গ শিখাইয়া যায়। তাহারা তাহাকে গণপতি সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিলেই—বাস্ আর রক্ষা থাকে না। মুখে কাপড় দিয়া লজ্জার ভাণ করিয়া সেই যে সে হাসিতে আরম্ভ করে সে হাসি আর তাহার শেষ হয় না। অবশেষে সে তাহাব সূচগুলি গুটাইয়া লইয়া বলে—আজ আর হবে না দিদিঠাকরুন, আজ চললাম, কাল আসব। দুশমনের হাড়ের দাঁত ও আর আজ বারণ শুনবে নাই।

সরস্বতী চলিয়া গেলে, মেয়েরা কঠোর সংযমে শীলতায় উগ্র হইয়া উঠে, সকলেই একবাক্যে বলে—সরস্বতীর মরণই ভাল। বৃদ্ধ হইলে কি হয় সে তো স্বামী, তাহার নামে ওই হাসি।

সরস্বতীর হাসি কিন্তু তখনও থামে না, সে হয়তো পথ চলিতে চলিতে তখনও আপন মনে হাসে, অথবা বাড়ি ফিরিয়া চিত্রাঙ্কন-রত গণপতিকে হাসিতে-হাসিতেই বলে—বাবুদের মেয়েরা কি বলছিল জান?

পট হইতে তুলি তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া গণপতি মৃদু হাসিয়া প্রশ্ন করে —কি বলছিল?

মুখে কাপড় দিয়া তাহারই দিকে আঙুল দেখাইয়া সরস্বতী বলে—তোমার কথা শুধাচ্ছিল।

হাতের তুলিটা এবার নামাইয়া রাখিয়া সকৌতুকে গণপতি প্রশ্ন করিল—কি শুধাচ্ছিল?

—বলছিল—। খুব গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিয়া সরস্বতী আরম্ভ করিল—বলছিল—। কিন্তু আর সে বলিতে পারিল না।

কি বলছিল?

একখানা কাচের বাসন যেন অকস্মাৎ সঙ্গীতময় ঝনৎকারে ভাঙিয়া পড়িল—খিল-খিল করিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িয়া সরস্বতী বলিল—শুধাচ্ছিল, বুড়াকে বিয়ে করলি কেনে?

কৌতুক হাস্যে গণপতির মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, সে বলিল—তু কি বল্লি?

—বললাম? বল্লাম—বুড়া হলে কি হয় গো ঠাকরুন, দাম যে বুড়াব লাখ টাকা। জান না, মরা হাতি লাখটাকা? তা—ই-তো মরা লয়, বুড়া। গণপতি মানে গণেশ—আর গণেশের যে শুঁড় আছে গো!

গণপতি হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল—বারবার ঘাড় নাড়িয়া তারিফ করিয়া বলিল- -বড়ই বলেছিস রে সরস্বতী—খুব বলেছিস তু। বুড়া হাতি! গণপতি হল গণেশের নাম! গণেশের মাথায় গজের মুণ্ড! বাঃ।

সরস্বতীও পা ছড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে আরম্ভ করিল।

গণপতি হঠাৎ তুলিকা লইয়া সরস্বতীর ছড়ানো পা দুইখানির একখানি বাঁ হাতে ধরিয়া বলিল—তুলি দিয়া তোর পায়ে আলতা পরায়ে দি, দেখ্!

ক্ষণিকের জন্য সরস্বতীর ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল; ক্ষণপরেই সে মিশি দেওয়া দাঁতের ঝিলিক হানিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল, বলিল—ইয়ারা এলে বলে দিব কিন্তু!

গণপতি কোন উত্তরই দিল না। ইহারা অর্থে পাড়ার নাতি-সম্পর্কিত তরুণের দল। নিত্য সন্ধ্যায় তাহারা এখানে নামাজ পড়িতে আসে, নামাজ সারিয়া প্রহরখানেক রাত্রি পর্যন্ত তাহারা আড্ডা জমাইয়া হৈ-চৈ করিয়া কাটায়। নাতিরা সকলে একদিক হইয়া সরস্বতীকে বঙ্গরহস্যে বিপর্যস্ত করিতে চেষ্টা করে—সরস্বতী একা তাহাদের বাণ কাটিয়া তাহাদিগকে বাণবিদ্ধ করিতে চেষ্টা করে। বুড়া গণপতি বসিযা মৃদু মৃদু হাসে—প্রয়োজন হইলে মধ্যস্থতা করিয়া বিচাব করিয়া দেয়।

পটুযারা ধর্মে ইসলামীয়, কিন্তু আচাবে ব্যবহারে নামে পুরা হিন্দু। তাহারা নামাজও পড়ে, আবার হিন্দুর ব্রত আচারও পালন করে, হিন্দুর অখাদ্যও খায় না। দেবদেবীর প্রতিমা গড়ে, পটের উপর হিন্দুর পুরাণকথাব ছবি আঁকে; সেই পট দেখাইয়া লীলা গান করিয়া ভিক্ষা করে। জাতি জিজ্ঞাসা করিলে বলে—পটুয়া, চিত্রকর। ধর্ম জিজ্ঞাসা করিলে বলে, ইসলাম। চাষবাসের বালাই নাই; ভিটা, চলিবার পথ, গৃহস্থের দুয়ার—এ তিন ছাড়া মাটির সহিত সম্বন্ধ নাই। সেই বলিয়াই সবস্বতীব মত মেয়েরও তাহাদের সমাজে সাজা নাই, কিন্তু তাহাদেব রসনা তো মানুষেরই রসনা—সুতরাং নিন্দা না থাকিয়া পারে না; সরস্বতীর নিন্দায় পটুয়া-পাড়া ভরিয়া উঠিল। কিন্তু দিগন্তেরও ওপাবের বিদ্যুৎ চমকের মত কথাটার চকিত আভাস পাইলেও প্রাণঘাতী বিদ্যুৎ-শিখার সংস্পর্শ বা মেঘ-গর্জনের ধ্বনি সরস্বতী ও গণপতির প্রত্যক্ষ গোচরে কোনও দিন আসে নাই। সে বিদ্যুৎশিখার উত্তাপ, আভা এবং গর্জন প্রথম প্রত্যক্ষ কবিল সরস্বতীই। হাটের পথে সরস্বতীর সঙ্গিনী ছিল সে-দিন তাহারই সমবয়সী একটি মেয়ে, তাহার বাড়িব সান্ধ্যমজলিশের নিয়মিত সভ্য এক নাতিব পত্নী। পথে নির্জন মাঠে ছুতা করিয়া ঝগড়া বাধাইয়া মেয়েটি বিদ্যুৎশিখার মতই জ্বলিয়া উঠিল, তীক্ষ্ণ চিৎকাবে সরস্বতীকে বলিয়া দিল—কালামুখী, কলঙ্কিনী, গলায় দড়ি দি গা তুই, গলায় দড়ি দি গা!

সরস্বতী হাসিয়া আকুল হইল, বলিল, গলায় দড়ি দিব কি বুন, শাওড়া গাছের ডালে দড়ি বাঁধতে গিয়া ভূতের ভয় লাগে; মনে পড়ে যায় তোর বরকে!

সঙ্গিনী মেয়েটা একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল. সে সরস্বতীর সঙ্গ ছাড়িয়া বিপথে ভিন্ন গ্রামের দিকে পথ ধরিল।

বাড়ি ফিরিয়া মুখে কাপড় দিয়া হেলিয়া দুলিয়া হাসিয়া সরস্বতী গণপতিকে বলিল—কি এনেছি দেখ!

গণপতি কৃষ্ণলীলাব পট আঁকিতেছিল, সে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—কি?

—এই দেখ! বলিয়া সে ডালা খুলিয়া দেখাইল।

—আরে বাপ! এত ধানি-লঙ্কা কি হবে রে?

—পাড়াতে বিলাব।

—কেনে?

সরস্বতী হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িল। তারপর কোনরূপে আত্মসম্বরণ করিয়া সকল কথা বলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—বলব, আমার হাতের গাছের লঙ্কা। লঙ্কা খেলে টিয়া পাখিতে খুব ভাল বুলি বলে। তোমরা খেয়ে দেখো. তোমরাও বুলি বলবে ভাল!

গণপতি মুগ্ধ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, ঠোঁটে তাহার কৌতুক ভরা মৃদু হাসি। সরস্বতী বলিল—কি? কথা বলছ না যে? 'বুড়া হাতির মাথায় দিলম ডাঙ্গসেবই বাড়ি'—না কি গো? বলিয়া সে আবার মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে আবম্ভ করিল।

গণপতি বলিল—তার চেয়ে চিটে কদমা দিলি না কেনে 'দুষ্টু সবস্বতী'? লোকের দাঁতে-দাঁতে লেগে গিয়ে আর খুলত না!

—উঁ হুঁ! সরস্বতীব কথাটা পছন্দ হইল না।

কিছুক্ষণ পর গণপতি সরস্বতীকে ডাকিয়া বলিল—দেখ! সে নূতন পটের নূতনতম অধ্যায়ের ছবিটি তাহাকে দেখাইল। যমুনার ঘাটে একটি মেয়ের মুখের কাছে আর একটি মেয়ে তর্জনী তুলিয়া চোখ পাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

কৃষ্ণলীলার পটের মধ্যে এ ছবি কোন কালে সরস্বতী দেখে নাই, সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন কবিল—ই আবার কি হল গো গুণিন?

গণপতি বাঁ-হাতে পটখানি তুলিয়া ধরিয়া ডান হাতের তর্জনী-নির্দেশে ছবি দেখাইয়া গাহিল—

> কুটিলার চসকু দুটি তারা হেন জ্বলে,
> দন্ত কিড়িমিড়ি করি রাধিকাকে বলে।'
> "কালামুখী কলঙ্কিনী রাইলো!
> তোর মতন কুল-মজানি গোকুলে আর নাইলো।"

সরস্বতী মাটিতে গড়াইয়া পড়িয়া হাসিতে আরম্ভ করিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া সে হাসিল, তারপর উঠিয়া বসিয়া ঘাড় ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ছবিখানি দেখিতে আরম্ভ করিল। বলিল—

কুটিলের নাকটা কিন্তুক আর টুকচা তুলে দিতে হ'ত বাপু! এমনি—ক'রে! বলিয়া সে নিজেই নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া দেখাইয়া দিল। গণপতি হাসিল। সরস্বতী আবার মন দিয়া ছবিখানি দেখিতে আরম্ভ করিল। আবার সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—কোন্ দোকানের রঙ আনছ বল দেখি? সব রঙ কেমন মেটে মেটে খস্‌খসে লাগছে!

গণপতি বলিল—ধূলা পড়ছেরে, রঙের দোষ নাই। পথের ধারে ঘর—ফাগুন মা.সের কাঁচা সড়ক—গাড়িতে গাড়িতে পথের ধূলা উড়ছে!

এ কথাতেও সরস্বতীর হাসি।

—তোমার মাথাটা কি হয়েছে গো! হি-হি-হি-হি! পাকা চুলের ডগায় ডগায় মেটে মেটে ধূলা—ঠিক কদম ফুল!

এই মেয়েটির রাগের কারণ আছে। উহার স্বামী ঘনশ্যাম পটুয়াই গণপতির নাতি-সম্প্রদায়ের মধ্যে সরস্বতীর সর্বাপেক্ষা প্রিয়জন। ঘনশ্যাম রঙ-মিস্ত্রির কাজ করে, দু পয়সা উপার্জনও করে। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে গোটা কয়েক নূতন কাজ পটুয়াদের পুরুষেরা গ্রহণ করিয়াছে। আগে তাহারা পট আঁকিত—পট দেখাইযা গান করিত, বিনা পটেও মন্দিরা বাজাইয়া পুরাণের পালা গান কবিত, প্রতিমা গড়িত, পুতুল গড়িত, রাজমিস্ত্রির কাজ করিত. যাহারা সূক্ষ্ম কাজ পারিত না—তাহারা মাটির ঘর তৈয়ারি করিত। এখন তাহারা দেওয়ালে তেল বঙ দিয়া লতাপাতা ফুল আঁকে—কাঠের উপব রঙ ও বার্নিশের কাজও করে। কেহ কেহ তাঁতের কাজও করে। ঘনশ্যাম রঙ-মিস্ত্রির কাজ শিখিয়াছে, এখান ওখান করিয়া বড়লোকের বাড়িতে বঙের কাজ করে। শহব-বাজাব হইতে সবস্বতীর পাতিজরদাটি সে নিয়মিত জোগাইয়া থাকে; রূপালি জরদা, কিমাম, কখনও বা আর দুই-চারিটা সখের জিনিসও আনিয়া দেয়।

ঘনশ্যাম তাহাকে বলে—রাঙাদিদি।

সরস্বতী মিশি দেওয়া দাঁতের ঝিলিক হানিয়া হাসিয়া তাহাকে ডাকে—কেলেসোনা। ঘনশ্যামের বঙ কালো। নামকরণ করিয়া দিয়াছে গণপতি নিজে।

সেদিন সরস্বতীর বিলানো ধানি-লঙ্কার ঝাল গোটা পাড়ায় একটা জ্বালা ধরাইয়া দিয়াছিল। নাতিদের দল মুখ বাব করিয়াই আসিয়া বসিল। ঘনশ্যামের সমাদরটা সকলের মনেই এতদিন গোটা ধানি লঙ্কার মত সরস রহস্যের আবরণে জ্বালা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া লুকানো ছিল। আজ সরস্বতীই সেগুলি ভাঙিয়া ভিতরের বিষ বাহির করিয়া দিয়াছে। ঘনশ্যামও আসিয়াছে। তাহার মনটাও ভাল নাই, তাহার স্ত্রী আজ তাহার সহিত চরম বচসা করিয়া ছাড়িয়াছে।

গণপতি নূতন পট দেখাইতেছিল। সরস্বতী রান্না করিতে করিতে অভ্যাসমত সরস রহস্যবাণগুলি নিক্ষেপ করিতেছিল। কিন্তু প্রতিপক্ষের দল আজ তেমন সাড়া দিতেছে না। সরস্বতীর জলের অভাব ঘটিয়াছিল সে ঘড়াটা কাঁখে লইয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আলোটা কেউ দেখাবে হে নাগরেরা?

একজন বলিল—তোমার কেলেসোনা যাক।

—তাই এস হে, তুমিই এস ভাই।

ঘনশ্যাম উঠিয়া দাঁড়াইল। একজন বলিল—যাবে তো কেলেসোনা, মজুরি কি দিবে গো রাঙাদিদি?

দাওয়া হইতে উঠানে নামিয়া সরস্বতী ঘুরিয়া দাঁড়াইল, বলিল—মজুরি কিসের হে? বেগার দিয়া কে কোন্ কালে মজুরি পায়?

—উঁ—হু! ঘনশ্যাম বেগার লয়।

—বেগার লয়?

—না। উ হ'ল গিয়ে কেলেসোনা; কাল রঙের সোনা, সোনার পাথরবাটি, উ কেনে বেগার হবে?

সরস্বতী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল—তা বটে! বল হে কেলেসোনা কি লিবে মজুরি?

ঘনশ্যাম কিছু বলিবার পূর্বেই একজন বলিয়া উঠিল—

"সব সখিকে পার করিতে লিব আনা আনা,
শ্রীমতীকে পার করিতে লিব কানের সোনা।"

অপর একজন সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিল—তোমাকে রাঙাদিদি আর বলব না ঠাকরুনদিদি—বলব 'বিনোদিনী'। 'কেলেসোনা নাম রাখে রাধা বিনোদিনী'। তোমার নাম হল 'বিনোদিনী'।

গণপতি হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল—তুমি বড় ভাল বলেছ হে লাতি; এ মজলিশে কল্কে তোমারই আগে পাওনা। লাও, কল্কে লাও। হুকা-সমেত কল্কেটি সে তাহার দিকে আগাইয়া দিল।

সরস্বতীও ফিক ফিক করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল, সে উচ্ছল হিল্লোলে ঘাটের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—তবে বাঁশি লাও হে কেলেসোনা, ঘাটের ধারে তুমি বাজাইবা—আমি জল ফেলব আর জল ভরব।

সরস্বতীর এই নির্লজ্জতায় সমস্ত নাতি-সম্প্রদায়ও আজ স্তম্ভিত হইয়া গেল। ঘনশ্যামের সহিত গোপন প্রেমের কথাটা এমন ঘোষণা করিয়া স্বীকার করিয়া লওয়ায় তাহাদের অন্তর রি-রি করিয়া উঠিল। একজন গণপতিকে বলিল—তোমাকে আমরা খাতির করি—ভালবাসি; কিন্তু তুমি এইবার গলায় দড়ি দিয়া মর! ছি!

গণপতি উত্তরে নাতি-সম্প্রদায়কে গণনা করিতে আরম্ভ করিয়া দিল, সকলে বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। গণনা শেষ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ভাবেই বুড়া বলিল—হ'ল না ভাই। তোমরা পাঁচের অনেক বেশি, আট জনা। পাঁচ হ'লে না হয়—বউয়ের নাম দিতাম দ্রৌপদী—তোমরা হতে পাণ্ডব। কথা শেষ করিয়া বুড়া মৃদু মৃদু হাসিতে আরম্ভ করিল।

নাতির দল কয়েক মুহূর্ত নীরবে বসিয়া থাকিয়া নীরবেই একে একে উঠিয়া চলিয়া গেল।

সরস্বতী ঘাট হইতে ফিরিল উচ্চ কণ্ঠে হাসিতে হাসিতে। ঘনশ্যাম নীরবে আলোটি নামাইয়া দিয়া হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল। গণপতি বলিল—বস হে কেলেসোনা!

ঘনশ্যাম ঢোক গিলিয়া বলিল—রাত অনেক—না—বসব না। বলিতে বলিতে সে চলিতে আরম্ভ করিল। সরস্বতীর হাসি আরও বাড়িয়া গেল।

গণপতি কোন প্রশ্ন করিল না, সে তামাক সাজিতে বসিল। সরস্বতী এবার মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—বলে তালাক দাও বুড়াকে, নিকা কর আমাকে!

গণপতি চকিত হইয়া মুখ তুলিয়া সরস্বতীর মুখের দিকে চাহিল, পরক্ষণেই সেও মৃদু মৃদু হাসিতে আরম্ভ করিল।

*    *    *

পরদিন হইতে নাতি-সম্প্রদায় গণপতির বাড়িতে নামাজ পড়িতে আসা বন্ধ করিল; অপর এক প্রৌঢ় পটুয়ার বাড়িতে তাহারা নামাজের আস্তানা গাড়িল। অভিরাম পটুয়া পয়সায় গণপতি অপেক্ষা কম নয়, সে ভাল রাজমিস্ত্রি, সৌখিন নকশার কাজ সে ভালই করে, কিন্তু কুলকর্মে রাজের কাজটা পটুয়া সম্প্রদায়ের নিকট কৌলীন্যজনক নয়। অভিরাম নামাজপ্রার্থীদের পুরোভাগে দাঁড়াইবার অধিকার এমন অপ্রত্যাশিতভাবে পাইয়া খুশি হইয়া উঠিল। সে শুধু জল তামাকের ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, প্রত্যহ এক বাণ্ডিল বিড়ির ব্যবস্থা পর্যন্ত করিল। ডুগি তবলা—মন্দিরা কিনিয়া পালা গানের মহড়ার আড্ডাও খুলিয়া দিল।

কেবল ঘনশ্যাম আসা ছাড়িল না। এই লইয়া পটুয়াদের রমণী-সমাজ একেবারে শতমুখী হইয়া উঠিল। তাহারা সরস্বতীর সহিত একসঙ্গে ব্যবসায়ে যাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করিল। কিন্তু সরস্বতীর তাহাতে কিছু আসিয়া গেল না। চুড়ি-পুতুলের পসরা চাপাইয়া সে একাই গ্রামগ্রামান্তর ঘুরিয়া আসিত। প্রতিবেশিনীদের মুখে মুখে তাহার কলঙ্ক-কাহিনি অঞ্চলময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, ফলে হাটে তাহার পসরার সম্মুখে ভিড় জমিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল মধুমক্ষিকার ঝাঁকের মত। নির্জন পথে প্রান্তরেও দুই-একজন ক্রেতার পর্যন্ত অভাব হইত না। সরস্বতী সেইখানেই চুড়ি পুতুলের পসরা নামাইয়া বসিত। তাহার রাঙাদিদি নামটা পর্যন্ত সকলের জানা হইয়া গিয়াছে; ক্রেতারা হাসিয়া ডাকে—রাঙাদিদি!

সে বলে—কি লিবে লাও লাতি!

ঘনশ্যাম ইহাতে একদিন রাগ করিল—না রাঙাদিদি, ছি!

সরস্বতী কথায় জবাব দিল না, হাসিয়া সোরগোল তুলিয়া ফেলিল।

ঘনশ্যাম আবার বলিল—হেসো না, এটা হাসির কথা লয়!

চোখ দুইটি বিস্ময়ে বিস্ফারিত করিয়া সরস্বতী প্রশ্ন করিল—লয়?

পরমুহূর্তেই মুখে কাপড় দিয়া উচ্ছ্বসিত হাসির আবেগে সে ভাঙিয়া পড়িল।

ঘনশ্যাম রাগ করিয়া চলিয়া গেল। দুই দিন সে আসিল না পর্যন্ত। তৃতীয় দিনে সরস্বতী পসরা মাথায় করিয়া দুই ক্রোশ দূরবর্তী গোপালপুরের পথ ধরিল। ওই গ্রামেই ঘনশ্যাম

এখন জমিদারদের পুরানো বাড়িখানা নূতন করিয়া রঙ করিতেছে। বাবুরা না কি শহর হইতে এখানে আসিয়া বাস করিবেন। গ্রামে কাহারও বাড়ি সরস্বতী যায় না, গেলে মেয়েরা তুমুল ঝগড়া বাধাইয়া তোলে।

প্রকাণ্ড বড় বড় থামওয়ালা জমিদারদের সদর কাছারি; ফটকের দুই পাশে জমানো-চুন-বালিতে গড়া দুইটা সিংহ। সরস্বতী ফটকের দুয়ারে দাঁড়াইয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া হাঁকিল—চা—ই—রে—শসী—চুড়ি—

হাঁক সে আর শেষ করিতে পারিল না, খিল খিল করিয়া হাসিয়া সারা হইয়া গেল। কিন্তু সে হাসিতে তাহাব অকস্মাৎ ছেদ পড়িয়া গেল। জমিদারদের কাছারি-বাড়ির দরজায় দাঁড়াইয়া কুড়ি-বাইশ বৎসরের সোনার বরন সে যেন কোন্ রাজার ছেলে।

ঘনশ্যামও বাহির হইয়া আসিয়াছিল, সে অন্তরালে দাঁড়াইয়া বারবার হাত ইশারা করিতেছিল—পালাও, পালাও!

সরস্বতীর তখন ঘনশ্যামের ইশারা দেখিবার বা বুঝিবার অবসর ছিল না, বিস্ময় বিস্ফারিত মুগ্ধ নেত্রে সে ওই রাজার ছেলের দিকেই চাহিয়াছিল।

ছেলেটি রাজারই ছেলে, জমিদারের বড় ছেলে; সম্প্রতি পড়া-শুনার শেষ পরীক্ষা দিয়া গতকাল এখানে আসিয়াছে, এখানে কিছুদিন বিশ্রাম করিবে। ছেলেটি ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিল—কি চাই?

—চুড়ি, রেশমি চুড়ি আছে, লিবেন?

ছেলেটি সশব্দে হাসিয়া উঠিল, বলিল—চুড়ি নিয়ে কি করব?

সরস্বতী অপ্রতিভ হইয়া গেল—কিন্তু পরমুহূর্তেই সে উত্তর খুঁজিয়া পাইল, বলিল—বউরানির হাতে পরায়ে দিব।

—বউরানি নেই। চুড়ির দরকার নেই।

—পুতুল, পুতুল লিবেন?

—তাই বা নিয়ে কি করব?

—টেবিলে সাজায়ে রাখবেন। সায়েবরা লিয়ে যায় আমাদের পুতুল।

—তাই না কি? দেখি তোমার পুতুল!

সরস্বতী পশরা নামাইয়া বসিল, সম্ভ্রমভরেই বোধ করি মাথায় সে আজ ঘোমটা টানিয়া দিল। তার পর বাহির করিল মাটির পুতুল—কেশবতী, কঙ্কাবতী, মালিনী, গোয়ালিনী, ঘোড়া, বাঘ, সিংহ।

রাজার ছেলে মুগ্ধ বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—বাঃ! এ পুতুল তোমরা নিজেরা গড়?

—আজ্ঞা হ্যাঁ গো!

ঘোড়াটি তুলিয়া লইয়া দেখিয়া শুনিয়া তরুণ জমিদার বলিল—এটা কি ঘোড়া নাকি?

—আজ্ঞা হ্যাঁ। পক্ষীরাজ ঘোড়া। পক্ষীরাজ আকাশে উড়ে কি না!

—ঠিক কথা। কত দাম নেবে বল তো?

সরস্বতী মুচকি হাসিয়া মাথার ঘোমটাটা আরও একটু টানিয়া দিয়া বলিল—ওরে

বাপরে! দাম আমি বলতে পারি—না লিতে পারি! আপনি দিবেন বক্‌শিশ্‌। আপনারা হাত ঝাড়লে তাই আমাদের পব্বত।

জমিদারের ছেলেটি একটি টাকা সরস্বতীর সম্মুখে ফেলিয়া দিল। সরস্বতীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, পুতুলের দাম দু'-পয়সা হিসাবে সাতটা পুতুলের জন্য চৌদ্দ পয়সার বেশি কেউ দিত না; সে টাকাটা কুড়াইয়া কপালে ঠেকাইয়া আঁচলের খুঁটে বাঁধিল। টাকা বাঁধিয়াও সে উঠিল না, আবার আরম্ভ করিল—পট লিবেন না? পট?

—পট?

—আজ্ঞা হাঁ; রামলীলা, কেষ্টলীলা, গৌরলীলা! সায়েবরা কিনে লিয়ে যায় আজ্ঞা!

—ও! পট! তোমরা পট আঁক না কি? কিন্তু নতুন পট তো চলবে না, পুরনো পট চাই, আছে তোমাদের?

—আজ্ঞা, আমার মরদ খুব পুরানো নোক, ষাট বছরের বুড়া; তারই আঁকা পট আছে।

- -তোমার মরদ মানে—তোমার স্বামী? ষাট বছরের বুড়ো?

—আজ্ঞা হাঁ গো! সরস্বতী মুখ হেঁট করিয়া হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া খুক—খুক করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল।

ঘনশ্যাম আড়ালে দাঁড়াইয়া প্রথম হইতেই সমস্ত শুনিতেছিল, সরস্বতীর চাপা হাসির শব্দে তাহার সর্ব অন্তর ঘৃণায় রি-রি করিয়া উঠিল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে আবার মিষ্ট কণ্ঠের উচ্চধ্বনি ধ্বনিত হইয়া উঠিল—চা—ই, রে—শমী চুড়ি—

জমিদার-বাড়ির কাছারি-ঘরের জানালায় রাজার ছেলে আসিয়া দাঁড়াইল। —পট এনেছ?

মাথার পশরা কাঁখে নামাইয়া—মাথায় ঘোমটা টানিয়া সরস্বতী হাসিয়া বলিল—রাজার হুকুম, না এনে পারি? বাপ রে!

—তবে? রেশমি চুড়ি বলে হাঁকছ যে?

—চাই—পট—বলতে কেমন লাগে যে! বলিয়া সে খালি হাতটায় কাপড় টানিয়া মুখে চাপা দিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল।

—কই, আন তোমার পট, এই ঘরেই নিয়ে এস।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পসরা নামাইয়া সরস্বতী বলিল—খুব ভাল পট এনেছি, গৌরলীলার পট!

—গৌরলীলার পট বুঝি খুব ভাল?

—গৌরলীলার পট আপনার লাগবে ভাল। গৌরচাঁদের মত বরন আপনার, তেমুনি রূপ—

—বল কি?

—হ্যাঁ। আপনকার নাম দিয়েছি আমি গৌরচাঁদ। এই দেখেন—বলিয়া পট খুলিয়া সে সুরে আরম্ভ করিল—

সোনার গৌর যায় পথ আলো করি—
যুবতীরা লাজে যায় মরমেতে মরি—
হায় রে এরে কেউ বাঁধতে লারে!

ত্রিশ-টাকায় তিনখানা পট বিক্রি করিয়া সরস্বতী রঙ্গভরে বিপুল উচ্ছ্বাসে হেলিয়া দুলিয়া ঘরে ফিরিল। নোট তিনখানা গণপতির সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল—লাও; আমার গৌরচাঁদের কেমন দরাজ হাত দেখ! পরমুহূর্তেই মুখে কাপড় দিয়া হাসি আরম্ভ হইয়া গেল। হাসিতে হাসিতে বলিল—বলেছি বাবুকে। রাগ করে নাই! বললাম আপনকার নাম দিয়েছি আমি গৌরচাঁদ। তা মুখখানা হয়ে উঠল সিন্দূরে মেঘের পারা!

গণপতিও হাসিল—আজ কিন্তু তাহার হাসি ম্লান। সে বলিল—কিন্তুক গৌর—প্রেম ইয়ারা যে সইবে না বলছে। মেয়েগুলান তো শাঁখের মত গলা বার করেছে। কেলেসোনা তোমার ধুয়া তুলছে—মলে ফেলব না।

সরস্বতী মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া বলিল—বাবারে—তবে তো ভয়ে আমি মরে গেলাম! ভেবো নাই তুমি, তুমার আগে আমি মরব। তুমি আবার একটা নিকা করবে—টুক্‌টুকে— চম্পাবতীর-পারা বরন।

গণপতি হাসিয়া বলিল—না রে রাঙা-বউ; দেহ আমার ভাল নাই।

সরস্বতী হাসিল—বিষণ্ণ হাসি, বলিল—সেও তুমি ভেবো নাই।

গণপতি আর কিছু বলিল না।

পরদিন দ্বিপ্রহরে আবার গোপালপুরের পথে হাঁক উঠিল—চা-ই, রে-শসী চুড়ি!

* * *

গণপতি মিথ্যা কথা বলে নাই। কিন্তু সরস্বতীর চোখে তাহা পড়ে নাই। গণপতির শরীর ভিতরে ভিতরে শূন্যগর্ভ হইয়া উঠিয়াছিল। দিনদশেক পরেই একদিন সরস্বতী ওই গোপালপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল তুলি হাতে করিয়াই অর্ধসমাপ্ত পটের সম্মুখে গণপতি নিস্পন্দ নিথর হইয়া পড়িয়া আছে। একটা দুর্দমনীয় কম্পনে থর থর করিয়া কাঁপিয়া সে বসিয়া পড়িল।

গণপতি মরিল, কিন্তু সে বাঁচিয়া থাকিতে যে আশঙ্কা করিয়াছিল সে আশঙ্কা মিথ্যা হইয়া গেল। তাহার নাতির দল ছুটিয়া না আসিয়া পারিল না। কিন্তু একটি মেয়েও আসিল না—সরস্বতীকে সান্ত্বনা দিতে।

গণপতির সৎকার শেষে নাতিরা আসিয়া বহুদিন পরে আবার রাঙাদিদির দাওয়ায় কিছুক্ষণ বসিয়া তবে বাড়ি গেল।

দিন তিনেক পরে।

ঘনশ্যাম সকালেই আসিয়া দাওয়ায় বসিল—কই? কি হচ্ছে গো?

সরস্বতী হাসিয়া বলিল—এস লাগর এস।

বিনা ভূমিকায় ঘনশ্যাম বলিল—কি বলছ বল, এইবার?

মুখে কাপড়-চাপা দিয়া সরস্বতী বলিল—কিসের গো?

—নিকার কথা! কি বলছ বল দেখি?

—উঁ—হু। সতিন নিয়া ঘর করতে লারব আমি!

—উকে যদি তালাক দি?

—হুঁ—তবে করব নিকা।

—দেখিয়ো?

—হুঁ গো! আমার কেলেসোনার দিব্যি। হল তো?

—কিন্তু তুমি এমন করে বেড়াতে পাবে নাই।

—বেশ!

কথায কিন্তু বাধা পড়িল; নাতি-সম্প্রদায়ের অন্যতম নাতি দ্বিজপদ আসিয়া উপস্থিত হইল—কই? রাঙাদিদি কই?

—এস, এস, ভাই এস। সরস্বতী হাসিয়া অভ্যর্থনা করিল।

ঘনশ্যাম উঠিয়া গেল। দ্বিজপদ বসিয়া বলিল—তারপরে?

হাসিয়া সরস্বতী উত্তর দিল—আমার কথাটি ফুরালো, নটে গাছটি মুড়ালো। হা নটে তুই—

অপ্রতিভ হইয়া দ্বিজপদ হাসিয়া বলিল—ধ্যেৎ—

—কেনে—ধ্যেৎ কেনে?

—বুড়া দাদু তো গেলো, তুমি কি করবে—শুধাতে এলাম—তা—না—

—বুড়ো মরেছে—আমি নেকা করব।

—হুঁ—তা—

—উঁ—হু। সতিন নিয়া আমি ঘর করতে লারব হে, তুমি উঠে যাও।

—আমি যদি তালাক দিই?

—তখন এস; পিঁড়ি পেতে রাখব আমি। এখন উঠ—আমি যাব গোপালপুর; জমিদারবাবুর পুতুলের বরাত আছে।

সে ডালা সাজাইয়া দুয়ারে তালা দিয়া বাহির হইয়া গেল। তালা দিতে গিয়া সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস না ফেলিয়া পারিল না। বুড়া ওই ঠাঁইটিতে বসিয়া ছবি আঁকিত। তালাচাবির অভ্যাস তাহার নাই।

স্তব্ধ দ্বিপ্রহর।

গোপালপুরের পথে হাঁক উঠিল—চা—ই, রেশমি চুড়ি!

কিন্তু জমিদার-বাড়ির জানালা আজ খুলিয়া গেল না। কোথাও একটুকু শব্দ হইল না; বাতায়ন-পথগুলি সবুজরঙের কপাটে কপাটে ভাঁজ মিলাইয়া নিরন্ধ্র রুদ্ধ!

গৌরচাঁদ চলিয়া গিয়াছে।

পটুয়াপাড়ার প্রায় প্রতিঘরেই একটা অবরুদ্ধ কান্না গুমরিয়া মরিতেছিল। তরুণী বধূগুলি গোপনে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছে, কিন্তু কেহ কাহারও কান্নার কথা জানে না। তাহাদের স্বামীরা তালাক দিতে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছে।

সর্বনাশী কলঙ্কিনী সরস্বতী মরে না কেন?

কিন্তু আশ্চর্যের কথা—সরস্বতী না মরিয়াও তাহাদের রেহাই দিল। সকালে উঠিয়া সকলে দেখিল—সরস্বতী নাই, কোথায় চলিয়া গিয়াছে। নাতিরা সকলেই পরস্পরের সন্ধানে চাহিয়া পরস্পরকে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইল; তাহারা সকলেই আছে—সে-ই নাই।

সকলেই ছুটিল—তালাকের আর্জি ফিরাইয়া আনিতে। মেয়েরা চোখের জল মুছিয়া গালিগালাজে শতমুখী হইয়া উঠিল।

* * *

সরস্বতী আজও বাঁচিয়া আছে।

সরস্বতী বলিয়া তাহাকে কেহ চেনে না। শহরে রাঙাদিদির চুড়ি ও মাটির পুতুলের দোকান বিখ্যাত।

পাকা আমের মত গৌরবর্ণা প্রৌঢ়া রাঙাদিদির খরিদ্দারেরা নিত্য তাহার পুতুল কেনে। সাত-আট বছরের ছেলেমেয়েরা নিত্য পুতুল ও চুড়ি ভাঙে, নিত্য কেনে।

—কি চাই ভাই, পক্ষীরাজ ঘোড়া? কালকেরটা রাক্ষসে খেয়ে নিয়েছে?

—কি দিদি? আজ কি পরবে? মনচোরা না নীলমানিক?

লোকে বলে, বুড়ি পটুয়ানীর অগাধ পয়সা।

*ভাদ্র, ১৩৪৭*

# শাক ও গাড়ি

## ভাস্কর

সেদিন বাজাবে গিয়াছিলাম।

এটা সেটা কিনিবার পর দেখি বাজারের একপাশে একখানি কলাপাতার উপর একরাশ নটে শাক। জিজ্ঞাসা করিলাম, কত করে?

ছ'আনা সের।

ন'টে শাক ছ'আনা সের! বল কি? কত কবে দেবে ঠিক করে বল।

আজ্ঞে ছ'আনা করে।

তিন আনা করে দেবে?

না।

চার আনা করে?

আজ্ঞে না। ছ'আনার কম হবে না।

আচ্ছা, দাও এক পোয়া।

শাক ওজন হইল। জিজ্ঞসা করিলাম, তোমার পাল্লায় ফের নেই তো।

এই দেখুন না!—বলিয়া দাঁড়িপাল্লা তুলিতেই ডানদিকটা ঝুঁকিয়া পড়িল অনেকখানি। দোকানি অপ্রস্তুত হইযা একমুঠা শাক তুলিয়া ফেলিয়া দিল ঝুড়িতে। বলিলাম, এমনি করে লোককে ঠকাও বুঝি? বলিতেই আরও সঙ্কুচিত হইয়া আরো একমুঠা শাক ফেলিয়া দিল ঝুড়ির ভিতর।

বলিলাম, প্রায় একপয়সা'র শাক ঠকিয়ে নিচ্ছিলে।

বাড়ি ফিরিয়া বাজারের জিনিসপত্র গুছানোর সময়ে, কেমন করিয়া শাকওয়ালা আমাকে ঠকাইবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং কেমন করিয়া তাহার ঠকাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিতেছি, এমন সময়ে চাকর আসিয়া একখানি চিঠি দিয়া গেল। বলিল, লোক বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে।

এনভেলাপের মধ্যে একখানি বিল। দি গ্রেট এশিয়াটিক মোটর এঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড পাঠাইয়াছে। কয়দিন ধরিয়া গাড়ির এঞ্জিনটা একটু নক কবিতেছিল। উহাদিগকে বলিয়াছিলাম, কারবুরেটরটা একটু পরিষ্কার করিয়া দিতে। এটা তাহারই বিল।

বিলে কাজের তালিকা দেওয়া আছে—এঞ্জিনের ঢাকনি খোলা, কারবুরেটরের দিকে চাহিয়া থাকা, পেট্রলের নল খুলিয়া দেওয়া, চোকলেভারের মুখের স্পিল্‌ট-পিনের ডগা একত্র করা, পিন টানিয়া বাহির করা, লেভার সরাইয়া রাখা, অ্যাকসিলারেটরের স্প্রিং খোলা, এঞ্জিনের গা হইতে কারবুরেটব খুলিয়া আনা, ফ্লোট চেম্বারের ঢাকনি খোলা, ফ্লোট

বাহির করা, ফ্লোট-চেম্বারের তলায় পিতলের তারের জাল খুলিয়া বাহির করা, ছোট ছোট বক্সরেঞ্চ দিয়া জেটগুলি খোলা, জেটের মুখে ফুঁ দেওয়া, সরু তার ঢুকাইয়া জেটের মুখ পরিষ্কার করা, জেটগুলি পুনরায় রেঞ্চ দিয়া আঁটা, জালের ছাঁকনি পুনরায় বসান, ফ্লোটটিকে পুনরায় চেম্বারে বসান, চেম্বারের মুখ ঢাকনি দিয়া বন্ধ করা, ঢাকনির উপরের স্প্রিংক্লিপ পুনরায় আটকাইয়া দেওয়া, এঞ্জিনের গায়ে কারবুরেটর পুনরায় আঁটিয়া দেওয়া, চোক্-লেভারের ডগা আটকানো, স্পিল্ট-পিন পরানো, পিনের মুখ ফাঁক করিয়া চাপিয়া দেওয়া অ্যাক্সিলারেটরের স্প্রিং পুনরায় আটকানো, কারবুরেটর টিউন করা, নেকড়া দিয়া মোছা, এঞ্জিনের ঢাকনি বন্ধ করা, ট্রায়ালেব জন্য পেট্রল খরচ আড়াই গ্যালন, ইত্যাদি—মোট থোক—৬৭˙ ০ বিলের পরিমাণ শুনিয়া গৃহিণী চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন, কি একটু পরিষ্কার করতে অত টাকা!

এমন বেশি আর কি বিল করেছে। বিলিতি দোকান হলে—

বাহিরে লোক অপেক্ষা করিতেছিল। বিলের টাকা লইয়া স্বচ্ছন্দমনে চলিয়া গেল।

*শ্রাবণ, ১৩৫৩*

# বড় গল্প

# অপরূপের হাট

## প্রফুল্ল রায়

রূপের হাট ঘরে ঘরে। রসের হাট মনে মনে।

কিন্তু অপরূপের হাট? সে কোথায়? সে কেমন?

রূপ তো ঠাট করে দেখাবার জিনিস। কিন্তু অপরূপ?

চোখ মেললেই রূপ। তা সে রূপের কত বাহার, কত জলুষ! কেউ সুরূপ, কেউ কুরূপ, কেউ বিরূপ। কিন্তু অপরূপ কে?

রূপ দেখে তো সবাই পাগল। রূপে কে না মজে! রূপ কে না ভজে! রূপের স্তুতি, রূপের বাখান সবখানে।

রূপ দেখে চোখ ভবে। কিন্তু মন ভরে কিসে?

চোখ মেললে তো রূপ। কিন্তু চোখ বুজলে?

রূপের মধ্যেই তো মানুষ পরমকে খুঁজে খুঁজে বেড়ায়। এই পরমই তো অপরূপ। অপরূপকে পাওয়াই তো পরম পাওযা।

রূপসাগরের ঘাট বড় পিছল। সে ঘাটে অনেক ভয়। সেখানে মন বিকল হল তো পা-ও টলল।

রূপের হাটে কেউ পায়, কেউ পায় না। কিন্তু অপরূপের হাটে?

সেখানে ভয় নেই, সংশয় নেই। চোখ বুঁজে শুধু হাত পাতো। সেখানে হাত পাতলেই মুঠি ভরে যায়।

রূপেব বড় ধন্দ, বড় জ্বালা। রূপেব হাটে কেউ বিকোয, কেউ বিকোয় না। কারো দাম চড়া, কারো দাম কানা-কড়িও না।

কিন্তু অপরূপের হাটে?

সেখানে সব সমান। সব এক দাম। সেখানে জ্বালা নেই, দুঃখ নেই, ধন্দ নেই, মাতামাতি নেই, দরাদরি নেই। না পাওয়ার আক্ষেপ নেই। সেখানে শুধু পাওয়ার আনন্দ।

আনন্দই তো বড় কথা।

অপরূপের হাট নিয়ত আনন্দে বিভোর হয়ে আছে।

অপরূপের হাট'

কেউ যদি বলে, 'এ আবার কী নামের ছিরি! এ নামের হাট আছে নাকি কোথাও?

তা হলে বলতে হয়, 'অপরূপের হাট যেমন অপরূপ, তার নামও তেমনি।'

কেউ যদি বলে, 'অপরূপের হাট বসেছে কোথায়?'

তা হলে বলতে হয়, 'এ হাট বসে নি কোথায়?'

অপরূপের হাট তো বিশেষ কোন হাট নয়। সে নির্বিশেষ। সে একটা প্রতীক মাত্র।

মানুষ যে এত কাঁদে, এত আক্ষেপ করে, তা কিসের জন্যে? রূপ থেকে অপরূপে পৌঁছবার জন্যেই তো। অপরূপকে পাবার জন্যেই তো।

রূপের মধ্যেই রয়েছে অপরূপ। আর এই অপরূপের হাট রয়েছে সবখানে। স্থল-জল-মানুষ, পৃথিবীর সব কিছু জুড়ে।

পৃথিবী খুব বড় কথা। ছোট কিছু দিয়েই ধরা যাক।

ধরা যাক, এই চিত্তিরগঞ্জেই অপরূপের হাট বসেছে।

## দুই

বছরের তৃতীয় ঋতুটি এখন যায় যায়।

ওপরে ঝাঁকে ঝাঁকে সরালি পাখি ওড়ে। আরো ওপরে বকের পাখার মত সাদা সাদা, ছেঁড়া ছেঁড়া ছন্নছাড়া মেঘ ভেসে বেড়ায়।

আকাশের রং ঝকঝকে নীল। এ দেশে বলে মাজা নীল।

. নিচে ঘোলা ঘোলা, গেরুয়া জলের নদী। নদী এখন স্থির, শান্ত।

ক'দিন আগেও নদীতে মাতামাতি ছিল, ঢলানি ছিল। এখন ঢল মরেছে। গেরুয়া জলে টান ধরেছে।

বছরের দ্বিতীয় ঋতুতে নদীতে যৌবন আসে। তৃতীয় ঋতুর শেষে সেই যৌবন মরতে শুরু করে।

নদীর নাম ঢলানি। ঢলানি নদীর ঠিক পার ঘেঁষে চিত্তিরগঞ্জ। চিত্তিরগঞ্জ বাজার-বন্দর জায়গা।

একটানা লম্বা লম্বা টিনের ঘর। এগুলো পাইকের মহাজনদের আড়ত। টিনের চাল আর কাঠের পাটাতনে পাকা ব্যবস্থা। এখানে রাখি মালের কারবার।

আড়তগুলোর লাগোয়া কাতারে কাতারে গোলপাতার দোচালা। এগুলো অস্থায়ী আস্তানা। এখানে রোজ কাঁচা মালের দোকান বসে।

রোজ হাট বসে চিত্তিরগঞ্জে।

এটা দক্ষিণের আবাদ অঞ্চল। এখানে চিত্তিরগঞ্জের হাটটাই একমাত্র হাট। ক্ষ্যাপা বাতাস যেন চারপাশের অর্থাৎ বাজিতপুর-নামখানা-দ্বারিকনগর—সব জায়গার সব মানুষকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে এখানে এনে ফেলে। আবাদের বাসিন্দাদের এখানে না এসে গতি নেই।

কিছু কিনতে হলেও চিত্তিরগঞ্জে আসতে হবে। বেচতে হলেও আসতে হবে। এই হাটের সঙ্গে আবাদের মানুষের বাঁচা-মরার সমস্যা বাঁধা।

রোজকার মত আজও হাট বসেছে।

ফড়ে-পাইকের-দালাল-দোকানি-খদ্দের--নানান জাতের মানুষে চিত্তিরগঞ্জের হাট গিজ গিজ করছে।

হাটের ঠিক নিচেই মাঝিঘাটা।

এখান থেকে কাকদ্বীপ, কুলপি, কুঁকড়োহাটি, গেঁওখালির বোট ছাড়ে।

পারে অর্থাৎ এক হাঁটু থকথকে কাদায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সওয়ারি ডাকছে বিলাস, 'যাবে গো কুঁকড়োহাটি— যাবো গো—হেই—'

বিলাসের কাজটা বিচিত্র। কুঁকড়োহাটির বোটের সে মালিক না, মাঝি না। তার কাজ হল চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সওয়ারি ডাকা। কোন রকমে চল্লিশটা সওয়ারি জুটিয়ে বোটের খোলে পুরতে পারলেই সে দায় থেকে খালাস। শুধু খালাসই না, খুশিও।

চল্লিশটা সওয়ারি জোটাতে পারলে নগদ একটি টাকা পাবে বিলাস। চল্লিশজন না জুটলে টাকাটা থেকে হিসেব মত মজুরি কাটা যাবে।

আজকাল দক্ষিণের এই আবাদে লোক বাড়ছে। চল্লিশটা সওয়ারি জুটে যায়ই। মজুরি কোনদিনই বড় একটা কাটা যায় না বিলাসের।

সকাল-বিকেল—কুঁকড়োহাটির বোট দিনে দু বার পাড়ি মারে। দুই পাড়িতে দুটি টাকা কামায় বিলাস। এই তার সারাদিনের রোজগার।

বিলাস চিল্লাচ্ছে, "যাবে গো, কুঁকড়োহাটির মানুষ--খরখর এসো। এক্ষুনি বোট ছাড়বে—খরখর—হেই কুঁকড়োহাটি-ই-ই-ই—

এখন বিকেল।

এর ভেতরেই জন কুড়ি সওযারি জুটিয়ে ফেলেছে বিলাস। আর কুড়িজন জোটাতে পারলেই আজকের মত কাজ শেষ।

একটু পরেই হাট ভাঙবে।

গলা ফাটিয়ে বিলাস চেঁচাচ্ছে "এই খাড়ল—এক্ষুনি ছেড়ে দেবে। পা চালিয়ে খরখর এসে পড়--'

সন্ধ্যের ঠিক মুখে মুখে চিত্তিরগঞ্জের হাট ভেঙে গেল।

এখন সামনের নদী আবছা, অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। ধোঁয়ারঙের একটা পর্দা আকাশ-নদী—সব কিছুকে ছেয়ে ফেলেছে।

আরো কুড়িজন অর্থাৎ মোট চল্লিশজন সওযারি জুটিয়ে কুঁকড়োহাটির বোটে পুরে দিল বিলাস।

একটু পর বোট ছেড়ে দিল।

নদীর পার থেকে দৌড়তে দৌড়তে হাটে উঠে এল বিলাস।

মদন ঢালি মস্ত বড় কারবারি। তার ধান চালের কারবার। তামাকের কারবার। গরু-ছাগলের কারবার। এ ছাড়া কুঁকড়োহাটি কুলপিতে তার সাতখানা বোট ভাড়া খাটে। সেই সব বোটেরই একটাতে হেঁকে হেঁকে সওযারি জোটায় বিলাস।

সরাসরি মদন ঢালির ধানের আড়তে এসে উঠল বিলাস।

সামনে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে খেরো খাতায় হিসেব কষছে মদন ঢালি।

ভয়ে ভয়ে বিলাস ডাকল, 'মহাজোন—'

তেরছা চোখে একবার তাকাল মদন। তার তাকানোটা অদ্ভুত। পুরোপুরি চোখ মেলে না সে। অর্ধেক বুঁজে অর্ধেক মেলে ভুরু দুটো কুঁচকে রাখে।

মদন ঢালির চেহারাটা থলথলে, মাংসল। বিরাট ভুঁড়িটা লোমে ভরা। নাকটা যেন মাংসের একটা ঢিবি। নাকের ভেতর থেকে পাঁশুটে রঙের কয়েকগাছা রোঁয়া, বাইরে বেরিয়ে পড়েছে।

লোকটার চামড়া খুব উর্বর। কানের লতি, ঘাড়, গলা, পিঠ—সব জায়গায় লোম গজিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য! মাথায় মস্ত এক টাক। মনে হয়, একদম চাঁচা। একটা চুলও নেই।

পরণে হাঁটু পর্যন্ত ঠেঁাট কাপড় আর ফতুয়া। ফতুয়াটা ভুঁড়ির কাছে বেড় পায় না। সেখানকার বোতামটা সব সময় খোলাই থাকে।

মদনের আকারটা যেমন বিরাট, গলার আওয়াজটা সেই অনুপাতে বেজায় সরু, মিহি। সরু কিন্তু তীক্ষ্ণ, ধারাল।

মদন বলল, 'বোট ছেড়ে গেচে?'

মুখে কিছু বলল না বিলাস। ঘাড় কাত করে সায় দিল। আসলে মদন ঢালির সামনে এলেই হাত-পা পেটের ভেতর সেঁদিয়ে যায় তার। ভয়ে জিভ জড়িয়ে যায়। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না।

মদন আবার বলল, 'ক'জন সওয়ারি হয়েছে?'

'দু কুড়ি।'

'ঠিক তো?'

বিলাস মাথা নাড়ল। বলল, 'হ্যাঁ।'

'এই নে তোর মজুরি।'

টাকা-সিকি-আধুলি—সামনের দিকে সব থাকে থাকে সাজানো রয়েছে। একটা কাঁচা টাকা তুলে ছুঁড়ে দিল মদন।

টাকাটা কুড়িয়ে বাইরে বেরুতে যাবে, মদন ডাকল, 'আঁই বিলেস—'

বিলাস থমকে দাঁড়াল।

মদন বলল 'শুনলুম, যমুনার ওখেনে রোজ যাস।'

'হ্যাঁ।'

'কী করিস সেখেনে?'

'যমুনা মাসি য্যাখন গান গায় ত্যাখন কত্তালে ঠেকো দি।'

'অ'—অস্ফুট একটা শব্দ করল মদন। তারপর এদিক-সেদিকে ভাল করে তাকিয়ে পাটকিলে রঙের খসখসে জিভটা বার করে পুরু পুরু ঠোঁট দুটো চাটল। ফিস ফিস করে বলল, 'কাছে আয়।'

মদনের রকম সকম দেখে আরো ভয় পেয়ে গেল বিলাস। কাঁপা-কাঁপা পায়ে সে এগিয়ে এল। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। শুকনো, ভরানো গলায় সে বলল, 'কী কইচেন?'

এমনিতেই গলাটা সরু। সরু গলা খাদে ঢোকাল মদন, 'যমুনার ওখেনে রোজ বেশ গাওনা-বাজনা হয়, না রে?'

'হ্যাঁ।'

'কে কে যায়?'

'অনেকে যায়। সুচাঁদ যায়, ধনঞ্জয় যায়, লোটন যায়, আমি যাই। সন্‌ঝে (সন্ধ্যে) বেলায় যমুনা মাসির ওখানে গে আমরা জুটি।'

'হুঁ—'

হুস করে একটা শব্দ করে মদন ঢালি।

অন্য সময় চোখ দুটো অর্ধেক বুঁজে অর্ধেক মেলে, ভুরু কুঁচকে বিলাসের দিকে তাকায় মদন। আশ্চর্য! এখন পুরোপুরি চোখ মেলে তাকিয়েছে। হ্যাবিকেনের তেজী আলোতে চোখ দুটো চক চক করছে।

বেশ খানিকটা চুপ। তারপর মদনই প্রথম কথা বলল, 'হ্যাঁ রে বিলেস—'

'কী কইচেন মহাজন?'

'যমুনার মেয়েটা নাকি ঘাটাল থেকে ফিরেচে?'

'কে কইল?'

বিলাস চমকে উঠল।

অন্য সময় হলে মদন খেঁকিয়ে উঠত। কিন্তু এখন নরম গলায় বলল, 'যেই বলুক, এসেছে কিনা বল—'

'হ্যাঁ—'

বিলাসের গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল কি বেরুল না।

'নাম কীরে ছুঁড়িটার? আঁই বিলেস—'

খসখসে জিভ বার করে পুরু ঠোঁট দুটো সমানে চাটছে মদন।

এদিক-সেদিক তাকালো বিলাস। মদনের আড়তে কেউ নেই। শুধু সে আর মদন। এমনিতেই মদনের কাছে এলে ভয়ে হাত-পা তার পেটে ঢুকে যায়। এখন ভয়টা এত বেড়েছে যে, শ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছে। হাত পা—সারা গা কাঁপছে। নাকের ডগায় কণা কণা ঘাম ফুটে বেরিয়েছে। মনে মনে বিলাস বলে, 'হেই মা গোসানি, কী গেরোতে পড়লম?'

মদন খেঁকিয়ে উঠল, 'আঁই বিলেস, অমন চুপ মেরে আচিস যে? যমুনার মেয়েটার নাম কী?'

'পদ্ম।'

'নামের তো বেশ ছিরি আছে। দেখতে কেমন? ছিরি ছাঁদ আছে?'

একটু থামে মদন। কি যেন ভাবে। তারপর বলে, 'বছর দুই আগে দেখেছিলুম ছুঁড়িটাকে। ত্যাখন তো বেশ ডেঁসিয়ে উঠেছিল। পুরো দু বচ্ছর আর দেখিনি। ছুঁড়িটাকে ঘাটালে সরিয়ে দিয়েছিল যমুনা। যাক ও কথা।'

চোখ নাচিয়ে নাচিয়ে, খিসখিসিয়ে খুব একচোট হাসল মদন। আবার নতুন উৎসাহে শুরু করল, 'দু বচ্ছরে ছুঁড়িটা বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছে, কী বলিস বিলেস?'

হাঁ-না—কিছুই বলল না বিলাস। কান দুটো তার ঝাঁ ঝাঁ করছে।

মদন বলল, 'পদ্ম কী যমুনার সঙ্গেই আছে?'

'হ্যাঁ।' বিলাসের গলাটা ফিসফিস করল।

কি ভেবে মদন বলল, 'আচ্ছা, তুই এখন যা।'

মদনের আড়তে যেন হাওয়া নেই। এতক্ষণ শ্বাসটা চেপে চেপে আসছিল। বাইরে বেরিয়ে বুক ভরে হাওয়া টেনে বাঁচল বিলাস।

## তিন

চিত্তিরগঞ্জ শুধু বাজার-বন্দরই না। এর অন্য মহিমা আছে।

ধান-চালের আড়তগুলোর পেছনে একটা বসতি গড়ে উঠেছে। সারি সারি ঘর। কোনটা গোলপাতার, কোনটা টিনের।

এই বসতিটা অনেক কালের। চিত্তিরগঞ্জ বাজারের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এরও জন্ম। এখানকার যারা বাসিন্দে, তাদের কেউ বাপের কুল, কেউ শ্বশুরের কুল মজিয়ে এসে উঠেছিল।

এখানকার যারা বাসিন্দে, তারা রূপ এবং দেহকে পণ্য করেছে। এখানে ঘরে ঘরে রূপের হাট, রসের হাট।

এখানে একবার যে এসেছে, সে-ই ডুবেছে, সে-ই মজেছে।

এককালে এখানকার বাসিন্দেদের সবাই ছিল রূপাজীবা। হাল আমলে কিছু কিছু ব্যতিক্রম ঘটেছে। সুস্থ জীবনের স্বাদ পেয়ে কেউ কেউ পুরুষ সঙ্গী জুটিয়ে সংসারী হয়েছে।

রসিক সুজনরা বলে, লোকে বলে কামিনী পাড়া।

কামিনী পাড়াটার চরিত্র অদ্ভুত। এখানকার আধা-আধি বাসিন্দে রূপাজীবা। বাকি অর্ধেক গৃহস্থ সংসারী মানুষ। তারা জীবনকে পুরো না পারলেও অনেকখানি সৎ এবং সুস্থ করে ফেলেছে।

এই কামিনী পাড়ারই একজন হল যমুনা। আর তার মেয়ে পদ্ম।

এককালে সারা আবাদের লোক যমুনা বলতে উন্মাদ ছিল।

কেউ যদি বলত, 'যমুনাকে চেন?'

যাকে বলা হত, সে জবাব দিত, 'চিনবুনি, বল কী গো খুড়ো? মাগি সারা আবাদের মাথা খাচ্ছে!'

রূপ! হ্যাঁ, তা রূপ বটে একখানা।

চোখ মেললেই তো রূপ। কিন্তু অমন রূপ কপালের জোর থাকলে, আগের জম্মের সুকৃতি থাকলে চোখে পড়ে।

অমন রূপ রাজা-বাদশার ঘরে নেই। বামুন-কায়েত-বড় মানুষের ঘরে নেই। অমন রূপ শহরে-বন্দরে মেলে না।

নকুড় গায়েনের গোলদারি দোকান। মাল কিনতে সে একবার কলকাতা গিয়েছিল। ফিরে প্রথম যে কথাটি সে বলেছিল, তা হল, 'না বাপু, এই চোখে তো কম দেখলম নি। স্বগ্গ মত্ত-পাতাল—যেখেনেই খোঁজ, এ রূপ পাবে নি।'

যমুনা আবাদ অঞ্চলের গর্ব; আবাদের মানুষের গৌরব।

সেই যমুনার হঠাৎ কী যে মতি হল! কামিনী পাডাব জীবনে তার অরুচি ধরে গেল।

কামিনী পাডা ছেড়ে সে গেল না। এক টেরেতে একটা বড টিনের ঘর তুলে সংসার পাতলা।

সংসার! হাঁ সংসারই তো! মজাব সংসার।

যমুনা রূপাজীবা। রূপ বেচে তার দিন চলত। রূপের টানে যাবা তার কাছে আসত, তাদের সম্বন্ধে কোন মোহ, কোন আসক্তিই তার ছিল না। দেহ বিকিকিনির সম্পর্ক ছাপিয়ে অন্য কোন গূঢ়, গোপন সম্পর্ক তাদের সঙ্গে গডে উঠত না।

কিন্তু আশ্চর্য। একদিন ফাঁদে পড়ল যমুনা। সে নারী দেহের মাংস বেচে, সুন্দব সুঠাম মাংস ছাড়া আর কিছুই নেই, মনটা যার মৃত, আশ্চর্য, একদিন তার মনের সাড়া পাওয়া গেল।

সুন্দব শরীরের কঠিন, সুঠাম মাংসের মধ্যে এতদিন কোথায় যে একটি মন লুকিয়ে ছিল, যমুনা টের পায়নি। যখন টের পেল, অসহ্য আবেগে, খুশিতে কেঁপে উঠল।

কুকড়োহাটি থেকে মথুর সাঁইদার রোজ আসত চিত্তিবগঞ্জে। মথুর মস্ত লোক। তাব মাছের কারবার।

সারাদিন হাটে মাছ কেনাবেচা সেরে সন্ধ্যের ঠিক মুখে মুখে পেট ভরে তাড়ি গিলে যমুনার কাছে আসত মথুর সাঁইদার।

রোজ তাকে ফিরিয়ে দিত যমুনা, 'ঘরে ফের মিনসে। বেশি রস থাকলে অন্য কারো কাছে যাও। আমি উসব ছেড়ে দিইচি।'

'কী যে বলিস তোর মাথার ঠিক নি যমুনা! তোবা যদি সতী হয়ে যাস্ আমরা কোন্ চুলোয় মুখ গুজব।'

'কোন্ চুলোয় মুখ গুঁজবে, তা কি আমায় বলে দিতে হবে!'

'হ্যাঁ মাইরি!'

'ঢ্যামনা কুথাকার, চোখের অরুচি। বেরো বেবো।' যমুনা ক্ষেপে উঠত।

'গাল দে মাইরি, মেরে মেরে পাট করে ফ্যাল, তবু কুকুর বেড়ালের মতন তাড়িয়ে দিস নি।'

বিড় বিড় করে যমুনা বলত, 'কেন্নো কুথাকার, ড্যাঙার কামট কুথাকার!'

এত যে গালাগালি খেতে, তবু শিক্ষা নেই মথুরের। রোজ সন্ধ্যেয় একবার সে হানা দিতই।

বেশিদিন আর মথুরকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না যমুনা। যার রক্তে কামিনী পাড়ার বিষ মিশে আছে, কদ্দিন আর সে মধুরকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে!

একটি মাত্র পুরুষ ঘরে আসে যমুনার। মাত্র একজন পুরুষ। তাকে নিয়েই সে মেতে উঠল।

তিনকুলে কেউ নেই মথুরের। বউ না, ছেলে না, মা-বাপ-ভাই—কেউ না। মাছের কারবার আর যমুনা ছাড়া কেউ নেই তার।

মথুরের ওপর কেমন যেন মায়া পড়ে গিয়েছিল যমুনার। রোজ রোজ যে মানুষটা তার কাছে আসে, তার ওপর মায়া পড়াই তো স্বাভাবিক।

বর্ষার মরসুমটা আর কুঁকড়োহাটি যেত না মধুর। এই চিত্তিরগঞ্জেই কোন পাইকেরের আড়তে পড়ে থাকত।

এ-সময়টা নদীর ওপারে মাছ মেলে না। এপার থেকে মাছ কিনে শহরে চালান দিত মথুর।

পুরো দিনটা মাছের ধান্দাতেই কাটত।

সেবার খুব সুবিধে হয়ে গিয়েছিল মথুরের। পাইকেরের আড়তে কাটাতে হত না। যমুনার ঘরেই সে আস্তানা গেড়েছিল।

যমুনা বলত, 'হ্যাঁ গো মিনসে, তুমার তো তিনকুলে কেউ নি।'

'না।'

'কেউ যাখন নি, ত্যাখন আমার কাছেই থাক।'

'তোর কাচেই তো রইচি।'

'ত্যামন থাকা লয়। চেরকালের জন্যে থাক।'

পেট ভরে এন্তার তাড়ি গিয়েছিল মথুর সাঁইদার। নেশার মুখে সে বলেছিল, 'রইব, রইব। তোর কাচে না থাকলে থাকব কুথায়? যাত কাল পেরান রয়েছে, তোর কাচেই কাটাব যমুনো।'

সুখে, আনন্দে, সোহাগে উপচে পড়েছিল যমুনা। ফিস ফিস করে সে বলেছিল, আমার খুব সাধ, বিয়ে করি। সোয়ামি ছেলে-পুলে নিয়ে ঘরসংসার করি।

নেশার মুখে মধুর বলেছিল, 'বিয়েই হল আমাদের।'

'সত্যি?'

'সত্যি ভগবানের দিব্যি।'

যমুনার সব হল। ঘর হল, সংসার হল। এমন কি যা সে চেয়েছিল, অর্থাৎ জীবনে একটি মাত্র মরদ, তা-ও জুটল। এমন কি পেটে তার বাচ্চা এল।

সুখে বুকের ভেতরটা তির তির করে কাঁপত যমুনার।

তখন তার বয়েস আর কত। একেবারে কাঁচা বয়েস, ভরা বয়েস। জীবনের হাল-চাল-চরিত্র কতটুকুই বা বুঝেছিল যমুনা!

কথায় বলে, সুখের দিনের পরমায়ু বেশি দিন না।

একদিন যমুনা বুঝল, মথুর সাঁইদারের পিরীত মস্ত এক ধাপ্পা, বিরাট এক ফক্কিকার। বর্ষার মবসুম যেই কাটল, নদীর ঘোলা ঘোলা গেরুয়া জলে যেই টান ধরল, চিত্তিরগঞ্জ ছেড়ে মধুর সাঁইদার রওনা হল।

খুব কেঁদেছিল যমুনা। পুরো তিনদিন সে খায় নি। মথুরের পা ধরে কেঁদে কেঁদে সে বলেছিল, 'আমাকে ছেড়ে যেও নি।'

ভেঙিয়ে ভেঙিয়ে মথুর বলেছিল, 'খুব যে সতী হইচিস. বাজারে মাগির আবার সতীগিরি! পা ছাড়।'

একটা মরসুম একসঙ্গে কাটিযেই নেশা চটে গেছে মথুর সাঁইদাবের।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল যমুনা, 'আমাকে ছেড়ে যেও নি সাঁইদার। তুমার ছেলে রয়েছে আমার পেটে। তুমার এট্টুস মায়াও হয় না।'

অমন কত শ্যাল-কুকুব জন্মাচ্ছে রোজ! শ্যাল-কুকুরের জন্যে আবার মায়া।'

মথুর সাঁইদাবকে ঠেকিয়ে বাখা গেল না। চিত্তিরগঞ্জ ছেড়ে কুঁকড়োহাটি চলে গেল সে। যাবার সময় এক মরসুম এক সঙ্গে কাটাবার ফসল হিসেবে যমুনার পেটে একটা বাচ্চা রেখে গেল। সেই বাচ্চাই পদ্ম।

আসল কথাটা বুঝতে ভুল করেছিল যমুনা, কামিনী পাড়াব বাসিন্দের সঙ্গে এক রাত দু রাত, বড় জোর একটা মরসুম কাটানো যায়। এমন কি তার পেটে একটা বাচ্চার জন্মও দেওযা যায়। কিন্তু তাকে নিয়ে কেউ সাবাজীবন কাটায় না।

মথুর চলে যাবার পর একদিন পদ্ম জন্মাল।

পৃথিবীর নোংরামির সঙ্গে, কামিনী পাড়ার জীবনের সঙ্গে অনেক যুঝেছে যমুনা। কামিনী পাড়ার জীবনকে সে এড়াতে চেয়েছিল। কিন্তু পারল না।

পেট কোন কথা মানে না। পেট বড় অবুঝ। যত দিন পারত, কামিনী পাড়ার জীবনকে দূরে ঠেকিয়ে রাখত যমুনা। কিন্তু পেটের জ্বালা যখন অসহ্য হয়ে উঠত, তখন মাঝে মাঝে রাত্রির অন্ধকারে নেশাখোর কামটগুলোকে ঘরে এনে ঢোকাতে হত যমুনার। না ঢুকিয়ে উপায় থাকত না।

এমন করেই দিন-মাস-বছর এবং জীবন কাটছিল।

যমুনার অতীতটা মোটামুটি এই বকম।

## চার

বিলাস যখন এসে পৌঁছল, আসর বেশ জমে উঠেছে।

যমুনার ঘরের উঠোনে একটা গোলপাতার দোচালা। দোচালাটার বেড়া নেই। দো-চালাটার তলায় তিনটে হ্যারিকেন জ্বলছে। হ্যারিকেনের কাচগুলো অনেক কাল সাফ করা হয় নি। লালচে ধোঁয়া ধোঁয়া, মেটে মেটে আলোতে জায়গাটা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কেমন যেন আবছা আবচ্ছা, অস্পষ্ট।

দো-চালার তলায় ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে তিনজন। ফড়ে সুচাঁদ, কাপড়ের দোকানি ধনঞ্জয়, আর মাঝি লোটন—

মানুষের আকার বোঝা যায় কিন্তু লালচে, আবছা আলোতে তাদের চোখেব ভাষা, মুখের রং বোঝা যায় না।

মানুষগুলো দলা পাকিয়ে বসে রয়েছে। সবাব মাঝখানে যমুনা।

রোজই গানের আসর বসায় যমুনা। কোনদিন কীর্তন গায়, কোনদিন সখিসোনার গান।

রোজকার আসরে যমুনা হল মূল গায়েন। গলাটা তার ভারি মিঠে।

যমুনা সখিসোনার গান ধরেছে :

হেই পেরানি,<br>
সখির অঙ্গে রূপ এয়েচে,<br>
সখির পেরান খুব রসেচে,<br>
হেই পেরানি,<br>
হেই গোসানি।

কোত্থেকে যেন একটা খোল জুটিয়ে এনেছে ধনঞ্জয়। খোলে চাঁটি মারতে মাবতে মুখে সে আওয়াজ করে, 'টাটুম—টুটুম—টাটুম-টুটুম—'

সুচাঁদের কাঁধ পর্যন্ত লম্বা বাবরি চুল। চুল নেড়ে নেড়ে সে ঠেকো দেয় ;

হেই পেরানি,<br>
সেই গোসানি।

বয়েস হয়েছে যমুনার। হ্যারিকেনের আলোতে ঠিক চোখে পড়ে না। কিন্তু দিনের আলোতে বোঝা যায়, মুখের চামড়ার সরু সরু অনেক দাগ পড়েছে। সিঁথির দু-পাশ হাতড়ালে কালো চুলের ফাঁকে ফাঁকে রুপোর তার পাওয়া যাবে।

যৌবন এখনও পুরোপুরি মরে নি। কথায় বলে মেয়েমানুষের শরীর হল নদীর মত। ক্ষ্যাপা ঢলের পর মধ্যম ঋতুতে নদীতে টান ধরে। নদীতে তখন ধার নেই, মাতামাতি নেই। নদী তখন স্থির।

যমুনার জীবনে এখন মধ্যম ঋতু। আবাদের মানুষ দেখেছে, কাঁচা বয়সে তার কোমর ছিল চিকন, হাত-পা-গলা-বুক—সব কিছুর ছাঁচ ছিল সুঠাম। এখন শরীরটা ভারি হয়েছে। কোমরে অযথা চর্বি জমেছে। বয়েসের ভারে দেহ এখন থলথলে। জীবনে যৌবনে ভাটির টান ধরেছে।

সব কিছুতেই বয়েসের টান ধরলেও গলাটা কিন্তু প্রথম বয়েসের মতই মিঠে, সুরেলা আর তাজা আছে যমুনার। যমুনা গাইছে :

হেই পেরানি,
সখির অঙ্গ জ্বরজ্বর,
সখির পেরান থরথর—

গোলপাতার দো-চালাটার এক কোণে দাঁড়িয়ে যমুনাকে দেখল বিলাস, সুচাঁদকে দেখল, খোলঞ্চি ধনঞ্জয়কে দেখল; লোটনকে দেখল। কিন্তু কেউ তার দিকে তাকাল না, তাকে ডাকাল না।

পা টিপে টিপে, নিঃশব্দে, নিজের অস্তিত্ব কারুকে না জানিয়ে আসরে এসে বসল বিলাস। একপাশে এক জোড়া পেতলের করতাল পড়ে ছিল। তুলে নিয়ে বাজাতে শুরু করল, 'ঝমর-ঝমর-ঝম—'

গান-বাজনার খুব সখ যমুনার। রোজ সন্ধ্যেয় গোলপাতার ছাউনির তলায় সে আসর বসায়।

যৌবনে টান ধরার সঙ্গে সঙ্গে কেউ আর তার কাছে আসে না। তা ছাড়া কামিনী পাড়ার জীবনে তার আদৌ মোহ নেই।

রোজ সন্ধ্যেয় গোলপাতার ছাউনির তলায় যারা এসে জোটে, তার হল সুচাঁদ, ধনঞ্জয়, লোটন আর যাকে কেউ গ্রাহ্য করে না, যার দিকে কেউ তাকায় না পর্যন্ত, সেই বিলাস। চুপচাপ গুটিগুটি পায়ে আসরে ঢুকে করতাল বাজিয়ে যমুনার গানে ঠেকো দেয় বিলাস। তারপর গান যেই শেষ হয়, আসর যেই ভাঙে, সবার অলক্ষ্যে সে উঠে যায়।

সুচাঁদ-লোটন-ধনঞ্জয় আর বিলাস—এই চারজনকে নিয়ে যমুনার গানের আসর বসে। এর চেয়ে একজন বাড়তি নয়। বরঞ্চ মাঝে মাঝে কমে যায়। হয়ত লোটন এল না, কিংবা ধনঞ্জয় এল না, কিংবা সুচাঁদ এল না। কেউ না আসুক, গোলপাতার ছাউনির আসরে একজন ঠিকই হাজিরা দেবে। ঝড়-জল, বান-তুফান, ছয় ঋতু বারো মাস বিলাস আসবেই। এমন ভাবে সে আসবে আর এমন ভাবে যাবে, কেউ টের পাবে না।

আজ কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটল।

অন্য অন্য দিন বিলাসরা চারজন ছাড়া কেউ এ মুখো হয় না। আজ মাছের কারবারি যোগেন জানা এল, কাঠের পাইকের অবিনাশ ধাড়া এল।

যমুনা বলল, 'তুমরা?'

'হ্যাঁ আমরা—এলম। এসতে কী দোষ আচে নাকি?'

'না-না, দোষ কী। এখেনে কারো আসতে মানা নি।'

যোগেন জানা আর অবিনাশ ধাড়া আসার পর আসর যেন জমল না। তারা দুজন হ'ল বড় কারবারি—চিত্তিরগঞ্জের মস্ত মানুষ। তাদের দেখে সুচাঁদ, ধনঞ্জয়, লোটন আর বিলাসের হাত-পা পেটের ভেতর সেঁদুতে লাগল।

খোলে চাঁটি মারতে ভুল করতে লাগল ধনঞ্জয়। গানে ঠেকো দিতে গিয়ে গলায় কাঁপুনি ধরল সুচাঁদের। বিলাসের হাত আর চলে না; করতাল-জোড়া যেন মণ দুই ভারি।

এমন করে আসর চালানো যায় না।

একটু পরেই আসর ভাঙল। সুচাঁদ-ধনঞ্জয় আর লোটন চলে গেল। গোলপাতার ছাউনিটার তলায় মুখোমুখি বসল তিনজন। যোগেন জানা, অবিনাশ ধাড়া আর যমুনা। এক কোণে পড়ে রইল বিলাস। তাকে কেউ গ্রাহ্যেই আনল না; কোন দিন তাকে কেউ গ্রাহ্যেও আনে না। বিলাস যে হাত-পা-শরীরওলা একটা আস্ত মানুষ, এই মোটা দাগের সোজা কথাটা সবাই যেন ভুলে যায়।

যোগেন জানা আর অবিনাশ ধাড়া বলল, 'এদিক দিয়ে যাচ্ছিলম, তুমার গানের আওয়াজ পেয়ে ঢুকে পড়লম।'

যমুনা জবাব দিল না।

'বেড়ে গলা, মিঠেন গলা। কদ্দিন ধরে তুমার গলা শুনচি। চেরটাকাল তুমার গলা এক রকমই রইল।'

'রইল নাকি?'

দু-জনে হাঁ-হাঁ করে উঠল, 'রইল বলে রইল! তুমায় না দেখে কেউ যদি দূর ঠেঙে (থেকে) গান শোনে ভেরোম (ভ্রম) হয়।'

'কিসের ভেরোম (ভ্রম)?'

'মনে হয়, ডাকাবুকো যুবুতি মেয়ে গাইচে।'

'কী যে বলেন পাইকের!'

মুখ নামিয়ে অল্প একটু হাসে যমুনা। খুব আস্তে আস্তে বলে. 'সে বয়েস কী আছে! সে গলাই বা পাই কুথায়?'

যোগেন জানা আর অবিনাশ ধাড়া মাথা নাড়ে। বলে, 'সে তুমি যাই বলো, গলা তুমার এক রকমই আচে।'

একটু চুপ।

রাত বেশ গাঢ় হয়েছে। আকাশময় পেঁজা পেঁজা মেঘ হানা দিয়ে বেড়াচ্ছে।

গোলপাতার চালাটার ওপাশে একটা উঁচু ছাই-গাদা। সেখানে দুটো বেঁটে আকারের পেঁপে গাছ খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। পেঁপের লম্বা, সরস, সবুজ পাতাগুলো বাতাসে সরসর করছে।

ছাই-গাদাটার ওপর অন্ধকারকে আলোর সুঁচের মত বিঁধে বিঁধে জোনাকি জ্বলছে। জ্বলছে আর নিবছে।

যোগেন আর অবিনাশ উঠি-উঠি করেও ওঠে না। বলি-বলি করেও বলে না।

যমুনা বলল, 'রাত হয়েচে পাইকের, এবেরে ঘরে ফিরবেন তো।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঘরে তো ফিরতেই হবে। এখুনি উঠব। তুমি তো আর ঘরে রাখবে নি। হে-হে—,

খেঁকিয়ে খেঁকিয়ে দু-জনে হাসল।

ফিস ফিস করে যমুনা বলল, 'বয়েসের সে গোন মরে গেচে গো পাইকের। ঐ সবে অরুচি ধরে গেচে।'

'হে-হে, কী যে কও!'

খুব একচোট হেসে যোগেন জানা আর অবিনাশ ধাড়া বলল, 'উ সব কথা ছেড়ে দাও যমুনা। আসল কথায় এসো।'

'আসল কথা! সি আবার কী?'

যোগেনের চোখ দুটো পিট পিট করে। অবিনাশ খরখরে, কর্কশ জিভ বার করে পুরু কালো ঠোঁট দুটো চেটে নেয়। বলে, 'পদ্ম নাকি কাল এয়েচে?'

'কে বললে?' যমুনা চমকে উঠল।

'এ খপর কী কইতে হয়। ও আপনি রটে যায়।'

ঘাড় গোঁজ করে কিছুক্ষণ বসে রইল যমুনা। তারপর শুকনো, রুক্ষ গলায় বলল, 'ঘর যান পাইকেব।'

'যাব যাব। ঘর তো যাবই। তার আগে কথাটা সেবে নি।'

যোগেন টেরিয়ে টেরিয়ে চায়। অবিনাশ মোটা গোঁফে তা মারতে মাবতে বলে, 'পদ্ম যুটলে তাকে কী চেপে রাখা যায়। কারো না কারো চোখে পড়বেই। কারো না কারো নাকে তার বাস যাবেই।'

হঠাৎ লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল যমুনা। চেঁচাতে লাগল, 'যা যা, এক্ষুনি আমার ঘর থেকে বেরো। ঢ্যামনা ঘা গ্যা কুত্তার: এখেনে কী? মড়াখেগোর দল, শকুনির দল, কামটের পাল—ভাগাড়ে যা।'

অবিনাশ আর যোগেন উঠে পড়ল। শাস: ত শাসাতে বলল, 'বাজারে নাম লিখিয়েচিস। অত সতীগিরি কীরে মাগি—আচ্ছা, তোর তেল মজাবো।'

'যা ঢ্যামনারা, এক্ষুনি বেরো— দেরি করলে ঝ্যাঁটা মেরে বের করব।'

শাসাতে শাসাতে গজরাতে গজরাতে দু-জনে চলে গেল।

অনেকটা সময় কাটল।

হঠাৎ ক্ষেপে উঠেছিল যমুনা। উত্তেজনায় কপালের দু-পাশে সরু সরু রগগুলো দপ দপ করছে। দু হাতে টিপেও তাদের বাগ মানানো যাচ্ছে না।

দু হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে বসে আছে যমুনা।

কানের কাছে কে যেন ফিসফিসিয়ে উঠল, 'মাসি, হেই গো—'

যমুনা চমকে উঠল। বলল, 'কে রে?'

'আমি বিলেস।'

বিলাসকে দেখে চমকানি ভাবটা কাটল। যমুনা বলল, 'তুই কখন এসেচিস?'

'অনেক্ষণ। পাইকেরদের গান শোনালে। আমি কত্তালে ঠেকো দিলম।'

'অ'—সংক্ষেপে জবাব সেরে চুপ করে গেল যমুনা।

খানিকটা চুপচাপ। যমুনাই আবার শুরু করল, 'পদ্মর খপরটা কেমন করে রটল রে? তাকে তো লুকিয়ে এখেনে এনেছিলম। তুই কারুকে বলেচিস?'

'না মাসি। আমি কেন কইতে যাব। তুমি তো বারণ করলে। বিলাস বলতে লাগল, 'আমিও খপরটা বাজারে শুনলম।'

'কী শুনলি?'

'মদন ঢালি আমাকে শুদোচ্ছিল, 'শুনলম পদ্ম নাকি এয়েচে?' ত্যাখন আমি বললম, 'হ্যাঁ'।

চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল যমুনা, 'মদন ঢালির কানেও খপরটা উঠেচে?'

'তাই তো শুনলম।'

'হেই মা গোসানি।' যমুনা ককিয়ে উঠল।

## পাঁচ

পদ্মর দিকে চাইলে যমুনার বুকের ভেতর কাঁপুনি ধরে যায়। মেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। বড়ই না শুধু, রূপসী যুবতী হয়ে উঠেছে।

রূপকে বড্ড ভয় যমুনার।

ডাঙার কামটগুলো রূপের খোঁজ পেলে উপায় রাখে না। ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। এ হ'ল বাজার। বিকি-কিনির বাজার। বড় বিষম ঠাঁই।

যে বাজারের যে নিয়ম। কোন বাজারে মশলা বেচা-কেনা হয়, কোন বাজারে ধান-চাল, কোন বাজারে মাছ কি পান।

এই বাজারের রীতি আলাদা। এখানে মাংস বিকি-কিনি হয—মেয়েমানুষের শরীরের কাঁচা মাংস।

অন্য বাজারে বিকিকিনির রীতি অন্য। মাল একবাব বেচা হল তো হল। এক মাল দুবার বেচা যায় না। কিন্তু দেহ বেচাকেনার রীতি আলাদা। এখানে এক দেহ বার বার বিকোয়।

রীতি যাই হোক, বাজারে-বন্দরে যে একবার এসে পড়ছে, তাকে বিকোতেই হবে।

মেয়ের দিকে চেয়ে চেয়ে তাই যমুনার বুক থরথর করে।

কামিনী পাড়ার জীবনে যে কি সুখ, তা তো সারাজীবন ধবে বুঝেছে যমুনা। না না, মেয়েকে কামিনী পাড়ার নরকে ডুবতে দেবে না সে।

যখন পদ্ম ছোট ছিল, এত ভয় ছিল না। কিন্তু তার বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে যমুনার ভয় শুরু হল, ভাবনা শুরু হল।

বছর দুই আগে পদ্মকে ঘাটালে পাঠিয়ে দিয়েছিল যমুনা। সেখানে টগরের কাছে থাকত পদ্ম। মাস মাস খরচ পাঠিয়ে দিত সে।

টগর যমুনার সই। এককালে চিত্তিরগঞ্জের এই বাজারে রূপাজীবা ছিল টগর। রূপ, দেহ, যৌবন বেচত। সেই টগর হঠাৎ একদিন বদলে গিয়েছিল।

মানুষ ওপরটা দ্যাখে। চামড়া দ্যাখে, রূপ দ্যাখে, শরীর দ্যাখে। কিন্তু রূপের তলায়, চামড়ার তলায়, শরীরের ভেতর যে প্রাণ, তা দেখাব চোখ ক'জনের?

ধান-চালের বাজারে ফড়ের কাজ করত নকুড় রাণা। সে টগরের প্রাণের খোঁজ পেয়েছিল। পেয়েই তাকে নিয়ে ঘাটালে চলে গিয়েছিল। সেখানে গুরু-পুরুত সাক্ষী রেখে তাকে বিয়ে করেছিল।

সুস্থ, স্বাভাবিক, সংসারী জীবন পেয়ে বেঁচে গিয়েছিল টগব।

টগবের কাছে মেয়েকে রেখে নিশ্চিন্ত ছিল যমুনা। কামিনী পাড়ার দুঃসহ জীবন যাতে পদ্মকে ছুঁতে না পারে, তার সব ব্যবস্থা করেছিল টগব।

মেয়ের সম্বন্ধে কোন ভাবনাই ছিল না যমুনার। ঠিক হয়েছিল, একটা ভাল, সৎ, রোজগেরে ছেলে দেখে পদ্মর বিয়ে দেবে। কিন্তু সাধ মিটল না। আশা পূবল না যমুনার।

দিন তিনেক আগে পালা জ্বরে টগর মবেছে। টগর ছাড়া সংসারে দ্বিতীয় মানুষ নেই।

অগত্যা নকুড় কাল বাত্রে পদ্মকে তাব মায়ের কাছে রেখে গিয়েছে।

পদ্ম আসার পব থেকেই যমুনাব খাওয়া নেই, ঘুম নেই। তার ওপর ডাণ্ডার কামটগুলো এসে পদ্মর খোঁজ নিচ্ছে। ভাবনায়, চিন্তায় মাথাটা খারাপ হয়ে যাবার জো হয়েছে যমুনার।

## ছয়

চল্লিশটা সওয়ারি জুটিয়ে কুঁকড়োহাটিব বোটটা কোন রকমে ছেড়ে দিতে পারলেই বিলাস কাজ থেকে খালাস। এর পব তার অফুরন্ত ফুরসত।

ফুরসত থাকলে কোনদিন সে নদীর পাবে বসে বিড়ি ফোঁকে। কোনদিন এর-ওর-তার কাজ করে দেয়। কারো মাল টেনে দেয়, কারো মাছ বেচে দেয়, কারো তামাক সেজে দেয়। বদলে একটা পয়সাও পায় না বিলাস। একটু মিঠে কথা বললেই সে খুশি।

যারা কাজ করায়, তারা বলে —'তুই বড্ড ভাল বিলেস। তোর মত পেরান চিত্তিরগঞ্জে এট্টাও নি। দে ভাই, এই ধানের বস্তাটা এট্টু গুদোমে তুলে দে।'

তারা আড়ালে বলে, 'ব্যাটা পাঁটার বাচ্চা পাঁটা, আস্ত গরু—বোকা—'

আড়ালে যা খুশি বলুক সামনের মিঠে কথাটুকুতে গলে যায়।

একটু আগে কুঁকড়োহাটির বোটটা ছেড়ে চলে গেছে।

মদন ঢালির কাছ থেকে একটা টাকা মজুরি নিয়ে ট্যাকে গুঁজেছে বিলাস। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে বাজারের ভেতর দিয়ে চলেছে।

বাজারের চালাগুলো গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পুরোদমে বিকিকিনি, দরাদরি, কষাকষি চলছে। ফড়ে-দালাল-পাইকের-দোকানি আর খদ্দেরে চিত্তিরগঞ্জের হাট সরগরম হয়ে আছে।

মাছের পাইকের অমর্ত ডাকল, 'হেই বিলেস, ইদিকে শুনে যা দাদা—'

মসলার দোকানি হেমন্ত হাঁকল, 'বিলেস—হেই বিলেস—'

'আজ সময় নি।'

চায়ের দোকানের কুঞ্জ ডাকল, 'বিলেস—শোন মাইরি—'

'আজ হবে নি।'

কোন দিকে তাকাচ্ছে না বিলাস। ঘাড় গোঁজ করে লম্বা লম্বা পায়ে বাজারটা পেরিয়ে যাচ্ছে।

অবাক হয়ে অমর্ত দেখল, হেমন্ত দেখল, কুঞ্জ দেখল, চিত্তিরগঞ্জ বাজারের সবাই দেখল, বিলাস আজ বড় ব্যস্ত। আজ তার কোন দিকে তাকাবার সময় নেই।

যে মানুষটার সারাদিন অফুরন্ত ফুরসত, একটু মিঠে কথা বললে যে আগ বাড়িয়ে সবার ফুট-ফরমাশ খেটে দেয়, হঠাৎ তাকে ব্যস্ত হতে দেখলে, তার সময়ের অভাব হতে দেখলে অবাক হবারই কথা।

অমর্ত, কুঞ্জ আর হেমন্ত মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

হেমন্ত বলল, 'ব্যাপার কী?'

'কী জানি।' কুঞ্জ বলল।

'বিলেস অমন দৌড়তে দৌড়তে চললে কুথায?'

'কী জানি।'

'বড্ড কাজের লোক হয়ে গেল দেখচি।'

দু-হাত ঘুরিয়ে কুঞ্জ বলল, 'তাই তো দেখচি।'

## সাত

দৌড়তে দৌড়তে যমুনার বাড়ি চলে এল বিলাস। উঠোনেব মাঝখানে গোলপাতার চালা। তার তলায় দাঁড়িয়ে রইল।

বড় ঘরের দাওয়ায় একটা খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে বসে বযেছে পদ্ম। সুতো দিয়ে চটের আসন বুনছে।

গোলপাতার চালার তলা থেকে পদ্মকে ঠিকমত দেখা যায় না। গালের একটা দিক, সরু নাকটা, পিঠময় কালো কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, পায়ের ক'টি আঙুল, বড় বড় পালকে ঘেরা একটা চোখ, দুটো সাদা, নিটোল হাত—এর বেশি কিছুই চোখে পড়ে না।

দু বছর ঘাটালে ছিল পদ্ম।

ঘাটাল হল শহর-বন্দর জায়গা। সেখানকার ধরন-ধারণই ভিন্ন।

সেই ছোটবেলা থেকে পদ্মকে দেখছে বিলাস। মাঝখানে দু বছর খালি বাদ। এই দু বছরে ঘাটাল থেকে একেবারে আলাদা মানুষ হয়ে ফিরে এসেছে পদ্ম।

কত বড় হয়েছে পদ্ম! কত সুন্দর হয়েছে!

এখন তার কাছে যেতে গা কাঁপে। জিভে কথা জড়িয়ে যায়। হাতের তেলো দুটো ঘামে ভিজে ওঠে বিলাসের।

শহর-বন্দর থেকে একেবারে বদলে এসেছে পদ্ম। তার কথাবার্তায়, চালচলনে, ধরন-ধারণে এখন কত জেল্লা, কত জলুষ!

গোলপাতার চালার তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ পদ্মকে দেখল বিলাস। নাঃ, পদ্ম একবারও এদিকে ঘাড় ফেরাচ্ছে না। যমুনা মাসিকেও দেখা যাচ্ছে না।

কি করবে, বিলাস ভেবে উঠতে পারল না। একবাব ভাবল, নদীর পারেই ফিরে যাবে। আবার ভাবল, দেখি আর একটু।

বেশ খানিকটা পর ফর্সা, গোল ঘাড়টা কাত করে এদিকে তাকাল পদ্ম। দেখল, গোলপাতার চালার তলায় বিলাস দাঁড়িয়ে রয়েছে।

পদ্ম ডাকল, 'হ্যাঁ গো বিলেসদাদা—ইদিকে এসো।'

বিলাস সামনে এসে দাঁড়াল।

'কতক্ষণ এয়েচ?'

'অনেক্ষণ।'

'ওখেনেই দাঁড়িয়ে ছিলে?'

মুখে কিছু বলল না বিলাস। ঘাড় কাত করে সায় দিল।

পদ্ম আবাব বলল, 'আমায় ডাকলেও তো পাবতে।'

'তুমি কাজ করছেলে: তাই ডাকি নি।'

বেশ লোক—নাও বোসো দিনি।'

দাওয়ার এক পাশে পদ্মর ছোঁয়া বাঁচিযে কুঁকড়ি মেরে বসল বিলাস।

চটের আসনে নীল সুতো দিয়ে ফুল তুলতে তুলতে পদ্ম বলল, 'এই দুপুরবেলায় এযেচ—কিছু কথা আছে?'

'হ্যাঁ। যমুনা মাসি ডেকে পাঠিয়েছিল। তাই এয়েচি।'

'তবে তো তুমায় এট্টু সবুর করতে হবে।'

'কেন?'

'মা নদীতে চান করতে গেচে।'

কথা ক'টা বলে, চটেব আসনে পর পর ক'টা ফোঁড় বসাল পদ্ম। তারপর দাঁতে সুতো কাটল।

মুখোমুখি বসে আছে পদ্ম। সরাসরি তার মুখের দিকে তাকাতে পারছে না বিলাস। মুখ নিচু করে লুকিয়ে চুরিযে এক একবার পদ্মর মুখটা দেখছে।

আসন বুনতে বুনতে পদ্ম মুখ তুলল। বলল, 'কি গো বিলেসদাদা, চুপ করে বসে রইলে যে? কথা কইচ না কেন?'

'কী কইব!'

'হেই মা গোসানি! কি কইবে, আমায় শুধোচ্ছ!'

পদ্ম গালে একটা হাত রাখে। বলে, 'দুবচ্ছর পর চিত্তিরগঞ্জে এলম। এর ভেতর কুনো কথা জমে নি তুমার।'

'কী কথা জমবে!' বিলাসের গলাটা হতাশ শোনাল।

অল্প একটু হাসল পদ্ম। তারপর ছোট একটা হাই তুলল। তারও পর বলল, 'তুমি সেই একরকমই আছ বিলেসদাদা।'

বিলাস জবাব দিল না।

একদৃষ্টে বিলাসের দিকে তাকিয়ে রইল পদ্ম। বিলাস দু বছর আগেও যা ছিল, এখনও তাই আছে। লোকটার কোন হেবফের নেই, অদলবদল নেই। সেই শুয়োরের কুচির মত খাড়া খাড়া চুল, সেই খালি গা, মুখময় দাড়ি-গোঁফ, ভাঙা ভাঙা, ক্ষয়া ক্ষয়া নখ। আঁচড় কাটলে চামড়া থেকে খই ওড়ে। গায়ে বোঁটকা, বিটকেল গন্ধ।

বিলাস বুঝতে পারছে, একদৃষ্টে পদ্ম তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বুঝতে পেরে কুঁকড়ে গেল সে।

পদ্ম বলল, 'আজকাল কী করচ?'

'সেই কাজটাই করছি।'

'কী কাজ?'

'হেই যে কুঁকড়োহাটির বোটে সওয়াবি জোটাতুম। তাই জোটাচ্চি।'

'অ—'

একটু চুপ।

পদ্মই আবার বলল, 'কত মাইনে পাও?'

'তা অনেক।' উৎসাহে বিলাসের চোখ দুটো চকচক করতে লাগল। সে বলল, 'দু কুড়ি সওয়াবি জোটাতে পারলে পুরো একটাকা মজুরি পাই।'

'অ—' অস্ফুট একটা আওয়াজ করল পদ্ম।

বিলাসের উৎসাহ মরে নি। সে সমানে বকে যায়, 'মহাজোন বলেচে, একটা দুটো মাস গেলে আমায় বোটের মাঝি করবে। মাঝি হলে দিনে তিনটাকা মজুরি পাব।'

পদ্ম কিছু বলল না। তার হাতদুটো ফোঁড়ের পর ফোঁড় বসিয়ে চটের ওপর সুতোর নক্‌শা আঁকতে লাগল।

পদ্ম আর বিলাসের কথা কওয়া-কওয়ির ভেতরেই যমুনা ফিরে এল। নদী থেকে চান করে এসেছে। ভিজে কাপড় থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরছে।

যমুনা বলল, 'কখন এলি বিলেস?'

'অনেক্ষণ। তুমার জন্যে বসে রইচি। কেন, ডেকে পাঠিয়েচিলে কেন?'

'কইব, সব কইব।' এট্টু সবুর কর। আমি একটা শুখো কাপড় পড়ে আসি।'

যমুনা ঘরের ভেতর ঢুকল।

খানিকটা পর আবার বেরিয়ে এল যমুনা। মেয়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলল, 'হেই পদ্ম, তুই এখেন ঠেঙে (থেকে) যা দিকিনি। বিলেসের সঙ্গে কথা কয়ে নি।'

চটের আসন, সুঁচ আর সুতো নিয়ে ঘরের ভেতর চলে গেল পদ্ম।

যমুনা বিলাসের গা ঘেঁযে বসল। বলল, 'আমার একটা কথা রাখবি বিলেস?'

'কী কথা?'

'আগে বল্ রাখবি। ভগমানের দিব্যি!'

'ভগমানের দিব্যি, তুমার কথা রাখব।' একটু থেমে কি যেন ভাবল বিলাস। বলল, 'অমন কোরচ কেন মাসি? তুমার কুন কথাটা আমি রাখি না?'

'আমার মনে বড্ড লেগেচে। উই সুচাঁদকে বললম, উই ধনঞ্জয়কে বলল, লোটনাকে বললম। কেউ আমার কথাটা রাখল নি। কারুকে না পেয়ে তুকে ডেকে পাঠিয়েচি।'

যমুনার গলাটা ভারি শোনাল।

'কও, কী কথা রাখতে হবে?'

'একবার ডায়মনহারবার যাবি। শ্যাম গায়েনকে চিনিস?'

'চিনি।'

'তাকে খপর দিবি। আমার কথা কইবি। কইবি, যমনা মাসি তুমায় যেতে বলেচে। বুঝলি?'

ঘাড় কাত সায় দিল বিলাস। তারপরেই উঠে দাঁড়াল।

যমুনা বলল, 'সব কথা না শুনে দৌড়ুচ্ছিস যে? আগে সব বলে নি। পা পেতে বসে থির হয়ে শোন।'

অগত্যা বিলাস বসেই পড়ল।

যমুনা বলল, 'শ্যাম গায়েনকে সঙ্গে করে ধরে নে এসবি। বুঝলি?'

'বুঝলম।' বিলাস মাথা নাড়ল।

'এবেরে যা।'

বিলাস উঠে পড়ল। উঠোনের মাঝখানের চালাটার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। তারপব ঘুরে এসে বলল, 'যমুনা মাসি একটা কথা শুদোব (জিগ্যেস করব)?'

'শুদো না।'

'শ্যাম গায়েনকে কী দরকার?'

'পদ্মর বে দুবো শ্যামের সঙ্গে।'

বলতে বলতে গলাটা কেঁপে উঠল যমুনার, 'যত তাড়াতাড়ি পারি মেয়ের বে দুবো! নইলে কামটগুলোর কাছ ঠেঙে (থেকে) উবে বাঁচাতে পারব নি।'

একটু দাঁড়াল বিলাস। তারপর দৌড়তে দৌড়তে বেরিয়ে গেল।

## আট

দাওয়ার খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে বসে বসে ভাবছে যমুনা। আশায়-নিরাশায় তার বুকের ভেতরটা কাঁপছে।

এখন বিকেল।

দ্বিতীয় ঋতুর আকাশটা টুকরো টুকরো, হানাদার মেঘে আবছা হয়ে আছে। আকাশের রং এখন সীসের মত। মেঘের সঙ্গে যুঝে যুঝে যেটুকু আলো এসে পড়েছে, তাতে উঠোনের ওপাশের ছাইগাদাটা স্পষ্ট না।

জোর হাওয়া দিয়েছে। থেকে থেকে হাওয়াটা হিসিয়ে হিসিয়ে উঠছে। ছাইগাদার ওপাশে পেঁপের লম্বা লম্বা পাতাগুলো কাঁপছে।

পেঁপে পাতার কাঁপুনি যেন যমুনার বুকের ভেতর ছড়িয়ে পড়েছে। একবার আশা, একবার নিবাশা। একবার আলো, একবার ছায়া।

আশায় আর নিরাশায়, আলোর আর ছায়ায় বুকটা থরথর করছে যমুনার।

মন একবার বলছে, শ্যাম আসবে। আবার বলছে, না।

বসে বসে শ্যাম গায়েনের কথা ভাবছে যমুনা।

কেন আসবে না শ্যাম? নিশ্চয়ই আসবে। গায়ে যদি মানুষের চামড়া থাকে, কলজেতে যদি মানুষের বক্ত থাকে, তবে তাকে আসতেই হবে। না এসে কিছুতেই পারবে না শ্যাম।

দু তিন বছর আগের কথা মনে পড়ল যমুনার।

সেটা ছিল বছরের পঞ্চম ঋতু। পোষ মাস।

শীত হোক, গরম হোক, খুব ভোরে রাত থাকতে ওঠা যমুনার অভ্যেস।

শীতের ভোরটা কুয়াশা আর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। নদীর দিক থেকে হিম-হিম, কনকনে বাতাস ছুটেছিল। শীতের বাতাসের যেন দাঁত বেরোয়। আর সেই দাঁতগুলো শরীবের খোলা অংশে কেটে কেটে বসে।

খুব ভোরে ওঠার মতই ভোরে নদীতে চান করাও যমুনার অভ্যেস।

ঘর থেকে উঠোনে নেমেই চমকে উঠেছিল যমুনা।

আবছা অন্ধকার গাঢ় কুয়াশা ফুঁড়ে নজর চলে না। ঠিক বুঝতে পারছিল না যমুনা। আন্দাজ করেছিল, উঠোনের চালাটাব তলায় কে যেন কুঁকড়ি মেরে পড়ে রয়েছে।

লাফ মেরে দাওযায় উঠে পড়েছিল যমুনা। সেখান থেকে ঘরের ভেতর। ঘরে ঢুকে খিল এঁটে দিয়েছিল।

সেই ভোরে যমুনার নদীতে যাওয়া হল না।

সকালে অন্ধকার আর কুয়াশা কাটলে দরজা খুলে বাইরে এসেছিল যমুনা। যা সে আন্দাজ করেছিল, ঠিক তাই।

গোলপাতার চালাটার তলায় নোংরা কাপড় সারা গায়ে জড়িয়ে হাত-পা-মাথা একাকার করে, কুণ্ডুলি পাকিয়ে কে যেন শুয়ে আছে।

কাছে গিয়ে যমুনা দেখেছিল, বছর বিশ বাইশের একটা ছেলে। মুখটা দেখা যাচ্ছিল। খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ, চোখ দুটো বোঁজা। মুখখানা ঢলঢলে, ভারি মিষ্টি। হঠাৎ দেখলে বিশ বাইশ বছরের জোয়ান মনে হয় না। মনে হয় দশ বারো বছরের ছেলের মুখ।

শীতে কুঁকড়ে আছে ছেলেটা। দেখে ভারি মায়া হয়েছিল যমুনার। আস্তে আস্তে ডেকেছিল, 'হেই গো বাছা—হেই গো—'

বার কতক ডাকাডাকির পর ধড়মড় করে উঠে বসেছিল ছেলেটা। যমুনাকে দেখে সে চমকে উঠেছিল। থতমত গলায় বলেছিল, 'আমি—আমি—'

যমুনা বলেছিল, 'তুমি কাদের ছেলে গো? কুনোদিন তুমাকে তো বাপু চিত্তিরগঞ্জে দোখনি।'

যমুনার গলাটা ভারি নরম। নবম গলায় ছেলেটার ভয় কাটল। তখনও পুরোপুরি ঘুমটা ছোটে নি। দু হাতে চোখ রগড়াতে রগড়াতে সে বলেছিল, 'আমি এখেনকার লোক না। গেঁওখালি ঠেঙে (থেকে) এসেচি। রাত্তিরে কুথাও জাযগা না পেয়ে এখেনে শুয়েছিলম। এখুনি চলে যাচ্চি।'

'যাবে যাবে, যাবেই তো বাবা। সারারাত ঠাণ্ডায় কষ্ট পেলে। আমায় ডাকলেই তো পারতে। যাক সে কথা—'

যমুনা বলেছিল, 'এখেনে কুথায় এয়েচ?'

'কাজের খোঁজে এয়েচি। এখেনকার কারুকে চিনি না।'

'নাম কী তুমার?'

'শ্যাম—শ্যাম গায়েন।'

'বা, বড্ড ভাল নাম '

শ্যাম বলেছিল, 'এবেরে যাই।'

'এখন যাবে কুথায়?'

'দেখি, যদি কিছু কাজ জোগাড় কবতে পারি।'

শ্যাম উঠে পড়েছিল। গোলপাতার চালা ছেড়ে বাজারের দিকে পা বাড়াতে যাবে, সেই মুখে যমুনা ডেকেছিল, 'হেই বাছা, শোন—'

ঘুরে দাঁড়িয়েছিল শ্যাম। বলেছিল, 'কী কইচেন?

'যাবেই তো। পরের ছেলে তো আর ধরে রাখতে পারব নি। তা বাপু সারারাত চালায় তলায় ঠাণ্ডায় কষ্ট পেলে—তা এবেলা চাট্টি খেয়েই যেও।'

শ্যাম থেকে গেল।

সেই বেলাটাই শুধু না, আরো অনেক বেলা, অনেক দিন, অনেক মাস সে যমুনার কাছে কাটাল।

ঢলঢল মিষ্টি মুখ, লাজুক লাজুক স্বভাব—সবই কেমন যেন ভাল লেগে গিয়েছিল যমুনার। প্রথম দিন ঠাণ্ডায় কুঁকড়ি মেরে পড়ে থাকতে দেখে মায়া পড়েছিল। সেই মায়াটা আস্তে আস্তে একটা উষ্ণ স্নেহের রূপ নিয়েছিল।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শ্যামের সব খবর জেনে নিয়েছিল যমুনা। বাপ-মা-ভাই-বোন, সংসারে কেউ নেই শ্যামের। গেঁওখালিতে বিঘে পাঁচেক ধানের জমি ছিল। বানের তোড়ে নোনা জল ঢুকে মাটিকে নিষ্ফলা করে দিয়েছে।

পেট তো আর নোনা জলের বাহানা শুনবে না। পেটের তাগিদে কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে শ্যাম। গেঁওখালি থেকে চিত্তিরগঞ্জে এসেছে। এখানে যদি সুবিধে না হয়, সে কুঁকড়োহাটি যাবে। সেখানে কাজ না পেলে সিধে ডায়মন্ডহারবার।

আসল কথা, একটা কাজ তার চাই-ই।

যমুনা বলেছিল, 'কী কাজ কববে শ্যাম?'

'যা পাই।'

'যদি তুমায় একটা গোলদারি দোকান করে দি।'

চোখ দুটো চকচক করে উঠেছিল শ্যাম গায়েনের। বলেছিল, 'তা হলে আমি বেঁচে যাই মা।'

প্রথম দিন থেকেই যমুনাকে মা বলে ডাকতে শুরু করেছিল শ্যাম।

'ভাল কথা রে ছেলে, তাই দুবো।'

চিত্তিরগঞ্জের বাজারে গোলদারি দোকান খুলে দিয়েছিল যমুনা।

শ্যামের ব্যবসাব মাথা খুব পরিষ্কার। ছ-সাত মাসে দোকান বেশ জমে উঠল। বেশ লাভ হতে লাগল।

হাজার লাভ হোক, চিত্তিরগঞ্জে দোকানদারি করে শ্যামের মনে সুখ নেই। তাব নজর আরো উঁচুতে, আরো বড় কিছুতে।

একদিন সে মুখ ফুটে বলল, 'হেই গো মা, একটা কথা কইচিলম।'

'কী কথা?'

'এই চিত্তিরগঞ্জে দোকানদারি করতে ভাল লাগচে না।'

'তবে কী করবি বাপ?'

'তুমি যদি শ পাঁচেক টাকা দাও, ডায়মনহারবারে একটা হোটেল খুলে বসি। হোটেলের ব্যবসাতে অনেক লাভ।'

'বেশ, দোব টাকা। কিন্তুক—' বলেই থেমে গিয়েছিল যমুনা। অদ্ভুত করুণ একটু হেসেছিল।

'কিন্তুক কি মা?'

'ডায়মনহারবার গেলে তুই আমায় ভুলে যাবি।'

যমুনাব পা দুটো ধরে ছোট ছেলের মত মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে শ্যাম বলেছিল,

'কক্ষনো না মা, কক্ষনো না। তুমি আমার পেরান বাঁচিয়েচ। রাস্তায় ঘাটে না খেয়ে শুকিয়ে মরতম। তুমি আমার মা, তুমায় ভুলতে পারি?'

যমুনার টাকায় ডায়মণ্ডহারবারে হোটেল খুলে বসল শ্যাম। আগে আগে ফাঁক-ফুরসত পেলে চিত্তিরগঞ্জ চলে আসত। আজকাল হোটেল জমে গেছে। হোটেল থেকে নড়ার উপায় নেই তার।

ছ-সাত মাস হল, চিত্তিরগঞ্জে আসে নি শ্যাম।

একটু আগে দ্বিতীয় ঋতুর দিনটা মরেছে। সীসে রঙের আকাশটা আরো আবছা, আরো দুর্বোধ্য হয়ে গেছে। একটা ঝাপসা পর্দা নেমে এসে চোখের সামনের সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে।

উঠোনের ওপাশে ছাইগাদাটা আর দেখা যায় না। পেঁপে গাছ দুটো লম্বা হাত বাড়িয়ে থরথর কাঁপছে। পেঁপে গাছের থরথরানি যমুনার বুকের ভেতরও চলছে। আশায় নিরাশায় প্রাণটা কাঁপছে।

মন বলছে, শ্যাম নিশ্চয় আসবে। যদি সে না আসে? হেই ভগবান, হেই মা গোসানি। আসবে না কী? তাকে আসতেই হবে। যমুনা তার প্রাণ বাঁচিয়েছে। এই বিপদের মুখে সে তাকে বাঁচাবে না? নিশ্চয় বাঁচাবে।

মেঘ আরো ঘন, আরো গাঢ় হয়েছে। মাঝে মাঝে আকাশটাকে আড়াআড়ি ফেঁড়ে বিদ্যুৎ চমকায়। আকাশজোড়া বিরাট একটা মৃদঙ্গে গুরু গুরু ঘা পড়ে। কড় কড়-কড়াৎ— কানে তালা ধরিয়ে বাজ পড়ে।

বাজ আর বিজুরির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একসময় বৃষ্টি শুরু হল। ক্ষ্যাপা উত্তুরে বাতাসে বৃষ্টিটা বেঁকে যাচ্ছে। ঝড়ো বাতাস ছুটেছে সাঁই সাঁই।

ঘর থেকে পদ্ম ডাকল, 'ভেতরে এস মা।'

আশা-নিরাশার ঘোর লেগেছিল যমুনার মনে। হঠাৎ ঘোরটা কেটে গেল। আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে খিল এঁটে দিল যমুনা।

খানিকটা চুপচাপ।

ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। তেজী আলোতে ঘরটা ঝকমক করছে।

হঠাৎ যমুনা বলল, 'হ্যাঁ রে পদ্ম, সেই যে বিলেস কাল ডায়মনহারবার গেল, এখনো তো ফিরল নি।'

পদ্ম চুপ করে রইল।

'আমার মন বড্ড খারাপ গাইচে পদ্ম। শ্যাম বুঝি আসবে নি।'

এবারও কিছু বলল না পদ্ম।

অস্থির, অবুঝ গলায় যমুনা বলল, 'হেই পদ্ম, মুখ বুঁজে রইলি কেন?'

অস্ফুট গলায় পদ্ম বলল, 'কি কইব!'

## নয়

সারারাত ঝড়বৃষ্টি গিয়েছে।

নদীটাকে উথল পাথল কবে বিরাট বিরাট তুফান উঠেছিল। চিত্তিরগঞ্জের ওপর দিয়ে ক্ষ্যাপা বাতাস যেন ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছিল। আকাশটাকে ফালা ফালা করে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল।

নদীটা ফুলে ফুলে গজরাচ্ছিল।

ভোরে উঠে অভ্যেস মত নদীতে চান করতে এসেছিল যমুনা।

আজ নদীর ক্ষ্যাপামি অনেকটা মরেছে। কিন্তু তার আক্রোশ একেবারে পড়ে নি। কাল বিকেল থেকে আকাশটা সেই যে সীসের রং ধরেছিল, সেই রংটা এখনো ঘুচল না। এখনো আকাশের নীল দেখা গেল না।

এখনো পুব দিকটা খুব পরিষ্কার হয় নি। আকাশে একটা পাখি নেই, নদীতে একটা নৌকো নেই। ওপারটা ধু-ধু, আবছা, ঝাপসা।

দুই পারের মাঝখানে নদীটা কানায় কানায় ভরা। কখন যে নদী কানা ছাপিয়ে উপচে পড়ে চিত্তিরগঞ্জের বাজারটাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, কে বলবে।

তাড়াতাড়ি দুটো ডুব দিয়ে, গায়ে ভিজে কাপড় আর গামছা জড়িয়ে নদী থেকে পারে উঠে এল যমুনা।

বাজারের ভেতর দিয়ে পথ।

বাজারের মানুষ এখনো ওঠে নি। সারা রাত বৃষ্টি হয়েছে। ঠাণ্ডায় কাঁথা মুড়ি দিয়ে একটা নিটোল ঘুমে সবাই তলিয়ে আছে।

এখন বাজারে ফড়ে নেই, দালাল-দোকানি নেই, খদ্দের নেই। কোন শব্দ নেই। বাজারের চালাগুলো গা ঘেঁষা-ঘেঁষি করে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বৃষ্টিতে ভিজে পথ পিছল হয়ে রয়েছে। কাদা থকথক করছে। সাবধানে কাদা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে পা ফেলছে যমুনা।

টিনের আড়তগুলোর কাছে এসে শিউরে উঠল যমুনা।

পেছন থেকে কে যেন সরু, তীক্ষ্ণ গলায় ডাকছে, 'হেই যমুনো—হেই গো—'

গলার আওয়াজেই যমুনা বুঝতে পারল, মদন ঢালি।

এক মুহূর্তে থমকে দাঁড়াল যমুনা। তারপরেই হন্ হন্ করে পা চালিয়ে এগুতে লাগল।

পেছন থেকে সাপের মত হিসিয়ে উঠল মদন, 'হেই যমুনো, যাচ্চিস কেন? কথা আছে—যাস নে!

যমুনা দাঁড়াল না। উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে দৌড়তে বাজারের শেষ মাথায় এসে পড়ল।

কিন্তু কত দৌড়বে যমুনা! এক সময় খক করে তার হাতটা চেপে ধরল মদন। দাঁত বার করে খুব একচোট হাসল সে। বলল, 'সক্কাল বেলায় খুব ছোটালি যমুনো—দ্যাখ, ক্যামন হাঁপ ধরে গেচে।'

পাটকিলে রঙের পুরু, খসখসে জিভটা বার করে হাঁপাতে লাগল মদন।

'হাত ছাড় মহাজোন—'

এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিল যমুনা।

'কী হল কী?'

'আমি এ্যাখন ঘর যাব।'

'যাবি তো, আমি তোকে আটকে রাখব নাকি?'

এখনও হাঁপাচ্ছে মদন ঢালি। হাঁপানিব তালে তালে তাব বিবাট মাংসল ভুঁড়িটা অল্প অল্প দোল খাচ্ছে। নাকের ভেতর থেকে যে পাঁশুটে রঙের রোঁয়াগুলো বেরিয়ে পড়েছে, সেগুলো নড়ছে।

'আমি যাই।'

রুক্ষ, শুকনো গলায় বলল যমুনা। দাঁতে দাঁত চাপল। চোয়াল দুটো ভয়ানক দেখাল।

'যাবি—যাবি। তা অমন করচিস কেন?'

'কী করচি?'

'আমায় যেন চিনতেই পাবচিস না।'

'না, পারচি না। তুমাব সঙ্গে চেনাশোনা বাখা ঠিক না।'

মদন খ্যা খ্যা কবে খেঁকিয়ে খেঁকিয়ে খুব একচোট হাসল। তারপব বলল, 'ঘর যাবি তো?

'হ্যাঁ!'

'চ, তোকে এগিয়ে দি।'

'না।' গলাটা কেঁপে উঠল যমুনার। গলার কাঁপুনি মুহূর্তের মধ্যে তার হাত-পা-বুক— সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ল।

'কী হল?'

চোখ দুটো অর্ধেক বুঁজে অর্ধেক খোলা রেখে অদ্ভুত দৃষ্টিতে যমুনার দিকে তাকিয়ে রইল মদন ঢালি।

আগেব মতই কাঁপা, ডরানো গলায় যমুনা বলল, 'তুমার মতলব কী মহাজোন?

'মতলব আবার কী?

দু হাতের দশটা আঙুল ঘুরিয়ে নিপাট ভালমানুষের গলায় মদন বলল, 'কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, কুনো মতলব নি। শুধু তোকে তোর ঘর পয্যন্ত এগিয়ে দেওয়া। হে-হে—'

টেনে টেনে হাসতে লাগল মদন ঢালি।

'না না, তুমি যাও মহাজোন—তুমার পায়ে পড়ি।'

'বেশ যাচ্চি—'

মুখটা যমুনার কানে গুঁজে দিল মদন ঢালি। গুজ গুজ করে বলল, 'এ্যাখন তোকে ছেড়ে দিলম। তবে যাবো—দু-দশ দিনের ভেতরেই তোর বাড়ি যাব—'

বিরাট, মাংসল দেহটা দোলাতে দোলাতে মদন ঢালি চলে গেল।

কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। বুকের ভেতর কিসের যেন ঘা পড়ছে।

চোখের সামনে এখন সব অন্ধকার, সব ঝাপসা। কিছুই যেন শুনছে না যমুনা, কিছুই দেখছে না, কিছুই বুঝছে না।

কোন রকমে টলতে টলতে বাকি পথটুকু পার হয়ে বাড়ি ফিবল যমুনা।

## দশ

দুপুর পর্যন্ত ছটফট করে কাটাল যমুনা। খেল না, শুল না, কোন কাজে মন বসল না। দাওয়ার খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে উদাস চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

এখন মেঘ কেটে গেছে। সীসে রঙের আকাশটা আবার নীল হয়ে গেছে। তীব্র, ধারাল রোদে দেখা দিয়েছে। সেই রোদ এসে পড়েছে মুখের ওপর। চামড়া যেন পুড়ে যাচ্ছে। তবু হুঁশ নেই যমুনার।

যতবার মদন ঢালির কথা মনে পড়ল, যতবার তার চেহারাটা চোখের সামনে ভাসল, বিচিত্র এক ভয়ে কুঁকড়ে গেল যমুনা।

মদন ঢালির মত ধূর্ত, শয়তান সারা চিত্তিরগঞ্জে আর একটাও নেই। তার হাড়ে হাড়ে রগে রগে শয়তানি। পৃথিবীতে এমন কু-কাজ নেই, যা সে কবতে পারে না।

মদনকে কী আজ থেকে দেখছে যমুনা? সেই যেদিন চিত্তিরগঞ্জে এসেছে, সেদিন থেকেই দেখছে।

শয়তানির কাজে বুকটা এতটুকু কাঁপে না মদনের, হাতটা এতটুকু টলে না।

দিনটা আস্তে আস্তে বিকেলের দিকে গড়াতে লাগল।

এখনও বিলাস ফেরে নি।

যমুনার ভয় আর ভাবনা পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে লাগল।

'মা-মা—' খুব আস্তে নরম গলায় পদ্ম ডাকল।

আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে ছিল যমুনা। চমকে উঠল। তার গলা ফেঁড়ে কর্কশ, রুক্ষ আওয়াজ বেরুল, 'কে—কে—'

'আমি—আমি পদ্ম। কী হয়েচে তুমার? অমন কোরচ কেন?'

অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল পদ্ম।

খানিকটা ধাতস্থ হয়ে যমুনা বলল, 'ও তুই। আমি ভেবেছিলম—'

'কী ভেবেছিলে?'

নিজেকে সামলে নিল যমুনা। ফিস ফিস করে বলল, 'কিছু না, কিছু না। সে কথা তোর শুনতে হবে নি।'

পদ্ম পীড়াপীড়ি করল না।

যমুনা বলল, 'ডাকচিলি কেন? বল্—'

'খাবে না—ইদিকে বেলা যে গড়াতে চলল।'

পদ্মর কথা কানে গেল কি গেল না। একদৃষ্টে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল যমুনা।

এতদিন মেয়ের দিকে ভাল করে তাকায় নি যমুনা। আজ তাকাল। আর তাকিয়েই গায়ে কাঁটা দিল।

রূপ! তা রূপ বটে একখানা। যেন খা-খা করছে। যে দেখবে সে-ই এই রূপে পুড়তে চাইবে।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে শ্বাস আটকে আসতে লাগল যমুনার। বুকের ভেতর অসহ্য এক কান্না উঠে এসে গলার কাছে ডেলা পাকিয়ে গেল। হাজার ঢোঁক গিলেও কান্নাটাকে নামাতে পারল না যমুনা। কান্নাটা নামেও না, বারও হয় না। অনড় হয়ে আটকে থাকে।

পদ্মর দিকে চেয়েই আছে যমুনা। তার চোখের পাতা পড়ছে না।

পদ্ম উসখুস করে উঠল। বলল, 'অমন করে কী দেখছ মা?'

চোখ নামিয়ে যমুনা বলল, 'কিছু না, ও কিছু না।'

'খাবে চল—'

'না, আজ আর খাব না। শরীলটা ক্যামন যেন ম্যাজ-ম্যাজ করছে। তুই খেয়ে নে গে—'

'তুমি চল।'

'যা পদ্ম, বিরক্ত করিস নি। আমার খেতে ইচ্ছে কোরছে না।'

মায়ের থমথমে মুখ দেখে একটু যেন ভয়ই পেয়ে গেল পদ্ম। বেশি জেদ করল না। খালি মুখভার করে বলল, 'বেশ, তুমি না খেলে আমিও খাব নি।'

'না খাবি না খাবি, যা চোখের আড়ালে যা সব্বোনাশী। তোকে দেখলে আমার হাত-পা ভয়ে পেটের ভেতর সেঁদিয়ে যায়। যা—যা—'

একটুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল পদ্ম। কী দোষ করল, বুঝে উঠতে পারছে না। অথচ বিনা দোষে মা তাকে বকল। মায়ের ওপর ভীষণ রাগ হল পদ্মর। দুম দুম করে পা ফেলে ঘরে গিয়ে ঢুকল সে।

দাওয়ায় বসে বসে যমুনা ভাবতে লাগল, চারপাশের বেড়া আগুন থেকে কেমন করে সে পদ্মকে বাঁচাবে? ভেবে ভেবে দিশেহারা হয়ে পড়ল। মাথাটা বুঝি তার খারাপই হয়ে যাবে।

সন্ধ্যের মুখে মুখে ডায়মন্ডহারবার থেকে ফিরে এল বিলাস।

উঠোনোর দোচালাটার তলায় জড়াজড়ি করে বসে রয়েচে তিনজন। সুচাঁদ, ধনঞ্জয় আর লোটন।

দাওয়ার খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে চুপচাপ বসে আছে যমুনা। তিনটে হ্যারিকেন টিমিয়ে টিমিয়ে জ্বলছে। হ্যারিকেনের অনুজ্জ্বল আলোতে কিছুই স্পষ্ট না।

আজ আর আসর বসে নি।

বিলাসকে দেখে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল যমুনা। এদিকে-সেদিক তাকাতে লাগল। কিন্তু না, যাকে সে খুঁজছে, তাকে পাওয়া গেল না। একাই এসেছে বিলাস।

রুদ্ধশ্বাস গলায় যমুনা বলল, 'হ্যাঁ রে বিলেস, তুই একাই এসেচিস?'

মাথাটা নিচের দিকে নামিয়ে বিলাস ফিস ফিস করল, 'হ্যাঁ—'

বিলাসের সামনে এসে তার দু কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিল যমুনা। বলল, 'শ্যাম এল নি।'

'না।'

আর কিছু বলল না যমুনা। টলতে টলতে দাওয়ায় গিয়ে উঠল। খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে আগের মতই বসল।

তার মুখে জীবনের কোন লক্ষণ নেই। মনে হয়, মরা মানুষের মুখ। চোখে জেল্লা নেই। হাত দুটো এলিয়ে পড়েছে। অকৃতজ্ঞ পৃথিবীর কাছে নিদারুণ একটা ঘা খেয়ে একেবারে বোবা হয়ে গেছে যমুনা।

গুটি গুটি পায়ে যমুনার পাশে এসে দাঁড়াল বিলাস। খুব আস্তে ডাকল, 'হেই গো যমুনো মাসি—'

যমুনা সাড়া দিল না।

আবছা আবছা, ছেঁড়া ছেঁড়া অন্ধকারে যমুনার মুখটা ঠিকমত দেখা যায় না। একবার যমুনার দিকে তাকিয়ে নিজের খেয়ালে বকতে লাগল বিলাস, 'আমি অনেক করে বললম, অনেক করে বোঝালম, কিন্তুক শ্যামদাদা কিচুতেই এল নি। বললম, যমুনো মাসির খুব বিপদ। পদ্মকে তুমার সন্‌গে (সঙ্গে) বে দেবে। পদ্মর বে না হলে মাসির বিপদ কাটবে নি। শুনে খুব খারাপ কথা বললে—'

'কী বললে?' যমুনা চিৎকার করে উঠল।

বিলাস চুপ করে রইল। ধনঞ্জয়-লোটন আর সুচাঁদ,—তারা কী বুঝল, তারাই জানে। উঠে চলে গেল।

'চুপ করে রইলি কেন? কী বললে শ্যাম?' আবার চেঁচিয়ে উঠল যমুনা।

'সে বড্ড খাবাপ কথা।' তুমার শুনে কাজ নি মাসি।'

'বল্, তোকে বলতেই হবে। কী বলেচে শ্যাম?'

'শুনবেই তবে।'

যমুনা জেদ ধরল, 'শুনবই।'

'শ্যামদাদা বললে, অমুকের মেয়েকে বে করতে আমার বয়ে গেচে। যা-যা, ভাগ্। দূর দূর করে আমায় তাড়িয়ে দিলে।'

'ও'—অস্ফুট একটা শব্দ করল যমুনা।

কপালের দু-পাশে দুটো অবাধ্য রগ সমানে লাফাচ্ছে। জোরে টিপে ধরেও তাদের

বাগ মানানো যাচ্ছে না। বুকের ভেতর অসহ্য যন্ত্রণা। শ্বাস টানতে শ্বাস ফেলতে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে।

এখন রাত কত, কে বলবে।

দ্বিতীয় ঋতুর আকাশে উজ্জ্বল, গোল একটা চাঁদ দেখা দিয়েছে। ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। হারিকেন তিনটে জ্বলে জ্বলে কখন যে নিবে গেছে কে তার হদিস দেবে।

এক নাগাড়ে খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে বসে ছিল যমুনা। পিঠটা ব্যথা হয়ে গিয়েছে। একটু পাশ ফিরে বসতে গিয়েই তার চোখে পড়ল, গোলপাতার চালাটার তলায় দুই হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসে রয়েছে বিলাস।

যমুনা ডাকল, 'হেই বিলেস, এখনো যাস নি?'

হাঁটুর ফাঁক থেকে মাথা তুলে খাড়া হয়ে বসল বিলাস। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলল, 'না মাসি, যাই নি।'

কি যেন একটু ভাবল যমুনা। তারপর বলল, 'যাস নি, ভালই করেচিস। ইদিকে আয়।'

গোলপাতার চালার তলা থেকে দাওয়ায় উঠে এলে বিলাস। বলল, 'কী কইচ?'

একেবারে ভেঙে পড়ল যমুনা, 'কী করি বল দিকিনি বিলেস। ভেবে ভেবে তো কূল পাচ্চি না। ইদিকে কী হয়েচে জানিস?'

'কী?'

'মদন ঢালির সন্‌গে (সঙ্গে) দেখা হয়েচিল। সে বলেচে, দু-দশ দিনের ভেতরেই আমার এখেনে আসবে।'

'সব্বোনাশ'—বিলাস আঁতকে উঠল।

'সব্বোনাশ বলে সব্বোনাশ' ভয়ে আমার হাত-পা পেটের ভেতর সেঁদিয়ে গেচে।'

বিলাসের দু-হাত ধরে কাঁদতে লাগল যমুনা, 'কী করব, আমায় একটা পরামশ্য দে দিকিনি বিলেস। মেয়েটাকে কেমন করে বাঁচাই?'

বিলাস বলল, 'একটা কথা ভাবছিলম মাসি। কইব?'

'বল্—'

'রাগ করবে নি।'

'না-না, তুই বল্—'

'একবার কুঁকড়োহাটি যাব?'

'কেন?'

'পদ্মর বাপ মথুর সাঁইদারকে কইব, তুমার মেয়ে বড় হয়েচে। এবেরে তার বে'র জোগাড় কর। নইলে চার ধারে অনেক শ্যাল-কুকুর আচে।'

অনেক, অনেকদিন পব মথুর সাঁইদারের কথা মনে পড়ল। এখনও মথুরের জন্য

যমুনার প্রাণের ভেতর খানিকটা তাপ আছে। নইলে তার কথা ভাববার সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুগুলো অমন ঝঙ্কার দিয়ে উঠবে কেন?

চোখ দুটো চকচক করল যমুনার। সে ভাবল, মেয়ে বড় হয়েছে। একবার যদি মথুর পদ্মকে দ্যাখে, নিশ্চয় তার মায়া পড়ে যাবে।

খুব আস্তে অথচ ব্যগ্র গলায় যমুনা বলল, 'যা বিলেস, যা। তুই কুঁকড়োহাটিই যা। যার মেয়ে তাকে ধবে আন। তার হাতে তার মেয়ে দিয়ে আমি নিচ্চিন্ত হই। যা বিলেস, কাল ভোরেই চলে যা!'

## এগারো

আজও মদন ঢালির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

চাল-ডাল তেল-মশলা কিনতে বাজারে গিয়েছিল যমুনা।

মানুষের চোখ না তো শকুনের চোখ; শয়তানেব চোখ। আডত থেকে ঠিক ঠিক যমুনাকে দেখে ফেলেছে মদন ঢালি। আর দেখার সঙ্গে সঙ্গে হিসেবেব খাতাটা বেঁধে, নোট আর রেজগিগুলোকে টিনের বাক্সে পুরে তালা এঁটে দৌড়তে দৌড়তে যমুনার পাশে এসে দাঁড়াল।

গোলদারি দোকানে জিনিস কিনছিল যমুনা।

মদন ঢালি ডাকল, 'হেই যমুনো—'

ঘুরে মনদনকে দেখে আঁতকে উঠল যমুনা, 'তুমি!'

'হ্যাঁ, আমি।'

মদন ঢালি বলতে লাগল, 'আড়তে বসে দেখলম, তুই জিনিস কিনচিস।'

'অমনি চলে এলে?'

'তা এলম।'

মদন ঢালি খ্যা-খ্যা করে হাসতে লাগল। হাসির তালে তালে তার ভুঁড়িটা দোল খাচ্ছে। ঢিবির মত নাকটা ফুলে ফুলে উঠছে।

নীরস গলায় যমুনা বলল, 'ষ্যামন এসেচ ত্যামন ফেবত যাও।'

'ফেরত যাবার জন্যে তো আসি নি।'

হঠাৎ গলাটা নামিয়ে মদন ঢালি বলল, 'চ, ওধারে যাই। নিরিবিলিতে তোর সন্‌গে (সঙ্গে) একটা কথা আচে।'

জিনিস-পত্তর বুঝে নিয়ে দাম দিতে যাবে যমুনা, খপ করে তার হাতটা চেপে ধবল মদন ঢালি। বলল, 'ও দামটা দিতে হবে নি।'

'কেন?'

'আমি দে দোব।'

এক ঝটকায় মদনের হাত থেকে নিজের হাতটা ছুটিয়ে নিয়ে কর্কশ, রুক্ষ গলায় যমুনা বলল, 'চালাকি কোরো নি মহাজোন। দাম দিতে দাও।'

মুখটা কপট কাঁচুমাচু কবে মদন ঢালি বলল, 'দাম তা হলে দিতে দিবি না?'

'না।'

'দিতে দিলেই ভাল করতি।'

একটা কথাও বলল না যমুনা। হিসেব করে দোকানিকে দাম চুকিয়ে হন্ হন্ করে হাঁটতে শুরু করল।

সঙ্গে সঙ্গে মদনও চলল।

বাজার পেরিয়ে একটা নিরিবিলি ঘাসেব মাঠ। তারপর যমুনাব ঘর।

মাঠে এসে মদন ঢালি বলল, 'অত জোর জোর হাঁটচিস কেন যমুনো?'

ঘুরে দাঁড়িয়ে যমুনা মুখিয়ে উঠল, 'তুমি আমার পেছু লেগেচ কেন মহাজোন? কী করেচি তুমার?'

মদন ঢালি কিছু বলল না।

একটু চুপচাপ। তারপর মদন বলল, 'ক'দিন ধরে খুব কাজের চাপ পড়েচে। তাই তোব ওখেনে যেতে পারচি না। তবে যাবো, শিগগিরই একদিন তোর বাড়ি হাজির হব।'

'না-না মহাজোন. তুমি এসো নি—তুমাব পায়ে ধবচি।'

'অমন কচ্চিস কেন যমুনো? অমন পব-পব ভাবচিস কেন? আগে তো তুই এমন ছিলি নি।'

'আগেব দিনেব কথা ভুলে যাও মহাজোন। আমায এট্টু শান্তিতে বাঁচতে দাও।'

'বেশি ঘ্যানব ঘ্যানর কবিস নি যমুনো। শুনলম—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল মদন ঢালি।

'কী শুনলে?'

'যা শুনলম তা দেখতেই তো তোব বাডি যাব। হে-হে—'খেঁকিয়ে খেঁকিয়ে হাসতেই লাগল মদন ঢালি। বলল, 'এ্যাখন যাই বে যমুনো। অনেক্ষণ আড়ত ঠেঙে বেরিয়িচি। ঠিক যাব একদিন--সু'বদে পেলেই যাব।'

দুলতে দুলতে চলে গেল মদন ঢালি।

## বারো

ভযে ভাবনায মাথাটা বুঝি খাবাপই হয়ে যাবে যমুনাব।

এখন দুপুর। দ্বিতীয় ঋতুব আকাশে পেঁজা পেঁজা ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ জমেছে। মেঘেব সঙ্গে যুঝে যুঝে খানিকটা নিরুত্তেজ, অনুজ্জ্বল রোদ এসে পড়েছে।

উঠোনের ওপাশে ছাইগাদা। ছাইগাদাব ওপব এক জোড়া যমজ পেঁপে গাছ। পেঁপে গাছের মাথায় বসে একটা ঘুঘু থেকে থেকে করুণ, বিষণ্ণ আওয়াজ করে একটানা ডেকে চলেছে।

উনুনে ভাত চাপিযে গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে আছে যমুনা।

মেঘে মেঘে পূবের আকাশটা ঝাপসা হয়ে আছে। সেদিকে চেয়ে আছে যমুনা। ঘুঘুর বিষণ্ণ, করুণ ডাক কানে আসছে।

মেটে হাঁড়িতে ভাত ফুটছে। হাঁড়িটার মতই যমুনার প্রাণের ভেতরটা টগবগ করছে।

একধারে বসে আনাজ কুটছে পদ্ম। হঠাৎ তার দিকে তাকাল যমুনা। ভাবল, পৃথিবীর নোংরামি আর শয়তানির হাত থেকে কেমন করে সে মেয়েকে বাঁচাবে।

ভাবতে ভাবতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল যমুনা।

আনাজ কুটতে কুটতে মুখ তুলল পদ্ম। মায়ের দিকে তাকিয়ে তার হাত থেমে গেল। ডাকল, 'মা—'

'কী কইচিস?'

'তুমি য্যাখন ত্যাখন অমন করে আমাব দিকে চেয়ে থাক কেন বলো দিকি?'

'কেন যে চেয়ে থাকি, তুই বুঝবি নি পদ্ম।'

'বুঝব, তুমি বলো।'

বঁটি আর আনাজ রেখে যমুনাব পাশে এসে বসল পদ্ম।

যমুনা হঠাৎ এক কাণ্ড করল। দুই হাঁটুর ফাঁকে মুখটা গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

'হেই মা, হেই গো—'

আঙুল দিয়ে যমুনার হাতে আস্তে আস্তে ঠেলা দিতে লাগল পদ্ম।

যমুনা মুখ তুলল না। কান্নাভরা, ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, 'কী কইচিস?'

'অমন কাঁদচ কেন মা? কী হয়েচে?'

'এমনি এমনি কী কাঁদচি! আমার কপাল কাঁদাচ্চে।'

যমুনার ফোঁপানি একটু একটু কবে বাড়তেই লাগল।

খানিকক্ষণ যমুনার ফোঁপানির আওয়াজ শুনল পদ্ম। তারপব খুব নরম গলায় বলল, 'কী হয়েচে মা, বলবে তো?'

'সে কথা বলা যাবে নি পদ্ম। বড্ড নোংরা কথা। তুই শুনতে চাস নি মা।' একটু থামল যমুনা। মুখ তুলল। চোখের জলে ভুরু, গাল, চোখ মাখামাখি হয়ে আছে। একটা হাত বাড়িয়ে পদ্মকে নিজের দিকে টেনে নিল। আস্তে আস্তে বলল, 'উপায নি, উপায নি—'

'কিসের উপায় মা?'

'এই তোর কি আমার ভালভাবে বাঁচার।'

'কেন?' অবুঝ গলায় শুধলো পদ্ম।

'পিরথিমীটা ভত্তি খালি কামট, কেন্নো আর মড়াখেগো শকুনির পাল। একটু থামল যমুনা। আবার বলল, আমাদের বাঁচার উপায় নি।'

'আমরা কী দোষ করেচি মা—'

'জানি না পদ্ম, জানি না।'

অনেকক্ষণ কেউ কথা বলল না। না পদ্ম, না যমুনা।

কখন যে দু-জনের অজান্তে ভাতে পোড়া লেগেছিল। পোড়া ভাতের বোটকা গন্ধে হুঁশ ফিরল।

তাড়াতাড়ি হাঁড়িতে খানিকটা জল ঢেলে দিল যমুনা।

বলল, 'অনেক বেলা হয়ে গেচে পদ্ম। আর দেবি করিস নি। হাত চালিযে আনাজ কটা কেটে কুটে দে। খেতে খেতে বেলা হেলে যাবে।'

'দিচ্চি মা।'

পদ্ম বঁটি আব আনাজ নিয়ে বসল।

## তেবো

ঘাটাল থেকে পদ্ম যেদিন চিত্তিরগঞ্জে এসেছে, সেদিন থেকেই বুকেব থরথরানি শুরু হয়েছে যমুনার। সেই থরথরানিটা তার বেড়েই চলেছে।

পদ্মর দিকে যতবার সে তাকাচ্ছে, যতবাব মদন ঢালিব কথা মনে পডছে, ততবরাই গাযে কাঁটা দিচ্ছে যমুনার।

একটু পবেই সন্ধ্যে নামবে। তাবই আযোজন চলছে।

দ্বিতীয় ঋতুব দিনটা চোখের সামনে ক্ষযে ক্ষযে একসময় নিবে গেল।

গোলপাতার চালাটাব তলায় বসে ছিল যমুনা। তার মনেব ওপর অনেকগুলো মানুষ, অনেকগুলো ভাবনা ছায়া ফেলছিল।

প্রথমেই শ্যাম গায়েনের কথা ভাবল যমুনা। মানুষ যে এত অকৃতজ্ঞ, এত নিমকহাবাম হয়, সমস্ত জীবনে এই প্রথম বুঝল সে। আর বোঝাব সঙ্গে সঙ্গে এক যন্ত্রণা তাকে বিকল কবে ফেলল।

যন্ত্রণা বুঝি নেশার মতই মানুষকে বুঁদ করে রাখে।

অশেষ, অফুবন্ত যন্ত্রণায় বুঁদ হযে ও'ছে যমুনা।

মথুর সাঁইদারের কথা মনে পড়ছে। মথুব কি আসবে না? মথুর কি বিলাসকে ফিরিয়ে দেবে?

যদি ফিরিয়ে দেয়, কী করবে যমনা? পদ্মকে কেমন কবে বাঁচাবে?

অবিনাশ আব যোগেন তাকে শাসিযে গিয়েছে। বলে গিযেছে, তাকে দেখে নেবে। মদন ঢালি বলেছে, দু-চাব দিনের মধ্যেই সে তার বাড়ি আসবে।

কথাগুলো যতই ভাবল, অদ্ভুত এক ভয় চাবপাশ থেকে যমুনাকে ঘিরে ধরতে লাগল।

বোদ অনেক আগেই মবেছে। ধোঁয়ারঙেব আবছা আবছা একটা পর্দা নেমে এসেছে।

দ্বিতীয় ঋতুর আকাশে টুকরো টুকরো, পাটকিলে বঙেব মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে সবালি পাখি উড়ছে।

হঠাৎ যমুনার খেযাল হল, বাল বিলাস কুঁকড়োহাটি গেছে। এখনও ফেরে নি।

সে ভাবল, মথুর সাঁইদার যদি ফিরিয়ে দিত, তা হলে এতক্ষণে ফিরে আসত বিলাস। নিশ্চয়ই মথুর আসবে। কাজের মানুষ। হাতের কাজ গুছিয়ে তবে তো আসবে।

মথুর না এসে কি পারে? তার জন্যে না থাক, নিজের মেয়ের জন্যে তার টান থাকবেই।

আশায় আশায় বুক বাঁধল যমুনা।

ধোঁয়ারঙের যে পর্দাটা নেমে এসেছিল, সেটা আরো ঘন আরো গাঢ় হয়ে সব কিছুকে অস্পষ্ট করে দিচ্ছে।

এখন আকাশটা দেখা যায় না, মেঘ বোঝা যায় না। সরালি পাখিগুলো অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

কোন দিকে নজর নেই যমুনার। সে ভাবছে, মথুর সাঁইদার এলে পদ্মর বিয়ের ব্যবস্থা করবে।

অদ্ভুত একটু সুখে, অদ্ভুত একটু আনন্দে বুকের ভেতরটা তির তির কবে কাঁপতে লাগল। যমুনাব।

হঠাৎ খচখচ করে শব্দ হল। চমকে ঘুরে বসল যমুনা। চেঁচিয়ে উঠল, 'কে, বিলেস এলি?'

'না মাসি, আমি ধনঞ্জয়––'

'আয়।'

ধনঞ্জয় পাশে এসে বসে পড়ল। বলল, 'হাবকেল (হ্যাবিকেন) জ্বালো নি?'

'না।'

'আজ আসর বসবে নি?'

'না।'

ধনঞ্জয় চুপ করে বসে রইল।

আবো খানিকটা পর আবার পায়ের আওয়াজ হ'ল।

যমুনা চমকে উঠল, 'কে—কে এলি—বিলেস?'

'না মাসি, আমি লোটন।' এগিয়ে আসতে আসতে লোটন বলল, 'এই আঁধারে বসে রয়েচো যে?'

যমুনা জবাব দিল না।

ধনঞ্জয়ের গা ঘেঁযে বসল লোটন।

আরো খানিকটা পর সুচাঁদ এল।

ধনঞ্জয়, লোটন আব সুচাঁদ—অন্ধকারে তিনজনে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসল। ফিস ফিস করে তিনজনে কথা কওয়া-কওয়ি শুরু কবল।

'মাসির হল কী?'

'কথা কইচে না কেন?'

'আজ আসর বসবে নি?'

সবাই প্রশ্ন করল। কিন্তু জবাব দেবার কথা যার, সে-ই মুখ বুঁজে রইল।

বেশ খানিকটা রাত করে কুঁকড়োহাটি থেকে ফিরে এল বিলাস।

ধনঞ্জয়রা এখনও যায় নি।

গুটি গুটি পায়ে গোলপাতার চালাটার তলায় এসে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল বিলাস।

'কে, বিলেস?'

যমুনা উঠে দাঁড়াল।

'হ্যাঁ'—বিলাসের গলাটা শোনা গেল কি গেল না।

ফিস ফিস করে যমুনা বলল, 'তাকে এনেচিস?'

'না।' বিলাসের গলায় অস্ফুট একটা আওয়াজ ফুটল।

হঠাৎ ক্ষেপে উঠল যমুনা 'কেন, কেন তাকে আনলি নি? কী জন্যে তোকে পাঠিয়ে ছিলনু?'

মথুর সাঁইদার আসে নি, সে দোষ যেন বিলাসের। ঘাড় নামিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে।

'হেই ভগমান, এখন আমি কী করি? আমি বাঁচব ক্যামন করে?

যমুনা অস্থির হয়ে উঠল। টেনে টেনে নিজের চুল ছিঁড়ল। দুম দুম করে বুকে কিল মারতে লাগল। তারপর বিলাসের দু-কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, 'কেন, কেন তাকে আনলি নি কুকুর?'

ভয়ে ভয়ে বিলাস বলল, 'সাঁইদের যে এল নি।' আমায় নাথি মারতে মারতে তাড়িয়ে দিলে। আমি বললম, তুমার মেয়েকে নিয়ে যমুনা মাসি বড্ড বিপদে পড়েচে। সাঁইদের দাঁত খিঁচিয়ে উঠলে বললে, রাস্তার শ্যাল-কুকুর আমার মেয়ে। যা ভাগ্‌—একবার মেয়ের নাম করেচিস তো, পিঠের ছাল তুলে নোব।

'মিছে কথা, সব মিছে কথা। তুই বানিয়ে বানিয়ে বলচিস।'

নিজেকে আঁচড়াল, কামড়াল যমুনা। চুল ছিঁড়ল। অস্থির, অবুঝের মত নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলল। ফুলে ফুলে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ডাক ছেড়ে কাঁদল। কেঁদে কেঁদে হয়রান হয়ে একসময় ভেঙে পড়ল, 'আমি এখন কী করব? ক্যামন করে মেয়েকে বাঁচাব?'

ধনঞ্জয়-লোটন-সুচাঁদ জড়াজড়ি করে বসে রইল। মাথা নিচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল বিলাস।

অনেক রাত্রে কাঁদার পর মনের অস্থির ভাবটা অনেকটা কাটল। মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবল যমুনা।

কয়েকদিনের মধ্যেই মদন ঢালি তার বাড়ি আসবে। তার আসার আগেই মেয়েকে বিয়ে দেবে যমুনা।

হঠাৎ তার চোখ পড়ল, ধনঞ্জয়রা জড়াজড়ি করে বসে রয়েছে।

যমুনা ডাকল, 'হেই ধনা—'

'কী কইচ মাসি?'

'আমার একটা কথা রাখবি বাপ?'

'কী কথা?'

'পদ্মকে তুই বে কর—'

'কী যে বল মাসি! তা কখনো হয়! আমার বাপ-মা-ঘর-সোমসার আচে। বাজারের মেয়েকে ঘরে নে তুলব ক্যামন করে? লোকে গায়ে যে থুথু ছিটোবে।'

'যা-যা, কুকুর, বেরো এখেন ঠেঙে—'

মাথা নামিয়ে ধনঞ্জয় চলে গেল।

একটু কি ভাবল যমুনা। তারপর ডাকল, 'হেই বাপ লোটনা—'

'কী কইচ?'

লোটনের দু-হাত ধরে যমুনা করুণ গলায় বলল, 'আমায় আর পদ্মকে বাঁচা বাপ। পদ্মকে তুই বে কর।'

'না মাসি, তা হয় না।'

লোটন চলে গেল।

কিছু বলার আগেই সুচাঁদ পালাল।

তার পাশে কেউ নেই। তাকে বাঁচাবার মত এতবড় পৃথিবীতে একটা মানুষও নেই। কোথাও যেন একটু আলো নেই, একটু হাওয়া নেই। শ্বাসটা আটকে আটকে আসছে যমুনাব। নিরন্ত অন্ধকারে চোখদুটো যেন অন্ধ হয়ে যাবে।

গোলপাতার চালার তলায় সারাটা রাত কাটিয়ে দিল যমুনা।

এখন ভোর। অন্ধকার কেটে কেটে পুব দিকটা ফরসা হতে শুরু করেছে।

হঠাৎ যমুনার চোখে পড়ল, মাথা নিচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে বিলাস।

যমুনা বলল, 'তুই দেঁড়িয়ে আচিস যে? যাস নি এখনো?'

'না।'

'যা, ভাগ এখেন থেকে।'

'না।' ফিস ফিস করে বিলাস বলল, 'সবাই তো চলে গেল। আমি গেলে তুমায় আর তুমার মেয়েকে বাঁচাবে কে?'

'তুই—তুই আমাদের বাঁচাবি বিলেস?'

বিলাস জবাব দিল না।

বিলাসের দুহাত ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল যমুনা। অদ্ভুত এক আবেগে তাব শরীরটা থরথর করতে লাগল।

*আশ্বিন, ১৩৬৬*

# অনুবাদ সাহিত্য

# বাঈজি

(চেকভের গল্পের অনুবাদ)

অনুবাদক—হাসুবানু

পাশা। সুন্দরী যুবতী। কোকিল-কণ্ঠি। একদিন সে তার প্রেমিক নিকোলাই পেট্রোভিচ্ কলপোকভের সঙ্গে শহরতলীর গ্রীষ্মাবাসে বাইরের ঘরে বসে আছে। গুমট গরম। একটু আগে পেট্রোভিচ কলপোকভ্ দুপুরবেলার খাওয়া-দাওয়া সেবেই সস্তা দামের এক বোতল মদ শেষ করেছে। মন তার বিস্রস্ত। শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ কবছে। পাশা ও কলপোকভ্ উভয়েই বিরক্ত হয়ে উঠেছে। এই গরমটা গেলেই ওরা বেড়াতে বেরোবে।

সেই সময় হঠাৎ দরজায় কড়া নড়ার শব্দ শোনা যায়। কলপোকভ কোট খোলা অবস্থাতে লাফ দিয়ে উঠে স্যান্ডেলটা পায়ে দিতে দিতে পাশার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়:

নিশ্চয়ই পিওন, অথবা তাদের গায়িকা দলেব কোন মেয়ে এসেছে—পাশা বলে।

পাশার কোন বান্ধবী বা পিওনের চোখে পড়লে কলপোকভ্ কিছু মনে করতো না। তবু 'সাবধানের মার নেই' মনে কবে পাশের ঘরে চলে যায়। আর পাশা ছুটে গিয়ে দবজা খুলে দেয। দবজা খুলেই এক অপবিচিত অল্পবয়সী সুন্দরী রমণীকে দেখে বিস্মিত হয়। আপাদমস্তক নিরীক্ষণ কবে পাশা নিঃসন্দেহ হয় যে আগন্তুক একজন স্ত্রীলোকই।

আগন্তুক রমণীব মুখ ম্লান এবং দ্রুত অনেকগুলো সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলে যেমন হয় সেই রকম জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে।

কি হয়েছে আপনার?—পাশা প্রশ্ন করে।

স্ত্রীলোকটি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় না। সামনে এক পা এগিয়ে এসে ঘরেব চাবদিকে একবার চোখ বুলায়। তার পর বসে পড়ে। মনে হয় সে যেন খুব ক্লান্ত কিংবা অসুস্থ। অনেকক্ষণ থেকে বৃথাই কথা বলবার জন্যে তার ম্লান ঠোঁট দুটো কাঁপছে।

আমার স্বামী এখানে আছেন?—অশ্রুসিক্ত রক্তিম আঁখিপল্লব উত্তোলন করে মহিলা পাশাকে শেষে জিজ্ঞেস কবে।

স্বামী?—পাশা চমকে উঠে ফিস্ ফিস্ করে বলে। হাত-পা তার ভয়ে হিম হয়ে আসে। কার স্বামী?—কাঁপতে কাঁপতে পুনরায় বলে।

আমার স্বামী—নিকোলাই পেট্রোভিচ কলপোকভ্।

উ—ন—না, আমি—আমি তো কারো স্বামীকে চিনি-টিনি না—বাঈজি বলে।

এক মিনিট উভয়েই নীরব। আগন্তুক মহিলা কযেক বার তার শুষ্ক ওষ্ঠে রুমাল বুলায় এবং ভেতরের কাঁপুনিকে রোধ করবাব জন্য শ্বাস বন্ধ করে। আর পাশা একটা

থামের মত নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়িয়ে ভয়ে ও বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

তাহলে তুমি বলছো সে এখানে নেই?—বিশ্রী হাসি হেসে দৃঢ়স্বরে আগন্তুক মহিলা পাশাকে জিজ্ঞেস করে।

আমি—আমি বুঝতে পারছি না আপনি কার কথা বলছেন—পাশা টেনে টেনে বলে।

তুমি রাক্ষুসী, নীচ, পাপী—আগন্তুক মহিলা ঘৃণা ও অবজ্ঞার সঙ্গে পাশার দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে বলে। হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমি, তুমি সর্বনাশী। তোমাকে ওসব কথা বলতে পারছি বলে মন আজ আমাব খুব খুশি।

পাশা তখন অনুভব করলো, এই অপরিচ্ছন্ন মহিলার রাগান্বিত চক্ষু ও সাদা সরু সরু আঙ্গুল ভয়ঙ্কর একটা ধারণা জন্মিয়ে দিয়েছে। তার ফোলা-ফোলা রক্তিম গাল দুটো, নাকের উপর বসন্তের দাগ, কপাল বেয়ে ঝরে-পড়া অগোছালো চুলে পাশা খুব লজ্জা বোধ করলো। তার মনে হলো সে যদি রোগা হতো এবং তার মুখে পাউডার, কপালে সোনার টিপ না থাকতো তবে বলতে পারতো সে 'সম্ভ্রান্ত মহিলা' নয় এবং সে এই অপরিচিত রহস্যময়ী নারীর মুখের সামনে দাঁড়াতে ভীত বা লজ্জিতবোধ করতো না।

আমার স্বামী কোথায়? যদিও সে এখানে থাক্ আর নাই থাক্, তবুও তোমাকে আজ আমার এ কথা বলা প্রয়োজন যে টাকা চুরির দায়ে লোকে তাঁকে গ্রেপ্তার করবে। এইটাই তোমার কাজ! এইটাই তুমি শেষ পর্যন্ত করলে!

আগন্তুক মহিলা এবার উঠে গভীর উত্তেজনায় ঘরের মধ্যে ইতস্তত পায়চারি করতে আরম্ভ করে। পাশা অত্যন্ত ভীত হয়ে তার দিকে চেয়ে থাকে। কিছুই সে বুঝতে পারে না।

তাঁকে খুঁজে বের করে গ্রেপ্তার করবে। বলে আগন্তুক মহিলা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। এই নিঃশ্বাসের সঙ্গে তার রোষ ও বিরক্তি প্রকাশ পায়। আমি জানি কে তাব এই সর্বনাশ করেছে! নীচ, মানুষ-খেকো! ঘৃণ্য, অর্থলুব্ধা কোথাকার! বলে—আগন্তুক মহিলার ঠোঁট ঘন ঘন নড়তে থাকে। ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চন করে। আমি অসহায়, এই কুলাঙ্গার মাগি শুনতে পাচ্ছো—আমি অসহায়! আমার চেয়ে তোমার শক্তি বেশি। হ্যাঁ—একজনই কেবল আমাকে ও আমার শিশুদেব বাঁচাতে পারেন। ভগবান সবই দেখেন! তিনিই এর বিহিত করবেন। তিনি আমার বিনিদ্র রাত্রির যন্ত্রণা ও প্রত্যেক বিন্দু অশ্রুব জন্য তোমাকে শাস্তি দেবেনই দেবেন। সময় একবার আসবেই—তখন আমার কথা তোমার মনে পড়বে।

আবার নীরবতা। আগন্তুক মহিলা আগের মত পায়চারি করতে করতে হাত ঝাঁকায়। পাশার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। সে কিছুই বুঝতে পারে না। ভয়ঙ্কর একটা কিছু হবে বলে তার ধাবণা। সে হতবুদ্ধি হয়ে মহিলার দিকে চেয়ে থাকে।

আমি তো এ বিষয়ে কিছু জানি না—হঠাৎ বলে ফেলেই ঝর্ ঝর্ করে কেঁদে ফেলে।

তুমি মিথ্যা কথা বলছো! আমি সব কিছু জানি। আমি অনেকদিন আগে থেকেই

তোমাকে চিনি। এ কথাও ঠিক, সে গত কিছুদিন থেকে তোমার সঙ্গে প্রতিদিন কাটায়— চিৎকার করে আগন্তুক মহিলা বলে। রাগে তার চোখ জ্বলছে।

হ্যাঁ। তাই কি? কী করবেন আপনি? আমার কাছে অনেক লোকই আসে। আমি আসবার জন্যে পায়ে ধরি না। যার ইচ্ছা হয় সে আসে।

আমি বলছি শোন—তারা বুঝতে পেরেছে অফিসের তহবিল তছরূপ করেছে। কেবল মাত্র তোমার—তোমার মত—একটা রাক্ষুসির জন্য—তোমার জন্যই ও অপকর্ম সে করেছে। শোন—দৃঢ়স্বরে বলে হঠাৎ থামে এবং পাশার দিকে তাকিয়ে আবার আরম্ভ করে—তোমাদের সত্যিকারের কোন নীতির বালাই নেই। তোমরা কেবল লোকের সর্বনাশ করবার জন্যে আছো। সেইটাই তোমাদের উদ্দেশ্য। লোকে ভাবতেও পারে না তোমরা কত নিচে নেমে গেছ। মনুষ্যত্বের ছিটে-ফোঁটাও তোমাদের মধ্যে নেই। তার স্ত্রী আছে, ছেলে-পুলে আছে—সে যদি আজ সাজা পেয়ে জেলে যায়, আমরা অনাহারে থাকবো। বাচ্চাগুলো এবং আমি না খেয়ে মরব—সেটা জানো! এখনও তাঁকে বাঁচাবার, আমাদের এই দীন হীনতা ও অপমান থেকে রেহাই পাবার উপায় আছে। আমি যদি ন'শ' রুবল নিয়ে অফিসে জমা দিতে পারি, তবে তারা তাঁকে মুক্তি দেবে। কেবল মাত্র ন'শ' রুবল!

কি বললেন, ন'শ' রুবল? আমি—আমি তো কিছুই জানি না—আমি নিইনি—পাশা নরম সুরে বলে।

আমি ন'শ' রুবল চাইছি না। তোমার টাকা পয়সা নেই আর আমি চাইও না। আমি অন্য জিনিসের কথা বলছি। তোমাদের মত মেয়েদের পুরুষরা সচরাচর অনেক দামি জিনিস দিয়ে থাকে। আমার স্বামীর তোমাকে যা দিয়েছে আমাকে সেইগুলো ফেরৎ দাও!

সে তো আমাকে কখনও কোন জিনিস উপহার দেয় নি। পাশা আঘাত পেয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে।

টাকা কোথায়? সে তাঁর নিজের সব কিছু নষ্ট করেছে, আমার যা কিছু ছিল তা উড়িয়েছে—এ সমস্ত টাকার কি হলো? শোন ভাই, আমি অনেক রূঢ় কথা বলেছি— আমাকে ক্ষমা করো। গালাগাল করার জন্য তুমি নিশ্চয়ই আমাকে ঘৃণা করবে জানি, কিন্তু তোমার মধ্যে যদি সহানুভূতি থাকে তোমাকে আমার জায়গায় রেখে একবার ভেবে দেখো! তাই তোমার কাছে আমার মিনতি—তুমি জিনিসগুলো ফিরিয়ে দাও।

পাশা এবার অবজ্ঞার সঙ্গে কাঁধ দুলিয়ে বলে—হুস্। আমি খুশি মনেই দিতাম। ভগবান সাক্ষী, তিনিই আমার ভরসা। আপনার স্বামী কখনও কোন জিনিস আমাকে উপহার দেন নি। আপনি আমার কথা বিশ্বাস করুন। পাশা এবার হন্তদন্ত হয়ে বলে— হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে, আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনার স্বামী আমাকে দুটো জিনিস দিয়েছিলেন বটে। হ্যাঁ, আপনি যদি তা নেন তবে আমি তা নিশ্চয়ই ফিরিয়ে দেবো।

পাশা ড্রেসিং টেবিলের একটা ড্রয়ার খুলে একটা সোনার ব্রেসলেট ও মুক্তা-বসানো

একটা অংটি বের করে—এই যে নিন্‌, বলে আগন্তুক মহিলার হাতে তুলে দেয়।

আগন্তুক মহিলার চোখ মুখ উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে। রেগে উঠে বলে—তুমি আমাকে এ কি দিচ্ছো? আমি তো তোমার দান চাইনি। কিন্তু যে জিনিস তোমার নয়—সুযোগ বুঝে আমার স্বামীকে নিংড়ে নিয়েছো—সেই দুর্বল অসুখী লোক—বিস্যুদবারদিন তোমাকে বন্দরে যে সব দামি দামি অলঙ্কার পরে আমার স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে দেখেছিলাম—সুতরাং আমার কাছে নির্বোধ মেষ-শাবক সাজবার মানে হয় না! আমি শেষবারের মত জিজ্ঞেস করছি—তুমি জিনিসগুলো দেবে কিনা!

পাশা এবার একটু রেগে বলে—অদ্ভুত তো! আমি তো বললাম। আমি তো বারবারই বলছি, হার আর ছোট্ট আংটিটি ছাড়া নিকোলাই পেট্রোভিচের কাছ থেকে আমি অন্য কোন জিনিস নেই নি। মিষ্টি কেক ছাড়া সে কিছুই আমার জন্যে আনে না।

মিষ্টি কেক্‌!—আগন্তুক মহিলা একটু ম্লান হাসে। বলে—বাড়িতে ছেলেমেয়েগুলোর কিছু খাবার নেই—আর তোমার এখানে মিষ্টি কেক্‌! যাক্‌, তাহলে তুমি কি সত্যিই জিনিসগুলো দেবে না?

কোন উত্তর না পেয়ে মহিলা বসে পড়ে। শূন্যে তাকিয়ে চিন্তা করতে থাকে :

এখন কি হবে? যদি আমি ন'শ' রুবল না পাই তবে তাঁকে বাঁচাতে পারবো না। সেই সঙ্গে ছেলেপুলে নিয়ে আমিও মরবো। তাহলে এই ঘৃণ্য মেয়েটাকে আমি হত্যা করব, না তার পায়ে ধরে ভিক্ষা চাইবো?

মহিলা এবার রুমালখানা মুখে চেপে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। বলে—আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি। তুমি আমার স্বামীর সর্বনাশ করেছো, তাঁকে পথে বসিয়েছো, তুমিই তাঁকে বাঁচাও। মানলাম—তাঁর প্রতি তোমার কোন মায়া মমতা নেই—কিন্তু অবোধ শিশুরা, অবলা বাচ্চাগুলো—তারা কি অপরাধ করেছে?

পাশা কথাগুলো শোনে—আর তার চোখে ভেসে ওঠে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে ক্ষুধার জ্বালায় চিৎকার করছে কতকগুলো দুগ্ধপোষ্য শিশু। এবার পাশার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে।

পাশা বলে—তাহলে আমি কি করতে পারি বলুন? আপনি বলছেন আমি ঘৃণ্য নারী, আমি নিকোলাই পেট্রোভিচের সর্বনাশ করেছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি ভগবানের নামে দিব্যি করে বলছি আমি তার কাছে থেকে এমন কিছু পাইনি—আমাদের গায়িকা দলে একটি মাত্র মেয়েরই বড বড় ধনী প্রিয়লোক আছে। তাছাড়া বাদবাকি আমরা দিনের রোজগারে দিন খাই। নিকোলাই পেট্রোভিচ শিক্ষিত মার্জিত রুচির লোক। তাঁকে আমরা আদর না করে পারি? ভদ্রলোকদের অভ্যর্থনা করতে আমরা বাধ্য।

আমি জিনিসগুলো আবার চাইছি। সেগুলো আমাকে ফিরিয়ে দাও! সেগুলোর আমার বিশেষ প্রয়োজন। দাও আমাকে। আমি তোমার কাছে নতি স্বীকার করছি। তুমি যদি চাও—আমি তোমার পায়ে ধরতেও রাজি আছি।

পাশা ভয়ে কেঁপে ওঠে। নিষেধ করার ভঙ্গিতে হাত নাড়ায়। সে বুঝতে পারে এই যে, সুন্দরী রমণী পাংশুটে হয়ে গেছে। মঞ্চে অভিনয় করার মত সুনিপুণভাবে গর্ব ও

আতিশয্য দেখিযে নিজেকে বড বলে জাহিব কবে সে তখন পাযেও ধবতে পাবে। নিজেব দম্ভ বজায বেখে সে গাযিকা মেযেদেব ছোট কবে দিতে চায।

পাশা চোখ মুছে ব্যস্ত হযে বলে—ঠিক আছে, আমি জিনিসগুলো দিচ্ছি। অবশ্যই। কেবলমাত্র—এগুলো নিকোলাই পেট্রোভিচেব নয। আমি অন্যলোকেব কাছ থেকে পেযেছি। এখন আপনি যা মনে কবেন—

পাশা দেবাজেব উপবকাব ড্রযাব খুলে ব্রুচ, প্রবাল-খচিত একটা নেকলেস, কযেকটা আংটি ও ব্রেসলেট বেব কবে আগন্তুক মহিলাকে সবগুলো দিযে দেয।—আপনাব স্বামীব কাছ থেকে ওব একটাও আমি নেই নি। যদি চান ওব সবগুলোই নিযে যান। ওগুলো দিযে আপনাব দাবিদ্রোব অবসান হোক্।

পাযে ধববাব নাম কবাতে বাঈজি একটু ক্ষুব্ধ হযেছিল। আবাব বলে—আপনি যদি ভদ্র নাবী হন, তাব প্রকৃত স্ত্রী হন, তাহলে তাঁকে আপনি নিজেব কাছে বাখবেন। আমি সেইটাই চাই। আমি তাঁকে কখনও আমাব কাছে আসতে বলি না। সে নিজেব ইচ্ছাযই আসে।

অশ্রুসিক্ত নযনে আগন্তুক মহিলা জিনিসগুলো খুঁটিযে খুঁটিযে দেখে বলে—ও কটা হলেই তো হবে না। ওব দাম পাঁচ শ' কবলও হবে না।

পাশা এবাব ঝটাং কবে দেবাজ খুলে একটা সোনাব সিগাবেট কেস, একটা ঘডি ও কযেকটা বোতাম বেব কবে দেয। হাত দিযে দেখিযে বলে—আমাব আব কিছুই নেই—আপনি খুঁজে দেখতে পাবেন।

আগন্তুক মহিলা দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন কবে। কম্পিত হস্তে জিনিসগুলো রুমালে বেঁধে ঘব থেকে বেবিযে যায। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ একটা কথাও বলে না, মাথাটাও কৃতজ্ঞতায নত হয না।

পাশেব ঘবেব দবজা খুলে কলপোকভ এঘবে আসে। তাব মুখ বিবর্ণ, থমমত খেযে যায সে। তেতো কোন জিনিস খেলে মানুষ যেমন মাথা ঝাঁঝায সেই বকম মাথা ঝাকাতে থাকে, আব তাব চোখ জলে চিক চিক কবে।

পাশা বেগে এগিযে যেযে ফোস কবে বলে—কখনও কোন জিনিস তোমাব কাছে চেয়েছি? তুমি আমাকে কী উপহাব দিযেছো?

উপহাব—না না, সেটা কিছু নয—কলপোকভ মাথা নেডে বলে—হে ভগবান, সে তোমাব কাছে কাঁদলো, মিনতি কবলো—

এবাব পাশা চিৎকাব কবে বলে— আমি তোমাব কাছে জানতে চাই, তুমি আমাকে কী দিযেছো?

হে ভগবান, সে এত গার্বতা, অত্যন্ত নির্মল চবিত্রেব—তোমাব পাযে ধবে— একটা জাত গোত্রহীন মেযেব কাছে—আমি শেষ পর্যন্ত এই ঘটালাম। আমিই তাকে এখানে নিযে এলাম।

কলপোকভ দুহাত দিযে নিজেব মাথা চেপে ধবে আফশোস কবতে থাকে উত্তেজিত

হয়ে—না, না, আমি নিজেকে ক্ষমা করব না, কিছুতেই করব না, আমার কাছ থেকে সরে যা ঘৃণ্য, অপদার্থ, নীচ্ কোথাকার! বিতৃষ্ণায় কলপোকভ্ কম্পিত হস্তে পাশাকে একটা খোঁচা মেরে নিজে সরে দাঁড়ায়। আবার বলে—সে পায়ে ধরতে যায়, সে তোর পায়ে ধরতে যায়। হায় ভগবান!

কলপোকভ্ কথা শেষ করে তাড়াতাড়ি জামা কাপড পরে পাশাকে একপাশে ধাক্কা মেরে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়।

পাশা পড়ে যেয়ে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। ঝোঁকের মাথায় আগন্তুক মহিলাকে জিনিসগুলো দিয়ে দেবার জন্য তখন মনে মনে অত্যন্ত অনুতপ্ত হয় এবং একথা তাকে ভীষণভাবে আঘাতও দেয়। তার মনে পড়ে, তিন বছর আগে এক ব্যবসায়ী বিনা কারণে তাকে মেরেছিল এবং সে বারের মত চিৎকার করে সে আব কোনদিন কাঁদে নাই।

*শ্রাবণ,* ১৩৬৬

# উপন্যাস

# খোকার টাটি

## চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতায় কলেজ-স্ট্রিট ও হ্যারিসন-রোডের মোড়ে খবরের কাগজ-ফেরিওয়ালারা ফুটপাথের উপর উবু হয়ে বসে প্রেস থেকে সদ্য আনা খোলা ছড়ানো কাগজের তা ভাঁজতে ভাঁজতে বিকট কণ্ঠে চেঁচাচ্ছিলো—আই-এ পাশের খবর বেরোয়লো বাবু, আই-এ পাশেব খবর বেরোয়লো...

তাদেব চারিদিক থেকে ঘিরে উৎসুক উৎকণ্ঠিত ছাত্রবৃন্দ ভিড় করে' ঠেলাঠেলি করছিলো এবং ঝুঁকে পড়ে' একখানা কাগজ অপর সকলের পূর্বে হস্তগত করবার চেষ্টা করছিলো। কাগজওয়ালা একখানা কাগজ তুলে একজন ক্রেতাকে দেবার চেষ্টা করছে, আর তাব হাত থেকে ছো মেরে আর-একজন সেখানা নিয়ে নিচ্ছে। সুতবাং ঠেলাঠেলির অন্ত নেই—যে লোক কাগজ পেয়েছে সে ভিড় ঠেলে বাইরে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, আর যে তখনো কাগজ পায় নি সে ভিড ঠেলে ব্যূহেব ভিতরে ঢোক্‌বার জন্যে চেষ্টা কবছে—ফলে বাইরে বেরোনো ও ভিতরে ঢোকা দুই-ই সহজে হচ্ছে না।

দুটি ছেলে একখানা খববের কাগজ কিনে নিয়ে কোনো মতে ব্যূহভেদ করে বাইরে বেরিয়ে এলো, কিন্তু কাগজখানাকে গোটা অখণ্ড বার করে আনতে পারলে না; কাগজের একটা কোণ অপব একজনের আগ্রহান্বিত মুঠার মধ্যেই রয়ে গেলো। তারা বাইরে বেরিয়েই সেই কোণছেঁড়া কাগজখানা দুজনে দুদিকে ধরে মেলে ফেল্‌লে, এবং চলতে চলতেই ভাগ্যবানদের নামের ভিড়ের মধ্যে নিজেদেব নাম তল্লাস করবার জন্য উৎসুক নেত্রের ব্যাকুল দৃষ্টি নামিয়ে নিবিষ্ট হয়ে গেলো।

একটি ছেলে ভিডের বাইরে এক পাশে দাঁড়িয়ে ব্যাকুল দৃষ্টিতে কাগজ-ক্রেতাদের দিকে তাকিয়ে ছিলো; সে এবার পরীক্ষা দিয়েছে, নিজের ভাগ্যফল জানবার জন্য উৎসুক হয়ে আছে, কিন্তু তার এমন সঙ্গতি নেই যে চার পয়সা খরচ করে একখানা কাগজ কেনে। সে কোনো কাগজ-ক্রেতা ছাত্রের অনুগ্রহ লাভের আশায় উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছিলো। সে ঐ ছেলেদুটিকে তার পাশ দিয়ে নিবিষ্ট দৃষ্টিতে কাগজ দেখতে দেখতে যেতে দেখে কাতর বিনতির স্বরে বললে—মশায়, দয়া করে একটু দেখুন না থাকোহবি জানার নামটা...

ছেলে দুটি কাগজ থেকে মুখ তুলে থাকোহরির মুখের দিকে তাকালে; তার পর কাগজখানা মুড়তে মুড়তে একজন বললে---মাপ করবেন, এখন আমাদের নাম খোঁজবার সময় নেই।

তারা দুই বন্ধুই পাশ করেছে, সাফল্যের আনন্দ তাদের মুখে চোখে ঝলমল কবছিলো,

তাদের বাড়িতে আর বন্ধুমহলে খবর দেবার জন্য ত্বরাও ছিলো। তারা থাকোহরির ম্লান ও ব্যাকুল মুখের দিকে লক্ষ্য না করে হাসিমুখে গল্প করতে করতে চলে গেলো।

তখন থাকোহরি আবার উৎসুক আকুল দৃষ্টিতে চারিদিকে চাইতে লাগলো, আর কোন্ কাগজ-ক্রেতার অনুগ্রহ সে প্রার্থনা করবে।

থাকোহরির পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো একজন লোক; থাকোহরির ব্যগ্র ব্যাকুলতা দেখে তার মনোযোগ থাকোহরির দিকে আকৃষ্ট হলো; সে দেখলে থাকোহরির পরিচ্ছদ পুরানো ও মলিন, তার মুখ গৌরবর্ণ ও সুশ্রী হলেও সেখানে দারিদ্র্যের কুণ্ঠা ও অপরাধী ভাব মুদ্রিত হয়ে আছে, তার চোখ দুটি টানা ও উজ্জ্বল হলেও শঙ্কা-চকিত। সেই লোকটি থাকোহরিকে জিজ্ঞাসা করলে—তুমি কি এবার এগজামিন দিয়েছিলে?

থাকোহরি তার ব্যস্ত কুণ্ঠিত দৃষ্টি সেই প্রশ্নকারীর মুখের দিকে ফিরিয়ে বললে—আজ্ঞে।

সেই লোকটি তখন থাকোহরিকে বললে—আচ্ছা দাঁড়াও, আমি কাগজ কিনছি, তুমি দেখো...

থাকোহরির মুখ কৃতজ্ঞতার আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

সেই লোকটি একখানা কাগজ কিনে নিজে না দেখেই থাকোহরির হাতে দিলে।

থাকোহরি আবেগ-কম্পিত হাতে কাগজের পাঠ খুলে নিবিষ্ট একাগ্রতায় নিজের নাম খুঁজতে প্রবৃত্ত হলো। থাকোহরির অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি প্রথম বিভাগ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এবং ক্রমে দ্বিতীয় বিভাগ থেকে তৃতীয় বিভাগে নেমে গেলো; যতোই তার দৃষ্টি নেমে চলেছিলো ততোই তার চাহনি হতাশ হয়ে উঠছিলো; তৃতীয় বিভাগে চোখ বুলাতে বুলাতে তার চোখ সজল হয়ে উঠলো—কোথাও তার নাম আর দৃষ্টিতে ঠেকলো না। সে তার অশ্রুতে-ঝাপসা চোখকে পুরা বিশ্বাস করতে পারলে না, আবার একবার প্রত্যেক বিভাগে নিজের নামের সন্ধান করলে। তার পর সে কাগজখানি সযত্নে ভাজ করে তার প্রতি-অনুকম্পা-পরায়ণ লোকটির হাতে যখন ফিরিয়ে দিলে তখন তার দুই গালের উপর দিয়ে ব্যর্থতার বেদনা গলে গড়িয়ে পড়ছে।

কাগজ-দাতা লোকটি থাকোহরির বিগলিত অশ্রুধারা দেখে ব্যথিত হয়ে বললে—তোমার নাম দেখতে পেলে না? তোমার নাম কি বলো তো, আমি একবার খুঁজে দেখি...

থাকোহরি ক্ষীণ আশার প্রলোভনে উচ্ছ্বসিত কান্না দমন করে বললে—আমার নাম থাকোহরি জানা।

সেই লোকটি কাগজের আগাগোড়া চোখ বুলিয়ে যখন থাকোহরির দিকে চোখ তুলে তাকালে তখন তারও চোখে জল ছলছল করছে। সে বললে—এই কাগজে হয় তো ছাপার ভুল হয়ে থাকতে পারে; দাঁড়াও, আমি অন্য কাগজ কিনে দেখছি...

থাকোহরির মন আশার ক্ষীণ আভাসে আবার উৎসুক হয়ে উঠলো।

সেই লোকটি অন্য একখানা খবরের কাগজ কিনে খুঁজে দেখলে, তাতেও থাকোহরির নাম নেই। সে ব্যথিত দৃষ্টি তুলে থাকোহরির মুখের দিকে তাকালে।

একজন অচেনা লোকের সহানুভূতি দেখে থাকোহবি আর আপনাকে সম্বরণ করে

রাখতে পারলে না, সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো—আমার মা পরের বাড়িতে রাঁধুনির কাজ করে আমাকে পড়াচ্ছিলেন; আমি মাকে কেমন করে মুখ দেখাবো?...

এই কথা শুনে ও থাকোহরির কান্না দেখে সেই অপরিচিত লোকটিরও চোখের ছলছল জল উছ্‌লে গড়িয়ে পড়লো, তার মনে হলো—এই ছেলেটির নাম যখন থাকোহরি, তখন নিশ্চয়ই এর মা অনেক ছেলে হারিয়ে হরিকে মিনতি করে এই একটি ছেলেকে নিজের বারংবার শূন্য কোলে থাকিয়েছে; সেই মরুঞ্চে পোয়াতি যমের উচ্ছিষ্ট এই ছেলেটিকে মানুষ করে তুলে সুখী দেখবার জন্যে কঠোর তপস্যা করছেন; মায়ের প্রতি ছেলেরও শ্রদ্ধা ও মমতার পরিচয় তার একটি কথা থেকে যা পাওয়া গেলো, তাতে মনে হয় ছেলেটিও লেখাপড়ায় অবহেলা করে নি, পাস করবার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করেনি। চেষ্টার নিষ্ফলতা যে আবো কষ্টকর! এই কথা ভেবে নিয়ে সেই লোকটি থাকোহরিকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বললে—চেষ্টায় নিষ্ফল হলেই কি অমন হতাশ হতে আছে? আবার চেষ্টা করো, আসছে বছর পাস হয়ে যাবে।

থাকোহরি চোখ মুছতে মুছতে হতাশা-শিথিল স্বরে হেসে—আমাব আর পড়া হবে না; কোথাও যা হোক কিছু কাজ করে উপার্জন করতে হবে, মাকে আর দাসীর কাজ করতে দিতে আমি পারবো না।

থাকোহরি এই কথা কয়টি এমন করুণ স্বরে বললে যে তার সহানুভূতিতে সেই অচেনা লোকটিও ঘন ঘন চোখ মুছতে লাগলো।

বাস্তাব মাঝে এই রকম কান্নাকাটি দেখে ওদের দুজনকে ঘিরে কলকাতার হুজুগ-প্রিয় বহু লোক জমা হয়ে গিয়েছিলো। সেই জনতার ভিতর থেকে একজন লোক থাকোহরির দুঃখে ব্যথিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলে—ছেলেটি আপনার কে হয় মশায়?

সেই লোকটি সজল চোখেব দৃষ্টি প্রশ্নকারীর দিকে ফিরিয়ে বললে—দুজনেই মানুষ, এই হিসেবে ভাই হয় বলতে পারেন; নইলে ও জাতে জানা, আর আমি মুখুজ্জে,...

আবার একজন প্রশ্ন কবলে— অনেক দিনের আলাপ-পরিচয় আছে বুঝি?

উত্তর হলো—না, এই মাত্র হলো...

আবার প্রশ্ন হলো—তবে যে আপনি কাঁদছেন?

মুখুজ্জে লোকটি বিরক্ত হয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে বললে— কাঁদবো না? মানুষ হয়ে মানুষের দুঃখে কাঁদবো না?— তবে মানুষ হয়ে জন্মেছি কেন?

প্রশ্নকারীরা পরাস্ত হয়ে নিরস্ত হলো। সমস্ত জনতা মুখুজ্জের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকাতে লাগলো, চারিদিকে সকলে জনান্তিকে তার মহাপ্রাণতার প্রশংসা করতে লাগলো।

এই-সব দেখে শুনে মুখুজ্জে একটু অপ্রস্তুত হয়ে সেখান থেকে প্রস্থানোদ্যত হয়ে দেখলে যে থাকোহরি সেখানে নেই। তখন সে একটি দীর্ঘনিশ্বাস চেপে জনতার ব্যূহ ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে পড়লো।

একজন ভদ্রলোক ঘরের গাড়িতে যেতে যেতে গাড়ি থামিয়ে কাগজ কিনছিলেন। তিনি

গাড়িতে বসে থেকেই থাকহরি ও মুখুজ্জের কথাবার্তা সব শুনছিলেন। মুখুজ্জে সেখান থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতেই সেই ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে এলেন এবং মুখুজ্যের সামনে দাঁড়িয়ে নত হয়ে নমস্কার করে জিজ্ঞাসা করলেন—মুখুজ্জে মশায়ের নামটি কি বিনীতভাবে জানতে পারি?

মুখুজ্জে বিরক্ত ভাবে একবার মাত্র প্রশ্নকারীর মুখের দিকে দেখে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে যেতে বললে—নাম জেনে আর কী হবে?...আমার নাম শ্রীরামযাদু মুখোপাধ্যায়...

সেই ভদ্রলোক বিনীত স্বরে বললেন—আমি মশায়কে বলতে তো পারি নে, তবে মুখুজ্জে মশায় যদি দয়া করে এক দিন আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দেন তো কৃতার্থ হই...

রামযাদু কার বাড়িতে কোথায় কেন যেতে হবে, না জেনেই বিরক্ত স্বরে বললে—আচ্ছা, সে একদিন দেখা যাবে...

সেই ভদ্রলোক বললেন—আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীপরানচন্দ্র বিশ্বাস, ৩৩ নম্বর হলধর বিশ্বাসের স্ট্রিটে...

রামযাদু এইটুকু শুনেই মুখ ফিরিয়ে পরান-বাবুর দিকে চেয়ে অগ্রাহ্যের ভাবে বললে—আচ্ছা, তা যাবো একদিন...

পরান-বাবুর বয়স পঞ্চান্ন-ছাপান্ন হবে; তিনি খুব মোটা, আর খুব কালো; তাঁর মাথাটা হাতির মাথার মতন, চুল ব্রহ্মতালুর উপর পাতলা হয়ে গেছে ও সেখানে টাকের আসর পাতা হচ্ছে; কিন্তু তাঁর গোঁপ প্রকাণ্ড, মুখবিবরের উপর ঝাঁপের মতন ঝুলে পড়েছে, কুলোর মতন কান-দুটোও চুলে আচ্ছন্ন; তাঁর দাড়ি কামানো। এই কদর্য চেহারার লোকটির বাড়িতে পায়ের ধুলা দিবার কিছুমাত্র আগ্রহ অনুভব না করে রামযাদু পাশ কাটিয়ে দ্রুতপদে প্রস্থান করলে।

* * *

পরান-বাবু বাড়িতে ফিরে গিয়ে পত্নীকে উদ্দেশ করে গম্ভীর স্বরে ডাকলেন—কোথায় গো?

পাশের ঘর থেকে তেমনি মোটা গলায় জবাব এলো—এই যে, কেন?

এই কথা সেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গে সেই ঘর থেকে ভোমরার মত মিশ কালো বছর ছয়েকের একটি মেয়ে ছিটকে বেরিয়ে এলো এবং ছুটে পরান-বাবুর কাছে এসে তাঁর হাঁটুব কাছটা দুই হাতে জড়িয়ে ধরে আনন্দিত স্বরে ডাকলে—বাবা!

পরান-বাবু বাৎসল্য-সুখের হাসিতে মুখ ভরে তুলে মেয়ের উঁচু দিকে চাইতে গিয়ে পিছন দিকে হেলে পড়া হাসিমুখখানিব দিকে নত দৃষ্টিতে চেয়ে কণ্ঠস্বরে আদর ঢেলে বললেন—কেন মা!

পরান-বাবুর এই মেয়েটির নাম কৃষ্ণকলি। ঐ নামের কালো ফুলের সঙ্গে সাদৃশ্য অনুভব করে পরান-বাবু মেয়ের নাম রেখেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের নাম ডাকাব সময় ঠাকুর-দেবতাব নামটা উচ্চাবণ করবার লোভটাও তাঁর মনে একটু ছিলো। কৃষ্ণকলির গায়ের রংটি বেশ কালো, চেহারাতেও শ্রী-ছাঁদের নিতান্তই অভাব—ঠোঁট দুটো পুরু উল্টানো,

নাকটা নেই বললেই হয়, কপালটা ঢিপি-পানা, কান দুটো কুলোর মতন,—এক কথায় সে অতিশয় কুৎসিত। অনেক সন্তানের জনক-জননীর এক মাত্র অবশিষ্ট কোলের ধন এই মেয়ে কালো কুৎসিত হলেও বাপমায়ের বড়ো আদরের,—তাই তাঁরা কালো কুৎসিত মেয়েরও ফুলের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখে নাম রেখেছেন কৃষ্ণকলি। এই কৃষ্ণকলি নাম অতি আদরে সঙ্কুচিত হয়ে কখনো হয় কেষ্টো, আর কখনো হয় কলি।

পরান-বাবু কৃষ্ণকলিকে কোলে তুলে নিয়ে যে-ঘর থেকে পত্নীর সাড়া এসেছিলো সেই ঘরে ঢুকলেন। সেখানে তাঁর স্ত্রী ফল ছাড়িয়ে স্বামীর বৈকালী জলখাবার সাজাচ্ছিলেন। পরান-বাবুর পত্নীর নাম মাতঙ্গিনী। তাঁর বিপুলায়তন কৃষ্ণবর্ণ কুৎসিত দেহ তাঁর নাম সার্থক করে তুলেছে!—তিনি যেন তাঁর কন্যা কৃষ্ণকলিরই শতগুণ পরিবর্ধিত রাজসংস্করণ!—তিনি যেমন মোটা তেমনি লম্বা—একেবারে যাকে বলে দশাসই! চুয়াল্লিশ ইঞ্চি বহরের কাপড়ে তাঁর পায়ের গোছ ঢাকে না; দশহাতি কাপড় তাঁর বিপুল দেহের পরিধি বেষ্টন করে আসতেই ফুরিয়ে যায়, মাথায় ঘোমটা দিতে কুলায় এমন একটু আঁচল অবশিষ্ট থাকে না। স্বামীকে ঘরে আসতে দেখে তিনি কাপড়ের আঁচলটা টানাটানি করে মাথায় তোলবার বৃথা চেষ্টা বার কতক করলেন,—অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে হেসে বললেন—এমন অসময়ে বাড়ির ভেতর যে?

পরান-বাবু হেসে বললেন—অপ্রস্তুত রূপসীর অসম্বৃত রূপ অতর্কিতে দেখে নিতে এলাম!—

ইয়ম্ অধিক-মনোজ্ঞা বল্কনেনাপি তন্বী,
কিম্ ইব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্!

মাতঙ্গিনী স্বামীর রসিকতায় সুখী ও লজ্জিতা হয়ে হেসে বললেন—রূপসী তন্বীই বটে। দশ হাত কাপড়ের বেড়ে কুলোচ্ছে না, হাঁপিয়েই সারা হচ্ছি! তোমার বুড়ো বয়সে আর রঙ্গ করতে হবে না। বাইরে যাও তুমি। এখনো কি পঙ্গপাল এসে জোটে নি?

পরানবাবু হাসিমুখে অথচ ক্ষুণ্ণ স্বরে বললেন—এরকম কথা বলা উচিত নয় গিন্নি। আমাদের সুযোগ হয়েছে তাই কতকগুলো টাকা হাতে এসে পড়েছে, আর দশজনের সে সুযোগ হয়নি তাই তারা আমার কাছে আসে। টাকার মূল্য হয় খরচেই তো? নইলে পুঁজি করে রেখে দিলে টাকাও যা ঢেলাও তাই—দুয়েরই দাম সমান।

মাতঙ্গিনী প্রকাণ্ড নথ নেড়ে বললেন—তা তো যেন বুঝলাম। কিন্তু তা বলে তো আমরা হরিশচন্দ্র রাজার মত সর্বস্ব দান করে আমাদের কলিকে পথে বসাতে পারব না।

কৃষ্ণকলি বলে উঠলো—ফুটপাথের উপর বসলে গাড়ি চাপা পড়বার ভয় নেই মা।

পরান-বাবু হাসিমুখে কন্যার মুখচুম্বন করে পত্নীকে বললেন—কলির জন্যে ভেবো না গিন্নি। কলির জন্যে দেশ-জোড়া যে আশীর্বাদ ভগবানের ব্যাঙ্কে জমা হচ্ছে তাতেই আমার কলির সকল অভাব মোচন হবে—সে ব্যাঙ্ক কখনও ফেল হয় না।

মাতঙ্গিনী মনে খুশি হয়েও মুখে বিরক্তি দেখিয়ে বললেন—শুধু ভুয়ো আশীর্বাদ কুড়িয়ে ধুয়ে খেলে তো পেট ভরবে না! কলিকালে আশীর্বাদ আবার ফলে না কি? তা হলে অমন হাতি হাতি ছেলেগুলো মরতো না।

পরান-বাবুর মুখ বিষণ্ণ হয়ে উঠলো; তিনি স্নিগ্ধস্বরে বললেন—ভগবান দুঃখ দেন পরের দুঃখ অনুভব করতে শেখবার জন্যে। ভগবানের সেই শিক্ষা কি তুমি ব্যর্থ করবে মনকে সকলের দিক থেকে বিমুখ করে রেখে? শুধু কি আমার নিজেরটুকু নিয়েই জগৎ, গিন্নি? প্রসন্ন মনে দিয়ে চলো যতদূর দিতে পারো; তা হলে পেতেও আর কিছু বাকি থাকবে না।

মাতঙ্গিনী অন্তরে স্বামীর মহত্ত্ব অনুভব করতেন; কিন্তু পাছে দানের নেশাতে স্বামী সব খুইয়ে ফতুর হয়ে পড়েন এই আশঙ্কায় তিনি মাঝে মাঝে স্বামীর দানের ঝোঁকটাকে একটু পিছনে টেনে' রেখে তাঁকে সচেতন ও সাবধান করতে চেষ্টা করতেন। মাতঙ্গিনী স্বামীর কথায় খুশি হয়ে হেসে বললেন—আচ্ছা গো কথার ভট্‌চার্জি, আচ্ছা! একা রামে রক্ষে নেই আবার সুগ্রীব দোসর হলেই তো হয়েছে! তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমিও দিতে থাকলেই তো চিত্তির! আমি কৃপণ মানুষ, আমার হাত দিয়ে জল গলে না, টাকা কড়ি তো অনেক স্থূল জিনিস!

পরান-বাবু হেসে বললেন—তুমি যে কেমন কৃপণ তা আমার জানতে বাকি নেই গো বাকি নেই। বেজা নাপ্তের বৌ, জগা ছুঁতোরের ছেলে, মধু হালদারের নাতনি..

নিজের গোপন দানের পাত্রদের নামের ফর্দ শুনে লজ্জিত সুখে হেসে মাতঙ্গিনী বললেন—আচ্ছা গো আচ্ছা, তোমার অতো পরচচ্চায় মন কেন বলো তো? কে কোথায় কি কচ্ছে আড়ি পেতে লুকিয়ে লুকিয়ে সব খবর নেওয়া হয়!

পরান-বাবু হেসে বললেন—পরচচ্চা তোমার কাছেই শিক্ষে—তুমি তো আমাকে ছেড়ে কথা কওনা!

মাতঙ্গিনী নথ দুলিয়ে বললেন—তুমি কি আমার পর?

পরানবাবু হেসে বললেন—আর তুমি কি আমার পর?

মাতঙ্গিনী কথা কইতে কইতেই জলখাবারের জো শেষ করে ফেলেছিলেন; তিনি একখানা আসন পেতে তার সামনে জল-খাবারের রেকাবি রাখতে রাখতে বললেন—বেশ গো বেশ, এখন জল খাও তো, মুখ একটু বন্ধ থাকুক। এখনি আবার কে এসে পড়বে; খাওয়া হবে না, নিজের খাবারটি তার মুখের কাছে ধরে দেবে!

পরান-বাবু একটু কাচুমাচু ভাবে বললেন—দেখো গিন্নি, আবশ্যাকের অতিরিক্ত গিলে গিলে ফল হচ্ছে তো এই প্রকাণ্ড দেহ নিয়ে সদাই অসাব্যস্ত থেকে হাঁপিয়ে মরা! খিদে কাকে বলে তা তো একদিনের তরেও জানতে পারলাম না। তার চেয়ে খিদের অন্ন যারা পায় না, তাদের খেতে দেওয়ায় কি বেশি সুখ নয়?

মাতঙ্গিনী হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—বাইরে কেউ এসেছে বুঝি?

পরান-বাবু কুণ্ঠিত-স্বরে বললেন—হ্যাঁ। একটি ছেলেকে তার মা পরের বাড়িতে রাঁধুনির কাজ করে পড়াতো; সে একজামিনে ফেল করেছে বলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদছিলো...

মাতঙ্গিনী মুখ ঘুরিয়ে নথ নেড়ে বললেন—আর তুমি তাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছো! নিজে হতেই বাড়িতে এসে যা জোটে তারই ঠেলা সামলানো দায়, তার উপর আবার পথ কুড়োতে আরম্ভ করলেই তো চিত্তির!

পরান-বাবু কুণ্ঠিত স্বরে বললেন—না, না, তা কেন? কলির জন্যে তো একজন মাস্টার রাখতে হবেই; ছেলেটি দেখতে শুনতে বেশ ভালো তাই নিয়ে এসেছি—বাড়িতে থাকবে আর...”

মাতঙ্গিনী ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন—না না, ওসব উপদ্রব বাড়িতে ঢুকিও না। নিজেদেরই দেখ্‌বার শোন্‌বার লোক নেই, তার উপব আবার পরের ছেলের ঝক্কি কে সামলাবে?

পরান-বাবু স্ত্রীর স্বভাব জানতেন—স্বামীর কথায় আপত্তি কবে শেষে তা আপনা হতেই পালন করা ছিল তাঁর রীতি। তাই পরান-বাবু হেসে বললেন—আচ্ছা আচ্ছা, তোমার যখন মত নেই তখন তাকে গোটাকতক পয়সা দিয়ে বিদায় কবে দিই গে, দোকান থেকে কিছু কিনে খাবে—কচি ছেলে, খিদেয় দুঃখে একেবারে মুষ্‌ড়ে পড়েছে।

মাতঙ্গিনীর মন অমনি স্নেহার্দ্র হয়ে উঠলো; তিনি বলে উঠলেন—আহা! কতো বড়ো ছেলেটি? তাকে বাড়ির ভিতরেই ডেকে আনাও না, আমি একবার দেখি।

স্ত্রীর কোমলহৃদয়ের আর একটি পরিচয় পেয়ে পবান-বাবু সুখী হয়ে বললেন—আচ্ছা, তুমি আনা দুচ্চার পয়সা বার করো, আমি তাকে ডেকে আনছি।

পরান-বাবু কৃষ্ণকলিকে কোলে করেই বাহির হয়ে গেলেন। মাতঙ্গিনী ক্ষুধিত অতিথির জন্য পয়সা বার না করে খাবারের ঠাঁই করতে লাগলেন।

পরান-বাবুর আহ্বানে থাকোহরি পরান-বাবুর পিছনে পিছনে বাহিব-বাড়ির ও ভিতর-বাড়ির মাঝখানে একটা দালানে এসে দেখলে একটা পুরু গালিচার আসনের সামনে এক বেকাবি জলখাবার ও সর্‌পোশ-ঢাকা এক গেলাস জল বয়েছে; তারই সামনে নর্দমার কাছে একঘটি জল আর একখানা ধোয়া তোয়ালে রয়েছে, আব তার কাছে একজন চাকর দাঁড়িয়ে আছে। পরান-বাবু অতিথি সৎকাবের এই আয়োজন দেখে খুশি হয়ে থেমে ঘুরে দাঁড়িয়ে থাকোহরিকে বললেন—বসো বাবা, একটু জল খাও।

থাকোহরির বিলক্ষণ ক্ষুধা পেয়েছিলো বলেও বটে এবং অপরিচিত স্থানে ওজর আপত্তির কোনো কথা বলতে লজ্জা অনুভব করেও বটে সে কোনো কথা না বলে কুণ্ঠিত ভাবে এই রাজভোগ খেতে বসলো।

তার সামনে পবান-বাবু মেয়েকে কোল থেকে নামিয়ে তাব হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছেন; মাতঙ্গিনী কপাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে দারিদ্র্যমূর্তি বালকটির প্রতি করুণায় কাতর হয়ে তার খাওয়া দেখছেন; এমন সময় একজন চাকর এসে পরান-বাবুকে বললে বাইরে একজন বাবু এসেছেন।

পরান-বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—কোন্ বাবু?

চাকর বললে—এ বাবু নতুন—খুব রোগা ফর্সা মতন...

এই শুনেই পরান-বাবু বলে উঠলেন—ও! রামযাদু বাবু এসেছেন। তাঁকে আমি আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিতে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। পরের দুঃখে যাঁর চোখের জল পড়ে, তিনি মহাপুরুষ!

থাকোহরি এতক্ষণ মাথা হেঁট করে খাবার খাচ্ছিলো; পরান-বাবুর কথা শুনে সে মুখ তুলে পরান-বাবুর দিকে চাইতেই পরান-বাবু তাকে বললেন—সেই যে বাবুটি কাগজ কিনে তোমায় দেখতে দিয়েছিলেন...

থাকোহরির মন সেই অচেনা দরদির নাম শুনেই কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো, তার চোখ ছলছল আর মুখ জ্বলজ্বল করতে লাগলো।

থাকোহরির মুখের ভাব দেখে খুশি হয়ে পরান-বাবু বললেন—তুমি বসে বসে খাও, তাড়াতাড়ি কিংবা লজ্জা করোনা, আমি রামযাদু-বাবুর সঙ্গে আলাপ করিগে।...ওগো, তুমি বেরিয়ে এসো না, একরত্তি ছেলেমানুষকে দেখে আবার লজ্জা!

স্বামীর ডাকে লজ্জিত হাসিমুখে মাতঙ্গিনী কপাটের আড়াল থেকে একটু একটু করে সরে এসে থাকোহরির পিছনে দাঁড়ালেন। পরান-বাবু বললেন—তুমি থাকোহরিকে খাওয়াও, আমি বাইরে বামযাদু-বাবুর কাছে যাই।

মাতঙ্গিনী চাপা গলায় ফিস্‌ফিস্‌ করে জিজ্ঞাসা করলেন—তাঁর জলখাবার বাইরে পাঠাবো কি?

পরান-বাবু বাইরে যেতে যেতে বললেন—তিনি ব্রাহ্মণ। আমার বাড়িতে খাবেন বুঝলে বলে পাঠাবো।

কৃষ্ণকলি বাবার হাত ছেড়ে দিয়ে এসে মার হাত ধরে কৌতূহলভরা দৃষ্টিতে থাকোহরির খাওয়া দেখতে লাগলো।

থাকোহরি অপরিচিত লোকেব বাড়িতে প্রথম দিন এসেই খেতে লজ্জা বোধ করছিলো; তাতে আবার এখন অন্তঃপুরের সীমানায় বসে একজন স্ত্রীলোকের সামনে তাঁরই তদারকে খেতে তার অত্যন্ত লজ্জা করতে লাগলো।

সে আড়ষ্ট হয়ে অল্প খেয়েই পরান-বাবুর যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হাত গুটিযে বসলো।

তা দেখে মাতঙ্গিনী থাকোহবির সামনে একটু এগিয়ে এসে বললেন—এখুনি হাত গুটুলে তো চলবে না বাবা—বেশি তো কিছু দিইনি—ও সব তোমায় খেতে হবে...

থাকোহরি অপ্রতিভ মুখ না তুলে এবং কিছু না বলেই আবার খেতে প্রবৃত্ত হলো। বাইরের অনুরোধের চেয়ে তাব আভ্যন্তরিক অনুরোধ তখনও প্রবল ছিলো। সে পাত্রের সমস্ত খাদ্য নিঃশেষ করে হাত গুটিয়ে বসলো।

তখন মাতঙ্গিনী বললেন—উঠে হাত ধোও বাবা। ও ভুখন, বাবুর হাতে জল দে।

দালানেব একপাশে যেখানে ভুখন কাঁধে ধোয়া নূতন তোযালে আর হাতে জলের ঘটি নিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলো, থাকোহরি সেখানে গিয়ে কুণ্ঠিত হয়ে বললে—ঘটিটা আমায় দাও, আমিই জল নিচ্ছি...

থাকোহরির কথা শুনেই মাতঙ্গিনী ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন—না, না, ও ঘটি তুমি ছুঁয়ো না, তোমার ছোঁয়া জল আবার কোথায় পড়বে টড়বে আর আমরা মাড়াবো...

থাকোহরি মনে করলে সে ছোটো জাত বলে মাতঙ্গিনী তাকে ঘটি ছুঁতে নিষেধ করছেন। থাকোহরি সঙ্কুচিত হযে অপ্রতিভ মুখে চাকরেব দিকে হাত বাড়িয়ে নত হলো,

চাকরের হাতের ঘটি থেকে ঢালা জলে হাত মুখ ধুয়ে সে ফিরে দাঁড়িয়ে নিজের কোঁচার কাপড়ে হাত মুখ মুছতে লাগলো; চাকর তোয়ালে এগিয়ে দিলে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে বললে—থাক্...

মাতঙ্গিনী তখন কন্যার হাতে পানের ডিবে দিয়ে বললেন—কলি, যাও, তোমার মাস্টার মশায়কে পান দাওগে।

থাকোহরি লজ্জিত মৃদুস্বরে বললে—আমি পান খাইনে। মাতঙ্গিনী তাড়াতাড়ি ঘরে যেতে যেতে বললেন—তবে দাঁড়াও বাবু, মশলা এনে দিচ্ছি।

মাতঙ্গিনী চলে গেলে কৃষ্ণকলি আশ্রয়হীনা ক্ষুদ্র লতার মতন অপরিচিতের সামনে দাঁড়িয়ে কৌতুক ও কৌতূহলের সঙ্গে তাকে দেখছিলো এবং মার কাছে পালাবে কি মার আগমনের অপেক্ষায় দাঁড়াবে এই দ্বিধা মীমাংসা করবার চেষ্টা করছিলো। তার মতিস্থির হবার আগেই থাকোহরি হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে টপ করে কৃষ্ণকলিকে কোলে তুলে নিলে এবং তার মুখের দিকে মুখ ফিরিয়ে হেসে জিজ্ঞাসা করলে—তোমার নাম কি খুকুমণি?

কৃষ্ণকলি থাকোহরির প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে লজ্জার সঙ্কোচে মুখ ফিরিয়ে তার কোল থেকে নেমে পড়বার জন্য ছট্‌ফট্ করতে লাগলো, কিন্তু থাকোহরির বাহুবেষ্টন থেকে নিজেকে কিছুতেই মুক্ত করতে পারছিলো না।

মাতঙ্গিনী একটা ডিবের খোলে করে মশলা নিয়ে ঘরের দরজার কাছে এসেই মেয়েকে থাকোহরির কোলে দেখে আতঙ্কিত হয়ে বলে উঠলেন—ও কি সর্বনাশ করছো বাবা! ওর পা যে তোমার গায়ে ঠেকছে—শিগ্‌গির নাবিয়ে দাও ওকে, শিগ্‌গির নাবিয়ে দাও। এতে আমাদের অপরাধ হবে যে, পাপ হবে যে!

কৃষ্ণকলি থাকোহরির কোল থেকে নাম্‌বার জন্য চেষ্টা করছিলই, তার উপর মাতঙ্গিনীর হঠাৎ ব্যস্ততায় অপ্রস্তুত হয়ে থাকোহরি কৃষ্ণকলিকে কোল থেকে নামিয়ে দিলে।

মাতঙ্গিনী অমনি মেয়েকে বললেন—মাস্টার মশায়কে পেন্নাম করো কেষ্টো—মাস্টার মশাই বামুন, তাঁর গায়ে পা ঠেকেছে...

কৃষ্ণকলি সার্কাসের শায়েস্তা জানোয়ারের মতন ব্রাহ্মণ শব্দের সঙ্কেতেই থাকোহরির সামনে গড় হয়ে প্রণাম করতে যাচ্ছিলো; থাকোহরি খপ করে তাকে ধরে আবার কোলে তুলে নিয়ে লজ্জিত মুখে মাতঙ্গিনীকে বললে—আমরা বামুন নই মা; আমরা জাতে মাহিষ্য।

মাতঙ্গিনী আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলেন—বামুন নও! কৈবর্ত? তবে যে কত্তা বলছিলেন তোমার মা কাদের বাড়ি রাঁধুনির কাজ করেন।

থাকোহরি অপ্রস্তুত কুণ্ঠিতভাবে বললে—দাসীর কাজের চেয়ে রাঁধুনির কাজে একটু সম্মান খাতির বেশি পাওয়া যায় আর মাইনেও বেশি মেলে, তাই মা রাঁধুনির কাজ করেন।

মাতঙ্গিনী শিউরে উঠে মুখ একেবারে অন্ধকার করে বলে উঠলেন—সর্বনাশ! সে কি গো! লোকের জাত মারা! সে যে বিষম পাপ।

থাকোহরি অপ্রতিভভাবে বললে—মা ব্রাহ্মবাড়ি রাঁধেন। ব্রাহ্মরা তো জাত মানে না

থাকোহরির এ উত্তরে মাতঙ্গিনী কিছুমাত্র আশ্বস্ত না হয়ে বললেন—বেহ্মজ্ঞানী, তার তো খ্রীস্টান। ওমা, খ্রীস্টানের বাড়ি রান্না খাওয়া! তা হলে তোমাদেরও জাত নেই—তোমরাও খ্রীস্টান নাকি?

থাকোহরি অত্যন্ত অপ্রস্তুতভাবে বললে—আজ্ঞে না। সেখানে হাঁড়ি হেঁসেল আর কেউ ছোঁয় না, আমরা সেখানে স্বপাক খাই।...

মাতঙ্গিনী এই কথায় একটু আশ্বস্ত হয়ে বললেন—তা হোক্ বাছা। কিন্তু খ্রীস্টানের বাড়ি তো। সেখানে তোমরা আর থেকো না। তোমরা যখন আমাদের স্বজাত, তোমরা আমাদের বাড়িতে এসেই থাকো। এখানে কলিরও কেউ খেলবার সঙ্গী নেই, আমিও একলাটি আর পেরে উঠিনে। অপরাধের ভয়ে বামুন তো রাখতে পারিনে; আমাদেরই স্বজাতের একটি মেয়ে ছিলো এতোদিন, ঘর সংসার দেখতো শুনতো; তার মেয়ে-জামাই-এর অবস্থা হচ্ছে বলে সে চলে গেছে। এখন তোমার মা এলে আমিও একজন কথা কইবার লোক পেয়ে বাঁচি।

থাকোহরি এই অপরিচিত দম্পতির মহৎ উদার সদয় হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে একবার মাতঙ্গিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তাঁর পায়ের কাছে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে।

থাকোহরি প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই মাতঙ্গিনী বললেন—তা হলে এই ঠিক হলো তো বাবা? মাকে নিয়ে এসে এই বাড়িতেই থাকবে তো?

পিছন থেকে পরান-বাবু তাঁর প্রাণখোলা সাদা সরল হাসি হেসে বলে উঠলেন—আমাকেও তুমি জিতে গেলে গিন্নি! আমি কেবল থাকোহরিকেই নিমন্ত্রণ করেছিলাম, তুমি থাকোহরির মা-ঠাকরুনকেও নিমন্ত্রণ করলে। আমরা যখন স্বজাত, পরিচয় হলে একটা সম্পর্কও বেরিয়ে যেতে পারে চাই কি। আত্মীয়ের সঙ্গে থাকতে আর বাধা কি? কি বলো বাবা?

থাকোহরি মুখে কিছু বলতে না পেরে পরান-বাবুকেও প্রণাম করে পূর্ণ প্রাণের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করলে।

পরান-বাবু বললেন—তবে তোমার মাকে নিয়ে আজই এসো, কেমন?

থাকোহরি বিনীত মৃদুস্বরে বললে—মা যাঁদের বাড়ি কাজ করেন, তাঁরা একজন লোক না পাওয়া পর্যন্ত চলে আসা কি ঠিক হবে?

পরান-বাবু খুশি হয়ে বলে উঠলেন—ঠিক বাবা ঠিক! তবে যতো শিগ্‌গির পারো—এসো।

থাকোহবি নতমুখে বললে—আচ্ছা।

পরান-বাবু বললেন—বামযাদু বাবুর মতন কোরো না যেন। আসবো বলে আব দেখা নেই। তিনিই দয়া করে পায়ের ধুলো দিতে এসেছেন মনে করে তাড়াতাড়ি বাইরে গেলাম; গিয়ে দেখি সে রামযাদুবাবু নয়, সে বামাচরণ। রামযাদুবাবু অতি চমৎকার মহাশয় লোক—নয়?

থাকোহরি মৃদুস্বরে বললে—আজ্ঞে।

পরান-বাবু বলে উঠলেন—একটা বড়ো ভুল হয়ে গেছে হে—তাঁর ঠিকানাটা জেনে রাখা হয়নি। তিনি দয়া করে নিজে না এলে অমন মহৎ লোকের দর্শন আর পাওয়া যাবে না। তোমার ঠিকানাটা বলো তো—

তুমি আপনি না এলে আমি যেন ধরে আনতে পারি।

থাকোহরি কৃতজ্ঞ আনন্দে লজ্জিত স্মিতমুখে বললে—আমরা থাকি ৬৭।১।১এ অচিন্ত্য দত্তর গলিতে নীলাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ডাক্তারের বাড়ি।

পরান-বাবু হেসে বললেন—অতো কথা বুড়োমানুষের মনে থাকবে না—বাইরে চলো একটু লিখে দেবে।

থাকোহরি পরান-বাবুর পিছনে পিছনে বাহির বাড়িতে চলে গেলো।

থাকোহরি চলে যেতেই কৃষ্ণকলি মার মুখের দিকে মুখ তুলে বলে উঠলো—ও কে মা? ও বেশ ভালো—না? কেমন ফস্‌সা সাদা! কেমন কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া চুল মা! দাঁতগুলো চক্‌চক করছে—পান খায় না কি না? খুব ভালো—না মা?

মাতঙ্গিনী হেসে ঘাড় কাত করে মেয়ের কথায় সায় দিলেন।

কৃষ্ণকলি আবার বলতে লাগলো—কিন্তু ও অতো বোগা কেন মা?

মাতঙ্গিনী ব্যথিত হয়ে করুণার্দ্র স্বরে বলে উঠলেন—আহা গবিব, ভালো করে খেতে পরতে পায় না...

কৃষ্ণকলি বলে উঠলো—তুমি তো ওকে খেতে দিলে মা, কৈ মোটা তো হলো না?

মাতঙ্গিনী হেসে বললেন—একদিন খেলেই কি মোটা হয় রে পাগ্‌লি? বোজ রোজ খুব পেট ভরে খেলে তবে মোটা হয়।

কৃষ্ণকলি বললে—ও তো এখানে এসে থাকবে, ওকে বোজ রোজ খেতে তো দেবে, তা হলেই তো তোমার মতন আর বাবার মতন মোটা হয়ে যাবে?

মাতঙ্গিনী হেসে বললেন—হ্যা।

কৃষ্ণকলি গাল ফুলিযে বলে উঠলো—না মা, অতো মোটা বুঝি ভালো? মোটা হলে আবাব কালো কিস্টিও হয়ে যাবে তো? ওকে তা হলে বেশি বেশি খেতে দিয়ো না মা।

মাতঙ্গিনী হেসে উঠে বললেন—আচ্ছা রে আচ্ছা, ওকে তোব মনেব মতন করেই গড়ে তুলবো।

এই কথা বলতেই মাতঙ্গিনীব মনে থাকোহরিকে ঘবজামাই কববাব ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাটা বিদ্যুৎ-চমকের মতন উঁকি মেবে চলে গেলো।

পরান-বাবু তাঁর বাড়িতে পায়ের ধূলা দিবাব যে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তা বামযাদু প্রথমত ততো গ্রাহ্য করেনি। রামযাদু বুঝতে পাবেনি যে সেই নিমন্ত্রণ বক্ষা করলে তাব কিছু স্বার্থ-সিদ্ধির সম্ভাবনা থাকতে পাবে; বিনা স্বার্থে কোনো কাজ করবার মতন স্বভাব রামযাদুর ছিলো না।

রামযাদুর চেহারা তার স্বার্থপর স্বভাবকে ছেলেবেলা থেকে সাহায্য করে করে তার স্বভাবকে একেবারে পাকা করে গড়ে তুলেছিলো। তার চেহারাটাই ছিলো এমন যে তাকে দেখলেই লোকের মনে করুণার উদ্রেক হতো, আহা বলে মমতা দেখাতে ইচ্ছা করতো। তার রংটা ছিলো ফ্যাকাশে, শরীরটা ভয়ানক কৃশ, নাকটা দন্ত্য-স উল্টে ধরলে যেমন দেখায় তেমনি বঁড়শির মতন বাঁকা আর ছুঁচোলো, চোখ দুটো ছিলো ছল্‌ছলে—যেন একটা কিছু দুঃখ-ব্যথা তার অন্তরে গোপন থেকে চোখের আয়নায় আপনার ছায়া ফেলেছে; তার মুখের মোট ভাবটা ছিলো নিরীহ, মনটা ছিলো সাবধানী, স্বভাবটা ছিলো সংসারী—যেখানে যেমনটি হলে সুবিধা হতে পারে সেখানে ঠিক তেম্‌নিটি হুঁশিয়ার হয়ে চারদিকের তাল সামলে সে চলতে পারতো—এ ছিল তার সহজাত বুদ্ধি, স্ব-ভাব, ইংরেজিতে যাকে বলে ইন্‌স্টিংক্‌ট্‌। সে যার কাছে যে কাজের জন্যে হাজির হতো, তারই এমন করুণা আকর্ষণ করতো, যে কেউ তাকে একেবারে অগ্রাহ্য বা উপেক্ষা করে ছেঁটে ফেলতে পারতো না। তার এই ঈশ্বরদত্ত সুবিধা তার কাছে ধরা পড়েছিলো তাব ছেলেবেলাতেই—যখন তার বয়স সবে ষোলো বছর।

রামযাদুর বাড়ি ছিলো যশোর জেলায় চিত্রা নদীর তীরে একটা ছোট গাঁয়ে। তাদের সাংসারিক অবস্থা ভালো না হলেও মন্দ বলা যায় না; তাদের ছিলো চার ভিটায় চারখানা চালা ঘর, গোয়ালে দুধালো দুটি গাই, কয়েক বিঘা লাখেরাজ ব্রহ্মত্র জমিতে সম্বৎসরের ধানের সংস্থান, খেজুর-গাছে গুড়, আর সুপারি ও নারিকেল গাছের একটা বাগান,—যার ফলকর বেচে তেল নুন কাপড়েব পয়সা জোগাড় হতে পারতো; এর উপবে রামযাদুর বাবা নড়ালের বাবুদের জমিদারিতে দূর মফস্বলে গোমস্তার কাজ করতো—সেই কাজের মাইনে সামান্য হলেও রামযাদুর মা বেশ ভারি ভারি খানকতক সোনা-রূপার গহনা গায়ে পরে আপন এয়োতের পয় আর জোর জানাতো। রামযাদুর বাবা মারা গেলে আয় অনেকটা কমে গিয়েছিলো বটে, কিন্তু তবু তাদের কষ্টে পড়তে হয়নি—পরিবারে তো তারা মাত্র দুজন—মা আর ছেলে; রামযাদুর এক বড়ো বোন ছিলো, কিন্তু তার বাবা থাকতেই তার বিয়ে হয়ে গিয়েছিলো।

রামযাদুর দিদির শ্বশুরবাড়ির অবস্থা ভালো ছিল না মোটেই। তার ভগ্নীপতি ছিলো যশোরের এক উকিলের মুহুরি—এই চাকুরীটুকু ছাড়া তার আব কোনো সঙ্গতিই ছিলো না। তাই বোন যখন বিধবা হলো তখন ভাই-এর আশ্রয় ছাড়া তার আর কোনো গতি রইলো না।

এই পরিবার-বৃদ্ধির সম্ভাবনাতে বালক রামযাদু একটু ক্ষুণ্ণ ও চিন্তিত হয়ে উঠলেও মার আদেশে দিদিকে নিজেদের বাড়িতে আনবার জন্য তাকেই যশোরে যেতে হয়েছিলো। বিধাতা এক-একজনের উপর অকারণেই প্রসন্ন থাকেন; রামযাদুর অদৃষ্টটাও ছিলো তেমনি; সে ক্ষুণ্ণ মনে যশোরে গিয়ে খুশি হয়েই ঘরে ফিরেছিলো।

যশোরে গিয়ে যখন সে পৌঁছালো, তখন রাত প্রায় দশটা। পথ অন্ধকার, নির্জন, স্টেশন থেকে তার দিদির বাসা পর্যন্ত অনেকখানি পথ। রামযাদুর একলা যেতে ভয় করতে

লাগলো, অথচ এইটুকু পথের জন্যে গাড়ি ভাড়া করতেও তার ইচ্ছে হচ্ছিলো না—সেই ছেলেবেলাতেই সে দস্তুরমতো হিসাবী সংসারী,—এই গুণটি সে উত্তরাধিকার সূত্রে পিতৃ-পিতামহের কাছ থেকে নিজের শোণিত-মজ্জার মধ্যে বিনা চেষ্টাতে, কেবল জন্মাধিকারেই পেয়েছিলো। রামযাদু ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে হনহন করে পথ চলছে, তার গাটা ছমছম করছে, কিন্তু সে মনের মধ্যে কোনো ভয়ের চিন্তাকেই আকার ধরে স্পষ্ট হয়ে উঠতে দিচ্ছে না। হঠাৎ তার কানে আওয়াজ এলো,—"মানিকপিব মুস্কিল আসান!" মুস্কিল আসান ফকিরদের মোটা চড়া গলার চিৎকার রামযাদুর মনে ছেলেবেলা থেকেই আতঙ্ক উৎপন্ন কবতো; এই ফকিরেরা ভিক্ষায় বাহির হয় তখন, যখন রাত্রের অন্ধকার ছেলেদের জুজুর ভয় দেখিয়ে জড়োসড়ো কবে ঘুম পাড়াবার জোগাড় করে, যখন শিশু-কল্পনার আড়াল আবডাল থেকে আলো-আঁধারের মধ্যে উঁকি মেরে ভূত পেত্নি শাঁকচিন্নি ভয় দেখাতে থাকে। রামযাদুর বয়স এখন শৈশব পেরিয়ে যৌবনের দিকে পা বাড়ালেও, এই নিশুত নিঝুম রাতে নির্জন পথে একলা চলতে চলতে মুস্কিল-ত [illegible] রব শুনেই শৈশব-সংস্কারের বশে তাব মনটা ছাঁত কবে উঠলো। সে চকিত দৃষ্টিতে চারিদিকে একবার তাকিয়ে একটু এগিয়ে যেতেই দেখলে মুস্কিল-আসান ফকির তার চারমুখো চেরাগ হাতে ধরে ভিক্ষা সেরে বাড়ি ফিরছে—চাবমুখো চেরাগেব আলোতে ফকিরের প্রকাণ্ড চওড়া মুখেব এক-বোঝা কাঁচা-পাকা দাড়ি আর তাব লম্বা ঝল্‌ঝলে আল্‌খাল্লার সামনেটা উজ্জ্বল হযে উঠেছে। বামযাদু বাল্য সংস্কাবের ভয়টা চট কবে দমন কবে হনহন করে ফকিরের কাছে এগিয়ে গিযেই বলে উঠলো—এই যে মুস্কিল-আসন ফকির। তোমাদেরই একজনকে আমি সন্ধ্যে থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

ফকির উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কেন বাবা, কেন? কিসের জন্যি?

রামযাদু একটুও না ভেবে তৎক্ষণাৎ বললে—মা আমাব কল্যেণে সওয়া পাঁচ আনার সিন্নি মানসিক করেছিলো, তাই দেবার জন্যি।

সওযা পাঁচ আনা! পিরেব দোযায দমকা লাভের আশায উৎসাহিত হয়ে ফকির বললে—দাও বাবা দাও, বাবা মানিকপিব তোমাদের সকল মুস্কিল আসান কববেন—মানিকপিব মুস্কিল আসান!"—ফকির উল্লাসে আজান দিযে উঠলো।

রামযাদু পযসা বাহিব কববার জন্য কোটেব ডান দিকের পকেটে হাত ভবলো, তার পর যেন সেই পকেটে পযসা না পেয়ে বাঁ দিকের পকেটে হাত দিলে; তাব পর সেখানেও যেন পয়সা না পেয়ে বুক-পকেটে খুঁজলে; অবশেষে কোথাও যেন পয়সা না পেয়ে আবার ব্যস্ত হযে এ-পকেট সে-পকেট হাঁটকে দেখতে দেখতে মুখ কাচুমাচু করে বললে—পয়সাগুলো বাড়িতেই ফেলে এসেছি দেখ্‌ছি। যাক্‌গে. কাল আব কাউকে ডেকে দিয়ে দেবো।

সওয়া পাঁ—চ আনা পযসা। কাল কোন ফকিরকে ডেকে দিয়ে দেবে তাব তো ঠিক নেই। ফকির চিন্তান্বিত হয়ে কেমন একবকম ঝিমানো স্বরে বললে—তা চলো বাবা, তোমার বাড়িতেই যাই, মানসিকেব পযসা ফেলে রাখ্‌তি নেই।

রামযাদু বললে—কিন্তু আমাদের বাড়ি যে এখান থেকে অনেক দূর—সেই কাছারির কাছে। এত রাত্রে তুমি আবার অত দূর যাবা?

রামযাদুর ছল্‌ছলে চোখ আর হাব্‌লাটে মুখ দেখে ফকির ভুলে গিয়েছিলো; সে বললে—তা হোক বাবা। লোকের মানসিকের ধার শোধ করিয়ে মানিকপিরকে খুশি করে দেওয়াই তো আমাদের কাজ। মানিকপির খুশি হলি কারো কোনো মুস্কিল থাকে না—বাবা মানিকপির মুস্কিল আসান!" ফকির সওয়া পাঁচ আনা পয়সা পাবার লোভের আনন্দে আবার ডাক ছেড়ে হেঁকে উঠ্‌লো।

রামযাদু আর দ্বিরুক্তি মাত্র না করে ফকিরের চারমুখো চেরাগের জোর আলোতে পথ দেখে দেখে একজন আগল্‌দার সঙ্গী পেয়ে নির্ভয় খুশি মনেই দিদির বাড়ির দিকে চললো।

দিদির বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে রামযাদু ফকিরকে বললে—এখানডা বড়ো গলি ঘুঁজি; আমার গাডা ছমছম কর্‌তি লেগেছে, তুমি আমার আগে আগে কাছে কাছে চলো ফকির।

ফকির সাহস দিয়ে বললে—ভয় কি বাবা, মুস্কিল-আসানের চেরাগের রোশ্‌নি যতদূর যায় তার চৌহদ্দির মধ্যি জিন দানা ভূত পেরেত কেউ আস্‌তি পারে না। আমি আগে আগে যাচ্ছি—তোমার কিচ্ছু ডর নেই।

ফকির রামযাদুর আগে গিয়ে কিছুদূর যেতেই রামযাদু নিঃশব্দে ও সত্বর পদে সুট্ করে পাশের এক শুঁড়ি গলির অন্ধকারের ভিতর সরে পড়্‌লো। ফকির খানিক দূর গিয়ে পিছনে রামযাদুর পায়ের শব্দ না শুন্‌তে পেয়ে পিছন ফিরে দেখলে রামযাদু নেই। প্রথমে সে মনে করলে রামযাদু বোধ হয় একটু পিছিয়ে পড়েছে। তাই সে ফিরে দাঁড়িয়ে চেরাগটা একটু উস্কে দিলে, এবং আলো-আঁধারের মধ্যে দৃষ্টি পাঠাবার চেষ্টা করে রামযাদুর তল্লাস করতে করতে ঝিমানো মোটা সুরে বললে—কৈ বাবা, আস্‌তিছো?

শ্রীবৎস রাজার বনবাসে রানি চিন্তাদেবীর হাত থেকে পোড়া শোল-মাছ জলে পালিয়ে গেলে তাঁর মনের অবস্থা যেমন হয়েছিলো, রামযাদুর কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে মুস্কিল-আসান ফকিরের মনের অবস্থা ততোধিক শোচনীয় হয়ে পড়্‌লো। পরের মুস্কিল আসান করতে এসে সেই পড়্‌লো মুস্কিলে! ফকির হতাশার ক্ষোভে কাতর হয়ে আর্তনাদ করে ডাকতে লাগলো—ও মানসিকওয়ালা বাবা! কনে গেলে বাবা? ও মানসা-করা বাবা! জবানে কবুল-করা মানসিক দাও বাবা!

আর বাবা! বাবা তখন এ-গলি থেকে ও-গলির বাঁক ফিরে সে-গলি দিয়ে ছুটে চলেছে। এক-একবার ফকিরের আর্তনাদ তার কানে এসে পড়ে, আর তার গতি দ্রুততর হয়ে ওঠে।

ফকিরের আওয়াজ চার-পাঁচ বারের পর রামযাদু আর শুনতে পেলে না। তখন সে নিশ্চিন্ত খুশি মনে দিদির বাড়ির দরজায় গিয়ে ডাকাডাকি করতে লাগলো।

ফকিরের ব্যাকুল চিৎকারে পাড়ার লোকেদের নিরুপদ্রব নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাতে পাঁচ-সাত দিক থেকে পাঁচ-সাত জনে একসঙ্গে সমস্বরে এমন ধমক দিয়ে উঠলো যে ফকির বেচারা দ্বিতীয় নূতন মুস্কিলের ভয়ে হঠাৎ চুপ করে গেলো। কিন্তু সে অস্পষ্ট স্বরে গজ্‌গজ্ করতে করতে মানসিকওয়ালা ছোঁড়ার চৌদ্দ পুরুষের সঙ্গে নানাবিধ সামাজিক অসামাজিক ঘনিষ্ঠ

সম্পর্ক পাতাতে পাতাতে তাদের জন্য বিবিধ অখাদ্য খাদ্যরূপে বরাদ্দ করতে করতে করতে সেই দীর্ঘপথ উজান বেয়ে আবার ফিরতে লাগলো। নিরুপায় ক্ষুণ্ণ মনকে সে এই বলে সান্ত্বনা দিতে লাগলো যে বাবা মানিকপিরের নাম নিয়ে ঠকামি—তিন রোজের মধ্যে এর সাজা হাতে হাতে পেতে হবে না!

কিন্তু বুদ্ধিমান লোককে বিধাতাও এঁটে উঠতে পারেন না—সে বুদ্ধির জোরে সবাইকে ঠকিয়ে নিজেব সুযোগ আবিষ্কার করে নেয়। মানিকপির তাঁর ভক্ত-ফকিরের আর্‌জি সত্ত্বেও রামযাদুকে মুস্কিলে না ফেলে তার বিশেষ আসানই করবার সূত্রপাত করে দিলেন।

রামযাদুর ভগ্নীপতি ছিলো যশোরের উকিল কিরণবাবুর মুহুরি। কিরণ-বাবুর মনটা ছিলো এমন বড়ো যে তিনি বাড়িব চাকরকেও নিজের আত্মীয়ের মতন দেখতেন। তাঁর মুহুরির অসুখের সেবা থেকে মৃত্যুর পর সৎকাব পর্যন্ত তিনি নিজের হাতে ও নিজের খরচে কবেছেন, মুহুবিব মৃত্যুতে কেঁদে আকুল হযেছেন।

রামযাদুব দিদি ভাই-এর সঙ্গে বাপের বাড়ি যাবার উদ্‌যোগ করে ভাইকে বললে—যা, একবাব বাবুকে বলে আয, তিনি আমাদের অনেক করেছেন।

বামযাদু কিবণ-বাবুব কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে নিজেব পরিচয় দিতেই কিরণ-বাবুর চোখ জলে ভবে উঠলো। তিনি রামযাদুর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন, কিছু বলতে পারলেন না।

কিরণ-বাবুব চোখেব জল গড়িযে না পড়লেও তাঁর চোখের ছলছলে ভাব রামযাদুর চোখ এড়ালো না। সে বললে—দিদিকে আমি নিয়ো যাবো তাই আপনার অনুমতি নিতে এসেছি।

কিরণ-বাবু জিজ্ঞাসা কবলেন—তোমার দিদি এখন কোথায যাবেন? শ্বশুরবাড়ি, না তোমাদের বাড়ি?

রামযাদু বললে—দিদির শ্বশুববাড়িতে কেউ নেই; আর ওখানকার অবস্থাও তো ভালো নয়। দিদিকে আমাদেব কাছেই থাক্‌তে হবে। আমাদেরও অবস্থা ভালো নয়। কিন্তু এক মায়ের পেটের বোন, তাঁকে তো আমি ফেলতে পারবো না—এক মুঠো ভাত জুট্‌লে তাই দুভাগ কবে খেতে হবে।

ছেলেমানুষের মুখে জ্যাঠামির কথা শুনেও কিরণ-বাবু খুশি হয়ে বললেন—এই তো চাই বাবা! যার এমন মন তার কখনো কোনো অভাব ভগবান বাখেন না। তোমার বাবা কি করেন?

রামযাদু মুখ মলিন করে বললে—বাবার দু বচ্ছব হলো কাল হযেছে। তিনি নড়ালের বাবুদেব জমিদাবিতে গোমস্তার কাজ করতেন। বাবার কাল হওযার পর মা ধান ভেনে কষ্ট করেও আমায় পডাচ্ছিলেন। এখন দিদিকে নিয়ে যাচ্ছি; আমায় এখন পড়া ছেড়ে একটা কাজকর্মের জোগাড় করতে হবে।

রামযাদুর চোখের জল ছিলো হাতধবা; তাব চোখের স্বাভাবিক ছলছলে ভাবটা ইচ্ছা করলে একটুতেই জলধাবায পবিণত হযে গড়িয়ে ঝরে পডতে পারতো। এখানে সে সেই

দুর্লভ অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে কিরণ-বাবুর কোমল করুণাপ্রবণ মনে অমোঘ অস্ত্র আঘাত করলে। কিরণ-বাবু জানতেন তাঁর মুহুরির অবস্থা কিরকম বিষম দরিদ্র ছিল; তার হাতে যারা মেয়ে সম্প্রদান করেছিলো তাদের অবস্থাও যে ভালো নয় এ কথা বিশ্বাস করতে তাঁর একটুও দ্বিধা বোধ হলো না। তিনি ব্যথিত হয়ে বললেন—না না বাবা, এই বয়সে তুমি লেখাপড়া ছেড়ো না। তুমি যদি বরাবর পাস করে যেতে পারো, আমি মাসে মাসে তোমায় দশ টাকা করে দেবো।

রামযাদুর মুখে চোখে হর্ষগদ্‌গদ কৃতার্থতার ভাব ফুটে উঠলো। রামযাদু বিনীত ভাবে বললে—আপনার দয়ার কথা দিদির কাছে শুনেছি। আপনি দিদিকে দেখবেন—আপনিই এখন তার অভিভাবক।

কিরণ-বাবু এ কথার কোনো জবাব দিলেন না, একটু অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন চিন্তা করতে লাগলেন।

কিরণ-বাবুকে অন্যমনা দেখে রামযাদু বললে—আজ্ঞে এখন তবে আসি।

কিরণ-বাবু একটা টিনের হাত-বাক্‌স খুলতে খুলতে বললেন—দাঁড়াও ঠাকুর, পায়ের ধুলো না দিয়ে যাবে কোথায়?

কিরণ-বাবু কায়স্থ; ব্রাহ্মণের উপর তার গভীর ভক্তি। তিনি বাক্‌স থেকে তিন খানি দশ টাকার নোট বার করে বাঁ হাতে রাখলেন এবং ডান-হাতে রামযাদুর পায়ের ধুলো মাথায় দিলেন; তার পর রামযাদুর হাতে একে একে গুনে গুনে তিনখানা নোট দিতে দিতে বললেন—এই নাও ঠাকুর, তোমার পায়ের ধুলোর দক্ষিণা। এই তোমাদের পথ-খরচ। আব তোমার দিদিকে বোলো, বদ্দিনাথ আমার কাছে যা মাইনে পেতো তার অর্ধেক আমি তোমার দিদিকে মাসে মাসে পাঠিয়ে দিতে থাকবো। তোমাদের বাড়ির ঠিকানাটা কি বলো তো, লিখে রাখি।

রামযাদু অপ্রত্যাশিতভাবে তিন দশে ত্রিশ টাকা পেয়ে পরম উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। তার চেয়ে সকল রকমে বড়ো কিরণ-বাবুকে অসঙ্কোচে পায়ের ধুলো দিযে ঠকিয়ে সে চলে এলো। পথ-খরচের টাকা পাওযা ও ভবিষ্যতে তার পড়ার সাহায্য ও দিদির মাসহারা পাবার বন্দোবস্তের কোনো খবরই সে তাব দিদি বা মাকে জানানো আবশ্যক মনে করলে না। সে বাড়িতে ফিরে গিয়েই পোস্ট অফিসের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে নিজের নামে একটা হিসাব খুল্‌লে।

বামযাদু ক্রমে ক্রমে বি-এ পাশ করেছে এবং কিরণ বাবুর কাছ থেকে বরাবর মাসে মাসে টাকা আদায় করে এসেছে, অথচ এই টাকা পাওয়ার কথা সে আর দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে ব্যক্ত করে নি—এমনি তার মন্ত্রগুপ্তির সাবধানতা!

এন্ট্রাস পাস করেই রামযাদু বিযে করেছিলো। তার শ্বশুর বেচারা কন্যার পিতা হওয়ার দণ্ড স্বরূপ জামাইকে পড়ার খরচ বলে মাসে মাসে দশ টাকা ঘুষ জুগিয়ে এসেছে।

এই বকম দু-তরফা সাহায্য পেয়ে রামযাদু বেশ নির্ভাবনায় লেখাপড়া করে চলেছিলো। বাল্যে তার চরিত্রে যেসব গুণ অস্ফুট ইঙ্গিত মাত্র ছিলো, বয়স জ্ঞান ও বিদ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে

সঙ্গে সেইসব গুণ অনুশীলন ও অভ্যাসের দ্বারা তার চরিত্রগত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন সে মহা লোভী ও ধনবানের প্রতি অতি ভক্তিমান হয়ে পড়েছে। আবার দরিদ্র যারা, যাদের কাছ থেকে তার কোনো লাভের সম্ভাবনা নেই, তাদের কাছে নিজের ধনশালিতার বড়াই করতে ছাড়ে না। সে মাসে মাসে তিন বার টাকা পায়—কিরণ-বাবুর কাছ থেকে, শ্বশুরের কাছ থেকে এবং নিজের মায়ের কাছ থেকে। এই ব্যাপারটার ব্যাখ্যা সে ধনী ও দরিদ্র ভেদে দুরকম করতো। সে ধনীদের বলতো যে সে এমন গরিব যে তাকে পরের কাছে হাত পেতে তবে লেখাপড়া করতে হচ্ছে। আর গরিবদের কাছে পাকে প্রকারে জানাতো যে তার বাড়ি থেকে তো খরচ আসেই, তা ছাড়া তার শ্বশুর বিয়ের পণ একেবারে দিতে না পেরে কিস্তিবন্দি করে মাসে মাসে দেনা শোধ করছে এবং সে এমনি মহানুভব যে পণের টাকা থোকে না নিয়ে শ্বশুরকে কন্যাদায়মুক্ত করেছে; আর কিরণ-বাবুকে রামযাদুর বাবা সাহায্য করে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, সেই ঋণই কিরণবাবু মাসে মাসে শোধ করছেন- -কিরণ-বাবুকে বেশ কৃতজ্ঞ ভদ্রলোক স্বীকাব করতেই হবে, কারণ রামযাদুদের কতো টাকা কতো লোকে কতো দিকে যে বে-ওজর মেরে খেয়েছে তার তো ইয়ত্তাই নেই।

কোনো মাসে কোনো জায়গা থেকে টাকা আসতে কিছু দেরি হয়ে গেলে অথবা বরাদ্দব অতিরিক্ত কিছু খরচ হয়ে গেলে রামযাদু ধার করে—পোস্ট-অফিসেব সেভিংস-ব্যাঙ্কে সে এ পর্যন্ত কেবল টাকা জমাই বেখে এসেছে, একদিনের তরেও একটি পয়সা সেখান থেকে তুলে নেয়নি। যাদের সঙ্গে সামান্য পরিচয় আছে অথচ হামেশা দেখাসাক্ষাৎ হয় না, এমন লোক বেছে বেছে সে ধার চাইতে যায়। ধনীর কাছে ধার চাইবার বেলা সে ধোপার বাড়ি কাপড় ধুতে দেবার দিন নিজের ময়লা কাপড় পরে যায়, ধার করতে যাবার দিন যদি নিজের কাপড় নেহাৎ ফর্সা থাকে, তবে অপরের কাপড় ময়লা দেখে ধার করে পরে ধনীর কাছে ধার করতে যায়; আর গরিব সাধাবণ গৃহস্থদের কাছে যেদিন ধার নিতে যায় সেদিন তার মেসের প্রতিবাসীদের প্রত্যেকের যে জিনিসটি সব চেয়ে ভালো তাই বেছে বেছে নিয়ে দামি জামা কাপড় জুতো আংটি শাল ছড়ি ঘড়ি চেন এসেন্স প্রভৃতিতে সজ্জিত হযে বড়মানুষী ঢঙে আমিরি চালে যায়। মেসে প্রতিবাসীদেব কাছে সজ্জা ধার নেবার বেলা সে বলে— সে শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কের কারো না কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চলেছে, তাই তার এই বিলাসবেশ, এই বরসজ্জা। রামযাদুর আর একটি গুণ ছিলো—সে ধার নিয়ে অতি সহজে ও সত্বর সে কথাটা ভুলে যেতে পারতো, অনেক গরিব রামযাদুর মতন একজন ধনীকে গোটা কতক টাকা ধার দিয়ে সেটা ফেরত চাইতে লজ্জা বোধ করতো, মনে করতো তার মতন একজন বড়োলোকে কি আব গরিবের টাকা মারবে?—মনে হলেই দিয়ে দেবে; আর তাদেরও তো অদিন অসময় আছে, একজন বড়লোককে হাতে রাখা ভালো। আর যারা বড়োলোক তারাও রামযাদুকে ধার দিয়ে উশুলের জন্যে তাগাদা করতে চাইতো না—একজন গরিব ভদ্রলোককে ধারের নামে যে সাহায্য করবার সুযোগ পাওয়া গেছে এতেই তারা সন্তুষ্ট হয়ে পাওনার কথা মুখে আনে না। আর রামযাদুও ঐ সব দেনাপাওনার তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে পড়ার চাপে পাড়ু স্মৃতিকে একটু ব্যস্ত

বিব্রত হতে দেয় না। তবে যারা চক্ষুলজ্জা ভুলে বার বার তিন বার তাগাদা করে তাদের ঋণ রামযাদু আর একদিনও রাখে না, নিজের হাতে টাকা থাকলে তাই থেকে ধার শোধ করে, আর নিজের হাতে না থাকলে ধার করে ধার শোধ করে। সুতরাং খাঁটি খাড়া লোক বলে তার একটা খ্যাতিও হয়ে গিয়েছে, এবং তার জন্যে তার ধার পেতেও অসুবিধা হয় না।

বিধাতা রামযাদুকে যে স্বার্থসিদ্ধির বৃদ্ধি দিয়েছিলেন তা অভাবের অভাবে চর্চা করবার অবকাশ সে পাচ্ছিলো না, অব্যবহারে তা প্রায় ভোঁতা হয়ে আসছিলো। নিজের দান নিষ্ফল হয়ে যায় দেখেই যেন বিধাতা তাড়াতাড়ি কিরণ-বাবু আর রামযাদুর শ্বশুরকে পরলোকে ডেকে নিলেন।

রামযাদু ইতিমধ্যে ওকালতি পাশ করেছিলো, এবং যশোরের উকিল কিরণ-বাবুর আশ্রয়ে থেকেই পসার জমাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছিলো। কিরণ-বাবু বর্তমানে তাঁর সুপারিশে সে যাও বা দু-একটা মোকদ্দমা পেতো, কিরণ-বাবুর মৃত্যুতে তাও পাওয়া তার বন্ধ হয়ে গেলো। এদিকে মা-ষষ্ঠীর কৃপাদৃষ্টিতে তার ঘরে আহারের অংশীদারের সংখ্যা বছব-বছরই বেড়ে চলেছিলো। তখন সে ওকালতি ব্যবসায়ে পসারের অনিশ্চিত প্রতীক্ষায় আর থাকতে পারছিলো না; সে চাকরির সন্ধানে বেশ একটু ব্যস্ত হয়েই উঠেছিলো—মুন্সেফি জুটে তো ভালোই, নয় তো জমিদারের ম্যানেজারি বা আপিসের কেরানীগিরি যা জোটে তাই এখন স্বাগত।

মধ্যে মধ্যে সে চাকরির চেষ্টায় চাকরির আড়ত কলকাতায় আসে। কলকাতায় এসে সে তার পরিচিত কারো মেসে ওঠে এবং দুচারদিন চাকরির বাজারের হাল চাল একটু যাচাই করে সরে পড়ে—সুযোগ করতে পারলে মেসের দেনা প্রায়ই শোধ করে না এবং যে মেসকে একবার ঠকিয়ে যায় তার ত্রিসীমানায় আর পা দেয় না।

এমনি একটা চাকরির খোঁজে কলকাতায় এসে হ্যারিসন-রোডের মোড়ে থাকোহরি আর পরান-বাবুর সঙ্গে রামযাদুর আলাপ হবাব সুযোগ হয়।

পরান-বাবু যে রামযাদুকে তাঁর বাড়িতে পায়েব ধূলা দিতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন রামযাদু সে নিমন্ত্রণ গ্রাহ্যই করেনি। সেই মুদির মতন চেহারার লোকের বাড়িতে পায়ের ধূলা দিতে গেলে যে কিছু স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা আছে এমন আন্দাজ করতে সে পারেনি এবং বিনা স্বার্থে কোনো কাজ করার মতন স্বভাব রামযাদুর ছিলো না। পরান-বাবুর নাম ঠিকানাটা থিয়েটারের বিজ্ঞাপনের উল্টা পিঠে তবু সে লিখে রেখে দিয়েছিলো, অবসর হলে সেখানকার অবস্থাটা একবার যাচাই করে আসবে, কারণ তার মূলমন্ত্র ছিলো—

"যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো ভাই,
মিলিলে মিলিতে পারে অমূল্য রতন!"

কিন্তু সে পরান-বাবুর বাড়ির সন্ধানে যাবার অবসর করবার আগেই কলকাতা ছেড়ে পালানো তার দরকার হয়ে পড়লো। সে তার এক সহপাঠীর মেসে এসে ফ্রেন্ড হয়ে ছিলো—রোজ তার পাচ আনা করে ফ্রেন্ড-চার্জ দেবার কথা। রামযাদুর মনে একটু ক্ষীণ

আশা ছিলো যে তার সহাধ্যায়ী চক্ষুলজ্জার খাতিরে তার কাছ থেকে পয়সা নাও নিতে পারে হয়তো। কিন্তু তার বন্ধুর মেসের ম্যানেজার যেদিন তার কাছে এসে বললে—রামযাদুবাবু, ফ্রেন্ড-চার্জটা রোজ রোজ মিটিয়ে দেওয়াই আমাদের মেসের নিয়ম, আপনার আজ সাতদিন থাকা হলো।—তখন রামযাদু ভীষ্মের মতন বুঝেছিলো এই বাক্যবাণ অর্জুন বন্ধুরই, শিখণ্ডী ম্যানেজার কেবল তাকে যুদ্ধে নিরস্ত ও পরাস্ত করার উপলক্ষ্য মাত্র। পাঁচ-সাতে পঁয়ত্রিশ আনা—দু টাকা তিন আনা!—তাকে দিতে হলেই তো সর্বনাশ! লোকেব দ্বারে দ্বারে টহল দিয়ে আর ধন্না পেড়ে চাকরি তো একটা মিললো না—উপরন্তু লাভ হবে গায়ের রক্তের চেয়েও প্রিয় গাঁটের পয়সা নষ্ট! রামযাদু মেসের ম্যানেজারকে বললে—আজকে আমি বাড়ি যাবো; আপনাদের পাওনা মিটিয়ে দিয়েই যাবো। মা মরণাপন্ন—আমি খবর পেয়েছি।

রামযাদু একটা ঝাঁকা-মুটে ডেকে তার ঝাঁকায় আপনার ব্যাগ আর বিছানা চাপিয়ে ট্যাঁক থেকে কতকগুলো টাকা পয়সা বার করে গুনতে গুনতে তার বন্ধুর দিকে ফিরে বললে—তোমাকে এই টাকাটা বাড়ি গিয়ে পাঠিয়ে দিলে হবে না ভাই? আমাদের পাড়াগাঁয়ে তো ওষুধ পথ্য কিছুই পাওয়া যায় না, মার জন্যে মকরধ্বজ আব কিছু বেদানা আঙুব কিনে নিয়ে যেতাম। মা মৃত্যুর আগে বেদানা আঙুর খেতে চেয়েছেন—আমি গিয়ে মাকে দেখতে পেলে হয়!

রামযাদুর ছলছল চোখের হাতধরা জল টলটল করে উঠলো, সে ঘনঘন, দুচারবার চোখের পাতা বুজে খুলে চোখ মিটমিট কবে চোখের জল গড়িয়ে ফেললে, তার পর সেই সজল চোখে তার বন্ধুর দিকে একবার চেয়ে ম্যানেজারের দিকে দুটাকা তিন আনা বাড়িয়ে ধরে ধরা গলায় বললে—এই নিন ম্যানেজার বাবু।

এমন কে কশাই আছে যে মুমূর্ষু রোগীর ঔষধ পথ্যেব সম্বল নিজেদের সামান্য ঋণের জন্য কেড়ে নিতে পারে? রামযাদুর সহপাঠী বন্ধু বলে উঠলো—থাক্ ও টাকা থেকে তোমায় এখন দিতে হবে না; বাড়ি গিয়ে যখন সুবিধা হবে পাঠিয়ে দিয়ো।

রামযাদুকে আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করতে হলো না। সে টাকা দেবার জন্য প্রসারিত হাত অমনি তৎক্ষণাৎ গুটিয়ে হাতের টাকা পকেটে ফেললে। মনের মুখ যদি দেখা যেতো তা হলে দেখা যেতো যে বন্ধুব কথায় রামযাদুর মনের মুখ এক গাল হাসিতে ভরে উঠেছে। কিন্তু রামযাদুর যে মুখ দেখতে পাওয়া যাচ্ছিলো সে মুখের বিষণ্ণ ভাবের একটুও পরিবর্তন কেউ ধরতে পারলে না, তার মুখে পেশীবিন্যাস যেমন হওয়াতে তাকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছিলো তাব একচুলও পরিবর্তন কারো চোখে পড়লো না। রামযাদু মুটের মাথায় ঝাঁকাটা তুলে দিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়াতে বাড়াতে তার বন্ধুকে বললে—আমি বাড়ি গিয়ে মাকে একটু ভালো দেখলেই তোমার টাকাটা পাঠিয়ে দেবো ভাই।

এই বলেই সে তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো—তার নিজেব উপস্থিত বুদ্ধির তারিফ তার নিজের মনে যে রকম উথ্‌লে উঠ্‌ছিলো তাতে সে সফলতাব সন্তোষের ও আত্মপ্রসাদেব হাসি আর আমলে রাখতে পারছিলো না। রামযাদু রাস্তায় পৌঁছোতেই তাব মুখ চাপা হাসির আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

রামযাদু মুটের দিকে নজর রেখে হনহন করে শিয়ালদহের দিকে চলেছিলো, হঠাৎ পথের মাঝে তার সামনে কে একজন গড় হয়ে প্রণাম করলে। চলার বেগ হঠাৎ বাধা পাওয়ায় রামযাদু সামনে ঝুঁকে হুমড়ি খেয়ে পড়া সামলে নিয়ে থম্‌কে দাঁড়ালো। প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালো থাকোহরি।—রামযাদু অবাক বিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে রইলো; সে এমন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলো যে তার মুটে যে তার মোট নিয়ে এগিয়ে চলেছে তার দিকে তার খেয়াল রইলো না।

থাকোহরি রামযাদুর অবাক বিস্ময় দেখে হেসে বল্‌লে—আমাকে চিনতে পারছেন না? আমার নাম শ্রীথাকোহরি জানা। হ্যারিসন রোডের মোড়ে আপনি আমায় খবরের কাগজ কিনে পাসের খবর দেখতে দিয়েছিলেন...

রামযাদুর সঙ্গে কোনো লোকের একদিন আলাপ হলে সে তাকে ভোলে না; সে থাকোহরিকে দেখ্‌বামাত্রই চিনতে পেরেছিলো। কিন্তু বিস্ময় তার চোখ মুখ থেকে ঠিকরে বের হচ্ছিল এই সাত দিনের ভিতর থাকোহরির চেহারার ভোল ফেরা দেখে। থাকোহরির সেই ময়লা ছেঁড়া অত্যল্প পরিচ্ছদ, কৃশ মলিন দুঃখাচ্ছন্ন মুখ, আর দারিদ্র্যজন্য শঙ্কিত সঙ্কুচিত ভাব একেবারে বদল হয়ে গেছে!—তার গায়ে তসরের পাঞ্জাবি, গরদের চাদর; পরনে 'জরি রেশমে মিশিয়ে বোনা ফুল-পাড় দেশি ধুতি; পায়ে নতুন বাদামি রঙের সেলিমশাহী জুতো, রোজ পালিশে আয়নার মতন চক্‌চকে; মাথার কোঁকড়ানো চুলে টেড়ির বাহার না থাকলেও বেশ পরিপাটি করে আঁচড়ানো; তার তোবড়ানো গাল ভবাট, ঝুলেপড়া নাক তীক্ষ্ণ, সঙ্কুচিত চোখ উজ্জ্বল, কুণ্ঠিত মুখ সপ্রতিভ- -মেঘযুক্ত চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর; তার নিশ্চিন্ততা ও অভাবমোচনের সুখ ও আনন্দ তার মুখের দর্পণে আপনাদের ছায়াপাত করেছে। ভালো খোলস ও খোলসা পথ পেয়ে যৌবনের শ্রী ও লাবণ্য যেন থাকোহবিব অঙ্গে অঙ্গে বাসা বেঁধেছে! রামযাদু অবাক হয়ে কেবল ভাবছিলো এই থাকোহরি ছোঁডা এমন ভোল বদ্‌লালো কেমন কবে! সে যে টাকা যাদুকরীর মোহন স্পর্শ পেয়েছে তাতে কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু কেমন করে পেলে এই ইতিহাসটা জানবার কৌতূহল রামযাদুর মনে প্রবল হয়ে উঠছিলো। যে লোক মাত্র সাত দিন আগে দু আনা দিয়ে একখানা কাগজ কিনে পাশফেলের খবর দেখতে পারেনি আজ তার এই রাজবেশ কোন্ আলাদিনের প্রদীপের দান, তার সন্ধান জানবার আগ্রহে বামযাদু তার প্রবল বিস্ময়কে হাসিব আড়ালে ঠেলে ফেলে থাকোহরির কাঁধের উপর হাত রেখে বললে--একদিন একটুক্ষণের তরে দেখা সাক্ষাৎ, তার পর আবার তোমার বিলক্ষণ পরিবর্তন হয়েছে, হঠাৎ চিনতে না পারবারই কথা। বেশ ভালোই আছে বোধ হচ্ছে। কোথায় থাকা হয় এখন ভায়ার?

থাকোহরির মুখে তার হঠাৎ অবস্থা-পরিবর্তনেব লজ্জার সঙ্গে কৃতজ্ঞতার প্রফুল্লতা ফুটে উঠলো, সে বললে—আজ্ঞে, আপনারই আশীর্বাদে আমি মহতের আশ্রয় পেয়েছি। মাবিস্ এন্ড কাট্‌থ্রোট্ কোম্পানির হেড-আপিসের বড়োবাবু পরানচন্দ্র বিশ্বাস—অতি মহাশয় লোক তিনি—তাঁর বাড়িতে আমি আছি এখন। সেদিন হ্যারিসন রোডে আপনি আমাকে কাগজ কিনে দিয়ে আমার অবস্থা সম্বন্ধে যে-সব কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন সেইসব কথা

পরান-বাবু শুনে নিজে আমাকে ডেকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দিয়েছেন। আমার মতন অসংখ্য লোককে তিনি কতো রকমে সাহায্য করে থাকেন। মারিস কাটথ্রোটের আপিসের চাকরি তো তাঁর হাতে দানছত্তর!

এই কথা শুনে রামযাদুর মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। তার মনে পড়লো এই পরান তাকেও তার বাড়িতে পায়ের ধূলা দিতে আপনি সেধে এসে নিমন্ত্রণ করেছিলো; মূর্খ সে এতদিন অবহেলা করে তার বাড়িতে যায়নি, যার হাতে মারিস কাট্‌থ্রোটের আপিসের চাকরি দানছত্তর! সে একটা চাকরির জন্যে কতো লোকের দ্বারে দ্বারে ফ্যা ফ্যা করে ফিরেছে, অথচ যে রাস্তার অচেনা লোককে ডেকে চাকরি দ্যায় তার যেচে নিমন্ত্রণ সে অবহেলা করেছে! এতো বড়ো বিশ্রী ভুল সে জীবনে এই প্রথম করলেও ধিক্কারে তার অন্তর ভরে উঠলো। সে কি জানতো ছাই যে ঐ মোষের মতন কালো মোটা লোকটার এতো মহিমা! এই ভুল করার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সে যে কি করবে তা মনের মধ্যে চকিতে ঠিক করে নিয়ে রামযাদু থাকোহরির কথার শেষে বলে উঠলো—ও! তা বেশ ভাই বেশ! তোমার যে কষ্ট ঘুচেছে এতেই আমি খুশি!

থাকোহরি বল্‌লে—কর্তা আপনার কথা প্রায়ই বলেন যে—মুখুজ্জে মশায় পায়ের ধুলো দিতে এলেন না একদিনও; মহৎ ব্যক্তির সাক্ষাৎলাভ পরম সৌভাগ্য না থাক্‌লে ঘটে না। তিনি সেদিন আপনার ঠিকানা জেনে নেননি বলে' কতো আপ্‌শোস করেন—বলেন, মুখুজ্জে মশায় নিজে দয়া করে' না এলে আর আমি তাঁর পায়ের ধুলো পাবো না।

পরান এখনো তার পায়ের ধূলার আকাঙ্ক্ষা ছাড়েনি এই শুভ সংবাদে হর্ষগদ্‌গদ হয়েও রামযাদু সে ভাব তার স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতায় দমন ও গোপন করে' বল্‌লে—আর ভাই, নিজের দুঃখধান্দাতেই ব্যস্ত থাকি, সময় পেয়ে উঠি না। আর সত্যি কথা বল্‌তে কি, পথের মাঝের সেই একটা কথা অতো মনেও ছিলো না, আর তার জন্যে একজনের বাড়িতে যাবার কোনো আবশ্যকও বোধ করিনি।

থাকোহরি বল্‌লে—না না, আপনি যাবেন একদিন, কর্তা ভারি খুশি হবেন, আপনিও খুশি হবেন কর্তার সঙ্গে পরিচয় হলে—আপনি যেমন মহৎ, তিনিও তেমনি...

এমন সময় মুটে তর্জন করে' উঠ্‌লো—আরে চলো না বাবু, রাস্তা পর খাড়া হো কর গপ্‌ লাগায়া, হাম মাথা পর মোট লে কর কেৎনা ঘড়ি খাড়া রহেগা। টিফেন্‌ নেহি মিলেগা ফিন্‌।

রামযাদু ও থাকোহরি দুজনেই মুটের বিরক্ত মুখের দিকে ফিরে দেখ্‌লে। —রামযাদু থাকোহরিকে বল্‌লে—তবে এখন আসি ভাই। পরান বাবুকে বোলো ফুরসৎ মতন একদিন দেখা কর্‌বো।

থাকোহরি জিজ্ঞাসা করলে—আপনি এখন কোথায় যাচ্ছেন?

রামযাদু চলবার উপক্রম করে বললে—যাচ্ছি ভাই একটু বাড়ি।

থাকোহরি রামযাদুর সঙ্গে সঙ্গে চল্‌তে চল্‌তে বল্‌লে—আপনার বাড়ির ঠিকানাটা বলুন, আমি কর্তাকে বল্‌বো।

রামযাদু হেসে বল্‌লে—আমার বাড়ি যশোর জেলায় নড়ালের কাছে সীমাখালি গ্রামে। আমি দু-চার দিনে মধ্যেই ফিরে আস্‌ছি, তার পর পরান-বাবুর সঙ্গে দেখা কর্‌বো একদিন।

থাকোহরি জিজ্ঞসা কর্‌লে—আপনার এখানকার ঠিকানা কি?

রামযাদু বল্‌লে—এখানে এসে বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে কি মেসে দু চারদিন থাকি—কবে কোথায় থাকি তার তো ঠিক নেই।

তাব পর একটু ভেবে রামযাদু বল্‌লে—আমি এবার এসে কাঙালি সরকারের গলিতে ১৭ নম্বর বাড়িতে আমার এক বন্ধুর মেসে থাক্‌বো।

থাকোহরি রামযাদুকে আবার প্রণাম করে' বল্‌লে—আচ্ছা আমি কর্তাকে বল্‌বো।

রামযাদু হন্ হন্ করে' চল্‌তে আরম্ভ কর্‌লো। তাকে চল্‌তে দেখে মুটেও ছুটে চল্‌লো।

কিছুদূর এগিয়ে পথের একটা মোড় ফিরেই রামযাদু একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে নিয়েই মুটেকে ডেকে বল্‌লে—এই মুটিয়া, ঘুম্‌কে চলো, হাম আউর নেহি যায়েগা।

মুটে আশ্চর্য হয়ে থম্‌কে দাঁড়িয়ে রামযাদুর দিকে ফিরে বল্‌লে—আর বাবু, ফিন্ কি ভেলো?

রামযাদু মুটেকে মুখ ভেঙ্‌চে বল্‌লে—ভেলো ভালো, তুই এখন ফিরে চ তো।

মুটে রামযাদুর সঙ্গে সঙ্গে ফিরে চল্‌লো।

রামযাদু মেসে ফিরে আস্‌তেই সকলে আশ্চর্য হয়ে ও ভীত স্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কি রাম-বাবু, ফিবে এলেন যে?

রামযাদু মুটের ঝাঁকা ধরে' নামিযে ঝাঁকা থেকে ব্যাগ বিছানা তুলে নিতে নিতে বল্‌লে—রাস্তায় আমাদের গাঁয়ের একজন লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো, সে আজই এসেছে বাড়ি থেকে, সে বল্‌লে মা ভালো আছেন। তাই আর গেলাম না।

রামযাদু মেসের ম্যানেজারের সাম্‌নে তিন্‌টে টাকা ধবে' বল্‌লে—এই নিন ম্যানেজার বাবু আপনার মেসের দেনা। বাকি পয়সাও আপনার কাছে অ্যাড্‌ভান্স্ জমা থাক্।

মেসের যে-সব লোকের ধারণা হয়েছিলো বামযাদু মেসের দেনা মেবে পালাচ্ছে, তারা নিজেদের সন্দেহ মিথ্যা হতে দেখে লজ্জিত হলো, তাদের কাছে রামযাদু বেশ বিশ্বাসযোগ্য ভদ্রলোক বলেই প্রতিপন্ন হযে গেলো।

রামযাদু তার পর মুটের হাতে দশটা পয়সা গুনে গুনে দিলে।

মুটে দশ পয়সা পেয়ে বামযাদুর সাম্‌নে পয়সা সুদ্ধ হাত ও রামযাদুর মুখের দিকে বিস্ফারিত চোখ মেলে বল্‌লে—এ ক্যা বাবু?

রামযাদু মিষ্ট ভর্ৎসনার সুরে বল্‌লে—কেন বাপধন, তোমার সঙ্গে দশ পয়সাই তো ফুরান্ হয়েছিলো।

মুটে একটু কড়া কর্কশ স্বরে বল্‌লে—সো ত সহি! লেকিন্ ওতো দূর গেলো, ফিন্ আইলো...

রামযাদু মুটেকে ভেঙিয়ে বল্‌লে—মাঝপথ থেকে তো ফিরে আইলে চাঁদ। যাও সরে' পড়ো।

রামযাদু চলে' যায় দেখে মুটে কাকুতি করে' বল্‌লে—আচ্ছা আউর একঠো পয়সা দেও বাবু সাহেব—আপলোক বড়া আদমি, ভদ্দর লোক, হামলোগ নোফর চাকর, একঠো পয়সা জল খানেকে লিয়ে হামি মেঙে লিস্‌সে আপসে।

রামযাদু পিছন ফিরে চলে' যেতে যেতে বলে' গেলো—ঐ দশ পয়সা দিয়েই জল খেয়ো, আর পয়সা পাবে না।

'আরে বাবু!' বলে' হতাশায় অসন্তুষ্ট মুটে ঝাঁকা তুলে নিয়ে চলে গেলো।

এর দুদিন পরে তেস্‌রা দিনের সকাল বেলা রামযাদু ময়লা জামা কাপড় পরে' পরান বাবুর বাড়িতে যাবে বলে' রওনা হলো। গত দুদিন সে তেল মাখে নি, মাথাব চুল রুক্ষ উস্কোখুস্কো; তাতে তার চেহারাটা হয়েছিলো অনাহারক্লিষ্ট রুগ্নের মতন।

রামযাদু হলধব হালদারের স্ট্রিট খুঁজে বার করে ৩২ নম্বর বাড়ির সামনে এসেই দেখ্‌লে মস্ত বড়ো বাড়ি। বাড়ির দবজা পার হয়ে দেউড়িতে ঢুকেই রামযাদু দেখ্‌লে দেয়ালের গায়ে একটা কাঠের পাটায় সাদা রং দিয়ে ইংবেজি ও বাংলায় লেখা আছে—

| | |
|---|---|
| Paranchandra Biswas | শ্রীপরানচন্দ্র বিশ্বাস |
| In. | বাড়িতে আছেন, |
| Please come in. | আসিতে আজ্ঞা হউক। |

ইংরেজদের ও ইংরেজি কায়দার দেশি বড়লোকদের বাড়ির সাম্‌নে গৃহকর্তা বাড়িতে আছেন কি না জানাবার জন্যে in বা out লেখা থাকে রামযাদু দেখেছে; কিন্তু গৃহকর্তা বাড়িতে আছেন এই সংবাদ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুক অনুসন্ধানীকে গৃহে অভ্যর্থনা কর্‌বার ব্যবস্থা এই নতুন দেখে রামযাদুব মন অত্যন্ত খুশি হলো। গৃহকর্তা বাড়িতে না থাক্‌লে কি জানানো হয় জান্‌বার কৌতূহলে বামযাদু একবাব পথের এদিক ওদিক দেখে নিয়ে চট্ করে' কাঠেব টানা ঢাক্‌নাটা এপাশে টেনে দিলে—"in আছেন" ঢেকে গিয়ে বার হলো—Out, please call at another time, বাড়িতে নাই, অনুগ্রহ করিয়া অন্য সময় আসিবেন। এই লেখার পাশেই চিল্‌তে কাগজেব খাতা একখানা, শক্ত বেশমি সুতোয় বাঁধা ঝোলানো আছে, আর খাতাব প্রত্যেক পাতার উপর লেখা আছে--Please leave your name and address—অনুগ্রহ করিয়া আপনার নাম ঠিকানা রাখিয়া যাইবেন। সেই খাতার পাশে একটা রুপালি সরু শিকলে বাঁধা একটা পেন্‌সিল ঝুলছে।

রামযাদু এই সব দেখ্‌তে দেখ্‌তে এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে ঠিক কর্‌লে—সে যে পরান-বাবুব নামের পাটার ঢাক্‌নি সরিয়ে তিনি বাড়িতে না থাকার সংবাদ প্রকাশ করেছে, সেটা আর বদল করবে না: তা হলে তার পরে আর কোনো লোক পরান-বাবুর কাছে গিয়ে ভিড় বাড়াবে না; এর পরে যারা আস্‌বে তারা দেউড়ি থেকেই ফিরবে; এখনো বেশি বেলা হয়নি, এখনো বেশি লোক এসে জোটেনি নিশ্চয, যারা এসেছে তারা চলে' গেলে সে একলাই পরান-বাবুর সঙ্গে নিরিবিলি কথা বল্‌বার সুযোগ পাবে।

রামযাদু মিনিট পাঁচ সাত দেউড়িতে দাঁড়িয়ে থেকেও কোনো লোকের সাক্ষাৎ বা সাড়া পেলে না। দেউড়িতে দারোয়ানের উপদ্রব নেই—এ কী-বকম বড়োলোক!

রামযাদু ইতস্তত কর্‌তে কর্‌তে একটু এগিয়ে গেলো—দেখলো দেউড়ির দুপাশে দুটো দালান উঠে গেছে এবং দালানের কোলে দুটো বড় বড় ঘর, কিন্তু সেখান থেকে জনমানবের সাড়া পাওয়া যায় না। দেউড়ির গলিটাব পরেই প্রকাণ্ড উঠান, তার এক ধারে একটা ঠাকুর-দালান; উঠানের অন্য দুই পাশের ঘরগুলো বোধ হয় অন্দরমহলের সামিল। কতকগুলো সাদা পায়রা উঠানের মাঝখানে গলা ফুলিয়ে লেজ ছড়িয়ে চরে' বেড়াচ্ছে, আর দুটো সাদা খর্‌গোশ লম্বা লম্বা কান আর বেঁড়ে লেজ নেড়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে;—এ ছাড়া কোথাও আর জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্রও নেই, সাড়াশব্দও নেই—সমস্ত বাড়িটা যেন জনশূন্য; অথচ এটা যে পোড়ো বাড়ি নয় তা এর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঝক্‌ঝকে অবস্থা দেখ্‌লেই জানা যায়।

রামযাদু এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে একদিকের দালানের উপর উঠে দাঁড়ালো। রামযাদু মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠ্‌ছিলো। নিজে সেধে ভদ্রলোককে ডেকে বাড়িতে নিয়ে আসে, অথচ তার যে দেখা পাওয়া যাবে কেমন করে' তার কোনো বিলি ব্যবস্থাই নেই!...ন চাষা সজ্জনায়তে!

রামযাদু দারোয়ান না বেয়ারা কি বলে' চিৎকার কব্‌বে ঠিক কর্‌তে না পেরে ভাবছে, এমন সময় বাড়ির ভিতর থেকে একজন চাকর বেরিয়ে এসে তার সাম্‌নে দিয়ে চলে' গেলো; একজন ভদ্রলোক যে বাড়িতে এসে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে সে লক্ষ্যই করলে না, আগন্তুককে একটা প্রশ্ন করে' জান্‌লেও না যে তার কি দরকার।

রামযাদু চাকরটার এই আচরণ বড়োমানুযের চাকবের দেমাকভরা উপেক্ষা মনে করে' অসহিষ্ণু ও উষ্ণ হয়ে উঠ্‌ছিলো, কিন্তু পরানের কাছে স্বার্থ-সিদ্ধির সম্ভাবনার আভাস থাকোহরির চেহারার ও পোশাকের বিলক্ষণ ভোল ফেরার মধ্যে পেয়ে সে বিরক্তি ও অধৈর্য দমন করে' আত্মসম্বরণ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লো।

চাকরটা রামযাদুর সাম্‌নে দিয়ে পরান-বাবুর নামের পাটার সাম্‌নে গিয়েই সেইদিকে অবাক্ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থম্‌কে দাঁড়াল এবং তৎক্ষণাৎ নাম-পাটার টানা-ঢাক্‌নিটা সরিয়ে দিয়ে পরান-বাবু বাড়িতে আছেন জানিয়ে সেখান থেকে চলে' গেলো! রামযাদু তাকে কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌বার আর অবসরও পেলে না।

তখনই একজন ভদ্রলোক বাইরে থেকে বাড়িতে এসে ঢুক্‌লো; সে একবার পরান-বাবুর নামের পাটাটার উপর চোখ ফেলে দেখে নিলে পরান-বাবু বাড়িতে আছেন কি না; তার পর রামযাদুর সাম্‌নে দিয়ে হনহন করে' যেতে যেতে তার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দালানের শেষের দিকের একটা দরজার মধ্যে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেলো। রামযাদু সেই লোকটির পায়ের শব্দ শুনে সেখান থেকেই বুঝতে পার্‌লো সে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। উপরে উঠ্‌বার সিঁড়ি তা হলে ঐ দরজার ওপারে আছে। তবে সেও কি সটান উপরে উঠে যাবে না কি? রামযাদুর রাগ হতে লাগল্ থাকোহরির উপর—সে ছোঁড়াটারও তো কোথাও টিকি দেখ্‌বার জো নেই, সেটাকে পেলেও তো তাকে কাণ্ডারী করে' পরানের কাছে পৌঁছানো যেতো।

রামযাদু ইতস্তত কর্‌তে কর্‌তে দালান থেকে আবার দেউড়িব গলিতে নেমে আস্‌ছিলো; সিঁড়ির শেষ ধাপে পা দিতেই সে দেখ্‌লে একটি স্ত্রীলোক আপাদমস্তক কাপড় মুড়ি দিয়ে বাইরে থেকে সেই দিকে আসছে। রামযাদু আবার সিঁড়ির ধাপ বেয়ে দালানে উঠে দাঁড়ালো, আর সেই স্ত্রীলোকটি তার সাম্‌নে দিয়ে হনহন করে' বাড়ির ভিতর চলে' গেলো।

রামযাদু আবাব দালান থেকে নিচে নাম্‌লো—আরো অপেক্ষা কর্‌বে, না চলেই যাবে, ঠিক কর্‌তে না পেরে ভাব্‌ছে; দেখ্‌লে একটি ছোট ছেলে বাহির থেকে বাড়ির ভিতর আস্‌ছে। ছেলেটি রামযাদুর বিরক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে একটু থতোমতো খেয়ে আস্তে আস্তে অন্দবের দিকেই চল্‌তে লাগ্‌লো।

ছেলেটিও চলে যায় দেখে রামযাদু হাতছানি দিয়ে ছেলেটিকে ইশারা করে' ডাক্‌লে—এই ছোক্‌রা, শোনো।

সেই ছেলেটি ফিরে এসে রামযাদুর মুখের দিকে চেয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়ালো। ছেলেটিব দৃষ্টিতে ভয় ও বিস্ময় ফুটে বাব হচ্ছিলো।

রামযাদু ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা কর্‌লো—বাবু কোথায় বসেন বল্‌তে পারো?

ছেলেটি রামযাদুর মুখের দিকে ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে চেয়ে নীরবে ঘাড় নেড়ে জানালে যে সে বাবুর কোনো খোঁজখবর রাখে না।

বামযাদু ছেলেটির কাছে এসে তার মুখের সামনে মুখ আন্‌বার জন্য সাম্‌নে একটু ঝুঁকে জিজ্ঞাসা কব্‌লে—তুমি কি এ বাড়ির ছেলে নও?

ছেলেটি ভয়ে সঙ্কুচিত শুষ্কমুখে অস্ফুট মৃদুস্ববে বল্‌লে—না।

রামযাদু নাছোড়বান্দা, সে ছেলেটিকে আবার প্রশ্ন কব্‌লে— তবে তুমি কোথায় যাচ্ছ।

ছেলেটি সব কথা একেবারে চট করে' বলে' ফেল্‌বার চেষ্টায় থেমে থেমে হাঁপিযে হাঁপিয়ে অসংলগ্ন কথা যা বল্‌তে পার্‌লে সেসব জুড়েতেড়ে রামযাদু এই বুঝলে যে ছেলেটির বাবার পক্ষাঘাত হয়েছে অনেক দিন, তাব মা বোজ রোজ এসে কর্তামার কাছ থেকে ওষুধপথ্যের সাহায্য নিয়ে যেতো, কাল থেকে তাব মারও খুব জ্বর হয়েছে, তাই আজ বালককে পিতামাতার সেবা-শুশ্রূষাব আয়োজনের সাহায্য ভিক্ষা কর্‌তে আস্‌তে হয়েছে। তাই কচি ছেলের প্রথম ভিক্ষাব সঙ্কোচ তার সর্বাঙ্গে, দীনতাব ভয় তার দৃষ্টিতে এবং অপরিচয়ের কুণ্ঠা তার কণ্ঠে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রামযাদুর মনটা কেমন করুণার্দ্র হয়ে উঠলো, সে পকেট থেকে একটা টাকা বার করে' সাম্‌নে ঝুঁকে সেই ছেলেটির হাতে দিয়ে বল্‌লে—যাও বাবা, যাও।

ছেলেটি টাকাটি পেযে তাব ভযচকিত দৃষ্টিতে কুণ্ঠিত মুখে কৃতজ্ঞতার একটু সঙ্কুচিত আনন্দ প্রকাশ করে' বাড়ি ফিরে চল্‌লো।

রামযাদু তাড়াতাড়ি তাকে ধরে' ফিরিয়ে বল্‌লে—তুমি কর্তামার কাছে যাবে না? ও তো আমি দিলাম। তুমি কর্তা-মাকে কি বল্‌তে এসেছো তা বলোগে।

বালক রামযাদুর এই সদয় সস্নেহ ব্যবহারে সাহস পেয়ে, শৈশবেব অস্বাভাবিক সঙ্কোচ

অনেকখানি ঝেড়ে ফেলে প্রফুল্ল মুখে অন্দরে দিকে চলে গেলো। রামযাদু আবার একলা দাঁড়িয়ে রইলো। সে ভাব্‌তে লাগলো—আহা! ঐ ছেলেটার মা যদি মরে' যায় তা হলে তার পক্ষাঘাতগ্রস্ত বাবার ও তার নিজের কি গতি হবে!

একটু পরেই অন্তঃপুর থেকে একজন উড়ে বাহির হয়ে এলো। তার মাথায় মস্ত বড়ো একটা ঝুঁটি; গলায় কাঠের মালার মাঝে মাঝে ছোট ছোট সোনার মাদুলি গাঁথা; সে কাপড় উরুতের উপর গুটিয়ে পরেছে, তার উপর একখানা লাল ডুরে অতিময়লা গামছা জড়ানো; তার হাতে একগাছা মোটা ময়লা গোবর-মাখা দড়ি—দড়ির দুমুখে দুটো মোটা মোটা গেরো বাঁধা। রামযাদু তাকে দেখেই বুঝ্‌তে পার্‌লে এ এ-বাড়ির কেউ নয়, এ গয়লা, গাই দুয়ে দিয়ে যাচ্ছে; অতএব একে কিছু জিজ্ঞাসা করা বৃথা।

উড়ে গোয়ালা বাড়ি থেকে বাহির হয়ে যেতে না যেতে একটা বাছুর তিড়িং তিড়িং করে' লাফিয়ে লাফিয়ে বাহিরের বিস্তীর্ণ উঠানে বেরিয়ে এলো এবং এসেই সেখানে রামযাদুকে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখ্‌তে পেয়েই উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে ছিট্‌কে যে পথে এসেছিলো সেই পথে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

রামযাদু স্মিত প্রফুল্ল মুখে বাছুরের প্রাণচঞ্চল লীলা দেখ্‌ছিলো, হঠাৎ তার পিছন দিকে কার জুতোর খটখট শব্দ শুন্‌তে পেয়েই সে মুখ ফেরালে; কিন্তু যেই আগন্তুকের কেবল পিঠের দিকটাই সে দেখ্‌তে পেলে এবং তাকে দেখ্‌তে না দেখ্‌তে সে ব্যক্তি সেই পূর্বাগত ভদ্রলোকটির পদাঙ্ক অনুসরণ করে' পাশের একটা খোলা দরজার জঠরে অদৃশ্য হয়ে গেলো আর তার পায়ের শব্দে রামযাদু জান্‌তে পারলে যে সেও সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে।

রামযাদু সেই সিঁড়ির দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছে কি কর্‌বে, আবার তার পিছনে দিকে কার পায়ের শব্দ সে শুন্‌তে পেলে। চট্‌ করে' পিছন ফিরেই রামযাদু দেখ্‌লে একটি ছোট মেয়ে আস্‌ছে—সে ভয়ানক কালো ও আশ্চর্য কুৎসিত—তার কপালটা বিষম উঁচু, নাকটা নিতান্ত খাঁদা, চোখ দুটো গোল গোল, ঠোঁট দুটো পুরু ও উল্টানো, কান দুটো খুব বড় ও সাম্‌নের দিকে ফেরানো—এমন কুৎসিত চেহারা সে জন্মে কখনো দেখেনি। এই মেয়েটিকে দেখেই রামযাদুর মনটা কুরূপ মেয়েটির উপর এমন বিরূপ হয়ে উঠ্‌লো যে সে হঠাৎ দাঁতমুখ খিঁচিয়ে জিভ বার করে' বিকট মুখভঙ্গী করে' উঠ্‌ল ও সঙ্গে সঙ্গে দু পা ফাঁক করে' ও দু হাত ছড়িয়ে জগন্নাথ মুর্তির অনুকরণে থ্যাব্‌ড়া হয়ে দাঁড়ালো। হঠাৎ রামযাদুকে এই উৎকট ভঙ্গী করতে দেখে মেয়েটি ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে পালিয়ে গেলো। মেয়েটি পরানবাবুরই আদরের দুলালী কন্যা কৃষ্ণকলি!

কৃষ্ণকলি চলে যেতেই রামযাদু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আপন মনেই বলে উঠলো—রক্ষাকালীর বাচ্চা! বাপ্‌স্‌!

রামযাদু এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে মনে মনে বল্‌লে—যে দুর্লক্ষণ দেখা হলো, আজ আর কোনো সফলতার আশা নেই। যাত্রা পাল্‌টে আসা যাবে। "প্রাতবেবানিষ্টদর্শনং জাতং, ন জানে কিম্‌ অনভিমতং দর্শয়িষ্যতি!"

তার পর একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে সে বাড়ি থেকে বাহির হয়ে চল্‌লো।

দেউড়ির দরজার চৌকাঠে পা দিয়েই সে দেখ্‌লে সাম্‌নের বাড়ির ছাদের উপর একটি তরুণী স্নান করে এসে ভিজা কাপড় শুকাতে দিচ্ছে; রামযাদু থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেলো। একটা মিন্‌সে হাঁ করে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে দেখে তরুণীটি ঘোমটা টেনে ভিজা কাপড়খানা তাড়াতাড়ি ছাদের আল্‌সের গায়ে মেলে দিয়ে নিচে নেমে গেলো। রামযাদু কিন্তু রমণীর রূপ-মুগ্ধ হয়ে দাঁড়ায় নি, সে পরান-বাবুর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পাবার জন্য বিলম্ব করবার উপলক্ষ্য খুঁজছিলো মাত্র।

রামযাদু আবার যাবে বলে' দু পা এগিয়েছে, এমন সময় সেই যে ছেলেটি পীড়িত মা-বাপের জন্যে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এসেছিলো ও রামযাদু যাকে একটি টাকা দিয়েছিলো সে তার খাটো কাপড়ের খুঁটটিকে একটি প্রকাণ্ড পোঁট্‌লায় পরিণত করে' প্রফুল্ল মুখে বাড়ির ভিতর থেকে বাহির হয়ে এলো, এবং যেতে যেতে বার বার প্রসন্ন মুখের হাসিমাখা দৃষ্টি ফিরিয়ে ফিরিয়ে রামযাদুকে নিজের সফলতার আনন্দ জানিয়ে দিতে চাইছিলো। রামযাদু তার ভাব দেখে কোমল স্বরে বল্‌লে—"কর্তামার কাছে পেয়েছো বাবা?" ছেলেটি স্মিতমুখে নীরবে, ঘাড নেড়ে সম্মতি জানিয়ে চলে' গেলো। রামযাদুর আর চলে' যাওয়া হল না,—কল্পতরুর তলায় এসে সেই কি কেবল রিক্তহস্তে ফিরে যাবে? সে থম্‌কে ফিরে দাঁড়ালো।

এবার সিঁড়িতে লোক নামার পায়ের শব্দ শোনা গেলো। রামযাদু উৎসুক হয়ে একটু এগিয়ে এলো। যে লোকটি রামযাদুর সাম্‌নে দিয়ে প্রথম উপরে উঠে গিয়েছিলো সে-ই ফিরে যাচ্ছে—চোখে মুখে তার সফলতার সন্তোষ যেন ফুটে বেরুচ্ছে!

রামযাদু তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—মশায়, পরান বাবু...?

সে লোকটি একবার রামযাদুর শীর্ণ মূর্তি ও মলিন বেশেব দিকে কটাক্ষপাত করে' তাকে তার জিজ্ঞাস্য শেষ করতে না দিয়েই তাকে অতিক্রম করে' যেতে যেতেই বলে' গেলো—ওপবে আছেন...

রামযাদু আবার তার দিকে ফিবে তার পিছনে মুখ খিঁচিয়ে জিভ ভেঙিয়ে অস্ফুট স্বরে বলে' উঠল—ওপরে আছেন তো নেহাল করেছেন!

তখনই একজন চাকর সেইদিকে আস্‌ছিলো। তার আসার পায়ের শব্দ পেয়েই রামযাদু সম্বৃত হযে ফিরে দাঁড়ালো। সেই লোকটা কাছে এলেই তাকে সে বাবুর সঙ্গে সাক্ষাতের উপায় ও সম্ভাবনাব তত্ত্ব জিজ্ঞাসা কর্‌বে বলে' উদ্যত হয়েছে, কিন্তু তার উদ্যম দমিয়ে দিয়ে তখনই দোতলার এক জান্‌লা থেকে সেই কুৎসিত কালো মেয়েটার মিষ্ট কোমল কণ্ঠ ডেকে উঠ্‌লো—ও বোঁচা দাদা, তোমাকে মা ডাক্‌ছেন।

বোঁচা চাকর তৎক্ষণাৎ "আজ্ঞে যাই" বলেই চোঁচা অন্দরমুখো দৌড় দিলো।

রামযাদু বিরক্ত হয়ে মনে মনে বলে' উঠলো—"ধুত্তোর! সব শালা বড়লোকই সমান আর তাদের বাড়ির চাকরগুলো পর্যন্ত সমান পাজি—সমস্ত দুনিয়াকেই তাদের অগ্রাহ্য! সেই থাকোহরি ছোক্‌রাই বা গেলো কোথায়? সেও যে দুদিন বড়মানুষের ছোঁয়াচ লাগিয়ে লাট হয়ে উঠেছে দেখ্‌ছি! দূর হোক্‌গে, মরুক্‌গে, আর তীর্থের কাগের মতন হাপিত্যেশে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

রামযাদু যদিও বল্‌লে যে আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না, তবু সে দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে যাই কি না-যাই ভাব্‌তে লাগ্‌লো। সে দেখ্‌ছিলো—পরান-বাবুর সদর দরোজার ধারে একটা বড় ঝাঁপালো কামিনী-গাছের ঝাড় ফুলে ফুলে একেবারে শাদা হয়ে উঠেছে আর তার গন্ধে সেখানকার বাতাস যেন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেচে; গোটা দুই মৌমাছি, একটা প্রজাপতি আর একটি সরু লম্বা ঠোঁটওয়ালা সবুজ রঙের অতি ছোটো পাখি কল্‌কাতার এই গলির মধ্যে থেকেও ফুলের সন্ধান খুঁজে বার করে' উড়ে উড়ে মধু খেয়ে বেড়াচ্ছে—কোথাও কিছু পাবার সম্ভাবনা থাক্‌লে এমনি একান্ত তপস্যাই কর্‌তে হয়! রামযাদুর আর যাওয়া হলো না, সে দৃঢ়সঙ্কল্প কর্‌লে যে যেমন করে' হোক আজ পরান-বাবুর সঙ্গে দেখা সে কর্‌বেই। কিন্তু এতো বড়ো লোক, দেউড়িতে একটা দারোয়ানও নেই যে তাকে দিয়ে এত্তেলা পাঠাবে। এমন কিপ্‌টে মানুষের সঙ্গে দেখা করে' কিছু লাভ হবে? কিন্তু থাকোহরি? তবে কি সে বেযারা দারোয়ান বলে' চেঁচামেচি কর্‌বে? কিন্তু সমস্ত বাড়িটা এমন নিস্তব্ধ শান্ত যে তার সেই ছন্দ ভঙ্গ করা রামযাদুর কাছে কেমন অশোভন বেখাপ্পা বোধ হলো। সে চুপ করে' দাঁড়িয়েই রইলো। তার অন্যমনস্ক দৃষ্টির সাম্‌নে পাড়াব কতো বাড়ির উঁচু নিচু বাঁকা-চোরা কম বেশি অংশ উদাস ভাবে দাঁড়িয়ে আছে; একটা বাড়ির এক কোণ থেকে একটা নারিকেল-গাছের ঝাঁক্‌ড়া মাথা উঁকি মার্‌ছে, তাব ডালে বসে' একটা চিল আর্তনাদ কর্‌ছে, একখানা ঘুড়ি সেই ডালে আট্‌কে ঝুল্‌ছে।...

হঠাৎ পিছন দিকে লোক ছুটে আসার শব্দ শুনে রামযাদু মুখ ফিরিয়ে দেখ্‌লে সেই বোঁচা। বোঁচাকে আস্‌তে দেখেই রামযাদু বলে' উঠলো –"ওহে বাপু বোঁচচন্দব!.."

বোঁচা রামযাদুর কথা শেষ হবার অপেক্ষা না করেই জিজ্ঞাসা করলে—আপনি কি কত্তার সঙ্গে দেখা কর্‌বেন?

রামযাদু বিরক্ত স্বরে বল্‌লে—ইচ্ছে তো ছিলো বাপধন! কিন্তু কত্তা তো দেখা দেবার কোনো উপায়ই রাখেন নি। তোমরা তো দেখে গেলে যে একটা ভদ্রলোক ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে...

বোঁচা কৌতুকের হাসি ঠোঁটের কোণে চেপে বললে—রোজ পঞ্চাশ ষাট জন বাবু কত্তার কাছে আসেন, কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে কত্তার বারণ আছে; যিনি আসেন তিনি সটান উপরে বাবুর বৈঠকখানায় চলে' যান। পাছে কেউ বাধা বোধ করেন বলে' বাবু দারোয়ান রাখেন না...

রামযাদু প্রীত ও আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—তবে তুমি যে এখন জিজ্ঞাসা কর্‌তে এলে?

বোঁচা বল্‌লে—গিন্নি-মার হুকুমে। আপনি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন দেখে তিনি খুকিকে আপনাব কাছে পাঠিয়েছিলেন..

রামযাদু ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—ঐটি কি কর্তার মেয়ে?

বোঁচা বল্‌লে—হ্যাঁ, ঐ এক মেয়ে, আর ছেলেপিলে নেই।

রামযাদুর মনটা অনুশোচনায় শিউবে উঠ্‌লো—ইস্‌! করেছি কি! সর্বনাশ! সে যদি গিয়ে মাকে বলে দিয়ে থাকে যে আমি মুখ ভেংচেছি!

রামযাদু আপনার কৃতকর্মের জন্য ভয়ানক পস্তাতে লাগ্‌লো, তার মনটা অত্যন্ত খিচ্‌ড়ে মুষ্‌ড়ে গেলো। সে নিজেকে এই বলে' একটু সান্ত্বনা ও আশ্বাস দেবার চেষ্টা কর্‌লে যে—যে চেহাবা মেয়েটার! আঁৎকে না উঠে উপায় কি?—কিন্তু এতেও সে স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বস্তি বোধ কর্‌তে পারলে না।

রামযাদুকে নীরব অন্যমনস্ক দেখে বোঁচা বল্‌লে এই সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলেই বাবুর দেখা পাবেন।

রামযাদু যার প্রসাদপ্রার্থী তার একমাত্র সন্তানকে মুখ ভেংচে যে অন্যায় অপকর্ম করে ফেলেছে তার জন্যে তার মনে অনুশোচনা ও অস্বস্তির অন্ত ছিলো না। এতে কিন্তু তার অনিচ্ছায় ও অজ্ঞাতসারে সুবিধাই হযে উঠলো, তার রুক্ষ শীর্ণ শুষ্ক মূর্তি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বিমর্ষ দেখাতে লাগ্‌লো।

রামযাদু বোঁচার নির্দেশ অনুসারে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতেই সিঁড়ির পাশের খোলা জানালা দিয়ে দেখতে পেলে যে ঘরে পরান-বাবু বসে আছেন সেটি বেশ বড়ো দৌড়-ঘব; ঘরে দেশি বিলাতি দু রকম আসনই আছে—ঘরের এক ধারে চেয়ার টেবিল বেঞ্চি সোফা কৌচ আছে, অপর ধারে খুব নিচু তক্তপোষের উপর জাজিম-বিছানো ফরাশও আছে, ঘরের দেয়ালগুলি ছাদ-ছোঁওয়া উঁচু উঁচু আলমারিতে ঢাকা; সকল আলমারিই বইএ ঠাসা, খাড়া করে সাজানো বইএর সারির মাথায় আবার কাত করে বই রাখা হয়েছে, তাতেও বইএর জায়গা কুলোয় নি, অনেক বই বেঞ্চিতে চেয়ারে মেঝের ধারে ধারে স্তূপাকার করে বাখা হয়েছে; পরান-বাবু খালি গায়ে একখানা প্রকাণ্ড বড়ো চওড়া চেয়ার একেবারে ভরাট করে বসে আছেন, তাঁর প্রকাণ্ড কালো বেঁটে শরীরের তাল তাল মাংসপিণ্ড চেয়ারের কাঠের ফাঁক ও ফুকোব দিয়ে এদিকে ওদিকে ফুঁড়ে ফুঁড়ে ফেঁপে ফুলে বেরিয়ে পড়েছে, যেন একতাল তিলকুটো সন্দেশ আহ্লাদি পুতুলের ছাঁচে ফেলা হয়েছে। পরান-বাবুব সাম্‌নে ও পাশে দশ-বাবো জন লোক চেয়ারে বেঞ্চিতে বসে' আছে,—আগন্তুকদের মধ্যে দুজন ইউরোপীয়ও আছে; পরান-বাবু তার প্রকাণ্ড ঝাঁপালো গোঁপেব তলা থেকে গুরুগম্ভীর স্বরে তাদের সকলের সঙ্গে প্রসন্নমুখে আলাপ করছেন নিজের ভাষাতেই—দুজন ইউরোপীয় যে আছে তাব জন্যে তাঁর খালি-গায়ে থাকতে ও নিজের ভাষায় কথা কইতে একটুও সঙ্কোচ দেখা যাচ্ছে না।

রামযাদু ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই পরান-বাবু মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখলেন; তাকে দেখ্‌বা মাত্রই তাঁর ছোটো ছোটো চোখ দুটি অমায়িক হাসির দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌লো; খোঁয়াড়ের ঝাঁপ খোলা পেলে ভেড়ার পাল যেমন গম্ভীর স্বরে ডাক্‌তে ডাক্‌তে বেরিয়ে আসে, তেমনি তাঁর ঝাঁপালো গোঁপের তলা থেকে ভারি আওয়াজ আনন্দে উছ্‌লে বেরিয়ে এলো—এই যে রামযাদু বাবু, আসুন, আসুন, আস্‌তে আজ্ঞা হোক্; আমি থাকোহরির কাছে যে অবধি শুনেছি যে আপনি একদিন পায়ের ধুলো দিতে আস্‌বেন, সে অবধি আমি রোজই আপনার দর্শন প্রত্যাশা করছি।

ঘরের পঁচিশ জোড়া চোখ একেবারে ঘুরে এসে আঢাকা মিষ্টান্নের উপর মাছির মতন রামযাদুকে ছেঁকে ধরলো। রামযাদু এতোগুলি উৎসুক চোখের কৌতূহল দৃষ্টির সামনে একটু সঙ্কুচিত হয়ে লজ্জিত হাসিমুখে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো। পরান-বাবু তাকে একখানা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বললেন—বসুন।

তারপর সমবেত লোকদের দিকে ফিরে পরান-বাবু বল্‌লেন—হ্যাঁ, আমাদের যে কথা হচ্ছিলো। সত্যি, আজ-কাল সব এম-এ, এম-এসসি পাস করে' পঞ্চাশ ষাট টাকার জন্যে আপিসে চাকরির উমেদার, কিন্তু এতো খরচপত্র আর কষ্ট করে' যে বিদ্যে শিখছে তা কি শুধু রেড়ির-খোলের আর ছাতার বাঁটের রপ্তানি আমদানির হিসেব লেখবার জন্য? এতে আমার ভারি কষ্ট হয়।

একজন লোক বল্‌লে—কি করবে বলুন, কিছু একটা করে খেতে তো হবে।

পরান-বাবু বল্‌লেন—তা তো জানি; কিন্তু যে যা বিদ্যে শিখেছে তার চর্চা আলোচনা অনুসন্ধান গবেষণা করলে টাকা আর যশ দুই যে হতে পারে। আমার দুঃখ হয় যে এত ছোক্‌রা আমার কাছে চাকরির উমেদারি করতে আসে, একজন কেউ বলে না যে মশায়, আমি এই বিষয়ের গবেষণা করছি, আপনার লাইব্রেরিতে আমি কাজ করতে চাই, কিংবা আমি যাতে এই কাজই করতে পারি তার একটা ব্যবস্থা করে দিন।

ঘরের সমস্ত লোক একটু লজ্জিত সঙ্কুচিত হয়ে পড়্‌লো। রামযাদু বুঝলো এরা সবাই পরান-বাবুর এই কথায় নিজেদের অপরাধী বিবেচনা করছে।

পরান-বাবু একটু হেসে আবার বল্‌তে লাগ্‌লেন—এই দেখো এই সাহেবরা—এরা কেউ কিছু বিদ্যে শিখে, কেউ কিছু না শিখেও সাত সমুদ্র তেরো নদী পারে লক্ষ্মীর সন্ধানে আসছে; দুহাতে যেমন জেব ভর্তি করছে, যেদেশে কাজ করছে সে দেশের সন্ধানও করছে তারাই;—ভারতবর্ষের পুরাতন ও বর্তমান সকল বিষয়ের তন্ন তন্ন সন্ধান করেছে ও করছে কারা? ওরা সব সরস্বতীকে সহায় করে লক্ষ্মীকে বশ করে, তবে না হয় ওরা লাখপতি! আর আমরা সরস্বতীকে বিদায় দিয়ে লক্ষ্মীর সেবা করতে চাই, তাই পাই শুধু পেঁচার মুখভ্রষ্ট উচ্ছিষ্ট উঞ্ছ এতোটুকু।

তাব পরে পরান-বাবু হা হা করে' হেসে বল্‌লেন—বৃথা আক্ষেপ! এখন আপনাদের সব ছুটি, বেলা হলো। রামযাদু-বাবুর সঙ্গে আমার এখন কাজ আছে। Well Mr Marris, I shall remember your request, and shall try my best. And you Mr. Kebble, please see me this day week, in the mean time I shall speak to Mr. Cottle. Good bye.

পরান-বাবু ইংরেজ দুজনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। তারা সম্ভ্রমের সঙ্গে উঠে সম্মুখে নত হয়ে তাঁর হাত ধরে বিদায় নিয়ে চলে গেলো। অন্য সকলেও কল-টেপা পুতুলের মতন এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠলো ও একে একে নমস্কার করে করে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে লাগলো। যাবার সময় সকলেই একবার করে রামযাদুকে দেখে নিচ্ছিলো,—তাঁদের সকলেরই ঈর্ষা ও কৌতূহল হচ্ছিলো—কে এই ভাগ্যবান্‌, যে সকলকে বিদায় করিয়ে একলা কর্তার কাছে রয়ে গেলো!

সকল লোক চলে গেলে পরান-বাবু চর্কি-চেয়ার ফিরিয়ে রামযাদুর দিকে মুখ করে বসে বল্‌লেন—আমার বড় সৌভাগ্য যে আপনি দয়া করে পায়ের ধুলো দিতে এসেছেন। সেদিন থেকে আপনার পরিচয় জান্‌বার জন্যে আমি ভারি উৎসুক হয়ে আছি।

রামযাদু তার শীর্ণ মুখে শুষ্ক হাস্যে বড় বড় দাঁত বিকশিত করে বল্‌লে—আমরা সামান্য লোক, আমাদের পরিচয়ও যৎসামান্য। আপনি মহাশয় ব্যক্তি, তাই পথের লোককে ডেকে বাড়িতে আন্‌তে চান।

পরান-বাবু স্মিতমুখে বললেন—পথে রত্ন কুড়িয়ে পেলে কে ছাড়ে বলুন। পরান-বাবু হো হো করে উচ্চ হাস্য করলেন।

রামযাদু পাল্টা জবাব দিলে—কিন্তু জহুরিই কেবল রত্ন চিনতে পারে।

রামযাদুর জবাবে পবান-বাবু আবার জোরে হেসে উঠলেন; সে হাসি যে খুশির তা তাঁব চোখ মুখ দেখেই রামযাদু বুঝতে পারলো। পরান-বাবু দীপ্ত মুখে জিজ্ঞাসা করলেন—মশায়ের বিষয়কর্ম কি করা হয়?

রামযাদু বল্‌লে—নামে যশোরে ওকালতি করি। কিন্তু Law is a jealous mistress, তাঁর একাগ্র উপাসনা না করলে তিনি প্রসন্ন কিছুতেই হন না।

পরান-বাবু জিজ্ঞসা কর্‌লেন—আপনাব আব কিছু কাজ আছে কি?

বামযাদু মুখভাব একটু অপ্রতিভ কবে' বল্‌লে—আজ্ঞে, ঠিক কাজ নয়, একটু বাতিক আছে। যশোবের বাইরে এর জন্যে আমাকে কি কম উপহাস সহ্য কবতে হয়।

পবান-বাবু কৌতূহলী হয়ে উৎসুক স্ববে জিজ্ঞাসা কবলেন—আপনার বাতিকটা কি শুন্‌তে পাই কি?

বামযাদু যেন গোপনীয় কথা অনিচ্ছায় বল্‌ছে এমনি সঙ্কুচিত ভাবে বল্‌লে—আজ্ঞে সে শোনবাব মতন কিছু নয। কতকগুলো খেয়ালের বশে ভূতের বেগার খাট্‌ছি—তিনখানি বই লেখবার চেষ্টা করছি আজ বাবো বচ্ছর ধরে। ঘবে এমন পয়সা নেই যে ওকালতি ছেড়ে শুধু বই লিখি, আবার বই লেখার দিকে মন থাকাতে ওকালতিও ভালো লাগে না—কাজেই পসারও জমে না—সত্যিকে মিথ্যে আর মিথ্যেকে সত্যি সাজাতে প্রবৃত্তিও হয় না—আমার হয়েছে এখন দু নৌকোয় পা।

বামযাদু নিজের ব্যবসার ক্ষতি করেও বা-রো বচ্ছব ধরে বই লিখছে আর তার প্রবঞ্চনার ব্যবসাযে প্রবৃত্তিও নেই এই খবর জেনে, রামযাদুর উপর পরান-বাবুর ভক্তি শ্রদ্ধা দ্বিগুণ বেড়ে গেলো। তিনি সম্ভ্রমভরা স্ববে জিজ্ঞাসা করলেন—কি কি বিষয়ে বই লিখছেন।

বামযাদু বিনয়ের স্বরে বল্‌লে—সে বলবার মতন নয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাতে কারো কিছু উপকাব হবে না। তবু লিখছি—ভূতে পাওয়াব মতন খেযাল পেলে তো আর রক্ষা নেই।—একখানার নাম দিয়েছি—পৌরাণিক উপাখ্যান; তাতে এক একটা পৌরাণিক উপাখ্যান ধবে' তার development trace করবার চেষ্টা করেছি; বেদ, ব্রাহ্মণ, কল্পসূত্র, ধর্মশাস্ত্র, বামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, উপপুবাণ, লৌকিক কাব্য আর জনপ্রবাদের ভিতর

দিয়ে কালানুক্রমে একটি আখ্যান সামান্য বীজ থেকে কেমন করে অঙ্কুরিত হয়ে ক্রমে ক্রমে পল্লবিত হয়েছে তারই ধারাগুলি আমি ধর্‌বার চেষ্টা করছি।...

পরান-বাবুর ছোটো ছোটো গোল গোল দুই চোখ বিস্ময়ে প্রশংসার আনন্দে যেন ফেটে ঠিক্‌রে পড়বার মতন বিস্ফারিত হয়ে উঠ্‌লো, ঝাঁপের মতন তাঁর ঝোলা গোঁপ ফুলে বেঁকে উঠলো, তিনি উল্লসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন—এ যে অসাধারণ আশ্চর্য বই হচ্ছে!

রামযাদু নিজের ধূর্ততায় নিজের উপর পরম সন্তুষ্ট হয়ে বল্‌লে—কবি-রবি বলেছেন—'যত সাধ ছিলো সাধ্য ছিলো না।' মনের মতন করে লিখতে পারছি কই? থাকি যশোরে, না আছে সেখানে কারো ভালো লাইব্রেরি, আর না আছে আমার টাকা যে বই কিন্‌বো। কালে ভদ্রে একখানা বই কিনি, থেকে থেকে কল্‌কাতার ছুটে আসি—তাতে ওকালতিরও ক্ষতি হয়, বই লেখার কাজও এগোয় না।

পরান-বাবু জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—তা এর কতোটা লেখা হয়েছে?

রামযাদু বল্‌লে—তা হয়েছে অনেকখানি, একটা বেশ বড়ো বই হয়। কিন্তু হলে হবে কি? টাকাও নেই যে বই ছাপি, আর রোজই দেখছি যে আজকের চেয়ে কালকের জ্ঞান আমার অসম্পূর্ণ ছিলো, তাই ছাপতে সাহসও হয় না।

পরান-বাবু অত্যন্ত খুশি হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার আর দুখানা বই কি কি বিষয়ে?

রামযাদু বল্‌লে—দ্বিতীয়খানা লিখ্‌ছি—বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের ভগ্নাবশেষ সম্বন্ধে, সহজিয়া, বাউল, নেড়ানেড়ি, ধর্মঠাকুর, চণ্ডী, শীতলা, মনসা প্রভৃতি ধর্ম যে বৌদ্ধধর্মেরই ভগ্নাবশেষ তা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছি; অনেক গান ছড়া, প্রবাদ সংগ্রহ করে আমার মত সমর্থন করেছি, এর জন্যে আমাকে গাঁয়ে গাঁয়ে মেলায় মেলায় অনেক ঘুরতে হয়েছে।

পরান-বাবু প্রশংসমান দৃষ্টিতে রামযাদুর মুখের দিকে চেয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলেন—আর তৃতীয় বই?

রামযাদু বল্‌লে—তৃতীয় বই লিখছি যশোর-খুলনার ইতিহাস। যশোর-খুলনা আমাদের বাংলার শেষ বীরত্বের ক্ষেত্র; এখানে প্রতাপাদিত্য, সীতারাম বাংলার শেষ স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর জন্যে আমাকে জঙ্গলে জঙ্গলে বেড়াতে হয়েছে। অনাহারে অনিদ্রায় পরিশ্রমে ম্যালেরিয়ায় শরীর একেবারে জীর্ণ হয়ে গেছে। এ শুধু আমাদের জেলার পলিটিক্যাল্‌ ইতিহাস নয়, এতে সামাজিক এবং সাহিত্যিক ইতিহাসও আছে; জেলার কৃষি শিল্প বাণিজ্য যা ছিলো ও আছে ও যা হতে পারে তারও বিস্তারিত বিবরণ আছে।

পরান-বাবু আনন্দিত ও মুগ্ধ হয়ে বলে' উঠলেন—ও! তিনখানার একখানা লিখতে পারলেও যে একজন লোক অন্য দেশে ধনী আর অমর হয়ে যেতো। আপনি কাল যদি বই তিন খানা একবার নিয়ে আসেন তা হলে আমি একবার দেখে ধন্য হই।

রামযাদু বল্‌লে—সে বই তো আমার সঙ্গে নেই। আমি এসিয়াটিক সোসাইটি থেকে কিছু বই নিয়ে যাব বলে কলকাতায় এসেছি। আমি তো নিজে এসিয়াটিক সোসাইটির মেম্বর নই; একে তাকে ধরে বই সংগ্রহ করি...

পরান-বাবু একটু কুণ্ঠিত স্বরে বললেন—তা হলে আমায় আপনার একটু অনুগ্রহ করতে হবে। কি বই আপনার দরকার আমাকে বললে হয়তো আমি আমার লাইব্রেরি থেকে দিতে পারবো, নয় তো আমিই আনিয়ে দেবো। আর যশোরে গিয়ে বই তিনখানা যদি দয়া করে নিয়ে আসেন, তা হলে আমি সেগুলি দেখে নয়ন মন সার্থক করে বিশেষ উপকৃত হবো।

রামযাদু বল্‌লে—এর জন্যে আপনি অতো অনুরোধ করছেন কেন? যশোরে তো শুধু লোকের উপহাস পাই; আপনি দয়া করে আমার কৃতকর্ম যে দেখতে চাইছেন এই আমার সৌভাগ্য। নিজেব লেখা নিজের সন্তানের মতন, একজন কেউ তার আদর করলে মন খুশি হয়ে ওঠে। আমি আজই যশোর গিয়ে কাল আপনাকে এনে বই দেখাবো।

পরান-বাবু ব্যগ্র হয়ে বল্‌লেন—আপনার কাজের যদি কোনো ক্ষতি না হয়...

রামযাদু বল্‌লে—যে অকাজ ঘাড়ে নিয়ে আছে তার আবার কাজের ক্ষতি! একজন সমঝদার লোককে যদি আমার পরিশ্রমের ফল দেখাতে পারি সে তো আমারই পরম সৌভাগ্য। ...আজকে তা হলে উঠি; ঢের বেলা হলো। আপনাকে তো আবার আপিস যেতে হবে?

পরান-বাবু বললেন—হ্যাঁ, এখন চান করবো।...অ বোঁচা-আ-আ!

পরান-বাবুর বজ্রগম্ভীর চিৎকারের উত্তরে—এজ্ঞে যাই—বলার সঙ্গে-সঙ্গেই বোঁচা দৌড়ে এসে সাম্‌নে কাঠের পুতুলের মতন আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়ালো।

পরান-বাবু বল্‌লেন—আমার হাত-বাক্‌স দে।

বোঁচা একটা দেরাজ খুলে একটা ছোট ক্যাশ্‌-বাক্‌স বাহির করে এনে পরান-বাবুর সাম্‌নে টেবিলে রাখ্‌লো। পরান-বাবু বাক্‌স খুলে দশখানি দশ টাকার নোট গুনে বার করে বাক্‌স বন্ধ করলেন। বোঁচা বাক্‌স তুলে নিয়ে দেরাজে রাখতে গেলো। রামযাদু যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো। পরান-বাবু রামযাদুকে বল্‌লেন—আপনার যশোর যাওয়া-আসার খরচ আপনাকে নিতে হবে।

রামযাদু ব্যস্ত হয়ে বললে—সে আপনাকে দিতে হবে না।

পরান-বাবু বল্‌লেন—আমার জন্যে আপনি কষ্ট করে যাওয়া আসা সময়-নষ্ট করবেন, এই আপনার অশেষ অনুগ্রহ। যেটা আমি বহন করতে পারি সেটা আমাকে বহন করতে আপনি অনুমতি করুন।

রামযাদু বললে—তা অত টাকা কি হবে? আমরা তো থার্ড ক্লাশে যাতায়াত করি...

পরান-বাবু হেসে বললেন—সে নিজের কাজে। কিন্তু আমার কাজে আমি আপনাকে পাঠাচ্ছি—ফার্স্ট ক্লাশের পাথেয় আপনাকে দিতে আমি বাধ্য। আর তা ছাড়া আপনাকে আমি ওকালতি ছাড়াবো হয়ত, কতোদিনে যে আপনি আমার কবল থেকে ছাড়ান পাবেন তা বলতে পারিনে। সৎসঙ্গের প্রতি আমার বড়ো লোভ আছে রামযাদু-বাবু।

পরান-বাবু হো হো করে হেসে রামযাদুর হাতে নোটগুলি গুঁজে দিলেন।

রামযাদু নোটভরা অঞ্জলি তুলে পরান-বাবুকে নমস্কার করে বল্‌লে—আপনি আমাকে

চেনেন না, শোনেন না, এতোগুলি টাকা আমাকে দিচ্ছেন! আমি যদি আর এমুখো না হই? আপনি আমার বিদ্যা বুদ্ধি গবেষণা সম্বন্ধে আমার নিজের মুখের কথা ছাড়া আর কোনো পরিচয় পান নি; আমার কথা যদি মিথ্যা হয়, ভুয়ো হয়? শেষকালে প্রতারিত প্রবঞ্চিত হয়েছেন বলে দুঃখ পাবেন। আপনার মতন মহৎ ও সরল লোককে আমি ঠকাতে পারবো না। আমি আগে আমার পরিচয় দি, যদি যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারি তবে আপনার দান আমি গ্রহণ করবো।

পরান-বাবু রামযাদুর কথায় পরম সন্তুষ্ট হয়ে বল্‌লেন—দেখুন রামযাদু-বাবু, রোজ দুবেলায় আমার কাছে পঞ্চাশ ষাট জন লোক স্বার্থসিদ্ধির সন্ধানে আসে। আমি যথাসাধ্য তাদের সাহায্য করি। সবাই কিন্তু ভাবে আমি ভারি বোকা, তারা সেয়ানা, আমাকে তারা ঠকিয়ে ভোগা দিয়ে গেলো! আমিও জেনে শুনে সকলের কাছে ঠকি, অথচ প্রকাশ করিনে। আপনার মতন সরল অকপট স্পষ্ট কথা আমি কারো কাছে শুনিনি। একবার না হয় আমাকে সত্যি সত্যি ঠক্‌তে দিন।

রামযাদু এইবার নোটগুলি পকেটে গুঁজ্‌তে গুঁজ্‌তে গুঁজ্‌তে হেসে বল্‌লে—নেহাৎ যখন ঠক্‌বেনই আপনি, তখন কি কর্‌বো বলুন। তবে আজ বিদায় হই।

পরান-বাবু বল্‌লেন—প্রণাম হই। কাল আবার পায়ের ধুলো পাবো এই প্রতীক্ষায় থাক্‌বো।

রামযাদু হেসে বল্‌লে—পায়ের ধুলোর যেরকম মোটা বায়না আজ দাদন কর্‌লেন তাতে পায়ের ধুলো খুব ঘন ঘন পড়্‌বে, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন। কাঙালকে শাগেব ক্ষেত দেখিয়েছেন; শেষকালে মনে হবে আপদ বিদায় হলে বাঁচি।

পরান-বাবু অত্যন্ত খুশি হয়ে বল্‌লেন—এমন পষ্ট সত্যি কথা আমি কারো কাছে কখনো শুনিনি মুখুজ্জে মশায়। যদি আপদ বোধ হয় তা হলে আমিও পষ্ট সত্যি কথা বল্‌তে চেষ্টা করবো। আচ্ছা, আজ ছুটি।

পরান-বাবুর গুরুগম্ভীর উচ্চ হাস্যরোলে ঘর ভরাট হয়ে গমগম কর্‌তে লাগ্‌লো।

রামযাদু এক মন হাসি মনের মধ্যে চেপে রেখে বেরিয়ে যাবে, এমন সময় পাশের এক দরজা দিয়ে কৃষ্ণকলি সেই ঘরে এসে ঢুক্‌লো। রামযাদু অমনি ফিরে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণকলিকে টপ করে কোলে তুলে নিলে, এবং পরান-বাবুকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—এটি আপনার ছোটো মেয়ে বুঝি?

পরান-বাবু হেসে বললেন—হ্যাঁ, আপনাদেব আশীর্বাদে ঐটিই এখন সম্বল।...

কৃষ্ণকলির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই রামযাদু তাকে যে মুখ ভেঙিয়ে ভয় দেখিয়েছিলো সে কথা কৃষ্ণকলি ভোলে নি। তাই এখন রামযাদু তাকে কোলে তুলে নেওয়াতে সে কতক ভয়ে ও কতক বিরক্তিতে ও ঈষৎ লজ্জায় ব্যস্ত হয়ে রামযাদুর কোল থেকে নেমে পড়বার জন্যে ছটফট করছিলো। কৃষ্ণকলিকে ব্যস্ত দেখে পরান-বাবু হেসে বললেন—ওকে ছেড়ে দিন মুখুজ্জে মশায়, ওর পা আপনার গায়ে লাগ্‌ছে, ওর অকল্যাণ হবে।

এই অতি কুৎসিত মেয়েটাকে কোলে করে রামযাদুর সমস্ত দেহমন কেমন ঘিন্‌ঘিন্‌

করছিলো। সে কৃষ্ণকলিকে মুখ ভেঙিয়ে যে অন্যায় করেছিলো তার সংশোধনের চেষ্টাতেই সে একরকম মরিয়া হয়ে তাকে কোলে তুলে নিয়েছিলো; কিন্তু কৃষ্ণকলিকে তার আক্রমণে ধড়ফড় করতে দেখে ও পরান-বাবুর অনুরোধ শুনে সে কৃষ্ণকলিকে কোল থেকে নামিয়ে দেবার সুযোগ পেয়ে যেন বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে বাঁচলো। রামযাদু কৃষ্ণকলিকে কোল থেকে নামিয়ে দিতে নত হয়ে তার মাথায় হাত দিয়ে কাষ্ঠহাসি হেসে বল্‌লে—এমন বাপের মেয়ের কখনো অকল্যাণ হবে না।

কৃষ্ণকলি ছাড়া পেয়েই রামযাদুর কাছ থেকে পালিয়ে এসে বাবার চেয়ার ঘেঁষে দাঁড়ালো। পরান-বাবু রামযাদুর কথা শুনে সস্নেহে কন্যাকে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বল্‌লেন—সে আপনাদের আশীর্বাদ।

রামযাদু মুখে হাসি মাখিয়ে এবার বিদায় হয়ে ঘর ছেড়ে বেরুলো।

রামযাদু অদৃশ্য হবামাত্র কৃষ্ণকলি বলে উঠলো—ও লোকটা বড় দুষ্টু বাবা!...

পরান-বাবু কন্যাকে কোলে তুলে নিয়ে মৃদু ভর্ৎসনার স্বরে বল্‌লেন—ছি মা, অমন কথা বল্‌তে নেই। জগতের সবাই ভালো, কেউ দুষ্টু না।

কৃষ্ণকলি প্রতিবাদের স্বরে বলে' উঠলো—তবে ও আমাকে...

পরান-বাবু মনে করলেন কৃষ্ণকলিকে কোলে তোলার জন্য সে রামযাদুর উপর বিরক্ত হয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণকলির কথা শেষ হবার আগেই সেই ঘরে একজন লোক এসে প্রবেশ করলো। তাকে দেখেই পরান-বাবু বলে উঠলেন—এই যে প্রতাপ বাবু, আসুন আসুন, অনেক দিন পরে যে...

কৃষ্ণকলিব নালিশ আর শেষ করা হলো না, সে আস্তে আস্তে বাবাব কোল থেকে নেমে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলো। পরান-বাবু আগন্তুকের সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হলেন। রামযাদুর অদৃষ্ট তার প্রতি সুপ্রসন্ন হয়ে তাকে এ-যাত্রা বাঁচিয়ে দিলে!

কিরণ-বাবু মৃত্যুর সময় রামযাদুর হাতে দু হাজাব টাকা ও একটি বাক্‌সর চাবি দিয়ে তাকে বলেছিলেন—ঐ কাঠের বাক্‌সর ভিতর আমার জীবনেব পঁচিশ বৎসরের পবিশ্রম সঞ্চিত আছে। তিনখানা বই আমি লিখছিলাম, প্রায় শেষ করা হয়েছে, ঐ তিনখানা তুমি ছাপিয়ে প্রকাশ কোবো। ছাপ্‌বাব খরচ দু হাজার টাকা তোমার হাতে দিলাম; অত খরচ হয়তো লাগবে না—যা বাঁচবে তা তোমার; আর বই বিক্রির যা আয় হবে তাও তোমার। আমার এই শেষ অনুরোধটি তুমি রক্ষা কোবো, আমি পরলোক থেকে দেখে সুখী হবো।

রামযাদু সেই দু হাজার টাকা হাতে পেয়ে কতকগুলো বাজে লেখা ছাপিয়ে অপব্যয় করা আবশ্যক মনে করে নি। কিরণ-বাবুর লেখা বই তিনখানির রাশীকৃত খাতা কাঠের বাক্‌সের মধ্যেই বন্ধ হয়ে পড়ে ছিলো, এবং কিরণ-বাবুর দেওয়া দু হাজার টাকা রামযাদুব ও তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার নামের সেভিং-ব্যাঙ্কের খাতায় চারিয়ে জমা হয়ে গিয়েছিলো। এই পুঁজির ভরসাতেই সে কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হয়ে চাকরির সন্ধান করছিলো।

কিরণ-বাবুর বই তিনখানার কথা রামযাদু এক রকম ভুলেই গিযেছিলো। আজ পরান-

বাবুর মুখে সাধারণ চাকরির উমেদারদের প্রতি তাঁর অবজ্ঞা ও বিদ্যানুসন্ধিৎসুদের সাহায্য করতে স্বীকারোক্তি শুন্‌বা মাত্রই রামযাদুর স্বার্থবুদ্ধি তৎক্ষণাৎ সজাগ হয়ে তাকে স্মরণ করিয়ে দিলে সেই অবহেলিত কাঠের সিন্দুকটার কথা; এতোদিন সে যে খাতার রাশিকে অকেজো আবর্জনা মনে করে এসেছে, আজ তার সেগুলিকে টাকা-ধরা বঁড়শির টোপ বলে মনে হলো, আলাদিনের প্রদীপের মতন সেগুলির অসাধ্যসাধনের শক্তি তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। সে তৎক্ষণাৎ স্থির করে ফেললে পরান-বাবুকে তাঁর নিজের কথার জালে বন্ধ করে কিরণ-বাবুর লেখা খাতাগুলিকে অস্ত্র করে তাঁকে বধ করতে হবে। একবার তার মনে একটু ভয় হয়েছিলো যে কিরণ-বাবুর লেখার মধ্যে বাস্তবিক কোনো গুণপনা আছে কি না; সে তো শুধু বই তিনখানার নাম ও সূচীপত্র মাত্র পড়েছিলো, কোন্ বই কেমন লেখা হয়েছে যাচাই করে দেখ্‌বার আগ্রহ তার তো একদিনও হয়নি—কারণ যেখানে অর্থলাভের সম্ভাবনা নেই সে জিনিস যে তার কাছে নিতান্তই বাজে। এই সব খাতার স্তূপ যদি বাস্তবিকই বাজে বকুনিতে ভরা থাকে তবে সেগুলি পরান-বাবুকে দেখিয়ে সে কি শেষকালে অপ্রস্তুত হয়ে যাবে? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার এও মনে হতে লাগলো যে কিরণ-বাবুর মতন একজন শিক্ষিত বুদ্ধিমান লোক যে বিষয়ে পঁচিশ বৎসব পবিশ্রম করেছে তা কি একেবারেই খেলো হবে?

এইরূপ সাত-পাচ ভাবতে ভাবতে রামযাদু তার বন্ধুর মেসে ফিরে গেলো। তার পর প্রফুল্ল মনে খাওয়া-দাওয়া কবে বল্‌লে মার অসুখের কথা শুনে মনটা চঞ্চল হয়ে আছে; যদিও দেশেব লোকটি বল্‌লে যে মা ভালো আছেন, তবু মন স্থিব হচ্ছে না; যাই একবাব মাকে দেখেই আসি।

মেসের লোকে তার মাতৃবৎসলতা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলো। রামযাদু দেশে যাত্রা করলে।

রামযাদু প্রথম প্রাপ্তব্য ট্রেনে যশোরে পৌঁছেই কিরণবাবুর বইএব সিন্দুকটা খুলে বস্‌লো। সেই সব খাতাব মধ্যে মৌলিক গবেষণা আছে কি না খোঁজার চেয়ে, কোথাও কিবণ-বাবুব নাম গন্ধ পবিচয় আছে কি না তাই তন্ন তন্ন কবে খুঁজতে লেগে গেলো। অতি সাবধানে কিরণ-বাবুর নাম বা পরিচয় খুঁজে খুঁজে সেই জায়গাটার কাগজ ছিঁড়ে ফেল্‌বার উপায় থাক্‌লে ছিঁড়ে ফেলতে লাগলো, নয়তো কালি দিয়ে তার উপরে এমন ঘন প্রলেপ দিতে লাগলো যে তাব ভিতর থেকে কিরণ-বাবুর নাম যেন উঁকি মারতেও না পারে।

সমস্ত রাত জেগে এই চুরিব আয়োজন সম্পূর্ণ করে পবদিন সে সিন্দুকটি নিয়ে কলিকাতা রওনা হলো; পবান-বাবুব জন্যে এক ভাঁড় ভালো গাওয়া-ঘি ও একটা প্রকাণ্ড মানকচু সংগ্রহ করে নিতেও তাব ভুল হলো না।

কল্‌কাতায় এসে সে একেবারে ববাবর পরান-বাবুর বাড়িতে এসে উপস্থিত। গাড়িব ছাদ থেকে নামলো বইভরা সিন্দুক ও মানকচু এবং গাড়ির জঠর থেকে বেরুলো ঘিয়েব ভাঁড় ও জীর্ণ ছাতা হাতে শীর্ণ রামযাদু।

রামযাদু ব মাল পবান-বাবুর সম্মুখে উপস্থিত হতেই পরান-বাবুর ছোটো ছোটো চোখ

দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ও ঝাঁপালো গোঁপটা আনন্দে ভয়-পাওয়া বিড়ালের মতন ফুলে উঠলো। পরান-বাবু বল্লেন—প্রণাম হই মুখুজ্জে মশায়! অনেক রকম সুস্বাদু সামগ্রী এনেছেন যে।...ওরে রামা, গাড়ির ভাড়া দিয়ে দিস্।

রামযাদু পকেট থেকে মনিব্যাগ বাহির করে বল্লে—গাড়ির ভাড়া আমি দিচ্ছি।

পরান-বাবু হেসে বল্লেন—আমার বাড়িতে এসে আপনি গাড়িভাড়া দেবেন কি? আপনি নিশ্চন্ত হয়ে বসুন তো।

রামযাদুকে পয়সা খরচ না করা সম্বন্ধে দুবার অনুরোধ করতে হয় না। সে মনিব্যাগটি যথাস্থানে পুনঃ স্থাপিত করে চেয়ারে গিয়ে বস্লো এবং সে শুন্‌তে পেলে গাড়িখানা দরজার কাছ থেকে চলে গেলো—তা হলে গাড়োয়ান ভাড়া ইতিমধ্যে পেয়ে গেছে।

রামযাদু বস্‌লে পর পরান-বাবু বল্লেন—ঐ সিন্দুকে আপনার বই আছে বুঝি?

রামযাদু ঘাড় নেড়ে সায় দিলে দেখে পরান-বাবু আবার প্রশ্ন করলেন—ঐ ভাঁড়ে কি?

রামযাদু একটু সম্ভ্রমকুণ্ঠিত ভাবে বল্লে—আপনার জন্যে একটু খাঁটি গাওয়া-ঘি এনেছি।

পরান-বাবু উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠ্‌লেন—চমৎকার! আমি মশায় একবার নড়ালে গিয়েছিলাম; সে যে ঘি খেয়েছিলাম তার গন্ধ আর স্বাদ এখনো যেন আমার নাকে আর জিভে লেগে আছে! কলকাতায় এমন জিনিস পাবার জো নেই—মাখনে পর্যন্ত ভেজাল দেয় মশায়! মাখন-গালানো ঘি খেয়ে অম্বলে গলা জ্বলে সারা হতে হয়!...ওরে পচা!

পরান-বাবুর বজ্রনিনাদের উত্তরে নিচের তলা থেকে জবাব এলো—এজ্ঞে যাই।

শব্দ এসে পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গেই পচা অভিধেয় ভৃত্য ছুটে এসে হাজির হলো এবং ছুটে আসাব জন্য দ্রুত নিশ্বাস চেপে স্বাভাবিক নিশ্বাস নেবার চেষ্টা করতে লাগলো।

পরান-বাবু বললেন—এই ঘি আর কচু বাড়ির ভিতব নিয়ে যা—ঘিটা ভালো করে রাখতে বল্‌বি—খাঁটি গাওয়া ঘি!—যশোরের!—বুঝ্‌লি?

পচা নত হয়ে ভাঁড় ও কচু তুল্‌তে তুল্‌তে বল্লে—এজ্ঞে।

পরান-বাবু বল্লেন—আর বোঁচাকে বল্ ঐ সিন্দুকটা পাশের ঘরে তুলে রেখে দেবে।—বুঝলি?

পচা ভাঁড় ও কচু নিয়ে চলে যেতে যেতে বলে গেলো—এজ্ঞে।

এবার পরান-বাবু রামযাদুর দিকে ফিরে বল্লেন—বল্‌তে তো পারিনে মুখুজ্জে মশায়, বেলা হয়েছে, যদি এখানেই স্নান কর্‌তেন...

রামযাদু অমনি তৎক্ষণাৎ অম্লান মুখে মিথ্যা কথা বল্লে—বই লেখবার তথ্য সংগ্রহ করবার জন্যে বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে যে ম্যালেরিয়া ধরেছে, তাতে চান্ করলেই আমার জ্বর হয়। তাই আজ বারো বচ্ছর আমি চান্ করিনি।

পরান-বাবু বিস্ময় ও প্রশংসা ভরা স্বরে বল্লেন—বারো বচ্ছর চান করেন নি! আপনার অসাধারণ অধ্যবসায় ও বিদ্যানুরাগ! এমন একনিষ্ঠ বাণীসেবক আমি কখনো দেখিনি!...তা হলে মুখুজ্জে মশায়, নতুন কাপড় ও গামছা আছে, দয়া করে পা হাত ধুতে কি কোনো আপত্তি...

রামযাদু বল্‌লে—আপত্তি আর কি? ইতিহাসের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে এমন এক এক গাঁয়ে গিয়ে পড়েছি যে সেখানে নমঃশূদ্র কি মুসলমান ছাড়া আর কোনো জাত নেই। তাদের গোয়ালঘরে রান্না করে খেতে হয়েছে, কি করি বলুন!

পরান-বাবু বল্‌লেন—তাহলে গা তুলুন। ওরে পচা, মুখুজ্জে মশায়কে চানের ঘরে নিয়ে যা।

রামযাদু পরান-বাবুর নিত্য-অতিথি ও প্রতিপাল্য হয়ে উঠেছে। পরান-বাবুর খরচে কিরণ-বাবুর লেখা বইগুলি রামযাদুর নামে প্রকাশ হওয়াতে দেশময় রামযাদুর খ্যাতি ও নাম ছড়িয়ে পড়েছে। দেশের সাহিত্যিক মহলে রাম-যাদুর অসাধারণ খাতির ও প্রতিপত্তি; রামযাদুকে বহু সভা-সমিতি থেকে সম্বর্ধনা করবার ও অভিনন্দন দেবার ধুম পড়ে গেছে। রামযাদু যে সাহিত্য-সাধনার তপস্যায় আপনার স্বাস্থ্যকে বলি দিয়েছে এই সংবাদটি যখন সে নিজে পরান-বাবুকে দিয়ে দেশময় বেশ করে প্রচার ও রাষ্ট্র করে দিলে, তখন দেশময় সহানুভূতিপূর্ণ প্রশংসার বান ডাক্‌তে লাগলো; খবরের কাগজে রামযাদুর বই-এর সমালোচনা উপলক্ষ্য করে নিছক প্রশংসা ও জয়জয়কার বিঘোষিত হতে লাগ্‌লো; রামযাদু যে লক্ষ্মণের মতন চৌদ্দ বৎসর অনাহারে অনিদ্রায় বনে বনে বেড়িয়ে দেবী সরস্বতীর সাধনা করেছে এই সংবাদেই লোকের মন এমন অভিভূত হয়ে উঠেছিলো যে কেউ আর তার নামে প্রচারিত রচনাগুলির প্রকৃত সমালোচনা করবার অবসরই পাচ্ছিলো না। কলিকাতার বিশিষ্ট সমাজে রামযাদুর প্রতিষ্ঠা এমন হঠাৎ কায়েমি হয়ে গেলো যে রামযাদু নিজের বুদ্ধির প্রখরতা সম্বন্ধে গভীর বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও সেই বুদ্ধিরও এই রকম অপ্রত্যাশিত সাফল্য দেখে আশ্চর্য হয়ে উঠলো। কলিকাতার বড়ো বড়ো ডাক্তার কবিরাজ বিনা পয়সায় রামযাদুকে চিকিৎসা করে সুস্থ করবার আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলেন; বড়ো বড়ো কবিরাজেরা দামি দামি ঔষধ বিনামূল্যে রামযাদুর বাড়িতে নিজেরা বয়ে নিয়ে এসে দিয়ে যান; রামযাদুব মেসের ঘর কবিরাজি ঔষধালয় হয়ে ওঠ্‌বার উপক্রম করতে লাগলো। এতো ঔষধ রামযাদু অকারণে খেতে মাখতেও পারে না; ঘরে জমিয়ে রাখতেও পারে না, কবিরাজেরা প্রায়ই অনাহুত এসে উপস্থিত হন এবং তাঁরা যদি দেখেন যে রামযাদু কোনো ঔষধই সেবন করে নি তবে তাঁরা ক্ষুণ্ণ হবেন এবং তাব বুজরুকিও ফাঁস হয়ে যাবে; পয়সার জিনিস প্রাণ ধরে সে ফেলে দিতেও পারে না, সে বরং বিনা অসুখে ঔষধ সেবন করে অসুখে ভুগতে—এমন কি প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছে, তবু সে প্রাণ ধরে পয়সার জিনিস ফেলে দিতে পারবে না। হঠাৎ রামযাদুর মনে হলো এই সব ঔষধ বেচেও তো দু পয়সা উপার্জন করে নিতে পারা যায়! মনে সঙ্কল্প উদয় হবার সঙ্গে সঙ্গে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া রামযাদুর স্বভাব। সে ঔষধ বেচবার সন্ধানে নির্গত হলো। ভিন্ন পাড়ায় এক ছোট্ট ঘরের সামনে এক কবিরাজের কদর্য সাইনবোর্ড টাঙানো দেখে রামযাদু বুঝলে এই কবিরাজটি হাতুড়ে যদিও বা না হয় তো বড়ো গরিব, ছোটো এঁদোপড়া ঘরে তার আস্তানা, আর তার এমন সঙ্গতি নেই যে একখানা সুশ্রী সাইনবোর্ড লাগায়; তাকে দিয়েই নিজের

কার্যসিদ্ধি হবে মনে করে রামযাদু সেই কবিরাজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। কবিরাজ আগন্তুককে দেখেই গম্ভীর হয়ে খাড়া হয়ে বস্‌লো, বেচারা হয়তো মনে করলে যে সেদিন তার সুপ্রভাত! তার ভাগ্যে একজন রোগী পাওয়া গেছে তা হলে! রামযাদুর চেহারা একেই শীর্ণ ম্লান, তাতে আবার সে নিজেকে রুগ্ন প্রতিপন্ন করবার জন্য স্নান করা ছেড়ে দিয়েছে; এই অবস্থায় তাকে রোগী মনে করাতে কবিরাজের দুরাশাকে কিছুমাত্র দোষী করা যায় না। কবিরাজের ঘরে একজন লোক বসে ছিলো; কবিরাজ তাকে সম্বোধন করে বলে উঠ্‌লো—“আপনি তিন দিন ওষুধ খেয়েই যখন ভালো বোধ কর্‌ছেন, তখন ঐ ওষুধেই আপনার ব্যাধি আরোগ্য হবে; পুরাতন ব্যাধি কিনা, দীর্ঘকাল ওষুধ সেবন না করলে তো নির্মূল হয়ে যাবে না।” তার পর রামযাদুর দিকে ফিরে বল্‌লে—“আসুন, বসুন। আমি এঁকে দেখে নিয়ে, আপনাকে দেখছি।” তার পর আবার ঘরের অপর লোকটির দিকে ফিরে কবিরাজ বল্‌লে—“বৈকালের ঔষধটার অনুপানটা একটু বদ্‌লে দেবো। আচ্ছা আপনি বসুন...” বলে রামযাদুকে দেখিয়ে বল্‌লে—“বাবুকে বড় কাতর কাহিল দেখছি; আগে ওনাকে দেখে লই...” এবং অমনি রামযাদুর দিকে ফিরে বল্‌লে—“বাবুর ব্যাধিটি কি? একবার হাতটা দেখি—”

রামযাদু কবিরাজের রকম দেখে মনে মনে হেসে কবিরাজের প্রসারিত হাতে নিজের হাত সমর্পণ না করে বল্‌লে—“এঁকে দেখে নিন। তার পর আমার কথা বল্‌বো—আমার একটু গোপনে...”

কবিরাজ উৎসাহিত হয়ে বলে উঠ্‌ল—ও! আপনার গোপনীয় ব্যাধি হয়েছে! তার জন্যে কিছু চিন্তা কর্‌বেন না, ঐ ব্যাধির ধন্বন্তরি ঔষধ আমার কাছে আছে...আমার পিতামহের স্বপ্নলব্ধ...

রামযাদু মনে মনে কৌতুক ও বিরক্তি উভয়ই অনুভব করে মনে মনে বল্‌লে—“দূর বেটা গোবদ্যি।” তার পর প্রকাশে বল্‌লে—না মশায়, আমার কোনো ব্যাধি নেই। আমি অন্য একটি গোপন কথা আপনাকে বল্‌তে এসেছি...

রামযাদুর এই কথা শুনে কবিরাজের দুই চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠ্‌লো; অপরিচিত লোক কবিরাজের কাছে চিকিৎসার কথা ছাড়া আর কি গোপনীয় কথা বল্‌তে পারে তা ঠিক করতে না পেরে কবিরাজ ঘরের অপর লোকটিকে বল্‌লে—আচ্ছা হরিচরণ, তুমি এখন যাও, তোমাকে অন্য সময় ব্যবস্থা করে দেবো...

হরিচরণকে, কবিরাজ আগে আপনি বলে সম্বোধন করছিল, এখন তাকে সে তুমি বল্‌লে, ধূর্ত রামযাদুর লক্ষ্য থেকে এই বিসদৃশ ব্যবহার এড়ালো না; রামযাদু মনে মনে হেসে বল্‌লে— বেটা ধড়িবাজ! বাড়ির লোককে রোগী সাজিয়ে পসার জমাবার জোচ্চুরি! আমার কাছে বেটার ধাপ্পাবাজি!

রামযাদু আড়চোখে চেয়ে দেখলে হরিচরণ কবিরাজের দিকে চেয়ে অর্থপূর্ণ ভাবে ঈষৎ হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

হরিচরণ চলে যেতেই কবিরাজ কৌতূহলী স্বরে বলে উঠলো —আপনার কি কথা?

রামযাদু কণ্ঠস্বর নামিয়ে বল্‌লে—কিছু ওষুধ কিন্‌বেন?

কবিরাজ জিজ্ঞাসা করলে—চোরাই মাল নাকি?

রামযাদু মনে মনে কবিরাজকে শক্ত রকম একটা গালাগালি দিয়ে প্রকাশ্যে বল্‌লে—না। একজন রোগীর জন্যে আনা হয়েছিলো, এখন আর দরকার নেই।

কবিরাজ জিজ্ঞাসা করলে—রোগীর মৃত্যু হয়েছে বুঝি?

রামযাদু মনে মনে বল্‌লে—"তোব মৃত্যু হোক দগ্ধানন!" প্রকাশ্যে বল্‌লে—না, মৃত্যু হয় নি; এখন আর সে-সব ওষুধের দবকার নেই। আপনি কিন্‌বেন কি না তাই বলুন।

কবিরাজ বল্‌লে—আরে মশায়, চটেন কেন? কার ওষুধ, কি ওষুধ, কোন্ কবিরাজের প্রস্তুত, না জান্‌লে কিনি কেমন করে'?

রামযাদু বল্‌লে—ওষুধ আমার, শহরের সেরা কবিরাজের তৈরি. এই ওষুধের ফর্দ—

রামযাদু ঔষধের তালিকা পকেট থেকে বাহির করে কবিরাজের সামনে ফেলে দিলে—কবিরাজ পড়তে লাগল—বসন্তকুসুমাকর দুই সপ্তাহ, চ্যবনপ্রাস চার সপ্তাহ, মকরধ্বজ চার সপ্তাহ..এগুলি কি? ...ব্যবস্থাপত্র! .. শহরের ধন্বন্তরিকল্প কবিবাজদের! ..চোরাইমাল নয় তা হলে!...আমি কিন্‌তে পারি...কতো দিতে হবে?

রামযাদু বল্‌লে—অর্দ্ধমূল্য।

কবিরাজ ফর্দ ফেরত দিয়ে বল্‌লে—পারবো না, মাপ কব্‌বেন। কম-সম করে দিলে কিন্‌তে পারি।

রামযাদু মনে মনে একটু ভেবে বল্‌লে—শাস্ত্রে বলেছে সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। অর্দ্ধের বেশি ত্যাগ করা তো শাস্ত্রবিরুদ্ধ। আর কমাতে আমি পারব না। বসুন তবে...

দাঁও ফেসে যায় দেখে কবিরাজ ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল—আবে মশায়, যান কেন, একটু বসুন না। ক্রয়-বিক্রয় কি এক কথায় হয়, কথায় বলে—

শও কথায় সওদা,
আর শতেক ঠাসায় ময়দা,
শতেক চাষে মুলো.

রামযাদু ব্যস্ত হয়ে বলে উঠ্‌লো—আপনার শ্লোক আবৃত্তি রেখে ওষুধ নিতে হয় তো নিয়ে ফেলুন, আমার ঢের কাজ আছে।

কবিরাজ মনে মনে বললে—"আচ্ছা ব্যস্তবাগীশ তো! দুনিয়ায় সবাই ব্যস্ত, কেবল আমিই দেখি বেকার।" তার পর প্রকাশ্যে বল্‌লে—আচ্ছা আপনার কথাও থাক, আমার কথাও থাক—সিকিমূল্য হলেই ঠিক হতো, তা আপনি যখন বেশি কমাতে নারাজ তখন তেহাই দামে দিয়ে দিন..

রামযাদু যথালাভ মনে করে বল্‌লে—আচ্ছা, এই আমাদের প্রথম কারবারের বউনি বলে আপনাকে কম মূল্যে দিচ্ছি; কিন্তু এর পরে অর্দ্ধমূল্য দিতে হবে।

ভবিষ্যতেও এই রকম উৎকৃষ্ট ঔষধ অল্পমূল্যে পাবার সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হয়ে কবিরাজ বল্‌লে—আপনি অনুগ্রহ করে এলে সে বিষয় বিবেচনা করে দেখা যাবে। আপনারা?

রামযাদু বল্‌লে—ব্রাহ্মণ।

কবিরাজ হাতজোড় করে মাথা নুইয়ে প্রণাম করে বললে—মধ্যে মধ্যে পায়ের ধুলো দিয়ে কৃতার্থ কববেন। আপনাব সঙ্গে আলাপ হয়ে বড় সুখী হলাম।

রামযাদু কুকুরের মতন দাঁত বার করে হেসে বল্‌লে—সে উভয়তই।

রামযাদুর এ একটা নূতন উপার্জনের পথ হলো, সে এখন আরো বেশি করে শহরেব বড়ো বড়ো কবিরাজের কাছেই নিজের স্বাস্থ্যহানির কাদুনি গেয়ে ঔষধ আদায করে আর সেই কবিরাজকে বেচে আসে।

এক দিন কবিরাজেব কাছে ঔষধ বেচে ফিরে আস্‌তে আসতে বামযাদুর মনে হলো—মানুষের শরীব এই আছে এই নেই। পরান-বাবু যে রকম মোটা, আর তাঁর বয়সও তো কম হয নি, তাতে তাঁব জীবনেব ভরসা আর কতো দিন। বেটা কেওট বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তে আমাব একটা কাযেমি হিল্লে বাগিয়ে নিতে হবে।

বামযাদুর চিন্তাকে কর্মে পবিণত করতে কখনো কালবিলম্ব হয় না। সে কবিরাজেব বাড়ি থেকে নিজেব বাসায ফিবে না গিয়ে বরাবব পবান-বাবুর বাড়িতে গিযে উপস্থিত হলো।

তাকে আস্‌তে দেখেই পবান-বাবু বলে উঠলেন—এই যে মুখুজ্জে মশায়, প্রণাম হই। টাইম্‌স্ লিটাবাবি সাপ্লিমেন্টে আপনার বইএব কী রকম প্রশংসা বেবিয়েছে দেখেছেন?

বামযাদু উৎফুল্ল মুখে বল্‌লে—না.

"এই দেখুন" বলে পরান-বাবু কাগজখানা রামযাদুব সামনে এগিযে দিলেন।

বামযাদু কাগজখানা তুলে নিযে চেযাবে বস্‌তে বসতে বল্‌লে—আমি এন্ডাবসন, বেভাবিজ, পার্জিটাব, গ্রিযাব্‌সন আব যাকোবিব চিঠি পেযেছি—তাঁরা সবাই তো দযা কবে ভালোই বলেছেন। যাকোবি বার্লিন টাগেব্লাট আব ট্‌সাইটুং থেকে দুটো সমালোচনাব কাটিং পাঠিয়েছেন, কিন্তু আমি তো জার্মান জানি না..

পবান বাবু বল্‌লেন—আপনি আমাকে সে দুটো দেবেন, আমি আমাদের আপিসেব সাহেবদেব দিয়ে.

রামযাদু পবান-বাবুব কথাব মাঝখানেই বলে উঠলে—ভালো কথা মনে কবে দিযেছেন—আমি কদিন থেকেই বলি-বলি কব্‌ছি, কথায় কথায় চাপা পড়ে যায, আব বলা হয় না।

পবান-বাবু উৎসুক হযে বললেন—আজ্ঞে করুন

বামযাদু বল্‌তে লাগলো—আপনাব আপিসেব কথাতেই মনে হলো—আপনার আপিসে আমার যদি একটি কাজ.

পরান-বাবু ব্যস্ত হযে বললেন—আপনাব আর কাজ কববাব কি দরকার? আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে সাহিত্যানুসন্ধান করুন, আমি তো বলেছি, আপনার সপবিবারের অভাব আমারই অভাব এবং তা মোচন কববার চিন্তাও আমারই..

বামযাদু দন্তবিকাশ কবে বল্‌লে—আপনার অসীম দযা, পবম মহত্ত্ব, অগাধ উদাবতা! কিন্তু...

পরান-বাবু উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—এতে আর কিন্তু কি মুখুজ্জে মশায়?

রামযাদু পরম বিনয়ের অভিনয় করে মাথা নিচু করে বল্‌লে—আজ্ঞে স্বাবলম্বী হয়ে সাহিত্যালোচনা করতে পারলেই...

পরান-বাবু আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে বল্‌লেন—এ আপনারই উপযুক্ত কথা হয়েছে মুখুজ্জে মশায়! স্বাবলম্বন! এই কথাটি যে কত বড়ো কথা তা আমাদের দেশের লোকেরা তো বড়ো কেউ একটা বোঝে না! আপনার যে গুণপনা আছে তাতে আপনার অভাব-মোচনের ভার গভর্মেন্টের ও দেশের লোকেরই নেওয়া উচিত এবং তারা নিতেও প্রস্তুত আছে; তৎসত্ত্বেও আপনি যে স্বোপার্জিত আয়ের উপরই নির্ভর করতে চান এতে আপনার পৌরুষ আর মহত্ত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়!

রামযাদু আপনার কৌশলের সফলতায় হর্ষগদগদ হয়ে বল্‌লে—আপনি আমাকে অনুগ্রহ করেন বলে এতটা গৌরব আমাকে দিচ্ছেন...

পরান-বাবু বল্‌লেন—আপনার গৌরব আপনি নিজে অর্জন করেন মুখুজ্জে মশায়: আপনার অর্থোপার্জনের পথও আপনা হতেই মুক্ত হয়ে যাবে।

রামযাদু বল্‌লে—সে যদি হয় তবে হবে আপনারই অনুগ্রহে! প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে আপনার কাছ থেকে উপকার পায় নি এমন লোক বাংলা দেশে বিরল! আমার বইগুলো তো সিন্দুকে বন্ধ হয়ে ধুলো হচ্ছিলো; তাদের আপনিই প্রকাশ করে আমাকে কৃতার্থ করেছেন, আমাদের বঙ্গসরস্বতীকে জয়যুক্ত করেছেন। আমি সরস্বতীর অধম সেবক...

পরান-বাবু রামযাদুর গৌরবে গৌরবান্বিত অনুভব করে গর্বিত ভাবে বল্‌লেন—আপনি সরস্বতীর বরপুত্র!

রামযাদু প্রতারণালব্ধ এই স্তুতিবাক্যে সত্য-সত্যই লজ্জিত হয়ে মাথা নত করলে। পরান-বাবু দেখে ভাবলেন—আহা! কী বিনয়!

পরান-বাবু বল্‌লেন—আপনি তা হলে প্রস্তুত হয়ে থাক্‌বেন, কাল থেকেই আমাদের আপিসে আপনি বেরোবেন—আজ একবার বড় সাহেবকে বলে...

রামযাদু বল্‌লে—যে আজ্ঞে। সাহেব-টাহেব ও-সব তো মিথ্যে, আপনি *সর্বশক্তিমান্...ইচ্ছাময়...পতিতপাবন...*

পরান-বাবু তোষামোদে তুষ্ট হয়ে বড়ো বড়ো গোঁপের ঝোপের ভিতর থেকে হেসে বল্‌লেন—না না, আপনারা আমার বন্ধুরা আমাকে যা মনে করেন তা আমি নই। আচ্ছা মুখুজ্জে মশায...

পরান-বাবুর এই আচ্ছা বলে স্বর টেনে থেমে যাওয়া মানে যে সম্বোধিত ব্যক্তিকে বিদায় নিয়ে প্রস্থান করতে বলা তা রামযাদু জেনে নিয়েছিলো। সে উঠে বল্‌লে—আচ্ছা, তবে এখন আসি...

রামযাদু বাইরে চলে যেতে যেতে মনে মনে বল্‌তে লাগলো—বেটা কেওট! বোকা নিরেট! আচ্ছা ভোগা দিয়ে মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া যাচ্ছে! বাবা তারকনাথ, আচ্ছা ফন্দি বাতলে দিয়েছো বাবা! বিশ্বাসের পো-কে আর কিছুদিন বাঁচিয়ে যদি রাখো তো আমি বেশ দু পয়সার সঙ্গতি করে নিতে পারব!

পরান-বাবুর কাছ থেকে বিদায় হয়ে রামযাদু নিচে নেমে এসেই দেখলে থাকোহরি নিচের দালানে দাঁড়িয়ে রয়েছে—তার পরনে মিহি দেশি ধুতি, গায়ে জালি-গেঞ্জির উপরে আদ্ধির পাঞ্জাবি পিরান, পায়ে পেটেন্ট লেদারের চটি! অধিকন্তু তার চোখে সোনার চশ্‌মা চড়েছে, আর হাতের মণিবন্ধে সোনার বন্ধনীতে সোনার হাতঘড়ি বাঁধা আছে! তাকে দেখেই রামযাদুর মন ঈর্ষায় জ্বলে বলে উঠলো—ঈস্! ঠিক যেন জামাই-বাবু! বেশ আছো বাবা!...

রামযাদুকে আস্‌তে দেখেই থাকোহরি হাসিমুখে তার দিকে এগিয়ে চল্‌লো।

থাকোহরিকে তার দিকে আসতে দেখে রামযাদু বল্‌লে—কি হে থাকোহরি! বলি খবর কি?

থাকোহরি রামযাদুর নিকটস্থ হয়ে তাকে প্রণাম করবার জন্য নত হতে হতে বল্‌লে—আজ্ঞে ভালো।

রামযাদু হেসে বল্‌লে—ভাল যে তা তোমার চেহারা দেখেই মালুম হচ্ছে। তা এখন করা হচ্ছে কি? পড়াশুনো বেশ হচ্ছে তো?

থাকোহরি বল্‌লে—কর্তা, কলেজ ছাড়িয়ে দিয়েছেন...

রামযাদু আশ্চর্য হয়ে চক্ষু বিস্ফারিত করে বলে উঠলো—কর্তা কলেজ ছাড়িয়ে দিয়েছেন! কেন?

থাকোহবি একটু কুণ্ঠিত সঙ্কুচিত ভাবে বলতে লাগলো—কর্তা বল্‌লেন, আজকাল পাশ-টাস করে তো বিশেষ কিছু হয় না, তার চেয়ে তাড়াতাড়ি আপিসে ঢুকলে কাজ-কর্ম শিখে উন্নতি হতে পারে। তাই তিনি আমাকে তাঁর আপিসে ভর্তি করে দিয়েছেন; আর দুজন প্রাইভেট টিউটার রেখে দিয়েছেন, তাঁদের কাছে সকাল সন্ধ্যায় আমি লেখাপড়াও করি...

রামযাদুর মন ঈর্ষায় পূর্ণ হয়ে উঠলো—একেই বলে পাতা-চাপা কপাল! ছোঁড়া এগ্‌জামিনে ফেল্ করে পথের ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলো, আর এখন একেবারে এগ্‌জামিনের ঝঞ্ঝাট কাটিয়ে নবাব বনে গেছে! আমার আগে হতভাগা আপিসে ঢুকেছে—এইবার আমায় ডিঙিয়ে চল্‌বে দেখছি!

রামযাদুকে মৌন ও বিস্ময়াপন্ন দেখে থাকোহরি তাব মুখের দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ স্বরে বল্‌লে—আমার এই সুখ-স্বচ্ছন্দের মূল আপনারই দয়া! আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ হয়ে...

এতোক্ষণ রামযাদু আত্মসম্বরণ করে বল্‌লে—না না, আমি আর তোমার কী করেছি! সকলের সকল সুখদুঃখের মূল নিজের নিজের প্রাক্তন কর্ম-ফল আর শ্রীভগবানের দয়া!

থাকোহরি কৃতজ্ঞতায় গদ্‌গদ স্বরে বল্‌লে—ভগবানের দয়াই আপনার দয়া-রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলো!

রামযাদু একটু বিরক্ত স্ববে বলে উঠলো—তোমার জ্যাঠামি রেখে দাও তো ছোক্‌রা!...আপিসে কি কাজ করা হয়? ...অ্যাপ্রেন্টিস্ আছো বুঝি?.. পেড্, না, আন্-পেড?...

থাকোহরি রামযাদুর তিরস্কারে অপ্রস্তুত হয়েও রামযাদুর আত্মপ্রশংসা শ্রবণে অনিচ্ছার পরিচয় পেয়ে তার প্রতি অধিক ভক্তিমান্ হয়ে বল্‌লে—কত্তা আমাকে অ্যাসিস্ট্যান্ট কেশিয়ার করে দিয়েছেন...

বিস্ময়ের আতিশয্যে রামযাদুর মুখ থেকে নির্গত হতে যাচ্ছিলো—"এক্কেবারে অ্যাসিস্ট্যান্ট কেশিয়ার!" কিন্তু সে তার এই বিস্ময়োক্তি দমন করে সহজ ভাব অবলম্বন করে বল্‌লে—কতো মাইনে?—

—দেড়শো টাকা থেকে আড়াইশো টাকা গ্রেড...

আবার রামযাদুর মনের মধ্যে বিস্ময় উন্মুখ হয়ে বলে উঠলো—আরে বাস্ রে! এক্কেবারে দেড়-শো টা-আ-কা!

তার পর সে প্রকাশ্যে থাকোহরিকে জিজ্ঞাসা করলে—কেশিয়ারের কাজে টাকা জমা দিতে হয় না? ...কর্তা তোমার জামিন হয়েছেন বুঝি?

—সাহেবরা কত্তার উপরেই লোক বাহালের সব ভার দিয়ে রেখেছেন; তাই কর্তা নিজের লোককে কেবল জামিন হয়ে বাহাল করতে ইচ্ছা করলেন না, তিনি এক লাখ টাকা সিকিউরিটি ডিপোজিট করে দিয়েছেন।

এই কথা বলতে বলতে থাকোহরির চোখ ছলছল করে উঠলো—তার এতোখানি সৌভাগ্য এবং পরান-বাবুব এতোখানি দয়া তার হৃদযকে অভিভূত করে তুললে।

রামযাদুর মন আবার বিস্ময়-ভরে বলে উঠলো—আরে বাস্ রে! এ-ক লা-খ টা-কা!

কিন্তু সে বিস্ময় বাহিবে প্রকাশ না করে হর্ষেব ভাব দেখিয়ে বললে—বেশ! বেশ! বড্ড কষ্ট পেয়েছো, এখন ভগবানের কৃপায় আর কত্তার অনুগ্রহে তোমার ভাল হোক। খুব সাবধানে কত্তার মন জুগিযে চোলো, তাঁর সুনজবে যখন পড়েছো তোমার আখেবে ভালই হবে।

রামযাদুর এই আশীর্বাদে থাকোহরির পূর্ণ চিত্ত উদ্বেলিত হযে উঠলো; কিন্তু সে রামযাদুর তিরস্কারেব ভয়ে তাকে মুখে কিছু না বলে নীরবে নত হয়ে তাব পায়ের ধূলা নিলে।

রামযাদু চিন্তিত মনে সেখান থেকে চলে যেতে যেতে বল্‌লে—আচ্ছা ভাই, আমি এখন তবে আসি..

থাকোহরি মুগ্ধ ও স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে রামযাদুর মুখেব দিকে তাকালে। রামযাদু পরান-বাবুব বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে গেলো।

রামযাদু রাস্তায় চলতে চলতে ভাব্‌তে লাগলো—-বেটা ঘুঁটে কুড়ুনির ছানা এক্কেবারে হঠাৎ-নবাব! এ যে দেখি বাই কুড়ুতে বেল! পরানে-টা একে এতো তোয়াজ করছে কেন?. বেওরাখানা কি?...পরানে ছোঁড়াব চাঁদপানা মুখ দেখে ভুলে গেছে! সাধে কি বঙ্কিম-বাবু লিখেছিলেন—সুন্দব মুখের জয় সর্ব্বত্র!...কিন্তু একটা ছোঁড়ার সুন্দর মুখেব দাম কি এ-ক লা-খ টা-আ-কা! ছুঁড়ি হলেও বা একটা মানের নাগাল পাওয়া যেতো!...ছোঁড়ার মা-মাগিকেও তো এনে বাড়িতে ভবেছে৷ এই ছেলেকে কোলে করে মাগি বিধবা

হয়েছিলো, আর ছেলে হয় নি; আমি আগে মনে করেছিলাম মরুঞ্চে পোয়াতির ছেলে বলে নাম রেখেছিলো থাকোহরি, কিন্তু তা তো নয়, বিধবার ছেলে বলে ঐ নাম।

রামযাদু ভাবতে ভাবতে আস্তে আস্তে রাস্তায় চল্‌ছিলো। এখন থাকোহরিকে পরান-বাবুর যত্ন করবার উদ্দেশ্য ও কার্য-কারণ-সম্পর্ক আবিষ্কার করতে পেরেছে মনে করে সে হনহন করে পথ হাঁটতে লাগলো।

পরদিন সকালে নিয়মিত রামযাদু পরান-বাবুর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলো; এটি তার প্রাত্যহিক কর্ম। সে পরান-বাবুর বাড়ির মধ্যে ঢুকেই দেখলে—কৃষ্ণকলি তার ফ্রকের কোঁচড়ে কতকগুলো মটর নিয়ে উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে, আর এক পাল সাদা পেখম-ধরা পায়রা তাকে ঘিরে মটরগুলি খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে, আর মদ্দা পায়রাগুলো থেকে থেকে গলা ফুলিয়ে ঘাড় নেড়ে নেড়ে বকম-বকম করে ডাক্‌তে ডাক্‌তে ঘুরপাক খাচ্ছে। রামযাদু কৃষ্ণকলিকে দেখেই কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব মোলায়েম ও স্নেহসিক্ত করে বল্‌লে—এই যে খুকুমণি? কি হচ্ছে মা-লক্ষ্মীর! পায়রাকে খাওয়ানো হচ্ছে? সর্বজীবে সমান দয়া তোমাদের! এ যেন লক্ষ্মীর সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ!

রামযাদু কথাগুলো একটু উঁচু গলাতেই বল্‌লে; তার কথা কৃষ্ণকলি বুঝতে পারবে এমন সম্ভাবনা যে নেই তা জেনেও সে ঐসব কথা বল্‌লে এই ভেবে, যে, যারা বুঝতে পারলে সাক্ষাতে খোসামোদ না করেও খোসামোদ করার কাজ হবে তারা যদি কোনো রকমে শুনতে পেয়ে যায়।

রামযাদুর ডাক শুনেই কৃষ্ণকলি একবার তার মুখ ফিরিয়ে রামযাদুকে দেখেই আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছিলো, এবং যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাক্‌বে, না ছুটে পালাবে ভাবছিলো; তার উপর আবার রামযাদুর মুখে দুর্বোধ্য অনেক কথা শুনে তার বুক দুরদুর করে কেঁপে উঠলো—ঐ লোকটা এখনই বুঝি আবার তাকে মুখ ভেংচে ভয় দেখাবে!

রামযাদু কৃষ্ণকলিকে পালিয়ে না গিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে আস্তে আস্তে তার দিকে এগিয়ে চল্‌লো। কৃষ্ণকলি রামযাদুর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলো, এবং অনেক পায়রা কলরব করে মটর খুঁটে খাচ্ছিলো ও উঠানের শানের উপর পায়রার ঠোঁট ঠোকার ঠকঠক শব্দও হচ্ছিলো, তাই সে রামযাদুর নিকটে আসা দেখতে বা শুনতে পায় নি। রামযাদু পায়রার গণ্ডীর একেবারে কিনারে গিয়ে আবার ডাক্‌লে—খুকুমণি! তোমার পায়রাগুলি তো বেশ!...

কৃষ্ণকলি একেবারে তার পিঠের কাছে রামযাদুর কথা শুনতে পেয়ে হঠাৎ চম্‌কে উঠলো এবং মুখ ফিরিয়েই রামযাদুকে শীর্ণ ফ্যাকাশে মুখে বড়ো বড়ো সাদা সাদা দাঁত বাহির করে হাস্‌তে দেখলে। কৃষ্ণকলি তৎক্ষণাৎ কোঁচড়ের সমস্ত মটর পায়রাদের উপরে ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে সেখান থেকে দৌড় দিয়ে বাড়ির মধ্যে পালিয়ে গেলো। আর সমস্ত পায়রা একসঙ্গে পাখা ফটফট করে ধুলো উড়িয়ে রামযাদুকে চকিত করে উড়ে'

গেলো এবং কতকগুলো উঠানের চারিধারের কার্নিশের উপরে গিয়ে বসলো, আর কতকগুলো আবার উঠান নেমে মটর খুঁটতে প্রবৃত্ত হলো।

রামযাদু অপ্রস্তুত হয়ে ফিরে আস্‌তে আস্‌তে মনে মনে বল্‌লে—বেটি রক্ষাকালীর বাচ্চা! তোকে দেখলেই গাটা ঘিনঘিন করে! কিন্তু তবু তোর সঙ্গে আমার ভাব করতেই হবে—বাপ-মার একমাত্র আদুরে মেয়ে—তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্ট!

রামযাদু উপরে পরান-বাবুর ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলে; দেখলে এক-ঘর লোক।

পরান-বাবু রামযাদুকে দেখেই হেসে বল্‌লেন—আস্‌তে আজ্ঞে হোক মুখুজ্জে মশায়! প্রণাম! কার সঙ্গে কথা হচ্ছিলো? কলির সঙ্গে বুঝি?

রামযাদুর মন বলে উঠলো—কলি! কলি—হুঁকো! কালী—কালীর ছানা—বঙ্কিম-বাবুর ইন্দিরার কালির বোতল—শরৎ-বাবুর পোড়া-কাঠ!

কিন্তু রামযাদুর মুখ হাস্যে বিকশিত হয়ে বলে উঠলো—আজ্ঞে হ্যাঁ। মা-লক্ষ্মীর জীবে দয়া দেখে বড়ো আনন্দ হলো!

অমনি ঘরে উপবিষ্ট লোকেদের মধ্যে দু-তিনজন সমস্বরে বলে উঠলো—হবে না কেন? কেমন পিতা-মাতার কন্যা! পিতা সাক্ষাৎ মহাদেব আর মাতা দুর্গা! তাঁদের কন্যা তো লক্ষ্মী হবেনই।

একজন ভট্টাচার্য কেবল-মাত্র উত্তরীয় গায়ে দিয়ে বসে ছিলো; সে টিকি দুলিয়ে বলে উঠলো—হাঁ হাঁ, সঙ্গত কথাই বলেছেন—আকরে পদ্মরাগানাং জন্মঃ কাচমণেঃ কুতঃ!

পরান-বাবু তোষামোদে তুষ্ট হয়েও যেন কেউ তাঁর প্রশংসা-বাক্য উচ্চারণ করে নি অথবা তিনি তা শুন্‌তে পান নি এমনি ভাবে রামযাদুর কথারই উত্তরে স্মিতমুখে বললেন— হাঁ কলি জীব-জন্তু খুব ভালোবাসে—তার একটি চিড়িয়াখানা আছে—পায়রা, বেড়াল, কুকুর, ময়না...তাতেও ওর মন ভরে না, মাসে অন্তত একদিন ওকে আলিপুরে চিড়িয়াখানা দেখাতে নিয়ে যেতে হয়...

একজন লোক বলে উঠলো—The child is the father of the man!

ভট্টাচার্য বললে—এতদ্দ্বারা ভবিষ্যৎ সূচনা করছে—জীবধাত্রী বসুন্ধরার ন্যায় বহু পোষ্য পালন করতে হবে তো!

রামযাদু মনে মনে বল্‌লে—রোস্ বেটি রক্ষাকালীর ছানা! তোর মরণ-বাণের সন্ধান পেয়েছি! তোর সঙ্গে ভাব করতে আর বেগ পেতে হবে না!

পরান-বাবু পারিষদ্‌দের কথার কোনো উত্তর না দিয়ে হাসিমুখে রামযাদুকে বল্‌লেন—তার পর মুখুজ্জে মশায়, সব ঠিক। আজ থেকেই তা হলে কাজে লেগে যাবেন।

রামযাদুর মুখ লাভের আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌লো; তার ইচ্ছা দুর্নিবার হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো যে সে জিজ্ঞাসা করে তার কতো বেতন নির্দিষ্ট হয়েছে; কিন্তু এতো লোকের সাম্‌নে সে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেও পারলে না; সে উৎসুক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পরান-বাবুর মুখের দিকে চেয়ে দন্তবিকাশ করলে।

ঘরে যারা যারা নিজের বা ছেলে ভাই ভাইপো ভাগ্নে শালা ভগ্নীপতি প্রভৃতির

চাকরি বা মাইনে বৃদ্ধি বা বৃত্তি প্রভৃতির আশায় উমেদার হয়ে বসে ছিলো তাদের সকলের উৎসুক দৃষ্টি পরান-বাবুর মুখের উপর থেকে ঈর্ষাকুল হয়ে রামযাদুর মুখের উপর গিয়ে পড়্লো; তাদের দৃষ্টি যেন বল্‌তে চাইছিলো—তুই কে বেটা উড়ে এসে জুড়ে বস্‌ছিস! আর আমরা এতোকাল থেকে নিষ্ফল উমেদারিতে টানা হাঁটা করছি! তারা সকলেই প্রার্থী, কাজেই নিজের মনস্কামনা সিদ্ধ হবার পূর্বে অপর কারো সফলতা দেখ্‌লেই তাদের আতঙ্ক হয় সফল ব্যক্তি বোধ হয় তাদেরই স্বার্থসিদ্ধির জায়গাটি অধিকার বা অবরোধ করে বস্‌লো! পরান-বাবুর মন দরাজ ও ক্ষমতা অসাধারণ হলেও তারও তো একটা সীমা আছে! সীমাবদ্ধ স্থানে বস্তু-সমাবেশ যতো হবে অপর বস্তুর স্থান ততো সঙ্কীর্ণ হয়ে আস্‌বে এবং অবশেষে স্থানাভাবই ঘট্‌বে। তাই উমেদারেরা অপরের সফলতায় প্রসন্ন হতে পারে না।

তাই ভট্টাচার্য মনের ক্ষোভ দমন করে রাখতে না পেরে বলে উঠ্‌লো—ধন্যো সি কৃতপুণ্যো সি!

পরান-বাবু সে কথার দিকে কর্ণপাত না করে রামযাদুর জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—আপনার মতন একজন পণ্ডিত আর রোজগারি উকিলের জাত মারতে যখন বসেছি তখন তার উপযুক্ত দক্ষিণা দিতে হবে তো, তাই ঠিক হয়েছে আপনি মুন্সেফের মাইনে পাবেন।

রামযাদুর একেবারে আশাতীত লাভ! তার মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌লো, তার ইচ্ছা করতে লাগ্‌লো সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে পরান-বাবুর পায়ের ধূলা নেয়। কিন্তু অনেক লোক বসে রয়েছে বলে লজ্জায় আর পরান-বাবুর কাছে নিজের বামনাই-মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়ে যাবার ভয়ে সে আত্মসম্বরণ করে বসে রইলো, কিন্তু তার দুই চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রুধারা গড়িয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লো। একটা চাকরি জোটাবার জন্য সে কতোবার কতো চেষ্টা করেছে, কতো লোকের দ্বারে গিয়ে ধন্না পেড়েছে, কিন্তু সুবিধা মতো চাকরি জোটে নি, জুটেছিলো হতাশ হওয়ার দুঃখ আর ধনী বা পদস্থ লোকেদের কর্কশ বাক্য ও অনাদর উপেক্ষা অবহেলা। আর এ একেবারে আড়াই শো টাকা আয়ের চাকরি এক কথায় পেয়ে যাওয়া! রামযাদুর সমস্ত শরীব-মন আনন্দে বিগলিত হয়ে অশ্রুপ্রবাহ পরিণত হতে চাচ্ছিলো।

রামযাদুর এইরূপ ভাবাবেশ দেখে পরান-বাবু অত্যন্ত পরিতুষ্ট হলেন; একজন অভাবগ্রস্ত যথার্থ গুণী ব্যক্তির অভাব মোচনের উপলক্ষ্য হতে পেরেছেন মনে করে তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন।

উপস্থিত ব্যক্তিগণও রামযাদুর রকম দেখে নিজেদের কথা ভুলে গেলো এবং তার লাভে সহানুভূতি প্রকাশ করে বল্‌তে লাগ্‌লো—বেশ হয়েছে! বেশ হয়েছে! মহতের আশ্রয়ে যখন এসে পড়েছেন তখন গুণের পুরস্কার লাভ তো হবেই! অগতির গতি, দীনশরণ, আশ্রিতবৎসল মহাপুরষের কৃপা লাভ গুণ না থাক্‌লেও হয়, আর আপনি তো বিদ্যার তপস্যায় সিদ্ধপুরুষ!...

উমেদারেরা পরান-বাবুকে ও পরান-বাবুর প্রিয়পাত্র বিবেচনায় রামযাদুকে একসঙ্গেই স্তুতি করতে লাগলো, এই রামযাদুর প্রসন্নতা অপ্রসন্নতা যে তাদের স্বার্থসিদ্ধির পক্ষে কতোখানি কার্যকরী তা তো ঠিক জানা নেই, অতএব সাবধান থাকাই কর্তব্য।

পরান-বাবু প্রশংসায় পরিতুষ্ট হলেও যেন কোনো কথাই কানে তোলেন নি এমনি ভাবে বল্‌লেন—আচ্ছা মুখুজ্জে মশায়, বেলা হচ্ছে আপিসে সাড়ে দশটায় পৌঁছতে হবে...

রামযাদু নীরবে উঠে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলো। তার মন অপ্রত্যাশিত লাভের আনন্দে এমন অভিভূত হয়ে গিয়েছিলো যে সে অবশ মনে কিছুই ভাবতে পারছিলো না।

রামযাদু পরান-বাবুর আপিসে পরান-বাবুর স্বকীয় কর্মচারী পারসোন্যাল অ্যাসিট্যান্ট নিযুক্ত হয়েছে। এতে প্রাচীন ও পুরাতন কর্মচারীরা মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ ও বিরক্ত হলেও প্রকাশ্যে কিছু বল্‌তে পারে নি, কারণ পরান-বাবুর অবিচার সুবিচার বিচার কর্‌বার অধিকার কারো ছিলো না, তাদের অনেকের চাকরি বা পদোন্নতি যে বরাবর নিয়ম-সঙ্গত প্রণালীতেই হয়েছে এমন কথা অতি স্বার্থপর ব্যক্তিও নিজের মনে মনেও বল্‌তে পারতো না, তাদের সকলের চাকরি ও বেতন-বৃদ্ধি বা পদোন্নতি সবই পরান-বাবুর একার খেয়াল ও খুশি অনুসাবেই হয়ে এসেছে।

চতুর রামযাদু আপিসে এসেই বুঝলে তার আগমনটা সেখানে বিশেষ প্রীতির কারণ হয নি। অমনি সে বৃদ্ধদের সঙ্গে জ্যেঠা-মশায় দাদা-মশায়, এবং সমান-বয়স্ক বা বয়ঃ-কনিষ্ঠদের সঙ্গে ভাই ভাই-পো ইত্যাদি সম্পর্ক পাতিয়ে ফেল্‌লে। সে অবসর পেলেই অপরের ডেস্কের কাছে গিয়ে হাজির হয় এবং তাকে বলে—দাদা-মশায়, আপনার যদি কিছু বেশি কাজ জমে থাকে তো দিন্ না, আমি খানিকটা করে দি...এখন আমার হাত খালি আছে।

এমনি করে সে সকলের কাজ করে সকলকে সাহায্য করে অল্প দিনেই তাদেব প্রীতিভাজন হয়ে উঠ্‌লো। কারো ছুটি নেবার দরকার; পরান-বাবু ছুটি দিতে আপত্তি করলে রামযাদু বিনীতভাবে অনুরোধ করে বলে—ভদ্রলোকেব বিশেষ দর্‌কার বলেই ছুটি চাচ্ছেন, আপনি ছুটি মঞ্জুর করে দেন, আমি ওঁর কাজ চালিয়ে দেবো।

পবান-বাবু রামযাদুব পরচ্ছন্দানুবর্তিতা ও কর্মে আগ্রহ দেখে খুশি হয়েও মুখে বলেন—আপনাব অসুস্থ শরীর! খেটে খেটে কি শেষকালে মাবা পড়বেন!

রামযাদু পরান-বাবুর স্নেহবাক্যে কৃতার্থ হযে হেসে বলে—কাজ কর্‌তে না পেলেই আমি মারা পডবো।

প্রার্থীর ছুটি মঞ্জুর হয়ে যায়; সে বামযাদুর উপর খুশি হয়ে থাকে।

আপিসের কারো অসুখ-বিসুখ হলে রামযাদু নিত্য তাব বাড়িতে গিয়ে দেখে আসে; রোজই সামান্য হলেও একটা কিছু পথ্য-সামগ্রী কিনে নিয়ে গিয়ে উপহার দিয়ে আসে।

আপিসের সহকর্মীদের কারো বাড়িব কোনো লোকেব অসুখ হয়েছে শুন্‌লেও রামযাদু ব্যস্ত হযে বলে—যদি বাত জেগে সেবা-শুশ্রূষা করবাব লোকেব দরকার হয় তবে অনুগ্রহ করে আমাকে বল্‌বেন।

এইরূপে সকল লোকের বিপদে সম্পদে দুঃখ সুখের ভাগী রূপে নিজের পরিচয় দিয়ে দিয়ে অতি অল্প দিনের মধ্যেই রামযাদু সকলের বন্ধু বলে গণ্য হয়ে উঠ্‌লো। এবং সকলের কাজ করে দেবার সুযোগে সে আপিসের সকল রকম কাজেই অভিজ্ঞ হয়ে উঠলো; সমস্ত আপিসের মধ্যে এমন দশকর্মান্বিত ব্যক্তি আর দ্বিতীয় রইলো না।

রামযাদুর কর্মকুশলতায় সন্তুষ্ট হয়ে সাহেবেরা ও তার সহৃদয়তায় সন্তুষ্ট হয়ে তার সহকর্মীরা পরান-বাবুর কাছে তার প্রশংসা করলে পরান-বাবুর ঝাঁপালো গোঁপ-জোড়া হাসিতে ছড়িয়ে যায়, আর ছোটো ছোটো চোখ দুটি উজ্জ্বল ও বিস্ফারিত হয়ে ওঠে, তিনি নীরবেই স্পষ্ট বল্‌তে চান—দেখেছো! কেমন লোক এনেছি!

সকলের কাজ করে দিতে দিতে রামযাদু যেমন নিজে অভিজ্ঞতা অর্জন কর্‌ছিলো, তেমনি কোন্ কর্মচারীর কোথায় গলদ ও ত্রুটি আছে তাও তার জানা হয়ে যাচ্ছিলো। তাদের সে মনে মনে শাসিয়ে রাখ্‌তো—রোসো বাছাধন, তুমি কোনো দিন আমার সঙ্গে লেগেছো কি আমি তোমার মরণ-কল টিপেছি!

আপিসের সাহেবেরা রামযাদুর সাম্‌নে তার প্রশংসা করলে সে বিনয়-নম্র স্বরে বলে—এতে তো তার প্রশংসা পাবার কিছু কারণ নেই, সে কর্তব্য পালন করে মাত্র; সে কর্তব্য পালন না কর্‌লে অপরাধী হয়ে নিন্দাভাজন হবে।

সাহেবেরা আর কিছু বলে না; রামযাদু সেলাম করে চলে এবং আসে সে বেশ বুঝে আসে যে সে সাহেবদের খুব খুশি করে দিয়ে এসেছে।

রামযাদুর সুখ্যাতিতে পরান-বাবু ছাড়া আর একজন সুখী হচ্ছিলো—সে থাকোহরি। রামযাদুর কাছে কৃতজ্ঞতায় থাকোহরির অন্তর পূর্ণ হয়ে ছিলো, তাই রামযাদুর সুখ্যাতিতে তার আনন্দ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছিলো।

রামযাদু কিন্তু সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হতে পারে নি; সে প্রায়ই ভাবে—সবাইকে তো ঘায়েল কর্‌লাম, কিন্তু ঐ কালিন্দী ছুঁড়িকে এখনো বশ করতে পারলাম না! কি কুক্ষণেই তাকে মুখ ভেঙ্‌চেছিলাম যে সে এমন ঘাবড়ে গেছে যে তাকে কিছুতেই বাগ মানানো যাচ্ছে না। ছুঁড়ি জন্তু-জানোয়ার ভালোবাস, কিন্তু সে-সব কিন্‌তে তো কম খরচ নয়! কপালে কিছু অপব্যয় লেখা আছে দেখ্‌ছি।

রামযাদু কৃষ্ণকলির সঙ্গে ভাব করবার চেষ্টায় তার দিকে অগ্রসর হলেই সে ছুটে বাড়ির ভিতর পালিয়ে যায়। একদিনও কৃষ্ণকলিকে ধর্‌তে না পেরে রামযাদু হতাশ হয়েই একদিন একজোড়া সাদা খর্‌গোশ কিনে তারের জালের খাঁচায় করে নিয়ে এলো। তার মনে হচ্ছিলো—কৃষ্ণকলি হয় তো কিছুতেই পোষ মান্‌বে না, মাঝে হতে গোটা কতক টাকা ন দেবায় ন ধর্মায় নাহক খরচ হয়ে গেলো।

রামযাদু পরান-বাবুর বাড়িতে প্রবেশ করেই চারিদিকে চোখ বুলিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো কোথায় কৃষ্ণকলি আছে। এই তার পায়রা খাওয়াবার সময়, সে উঠানে থাক্‌বার কথা। রামযাদু উঠানের দিকে অগ্রসর হয়ে দেখলে, উঠানে কৃষ্ণকলি নেই; তার পায়রাদের খাবার

দেওয়া হয়ে গেছে; পায়রাগুলো একটি শুভ্র বৃত্ত করে মটর খুঁটে খাচ্ছে আর কলরব করছে।

রামযাদু হতাশ ও বিপন্ন হয়ে চারিদিকে তাকাতে লাগ্‌লো; সে একবার ভাব্‌লে—কোনো চাকরকে দিয়ে কৃষ্ণকলিকে ডেকে পাঠাই। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হলো—আমি ডাক্‌ছি শুন্‌লে তো সে আস্‌বে না। তবে কি চাকরের হাত দিয়ে খাঁচাটা বাড়ির ভিতর তার কাছে পাঠিয়ে দেবো? কিন্তু তাতে আমার লাভ কি হবে? তার চেয়ে একটা অন্য কিছু ছুতো করে তাকে ডাকিয়ে আনি, তার পর তার চোখে খরগোশের ছানা পড়লে রক্ষাকালীর ছানা জালে ধরা পড়বে।

এই কথা ভেবে সে কোনো একজন চাকরের সন্ধানে দালান দিয়ে অগ্রসর হয়ে চল্‌লো। একটু এগিয়ে গিয়েই সে দেখলে ঠাকুরদালানের এক কোণে একটা মাটির কৃষ্ণমূর্তি রঙিন পুতুল একটা ছোটো জলচৌকির উপর বসিয়ে কতকগুলি ফুল নিয়ে ঠাকুর পূজার খেলা করছে।

রামযাদু আনন্দিত হয়ে প্রফুল্ল মুখে পায়ের শব্দ যথাসম্ভব নিবারণ করে ঠাকুর দালানে গিয়ে উঠলো।

রাময়াদুকে দালানে উঠতে দেখেই কৃষ্ণকলি চম্‌কে উঠলো; তার মুখটা ভয়ে ও অপ্রতিভ ভাবে অন্ধকার হয়ে গেলো; সে সেখান থেকে পালাবার ইচ্ছায় উঠে দাঁড়ালো।

রামযাদু কৃষ্ণকলিকে পলায়নোন্মুখ দেখেই ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি বল্‌লে—খুকু সোনা, দেখো...তোমার জন্যে কি এনেছি!...

রামযাদু খর্‌গোশের খাঁচাটা সাম্‌নের দিকে এগিয়ে ধর্‌লে। পালাবার উদ্‌যোগে কৃষ্ণকলির পিঠ রামযাদুর দিকে অর্ধেক ফিরেছিলো; রামযাদুর কথা শুনে সে মুখ ফিবিয়ে পিঠের উপর দিয়ে দেখেই থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেলো এবং আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়ালো। রামযাদু দেখলে কৃষ্ণকলির আরক্ত ছোটো ছোটো চোখ দুটো আনন্দে ও কৌতূহলে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

রামযাদু কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব স্নেহকোমল করে বল্‌লে—খুকু সোনা, এসো খর্‌গোশ নেবে এসো...কিচ্ছু বল্‌বে না...

এই বলে সে খাঁচাটা মাটিতে নামিযে খাঁচার দরজাটা খুলে দিলে। আর খরগোশের বাচ্চা দুটি খাঁচার ভিতর থেকে বাহির হয়ে লম্বা লম্বা কান নেড়ে নেড়ে আর শরীরের পশ্চাদর্ধ উৎক্ষিপ্ত করে নাচিয়ে নাচিয়ে ঘরময় বেড়িয়ে বেড়াতে লাগলো এবং মাঝে মাঝে তাদের বেঁড়ে লেজটুকু তুড় তুড় করে কাঁপিয়ে তুল্‌তে লাগ্‌লো।

কৃষ্ণকলির মুখ আনন্দে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে; তার অদম্য আগ্রহ হচ্ছে ছুটে গিয়ে বাচ্চা দুটির গায়ে হাত দেয়; কিন্তু রামযাদুর উপস্থিতি দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায় হয়ে তাকে নিরস্ত করে রাখছে। সে চকিত স্মিত দৃষ্টিতে একবার বাচ্চা দুটির দিকে, একবার রামযাদুর দিকে দেখ্‌তে লাগলো'

রামযাদু একটি বাচ্চাকে ধরে কোলে তুলে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্‌লে—তুমি কোলে নেবে?...নাও না, কিচ্ছু ভয় নেই...দেখো, কেমন নরম!

রামযাদু কৃষ্ণকলির কাছে এগিয়ে গিয়ে খরগোশটাকে তার দিকে বাড়িয়ে ধরলে। কৃষ্ণকলি একটু লজ্জিত অপ্রতিভ ভাবে স্মিত মুখে ধীরে ধীরে হাত বাড়িয়ে খর্‌গোশের অঙ্গ স্পর্শ কর্‌লে এবং তখনই আবার সঙ্কুচিত হয়ে হাত সারিয়ে নিলে।

রামযাদু কৃষ্ণকলিকে বল্‌লে—কোলে নাও তুমি...

কৃষ্ণকলির মন কৌতুক ও ঈষৎ ভয়ের ভাবে আবিষ্ট হয়ে উঠ্‌লো। কিন্তু যখন সে খরগোশটাকে কোলে নিয়ে দেখ্‌লে সেটা তাকে কাম্‌ড়ালেও না, আঁচ্‌ড়ালেও না, তখন নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে তার মন পূর্ণ হয়ে উঠলো।

ইতিমধ্যে অপর খর্‌গোশটা লাফাতে লাফাতে গিয়ে কৃষ্ণকলির পূজার ফুল নৈবেদ্য খেতে আরম্ভ করে দিয়েছে। রামযাদু তা দেখে তাকে তাড়া দিয়ে বলে উঠলো—ধেৎ...ধেৎ...

কৃষ্ণকলি কোলের খর্‌গোশটির গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে লজ্জিত কুণ্ঠিত মৃদুস্বরে বল্‌লে,—ও থাক! ও ফুল নৈবিদ্যি তো খেলা-ঘরের...

কৃষ্ণকলিকে কথা বল্‌তে শুনে রামযাদু আপনার উদ্দেশ্যের সফলতায় উৎফুল্ল হয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—আমি আবার কাল তোমাকে সাদা ইঁদুর এনে দেবো...আর আমরা দুজনে একসঙ্গে তাদের নিয়ে খেলা করবো...কেমন?

কৃষ্ণকলি তার ঘাড় অল্প একটু কাত করে সম্মতি জানালে; এবং কোলের খর্‌গোশটাকে খাঁচার মধ্যে পুরে, অপরটাকে ছুটে ধর্‌তে গেলো। কৃষ্ণকলিকে ছুটে নিকটে আস্‌তে দেখে খর্‌গোশটা ভয়-চকিত হয়ে তুড়ুক তুড়ুক করে লাফাতে লাফাতে ঘরের অপর দিকে চলে গেলো। রামযাদু সেটাকে ধরে খাঁচায় পুরে দিলে।

কৃষ্ণকলি দুই হাতে খাঁচাটা টেনে তুল্‌লে এবং ভারি খাঁচা বহনের প্রযত্নে পিঠের দিকে একটু চিতিয়ে চল্‌তে চল্‌তে যেন জনান্তিকে রামযাদুকে বলে গেলো—যাই, মাকে দেখাইগে...

রামযাদু বল্‌লে—কাল ইঁদুর আন্‌বো, মনে থাকে যেন...

কৃষ্ণকলি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে, কিন্তু তখন সে পূজার দালান থেকে অন্দরে মহলে যাবার পথে বেরিয়ে পড়াতে রামযাদুর দৃষ্টির অন্তরালে চলে গিয়েছিলো; রামযাদু তার ঘাড় নাড়া যে দেখতে পেলে না তার সম্বন্ধে তার কোনো উদ্বেগ প্রকাশ পেলো না।

রামযাদু মনে মনে বল্‌লে—টোপ গিলেছে, এইবার খেচ মারলেই গেঁথে যাবে; তার পর বাছাধন আর যাবেন কোথা!

এর পরদিন রামযাদু একখাঁচা সাদা ও সাদায়-কালোয় ছিটে-ফোঁটা ইঁদুর নিয়ে পরান-বাবুর বাড়িতে এসে ঢুকেই দেখলে কৃষ্ণকলি উৎসুক দৃষ্টিতে পথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখেই কৃষ্ণকলির চোখ দুটি উজ্জ্বল ও মুখ প্রফুল্ল বিকশিত হয়ে ওঠাতে আরো কুৎসিত হয়ে উঠ্‌লো। রামযাদু দেখেই বুঝতে পার্‌লো যে কৃষ্ণকলি তারই আগমন প্রতীক্ষা কর্‌ছে। রামযাদু ইঁদুরের খাঁচাটা তুলে ধরে কৃষ্ণকলিকে দেখিয়ে হাস্‌লে, তার মনে

হলো এইবার কৃষ্ণকলি তার কাছে ছুটে আস্‌বে। কিন্তু সে এক পাও অগ্রসর না হয়ে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলো সেইখানেই দাঁড়িয়ে থেকে মুখ ঈষৎ অবনত করে লজ্জিত সুখের হাসি হাস্‌লে। কৃষ্ণকলির মুখ তাতে কদর্যতর হয়ে উঠ্‌লো। রামযাদুর মনটা কেমন ঘিন্‌ঘিন্‌ করে উঠ্‌লো, সে মনে মনে বল্‌লে—এঃ রামঃ! এক্কেবারে শেওড়া-গাছের পেত্নী! ঢের ঢের কুৎসিত কদর্য দেখেছি, কিন্তু এমন ফর্‌মাশ-দেওয়া বে-ঢপ ভয়ঙ্কর চেহারা কখনো দেখিনি। ছোটো জাতের মেয়ে আর কতো ভালো হবে!

এই কথা ভাবতে ভাবতে রামযাদু অগ্রসর হয়ে কৃষ্ণকলির কাছে গেলো এবং চেষ্টা করে হেসে বল্‌লে—খুকু সোনা, এই দেখো কেমন ইঁদুর!

কৃষ্ণকলি দেখ্‌লে খাঁচার মধ্যে লোহার তারের তৈরি একটা ঘূর্ণি চাকায় চড়ে দুটা ইঁদুর সিঁড়ির ধাপে ধাপে পা দিয়া চড়বাব ক্রমাগত চেষ্টায় চাকাটাকে বনবন করে ঘোরাচ্ছে। ইঁদুরের এই খেলা দেখেই কৃষ্ণকলি উল্লসিত হয়ে হাততালি দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠলো; কিন্তু পরক্ষণেই লজ্জা-শঙ্কা-ভরা দৃষ্টিতে রামযাদুর মুখের দিকে চেয়েই নিজের চঞ্চলতা দমন করে ফেল্‌লে।

রামযাদু জিজ্ঞাসা কর্‌লে—তোমার খর্‌গোশ তোমার পোষ মেনেছে তো?

কৃষ্ণকলি লজ্জিত স্মিত মুখে একবার রামযাদুর দিকে চেয়ে নীরবে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে।

রামযাদু কৃষ্ণকলিকে কথা কওয়াবার জন্য জিজ্ঞাসা কর্‌লে—খুকু সোনা, তোমার আর কি চাই বলো তো, আমি এনে দেবো।

কৃষ্ণকলি অর্ধেক আনন্দ ও অর্ধেক সন্দেহে দোলায়মানচিত্ত হয়ে মৃদু অস্ফুট স্বরে বল্‌লে—একটা কাকাতুয়া।

রামযাদু মনে মনে শিউরে উঠে বলে উঠলো—টিপ-কপালির সখ কম না! এইবার আমায় সেরেছে! কাকাতুয়া তো দু-এক টাকায় কর্ম নয়!

কিন্তু সে প্রকাশ্যে বল্‌লে—বেশ! কাল তোমার কাকাতুয়া আস্‌বে।

অসীম আনন্দে অধীর হয়ে কৃষ্ণকলি ইঁদুরের খাঁচা তুলে নিয়ে ছুটে বাড়ির মধ্যে চলে গেলো।

রামযাদু খুশি মনে পরান-বাবুর সাক্ষাৎ-কক্ষের দিকে প্রস্থান কর্‌লো।

পরান-বাবু রামযাদুকে আস্‌তে দেখেই হাসিমুখে বলে উঠলেন—আসুন মুখুজ্জে মশায়, প্রণাম হই। কলি তো আপনার খবগোশ পেয়ে মহা খুশি! আপনি আবার সাদা ইঁদুর এনে দেবেন বলেছেন বলে সে ভোর বেলা উঠে কেবল ঘর-বার করছে যে কখন আপনি আস্‌বেন। আপনি তাকে আচ্ছা লোভ দেখিয়েছেন!

রামযাদু পরান-বাবুর প্রশংসায় ও সমাদরে গদ্‌গদ হয়ে দন্ত বিকাশ করে বল্‌লে—ছেলেমানুষের খেলনা একটা তো চাই; কিন্তু কৃষ্ণকলি যে কেমন বাপ-মায়ের মেয়ে তা তার খেলা দেখলেই টের পাওযা যায। তার খেলা হয় ঠাকুরপূজা, নয় জীবসেবা। সেই খেলাচ্ছলে পুণ্যসঞ্চয়ের একটু ভাগ আমিও ফাঁকতালে নিয়ে নিলাম।

পরান-বাবু রামযাদুর কথায় খুশি হয়ে হাস্‌তে লাগ্‌লেন; অমনি ঘরে সমাগত সমস্ত লোক রামযাদুর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলো; কেউ বল্‌লে—সাধু সাধু! কেউ বল্‌লে—"এ রামযাদু-বাবুর প্রকৃতির অনুরূপ কথাই হয়েছে!" এক টিকি-ওয়ালা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বল্‌লে—"যদ্ যেন যুজ্যতে লোকে বিধিস্ তৎ তেন যোজয়েৎ! এ একেবারে মণি-কাঞ্চন যোগ!" ব্রাহ্মণ রামযাদুকে উপলক্ষ্য করে পরান-বাবুরও একটু প্রশংসা করে নিলো দেখে একজন জ্যোতিষী বলে উঠলো—"এ একেবারে বুধাদিত্য যোগ, গুরু-শুক্রের রাজযোটক!" একজন বল্‌লে—আমাদের কৃষ্ণকলি তার পিতা-মাতার পুণ্যফল মূর্তিমতী!

পরান-বাবু পরিতুষ্ট হয়ে প্রফুল্ল মুখে বল্‌লেন—আপনারা দশজনে প্রসন্ন মনে আশীর্বাদ করবেন, আমার ঐ গুঁড়োটুকু বেঁচে-বর্তে থাকুক আর ও যেন জীবনে সুখী হয়।

অমনি সকলে সমস্বরে বলে উঠ্‌লো—আমরা তো নিত্য নিরন্তর আশীর্বাদ করছিই; আপনার অনুগ্রহ আর কৃপা লাভ করে নি এমন লোক বাংলা দেশে অতি অল্পই আছে; অগণ্য কৃতজ্ঞ-হৃদয় হতে কল্যাণ-কামনা অহরহই উত্থিত হচ্ছে!

পরান-বাবু খুশি হয়েও বিনয় প্রকাশ কবে বল্‌লেন—আমি আর কি করছি, আমার শক্তিই বা কতোটুকু?

রামযাদু বলে উঠ্‌লো—আপনি হচ্ছেন বাংলা দেশেব পরান! দেহে প্রাণ যে কতো কাজ করে তা দেহই জান্‌তে পারে, পরানের কৃপা হতে যার দেহ বঞ্চিত হয় সেই তখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারে যে পরানের কাজ ও শক্তি কতো!

সেখানে একজন ডাক্তার ছিলো, সে মনে মনে রামযাদুব উপর ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠ্‌লো, তার মনে হলো এই physiological খোশামোদটা তারই করা উচিত ছিলো, কিন্তু করলে কি না ঐ প্রত্নতাত্ত্বিক রামযাদু! একেই বলে কপাল! একেই বলে অদৃষ্টের অনুগ্রহ!

পরান-বাবু রামযাদুর বাক্‌চাতুরিতে মুগ্ধ হয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বললেন—মুখুজ্জে মশায়, আপনি প্রত্নতাত্ত্বিক না হয়ে কবি হতেও পারতেন!

রামযাদু লম্বা লম্বা সাদা দাঁত বাহির করে শীর্ণ মুখ হাসিতে ভরে বল্‌লে—আপনার কৃপা থাক্‌লে তাও বাকি থাকবে না। আপনার কৃপা।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্!.

রামযাদুর কথা শুনেই পণ্ডিতের মন হায় হায় করে উঠলো—"আহা হা! এই শ্লোকটা তো আমার বলা উচিত ছিলো!" যেই এই কথা তার মনে হওয়া অমনি সে রামযাদুর মুখের অসমাপ্ত কথা কেড়ে নিয়ে বল্‌লে—

যৎ কৃপা, তম্ অহং বন্দে পরমানন্দ-কারণম্॥

পরান-বাবু পরিতুষ্ট হয়ে পণ্ডিতের কথা যেন শুনতে পান নি এমন ভাবে রামযাদুকে বল্‌লেন—তা হলে আমাদের আর-একবার আশ্চর্য কবে দেবার আয়োজন মুখুজ্জে মশায় লুকিয়ে লুকিয়ে কবছেন! আপনি কবিতা লেখেন তা তো জান্‌তাম না! একেই তো বলে সাধনা! গোপনে শক্তিসঞ্চয় হচ্ছে; যেদিন প্রকাশিত হবে সেদিন জগৎ স্তম্ভিত হয়ে যাবে!

রামযাদু বিনয় দেখিয়ে মুখ কাচুমাচু করে বললে—না না, সে শক্তি আমার নেই, তবে কখনো-কখনো দু-একটা লিখতে চেষ্টা করি।

পরান-বাবু বল্‌লেন—আপনার কবিতা দেখবার জন্যে উৎসুক হয়ে রইলাম; কিন্তু আপনি গবেষণা ত্যাগ করবেন না মুখুজ্জে-মশায়।

রামযাদু দন্তবিকাশ করে বললে—আপনার চেয়ে বেশি গবেষণা করবার শক্তি তো কারো নেই।

পরান-বাবু আশ্চর্য হয়ে বললেন—আমি গবেষণা করি!

রামযাদু পূর্ব্ববৎ হাসতে হাসতে বললে—হ্যাঁ, গো-এষণা...গোরু-খোঁজা তো আপনার প্রধান কর্ম।

পরান-বাবু রামযাদুর শ্লেষ বুঝতে পেরে—ও হো হো! বলে উচ্চ হাস্য করে উঠলেন।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতটি রামযাদুর কথার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে বলে উঠলো—হাঁ হাঁ, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের অবতার! শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখেরই বাণী তো শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় উক্ত হয়েছে—

পরিত্রাণায় চ সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

এ রকম তোষামোদ-বৃষ্টি অনন্ত কাল চলতে পারতো কিন্তু পরান-বাবু তোষামোদ শুনতে ভালোবাসলেও কাজের সময় মধ্যপথেই থামিয়েও দিতে পারতেন। তিনি বললেন—আচ্ছা।

এই আচ্ছার মানে সবাই বুঝতো। সৈনিকের কানে কমান্ডারের সঙ্কেত-ধ্বনি প্রবেশ করবামাত্র সে যেমন তৎক্ষণাৎ আদিষ্ট কর্ম সম্পন্ন করে, তেমনি ঘরে উপবিষ্ট সমস্ত লোক একটি স্প্রিঙের কল-টেপা পুতুলের মতন এক সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো ও ধীরে ধীরে বিদায় হয়ে চলে যেতে লাগলো।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতটি যখন দরজার কাছে গিয়েছে তখন পরান-বাবু বললেন—বিদ্যারত্ন মশায়, আপনার সম্বন্ধীকে কাল একবার আমার আপিসে পাঠিয়ে দেবেন, দেখবো যদি কিছু করতে পারি।

বিদ্যারত্ন আনন্দে গদ্‌গদ হয়ে বললে—যে আজ্ঞে।

পরান-বাবুর এই "দেখবো যদি কিছু করতে পারি" কথা কয়টির যে কি শক্তি তা অনেকেরই জানা ছিলো। সকলে বিদ্যারত্নের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলো, এবং ভাবতে ভাবতে চললো—কাল হতে তারাও কি রকম ভাবে খোশামোদ করে পরান-বাবুর প্রসন্নতা লাভ কববাব চেষ্টা করবে।

রামযাদু সেইদিনই নিজের নাম-ধাম গোপন রেখে ও বক্‌স-নম্বর দিয়ে তিনটি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে—কারও যদি অপ্রকাশিত কবিতার খাতা থাকে, তবে সে সেই খাতা দেখতে পেলে ও তার কাছে উৎকৃষ্ট বিবেচিত হলে উপযুক্ত মূল্য দিয়ে কিনে নিয়ে সে নিজের খরচে প্রকাশ কববে।

এবং সেই দিন বিকাল বেলা আপিসের ছুটির পর কৃষ্ণকলির জন্য একটা কাকাতুয়া, একটা ময়ূর ও একটা হরিণের ছানা কিনে গাড়ি করে পরান-বাবুর বাড়িতে এসে হাজির হলো।

বাড়ির উপর তলার বারান্দা থেকে কৃষ্ণকলি রামযাদুকে দেখতে পেয়েই উল্লাসে চিৎকার করে বল্‌লে—বাবা, বাবা, মুখুজ্জে-কাকা কাকাতুয়া নিয়ে এসেছে...শুধু কাকাতুয়া নয়,...একটা ময়ূর...একটা আবার পুচকে হরিণ!...

কৃষ্ণকলি ছুটে নিচে নেমে গেলো, কিন্তু রামযাদুর সামনে গিয়েই তার সেই চাঞ্চল্য থেমে গেলো, উল্লাস সংযত হয়ে গেলো, সে প্রফুল্ল বিস্ফারিত নয়নে সেই উপহারগুলির প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

রামযাদু তাকে দেখে হেসে বল্‌লে—খুকু সোনা, তোমার জন্যে কতো কি এনেছি। এইবার আমার সঙ্গে ভাব করবে?...

কৃষ্ণকলি প্রফুল্ল মুখে লজ্জা মাখিয়ে মাথা কাত করে নীরবে সম্মতি জানালে।

রামযাদু আবার জিজ্ঞাসা করলে—আর আড়ি নয় তো?

কৃষ্ণকলি আবার নীরবে মাথা নেড়ে জানালে—না।

রামযাদু মাথা দুলিয়ে ডাকলে—এসো তবে আমার কাছে, কাকাতুয়া নেবে. .

কৃষ্ণকলি কুণ্ঠিত মন্থর পদে অগ্রসর হয়ে আবার থম্‌কে দাঁড়ালো।

রামযাদু কৃষ্ণকলির দিকে কাকাতুয়ার দাঁড়টা বাড়িয়ে ধরে বললে—ধরো ..গায়ে হাত বুলিয়ে দাও ..ঘাড় চুলকে দাও দেখি, ও চুপ করে ঘাড় নিচু করে থাকবে...

কৃষ্ণকলি সঙ্কোচের ও ঈষৎ ভয়ের সহিত কাকাতুয়ার গায়ে হাত দিলে। কাকাতুয়া অমনি গলা নিচু ও কাত করে দিলে। কৃষ্ণকলি কাকাতুয়ার গলায় হাত দিতেই কাকাতুয়া মাথার ঝুঁটি খাড়া কবে তুললো। কৃষ্ণকলি দেখলে সেই দুধের মতন সাদা কাকাতুয়ার ঝুঁটিটার তলার রং হল্‌দে আর গোলাপিতে মেশা! কৃষ্ণকলির উল্লাসে হাততালি দিয়ে নেচে উঠতে ইচ্ছা করছিলো, কিন্তু সে আডচোখে একবার রামযাদুকে দেখে নিজেকে সামলে নিলে এবং একমনে কাকাতুয়ার ঘাড় চুলকে দিতে লাগলো। কাকাতুযা তুষ্ট হয়ে ডেকে উঠলো—কাকাতুয়া! কৃষ্ণকলির মন আবার আনন্দে নেচে উঠলো।

রামযাদুকে গাডি থেকে পশু-পক্ষী নিয়ে নামতে দেখেই দুজন চাকব দৌড়ে এসেছিলো। তারা হরিণ-ছানার গলার শিকল ধরে ও ময়ূবের খাঁচা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। রামযাদু তাদের অপেক্ষা করতে দেখে কৃষ্ণকলিকে বললে—যাও খুকু সোনা, তুমি মাকে দেখাও গে তোমার পাখি হরিণ।

রামযাদুর কথা শুনে রামযাদুর সম্মুখ থেকে অপসৃত হবার সুযোগ পাওয়ার আগ্রহে তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণকলি কাকাতুয়ার দাঁড় কষ্টে বহন করে প্রস্থানোদ্যত হলো।

রামযাদু বললে—কাকাতুয়াটা বোঁচার হাতে দাও।

কৃষ্ণকলি কাকাতুয়ার দাঁড় বোঁচাব হাতে দিয়েই একছুটে বাড়ির ভিতর চলে গেলো। সে দৌড়ে গিয়ে চেঁচিয়ে মাকে বললে—মা দেখো দেখো, আমার আঙুলে কাকাতুয়ার গলা থেকে কেমন পাউডারের মতন রেণু লেগেছে!..

কৃষ্ণকলি চলে গেলে রামযাদু উপরে পরান-বাবুর ঘরে এলো।

রামযাদুকে চৌকাঠের কাছে দেখেই হাসতে হাসতে পরান-বাবু বললেন—মুখুজ্জে মশায়, আপনি যে আমার বাড়িটা চিড়িয়াখানা করে তুললেন!

রামযাদু ঘরের মধ্যে এসে একখানা চেয়ারে বসতে বসতে বললে—আপনি নিজেই তো অনেক আগে থেকে চিড়িয়াখানা বানিয়ে রেখেছেন। আপনি তো greatest menageriekeeper in the world—হরেক রকম জানোয়ার আপনার চিড়িয়াখানায়!

পরান-বাবুর কাছে সমাগত লোকেরা পরান-বাবুর সঙ্গে হো হো করে হেসে উঠলো বটে, কিন্তু রামযাদুর কথাটা সকলের গায়ে গিয়ে বিধ্‌লো। অনেকেই মনে মনে বল্‌লে—তুমি একটি মস্ত জানোয়ার! কিন্তু সেই জানোয়ারটি যে কি তৎসম্বন্ধে শনাক্ত করাতে মতভেদ হলো—কেউ মনে মনে বললে—তুমি একটি মর্কট! কেউ বললে—হনুমান! কেউ বললে—ধূর্ত শৃগাল! কেউ বল্‌লে—ছিনে জোঁক!

পরান-বাবুর হাসির ঝোঁক থাম্‌লে তিনি বললেন—কিন্তু আপনি এতো পয়সা খরচ করছেন, এ ভারি অন্যায়!

রামযাদু তৎক্ষণাৎ বললে—এ কার পয়সা খরচ করছি, এ পয়সাও তো আপনারই...এ আমার গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা...কানে জল দিয়ে কানের জল বের করবার ফন্দি। আমরা কেউ বিনা স্বার্থে কি আপনার মতন কাজ করি?

পরান-বাবু রামযাদুকে এক-ঘর লোকের সামনে এমন অকপটে স্পষ্ট কথা বলতে শুনে খুশি হয়ে আবার হো হো করে হেসে উঠলেন এবং পরে বললেন—জগতে সবাই স্বার্থ খোঁজে। আমিও কম স্বার্থপর নই, আপনারা কেউ টের পান না, ঐখানেই তো আমার বাহাদুরি!

একজন লোক মনে মনে বললে—A bit too frank!

ঘরের সকল লোক রামযাদুর কথায় অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলো; তারা বামযাদুব কথায় নিজেদের স্বরূপকে অকস্মাৎ উলঙ্গ ভাবে প্রকাশিত হয়ে যেতে দেখে যে লজ্জা পেলে তাতে তারা রামযাদুর উপর অপ্রসন্ন হয়ে উঠলো, অথচ রামযাদু সত্য কথাই বলেছে বলে তার উপর যথেষ্ট বিরক্ত হতেও পারছিলো না।

পরান-বাবু ঘরের লোকদের মুখ অপ্রতিভ ও অপ্রস্তুত হয়ে উঠেছে দেখে অন্য প্রসঙ্গ অবতারণ করে বললেন—উঃ! এবার কী গরমই পড়েছে!

তখন বাক্যস্রোত গ্রীষ্ম থেকে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনায় ও ক্রমে লেংড়া-আমের চড়া দর আলোচনায় এঁকে বেঁকে প্রবাহিত হয়ে চল্‌লো। সকলে সহজ কথা আলোচনার অবসর পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো।

পূজাব ছুটি আসন্ন। পরান-বাবুর আপিসে সাহেব কর্তাদের মঞ্জুরি ছুটি মাত্র চার দিন। পরান-বাবু কর্মচারীদের ভাগাভাগি করে আরও বারো দিন ছুটি দিয়ে থাকেন; অর্ধেক লোক দশমীর পবে বারো দিন ছুটি ভোগ করে এবং তারা ফিরে এলে বাকি অর্ধেক ছুটি পায়। যাঁদের বাড়ি মফস্বলে দূরে, তাবা প্রথম বারো দিন ছুটি নিয়ে থাকে।

রামযাদু থাকোহরিকে জিজ্ঞাসা করলে—কি হে থাকোবাবু, ছুটিতে বাড়ি-টাড়ি যাচ্ছো না কি?

থাকোহরি একটু বিষাদাচ্ছন্ন কুণ্ঠিত স্বরে লজ্জিত হাসিমুখে বললে—আমার আবার বাড়ি! আমার বলে—

চাল না চুলো
ঢেঁকি না কুলো,
পরের বাড়ি হবিষ্যি!

রামযাদুর পরদুঃখ-কাতর চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠালো, চোখ ছলছল করতে লাগলো; সে ব্যথিত স্বরে বললে—ঈশ্বর তোমার ভালো করবেন। যে মহাপুরুষের আশ্রয় পেয়েছো, তাতে তুমি অচিরেই বাড়ি-জুড়ি করে স্বাধীন হতে পারবে। আর এই বাড়িই তো এখন তোমার বাড়ি!

থাকোহরি কৃতজ্ঞতায় গদগদ স্বরে বললে—হ্যাঁ, সমস্তই আপনার আশীর্বাদে হয়েছে; যা হবে তাও আপনার আশীর্বাদেই হবে। কর্তা আর গিন্নি-মা আমাকে নিজের ছেলের মতনই ভালোবাসেন; আমার কোনো অভাব নেই আপনার আশীর্বাদে।

রামযাদুর স্বভাবটা একটু জটিল রকমের: সে লোকের দুঃখে ব্যথিত হয়, আবার কারো ভালো দেখলেও সে সহ্য করতে পারে না। থাকোহরির কোনো অভাব নেই শুনে রামযাদু প্রফুল্ল হয়েও একটু ঈর্ষা-বিদ্ধ হয়ে বল্‌লে—বেশ, বেশ! ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বয়ে থাকেন। তা হলে তুমি এখানেই থাকছো? তবে তুমি, শেষের দিকে ছুটি নেবে?

থাকোহরি বললে—আজ্ঞে না, কর্তা কাশী যাচ্ছেন, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন বলছেন।

—তা হলে তোমার মা-ঠাকরুনও তীর্থ কবতে যাচ্ছেন?

—না। মা তো এখানে নেই। আমরা এ বাড়িতে আসার দিন পনেরো পরেই দেশে চলে গেছেন,...

রামযাদুর সকল আন্দাজ ভণ্ডুল হয়ে গেলো, থাকোহরির মা যদি এখানে না থাকে তবে থাকোহরির এমন রাজার হালে থাকার হেতু কি? বিস্ময়ে কৌতূহলে রামযাদুর চক্ষু দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠলো।

রামযাদুর চক্ষু কৌতূহলে বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠলো দেখে থাকোহরি বলতে লাগলো—আমার এক মামা আছেন, তাঁর হঠাৎ পক্ষাঘাত হয়েছে, মামি-মার ছেলে হয়েছে, তাই মাকে সেখানে যেতে হয়েছে।

রামযাদু চিন্তাসাগরে তলিয়ে যেতে যেতে শুধু বললে—ও!

সে থাকোহরিকে আর কিছু না বলে পরান-বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কবতে তাঁর বৈঠকখানার দিকে যেতে যেতে ভাবতে লাগলো—আমি যা আন্দাজ করেছিলাম তা তো নয় দেখছি। তবে? এই ছোঁড়াকে এমন তোয়াজ করবার হেতু কি?

চতুর রামযাদুর তৎপর-বুদ্ধি এইখানে সমস্যায় ঠেকে আটকে গেলো। সে সমস্যার

কোনো কিছু মীমাংসায় উপনীত হবার আগেই পরান-বাবুর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলো। তাকে দেখবামাত্রই পরান-বাবু তাকে সম্ভাষণ করে অভ্যর্থনা করলেন—এই যে মুখুজ্জে মশায়, আসতে আজ্ঞা হোক। প্রণাম হই!

পরান-বাবু মুখে মাত্র প্রণাম শব্দ উচ্চারণ করলেন, কিন্তু সেই প্রণাম-বোধক মাথা নত করা বা হাত তুলে কপালে ঠেকানো বা আর কোনো রকম অঙ্গ-চেষ্টা কিছুমাত্র প্রকাশ করলেন না। ব্রাহ্মণকে ভক্তি-বশত তাঁর এই প্রণাম নয়; এই প্রণামের মধ্যে নিম্ন জাতিতে জন্মলাভেব লজ্জা, নিজেকে বিনীত বলিয়া প্রকাশ করিবার অহঙ্কার এবং নিজের পদমর্যাদাব ও শ্রেষ্ঠত্বের সম্বন্ধে সচেতনত্ব সম্মিলিতভাবে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

পরান-বাবু প্রণাম বাক্য উচ্চারণ করতেই রামযাদু বললে—আপনি প্রণাম করলেই আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে!...

পরান-বাবুর ছোটো ছোটো চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, চাপা হাসি ঠোঁট ঠেলে বেরিয়ে পড়বার চেষ্টায় ঝাঁপালো গোঁপ-জোড়া ফুলে উঠলো; তিনি রামযাদুর তোষামোদ শোন্‌বার আগ্রহে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ঘবের সকল লোকই উৎসুক দৃষ্টি রামযাদুর মুখের উপর স্থাপন করলে।

বামযাদু বলতে লাগলো—আপনি কলিকালে ভগবান বিষ্ণুর একাদশ অবতার। মহাপুরুষ! পতিতপাবন! অগতির গতি! আপনি কাউকে প্রণাম করলে তার পাপ হয়। আপনাকে কী বলেই বা আশীর্বাদ করবো? কিসের অভাব আছে আপনার? ইহ-পরকাল তো কর্মে ও পুণ্যে জয় করে বসে আছেন। ভগবান বিষ্ণু যেমন ভৃগুর পদাঘাত বক্ষে ধাবণ করে ব্রাহ্মণের মর্যাদা বাড়িয়েছিলেন, আপনিও তেমনি নিজে পরমপুরুষ হয়েও ব্রাহ্মণকে বাড়াচ্ছেন। আপনার যখন লীলা যে আমি বড়ো হই, তখন আমি সাহস করে আশীর্বাদ করি...

পরান-বাবু ও সমবেত লোকদের দৃষ্টি আর একটু আগ্রহান্বিত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

রামযাদু বললে—আপনি আরো বেশি করে আমাদের মতন অভাজনদেব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন, আমাদেব সকলের মঙ্গল বিধান করুন।

রামযাদুর এই বাক্‌পটুতায় পরান-বাবু খুশি হলেন, উপস্থিত উমেদারেরা খুশি হলো।

পরান-বাবু নিজের প্রশংসাটুকু শুনে নেন, কিন্তু তার অধিক আলোচনার অবসব দেন না; তিনি যে তোষামোদে তুষ্ট হয়েছেন এমন আভাসও প্রকাশ করেন না। চাটুবাদ সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অপর কথা পেড়ে সেই প্রশংসাব প্রসঙ্গ চাপা দেন। রামযাদুর বক্তৃতা বিরত হতেই পবান-বাবু বললেন—ছুটিতে বাড়ি যাবেন নাকি মুখুজ্জে মশায়?

রামযাদু একটি চেয়ারে উপবেশন করে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, ষষ্ঠীর দিন রাত্রেব গাড়িতেই...

—কিন্তু এ সময় তো আপনাদের দেশে বিষম ম্যালেরিয়া?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ম্যালেরিয়ার উৎপত্তিই তো আমাদের যশোরে; দেশ-মাতা কি নিজের সন্তানের মমতা ত্যাগ করতে পাবেন—সে সন্তান এখন যতোই বড়ো আর বিখ্যাত হোক না কেন।

রামযাদুর বাক্‌চাতুরিতে প্রীত হয়ে পরান-বাবু বল্‌লেন—কিন্তু আপনার স্বাস্থ্য ভালো নয়, ম্যালেরিয়াতে ভুগছেন, এ অবস্থায়...

—তা বটে, কিন্তু অনেক দিন ছেলে-মেয়েগুলোকে দেখি নি...

পরান-বাবু হো হো করে হেসে উঠে বললেন—ছেলেমেয়ের মাও মেঘদূত হংসদূত পবনদূত প্রেরণ করছেন!

উপস্থিত একজন তিলক-কণ্ঠি-ধারী মুণ্ডিত-মস্তকে স্থূল-শিখা-ধারী বৈষ্ণব বলে উঠলো—পদাঙ্ক-দূতটাই বা বাদ যায় কেন?

রামযাদুর মুখ অপ্রতিভ হয়ে উঠলো, সে অ্যাঁ ওঁ করে বললে—আমাদের সে রসের বয়েস বয়ে গেছে...এখন অন্ন-চিন্তা চমৎকারা! আধ দর্জন ছেলে-মেয়ের চ্যাঁ-ভ্যাঁ'র মধ্যে কি আর কবিত্ব জমে? তার উপর নিত্য চিন্তা কোন্ ছেলেটা কখন বা শিঙে ফোঁকে!...

হাস্যরসটা করুণরসে পরিণত হচ্ছে দেখে পরান-বাবু বললেন—আপনি বাড়ি গিয়েই বিজয়া-দশমীর দিনই বা কোজাগর-লক্ষ্মীপূজার দিনই সকলকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসুন। ঐ দিন তো শুভযাত্রা, পাঁজি দেখবার দরকার হবে না।

রামযাদু হতাশ-ভাবে বললে—এতো বড়ো সংসার নিয়ে কলকাতায় বাস করা কি মুখের কথা! বাড়িভাড়া দিতে আর ছেলেদের দুধ কিনতেই তো সব কটি টাকা উবে যাবে...

একজন লোক বললে—আপনি আর কটি টাকা বলবেন না রাম-বাবু; কর্তার কৃপায়...

রামযাদু বক্তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে—কর্তার কৃপায় আমি আমার যোগ্যতার অতিরিক্ত আশাতীত বেতন পাই সত্য, কিন্তু আমার খরচ অনেক...

তার পর সে পরান-বাবুর দিকে ফিরে বলতে লাগলো—আমার পিতার মুনিব আর আমার বাল্যের সাহায্যদাতা কিরণ-বাবুর বিধবা নিরাশ্রয় স্ত্রীকে মাসে মাসে মাসহারা দিতে হয়; আমার পিতার আব কিরণ-বাবুর কিছু ঋণ আছে, তাও মাসে মাসে শোধ করতে হচ্চে; কিরণ-বাবুর মেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে, কিরণ-বাবুব স্ত্রী চিন্তিত হয়ে চিঠি লিখেছেন, তাঁর মেয়ের বিয়ের ভারও আমাকে নিতে হয়েছে...

রামযাদুর কথায় মুগ্ধ হয়ে পরান-বাবু গম্ভীর স্বরে বললেন—মুখুজ্জে মশায়, মহাপুরুষ আমি, না আপনি? আমি পরের ধনে পোদ্দারি করি—পরের আপিসে চাকরি করে দি, নিজের এক কড়া খরচ করি কি? কিন্তু...যাক সে কথা, আপনাকে প্রশংসা করে আপনার সাত্ত্বিক দানের অমর্যাদা করবো না। ...আপনি আপনার পরিবার নিয়ে কলকাতায় চলে আসুন, আপনার কিছু ভাবতে হবে না। আপনি পরেব ভাবনা ভাবুন, আপনার নিজের ভাবনার ভার আমার উপরে ছেড়ে দিন...

রামযাদু আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বললে—থাকোহরির মতন আমিও সপরিবারে আপনার বাড়ি দখল করে বসবো নাকি?

পরান-বাবু হাসিমুখে বলতে লাগলেন—আপনি ব্রাহ্মণ না হলে সে ব্যবস্থাও হতে পারতো...আমার এতো বড়ো বাড়ি, আর আমরা তিনটি প্রাণী, আমরা বাড়ির এক টেরে পড়ে থাকি, আর একটা পরিবার স্বচ্ছন্দে এই বাড়িতে আঁটে। কিন্তু আপনাকে তো এমন অনুরোধ

করতে পারি নে। ...আমার শিক্‌দার-বাগানের বাড়ির ভাড়াটে উঠে গেছে; আমি আর সে বাড়ি ভাড়া দিই নি; মেরামত চুনকাম করাচ্ছি আপনারই বাসের জন্যে। আপনি পরিবার নিয়ে চলে আসুন, ততো দিনে মেরামত হয়ে যাবে।...আর আমার একটা গোরুর সম্প্রতি বাচ্চা হয়েছে, সের দশ-বারো দুধ দিচ্ছে; দুধ খাবার লোক আমার বাড়িতে তো এক কৃষ্ণকলি; কিন্তু সে তো তার মার সঙ্গে কালীপূজা পর্যন্ত কাশীতেই থাকবে; কিছুদিন গোরুটা আপনার কাছেই রেখে দেবো ভাবছি।

রামযাদু আশাতীত লাভের আনন্দে অভিভূত হয়ে অবাক হয়ে পরান-বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, তার দুই চোখ দিয়ে জলধারা গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

একজন লোক রামযাদুর সৌভাগ্যোদয় দেখে আর আত্মসম্বরণ করতে না পেরে পরান-বাবুকে বললে—আপনি আমাকে একখানা বাড়ি করে দেবেন আশা দিয়েছিলেন...

পরান-বাবু হেসে বললেন—পরান বিশ্বাসকে বিশ্বাস করে অপেক্ষা করো, পরান বিশ্বাস কখনো প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না।

সেই লোকটি মুখ কাচুমাচু করে বললে—মিস্টার দত্ত-গুপ্তর বাড়ি হলো, দ্বিপেন হাজরার বাড়ি হলো...

পরান-বাবু হাসি চেপে গাম্ভীর্যের ভান করে বললেন—তুমি আমার কাছে কতো দিন আসছো?

—আজ্ঞে ন-অ ব চ্ছ-র!

—দত্তগুপ্ত আমার কাছে আসছে চোদ্দ বচ্ছর, আর হাজরা আসছে তেরো বচ্ছর! তা হলে তোমার আরও চার বচ্ছর আসতে হবে।

লোকটা এই বিলম্বের কথা শুনে দমে গেলো, সে নিতান্ত নির্লজ্জের মতন বল্‌লে—কিন্তু মুখুজ্জে মশায় তো...

পরান-বাবু এবার সত্যই গম্ভীর হয়ে বললেন—মুখুজ্জে মশায়ের কথা স্বতন্ত্র। তাঁর মতন গুণ তোমাদের কারো নেই। ...যাক, Comparison is odious, তুমি তিসি আর শোরগোঁজা জোগাবার কন্‌ট্র্যাক্‌টের টেন্ডার দিয়েছো তো? তুমিই অর্ডার পাবে, আর তাতেই তোমার বাড়ি হয়ে যাবে। কেমন, হবে না?

—আজ্ঞে, আপনার কৃপা থাকলে তা হবে।

—আচ্ছা, তবে যাও...

পরান-বাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। অমনি ঘরের সকল লোকই এক স্প্রিং-টেপা পুতুলের মতন উঠে দাঁড়ালো এবং একে একে ঘর থেকে বেরিয়ে চললো। রামযাদু আর তিসির কনট্রাকটর আপন আপন সৌভাগ্যে উৎফুল্ল হলেও পরস্পরের প্রতি ঈষৎ ঈর্ষা ও বিদ্বেষ অনুভব করছিলো, তাদের দুজনেরই মনের ভাবটা যেন ঐ অপর ব্যক্তিটা কিছু না পেলে তার নিজের পাওনাটা হয়তো বেশি হতো। আর যারা আজ বিফল-মনোবথ হয়ে ফিরলো তারা ঐ দুজনের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত, নিজেদের নিষ্ফলতায় ক্ষুণ্ণ এবং ভবিষ্যতের আশায় লুব্ধ হয়ে বিদায় হলো।

রামযাদু অপ্রত্যাশিত লাভের অতি-আনন্দে থাকোহরির সৌভাগ্য-সমস্যার কথা একদম ভুলেই গেলো।

রামযাদু গ্রামের বাড়ির দাওয়ায় মাদুর পেতে বসে তার বিজ্ঞাপনের আকর্ষণে প্রেরিত কবিতার খাতার স্তূপ থেকে কবি-প্রতিভা আবিষ্কার করবার সন্ধান করছে। সত্যদাস দত্ত নামক একটি লোকের খাতায় কবিতাগুলি পড়তে পড়তে রামযাদু বিস্ময়ে আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠ্‌ছে—এমন একজন প্রকৃত কবি আজও প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে! এ কেবল রামযাদুকে প্রসিদ্ধ করে তোলবার জন্য ভগবানের লীলা! সত্যদাসের কবিতার ছন্দ যেমন নিখুঁত ও বিচিত্র, ভাষা তেমনি পরিমার্জিত, শব্দবিন্যাস তেমনি যথাযথ, ভাব তেমনি কবিত্বময় ও নূতন, তার অভিমত সাহসী সত্যমূল দৃঢ়। রামযাদু একেই অর্জুন করে নিজে শিখণ্ডী হয়ে এর শাণিত কবিত্ব বাণে পরান-বাবুকে কাবু করতে হবে সঙ্কল্প স্থির করছে, এমন সময় একজন স্থূলকায় শ্যামবর্ণ বৃদ্ধ ভট্টাচার্য ধরণের ভদ্রলোক রামযাদুর উঠানে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর গায়ে একটা খদ্দরের বেনিয়ান জামা একপাশে ফিতে দিয়ে বাঁধা, তার খাটো হাতায় হাতের তিন ভাগ ঢেকেছে; সেই বেনিয়ানের উপরে মোটা খদ্দরের একখানি চাদর; পরনে খদ্দরের সাদা ধুতি; পায়ে তালতলার সাদা চটি জুতা; বাঁ হাতে একটি ক্যাম্বিশের ব্যাগ, তার স্থূল উদর বেষ্টন করে একটি আধ-ময়লা লালপাড় দেওয়া সাদা গড়ার গামছা বাঁধা, তাঁর ডান হাতে একটি ছাতা ও তর্জনীতে সোনার তারের পুঁটে-দেওয়া একটা আঁংটি; তাঁব দাড়ি-গোঁপ কামানো; তাঁর মাথার চুল হয় খুব খাটো করে ছাঁটা, নয়, মাস খানেক আগে একেবারে মুণ্ডনের পর উদ্‌গত হয়েছে, একটি স্থূল শিখা গ্রন্থি-বদ্ধ হয়ে মাথার পিছনে গুটিসুটি হয়ে আছে, লম্বিত হয়ে দুলছে না।

রামযাদুর মুখ কবিত্বখ্যাতি অর্জনের আশু সম্ভাবনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠতে যাচ্ছিলো, এমন সময় তার দৃষ্টির সম্মুখে ঐ ব্রাহ্মণের আবির্ভাব হওয়াতেই তার মনটা দমে গেলো, মুখ ম্লান গম্ভীর হয়ে উঠলো। কিন্তু সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে তটস্থ ভাবে দাওয়া থেকে নামতে নামতে মুখে অভ্যর্থনা করলে—আসুন আসুন

এবং সে সেই বৃদ্ধের নিকটস্থ হয়ে ভূমিষ্ঠ প্রণাম ক্‌রে পদধূলি নিতে নিতে বললে—আপনি এখন কোথা থেকে আসছেন?

আগন্তুক রামযাদুর গুরুদেব; তাঁর নাম রাজচন্দ্র বিদ্যারত্ন। বিদ্যারত্ন বললেন—কল্যাণ হোক বাবা, ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক, স্বধর্মে মতি হোক। .. এখন নলডাঙা থেকে আসছি।

রামযাদু প্রণাম করে উঠে গুরুর হাত থেকে ব্যাগ ও ছাতা নিয়ে তাঁকে অগ্রসর করে দাওয়ায় এসে উঠলো এবং ঘরের মধ্যে তাড়াতাড়ি গিয়ে ব্যাগ ছাতা রেখে একটা গালিচার আসন এনে পেতে দিলে।

বিদ্যারত্ন আসনে উপবেশন করলে রামযাদু চিৎকার করে ডাক দিলে— ওরে বিমলি, এক ঘটি পা ধোবার জল নিয়ে আয়, গুরুদেব এসেছেন।

বিদ্যারত্ন রামযাদুকে জিজ্ঞাসা করলেন—বাড়ির সব কুশল তো বাবা? ছেলে পিলে সব ভালো আছে?... বৌমার শরীর ভালো?

রামযাদু হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে বুকের কাছে তুলে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার শ্রীচরণের আশীর্বাদে!

বিদ্যারত্ন রামযাদুকে বললেন—লোক-পরম্পরায় শুনলাম যে কলকাতায় তোমার উত্তম চাকরি হয়েছে...

রামযাদু বিষ্ণুর সম্মুখে গরুড়ের মতন, রামচন্দ্রের সাক্ষাতে হনুমানের মতন, গুরুর সম্মুখে জোড় হাত বুকের কাছে তুলে ভক্তি-গদ্‌গদ স্বরে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার শ্রীচরণের আশীর্বাদে একটা জুটেছে একরকম, কায়-ক্লেশে সংসার চলে যাচ্ছে।

বিদ্যারত্ন একটা জার্মান-রূপার কৌটা থেকে এক টিপ নস্য নিয়ে নাকে দিতে দিতে বললেন—তা বাবা, তুমি তো এমন শুভ সংবাদটা আমাকে জানাও নি! আমি কিন্তু তোমার কল্যাণ-কামনায় নিত্য স্বস্ত্যয়ন কবেছি, নারায়ণকে তুলসী দিয়েছি...

রামযাদু যে গুরুকে চাকরি হওয়ার সংবাদ দেয় নি এই অনুযোগে সে একটু লজ্জিত হতে যাচ্ছিলো, কিন্তু গুরু নিত্য স্বস্ত্যয়ন করেছেন আর নারায়ণকে তুলসী দিয়েছেন শুনেই রামযাদুর মন বিরক্ত হয়ে উঠলো—তার মনে হলো এমন নির্জলা মিথ্যা কথাটা গুরুর না বললেও হতো। রামযাদু একটু শুষ্ক স্বরেই বললে—আমি সংবাদ দিই নি এই ভেবে যে বার্ষিক নেবার জন্যে তো আপনি আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবেন, তখনই জানতে পারবেন...তা এবার যে পূজোর সময়ই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন?

বিদ্যারত্ন ক্ষুণ্ণ স্বরে বললেন—আর বাবা, বাড়ি কি আছে? অগ্নিদেব সমস্তই গ্রহণ করেছেন। ছেলে পিলেদের পরের বাড়িতে রেখে কিছু অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় বেরিয়েছি: তোমরা পাঁচ জনে সাহায্য করলে তবে মাথা গুঁজবার একটু আচ্ছাদন তুলতে পারবো।

রামযাদু ব্যথিত স্বরে বললে—আহা! আপনার মতন পুণ্যাত্মা লোকেরও এমন বিপদ হয়! কিছু টাকা কি সংগ্রহ হলো?

বিদ্যারত্ন নস্যের কৌটাটা বেনিয়ানের পকেটে রেখে বললেন—যৎকিঞ্চিৎ পেয়েছি। তুমি লক্ষ্মীমন্ত আর ভক্তিমান শিষ্য, তোমার ভরসাই আমি অধিক করি।

এই সময় বিমলি নামে পরিচিতা একটি নয়-দশ বৎসরের মেয়ে এক ঘটি জল এনে রামযাদু ও বিদ্যারত্নের মাঝখানে রেখে দিয়ে গেলো, এবং তার পিছনে পিছনে রামযাদুর স্ত্রী মনোমোহিনী মাথায় ঘোমটা দিয়ে একটা পিতলের গামলা এনে সেই ঘটির কাছে রাখলে এবং কাপড়ের আঁচল গলায় জড়িয়ে গুরুর সামনে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে।

বিদ্যারত্ন নিজের দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ মনোমোহিনীর মাথায় ঠেকিয়ে দিয়ে বললেন—সাবিত্রী সমা ভব, পতি-দেবতাকা ভব।

মনোমোহিনী প্রণাম করে উঠে বসে গামলার ভিতর থেকে এক জোড়া খড়ম ও একখানা গামছা বাহির করে মাটিতে রাখলে। অমনি গুরু দুই হাতের আঙুল হাঁটুর সামনে

শৃঙ্খলিত করে ডান পা শূন্যে বাড়িয়ে গামলার উপর তুলে দিলেন। রামযাদু ঘটি থেকে জল পায়ে ঢেলে দিতে লাগলো এবং মনোমোহিনী দুই হাতে গুরুর পা ধুইয়ে গামছা দিয়ে মুছিয়ে দিতে লাগলো।

পাছে গুরুর পা-ধোয়ানি জল কোথাও পড়ে ও কেউ মাড়িয়ে পাপগ্রস্ত হয় তাই এই সাবধানতা; এবং গুরু বার্ষিক আদায় করতে এলে পায়ে দেবেন বা ব্যবহার করবেন বলে রামযাদু খড়ম গামছা আসন শয্যা প্রভৃতি সব সামগ্রী এক প্রস্থ স্বতন্ত্র ও পৃথক করে রেখে দিয়েছে। রামযাদুর এই গুরুভক্তি গ্রামের আদর্শ, তার গুরুভক্তিতে গুরুও প্রসন্ন।

গুরুর পা ধোয়া হলে সেই জল একটু হাতে নিয়ে রামযাদু মাথা পিছন দিকে হেলিয়ে ঊর্ধ্বমুখে হাঁ করে আলগোছে মুখে কয়েক ফোঁটা জল ঢেলে দিলে এবং তার পরে মাথা সোজা করে জলসিক্ত হাতটা মাথার চুলের উপর বুলিয়ে মুছে ফেললে।

মনোমোহিনী গামলা সুদ্ধ জল ও গামছা নিয়ে জড়োসড়ো ভাবে বাড়ির ভিতরে চলে গেলো।

গুরুদেব জলের ঘটিটি নিয়ে উঠানের এক পাশে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এসে আবার আসনে বসলেন।

বিমলি এসে খবর দিলে—বাবা, মা বললে—গুরুঠাকুরের জল-খাবার দেওয়া হয়েছে।

রামযাদু হাত জোড় করে বললে—তা হলে কৃপা করে একবার গা তুলুন।

বিদ্যারত্ন খড়ম পায়ে দিয়ে বাড়ির ভিতরে চললেন, রামযাদু গুরুর আসনখানি তুলে নিয়ে অগ্রে অগ্রে পথ দেখিয়ে চললো।

গুরু গিয়ে দেখলেন—একখানি শ্বেতপাথরের রেকাবির উপর পেঁপে বাতাবি নেবু শশা কলা নারিকেল-কোরা ও একটু গুড় সাজানো আছে; পাশে আছে শ্বেতপাথরের গেলাসে কর্পূর দেওয়া জল।

গুরু খেতে বসলে রামযাদু স্ত্রীকে উদ্দেশ করে বললে—গুরুদেবের জন্যে রাত্রে একটু ছানা কি ক্ষীর তৈরি কোরো, আর চারটি কাঁচা মুগের ডাল ভিজিয়ে দিয়ো।

গুরু শিষ্যবাড়ি এসে রাত্রে আচমনী কিছু খান না, যদিও নিজের বাড়িতে অনেকেই এই নিষ্ঠা পালন করেন না।

রাত্রে আহারাদির পর বাহিরের ঘরে গুরুর শয্যা রচনা করা হলো। গুরুকে শয্যায় বসিয়ে রামযাদু বললে—ব্যাগটা বাড়ির ভিতরে নিয়ে গিয়ে রাখি?

গুরু ব্যস্ত হয়ে বললেন—না বাবা, ওটা আমার কাছেই থাক...

এই বলেই গুরু গায়ের চাদরখানা লম্বা করে তার এক প্রান্ত দিয়ে ব্যাগটাকে বাঁধতে প্রবৃত্ত হলেন।

রামযাদু এই দেখে বললে—গ্রামে বড়ো চোরের উপদ্রব হয়েছে...তা হলে আমিও এই ঘরে শোবো...

—তাই শুয়ো বাবা তাই শুয়ো...বলতে বলতে গুরু চাদরের অপর প্রান্তটা নিজের বালিশের সঙ্গে বেঁধে ফেললেন। বালিশে-ব্যাগে গাঁটছড়া বেঁধে গুরু 'পদ্মনাভ! পদ্মনাভ!' বলে শুয়ে পড়লেন।

গভীর রাত্রি। গুরুর নাসিকা-গর্জনে ঘরেব বাতাস আলোড়িত হচ্ছে। রামযাদু শয্যা ছেড়ে উঠলো এবং পাছে গুরুর নিদ্রার ব্যাঘাত হয় এজন্য অত্যন্ত সন্তর্পণে বাহিরে যাবার দরজার শিকল খুলতে লাগলো। শিকলে একটু খুট করে শব্দ হতেই গুরু নাসাপথে নির্গমোৎসুক নিঃশ্বাসপ্রবাহটা মুখের মধ্যে হড়াৎ করে টেনে নিয়ে শ্বাস-লালা-নিদ্রালস্যে জড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—ক্যা?

রামযাদু ধীরে উত্তর দিল—আজ্ঞে আমি রামযাদু।

গুরু নিদ্রাজড়িত স্বরে দুবার "রাম! রাম!" বলে পাশ ফিরে শুলেন।

রামযাদু গাড়ু হাতে নিয়ে ঘর থেকে বাহির হয়ে গেলো।

বিদ্যারত্নের আবার ঘুম এসে গেছে; রামযাদু ঘরে ফিরে আসতে আসতে শুনলে গুরুদেবের দুর্জয় নাসিকা-গর্জন হচ্ছে।

বিদ্যারত্নের মাথার তলা থেকে বালিশটা হঠাৎ হ্যাঁচকা টানে সরে যেতেই তাঁর মাথাটা হড়কে বিছানার উপর পড়ে গেলো এবং তিনি থতোমতো খেয়ে ঘুমের ঘোরে জড়িত স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন—আ-া..মা া-া...ব্যা-া-া...গ...

গুরুর সেই অস্পষ্ট কাতরোক্তি ডুবিয়ে দিয়ে রামযাদু চিৎকার করে উঠলো—চোর! চোর! ধর! ধর!...

এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে রামযাদু ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ির ভিতর দিকে দৌড়ে গেলো। চোর...চোর...ধর...ধর...ঐ যায়...ইত্যাদি চিৎকারে সে সমস্ত গ্রামকে উচ্চকিত করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এ-বাগানের ভিতর দিয়ে সে-বাড়ির উঠান দিয়ে, ও-বাড়ির পাঁদাড় দিয়ে ছুটে বেড়াতে লাগলো।

বিদ্যারত্ন রামযাদুর চিৎকারে আচম্‌কা প্রবুদ্ধ হয়ে ও ছুটে তাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে তিনিও তার সঙ্গে সঙ্গে চোর ধরবার চেষ্টায় ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু স্থূল উদরের উপর খদ্দরের মোটা কাপড়ের পরিবেষ্টনী শিথিল হয়ে গিয়েছিলো, কাছা খুলে গিয়েছিলো; তিনি কাপড়ের কষি গুঁজতে-গুঁজতে ছুটে যাবার চেষ্টায় দাওয়ায় গিয়ে উপস্থিত হতেই মুক্ত কাছাটা তাঁর পাযে জড়িয়ে গেলো এবং আচমকা ঘুম ভেঙে ওঠাতে ও ব্যাগ চুরি যাওয়ার অশঙ্কায় ব্যস্ত হওয়াতে অচেনা দাওয়া থেকে নামতে গিয়ে তিনি তালগোল পাকিয়ে দাওয়ার নিচে ছেঁচ-তলায় পড়ে গেলেন এবং আঘাতের বেদনায় ও ব্যাগের শোকে গোঁ গোঁ করে কাতরাতে লাগলেন—ব্যা...ব্যা...

রামযাদুর চিৎকারে গ্রামের ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-পুরুষ অনেকেই লণ্ঠন জ্বেলে লাঠি নিয়ে দিকে দিকে বেরিয়ে পড়লো। ঝোপ ঝাড় জঙ্গল বাগান তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো, কিন্তু চোরের পাত্তা পাওয়া গেলো না, ব্যাগেরও দর্শন মিললো না।

যখন গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে রামযাদু বাড়িতে ফিরে এলো তখন দেখলে গুরুদেব সেই ছাঁচতলাতে বসে দুই হাতে মাথা ধরে কেবল বলছেন—মধুসূদন! মধুসূদন!... মধুসূদন! মধুসূদন!...আর তাঁর দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

রামযাদু তাড়াতাড়ি এসে গুরুদেবকে ধরে তুলতে তুলতে জিজ্ঞাসা করলে—ব্যাগের মধ্যে বেশি কিছু ছিলো কি?

বিদ্যারত্ন নাক ঝেড়ে আঙুলের কফ কাপড়ে মুছতে মুছতে বললে—ছিলো বৈকি বাবা, আমার সর্বস্ব ছিলো...গৃহদাহের দায় জানিয়ে শিষ্য-বাড়ি থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ শো টাকা সংগ্রহ করেছিলাম...আমার সব গেলো!...

বৃদ্ধ এবার প্রকাশ্যে কেঁদে ফেললেন।

রামযাদু বল্‌লে—আপনি জ্ঞানী, আপনি অধীর হলে আমরা কাকে দেখে হৃদয়ে বল সঞ্চয় করবো। স্থির হোন। কাল সকালেই পুলিশে খবর...

বিদ্যারত্ন কপালে করাঘাতে করে বললেন—আর পুলিশ। আমার গ্রহ-বৈগুণ্য উপস্থিত হয়েছে!

গ্রামের নানা লোকে নানা রকম আন্দাজ করতে লাগলো, নানা উপায় নির্দেশ করতে লাগলো।

রামযাদু তাদের বললে—আর রাত ভোর হয়ে এলো...তোমরা সব এখন বাড়ি যাও...সকালে যা হয় পরামর্শ করা যাবে...

সকল লোকে একে একে চলে গেলো। রামযাদু ও বিদ্যারত্ন বাকি রাত্রিটুকু জেগে বসেই কাটিয়ে দিলে।

রামযাদু ভোরবেলা শৌচে নদীর ধারে গিয়েই চেঁচিয়ে উঠলো—গুরুদেবের ব্যাগ পাওয়া গেছে। গুরুদেবের ব্যাগ পাওয়া গেছে।

এই চিৎকারে পাড়াব দু-চারজন লোক আবার ছুটে বেরিয়ে এলো। লোকেরা সমাগত হলে রামযাদু গিয়ে ব্যাগটাকে তুল্‌লে...চোর ব্যাগ খুল্‌তে না পেরে ছুরি দিয়ে ব্যাগের পেট ফাঁসিয়ে ফেলেছে কিন্তু ব্যাগের উদর স্ফীত হয়েই আছে। রামযাদু তা দেখে উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলো—চোর ব্যাটা ব্যাগটা কেটেও কিছু নিতে পারে নি; আমাদের তাড়াহুড়ো পেয়ে ব্যাগ ফেলেই পালিয়েছে।

সকলে বিজয়োল্লাস করতে করতে গুরুর কাছে এনে ব্যাগ দিলে। রামযাদু প্রফুল্লমুখে বল্‌লে—ব্যাগের জিনিস কিছু নিতে পারে নি।

এই সুসংবাদ শোন্‌বা মাত্র বিদ্যারত্নের মৃতদেহে যেন প্রাণ এলো; তিনি যেন মৃতমন্য পুত্রকে ফিরে পাচ্ছেন এমনি আগ্রহে হাত বাড়িয়ে বল্‌লেন—কই বাবা কই দেখি?

রামযাদু গুরুর সামনে ব্যাগটি স্থাপন করলে।

বিদ্যারত্ন চাবি দিয়ে ব্যাগ খোলার বিলম্ব স্বীকার না করে ব্যাগের বিদীর্ণ উদর থেকেই অভ্যন্তরের সমস্ত দ্রব্যাদি টেনে টেনে বাহির করে চারিদিকে ছড়িয়ে ফেল্‌তে লাগলেন।... কাপড়, উড়ানি, নামাবলি, রুদ্রাক্ষের মালা, পুরোহিত-দর্পণ, কোশা-কুশি এমনি কতো কি।

জিনিস যতোই বেরিয়ে আসতে লাগলো বিদ্যারত্নের মুখ ততোই বিশুষ্ক ম্লান হয়ে উঠতে লাগলো। সব জিনিস বাহির করা হলো, ব্যাগের ছিন্ন উদর চিপসে ঝলঝল করতে লাগলো, তবু বিদ্যারত্নের যেন প্রত্যয় হয় না, তিনি ছেঁড়ার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে ব্যাগের উদরে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখতে লাগলেন, কোথাও কোনো কোণে কিছু আটকে লুকিয়ে আছে কি না। এই রকম অনুসন্ধানে সন্তুষ্ট না হয়ে তিনি আবার পৈতাতে

আটকানো চাবি দিয়ে ব্যাগের তালা খুলে ফেললেন এবং ব্যাগের মুখ বিস্তার করে দু-মুখ-খোলা থলের মতন ব্যাগটাকে ঝেড়ে ঝেড়ে এবং তার মধ্যে উঁকি মেরে মেরে দেখতে লাগলেন।

রামযাদু বিষণ্ণ কাতর মুখে জিজ্ঞাসা করলে—আর কি খুঁজছেন?

বিদ্যারত্ন হতাশ স্বরে বললেন—আমার টাকা! টাকার পুঁটলিটা নেই...

রামযাদু বল্‌লে—আর একবার সব জিনিসগুলো মিলিয়ে উল্টে পাল্টে দেখুন তো...কোনো কাপড়ের মধ্যে ঢুকে থাক্‌তে পারে...

বিদ্যারত্ন তন্ন তন্ন করে দেখে বললেন—টাকার পুঁট্‌লিটা আর একটা নতুন গরদের জোড় নেই...আর সব আছে।

রামযাদু ব্যথিত স্বরে "তাই তো" বলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

প্রভাতে রামযাদুর অত্যন্ত পীড়াপীড়িতে বিদ্যারত্ন স্নানাহার করলেন। মাত্র ভাতে-ভাত রান্না করলেন, কিন্তু হাতে-ভাতে করেই উঠে পড়লেন, মুখে অন্ন রুচলো না।

রামযাদু কাতর স্বরে বললে—আপনার যে কেবল রন্ধনের ক্লেশ স্বীকার করাই হলো!

বিদ্যারত্ন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন...আর বাবা!

বিদ্যারত্ন আচমন করে মুখ মুছতে মুছতে বললেন—আমি এখনই যাবো বাবা,...

রামযাদু ব্যস্ত হয়ে বললে—এখনই?

—হ্যাঁ, এখনই। মনটা বড়ো উতলা হয়ে উঠেছে। একবার সিঙ্গেতে একটি শিষ্যের বাড়ি হয়ে আজকের ট্রেনেই বাড়ি চলে যাবো।

রামযাদু ক্ষুণ্ণ স্বরে বললে—যেমন আজ্ঞা করবেন তাই হবে। আমরা মনে করেছিলাম দু-দিন প্রসাদ পাবো, পদ সেবা করতে পারবো...

—তোমরা কলকাতায় গিয়ে স্থির হয়ে বসলে আমাকে সংবাদ দিয়ো, আমি তোমাদের নূতন আবাসে গিয়ে আশীর্বাদ করে আসবো।

বিদ্যারত্ন ব্যাগের সামগ্রীগুলি একটি পোঁট্‌লায় বাঁধবার উদ্‌যোগ করছেন। রামযাদু বাড়ির ভিতর থেকে একটা ভালো কার্পেটের ব্যাগ এনে গুরুর সামনে রাখলে, এবং দশটাকার দশখানি নোট গুরুর পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করলে।

বিদ্যারত্ন রামযাদুর গুরুভক্তি দেখে আনন্দে বিহ্বল হয়ে কোনো কথা বলতে পারলেন না, কেবল রামযাদুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

রামযাদু কুণ্ঠিত স্বরে বললে—আমাকে সপরিবারে কলকাতায় গিয়ে নতূন বাসা পত্তন করতে হবে, নইলে আরো কিছু আপনাকে দিতাম। আমারই বাড়ি থেকে যে টাকা চুরি হয়ে গেলো তার ক্ষতিপূরণ আমারই করা উচিত ছিলো। কিন্তু এখন এই সামান্য কিছু দিতে পারছি বলে অত্যন্ত দুঃখিত হচ্ছি।

বিদ্যারত্ন নূতন ব্যাগে জিনিসগুলি ভরতে ভরতে বল্‌লেন—এই আমার লক্ষ টাকা! শিষ্যে পুত্রে ভেদ নেই; তোমাদের উন্নতি হোক, আমরা তো তোমাদেরই প্রতিপাল্য।...

গুরু ছলছল চোখে বিদায় হলেন। রামযাদু সপরিবারে গুরুর পদধূলি মাথায় দিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লে।

শীঘ্রই গ্রামে রাষ্ট্র হয়ে গেলো যে রামযাদু গুরুকে একশত টাকা প্রণামি দিয়েছে।

দুষ্ট লোকে চোখ টেপাটিপি করে চাপা গলায় বললে—গোরু মেরে জুতো দান!

দুষ্ট লোকে কানাঘুষা করতে লাগলো—ব্যাগ-চুরির ব্যাপারটা ধড়িবাজ রামযাদুরই কারসাজি! বেটা কী শয়তান! গুরুস্ব অপহরণ করতেও ওর বুক কাঁপে না!

রামযাদু এই দুর্নাম রটনা শুনে চিৎকার করে বল্‌লে—পরের ভালো কেউ দেখতে পারে না! আমার একটু উন্নতি হচ্ছে অমনি লোকের চোখ টাটাচ্ছে কিসে আমাকে খাটো করবে অপদস্থ করবে তার ছুতো খুঁজছে! ...এমন ঈর্ষাকাতর গাঁয়ে মানুষ বাস করে! এই গাঁ জন্মের মতন ছেড়ে চল্‌লাম, জীবনে যদি কখনো ফিরে আসি তো...

শপথটা রামযাদুর ক্রোধস্খলিত বাক্যে ভালো বোঝা গেলো না।

রামযাদু সপরিবারে কলকাতায় এসে পরান-বাবুর শিক্‌দারবাগানের বাড়িতে আস্তানা গেড়েছে; বাড়ির ভাড়া লাগে না, দুধালো গোরু দুবেলায় আট দশ সের দুধ ঢালছে, রামযাদু সপরিবারে দিব্য আরামেই আছে। কর্তা কাশী গেছেন, আপিসে তাঁর এখনও ছুটি, কাজেই রামযাদুর অখণ্ড অবসর। সে সেই অবসরটি কবিখ্যাতি অর্জনের আয়োজনে নিযুক্ত করলে। সে কলকাতায় এসেই সত্যদাসকে চিঠি লিখলে যে সত্যদাস এসে তার সঙ্গে দেখা করলে সত্যদাসের কবিতা প্রকাশ করার ব্যবস্থা সম্বন্ধে কথাবার্তা হতে পারে।

সত্যদাস রামযাদুর বাড়িতে এলো। রামযাদু দেখলে সত্যদাস বুদ্ধির প্রভায় সুশ্রী যুবক, কিন্তু সে দরিদ্র। রামযাদুর মন আশায় প্রফুল্ল হয়ে উঠলো। রামযাদু সত্যদাসকে জিজ্ঞাসা করলে—তুমি এমন সুন্দর কবিতা লিখতে পারো, এ পর্যন্ত কোনো মাসিকপত্রে ছাপ্‌তে দাওনি কেন? কোনো কাগজে তোমার কবিতা দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না?

সত্যদাস কুণ্ঠিত ভাবে বললে—আমার ইচ্ছা ছিলো যে সাধনার দ্বারা শক্তি সঞ্চয় করে তার পর আত্মপ্রকাশ করবো। এই বইখানি যদি কোন রকমে ছাপতে পারি, আর লোকে আমার কবিতার প্রশংসা করে, আর সম্পাদকেরা নিজে থেকে আমার কবিতা চেয়ে নেন, তবেই মাসিকপত্রে কবিতা দেবো।

রামযাদু সত্যদাসের গর্বিত মনের পরিচয় পেয়ে চিন্তিতও হলো আবার সত্যদাসের এমন সুরচনার শক্তি যে বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে এখনও একেবারে অপরিচিত আছে তাতে সে আনন্দিত ও আশান্বিতও হলো। সে সত্যদাসকে বল্‌লে—বেশ! বেশ! আমি খরচ দিয়ে তোমার এই বই ছেপে প্রকাশ করে দেবো। ...তুমি এখন কি করো?

—কিছুই করি না। অনেক দিন থেকে একটা চাকরি খুঁজছি, কিন্তু আমার কেউ মুরুব্বিও নেই, কারো বেশি খোশামোদও করতে পারি না, আমার কোনো ডিগ্রি-ফিগ্রিও নেই. .

—তোমার লেখার মধ্যে তো গভীর জ্ঞান ও চিন্তার পরিচয় পেয়েছি—সমস্ত শাস্ত্র আর ইতিহাসে তো তোমার অসাধারণ জ্ঞান! তুমি স্কুল-কলেজে কতোদূর পড়েছিলে...

সত্যদাস রামযাদুর প্রশংসায় প্রফুল্ল এবং তার প্রশ্নে লজ্জিত হয়ে বললে—আমি আই-এ পাস করতে পারি নি...

—তুমি আমাদের আপিসে চাকরি করবে? প্রথমে একশো টাকা পাবে, পরে দুশো আড়াইশো টাকা পর্যন্ত যাতে পাও তার আমি চেষ্টা করবো...

রামযাদু উত্তরের আশায় সত্যদাসের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু চুপ করলে, কিন্তু সত্যদাস আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে তখনই কোন কথা বলতে পারলে না।

সত্যদাসের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে খুশি হয়ে রামযাদু বলতে লাগলো—কলকাতায় তোমার মেসে-টেসে থাক্‌বারও দরকার হবে না, আমার বাড়িতেই স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবে...নিজের বাড়ির মতন থাকবে, তোমার কোনো কষ্ট হবে না...

সত্যদাস বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছে, সে বুঝতে পারছে না যে তার উপর রামযাদুর এই অনুগ্রহের কারণ কি হতে পারে?

রামযাদু সত্যদাসকে বললে—তা হলে আপিস খুললেই তোমাকে কাজে বাহাল করে দেবো। আর তুমি ইচ্ছা করলে আজ থেকেই আমার বাড়িতে থাকতে পারো।

সত্যদাস সন্তুষ্ট হয়ে বললে—আমি আপনার চিঠি পেয়ে দেশ থেকে তাড়াতাড়ি চলে এসেছি, একবার দেশে গিয়ে কাপড়-চোপড় নিয়ে আসতে হবে...

রামযাদু হেসে বললে—কলকাতায় তো কাপড়-চোপড়ের কিছুমাত্র অভাব নেই; যা দরকার হবে কিনে নিলেই হবে। তুমি আজ থেকেই আমার কাছে থেকে যাও, তোমার সঙ্গে একটু সাহিত্য আলোচনা করা যাবে।

সত্যদাস আনন্দে অভিভূত হয়ে মৌন হয়ে রইলো, রামযাদু সত্যদাসের মৌনতাকে সম্মতির লক্ষণ জেনে উচ্চ চিৎকার করে ডাকলে—ওরে বুনো,...বুনো...

নেপথ্য থেকে বালক-কণ্ঠের সূক্ষ্ম স্বরে জবাব এলো—কি বাবা?

বামযাদু আবার চেঁচিয়ে ডাকলে—শুনে যা...

একটি এগারো-বারো বছর বয়সের ফর্সা রোগা ছেলে গলার উপর কোঁচার কাপড় জড়িয়ে ছুটে এসে ঘরে ঢুকলো। তার নাম বনমালী, সে রামযাদুব বড়ো ছেলে।

রামযাদু বনমালীকে দেখেই বললে—এই সত্যদাসবাবু আজ থেকে আমাদের বাড়িতে থাকবেন। তোমার মাকে গিয়ে বলো গে। তোমাদের পড়বার ঘরের পাশের ঘরে ইনি থাকবেন; এঁর বিছানা-টিছানা সেখানে ঠিক করে দিয়ো। আর এখন তোমার সত্যদাদাকে জলখাবার এনে দাও, আর আমাকে ত্রিশটে টাকা এনে দাও...

বনমালী ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলো।

রামযাদু তখন সত্যদাসের দিকে ফিরে বললে—জল খেয়ে একবার বাজার ঘুরে এসো—ধোয়া জামা-কাপড জুতো ছাতা যা যা দরকাব কিনে নিয়ে এসো...একটা স্টীল-ট্রাঙ্কও কিনে এনো, জামা-কাপড় রাখতে হবে...

সত্যদাস কুণ্ঠিত ভাবে বললে—এ সবের কিছু দরকার ছিলো না, আমি বাড়ি গিয়ে...

. রামযাদু হেসে বললে—তুমি মনে কোরো না যে আমি Charity করছি; তোমার কুণ্ঠিত হবার কোনো কারণ নেই। আমি অল্প-স্বল্প Research work করে থাকি...

সত্যদাস সঙ্কুচিত ভাবে বললে—তা আমি জানি; আপনার নাম ভারতবর্ষে কে না জানে?

রামযাদু সত্যদাসের প্রশংসায় তুষ্ট হয়ে বলতে লাগলো, সেই রিসার্চের কাজে আমাকে সাহায্য করবার জন্যে একজন বুদ্ধিমান চতুর সাহিত্যানুরাগী যুবককে আমি খুঁজছিলাম। ভগবান তোমাকে জুটিয়ে দিয়েছেন; তোমাকে আমি অল্পে অব্যাহতি দেবো না। তোমাকে আমার কাছে রাখছি কেন জানো? তোমাকে আচ্ছা করে খাটিয়ে নেবো...আমার যখন যা দরকার হবে তোমাকে দিয়ে খুঁজিয়ে নেবো; লেখা নকল করিয়ে নেবো; কখনো বা আমি মুখে বলে যাবো তুমি লিখে দেবে; তার পর ছেলেমেয়েগুলোর লেখাপড়াটাও তুমি দেখতে পারবে। বাড়িতে যখন বাড়ির লোকের মতন থাকবে তখন কোন না মাঝে মাঝে হাট-বাজারটাও করে দেবে?

এই বলে রামযাদু হাসতে লাগলো। এবং রামযাদুর কথা শুনে সত্যদাসের মন থেকে অপরের কাছে দান গ্রহণের গ্লানি দূর হয়ে গেলো। সে নিজের মনে মনে বললে—এমন সদাশয় সরল লোকের সাহায্যে সে তার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে দিতে প্রস্তুত থাকবে।

বনমালী এক থালা জলখাবার ও এক গেলাস জল দুই হাতে নিয়ে ঘরে এলো এবং সত্যদাসের সামনে নামিয়ে রেখে দিলে, তার পর ট্যাক থেকে ভাঁজকরা নোট বার করে বাবার হাতে দিলে।

সত্যদাসের জল-খাওয়া শেষ হলে রামযাদু নোটের ভাঁজ খুলে তিনখানা দশটাকার নোট তার হাতে দিল। সত্যদাস আবশ্যক সামগ্রী কিনতে বাজারে বেরিয়ে গেলো।

আপিসের ছুটি ফুরিয়ে গেছে। পরান-বাবু কাশী থেকে আজ ফিরে আসবেন। রামযাদু বর্ধমান স্টেশন পর্যন্ত গিয়ে অপেক্ষা করছে, পরান-বাবুকে আগ-বাড়িয়ে নিয়ে সে কাশীর ট্রেনে কলকাতায় ফিরবে। কাশীর ট্রেন স্টেশনে এসে প্রবেশ করতেই পরান-বাবু রামযাদুকে দেখেই হাসলেন এবং রামযাদুও হাসিমুখে পরান-বাবুর কামরার সামনে পৌঁছাবার চেষ্টায় ক্রমশ-মন্থর গতি চলন্ত ট্রেনের সঙ্গে ছুটতে লাগলো। ট্রেন একেবারে থেমে গেলে রামযাদু হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পরান-বাবুর গাড়ির সামনে দাঁড়ালো।

পরান-বাবু প্রফুল্ল মুখে বললেন—প্রণাম হই মুখুজ্জে মশায়। এখানে কি করতে এসেছিলেন?

রামযাদু দন্তবিকাশ করে বললে—তীর্থ-প্রত্যাগত পুণ্যাত্মাদের দর্শন করে একটু পুণ্যসঞ্চয় করে নিতে।

পরান-বাবু রামযাদুর তোষামোদে তুষ্ট হয়ে বললেন—সে কর্মটি তো হাবড়া স্টেশনেও হতে পারতো?

—কষ্ট-স্বীকার করে আগ্রহের পরিচয় না দিলে অনায়াসে পুণ্য হয় না।

—আসুন, গাড়িতে উঠে পড়ুন।

—আমরা কি ফার্স্ট-সেকেন্ড ক্লাসে যাবার যোগ্য লোক। আমরা সামান্য ব্যক্তি সর্বনিম্ন ক্লাসে যাবো।

—না, না, এ আমাদের রিজার্ভ গাড়ি, আপনি আসুন, একসঙ্গে গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।

রামযাদু আর আপত্তি না করে বললে—আচ্ছা আমি আসছি।

এই বলেই সে ছুটে চলে গেলো এবং দু টাকাব সীতাভোগ মিহিদানা কিনে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে পরান-বাবুর কামরায় উঠলো।

পরান-বাবু বললেন—ও আবার কি আনলেন মুখুজ্জে মশায়।

পরান-বাবু মাতঙ্গিনী ও কৃষ্ণকলি স্টেশনের প্ল্যাট্‌ফরমের দিকের বেঞ্চিতে বসে ছিলেন। আর থাকোহরি ছিলো অপর প্রান্তের বেঞ্চিতে। মাতঙ্গিনী রামযাদুকে দেখেই ঘোমটা টেনে কৃষ্ণকলিকে নিয়ে গাড়ির অপর দিকে গিয়ে বসেছিলেন। থাকোহবি উঠে এসে মাঝের বেঞ্চিতে বসেছিলো। বামযাদু গাড়িতে উঠে মাঝের বেঞ্চির উপর থাকোহরির পাশে সীতাভোগের খাণ্ডাটা রেখে পরান-বাবুর দিকে মুখ ও মাতঙ্গিনীর দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসতে বসতে বললে—কৃষ্ণকলির জন্যে একটু সীতাভোগ মিহিদানা কিনে নিয়ে এলাম।

থাকোহরি রামযাদুকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলে। বামযাদু নীরবে তার মাথায় হাত দিলে।

পরান-বাবু হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার ছেলেমেয়েদের জন্যে কিছু নিলেন না?

রামযাদু বললে—মা ষষ্ঠীব পবম অনুগ্রহে আমার বাড়িতে তো একটি পল্টন, তাদের মুখে একটি কবেও দিতে পারি এমন সঙ্গতি আমার নেই। আমার গো-ভাগ্যি নেই, এঁঠুলি-ভাগ্যি আছে!

এই সময় গাড়ির সামনে দিয়ে একজন ফেবিওয়ালা মিষ্টান্নের গাড়ি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিলো; পরান-বাবু তাকে ডেকে বললেন—এই, পাঁচ টাকার সীতাভোগ মিহিদানা দাও তো।

বামযাদু একবাবও একটু আপত্তি প্রকাশ না করে দন্তবিকাশ করে বসে রইলো।

পরান-বাবু মিষ্টান্নেব মূল্য চুকিযে দিয়ে মিষ্টান্নেব ঝুড়িটা রামযাদুব পাশে বেখে হাসিমুখে বললেন—ছেলেদেব বলবেন আমি তাদেব খেতে দিয়েছি।

রামযাদু বললে—আপনিই তো তাদেব খেতে পরতে দিচ্ছেন—আপনি বিশ্ববাংলার অন্নদাতা ভয়ত্রাতা!

পরান বাবু তুষ্ট হয়ে বললেন—আমরা কাশী থেকে মিষ্টান্ন চমচম গুপচুপ আকের মোরব্বা প্রভৃতি আব বেনারসি শাড়ি জোড এনেছি। কালকে উনি নিজে গিয়ে বৌমাকে দিয়ে আসবেন, আর নতুন বাড়িতে এসে তারা কেমন আছেন তাও দেখে আসবেন।

রামযাদু একবাব মুখ অর্ধেক ফিরিয়ে মাতঙ্গিনীব দিকে নত চক্ষুর দৃষ্টিপাত করে বললে—আপনাদের অসীম অনুগ্রহে আমবা তো চিরকালের জন্য কেনা হয়ে রয়েছি।

পরান-বাবু প্রফুল্ল মুখে জিজ্ঞাসা করলেন—এই ছুটিতে কি লিখলেন মুখুজ্জে মশায়?

—কতকগুলো কবিতা বাছাই ক'রে একখানা বইএর মতন করে রেখেছি। মনে করছি ছাপাবো।

পরান-বাবু বিস্ময়পূর্ণ আনন্দ প্রকাশ করে বললেন—আপনি কবিতা লিখতেও পারেন? পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব দুইয়ের সমাবেশ আপনাতে হয়েছে! এমন অসামান্য প্রতিভা আপনার!

রামযাদু যেন আত্মপ্রশংসায় লজ্জিত হয়ে বিনয়ে সঙ্কুচিত হাস্য করলে।

পরান-বাবু বলতে লাগলেন—চটপট ছাপিয়ে ফেলুন, ছাপাখানার বিলটা আমার নামে করতে বলবেন।

রামযাদু পুনঃপুনঃ লাভে প্রফুল্ল হয়ে বললে—আমি কিছু কিছু রিসার্চও করছি। কিন্তু আজকাল আপিসে যেতে হয়, বেশি তো সময় পাই না, তাই আমাকে সন্ধানে সাহায্য করবার জন্যে একজন লোক রেখেছি।

—বেশ করেছেন। তাকে কতো দিতে হবে?

—কিছু দিতে হবে না। আমার বাড়িতে থাকবে খাবে, আর আপিসে একটা কিছু কাজ করে দেবো বলেছি...ছেলেটি বড়' গবিব কিন্তু বেশ বুদ্ধিমান।

অথচ বুদ্ধিমান শুনেই পরান-বাবুব মন গলে গেলো। তিনি বললেন—তা হলে Export Department-এ বিল ক্লার্কের খালি কাজটা ঐ ছেলেটিকে দিলে তো হয়...

রামযাদু খুশি হয়ে বললে—কিন্তু সে কাজের মাইনে তো বেশি, একশো থেকে আড়াইশো...

পরান-বাবু বললেন—তা একটু বেশি মাইনে না দিলে ছেলেটি মন দিয়ে কাজ করবে কেন, আব বেশি দিন টিকেই বা থাকবে কেন?

রামযাদু অভীষ্টসিদ্ধির আনন্দে অভিভূত হয়ে কেবল হাসলে এবং তার পরে কাশীতে এখন কেমন ভিড়, শীত পড়েছে কি না, ইত্যাদি গল্প বলতে আরম্ভ করলে।

সত্যদাসের চাকরি হয়ে গেছে। সে অপ্রত্যাশিত অধিক বেতনের চাকরি পেয়ে রামযাদুর কাছে কৃতজ্ঞতায় একেবারে তার অনুরক্ত আজ্ঞাধীন হয়ে পড়েছে।

রামযাদু একদিন সত্যদাসকে বললে—সত্যদাস এইবার তোমার বইখানা প্রেসে দেবো। খুব ভালো করে ছাপাতে হবে।

সত্যদাসের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

রামযাদু বলতে লাগলো—কিন্তু একটা মুস্কিল আছে। আপিসেব সাহেবেরা ইচ্ছা করে না যে তাদের কর্মচারীরা আপিসের কাজ ছাড়া আর কিছু করে; বিশেষত লেখকদেরকে ওরা দেখতে পারে না। তবে যদি আমার কথা বলো সে স্বতন্ত্র, আমি লেখক বলে খ্যাতি লাভ করার পর ওদের আপিসে ঢুকেছি।

সত্যদাস শঙ্কাকুল হতাশ নিরুপায় দৃষ্টিতে রামযাদুর মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

রামযাদু বলতে লাগলো—কিন্তু আমি ভেবে চিন্তে একটা উপায় স্থির করেছি...

সত্যদাসের মুখ আবার আশার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

রামযাদু বলতে লাগলো—তুমি একটা ছদ্মনাম নিলেই তো চুকে যায়। শেষে সেই ছদ্মনামেই লেখকের খ্যাতি জড়িয়ে যায়। জর্জ ইলিয়ট, মার্ক টোয়েন, জর্জ স্যান্ড, তাঁদের ছদ্মনামেই প্রসিদ্ধ। বাংলাতেও সুরেশ্বর শর্মা, বীরেশ্বর গোস্বামী এক সময়ে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, কিন্তু ঐ দুটিই ছদ্মনাম। বীরবল তো স্বনামপ্রসিদ্ধ। এমন কি স্বয়ং বঙ্কিমবাবুও কমলাকান্ত আর রাম শর্মা নাম নিয়ে লিখে ছদ্মনাম দুটিকেও অমর করে রেখে গেছেন। তাই আমি বলি কি, তুমি বঙ্কিমবাবুর ছদ্মনাম রাম শর্মা নামেই বই ছাপো, কাগজে লেখো। বঙ্কিম বাবুর ঐ ছদ্মনামটির কথা বেশি লোকে জানে না, অথচ অমর বঙ্কিমচন্দ্রের আশীর্বাদ নিয়ে তোমার সাহিত্যক্ষেত্রে বিজয়-অভিযান হবে। কি বলো?

সত্যদাস বঙ্কিমচন্দ্রের অমর আত্মার আশীর্বাদ লাভের সৌভাগ্যে ও আনন্দে কৃতার্থ হয়ে বললে—আজ্ঞে সে খুব ভালো হবে।

সত্যদাস মনে মনে ভাবলে পরম ভাগ্যবলে সে রামযাদুর ন্যায় একজন পরমহিতৈষী বন্ধু মুরুব্বি পেয়ে গেছে। তার মন ভক্তিতে শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে উঠলো।

এই ব্যবস্থা অনুসারে সত্যদাসের কবিতার বই ছাপা হলো; তার পরিচয়-পত্রে ছাপা হলো শ্রী রাম শর্মা কর্তৃক বিরচিত, শ্রীরামযাদু মুখোপাধ্যায় কর্তৃক শিকদার বাগান লেন হইতে প্রকাশিত; এবং ভূমিকায় লেখা হলো, এই গ্রন্থ প্রকাশে শ্রীযুক্ত রামযাদু মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও আমার পরমস্নেহভাজন বন্ধু শ্রীমান সত্যদাস দত্ত আমাকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন, তাহার জন্য আমি উভয়েব নিকটেই বিশেষ কৃতজ্ঞ। ইতি শ্রী রাম শর্মা, শিকদার বাগান লেন, কলিকাতা, শ্যামাপূজা কার্তিক ১৩—।

এই ভূমিকা দেখে সত্যদাস খুব কৌতুক অনুভব করলে যে রামযাদু বাবু বেশ কৌশল করে তার নামটাও বইয়ের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। তার মুখের ভাব দেখে চতুর রামযাদু তার মনের ভাব বুঝতে পেরে বললে—তোমার নামটাও এর ভিতরে ঢুকিয়ে দিলাম, রাম শর্মা যে কে, তা লোকে শীঘ্রই শনাক্ত করতে পারবে।

সত্যদাসের কৃতজ্ঞতা উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়ে রামযাদুর প্রতি অন্ধ ভক্তিতে পরিণত হতে চললো।

কিন্তু লোকে রাম শর্মা নামটিকে রামযাদুরই নাম-সংক্ষেপ বলেই সহজেই বুঝে নিলে। রামযাদু ব্রাহ্মণ, সুতরাং রাম শর্মা সে তো বটেই; তার উপর আবার সেই প্রকাশক, রাম শর্মা পুস্তকের ভূমিকায় নিজের যে ঠিকানা দিয়েছে তা রামযাদুরই বাড়ির ঠিকানা; অতএব রামযাদুই যে রাম শর্মা এ সম্বন্ধে কারও একটুও সন্দেহ রইলো না।

খবরের কাগজে পুস্তকের প্রশংসা বিঘোষিত হতে লাগলো। এক কাগজে লিখলে—এই রাম শর্মা যে কে তা বুঝতে কোনো পাঠকেরই একটুও কষ্ট হবে না; লেখক যে ছদ্মনাম গ্রহণ করেছেন সেটি যেন মাকড়সার জালের পর্দার আড়ালে জালি কাপড়ের ঘোমটা দিয়ে আত্মগোপন করার চেষ্টা। অন্য এক কাগজে লিখলে—যিনি অকস্মাৎ পুরাতত্ত্বের গবেষণায় অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়ে ঐতিহাসিকদের চমৎকৃত করেছিলেন,

তিনিই আবার অকস্মাৎ কবি রূপে বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। এরূপ বিভিন্নমুখী প্রতিভা সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না; রবীন্দ্রনাথের যুগে এমন স্বতন্ত্র কবিত্ব প্রতিভাসম্পন্ন কবির আবির্ভাব বঙ্গবাসীর পরম সৌভাগ্যই সূচনা করছে। এই কবিতাগুলি অক্ষম শিক্ষানবিসের প্রথম উদ্যম নয়, এ একেবারে পাকা হাতের লেখা; ছন্দ অনবদ্য, ভাষা ললিত মার্জিত, ভাব পাণ্ডিত্য-লব্ধ গভীর ও নূতন। এতো বিচিত্র গুণের একত্র সমাবেশ খুব অল্প রচনাতেই দেখা যায়। কবি একটি নূতন বাণী, নিজস্ব মেসেজ্ শোনাতে আবির্ভূত হয়েছেন।

রামযাদু দাঁত বার করে হাসতে হাসতে সত্যদাসকে বললে—খবরের কাগজওয়ালারা কী মূর্খ! তারা মনে করছে এ বইখানাও আমারই লেখা! যেন বাংলা দেশে ভালো রচনা আমি ছাড়া আর কেউ করতে পারে না। তা এতে তোমার ভালোই হলো; আমার লেখা মনে করে সকলেই খুব প্রশংসা করছে, সহজেই তোমার যশ প্রতিষ্ঠা লাভ করলে। এর পরে যা লিখবে তাই সমাদর লাভ করবে।

সত্যদাস আনন্দোৎফুল্ল লজ্জিত মুখ নত করে চুপ করে রইলো।

পরান-বাবুর বাড়িতে রামযাদু যাওয়া মাত্রই পরান-বাবু এক ঘর লোকের সামনে বলে উঠেন—মুখুজ্জে মশায়, আপনি এতো উঁচু দরের কবি তা তো আমার জানতাম না।

একজন উমেদার বলে উঠলো—কোনো কোনো বিষয়ে ইনি রবি-ঠাকুরকেও ছাড়িয়ে গেছেন।

অপর একজন বললে—রামযাদু-বাবু হচ্ছেন বিস্ময় মূর্তিমান। ইতিহাস লিখে তাক লাগিয়ে দিলেন; লোকে বিস্ময়ভাব সামলাতে না সামলাতে আর এক বিস্ময় এসে উপস্থিত! এর পরে আবার যদি অঙ্কশাস্ত্রে নূতন কিছু আবিষ্কার করে ফেলেন তাতেও আর আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না।

রামযাদু হাসিভরা মুখে বিনয় মাখিয়ে বললে—হ্যাঃ হ্যাঃ, আমি আর এমন কি লিখতে পেরেছি! গবেষণায় পরিশ্রমে ক্লান্ত মস্তিষ্ককে একটু অন্যমনস্ক করবার জন্য মাঝে মাঝে যে কবিতা রচনা করে থাকি তারই গোটা কয়েক এক জায়গায় করে বার করেছি।

—এবার আপনাকে আমরা আর দীর্ঘকাল নীরব হয়ে থাকতে দিচ্ছি নে। আপনাকে মাঝে মঝে মাসিক পত্রিকায় কবিতা দিতে হবে।

পরান-বাবু বললেন—আর আমাদের অনুরোধের অপেক্ষা থাকবে না। সম্পাদকেরা বাড়িতে চড়াও হয়ে আদায় করে নিয়ে যাবে!

রামযাদুর মুখ কৃতার্থতার হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

বাস্তবিক পরান-বাবুর কথাই সত্য হলো। রামযাদু সম্পাদকদের লিখিত ও বাচনিক তাগাদায় উদ্বাস্ত হয়ে ওঠবার উপক্রম হলো। এবং সে সত্যদাসের নূতন নূতন কবিতা তার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে নিজের নাম-ঠিকানা ছাপা কাগজে চিঠি লিখে সেই চিঠির সঙ্গে বিভিন্ন কাগজে পাঠাতে লাগলো। সকলের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে উঠলো যে রামযাদুই রাম শর্মা, এবং রামযাদুর সম্মুখে এই কথা উত্থাপিত হলে সে প্রতিবাদ তো করেই

না, বরং এমন ভাব দেখায় যে সে যে কথা লুকাতে চেয়েছিলো সেটা বড়োই স্পষ্ট রকমে ধরা পড়ে গেছে।

রামযাদুর সাহিত্যসাধনার কৃতিত্ব যতো সুখ্যাতি অর্জন করতে লাগলো, ততোই রামযাদুর কাছে নবীন ও সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারপ্রার্থী বহু সাহিত্যিক নিজেদের রচনা যাচাই করবার জন্য, রচনা কোনো সম্পাদকের নিকট সুপারিশ করে দেবার জন্য, রচনার পরিচয় স্বরূপ পুস্তকের ভূমিকা লিখে দেবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ নিয়ে আসা যাওয়া করতে লাগলো। রামযাদুর বাড়ি সাহিত্যসেবীদের তীর্থস্থান হয়ে উঠলো; কবি ঔপন্যাসিক ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক সমালোচক সকল প্রকারের সাহিত্যিক সকাল বিকাল রামযাদুর বৈঠকখানায় সমবেত হয়ে সাহিত্যের সকল বিভাগের আলোচনা করে, রামযাদুর অভিমত উৎসুক হয়ে শোনে। রামযাদুর কাছে যে-সব সাহিত্যযশপ্রার্থী নিজেদের রচনা দেখতে দিয়ে যায়, রামযাদু সেইগুলি পড়ে তার মধ্যে কোনো নূতন ভাব, সুন্দর আখ্যান বা নূতন তত্ত্ব পেলে সেগুলিকে লিখে রাখে এবং সেইগুলি সত্যদাসকে বলে কবিতায় বা নিজে গদ্যে লিখে নিজের নামে চটপট প্রকাশ করে।

একদিন একজন প্রৌঢ় বয়সের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রামবাবুর কাছে এসে বিনীতভাবে বললে—আমি তেরো বৎসর নিরন্তর অনুসন্ধান করে প্রাচীন বঙ্গের রীতিনীতি সম্বন্ধে এই বইখানি লিখেছি; ইতিহাস সাহিত্য ছড়া ব্রতকথা রূপকথা কিম্বদন্তী এ পর্যন্ত যেখানে যা কিছু লিখিত সংগৃহীত হয়েছে তা তো আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করেছি, আবার নিজেও জেলায় জেলায় ঘুরে অনেক নূতন তত্ত্ব সংগ্রহ করেছি। আমার অল্প কয়েক ঘর শিষ্য আছে; মাঝে মাঝে আমাকে বিভিন্ন জেলায় যেতে হয়; কাজেই আমার অনেক সুযোগ জুটেছে। বইখানি অনেক দিন থেকে লিখে রেখেছি কিন্তু অর্থাভাবে ছাপাতে পারি নি। কোনো পুস্তক প্রকাশকই এই বই পয়সা খরচ করে ছাপতে চায় না, বলে—উপন্যাস ছাড়া বাঙালি পাঠকপাঠিকারা আর কিছু পড়ে না। এখন আপনি যদি একটু সুপারিশ করে বলে দেন তা হলে আমার এতো দিনেব পরিশ্রম সার্থক হয় আর আমি আপনার কাছে চিরক্রীত হয়ে থাকি।

রামযাদু ব্রাহ্মণের সকল কথা মন দিয়ে শুনতে শুনতে তার খাতার পাতা উল্টে উল্টে দেখছিলো যে পুস্তকখানিতে কি আছে ও তার মূল্যই বা কি। সমস্ত কথা বলে ব্রাহ্মণ নিবৃত্ত হয়ে রামযাদুর অভিমত জানবার জন্য রামযাদুর মুখের দিকে উৎসুক আশান্বিত অনুনয়ের দৃষ্টিতে তাকালো।

রামযাদু ব্রাহ্মণকে নিরস্ত হতে দেখে খাতা থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলে—মশায়ের নাম?

—আজ্ঞে আমার নাম শ্রীবনমালী বিদ্যাবাগীশ, আমরা মুখোপাধ্যায়।

—আপনার নিবাস?

—এই ঝাঁপড়দা মাকড়দা।

রামযাদু বিদ্যাবাগীশের পুস্তকের হস্তলিপির পাতা পাল্টাতে পাল্টাতে বললে—আমি ঠিক এমনি একখানি বই লিখে ছাপতে দিয়েছি। ছাপা প্রায় হয়ে এসেছে, আর দিন দশ পনেরোর মধ্যে বই বাজারে বেরিয়ে যাবে। তবে আপনি যদি ইচ্ছে করেন, তবে খাতা রেখে যেতে পারেন, আমি একবার পড়ে দেখবো; যদি কিছু নতুন বিবরণ থাকে তবে নিশ্চয় সুপারিশ করে দেবো।

বিদ্যাবাগীশ আনন্দিত হয়ে বললে—তেরো বৎসরের কঠিন পরিশ্রম যে বিষয়ে করেছি, তাতে কিছু হয়তো নূতন তত্ত্ব থাকতে পারে।

রামযাদু পরম গম্ভীর ভাবে বিজ্ঞের মতন মুখ করে বললে—হ্যাঁ, দেখছি তো, আপনি যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। নিশ্চয় আপনার কিছু নূতনত্ব আছেই। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো যাতে আপনার এই বই প্রকাশিত হয়। কোনো প্রকাশক প্রকাশের ভার না নিতে চাইলে আমি নিজে খরচ দিয়ে ছাপিয়ে দেবো।

বিদ্যাবাগীশ খুশি হয়ে বললে—ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণো গতিঃ! তাতে আবার আমরা সাহিত্যের একই ক্ষেত্রের সমকর্মী। আপনার সহৃদয় সাহায্য যে পাবোই তা আমি জানতাম।

রামযাদু বললে—আপনি দিন পনেরো পরে আসবেন, আমি এর মধ্যে পড়ে রাখবো। আমার হাতে এতো কাজ যে অবকাশ পাই না; একটু বিলম্ব হবে; ক্ষমা করবেন।

বিদ্যাবাগীশ রামযাদুর সৌজন্যে ও বিনয়ে তুষ্ট হয়ে বললে—যে বই প্রকাশের জন্য তেরো বসর অপেক্ষা করে আছি তার কাছে পনেরো দিন তো কিছুই নয়। তবে আপনার শেষ অভিমত জানবার আগ্রহে আমাব কাছে এক পক্ষ এক কল্পের তুল্যই দীর্ঘ মনে হবে। আচ্ছা, আজ তবে আসি, আপনার বহুমূল্য সময়ের আর অপব্যয় করবো না।

বিদ্যাবাগীশ রামযাদুকে নমস্কার করে চলে গেলো।

রামযাদু তৎক্ষণাৎ খাতার উপরের পাতাটা ছিঁড়ে ফেলে দিলে, সেখানে বনমালী বিদ্যাবাগীশের নাম লেখা ছিলো। তার পর একবার খাতায় আদ্যোপান্ত তাড়াতাড়ি উল্টে দেখে নিলে আর কোথাও বিদ্যাবাগীশের নাম লেখা আছে কি না। যখন দেখ্‌লে যে আর কোথাও নেই, তখন সে চারজন লোক ভাড়া কবে নিয়ে এলো এবং তাদের বললে—এই বইখানা আমি তেরো বচ্ছর পরিশ্রম করে উপাদান সংগ্রহের পর লিখে শেষ করেছি। এখন ছাপতে দোবো। প্রেসে যদি কপি হারিয়ে ফেলে তবেই সর্বনাশ! একটা নকল করে দিতে হবে। খাতাখানা চার পাঁচ ভাগ করে চার পাঁচ জনে নকল করলেই চট্‌ করে হয়ে যাবে।

এই বলে রামযাদু খাতাখানা ছ খণ্ড করে ফেললে এবং ভাড়া-করা চারজন লেখক, সত্যদাস ও নিজে মিলে এক দিনেই বইখানা নকল করে নিলে। তার পর দপ্তরিকে দিয়ে খাতাখানা বাঁধিয়ে আবাব সম্পূর্ণ করে রেখে দিলে।

রামযাদু কুড়িটা প্রেসে পুস্তকের কুড়িটা পরিচ্ছেদ ভাগ করে ছাপতে দিলে। এবং প্রেসের নির্দিষ্ট মজুরির দ্বিগুণ দিয়ে ১০ দিনেই বই ছেপে দপ্তরিকে দিয়ে বাঁধিয়ে বাহির করে ফেললে এবং বিদ্যাবাগীশের আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

পনেরো দিন পরে বিদ্যাবাগীশ ফিরে এলে রামযাদু বললে—আমার বইএর সঙ্গে আপনার বইয়ের বিশেষ কিছু পার্থক্য দেখলাম না। কাজেই আমি দুঃখিত হচ্ছি আপনাকে কিছু সাহায্য করতে পারছি না। এই আমার বই বেরিয়েছে। একখানা আপনি নিয়ে যান। আপনার খাতাখানা আমার ছেলে ছিঁড়ে ফেলেছিল। আমি বাঁধিয়ে দিয়েছি; কিছু মনে করবেন না।

বিদ্যাবাগীশ ক্ষুণ্নমনে চলে গেলো, এবং সে কৌতূহলী হয়ে রামযাদুর বই পড়তে আরম্ভ করে দেখলে রামযাদুর বই হুবহু তাব খাতার নকল এবং রামযাদুর বইয়ে পত্রাঙ্ক নেই।

খবরের কাগজে রামযাদুর নূতন বইয়ের যশ বিঘোষিত হতে লাগলো।

রামযাদু কয়েক দিন পরে খবর পেলে যে সেই বনমালী বিদ্যাবাগীশ পাগল হয়ে গেছে। এতে রামযাদুর আনন্দটা একটু বিষাদে ও ভয়ে দমে গেলো।

ভাই-ফোঁটার দিন। বামযাদু সকাল বেলা পরান-বাবুর বাড়িতে এসে ঢুকতেই দেখলে কৃষ্ণকলি থাকোহরির হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দেখেই রামযাদু হাসিমুখে কৃষ্ণকলিকে বললে—কি গো কৃষ্ণকলি, তোমার থাকোদাদাকে ভাই-ফোঁটা দিয়েছো?

কৃষ্ণকলি লজ্জা পেযে মুখ নামিয়ে চোখ বাঁকিয়ে বলে—ধ্যৎ! বরকে কি কেউ ভাই-ফোঁটা দেয়?

রামযাদুর দৃষ্টির সামনে থেকে যেন একটা পর্দা উঠে গেলো, অনেক অনির্ণীত সমস্যার মীমাংসা এক নিমেষে হয়ে গেলো। সে এখন স্পষ্ট বুঝতে পাবলে যে পরান বাবু কেন থাকোহরিকে এমন জামাই-আদরে প্রতিপালন করছেন। কৃষ্ণকলি অতি কদর্য রকমের কুৎসিত মেয়ে; তার ভাগ্যে সৎপাত্র জোটানো কুবেরেরও অসাধ্য; অর্থলোলুপ কোনো যুবা কাঞ্চন-কল্প-লতিকার পুষ্প-বৃষ্টির লোভে এই কালো ভোমরার সঙ্গ সহ্য করবে কেবল ততোক্ষণই যতোক্ষণ পুষ্প সঞ্চয়ে তার নিজের কোঁচড় পরিপূর্ণ হয়ে না উঠছে। রামযাদুর মনে পড়লো রবি-বাবুর শেষরক্ষা নাটকের বাগবাজারের চৌধুরিদের কাদম্বিনীর কথা; আহা বেচারি রূপহীনা বলে সে এমনই ভাগ্যহীনা যে তাকে নিয়ে অপর সবার প্রতি দরদী কবিও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের নিষ্ঠুর কৌতুক করতে দ্বিধা বোধ কবেন নি; যে কবি কাব্যে উপেক্ষিতা বলে ঊর্মিলার দুঃখের প্রতি অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ কবেছেন, তিনিও সেই কাদম্বিনীর প্রতি একটু সহানুভূতি কোথাও দেখান নি; অর্থ-গৃধ্নু ললিত যে কাদম্বিনীকে বিয়ে করে তাকে ফেলে রেখে তার টাকা নিয়ে বিলাতে পলায়ন কবলে, এতোবড়ো নির্মম ব্যবহারটা কবি পরম কৌতুকের মধ্যে ডুবিয়ে লোক-চক্ষুর অগোচরেই রেখে দিয়েছেন। এই রকম কোনো একটা দুর্ঘটনা পাছে ঘটে এই ভয়েই বোধ হয় পরান-বাবু থাকোহরির সঙ্গেই নিজের একমাত্র কন্যার বিবাহ দেবার সঙ্কল্প করেছেন; থাকোহরি দেখতে সুশ্রী, স্বভাব-চরিত্রও ভালো; থাকোহরি দুনিয়ায় নিরাশ্রয় হয়ে যখন চতুর্দিক অন্ধকার দেখছিলো তখন পরান-বাব কেবল তাকে আশ্রয়ই দেন নি, ধনীর আত্মীয়তা দিয়ে তাকে সুখে স্বচ্ছন্দে রেখেছেন; থাকোহরি এই উপকার লাভের কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে উপকারকের কন্যা কৃষ্ণকলিকেও যত্ন মমতা

দেখাবে এবং বহুকাল এই ভাবে একত্র থাকার ফলে থাকোহরির মন থেকে কৃষ্ণকলির কদর্যতার প্রতি ঘৃণা অনেকখানি লোপ পেয়ে যাবে; অবশেষে থাকোহরির সঙ্গে কৃষ্ণকলির বিবাহের প্রস্তাব করলে থাকোহরি আপত্তি করতে পারবে না, এবং বিবাহ হয়ে গেলেও তার অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটবে না বলে সে নিজের কুৎসিত স্ত্রী লাভের দুর্ভাগ্য সম্বন্ধেও সচেতন হবে না; সে দিব্য আরামে ঘর-জামাই হয়ে কৃষ্ণকলিকে নিয়েই ঘর-কন্না করবে।

এই সব কথা মনের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যেতেই রামযাদু মনে মনে বলে উঠলো—উঃ! বেটা কেওটের কী কূটবুদ্ধি! পাক্কা ধড়িবাজ! চাণক্য-পণ্ডিতের চেলা। আমার চোখেও এতোদিন ধুলো দিয়ে রেখেছে, ঘুণাক্ষরে মৎলবটা ফাঁস করে নি! আচ্ছা, এইবার দেখা যাবে।

রামযাদু এই রকম ভাবতে ভাবতে পরান-বাবুর ঘরে গিয়ে উপনীত হলো। পরান-বাবু ঘরে তখন একলা বসে ছিলেন।

পরান-বাবু রামযাদুকে ঘরে আসতে দেখেই বললেন—এই যে মুখুজ্জে মশায়! প্রণাম হই। আপনার নতুন বইখানার তো খুব সুখ্যাতি হয়েছে। ওটাকে এইবার ইংরেজি করে ডক্টরেটের থিসিস সাবমিট করুন।

রামযাদু উপবেশন করতে করতে বললে—হ্যাঁ, আমিও ঐ কথাই ভাবছিলাম। তা আপনি যদি অনুমতি করেন তো চেষ্টা করে দেখি।

পরান-বাবু খুশি হয়ে বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এতে আবার আমার অনুমতি কি?

বামযাদু এ প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে বললে—আপনাকে আমি অনেকদিন থেকে একটা কথা বলবো বলবো মনে করছি, বলবার সুযোগ আর পাই নি; আজ আপনাকে একলা পেয়েছি, যদি অনুমতি করেন তো বলে ফেলি...

বামযাদু হাস্যমুখে অপেক্ষমাণ দৃষ্টিতে পরান-বাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

পরান-বাবু কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে বললেন—কি বললেন স্বচ্ছন্দে বলুন।

রামযাদু যেন পরের উপকারের জন্য অ..রোধ করছে এমনি ভাবে বলতে লাগলো—আমি আপনাকে থাকোহরির কথা বলছিলাম...

রামযাদু যে নিজের জন্য কিছু বলছে না, এবং থাকোহরির কোনো কথা বলতে যাচ্ছে, এতে পবান-বাবু বিস্মিত ও উৎসুক হয়ে বললেন—হ্যাঁ, কি বলবেন বলুন. .

রামযাদু বললে—ছেলেটি বড়ো খাসা...

পবান-বাবুর মনের মধ্যে একটু আশঙ্কা উঁকি মারছিলো, হয় তো বামযাদু থাকোহরির কোনো দোষের কথাই বা উত্থাপন করতে যাচ্ছে; কিন্তু তাঁর আশঙ্কা অমূলক প্রতিপন্ন হয়ে যাওয়া মাত্র তিনি উৎফুল্ল হয়ে বললেন—হ্যাঁ, ছেলেটি সত্যিই খাসা!

রামযাদু বলে যেতে লাগলো আমি কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছি থাকোহবি আমাদের কৃষ্ণকলিকে খুব ভালোবাসে, আর কৃষ্ণকলিও থাকোহরির খুব নেওটো হয়েছে!...

পরান-বাবুর ক্ষুদ্র চক্ষুর দৃষ্টি উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো, মুখ আনন্দে বিকশিত হয়ে উঠলো।

রামযাদু বলতে লাগলো—কৃষ্ণকলির সঙ্গে থাকোর বিয়ে হলে বেশ হয়; থাকো ঘর-জামাই হয়েই থাকে, তা হলে আমাদের মা-লক্ষ্মীকে আর আমাদের কাছ-ছাড়া করতে হয় না...

পরান-বাবু উৎফুল্ল মুখে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কি মনে করেন মুখুজ্জে মশায় যে এই ব্যবস্থা করলে উত্তম হবে?

রামযাদু গম্ভীরভাবে বললে—আমার তো মনে হয় এর চেয়ে উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা আর কিছু হতে পারে না।

পরান-বাবু খুশি হয়ে বললেন—তবে আপনাকে আমাদের মনের কথাটাও খুলে বলি মুখুজ্জে মশায়,—আমরাও এই রকম সঙ্কল্প মনে মনে এঁচে রেখেছি। এবার কাশীতে গিয়ে বড়ো বড়ো জ্যোতিষীদের দিয়ে ওদের দুজনের কোষ্ঠী বিচার ও গণনা করিয়ে দেখেছি; সবাই বলেছেন এ বিবাহ হলে রাজযোটক হবে। কেবল একজন জ্যোতিষী বলেছেন যে এ বিবাহ হলে ভালোই হবে বটে, কিন্তু কৃষ্ণকলির পতিযোগ এতোই উৎকৃষ্ট যে থাকোহরির চেয়েও গুণান্বিত কোনো পাত্রের সঙ্গেই কৃষ্ণকলির বিবাহ হওয়া সম্ভব। সেইজন্যে আমরা আর বছর কতক অপেক্ষা করে দেখবো, ভবিতব্য কি হয়। ওরা দুজনেই এখন তো ছেলেমানুষ। তিন চার বছর অপেক্ষা করা স্বচ্ছন্দেই চলবে। কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে যে সঙ্কল্প উদয় হয়েছিলো, আপনার মনেও যখন সেইটিরই সমর্থন হচ্ছে, তখন আমাদের মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হবে বুঝতে পারছি। এখন প্রজাপতি আর ভবিতব্যতার আশীর্বাদ!

রামযাদু বললে—যার সঙ্গেই বিয়ে হোক কৃষ্ণকলি যে সৎ পতি লাভ করবে তাতে আর সন্দেহ নেই। আমরা কোষ্ঠী দেখতে না জানলেও এ তো জানি যে পিতৃমাতৃপুণ্যের জোরে সন্তান সর্বথা মঙ্গলাস্পদ হয়।

পরান-বাবু পরিতুষ্ট হয়ে বললেন—সে আপনাদের দশ জনের আশীর্বাদ ও অনুগ্রহের উপরই নির্ভর করছে।

এমন সময় ঘরের পাশের কাঠের সিঁড়িতে মানুষ ওঠার ধপধপ পদশব্দ শোনা গেলো। রামযাদু লোক-সমাগমের সম্ভাবনা দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আমি এখন আসি। আমাদের দশজনের জ্বালায় আপনার আর আরাম বিশ্রাম করবার জো নেই।

পরান-বাবু সন্তুষ্ট হয়ে প্রফুল্লমুখে বললেন—আপনাদের অনুগ্রহে এই আমার পরম সৌভাগ্য।

পরান-বাবুর ঘরে কয়েকজন লোক এসে প্রবেশ করতে লাগলো। রামযাদু সমাগতদের সমবেত ভাবে একটি নমস্কারে অভিনন্দিত করে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলো। সমাগত লোকেদের দৃষ্টি তখন পরান-বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে উৎসুক ও হস্ত দুটি তাঁর দর্শন লাভ করা মাত্র নমস্কার করবার উদ্‌যোগে যুক্ত হয়ে ছিলো, তাই রামযাদুর প্রস্থান ও নমস্কার কেউ বা লক্ষ্য করলে আর কেউ বা লক্ষ্য করবার অবকাশ পেলে না। যদিও তারা জানে যে রামযাদু পরান-বাবুর কৃপাপাত্র, সুতরাং তাকে তুষ্ট রাখাতেও তাদের স্বার্থ আছে, তথাপি

প্রধান দেবতা ও তাঁর বাহনের মধ্যে কার পূজা আগে করবে স্থির করতে পারবার আগেই রামযাদু ঘর থেকে বাহির হয়ে গেলো।

রামযাদু নিচে নেমে গিয়েই দেখলে যে থাকোহরি কৃষ্ণকলির হরিণ ছানাকে ঘাস খাওয়াচ্ছে, কিন্তু এখন আর তার কাছে কৃষ্ণকলি নেই। থাকোহরিকে দেখেই রামযাদু হাসিমুখে বলে উঠলো—বেশ বাবাজি বেশ, লাভ মি অ্যাণ্ড লাভ মাই ডগ!

থাকোহরি মুখ ফিরিয়ে রামযাদুকে দেখেই লজ্জাকুণ্ঠিত ভাবে হাসলে এবং হাতের ঘাস ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে রামযাদুর দিকে ফিরে দাঁড়ালো।

রামযাদু থাকোহরির কাছে এসে তার কাঁধে হাত রেখে কণ্ঠস্বরে আদর মাখিয়ে বললে—তোমাকে বল্‌বো না মনে করেছিলাম বাবাজি। কিন্তু দেখছি কৃষ্ণকলি পর্যন্ত যখন জানতে পেরেছে, তখন তোমারও জানতে বাকি নেই...আর আজ কৃষ্ণকলি তো তোমার সামনেই তোমাকে বর বলে পরিচয় দিয়ে গেলো, যদি বা কথাটা তোমার অগোচর ছিলো তবে তো আজই তা জানা হয়ে গেলো। এখন তোমাকে বলতে আর বাধা নেই...আমিই কর্তাকে প্রথমে এই কথা বলি যে "থাকোহরি তো আপনাদের স্বজাত আর ছেলেটিও দেখতে শুনতে স্বভাব-চরিত্রে খুব ভালো, ওর সঙ্গে আমাদের কৃষ্ণকলির বিয়ে দিলে বেশ হয়। তাতে কর্তা বললেন—"থাকোহরির অবস্থা তেমন ভালো নয়, বংশ-পরিচয়ও..."তাতে আমি তাঁর কথায় বাধা দিয়ে বললাম—"থাকোহরির যেমন রূপ গুণ তাতে সে সদ্‌বংশজাত না হয়ে যায় না; আর তা যদি নাই হয়, তাতেই বা কি? কয়লার খনিতে হীরক পাওয়া গেলে সেই হীরকের সমাদর তো কয়লার দরে হয় না? দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মদায়ত্ত পৌরুষম্—কর্ণের এই বাক্য একটি মহৎবাক্য! আর থাকোহরির অবস্থা ভালো নাই বা হলো? আপনার অগাধ সম্পত্তি থেকে আপনার কন্যাকে তো আপনি বঞ্চিত করতে যাচ্ছেন না? আর থাকোহরি যখন আপনাব কৃপা লাভ করেছে, তখন সে নিজেও যথেষ্ট রোজগার করতে পারবে।" এইসব কথা শুনে কর্তা একটু চুপ করে থেকে ভেবে চিন্তে বললেন—"হ্যাঁ তা বটে, কিন্তু আমার মেয়ে কালো কুচ্ছিত, তাকে যদি থাকোহরির পছন্দ না হয়..." এতে আমি বললাম—"মানুষের বাহিরটাই কি সব? অমর বঙ্কিমচন্দ্র কি দেখিয়ে যান নি যে ভ্রমরের কাছে শত রোহিণী তুচ্ছ? তা ছাড়া থাকোহরিব মনের কৃতজ্ঞতা তার চোখে যে প্রীতিব অঞ্জন মাখিয়ে দেবে তাতে জগতের সকল সুন্দরী কৃষ্ণকলির মাধুর্যের কাছে পরাজিত হয়ে যাবে!" আমার এই কথা শুনে কর্তা অনেকক্ষণ ভেবে শেষে নিম্‌রাজি হয়ে বললেন—"আচ্ছা, কিছুদিন ভেবে চিন্তে দেখি আর থাকোহরি আর কৃষ্ণকলির মনের ভাবটাও কিছুকাল লক্ষ্য করে দেখি, তারপর আপনার পরামর্শমতো যা হয় কিছু করা যাবে।" আজকে কৃষ্ণকলির কথা শুনে এই কথাটা আমার মনে পড়ে গেলো; আজ আবার কর্তাব কাছে কথাটা তুলোছিলাম; তিনি বললেন, "আরও দু-চার বছর লক্ষ্য করে দেখি।" তা দেখো বাবাজি, এই অতুল সম্পত্তি যদি লাভ করতে চাও তবে কৃষ্ণকলিকে খুব ভালো বাসবে আর খুব শান্ত শিষ্ট হয়ে কর্তা-গিন্নির মন জুগিয়ে চলবে। আমি তোমার জন্যে কুবেরের ভাণ্ডারের দরজা খুলে দিয়েছি, এখন তুমি দখল করতে পারলেই হয়।

থাকোহরি রামযাদুর বানানো উপন্যাস সত্য বলে বিশ্বাস করে রামযাদুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় অবনত হয়ে তার পায়ের ধুলো নিয়ে বললে—আমার সমস্ত শুভাদৃষ্টের মূল আপনি। আপনার শ্রীচরণের আশীর্বাদ থাকলে আমার কর্তব্যের কিছু ত্রুটি হবে না।

রামযাদু নিজের বুদ্ধির কৌশল ও থাকোহরির ভক্তিশ্রদ্ধা দেখে খুশি হয়ে বললে—বেশ বাবাজি বেশ! আমি তোমাকে সদা-সর্বদাই সৎপরামর্শ দেবো।

রামযাদু কলকাতায় এসে অবধি পরান-বাবুর বাড়িতেই পরান-বাবুর গোরুর খাঁটি দুধ দই ক্ষীর মাখন ছানা সর খেয়ে সপরিবাবে দিব্য আরামে আছে, কিন্তু নিশ্চিন্ত হয়ে নেই। রামযাদুর সদাই মনের মধ্যে ভয়-ভয় করে কখন বুঝি বা পরান-বাবু বাড়িটা ছেড়ে দিতে বলেন বা ভাড়াই চেয়ে বসেন, আর কখন বা গোরুটাই ফিরে চান। এইজন্য সে আজকাল পরান-বাবুকে পরিতুষ্ট রাখবার জন্য বিধিমতো চেষ্টা করে।

একদিন গভীর রাত্রে রামযাদু সপরিবারে থিয়েটার দেখে বাসায় ফিরছিলো। পরান-বাবুর বাড়ির কাছাকাছি এসে তার উর্বর মস্তিষ্কে হঠাৎ একটা সুবুদ্ধি গজিয়ে উঠলো; সে গাড়োয়ানকে বললে—দেখ, তোকে আট আনা পয়সা বেশি দেবো তুই এই গলির ভিতর দিয়ে একটু ঘুরে চল...এক জায়গায় একজনের সঙ্গে দেখা করে যাবো...

গাড়োয়ানদের স্বভাবসিদ্ধ আপত্তি অমনি রুক্ষ স্বরে বিঘোষিত হলো—না বাবু, কতো দেরি করবেন, আট আনায় হবে না...

রামযাদু মোলায়েম সুরেই বললে—না রে বাপু, বেশি দেরি হবে না, বড়ো জোর পনেরো মিনিট। বেশি দেরি হয় তো বেশিই দেবো, তার আর কথা কি?

গাড়ি গলির মধ্যে দিয়ে পরান-বাবুর বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

রামযাদুর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলে—এতো রাত্রে কর্তার বাড়িতে কি করতে এলে?

রামযাদু বললে—বাড়িখানা যাতে ফিরিয়ে না চায় তার একটা চেষ্টা করা উচিত তো?

এ সম্বন্ধে রামযাদুর সহধর্মিণীর কিছুমাত্র মতানৈক্য ছিলো না। তবে সে বুঝতে পারলে না যে রাত তিনটের সময় তার স্বামীর সেই সাধু চেষ্টা কি উপায়ে সম্পন্ন হবে। সে ফলেন পরিচীয়তে নীতি অবলম্বন করে মৌন হয়ে রইলো। তাদের ছেলেমেয়েগুলো সব গাড়িতে ঘুমিয়ে পড়েছে।

রামযাদু গাড়ি থেকে নেমে পরান-বাবুর বাড়ির দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দিতে দিতে মহা চিৎকার করে ডাকাডাকি সুরু করে দিলে—দরোয়ানজি, এ দরোয়ানজি! ওরে বোঁচা! রাইচরণ!...থাকোহরি!...সরকার মশায়!...

তার শোরগোলে বাড়ি শুদ্ধ লোক সচকিত হয়ে জেগে উঠলো। ঘরে ঘরে ইলেকট্রিক লাইট জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রা বিড়জিত বিভিন্ন স্বরে প্রশ্ন হতে লাগলো—কৌন হায়? ..কে?...কি চাই???...

রামযাদু প্রশ্নের উত্তরে ব্যস্তসমস্ত ভাবে ডাকলে—দরোয়ানজি জলদি দরওয়াজা খোলো—হাম রামযাদু মুখুজ্জা মশা হ্যায়...

প্রকাণ্ড দরজার প্রকাণ্ড হুড়কা হড়াত করে খুলে গেলো এবং দরোয়ান চাকর সরকার প্রভৃতি চার পাঁচ জনে উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—ক্যা মুখুজ্জা মশা? ক্যা হুয়া? কি হয়েছে?...

রামযাদু ব্যগ্র স্বরে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলে—কর্তা ভালো আছেন তো?

সকলে রামযাদুর প্রশ্ন শুনে আশ্চর্য হয়ে বললে—হ্যাঁ, তিনি তো ভালোই আছেন!

রামযাদু পরম স্বস্তি অনুভবের ভান করে নিঃস্বাস ফেলে বললে—আঃ! বাঁচা গেলো! এতোক্ষণে ধড়ে প্রাণ এলো!...

সকলে রামযাদুর কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে অবাক হয়ে রামযাদুর মুখের দিকে চেয়ে যখন আশা করছে যে রামযাদু হয় তো রহস্যটা আর একটু পরিষ্কার করে তুলবে তখন দোতলা থেকে পরান-বাবু গম্ভীর গলায় প্রশ্ন শোনা গেলো—বেচা, কী হয়েছে রে? মুখুজ্জে মশায়ের গলা শুনছি যেন?

রামযাদুর ডাক-হাঁক শুনে থাকোহরিও ঘুম থেকে জেগে উঠে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলো: সে পরান-বাবুর প্রশ্ন শুনে বললে—হ্যাঁ, মুখুজ্জে মশায়ই এসেছেন।

পরান-বাবু আবার প্রশ্ন কবলেন—কেন? বাড়িতে কারো অসুখ-বিসুখ হয় নি তো?

বামযাদু পরান-বাবুর কথা শুনেই বলে উঠলো—আঃ! প্রাণটা জুড়োলো!...কী দুর্ভাবনাই হয়েছিলো!...

পরান-বাবু প্রশ্ন করাব সঙ্গে সঙ্গে থাকোহরির উত্তর না পেয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে নিচে নেমে এলেন; থাকোহরি অনুক্ষণ অপেক্ষা করছিলো যে এইবার হয তো রামযাদু তার অসাময়িক আগমনেব কারণ ব্যক্ত করে বলবে; তাই সে অবাক হয়ে রামযাদুব মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিলো, সে পরান-বাবুকে কিছুই জবাব দিতে পারছিলো না।

পরান-বাবু নিচে এসেই ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—কী হয়েছে মুখুজ্জে মশায়? বাড়ির সব ভালো তো?

রামযাদু আবার আবামের নিঃশ্বাস ফেলে বললে—যাক দুর্ভাবনা ঘুচলো! বাঁচা গেলো! ধড়ে প্রাণ এলো!...

সমবেত লোকেরা রামযাদুর মুখে কেবল এই একই কথাব পুনরাবৃত্তি শুনতে শুনতে হাঁপিযে উঠ্‌ছিলো, এবং বামযাদুর দুর্ভাবনাটা যে কিসের তা জানবার জন্যে সকলেই ব্যস্ত ও ব্যগ্র হযে উঠেছিলো।

পরান-বাবুও উৎসুক স্ববে জিজ্ঞাসা করলেন—কিসের দুর্ভাবনা মুখুজ্জে মশায়? ব্যাপার কি?

রামযাদু বললে—আমার স্ত্রী ঘুমের ঘোরে হঠাৎ কেঁদে উঠলেন। আমি তাঁকে জাগিয়ে জিজ্ঞাসা কবলাম—"কি স্বপ্ন দেখে কেঁদে উঠলে?" জেগে উঠেও তিনি হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগলেন, কান্না আর থামে না, কথাও বলতে পারেন না। অনেক সান্ত্বনা দেওয়ার পর তিনি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন—"আমি কর্তার অমঙ্গল স্বপ্নে দেখেছি।" আমি তাঁকে অনেক করে বোঝালাম যে আমি তো রাত্তিরে কর্তার বাড়ি থেকে এসেছি, তাঁকে

ভালো দেখে এসেছি; কিন্তু তিনি কিছুতেই প্রবোধ মানতে চান না। তখন আমি অগত্যা বললাম, আচ্ছা, তুমি স্থির হয়ে থাকো, আমি গিয়ে কর্তার খবর নিয়ে আসছি। কিন্তু তিনি এ কথাতেও ধৈর্য মানলেন না, বললেন—আমিও তোমার সঙ্গে যাবো; তুমি যাবে, ফিরে আসবে, অতোক্ষণ দেরি আমি সহ্য করতে পারবো না। তখন গাড়ি ডেকে তাঁকে শুদ্ধ নিয়ে এলাম, ছেলে-মেয়ে-গুলো সঙ্গ ছাড়লে না!

পরান-বাবু খুশির হাসিতে প্রকাণ্ড বাড়ি ভরিয়ে দিয়ে বললেন—আচ্ছা পাগল তো আপনারা! এতো রাত্রে বৌমাও বুঝি কচি-কাচা কাচ্চা-বাচ্চা সবাইকে নিয়ে এসেছেন? তিনি গাড়িতে বসে আছেন! যান যান বাড়ি যান, ছেলেগুলোর রাত জাগলে হিম-টিম লেগে অসুখ-বিসুখ করতে পারে।

রামযাদু বল্‌লে—না না, আমাদের তো ঘুম ভেঙেই ছিলো; না এলে তো দুর্ভাবনায় সমস্ত রাত্রি ঘুমই হতো না। তবে অসময়ে এসে যে আপনাদের জ্বালাতন করে গেলাম এই এখন আমার মনস্তাপ হচ্ছে।

পরান-বাবু খুশি হয়ে বললেন—না না, আমার ওঠবার তো সময় হয়েই এসেছিলো। ...যান, আর বিলম্ব করবেন না।

রামযাদু বললে—হ্যাঁ যাই, গিন্নি আবার সত্যনারাণের শিন্নি, সুবচনীর পুজো, কালীঘাটের কালীর কাছে কালোধলো পাঁঠা আর মা-কালীর জিব সমান উঁচু চিনির নৈবিদ্যি দিয়ে পুজো মানত করেছেন, তার আয়োজন করতে হবে...

পরান-বাবু পরম পরিতুষ্ট হয়ে বললেন—দুজনেই আপনারা সমান খ্যাপা দেখছি। থাকো, তোমার মায়ের কাছ থেকে একশো টাকা এনে মুখুজ্জে মশায়কে দাও তো—আমার জন্যে ওঁর সুখদণ্ড হয়ে কেন?

রামযাদু দন্ত বিকশিত করে বললে—তা টাকা দেবেন দিন, আপনার দৌলতেই তো আমরা খেয়ে পরে বেঁচেবর্তে আছি...অতো বড়ো একটা বাড়িই অমনি পেয়ে গেছি... গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা হবে...

থাকোহরি ছুটে মাতঙ্গিনীর কাছে গিয়ে এক শো টাকা এনে রামযাদুকে দিলে। রামযাদু খুশি হয়ে বললে—তবে এখন আসি।

পরান-বাবু হাসিমুখে বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, আর বিলম্ব করবেন না। কাল আপনার বাড়ির সঙ্গে টেলিফোন কনেকশন করিয়ে দেবো, তা হলে আর রাত দুপুরে গাড়িভাড়া করে ছেলেপুলেদের সুদ্ধ টেনে নিয়ে আসতে হবে না।

পরান-বাবুর কথাটা বামযাদুর কানে ব্যঙ্গের মতন শোনালো; সে কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়ে হ্যা হ্যা করে হাসতে হাসতে এসে গাড়িতে উঠলো।

গাড়ি চড়ে কিছুদূর এলে রামযাদু নিজের সহধর্মিণীকে বললে—শুনেছো তো সব? ক্যায়সা বুদ্ধির কৌশল খাটিয়ে বেটা কেওটকে বোকা বানিয়ে দিয়ে এসেছি! বাড়িটা আর ফিরে চাইতে পারবে না।

মনোমোহিনী স্বামীর কথা শুনে কেবল বললে—"হুঁ!" সে স্বামীর সহধর্মিণী হলেও

স্বামীর এই মিথ্যাচার ও প্রবঞ্চনার কৌশলে সুখী হবে বা দুঃখিত হবে স্থির করে উঠতে পারছিলো না।

পরদিন হতে রামযাদুর বাড়িতে শান্তি স্বস্ত্যয়নের ধুম লেগে গেলো—অবশ্য পরান বাবুর টাকায়, কিন্তু পরান-বাবুর মঙ্গল কামনায় নয়, পরান-বাবুর বাড়িটি যাতে নির্বিঘ্নে করায়ত্ত হয় এই কামনায়। আর রামযাদুর বাড়ি থেকে পরান-বাবুর বাড়িতে রোজই পূজার প্রসাদ আসে—আজ সত্য-নারায়ণের শিন্নি, কাল সুবচনীর আটভাজা আর কলা, পরশু কালীর প্রসাদ কবন্ধ কালো পাঁঠা আর সের খানেক চিনি! যদিও কালী লোল রসনা পর্যন্ত উঁচু চিনির পাহাড়ের নৈবেদ্য পান নি—কারণ রামযাদু মিষ্ট বাক্য যতটা বাজে খরচ করতে প্রস্তুত, রজতমুদ্রা বাজে খরচ করতে তার সিকি পরিমাণও প্রস্তুত ছিলো না।

এর কয়েক দিন পরে পরান-বাবুর আপিসের সমস্ত ভারতবাসী কর্মচারী—বাঙালি উড়িয়া পশ্চিমা মহারাষ্ট্রী মাদ্রাজি গুজরাটি—সকালবেলা একসঙ্গে পবান-বাবুর বাড়িতে এসে উপস্থিত। তাদের কারো হাতে ফুল, কারো হাতে চন্দন, কারো হাতে ধূপ, কারো হাতে ধুনা, কারো হাত শঙ্খ, কারো হাতে ঘণ্টা, আর রামযাদুর হাতে চামর! তাদের দেখেই পরান-বাবু চমৎকৃত হয়ে আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠতে উঠতে বললেন—এ কি? ব্যাপার কি?

রামযাদু হাস্যমুখে বললে—আজ আপনার জন্মদিন।

পরান-বাবু পরম পরিতুষ্ট হয়ে উচ্চহাস্যে ঘর ভরে তুলে বলে উঠলেন—ওহো! তা এখন আমাকে কি করতে হবে?

রামযাদু বললে—এখন আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করতে হবে।

পরান-বাবু বললেন—এ সমস্তই মুখুজ্জে মশায়ের অদ্ভুত খেয়াল বোধ হচ্ছে?

রামযাদু বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, মহাপুরুষ পূজার প্রধান পুরোহিত আমিই বটে।

পরান-বাবু হাসিভবা প্রসন্ন মুখে মিষ্ট স্বরে বললেন—এ আপনার ভারি অন্যায় মুখুজ্জে মশায়! এ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি!

রামযাদু পূজার আয়োজন করতে করতে বল্‌লে—ভক্তের অত্যাচার ভগবানকে নিত্য কালই সহ্য করতে হয়।

পরান-বাবু আবার সন্তোষেব হাসি হাসলেন।

দেখতে দেখতে ঘরের মাঝখানকার চেয়ার টেবিল সরে জায়গা সাফ হয়ে গেলো। সেখানে পাতা হলো নূতন আসন ও সম্মুখে সজ্জিত হলো পূজোপকরণ। একজোড়া নূতন গরদের জোড়ও বাহির হলো এবং পরান-বাবুকে সেই জোড় পরিয়ে চন্দনচর্চিত ও মাল্যভূষিত করে শঙ্খ ঘণ্টা নিনাদিত হতে লাগলো। তৎপর ভারতবর্ষের সকল ভাষায় রচিত প্রশস্তি পাঠের ধুম লেগে গেলো। পরান-বাবু সেই সব অবোধ্য বন্দনা হাস্যমুখেই শুনতে লাগলেন।

অনুষ্ঠান শেষ হলে সকলকেই পরান-বাবুর বাড়িতে প্রচুর রূপে মিষ্টমুখ করে যেতে হলো।

দেবতারা এইবার রামযাদুর ঘুষ সত্য-সত্যই খেলেন। একদিন বিকাল-বেলা পরান-বাবুর মোটর-গাড়ি এসে রামযাদুর বাড়ির সামনে থামলো আর অমনি রামযাদুর ছেলে বনমালী বোঁ করে ছুটে এসে পিতার দৃষ্টান্তে শিক্ষা পেয়ে হাত জোড় করে পরান-বাবুকে বিনীত স্বরে বললে—বাবা তো বাড়ি নেই।

পরান-বাবু হাসিমুখে গাড়ি থেকে নামতে নামতে বললেন—তা জানি রে জানি, সেইজন্যেই তো এখন এসেছি। যা তোর মাকে বল গে যে জেঠামশায় এসেছে...

পরান-বাবু বৈঠকখানা-ঘরে গিয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়ালেন; মনোমোহিনী এসে দরজার আড়ালে দাঁড়ালো; বনমালী এসে বললে—মা এসেছেন...

পরান-বাবু বললেন—দেখো বৌমা, আমি এই বাড়িটার দান-পত্র রেজেস্টারি করে দিতে এসেছি; মুখুজ্জে মশায়কে দিতে গেলে তিনি হয়তো শূদ্রের দান নিতে আপত্তি করতেন, তাই আমি দলিলখানা তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি, এ বাড়ি আমি ছেলেদের দিলাম; আর গোরুটাও তোমার বাড়িতেই থাক, খোকারা দুধ খাবে।

মনোমোহিনী চাপা গলায় পরান বাবুব শ্রুতিগম্য স্বরে বললে—বুনো তুই কর্তাকে বল, আমার তো তাঁবই আশ্রিত, আমাদের যা অভাব হবে তা তাঁকেই পূর্ণ করতে হবে।

পরান-বাবু হো হো কবে হাসতে হাসতে ঘর থেকে বেবিয়ে এসে মোটরে উঠলেন।

রামযাদু বাড়িতে এসে পত্নীর কাছ থেকে দলিল পেয়ে খুশিতে এক মুখ হেসে বললে—বেটা কেওটকে আচ্ছা ভোগা দিযেছি।

কিন্তু মহাব্রাহ্মণ বামযাদুর মনে কেওটেব দান গ্রহণে এতোটুকু আপত্তিও উদয় হলো না।

রামযাদুর আপিসের সকল কর্মচাবী বামযাদুর লাভেব সংবাদে মুখে হর্ষপ্রকাশ করলেও মনে মনে ও পরস্পবে চুপি চুপি বলতে লাগলো—পূজো করলাম আমরা সকলে আব দেবতার বর মিললো একা রামযাদুর ভাগ্যে! আমবা শুধু লেংড়া আম আর মিষ্টান্ন খেয়েই বিদায়!

কিন্তু সকলের মনেই আশা জেগে রইলো যে এই পূজার ফল তারাও কোনো না কোনো আকাবে কিছু না কিছু পাবে। কিন্তু বামযাদুর লাভেব সমতুল্য যে হবে না এটা নিশ্চিত জেনে তাবা রামযাদুর সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হযে বইলো।

রামযাদু বাড়িটি কায়েমি ভাবে লাভ করেই আরও অধিক লাভ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো। সে স্থির করলে শহরের বাইরে কোথাও অল্প ভাড়ায় একটা বাড়ি নিয়ে পবানবাবুর দেওয়া বাড়িটা বেশি টাকায় ভাড়া দিয়ে কিছু আয়ের উপায় করে নেবে। কিন্তু তার চিন্তা হলো কোন্ ছলে সে এই বাড়ি ছেড়ে শহরেব বাইরে যাবে; পবানবাবু তাকে বাড়ি দান করেছেন সপবিবাবে বাস করবার জন্য; এখন যদি সে সেই বাড়ি ভাড়া দিয়ে অন্যত্র যেতে চায় তবে তিনি কি মনে করবেন? পরানবাবুর কাছে চক্ষুলজ্জা রামযাদুকে একটু বিব্রত কবে তুললো। কিন্তু তার উর্বব মস্তিষ্ক অল্প ক্ষণেই একটা ফিকির আবিষ্কাব করলে— সে যদি পবানবাবুকে বলে যে শহবেব গোলমালের মধ্যে তার গবেষণা আর

সাহিত্য রচনা যথোপযুক্ত রকমে হতে পারছে না, তা হলে তিনিই হয় তো শহরতলির কোথাও তার বাসের সুবন্দোবস্ত করে দেবেন। কিন্তু অন্যত্র যাওয়ার জন্য কেবল এই ওজরটি তার যথেষ্ট মনে হলো না। সে আবার উন্মনা হয়ে বলবত্তর কোনো কারণ অনুসন্ধানে নিজের চিন্তা ও চিত্তকে নিযুক্ত করলে।

একদিন আপিস থেকে বাড়ি ফিরবার পথে সে দেখলে একটি ছোটো ছেলে কেঁদে কেঁদে পথে বেরিয়ে বেড়াচ্ছে। ছোটো ছেলেটির উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি আর ব্যাকুল ক্রন্দন দেখে রামযাদুর চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠলো, সে তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে স্নেহভরা কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—তোমার কি হয়েছে বাবা?

ছোটো ছেলেটি কান্নার ফাঁকে ফাঁকে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে যা বললে তা জোড়া-তাড়া দিয়ে রামযাদু এই বুঝতে পারলে যে ছেলেটির মা গঙ্গাসাগরে তীর্থ করতে গিয়েছিলো, সেখানেই তার মৃত্যু হয়েছে; তীর্থযাত্রী লোকেরা দয়া করে তাকে কলকাতায় ফিরিয়ে এনে পথে ছেড়ে দিয়ে বলেছে যাও ভিক্ষে করে খাও। বালক ভিক্ষা করতেও জানে না, আর নিরাশ্রয় হয়ে লোকারণ্যে হারিয়ে গিয়েছে বলে ভয় পেয়ে কাঁদছে। তাদের বাড়ি নিশ্চিন্তপুর, তারা সেখান থেকে অনেকখানি পথ হেঁটে রেলে উঠে কলকাতায় এসেছিলো; এর বেশি খবর আর সে কিছু দিতে পারলে না; সেই নিশ্চিন্তপুর যে কোন্ জেলায় বা কোন্ থানা বা পোস্ট অফিসের অন্তর্গত তা সেই বালক জানে না। রামযাদু ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করে করে জানলে—তার মা আর সে একখানা কুঁড়ে ঘরে থাকতো, তার মা ধান ভানতো, তাদের আর কেউ নেই; তারা কি জাত সে তা জানে না।

রামযাদুর পরদুঃখকাতর চিত্ত বালকের কাহিনি শুনে ব্যথিত হয়ে উঠলো, তার চোখ ছলছল করতে লাগলো, সে করুণার্দ্র স্বরে বললে—চলো বাবা তুমি আমার সঙ্গে; কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখবো কেউ যদি তোমার আপনার লোক সাড়া দেয় তার কাছে পাঠিয়ে দেবো, নইলে...

—অনাথ-আশ্রমে পাঠিয়ে দেবেন।" রোরুদ্যমান বালক ও রামযাদুকে ঘিরে যে জনতা জমেছিলো সেই জনতার মধ্যে থেকে একজন পরামর্শ দিলে।

রামযাদুর মনের উপর দিয়ে বিদ্যুৎ-চমকের মতন এই কথাটা ঝলক মেরে গেলো, তার মনের অনেকখানি স্থান এক মুহূর্তে আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো, রামযাদু মনে মনে বললে—অনাথ-আশ্রম আমিই খুলবো আর এই উপলক্ষ্য করেই আমি শহর ছেড়ে বাইরে যেতে পারবো।

রামযাদুর অশ্রুপূর্ণ চক্ষুর দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, সে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ছেলেটির হাত ধরে স্নিগ্ধ স্বরে বললে—এসো বাবা, আমার সঙ্গে এসো...

রামযাদু সন্ধ্যার পর পরান-বাবুর বাড়িতে গেলো এবং কথায় কথায় অনাথ নিরাশ্রয় বালককে আশ্রয় দেওয়ার কথা জানিয়ে অবশেষে বললে—আমি যখন ছেলেটিকে বললাম যে চলো বাবা এখন আপাতত আমার বাড়িতেই থাকবে, তার পর কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে তোমার আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজ করে তোমাকে তাদের কাছে পাঠিয়ে দেবো, তখন কোথা

থেকে এই আকাশ-ভাষণ ভেসে এলো—এই বালককে নিয়ে তুমি একটি অনাথ-আশ্রম খোলো! আমি চমকে উঠলাম; কে এ কথা বললে দেখবো মনে করলাম, কিন্তু স্থির করতে পারলাম না সেই কথা কোন দিক থেকে উচ্চারিত হয়েছে; মনে হতে লাগলো যেন সমস্ত আকাশ ভরে চারিদিক থেকেই সেই কথার ধ্বনি ভেসে আসছে; তখন আমার মনে হলো—এ দৈববাণী! এই সম্ভাবনা মনে উদয় হবা মাত্র দেখলাম কারা পূজা করবে বলে অন্নপূর্ণার প্রতিমা কিনে নিয়ে আসছে—মাতা জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণা ভিখারি শিবকে অন্ন দান করছেন। আমার গায়ে রোমাঞ্চ হলো...এখনও ঐ কথা স্মরণ করতে আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে...

পরানবাবু ভাব-বিহ্বল কণ্ঠে বললেন—

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী সর্বভূতেষু দয়া-রূপেন সংস্থিতা॥

সেই মহামায়া জগদম্বা দয়া রূপে আপনার হৃদয়ে নিত্য বসতি করছেন; আপনি দেবানুগৃহীত মহৎ ব্যক্তি এর পরিচয় আমি বার বার পেয়ে আসছি। শিবানীর যে দৈববাণী আপনি শুনেছেন সেই আদেশ আপনি পালন করুন, জগতের কল্যাণ-ব্রতে প্রবৃত্ত হলে আপনার কোনো অভাব হবে না।

রামযাদু পরান-বাবুর ভাবোচ্ছ্বাস শুনে সুযোগ পেয়ে বললে—তাই আমি মনে করেছি কলকাতার বাড়িটা ভাড়া দিয়ে শহরের বাইরে একটা পুকুর-বাগান-ওয়ালা বাড়ি ভাড়া নেবো; তাতে কিছু টাকা লাভ হবে, আর তাই দিয়ে এখনকার মতন অনাথ-আশ্রমের খরচ চলে যাবে; আর পুকুরের মাছ আর বাগানের ফল-ফুলুরি তরি-তরকারি পেলে অনাথদের ভরণ-পোষণেরও অনেকটা আনুকূল্য হবে।

পরান-বাবু রামযাদুর প্রস্তাব শুনে আনন্দিত হয়ে বললেন—সাধু সঙ্কল্প! আপনি সেই রকম একটা বাড়ি খোঁজ করুন, আমিও লোক লাগিয়ে খোঁজ করবো। সব ঠিক হয়ে যাবে মুখুজ্জে মশায়, আপনি কিছু ভাববেন না, মা অন্নপূর্ণা সব অভাব পূর্ণ করে দেবেন।

রামযাদু বুঝতে পারলে যে পরানবাবুর ঐ কথার অর্থ কি; তাই সে হাসিমুখে বললে—আপনি যখন আশ্বাস দিচ্ছেন তখন আর আমার ভাবনা কি? জয়ো স্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দনঃ!

*   *   *

অতি শীঘ্রই কলিকাতার উপকণ্ঠ বালিগঞ্জে রেলওয়ে স্টেশনের-নিকটেই একটি বাগান-পুষ্করিণী-সংলগ্ন দ্বিতল বাড়ি অল্প ভাড়ায় পাওয়া গেলো। রামযাদু কলকাতার বাড়ি ভাড়া দিয়ে সেই নূতন ভাড়াটে বাড়িতে বাস করতে গেলো; এতে মাসে তার পঞ্চাশ টাকা আয় বৃদ্ধি হলো।

রামযাদু একখানা এনামেল-করা লোহার পাটায় বড়ো বড়ো অক্ষরে বাড়ির নাম লেখালে অন্নপূর্ণা অনাথ-আশ্রম, এবং সেখানাকে সাইন-বোর্ডের মতন বাড়ির সামনে লটকে দিলে।

তার পর সে কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে কেউ কোথাও কোনো অনাথ ছেলে-মেয়ের সন্ধান পেলে যেন অনুগ্রহ করে তার আশ্রমে পাঠিয়ে দেন।

রামযাদুর এই আত্মত্যাগমূলক পরোপকার-ব্রতের সংবাদ সত্বর সারা বঙ্গদেশে ছড়িয়ে পড়লো; সংবাদপত্রে তার প্রশংসা বিঘোষিত হতে লাগলো।

আপিসের সাহেবেরা এই সংবাদ পাঠ কবে রামযাদুকে ডেকে খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং রামযাদুর সৎ প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করলেন। তাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বললেন—আপনি সাধারণের কাছে অর্থ-সাহায্যের জন্যে একটা বিজ্ঞাপন দেন; আমরা আপিস থেকে সকলে কিছু কিছু দিয়ে চাঁদা আদায়ের সূত্রপাত করে দেবো।

এই কথা বলে বড়ো সাহেব বললেন—আমাদের আপিস আপনার আশ্রমকে হাজার টাকা দেবে, আর আমি নিজে দেবো পাঁচ শো টাকা।

ছোটো সাহেব বললেন—আমি দেবো আড়াই শো টাকা।

পরান-বাবু সেখানে উৎফুল্ল-মুখে বসে সাহেবদের কথা শুনছিলেন; তিনিও বললেন—আমি দেবো দু শো টাকা; আর থাকোহরি দেবে পঞ্চাশ টাকা।

রামযাদুর মুখ অপ্রত্যাশিত লাভে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো—একেবারে থোক দু হাজাব টাকা হাতে হাতে লাভ! এর টানে আবার কতো হাজার এসে পড়বে তার নির্ণয় কে করবে?

রামযাদু সাহেবদের বিনীত ধন্যবাদ জানিয়ে বললে—সে তাব মুনিবদের সাহায্য ও পরামর্শ বরাবার পাবার আশাতেই এই দুরূহ ব্রত গ্রহণ কবেছে।

রামযাদু ও পরান-বাবু সাহেবদের ঘর থেকে বেবিয়ে এলো। বাইরে এসে পরান-বাবু হাসিমুখে রামযাদুকে বললেন—আমার এই চাঁদাটা প্রথম কিস্তি: ছোটো সাহেবের চেয়ে আমি তো বেশি দিতে পারি না, তাই ঐ অল্প পবিমাণই বলতে হলো...

রামযাদুও খুশিতে হেসে বললে—তা আমি জানি...আপনার ভরসাতেই তো আমাব এতোবড়ো কাজে হাত দিতে সাহস হয়েছে।

পবান-বাবু আপিসের সকলকে ডেকে সাহেবদের চাঁদা দেওয়ার কথা বললেন এবং সকলকে যথেচ্ছা দান করতে সাহেবদের অনুবোধ জানালেন।

সাহেবদের অনুরোধ পরান-বাবু মুখে ব্যক্ত ও সমর্থিত হওয়ার মানেই হুকুম। সকলে বিনা বাক্য ব্যয়ে চাঁদার তালিকায নিজেদেব দেয় অর্থের অঙ্কপাত করতে লাগলো. দেখতে দেখতে আপিস থেকে আরও সহস্রাধিক টাকা উঠে গেলো।

এই চাঁদা আদায়ের তালিকা সমেত সাহায্যের আবেদন যখন কাগজে কাগজে বাহির হলো তখন চারিদিক্ থেকে অনাথ বালক-বালিকা ও অজস্র অর্থ অন্ন বস্ত্র আমদানি হতে লাগলো।

রামযাদু দেখলে এ এক মন্দ ব্যবসায় নয়। অনাথদের দৌলতে তার নিজেব ছেলেদেরও জামা কাপড় কিনতে হয় না; বদান্য দাতারা অনাথদের খাদ্য-সামগ্রী উপহাব দিলে সেই ভোজ থেকে তারাও বঞ্চিত হয় না; রামযাদুর বাড়িতে নূতন কম্বল বিছানা চাদব এতো জমে যায় যে সে তাও মাঝে মাঝে বেচে ফেলে দু পয়সা আয় করে নেয়। তাই এখন

তার মুখে অনাথদের অপার দুঃখ ও তা মোচনের জন্য প্রার্থনা ছাড়া আর অন্য কথা বড়ো একটা শোনা যায় না। এতে অনাথদের সুবিধা যতো হোক না হোক তার নিজের সুবিধা বিলক্ষণ হচ্ছিলো। তবে তার প্রতি ঈর্ষান্বিত কোনো কোনো লোক অপ্রকাশ্যে তাকে 'অর্ফ্যান্ দি গ্রেট্' বলে বিদ্রূপ করতেও ত্রুটি করতো না। রামযাদু সে-সব বিদ্রূপ শুনেও শোনে না।

রামযাদুর হাতে অনাথ-আশ্রমের আকর্ষণে এতো টাকা এসে জম্‌লো যে সে যে-বাড়িটাতে অনাথ-আশ্রম করেছিলো সেই বাড়িটা কিনে ফেললে; কিন্তু অনাথ-আশ্রমের নামে নয়, নিজেরই নামে।

রামযাদুর এই পরোপকারক প্রতিষ্ঠানের জন্য সকল সমাজে তার বিশেষ প্রতিষ্ঠা। গভর্মেন্ট কর্মচারীরা, আপিসের সাহেবেবা ও সাধারণ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা সকলেই তাকে বিশেষ খাতির করে। এক বৎসর পরেই সম্রাটের জন্মদিনে রামযাদু রায় বাহাদুর খেতাবে সম্মানিত হলো। রামযাদু এখন সকল সভা-সমিতিতে গণ্যমান্য অভ্যাগতের আসন সহজেই অধিকার করে বসে।

একদিন সকাল বেলা রামযাদু ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে পাড়ার সকলকে খবর দিতে বেড়াতে লাগলো, যে, কাল রাত্রে মা অন্নপূর্ণা আমাকে স্বপ্ন দিয়েছেন যে তিনি অষ্টধাতুর প্রতিমা রূপে আমার বাড়ির পুষ্করিণীর ঈশান কোণে আবির্ভূত হয়েছেন. তাঁকে উদ্ধার করে বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আপনারা সকলে আসুন...যদি স্বপ্ন অমূলক চিন্তা মাত্র না হয় তা হলে মায়ের আবির্ভাব স্বচক্ষে দেখবেন।

দেখতে দেখতে এই সংবাদ বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গেলো; কাতারে কাতারে লোক এসে রামযাদুর বাগানে মেলা জমিয়ে তুললে।

পুষ্করিণীর ঈশান কোণে পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করিয়ে রামযাদুকে অন্নপূর্ণার পূজা হোম পুনশ্চরণ করালে। তার পরে বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় পূজা সাঙ্গ করে রামযাদু প্রতিমা উদ্ধার করতে জলে নামলো। অনাথ বালক-বালিকারা কাঁসি ঘণ্টা শঙ্খ বাজিয়ে লোকের কানে তালা লাগিয়ে দিতে লাগলো। অন্নপূর্ণা পূজাব উপলক্ষে ঢাক ঢোল কাঁসি বাজনাও আনানো হয়েছিলো, তার বাজনদারেরাও উন্মত্তের মতন ঢাক ঢোল কাঁসি পিটিয়ে পিটিয়ে যেন ভেঙে ফেলবার উপক্রম করেছে।

রামযাদু ডুবের পর ডুব পাড়ছে; সে একবাব ডুব দিচ্ছে, আর যতক্ষণ দম জলের তলে ডুবে থেকে মাটি হাতড়ে হাতড়ে জল ঘুলিযে ফেলছে, তার পর নিষ্ফল হয়ে উঠে করুণ কাতর স্বরে চিৎকার করছে—মা! মা! করুণাময়ী! দয়া করো মা!...

রামযাদু এক-একবার উঠছে আর তার চোখে মুখে নিরাশার ভাব ফুটে উঠছে। সমবেত লোকেরা প্রত্যেক বারই আশা করছে এইবার হয় তো দেবীর আবির্ভাব হবে। রামযাদু দু-দুবাব ডুবেও যখন কিছু তুলতে পারলে না, তখন সবাই বলাবলি করতে লাগলো বাব বার তিন বার! তিনবার না চেষ্টা করলে কি ত্র্যম্বক-গৃহিণী ত্রিগুণাত্মিকা ত্রিনয়না মহামায়ার দর্শন মিলবে? কিন্তু তৃতীয় বাবেও যখন রামযাদু শূন্য হাতে উঠলো তখন সকলে বললে—

পাঁচবারের বার পঞ্চানন-পত্নীর আবির্ভাব হতে পারে। পাঁচ বার ডুবেও যখন রামযাদু কিছু তুলতে পারলে না, তখন অর্ধেক লোক হতাশ হয়ে পড়লো, সিকি ভাগ লোক ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতে লাগলো—মা অন্নপূর্ণা ওঁকে স্বপ্ন দিয়েছেন! এমন কী সুকৃতি করেছেন উনি যে জগদম্বা যেচে ওঁর ঘরে আসবেন?...

কেউ কেউ বললে—কিছু বলা যায় না রে ভাই, লোকটার যে রকম পাতা চাপা কপাল, মায়ের কৃপা না হলে কি এতো অল্প দিনে এমন বাড়বাড়ন্ত হয়!

একজন বিজ্ঞ বললে—ষড়ানন-জননী ষষ্ঠ বারে নিশ্চয় উঠবেন।

রামযাদু ষষ্ঠ ডুবও নিষ্ফল হলো।

তখন সকলের মনই হতাশ হয়ে গেলো। কিন্তু রামযাদু তারস্বরে চিৎকার করে উঠলো—জগদম্বা, আমি ডুবে ডুবে মরে যাবো তাও স্বীকার, কিন্তু তোকে না নিয়ে আমি উঠবো না...স্বপ্নে যখন দেখা দিয়ে আদেশ করেছিস তখন তোকে ধরাই দিতে হবে পাষাণী!

রামযাদুর বক্তৃতায় বিশ্বাসী ভক্তদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো, কারো কারো চোখে জলও দেখা দিলো।

সাত বারের বার। রামযাদু মা মা করে ডাকতে ডাকতে ডুব মারলে। অনেকক্ষণ জল নিস্তব্ধ অচঞ্চল হয়ে রইলো; সকলে নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে রামযাদুর উত্থানের অপেক্ষায় জলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রইলো। খানিক পরে জলের উপর ভুড়ভুড়ি উঠতে লাগলো, ক্রমে সেই ভুড়ভুড়ি কলসিতে জল ভরার সময় কলসির অভ্যন্তরের বাতাস নির্গমনের মতন জলের উপর ভড়াক ভড়াক শব্দ করে উথলে উথলে উঠলো; তার পরই রামযাদু জল ছেড়ে কাতলা মাছের আকাল দেওয়ার মতন লাফিয়ে উঠলো এবং হাত উঁচু করে তুলে মুখ বেয়ে জলধারা পতনের বাধা ঠেলে চিৎকার করে উঠলো—পেয়েছি! পেয়েছি! মা ধরা দিয়েছেন! মা জগদম্বা করুণাময়ী!...

রামযাদুর কথা ঢাক ঢোল কাঁসি, কাঁসর ঘণ্টা শঙ্খ ও সহস্র কণ্ঠের মা মা শব্দের মহা কলরোলের মধ্যে ডুবে গেলো। সমস্ত জনতা যেন উন্মত্ত তাণ্ডব নৃত্য করতে করতে চিৎকার করতে লাগলো। রামযাদুও এক ছুটে জল থেকে ডাঙায় উঠে অন্নপূর্ণা-প্রতিমা দুই হাতে ধরে মাথায় রেখে ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করে দিলে। সকল লোকে সবিস্ময়ে দেখলে একখানি ক্ষুদ্র সিংহবাহিনী দেবীমূর্তি! সকলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করতে আরম্ভ করলে!

রামযাদু যখন শ্রান্ত হয়ে হাঁপিয়ে পড়লো তখন সে নৃত্য থেকে নিবৃত্ত হয়ে চিৎকার করে বললে—এই বার মা জগদম্বার প্রতিষ্ঠা অভিষেক পূজা হবে; তার পর বলি আর ভোগ হবে। যাঁরা দয়া করে আমার সামান্য কুটিরে পদার্পণ করেছেন তাঁরা সকলে রাত্রে এসে মায়ের প্রসাদ পেয়ে যাবেন, আমি সকলকে নিমন্ত্রণ করছি।

সকল লোকে রামযাদুর ভক্তির জোর ও কপালের জোর সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগলো। কেবল দু চার জন কলেজের ছেলে অবিশ্বাসের হাসি হেসে বললে—আগে

থাকতে একটা প্রতিমা জলে ডুবিয়ে রেখে তুলতে আমরাও পারি। বেটার আগাগোড়া সব ভড়ং আর বুজরুগি!

রামযাদুর দেবী লাভের সংবাদ শীঘ্রই সারা কলকাতা-ময় ছড়িয়ে পড়লো। শত শত লোক গাড়িতে মোটরে হেঁটে দেবী দর্শন করতে আসতে লাগলো। প্রণামী দক্ষিণা পড়তে পড়তে প্রতিমার সামনে টাকা আর মোহরের পাহাড় হয়ে উঠলো। ওঙ্কারমল জেঠিয়া এক গাড়ি ঘি ময়দা চিনি দেবীর ভোগের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে; রামভজ ঝুনঝুনওয়ালা এক গাড়ি অত্যুত্তম আতপ চাল পাঠিয়েছে। পাঁঠা তরি-তরকারি মাছ ডাল কোথা থেকে কে যে পাঠাচ্ছে তার আর হিসাবই রাখা গেলো না। শিউবখশ হালুওয়াই এক গাড়ি মিষ্টান্ন পাঠিয়েছে।

রামযাদু এই সব সামগ্রী সমাগত দেখেই পঞ্চাশ জন হালুইকর ব্রাহ্মণ আনিয়ে নিলে এবং বাগানের মধ্যে বড়ো বড়ো জোল কেটে পাচকদের ভোগ রাঁধতে লাগিয়ে দিলে। রাত আটটার মধ্যে ভোগ হয়ে গেলো এবং পাড়াপড়শি সকলে মিলে সাহায্য করে হাজার হাজার লোককে পরিতোষ করে আহার করিয়ে বিদায় দিতে লাগলো। রাত একটার পর সকলকে বিদায় দিয়ে রামযাদু একটু বিশ্রামের অবসর পেলে; তখন সে মুচকি হেসে সহধর্মিণীকে বললে—যদি জোটে রোজ এমনি বিনি পয়সার ভোজ!

মনোমোহিনী স্বামীর আহারের ঠাঁই করতে করতে বললে—আজ সমস্ত দিন তো পেটে অন্ন জুটলো না, এখন খেতে বোসো।

রামযাদু খেতে বসতে বসতে হেসে বললে, এক দিন উপোস করে চিরদিনের খোরাকের জোগাড় করে নিলাম রে পাগলি!

স্বামীভক্তিতে মনোমোহিনীর মন পূর্ণ হয়ে উঠলো।

এর পর দেনা-পাওনা সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলতে হলেই রামযাদু বলে—"আমি তো কিছু জানি না, সে মা অন্নপূর্ণা জানেন!" দিতে হলে অন্নপূর্ণা কম দিতে বলেন এবং পেতে হলে অন্নপূর্ণা বেশি নিতে বলেন।

রামযাদুর কলকাতার বাড়ির ভাড়াটে উঠে গেছে; আবার বাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। একজন ভদ্রলোক সেই বাড়ির ভাড়া ঠিক কবতে এসে রামযাদুকে বললে—মশায়, আপনার বাড়িটি...

রামযাদু অমনি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললে—আমার বাড়ি নয়, মা অন্নদার বাড়ি...

ভদ্রলোক মনে মনে বললে—মা অন্নদা কেবল অন্নই দেন না, তিনি বাড়ি-দাত্রী বটে!

তার পর সে প্রকাশ্যে বললে—তা যাঁরই বাড়ি হোক, ভাড়ার কথা-বার্তা তো আপনার সঙ্গেই কইতে হবে? আমরা পাপী লোক, মা অন্নদার দেখা তো আমরা পাবো না যে তাঁর সঙ্গে কথা বলবো?

রামযাদু হেসে বিনয় প্রকাশ করে বললে— হেঁ হেঁঃ হেঁ, আমি মায়ের সেবক হুকুম-বরদার মাত্র!

—তা যাই হোন, ঐ বাড়িটির ভাড়া কতো?

—হেঁ হেঁঃ হেঁ, আজ্ঞে মা বলেছেন—একশো এক টাকা নিতে।

—আমি ঐ বাড়ি বাড়িতে বিশ পঁচিশ ত্রিশ বছর থাকবো, যতো দিন না মরে যাচ্ছি; স্থায়ী ভাড়াটের কাছে কিছু কম নেওয়া উচিত; আমি আশি টাকা করে দেবো...

—ভাড়ার কথা আমি তো কিছু জানি না, সে মা অন্নপূর্ণা জানেন। তিনি আমার মনে এই চিন্তা উদয় করে দিয়েছিলেন যে এক শো এক টাকা হলেই আমার পূজা ভোগ বেশ সুশৃঙ্খলায় হবে; তাই আমি সেই পরিমাণ ভাড়ার কথাই বললাম। তা আপনি যদি কিছু কম দিতে চান দিন, তাতে আমার কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নেই, মায়ের পূজা ভোগ একটু কম হবে।

রামযাদুব এ কথার পর সে ভদ্রলোক আর ভাড়া কম করবার কথা মুখেও আনতে পারলে না: সে কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে বাস করবে, দেব-পূজার বিঘ্ন ঘটিয়ে সে দেবতার বিরাগভাজন হতে যাবে এতো বড়ো সাহস তার নেই; সে তাই তৎক্ষণাৎ বললে—না, না, আমি মায়ের পূজার ত্রুটি ঘটাতে চাই না; বাড়িখানি আমাদের পছন্দ হয়েছে, আমরা মায়ের পূজার জন্য একশো এক টাকা করেই মাসে মাসে দেবো।

রামযাদু নিজের স্থির-করা ভাড়াতেই একজন স্থায়ী ভাড়াটে পেয়ে খুশি হয়ে বললে—মায়ের বরে আপনার খুব বাড়-বাড়ন্ত হবে, ধুলোমুঠো ধরলে সোনামুঠো হবে। আর একটি কথা আছে, মায়ের আর একটি আদেশ আছে, প্রত্যেক মাসের ভাড়া সেই মাসের পয়লা আগাম দিয়ে দিতে হবে, নইলে তাঁর ভোগ-পূজা চলা দুষ্কর হবে, আমি তো ছা-পোষা মানুষ সামান্য মাইনে পাই...

ভদ্রলোক বললে—সে আর বেশি কথা কি? মাসের শেষে দেওয়াও যা আর মাসের গোড়ায় দেওয়াও তাই। আমি সঙ্গে টাকা এনেছি। এ মাসেব টাকাটা দিয়ে যাচ্ছি। একটা রসিদ দেবেন কি?

রামযাদু আরো খুশি হয়ে বললে—অবিশ্যি, রসিদ দেবো বৈ কি।

রামযাদু কাগজ কলম নিয়ে যখন বাড়ি ভাড়ার বসিদ লিখতে প্রবৃত্ত হলো, তখন সেই ভদ্রলোক পকেট থেকে মনিব্যাগ বাহির করে ও তার ভিতর থেকে এক গোছা নোট বাহির করে দশখানি নোট গুনে নিতে লাগলো। রামযাদু রসিদ লিখে দিলে—

শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণা মাতা সহায়

কস্য রসিদপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে—

আমার বলিয়া লোক-সমাজে পরিচিত রামরতন পালিত স্ট্রিটস্থ ১৭বি নম্বর বাটী আমি মাতা অন্নপূর্ণা দেবীর সেবানুকূল্যের জন্য শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে মাসিক এক শত এক (১০১) টাকা হারে ভাড়া দিয়া তাহার এপ্রেল মাসের ভাড়া অগ্রিম বুঝিয়া পাইয়া এই রসিদ লিখিয়া দিলাম। ইতি—

এই সময় বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফেল হলো, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল অচল হলো, মেডিক্যাল-কলেজের তহবিল-তছরুপাত ধরা পড়লো, আর এমনি আরও কয়েকটা প্রবঞ্চনার ব্যাপার আদালত পর্যন্ত গড়ালো। যখন সমস্ত বাংলা দেশ এই সব ব্যাপার

আলোচনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তখন একদিন রামযাদু অতি ধীর ভাবে থাকোহরিকে নির্জনে ডেকে নিয়ে বললে—দেখো বাপু থাকোহরি, ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক বঙ্গলক্ষ্মী কটন-মিল আর মেডিক্যাল-কলেজের মকদ্দমার বিবরণ কাগজে পড়ছো তো? তুমি কিন্তু খুব হুঁশিয়ার! তোমার হাত দিয়ে অনেক টাকার লেনা-দেনা হয়; তুমি ইচ্ছে করলে এই রকম করে কিছু টাকা মেরে নিয়ে স্বচ্ছন্দেই য়ুরোপে কি আমেরিকায় বা জাপানে সরে পড়তে পারো; পুলিস হাত বাড়াতে না বাড়াতে পগার পার হয়ে যাওয়া কঠিন নয়। তাই তোমায় বলছি বাপু তৃতীয় রিপুটিকে বশে রেখো।

থাকোহরি হেসে বললে—আপনার আশীর্বাদে আমার কোনো অভাব নেই; আমি কর্তার কাছে নেমকহারামি করতে পারবো না।

রামযাদু খুশি প্রকাশ করে থাকোহরির কাঁধ চাপড়ে বললে—এই তো চাই ভায়া! বেশ, বেশ!...

রামযাদু থাকোহরিকে কখনো ভাই, কখনো বাপু, বাবাজি বলে, তার সম্পর্ক ও সম্বোধনের স্থিরতা নেই। সে বলতে লাগলো—কিন্তু এও তো তোমার মনে হতে পারে আপিসের টাকা তো আর কর্তার নয়, ইংরেজের; ইংরেজরা আমাদের দেশ শুষে লুটে খাচ্ছে, তাদের লুটের ধনে খাবল মার্‌লে চোরের উপর বাটপাড়ি হতে পারে কিন্তু পাপ হয় না। আরো তা ছাড়া, এও তো তোমার মনে হয় কখনো কখনো...আমার কাছে লুকিয়ো না ভায়া...যে, ঐ কালো কুচ্ছিত বিদিকিচ্ছি রক্ষাকালীর বাচ্চা মেয়েটাকে বিয়ে না করে একটি দিব্যি সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে বিয়ে করতে পারলে বেশ হতো! ঐ কালির বোতল মেয়েটাকে বিয়ে করবার কল্পনা করতে তোমার গা ঘিন-ঘিন করে কি না, একবার স্পষ্ট করো বলো তো?

থাকোহরি লজ্জিত মুখ নত করে নিরুত্তর হয়ে রইলো।

রামযাদু বলতে লাগলো—তবেই বাবাজি, ভেবে দেখো, এ প্রবৃত্তি হওয়া সম্ভব কি না, যে, কর্তা তো কিছুই দেখেন না, তহবিল আমার হাতে সঁপে নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন, এই অবসরে আমি যদি বেশি নয় লাখ খানেক টাকা হাতিয়ে জাপানে কি চিনে সরে পড়ি তা হলে সেখানে একটি মেয়ে বিয়ে করে সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে পাবি। চিনে মেয়ে খেঁদা বোঁচা কোটর-চোখী হলেও কৃষ্ণকলির চেয়ে তো লক্ষগুণে সুন্দরী!...

থাকোহরি গম্ভীর নতমুখে নিরুত্তর। রামযাদু তার মনে ভাবনাব আগুন ধবিযে দিয়েছে, তার মন পুড়তে শুরু করেছে।

রামযাদু থাকোহরির চিন্তাক্লিষ্ট মুখ দেখে খুশি হয়ে আবার তার কাঁধ চাপড়ে বললে—অতএব সাবধান বাবাজি! নাস্তি লোভাৎ পরো রিপু! লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু শাস্ত্রে বচন!

থাকোহরি মুখ তুলে একবাব রামযাদুর মুখের দিকে চাইলে, কিন্তু তার দৃষ্টি লক্ষ্য-হারা, মুখ বচনবিহীন। সে দুর্ভাবনায় ক্রমশ তলিয়ে চলেছে। সে কৃষ্ণকলিকে কোনো দিন সচেতন ভাবে ভাবি স্ত্রী রূপে ভেবে দেখে নি; নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতা হিতৈষী উপকারকের কন্যা বলে তাকে সে আদর যত্ন করেছে, অনেকটা খোশামোদের খাতির;

দু-একবার যখন তার মনে হয়েছে যে কৃষ্ণকলি তার স্ত্রী তখন সে সেটা নিয়তি-নির্দিষ্ট অনিবার্য অপ্রতিকার্য ভবিতব্য বলেই মেনে নিয়েছে; যেমন নিজের চেহারা বা পিতা-মাতার চেহারা বেছে নেবার উপায় নেই, বিধাতার বিধান মেনে নিতেই হয়, সেই রকম ভাবেই থাকোহরি কৃষ্ণকলিকে স্ত্রী রূপে অপ্রতিবাদে মেনে নিতে অভ্যস্ত হচ্ছিলো। কিন্তু আজ রামযাদু তার সেই মোহাবেশ হঠাৎ সরিয়ে তার চেতনা এনে দিলে; তার মনে হলো তাই তো, এই অসম্ভব কুৎসিতটাকে জীবনের অভিশাপের মতন চিরজীবন বহন করতে কেন যাই? নিজে রোজগার করছি, তাতেই তো স্বাধীন ঘরকন্না পেতে মনের মতন পাত্রী খুঁজে বিয়ে করতে পারি। ঐ অপূর্ব কুৎসিতকে চিরজীবন সহ্য করা অসম্ভব। এই দুর্বিপাক তো অনিবার্য নয়।

থাকোহরিকে চিন্তিত দেখে রামযাদু সন্তুষ্ট হয়ে বললে—চারিদিক বেশ করে ভেবে চিন্তে দেখো ভায়া, তোমার সামনে সোনার কাঠি রূপোর কাঠি দুই পড়ে রয়েছে—রাজকুমারীকে চেতনা দিয়ে তেপান্তর মাঠ পেরিয়ে পালাবে, না রাক্ষসের পুরীতে হতচেতন করেই রেখে যাবে! কিন্তু এ পথে বিপদ আছে—সাত শো রাক্ষসী পিছনে তাড়া করবে।

থাকোহরি নিরুত্তর। বামযাদু তার মুখের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে ধীর মন্থর পদে প্রস্থান করলো পরান-বাবুর ঘরের দিকে।

মানুষের যৌবনে রূপ-লিপ্সা অত্যন্ত প্রবল হয়, থাকোহরির নবযৌবনাবিষ্ট মনের সামনে কৃষ্ণকলিকে রামযাদু যে কুৎসিত রূপে উপস্থিত করে দিয়ে গেলো তাতে তার মন ঘৃণায় ও বিরাগে সঙ্কুচিত হয়ে উঠতে লাগলো। থাকোহরির মন দুর্ভাবনায় ভরে উঠলো, তাব কেবলই মনে হতে লাগলো সে কি উপায়ে এই বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে? সে নিজের জীবনটাকে একেবারে ঐ রক্ষাকালীর বাচ্চার কাছে বলি দিতে পারবে না, পারবে না, পারবে না, কিছুতেই পাববে না।

থাকোহবি যখন একা দাঁড়িয়ে তার অদৃষ্টের দৈবদুর্বিপাকেব কথা ভাবছে, এমন সময় কৃষ্ণকলি ছুটে সেইখানে এসে হাসতে হাসতে বললে—মাস্টার মশায়, আমার ইঁদুরের আর খরগোশের বাচ্চা হয়েছে...সাদা ধবধবে!...দেখবে এসো.

লোকে অন্ধকারে ভূত কল্পনা করে যেমন চমকে ওঠে, থাকোহরি কৃষ্ণকলিকে দেখে তেমনি চমকে উঠলো। ভয়ে ঘৃণায় তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। সে যেন আজ প্রথম কৃষ্ণকলির দিকে তার সম্পূর্ণ দৃষ্টি খুলে তাকিয়ে দেখলে—কী বীভৎস কুৎসিত সে! তার রং কালো খসখসে, তার কপাল নাক ঠোঁট সবই একই প্লেনে অবস্থিত। তার হাসিই বা কী ভয়ানক! হাসিতে তার মুখের হাঁ এতো বিস্তৃত হয় যেন এক কান থেকে আর এক কান পর্যন্ত চিরে গেছে; তার কালো ঠোঁটের প্রান্ত দুটো ধূসব, দাঁতের মাড়ি লাল টকটকে, হাসতে সমস্ত মাড়ি বেরিয়ে পড়ে; দেখে থাকোহরির মনে হল যেন দুখানা টিকেতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, তার খানিকটা পুড়ে ছাই হয়েছে, সেই ছাইযের কোলে আগুনের লাল আঁজি, তার পবেই কালো! এই দুর্দর্শন আতঙ্ক তার জীবনসঙ্গিনী হবে মনে করতেই থাকোহরির গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো।

কৃষ্ণকলি থাকোহরিকে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে অধীর হয়ে আবার ডাকলে—মাস্টার মশায়, দেখবে এসো না, কেমন সাদা ধবধবে বাচ্ছা!

থাকোহরির মনে হলো—ইঁদুর বেড়াল কুকুর খর্‌গোশ পশুদের বাচ্চাও সাদা ধবধবে হয়, আর এই না-মানুষ না-পশু মেয়েটাকে বিয়ে করলে এর বাচ্চা হবে কাকের ছানার চেয়েও কালো—কালো মিশ্‌মিশে, ঘুটঘুটে অন্ধকার, যাকে বলে কালীকৃষ্টি! সেই-সব ছেলে-মেয়েদের সে কি প্রাণ খুলে আদর করতে পারবে, না লোকালয়ে তাদের বা'র করতে পারবে? ঐসব সন্তানের পিতা বলে তাকে চিরজীবন লজ্জিত কুণ্ঠিত হয়ে থাকতে হবে না? আমরণ অবিবাহিত থেকে সে পরান-বাবুর ঋণের কাছে আত্ম-বলি দেবে, কিন্তু তার বেশি আর সে ক্ষতি স্বীকার করতে পারবে না। তার সৌন্দর্যজ্ঞান, পছন্দ ও রুচিকে লোকে যে ধিক্কার দেবে এ সে সহ্য করতে পারবে না। এমন স্ত্রীকে সে কি কখনো ভালো বাসতে পারবে, না তার কাছে তন্নিষ্ঠ হয়ে থাকতে পারবে? না—না—না—না! একটা বিরাট না'য়ের হাহাকারে থাকোহরির মন ভরে উঠলো।

থাকোহরি কৃষ্ণকলির আহ্বান উপেক্ষা কবে সেখান থেকে চলে গেলো। যেতে যেতে তার মনে হলো দ্বিজেন্দ্রলালের অমর গান—

"কালো রূপে মজেছে আমার মন!
ওগো সে যে মিশমিশে কালো,
সে যে ঘোরতর কালো—অতি নিরুপম!
কোকিল কালো, ভোম্‌রা কালো,
আমরা কালো, তোমরা কালো,
মুচি মিস্ত্রি ডোমরা কালো;—
কিন্তু জানো না কী কালো সেই কালো রঙ্‌—
ওগো সেই কালো রঙ!
অমাবস্যার নিশি কালো,
কালী কালো, মিশি কালো,
আর গদাধরের পিসি কালো;
কিন্তু তার চেয়েও কালো সে কালো বরণ—
ওগো, সে কালো বরণ!"

এই গানের পদ আদ্যন্ত মনে মনে আওড়াতেই থাকোহরির মুখের উপর একটা ঘৃণা-মিশ্র বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠলো।

কৃষ্ণকলি তার আহ্বান উপেক্ষা করে থাকোহরিকে চলে যেতে দেখে আশ্চর্য হলো, এবং ক্ষণকাল অবাক হয়ে থাকোহরির চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো; তার পর সে বিড় বিড় করে নিজেকেই বলতে লাগলো—

আড়ি! আড়ি! আড়ি!
কাল যাবো বাড়ি!

পরশু যাবো ঘব।

কী করবি কর।

মাস্টার-মশায়ের সঙ্গে আমি আর কখ্‌খনো কথা কইবো না,...সেধে ভাব করতে এলেও না...

রামযাদু থাকোহরির কাছ থেকে বরাবর পরান-বাবুর কাছে গেলো। পরান-বাবু একা বসে খবরের কাগজ পড়েছিলেন।

রামযাদু ঘরে পা দিতেই পরান-বাবু খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে আধা-চশমার উপরের ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি পাঠিয়ে দেখলেন কে এলো। রামযাদুকে দেখেই তিনি চোখের চশমা খুলে ফেলতে ফেলতে বললেন—আসুন মুখুজ্জে মশায়! খবরের কাগজে ন্যাশন্যাল-ব্যাঙ্ক, বঙ্গলক্ষ্মী-কটন-মিল আর মেডিক্যাল-কলেজের ব্যাপার পড়ছেন?

রামযাদু পরান-বাবুর সামনে টেবিলের এপারে একখানা চেয়ারে বসতে বলতে বললে— পড়ছি বই কি। তারই জন্যে আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছিলাম, এখন নিরিবিলি আছেন বলে ফেলি...

ব্যাঙ্ক, প্রভৃতির চুরির প্রসঙ্গে রামযাদুর পরান-বাবুকে কী বলবার থাকতে পারে তা বুঝতে না পেরে পরান-বাবু ঈষৎ কৌতূহলী হয়ে বললেন—হ্যাঁ বলুন।

রামযাদু বলতে লাগলো—থাকোহরি ছেলেটি অতি সৎ, বিশ্বাসী, কৃতজ্ঞ, কিন্তু নিতান্ত ছেলেমানুষ তো,...ওর ওপর আপনি একটু সতর্ক নজর রাখবেন,...অনেক টাকা নাড়াচাড়া করে.. কোন্ রিপু কখন যে প্রবল হয়ে ওঠে তা তো বলা যায় না।

পরান-বাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরল-প্রাণ-খোলা উচ্চ হাসি হেসে নিয়ে বললেন—মুখুজ্জে মশায়, আপনি আমার আর থাকোহরির হিতৈষী বন্ধু বলে অকারণে শঙ্কিত হচ্ছেন। কিন্তু ভেবে দেখুন থাকোহরি চুরি করতে যাবে কেন? আমার যা খুদ-কুঁড়ো আছে সবই তো তার...

রামযাদু গম্ভীর হয়ে বললে—হ্যাঁ তা তো জানি, কিন্তু .. যে রকম দিনকাল পড়েছে তাতে জামাই বাবাজিরা তো শ্বশুর মশায়দের দয়ে মজাতে দ্বিধা করেন না, খবরের কাগজে সব দেখছেন তো...থাকোহরি তো এখনও জামাই হন নি, হবু হয়ে আছেন... ধরুন একটা কথার কথা. . সে জোয়ান সোমত্থ ছেলে, আর আমাদের কৃষ্ণকলি কচি খুকিটি, কৃষ্ণকলিকে তার যদি পছন্দ না হয়, আর থাকোহরি যদি কোনো মূলজি জেঠাব চেক ভাঙিয়ে পগার ডিঙিয়ে য়ুরোপে বা জাপানে সরে পড়ে, তবে তাকে খুঁজে আনা কঠিন হবে।

পরান-বাবু আবার হো হো করে হেসে উঠে বললেন—মুখুজ্জে মশায়, আপনি কেবল ঐতিহাসিক বা কবি নন, আপনার মধ্যে ঔপন্যাসিকের কল্পনাও উঁকি মারে, দিব্য ঘটনাজাল বুনেছে আপনার কল্পনা! আপনি উপন্যাস লিখতেও আরম্ভ করুন।

পরান-বাবু রামযাদুর উপদেশটা তুচ্ছ অগ্রাহ্য করে হেসে উড়িয়ে দিলেন দেখে রামযাদু খুব খুশি হলো, এবং সেও হাসতে হাসতে বললে—চারিদিকের ব্যাপার দেখে শুনে আমার মনে কেমন একটা আতঙ্ক ধরে গেছে। ঈশ্বর করুন আমার ভয় মিথ্যা হোক। জগৎ থেকে মিথ্যা প্রবঞ্চনা চুরি পাপ লুপ্ত হয়ে যাক।

শেষের কথাটা বলবার সময় রামযাদু পরম গম্ভীর হযে উঠলো।

পরান-বাবু রামযাদুর কথায় পরিতুষ্ট হয়ে বললেন—মুখুজ্জে মশায়, আপনাকে যতো দেখছি ততো আমার ভক্তি বাড়ছে; আপনি পরম ধার্মিক, পরোপকারী, পরহিতৈষী মহাশয় ব্যক্তি! জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির এমন সমন্বয় সচরাচর মানবচরিত্রে দেখা যায় না।

এমন সময় পাশের কাঠের সিঁড়িতে চার-পাঁচজন লোক ওঠার পদ্ধতি শুনতে পেয়ে রামযাদু উঠে দাঁড়ালো, এবং মুখ কাচুমাচু করে বললে—আমি এখন তবে আসি।

পরান-বাবু প্রসন্ন উদার দৃষ্টিতে রামযাদুব মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—আচ্ছা। প্রণাম হই।

রামযাদু পৃষ্ঠ পরাবর্তন করে প্রস্থানোদ্যত হতেই পবান-বাবু মনে মনে ভাবলেন—মুখুজ্জে মশায় নিজের প্রশংসা কখনো শুনতে পারেন না, প্রশংসা শোনবা মাত্র বিষের মতন পরিহার করে চলে যান, পাছে সত্ত্বগুণপ্রধান চিত্তে তমোগুণের স্পর্শদোষ ঘটে! মহাশয় ব্যক্তি!

রামযাদু সিঁড়ির মুখের কাছে যেতেই আগন্তুক একজন তাকে বললে—এই যে মুখুজ্জে মশায়, চললেন যে এরই মধ্যে?

রামযাদু হেসে বললেন—আপনাদের জন্যে ফিলড্ ক্লিয়ার করে রেখে গেলাম।

আগন্তুক একজন ব্যঙ্গ করে বললে—ফিল্ড কমপ্লিট্ ক্লিয়ার! একটি শস্য-কণাও আমাদের জন্যে ফেলে রাখেন নি বোধ হয়?

রামযাদু গলার স্বর উচ্চ করে যাতে পরান-বাবু শুনতে পান এমন ভাবে বললে—এ ফিল্ড, তো বসুন্ধরা, রত্নাকর, নিয়ে ফুরোতে পারবেন না, তবে নিতে জানতে হয়।

আগন্তুকদের একজন রামযাদুকে উদ্দেশ করে বললে—সেটি আপনি বিলক্ষণ জানেন।

কিন্তু রামযাদু যেন সে কথা শুনতে পায় নি, এমনি ভাবে হাসতে হাসতে নিচে নেমে চলে গেলো। চোরকে চুরি করতে ও গৃহস্থকে সাবধান হতে ব'লে রামযাদুর মনটা আজ ভারি খুশি হয়ে উঠেছিলো, সে যখন বাড়ি থেকে বেবিয়ে রাস্তায় চলেছে তখনও তার মুখে হাসির আভা ঝক্‌মক্ করছে।

পরান-বাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে রামযাদু একেবারে মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে গিয়ে হাজির। সে বাজারের সেরা দেখে এক শ ল্যাংড়া আম, বড়ো গলদা চিংড়ি আর তপসি মাছ কিনলে; বাজার করেও যখন দেখলে তার কাছে তখনও কয়েক টাকা অবশিষ্ট আছে, তখন সে এক কাঁদি উৎকৃষ্ট কানাই-বাঁশি কলা আর গোটাকতক সিঙ্গাপুরি আনারস কিনলে। এই দ্রব্যগুলিকে সে দুই ভাগ করে তার আপিসের বড়ো সাহেব ও ছোটো সাহেবকে ভেট দিতে তাদের বাড়িতে চললো। তারা দুজনে একসঙ্গে এক বাড়িতে থাকে, বড়ো সাহেবের মেম বিলাতে, ছোটো সাহেব অবিবাহিত। রামযাদু সাহেবদের সামনে খুব নত হয়ে লম্বা হাতে বিনীত সেলাম করে বললে—তার এক শালা থাকে মজঃফরপুরে, সেখান থেকে সে ল্যাংড়া আম পাঠিয়েছে; এক সম্পর্কে শ্বশুর থাকে ঘাটালে, সে আজ কলকাতায় এসেছে, তাই সঙ্গে করে কিছু তপসি মাছ এনেছে; আর কলা তার দেশের বাগানের এবং গলদা

চিংড়ি তার পুকুরের। তাদের দেশে শাস্ত্রে বলে ভালো জিনিস একলা উপভোগ করতে নেই, তাই সে তার অন্নদাতাদের যৎকিঞ্চিৎ উপহার দিতে এই সব এনেছে।

রামযাদুর শালা শ্বশুর বন্ধু নানা দিগ্‌দেশ থেকে কেমন করে এমন হিসাব করে জিনিস উপহার পাঠালো যে সবগুলি একই সময়ে একই দিনে এসে রামযাদুর কাছে পৌঁছালো এবং তার বাড়ির বাগান ও পুকুর থেকেই বা ঠিক তাক্ বুঝে কেমন করে যে কলা ও মাছ এসে জুটলো, তা বলবার আবশ্যক রামযাদুও মনে করলে না, সাহেবরাও জিজ্ঞাসা কররার কথা মনে আনলে না; তারা কেবল বললে থ্যাঙ্ক, ইউ ভেরি মাচ্ রায় বাহাদুর!

উপহার দেওয়া ও নেওয়ার আপ্যায়নের পর রামযাদু কথায় কথায় ব্যাঙ্ক মিল আর মেডিক্যাল-কলেজের চুরির মকদ্দমার কথা তুললে। এবং অবশেষে বললে—আমাদের আপিসেও সাবধান হওয়া দরকার; ঐ সব মকদ্দমায় অনেকের চোখ ফুটেছে, যারা ঠকাতে জানতো না তারাও ঠকাতে শিখলে।

সাহেবেরা বললে—তা শিখুক, তাতে আমাদের কোনো ভয় নেই; আমাদের কেশিয়ার থাকো-বাবু পরান-বাবুর লোক, তার কাজ-কর্ম খুব পরিষ্কার; আর পরান-বাবু বিশ্বাসের অবতার!

রামযাদু বললে—হ্যাঁ...তা বটে...কিন্তু...থাকোহরি নিতান্ত ছেলেমানুষ...আর পরান-বাবু সকলকে অত্যন্ত বিশ্বাস করেন বলে নিজে তো কিছু দেখেন শোনেন না...

সাহেবেরা বললে—থ্যাঙ্ক ইউ রায় বাহাদুর! আমরা পরান-বাবুকে বলে দেবো। আর শিগ্‌গিরই হিসাব অডিট্ করাবো।

রামযাদু আবার লম্বা সেলাম করে বিদায় হলো।

আপিসে গিয়েই সে দেখলে থাকোহরির সদাপ্রফুল্ল মুখ আজ চিন্তাক্লিষ্ট বিমর্ষ হয়ে আছে। দেখেই সে খুশি হয়ে থাকোহরির কাছে গিয়ে চুপি চুপি বললে—দেখো ভায়া, বিশ্বাসঘাতকতা কোরো না, পরানবিশ্বাস তোমাকে বিশ্বাস করে তোমার হাতে তাঁর কন্যা আর ক্রেডিট সঁপে নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন। কুৎসিত কালো মেয়ে তোমার অপছন্দ হতে পারে, হওয়াটাই স্বাভাবিক, হয় তো কৃষ্ণকলিকে বিবাহ করলে তোমার জীবনটা বিস্বাদ হয়ে যাবে, তবু মনে রেখো—

ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাৎ ধর্ম্মো ন হন্তব্যো মা নো ধর্ম্মো হতো বধীৎ।

থাকোহরি গম্ভীর হয়ে রইলো, কোনো কথাই বললে না। রামযাদু মনে মনে হাসতে হাসতে নিজের কাজে চলে গেলো।

এর পর থেকে থাকোহরির দেখা পেলেই রামযাদু তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় তার ভাবী পত্নী পেত্নি-তুল্যা, তার জীবনের সুখ আনন্দ গ্রাস করতে উদ্যতা হয়ে আছে; সে ইচ্ছা করলেই মুক্তি পেতে পারে; কিন্তু তাতে তার অধম হবে; মানুষের ইহলোকটাই সর্বস্ব নয়, পরলোকটার দিকেও তাকাতে হবে, যদিও অনেকে পরলোকের অস্তিত্ব স্বীকারই করেন না—চার্বাকপন্থী অনেক আধুনিক বলেন বটে—ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ। আর

ধর্মভয়কে তাঁরা বলেন—A bugbear of the weak mind! তোমরা তো সেই আধুনিকের দলে!

রামযাদু থাকোহরির সামনে কৃষ্ণকলির স্বামী হওয়ার ভয়ালতা ও তার হাত থেকে মুক্তির পথও নির্দেশ করে, আবার ধর্মের ভয় দেখিয়ে সে পথে যেতে প্রতিনিবৃত্তও করে এবং ধর্ম ভয় যে কাল্পনিক এ কথা বলে তাকে ধর্ম উল্লঙ্ঘন করতে প্ররোচিতও করে।

থাকোহরির মনে শান্তি নেই, তাব চিত্তে চিন্তার অন্ত নেই। তার এখন সব চেয়ে দুর্ভাবনা কৃষ্ণকলির হাত থেকে সে কেমন করে উদ্ধার পায়।

একদিন থাকোহরি আপিস থেকে চিন্তাকুল মুখে বাড়ি ফিরছে, দেখলে বেথুন-কলেজের গাড়ি এসে তাদের বাড়ির পাশের বাড়ির দরজার কাছে থামলো; সেই গাড়ির দরজার মুখের কাছে বসেছিলো একটি তরুণী চতুর্দশী মেয়ে। তাকে দেখেই থাকোহরির দৃষ্টি ব্যাকুল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো; তার মনে হলো এই মেয়েটিকে তো সে চেনে; পাশের বাড়ির শ্যাম-বাবুর মেয়ে সুলোচনা; তারাও তো থাকোহরিদের জাত; এই মেয়েটির সঙ্গে তে তার বিয়ে হতে পারে, সুন্দরী প্রথম-যৌবনা চতুর্দশ বসন্তের একগাছি মালার মতন এই সুশিক্ষিতা মেয়েটিকে পেলে তার জীবন ধন্য হয়ে যেতে পারে! কিন্তু তার জীবন পেত্নিতে পাওয়া অভিশপ্ত! থাকোহরির বুক ঠেলে দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো।

সুলোচনা গাড়ির জানলা থেকে যখন দেখলে থাকোহরি তার দিকে বুভুক্ষু দৃষ্টিতে দেখছে, তখন তার মুখ লজ্জায় সঙ্কোচে অপ্রতিভ হয়ে উঠলো; গাড়ি বাড়ির দরজায় থামবামাত্র সহিস যেই গাড়ির দরজা খুলে দিলে অমনি সুলোচনা গাড়ি থেকে তাড়াতাড়ি নেমে পড়লো, কিন্তু বাড়ির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাবার আগে আর-একবার থাকোহরির দিকে ফিরে দেখে নিলে।

সুলোচনার ফিরে তাকানো কেবল মাত্র কৌতূহল ও কৌতুকের বশে হতে পারে; কিন্তু থাকোহরির মনে হলো সুলোচনা তার প্রতি অনুরাগিণী, তাই সুলোচনার মুখ তাকে দেখে অমন লজ্জারুণ হয়ে উঠেছিলো।

থাকোহরি উন্মনা হয়ে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলে। সে বাড়িতে গিয়েই দেখলে দেশ থেকে তার মা এসেছে। তার মা তার ঘরে এসে দেশের খবর দেবার প্রসঙ্গে বললে—তোর মামির বোনের বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে; তোর মামির বড়ো ইচ্ছে যে তোর সঙ্গে তার বোনের বিয়ে হয়; কিন্তু আমি বললাম তা তো হবার জো নেই। এখানে পাশের বাড়ির সুলোচনার মাও বলছিলো—"তোমার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে হলে বেশ হতো।" বেশ তো হোতো কিন্তু...

থাকোহরির মা চারিদিকে একবার তাকিয়ে কণ্ঠস্বর চেপে চুপিচুপি বলতে লাগলো—কর্ত-গিন্নির ইচ্ছে কেষ্টোকলির সঙ্গে তোর বিয়ে দেবেন। আমার কিন্তু মন সরে না, যে মেয়ের ছিরি! আমার সাত নয়, পাঁচ নয়, সবে এক বেটার বৌ, সে অমন কালো কুচ্ছিত হবে, এ দুঃখ আমি কাকেই বা কেমন করে বলি! কর্তা-গিন্নি যদি আবার রাগ করেন? তোর এই উন্নতি তো কর্তার আশীর্বাদেই!

থাকোহরি ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলো; সে বাড়ি ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়লো। সে আনমনা হয়ে পথ চলতে চলতে এই ভাবতে লাগলো—সুলোচনার মা বলছিলেন আমার সঙ্গে সুলোচনার বিয়ে হলে বেশ হতো! সুলোচনা বোধ হয় তার মায়ের এই ইচ্ছার কথা জানতে পেরেছে; তাই আমার প্রতি তার অনুরাগ জন্মেছে, আমাকে দেখলেই সে লজ্জা পায়! সুলোচনা তো কৃষ্ণকলির তুলনায় স্বর্গের অপ্সরা; মামির বোনও যে কৃষ্ণকলীর চেয়ে ঢের ঢের ভালো—সে লেখাপড়া না জানুক, দেখতে মানুষের মতন তো...আহামরি সুন্দরী নাই হোক...

সেই দিন থেকে থাকোহরির সকাল-বিকালের কাজ হলো সুলোচনার স্কুলে যাওয়া-আসার সময় দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা। সুলোচনা হয় তো বা তার মায়ের কাছে থাকোহরির সঙ্গে তার বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব শুনেছে, অথবা থাকোহরিকে ব্যগ্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলেই থাকোহরিকে দেখলে তার মুখ লজ্জার হাসিতে উদ্ভাসিত অথচ সঙ্কুচিত হয়ে যায়। আর থাকোহরি ভাবে সেটি নব-অনুরাগিণী কিশোরীর লজ্জাবেশ। যতোই থাকোহরি সুলোচনাকে নিজের প্রতি অনুরক্ত অনুমান করে, ততোই তার ব্যগ্রতা বেড়ে চলে, এবং সুলোচনা ততোই বেশি লজ্জা পায়, আর থাকোহরি সেই লজ্জাকে প্রণয়চিহ্ন মনে করে আরো ব্যগ্র হয়। এমনি বৃত্তাবর্তে তাদের দুজনের মনের ভাব ঘুরপাক খেতে লাগলো, ইংরেজি লজিকে যাকে বলে vicious circle! এখন কৃষ্ণকলি থাকোহরির একেবারে চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়িয়েছে; কৃষ্ণকলিকে দূর থেকে দেখলেই সে পলায়ন করে। আদুরে মেয়ে কৃষ্ণকলি থাকোহরির এই হতাদর বুঝতে পারে, সেও অভিমানে ক্রোধে থম্‌থমে হয়ে দূরে দূরেই থাকতে চেষ্টা করে।

থাকোহরি উন্মনস্কতা ও কৃষ্ণকলির উপর বিরাগ হয় তো পরান-বাবু ও মাতঙ্গিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতো, কিন্তু একদিন হঠাৎ অতি স্থূলাঙ্গী মাতঙ্গিনী হার্টফেল করে মারা গেলেন। সমস্ত সংসার শোকাচ্ছন্ন হয়ে গেলো। সকলে মনে করলে থাকোহরির বিষণ্নতার কারণও কর্ত্রী ঠাকুরানির আকস্মিক মৃত্যু।

পরান-বাবু পত্নীবিয়োগে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তিনি কৃষ্ণকলিকে নিয়ে তেতালার ঘরে যে আশ্রয় নিয়েছেন, সেখান থেকে আর বাহির হন না দলে দলে লোক আসে সমবেদনা দেখাতে। পরান-বাবু কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন না, সকলে হতাশ ক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে ফিরে চলে যায়। তাঁর কাছে একমাত্র যেতে পাবে থাকোহরি; সেই তাঁকে সময়-মতো নাওয়ায় খাওয়ায়। কিন্তু কৃষ্ণকলিকে দেখলেই থাকোহরির গা শিউরে ওঠে, এবং থাকোহরির বিরাগচ্ছন্ন মুখ দেখলে কৃষ্ণকলিও স্বস্তি অনুভব করে না। থাকোহরিও নিতান্ত কাজ না পড়লে পরান-বাবুর কাছে ঘেঁষে না। থাকোহরি স্বেচ্ছায় যতোটুকু সময় তাঁর কাছে অতিবাহিত করে তার বেশি এক মিনিটও পরান-বাবু থাকতে অনুরোধ করেন না। কেবল কৃষ্ণকলি চোখের আড়াল হলে তিনি ব্যাকুল ও চঞ্চল হয়ে ওঠেন। তাই কৃষ্ণকলিকে তার চিড়িয়াখানা সমেত সেই তেতালার বৃহৎ ঘরে পিতার শোকের বেষ্টনে বন্দিনী হতে হয়েছে।

আপিসের জরুরি কাগজপত্র যে-কোনো কর্মচারী নিয়ে এসে থাকোহরিকে দেয়; থাকোহরি পরান-বাবুর কাছে নিয়ে গিয়ে কোন্‌টা কিসের কাগজ বুঝিয়ে দিতে চাইলে তিনি বলেন—ও-সব আমি এখন দেখতে শুনতে চাইনে; তুমি আর মুখুজ্জে মশায় দেখে শুনে যা হয় কোরো; কেবল আমাকে কি করতে হবে বলো... কেবল সই করে দেওয়া ছাড়া আর কিছু করতে পারবো না।

থাকোহরি সই করিয়ে কাগজপত্র ফিরিয়ে নিয়ে যায়, নীরবে দুশ্চিন্তায় কাতর হয়ে।

রামযাদু যখন শুনলে কর্তা কাগজপত্র কিছু দেখেন না, অমনি সই করে দেন, তখন সে থাকোহরিকে বললে— দেখো ভায়া, তোমার সামনে মস্ত প্রলোভনের পথ খোলা পড়ে রয়েছে, খুব সাবধান! কর্তাকে দিয়ে এখন তুমি যা খুশি তা করিয়ে নিতে পারো, তিনি টেরও পাবেন না, কিন্তু সে প্রবৃত্তি মনের কোণেও ঠাঁই দিয়ো না। কৃষ্ণকলিকে তোমার পছন্দ হয় না, কিন্তু জীবনে কটা জিনিসই বা পছন্দসই হয়?

রামযাদুর উপদেশের বক্তৃতা শুনে থাকোহরি চুপ করে থাকে, কিন্তু তার মন জ্বলতে থাকে।

একদিন সকালে পরান-বাবু প্রাতঃকৃত্য সমাধা করে প্রতীক্ষা করছেন নিত্যকার মতন আজও থাকোহরি এসে তাঁর চা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু অনেক বেলা হয়ে গেলো, তবু থাকোহরির দেখা নেই; থাকোহরির প্রাত্যহিক নিয়মিত আগমন কয়েক দিনেই পরান-বাবুর অভ্যাস হয়ে গিয়েছিলো. আজ তার ব্যতিক্রম হওয়াতে তাঁর পত্নীর মৃত্যু তাঁর জীবনে যে বিরাট অভাব সৃষ্টি করে গেছে, সেইটা যেন আজ অধিকতব উৎকট হয়ে তাঁর মনের সামনে এসে দেখা দিলো। তাঁব পত্নী দিনের পর দিন সমান ভাবে দীর্ঘ বত্রিশ বৎসর নিয়মিত নিরলস সেবা করে গেছেন; আর তাঁর অভাবের এই ষোলো দিনের দিনই অপরে ক্লান্ত হয়ে পড়লো! জীবনের তো এখনও হয় তো অনেকখানিই বাকি; চাওয়ার আগে পাওয়ার আনন্দ জীবন থেকে ঘুচে গেলো, এখন প্রত্যেক বস্তু চেয়ে চেয়ে তবে পেতে হবে। কিন্তু তাঁর নিজের জীবন তো পরমায়ুব অনেকখানি পথ অতিক্রম করে এসেছে, কৃষ্ণকলির তো সবে যাত্রা শুরু! তার জীবনেব অভাব মোচন করবে কে? পরান-বাবুর মনে এই প্রশ্ন উদয় হবার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তরও উদয় হলো—কৃষ্ণকলির জীবনের অভাব মোচন করবে তাকে সব চেয়ে যে ভালোবাসবে...তার স্বামী! কোষ্ঠীতে বলেছে কৃষ্ণকলি স্বামী-সোহাগিনী সৌভাগ্যবতী হবে। পরান-বাবু নিদ্রিতা কন্যাব ললাটে আপনার দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করলেন, ব্যথিত পিতৃ-অন্তরের ঐকান্তিক আশীর্বাদ যেন তার মাথায় ঢেলে দিলেন; তাঁর দুচোখ দিয়ে সন্তাপের অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

কৃষ্ণকলি কপালে পিতার হস্তস্পর্শ পেয়ে ঘুম থেকে জেগে চোখ মেলে হাসতে গিয়েই দেখলে বাবার চোখে জল। তার আর হাসা হলো না, সে তাড়াতাড়ি উঠে দুই হাত দিয়ে বাবার গলা জড়িয়ে ধরলে। পরান-বাবু তাড়াতাড়ি চোখ মুখে ফেলে হাসতে চেষ্টা করে বললেন—ঘুম ভাঙলো মা-জননীর? তোমার ছেলেরা যে খাবার জন্যে ছটফট করছে, তোমার প্রসাদ পাবে বলে ব্যস্ত হয়েছে।

কৃষ্ণকলি স্নেহার্দ্র দৃষ্টিতে কাকাতুয়া আর খরগোশের দিকে দেখলে।

পুরাতন ভৃত্য বোঁচা বড়ো একখানা আংটা-দেওয়া থালায় করে চা দুধ পাঁউরুটি জেলি সন্দেশ ইত্যাদি নিয়ে সেই ঘরে এসে প্রবেশ করলে।

বোঁচাকে দেখেই পরান-বাবু প্রশ্ন করলেন—হরি-বাবু কোথায় রে?

বোঁচা খাবারের থালা টেবিলের উপর নামিয়ে রাখতে রাখতে হাতের জিনিসের দিকেই দৃষ্টি রেখে বললে—তিনি তাঁর মাকে নিয়ে কাল রাত্রে বাড়ি গেছেন।

পরান-বাবু আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলেন—বাড়ি গেছে? কেন?

বোঁচা এইবার পরান-বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—তা তো জানি নে।

পরান-বাবু চিন্তিত ও দুঃখিত হয়ে চুপ করে রইলেন; তাঁর মনের মধ্যে একটা টানা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পড়লো—খাকোহরি বাড়ি গেলো, কিন্তু একবার আমাকে বলে গেলো না।

পরক্ষণেই তিনি সে চিন্তা মন থেকে সরিয়ে ফেললেন, তাঁর বিষণ্ণ হবার অবসর নেই, তিনি বিষণ্ণ হলে কৃষ্ণকলি বিষণ্ণ হয়, তিনি জোর করে হেসে বললেন—এসো মা অন্নপূর্ণা, তোমার সন্তানদের প্রসাদ বিতরণ করো।

কৃষ্ণকলি খাট থেকে বাবার গলা ধরে ঝুলে নিচে নেমে পড়ে বললে—মাস্টার মশায় বাড়ি চলে গেছে, বেশ হয়েছে বাবা। আমি ওকে দুচক্ষে দেখতে পারি নে; আমি ওর সঙ্গে জন্মের মতন আড়ি করে দিয়েছি!

পরান-বাবুর চিত্ত কন্যার কথা ভাবী স্বামীর প্রতি অনুরাগব্যঞ্জক অনুমান করে সুখাবেশে পরিপ্লুত হয়ে উঠলো। তাঁর মনে হলো—গিন্নি যদি এদের দুজনের মিলনটা দেখে যেতে পারতেন, তা হলে আমার আর এতো ক্ষোভ হতো না। এখন তো এক বৎসর বিয়ের প্রতিবন্ধক পড়লো। আমি দেখে যেতে পারলে হয়। আকৈশোরের জীবনসঙ্গিনী সহধর্মিণীকে ছেড়ে কি আমিই বেশি দিন বাঁচবো?

তাঁর অবর্তমানে কৃষ্ণকলিকে কে দেখবে শুনবে এই চিন্তা পরান-বাবুর মনে উদ্‌গত হতে যাচ্ছিলো, এমন সময় কৃষ্ণকলি বললে—বাবা, তুমি চা ঢালো, আমি চট করে মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে আসছি।

পরান-বাবু মায়ের যত্ন দিয়ে মেয়ের আহার্য প্রস্তুত করতে মনোনিবেশ করলেন।

একটু পরেই কৃষ্ণকলির চিড়িয়াখানার মধ্যে পরান-বাবুর সমস্ত চিন্তা হারিয়ে গেলো। পিতা কন্যার সঙ্গে তার খেলায় যোগ দিলেন।

বেলা দশটার সময় বোঁচা এসে খবর দিলে মুখুজ্জে মশায় কাগজপত্র সই করাতে এসেছেন।

কৃষ্ণকলি বললে—তুমি চট করে কাজ সেরে নাও বাবা, আমি ততোক্ষণে নেয়ে আসি। নইলে তুমি নাইতে কলঘরে ঢুকলে আমার নাইতে দেরী হয়ে যাবে।

কৃষ্ণকলি লাফাতে লাফাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। রামযাদু একতাড়া কাগজপত্র হাতে করে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো—তার মুখ অত্যন্ত ম্লান বিমর্ষ, কিন্তু ছোটো ছোটো চোখ দুটো ধারালো ছুরির ফলার ডগার মতন ভারি বেশি উজ্জ্বল চক্‌চক্ করছে।

রামযাদু ঘরে ঢুকেই বললে—খাকোহরি বাবাজি হঠাৎ বাড়ি চলে গেছেন: আমাকে

চিঠি লিখে গেছেন আপিসের কাগজপত্রগুলো আপনাকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তাই তাড়াতাড়ি সকাল-বেলাতেই এলাম...

পরান-বাবুর শোকার্ত চিত্ত এখন একটুতেই অধিক ব্যথিত হয়; থাকোহরি বাড়ি যাওয়ার খবরটা রামযাদুকে দিয়ে গেলো, কিন্তু তাঁকে দিয়ে যেতে পারলে না, এতে পরান-বাবুর মন অভিমানের বেদনায় টনটন করে উঠলো। তিনি থাকোহরির প্রসঙ্গ মাত্র উত্থাপন না করে কাগজপত্রে সই করে দেবার জন্য ফাউন্টেন-পেন খুলে নিলেন। রামযাদু প্রত্যেক কাগজের কেবল সই করবার জায়গাটা খুলে খুলে পরান-বাবুর সামনে ধরতে লাগলো, আর পরান-বাবু কোন্ কাগজে কি আছে না দেখে-শুনেই সই করে যেতে লাগলেন। রামযাদু কিন্তু মাঝে মাঝে পরান-বাবুকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছিলো কোন্ চিঠি কাকে কোন্ কোন্ কাজের জন্য লেখা হয়েছে। রামযাদু কতকগুলো চিঠিপত্র সই করিয়ে নিয়ে এক তাড়া কাগজের শেষ পৃষ্ঠাটা পরান-বাবুর সামনে খুলে ধরলে; সেই সময় তার হাত দুখানা একটু কাঁপলো, চোখ দুটা একটু সঙ্কুচিত হয়ে চঞ্চল হয়ে উঠলো; কিন্তু পরান-বাবু সই করে দিয়ে পরবর্তী কাগজে সই করবার প্রতীক্ষায় কলম তুলে নিতেই রামযাদুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, সে তাড়াতাড়ি ক্ষিপ্র হস্তে সেই কাগজগুলো সরিয়ে কতকগুলো বিল্ ইন্‌ভয়েস পরান-বাবুর সামনে ধরে দিলে, সেগুলো সই হলে রামযাদু আবার পূর্বের ন্যায় একতাড়া কাগজের শেষ পৃষ্ঠাটা পরান-বাবুর সামনে ধরলে; এবং পরান-বাবু সেটাতে না দেখে সই করে দিলেন। তার পর রামযাদু কয়েকখানা চেক সই করিয়ে নিতে লাগলো; এবং পরান-বাবুর সই করবার অবসরে যে নিজের সাফাই স্বরূপ বলে যেতে লাগলো কোন্ চেকে কতো টাকা কোন্ পাওনাদারকে দেবার জন্য সে পরান-বাবুর স্বাক্ষর নিচ্ছে।

সমস্ত কাগজপত্রে পরান-বাবুর সই হয়ে যেতেই রামযাদু সমস্ত কাগজপত্র গুটিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো এবং বললে—এখন তবে আসি, আপিস যেতে হবে...

পরান-বাবু উদাস ভাবে বললেন—আচ্ছা।

রামযাদু ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে গিয়েই দুটি তাড়া ডেমি কাগজে লেখা দলিল কাগজপত্র থেকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে ভাঁজ করে নিজের কোটের ভিতরকার বুকপকেটে পুরে রাখলে। তার পর আবার পরান-বাবুর ঘরের দিকে ফিরে চললো।

রামযাদুকে প্রত্যাবৃত্ত হতে দেখে পরান-বাবু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রামযাদুর মুখের দিকে তাকালেন।

রামযাদু ঘরে প্রবেশ করে বলতে লাগলো—থাকোহরি আমাকে একখানা চিঠি লিখে গেছে; সে চিঠিখানা আপনার দেখা দরকার। কিন্তু এখন আপনার মানসিক অবস্থা যে রকম তাতে মানসিক উদ্বেগ অশান্তি বৃদ্ধি হয় এমন বিষয় আপনার কাছে উপস্থিত করতেও ইচ্ছা হয় না, কষ্টও হয়।

পরান-বাবু কোনো উদ্বেগ প্রকাশ না করে ধীর ভাবেই বললেন—হরির চিঠি কই? দেখি...

রামযাদু পকেট থেকে একখানা চিঠির মুখ-ছেঁড়া খাম বাহির করে পরান-বাবুর হাতে দিলে।

পরান-বাবু খাম হাতে নিয়ে দেখলেন যে চিঠি ডাকে পাঠানো। তিনি খামের ভিতর থেকে চিঠি বাহির করতে করতে রামযাদুকে বললেন—বসুন।

রামযাদু মুখ কাচুমাচু করে বললে—আজ্ঞে থাক, আমাকে এখনই যেতে হবে...

পরান বাবু আর কিছু না বলে থাকোহবির চিঠি পড়তে লাগলেন—

শ্রীচরণকমলে

ভক্তি-কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অসংখ্য প্রণাম পূর্বক নিবেদন, মহাত্মন্, আপনার কাছে আমি অশেষ প্রকারে উপকৃত। আপনা হতেই আমার যতো কিছু উন্নতির সূত্রপাত, কর্তার আশ্রয় পেয়ে আমি বর্তে গিয়েছিলাম। কিন্তু কর্তা আর গিন্নি-মা আমাকে অহেতুক স্নেহ করেন নি, তাঁদের স্বার্থবুদ্ধি তাঁদের স্নেহকে ক্ষুণ্ণ খর্ব করেছিলো,—তাঁরা চেয়েছিলেন তাঁদের বিদিকিচ্ছি কুচ্ছিত্ মেয়েটাকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা কন্যাদায় থেকে নিষ্কৃতি পেতে ও আমার জীবনটাকে চির-অভিশপ্ত করতে। তাঁরা বুঝেছিলেন যে তাঁদের ছিরি-ছাঁদ-বিহীনা কন্যাকে অগাধ টাকার লোভেও কেউ সহজে বিবাহ করতে চাইবে না, লোভে পড়ে বিবাহ করলেও তাব স্বামী কোনোদিন তাকে ভালো বাসতে পারবে না। তাই তাঁরা বাড়িতে পোষা আমারই ঘাড়ে ঐ দুর্দৈব চাপাতে সঙ্কল্প করেছিলেন, মনে করেছিলেন বহু দিনের একত্র বাসের ফলে তাঁদেব কন্যার বীভৎস কুশ্রীতা আমার অভ্যাসের বশে সহ্য হয়ে যাবে এবং আমি কন্যার পিতামাতাব প্রতি কৃতজ্ঞতার ভক্তিকে কন্যার প্রতি প্রীতিতে পরিণত করে ফেলবো, কিন্তু তাঁদের সেই উদ্দেশ্য আমার কাছে স্পষ্ট প্রতিভাত হওয়াতে তাঁদের এই স্বার্থবুদ্ধির চাণক্যনীতি আমার মনকে বিরূপ ও তিক্ত করে তুলেছিলো, আমাব মনেব কৃতজ্ঞতা বিরাগে পরিণত হয়েছিলো। আমি কোনো রকমে মনোভাব দমন করে ছিলাম, কিন্তু আপনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে তা গোপন করতে পারি নি। আপনি বোধ হয় আমার মনের ভাব জানতে পেরেই আমাকে বারম্বার বলেছেন কৃষ্ণকলি কালো কুৎসিত হলেও তাকে বিবাহ করে ভালোবাসা আমার কর্তব্য। তার পর বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক, বঙ্গলক্ষ্মী কটন-মিল আর মেডিক্যাল কলেজের চুরির মামলার কথা কাগজে পড়ে আমার মগজে যখন নানা রকম চিন্তা জোট পাকাচ্ছিলো তখনও আপনি আমাকে সে-রকম প্রবঞ্চনাময় চুরি করবার সঙ্কল্প থেকে বিরত থাকবার জন্য বহু উপদেশ ও শাস্ত্রের দোহাই দিয়েছেন; তাতে ফল হলো এই যে আমার উদ্দেশ্য ও সঙ্কল্প যা অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট ছিলো তা আপনার কথায় আর উপদেশে সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট হয়ে উঠলো। আমি স্থির করলাম জীবনকে চির-অভিশাপ থেকে মুক্ত করবার এই সুযোগ ত্যাগ করা নৈব নৈব চ। আমি আমাদের আপিসের একখানা তুলার বিলের দরুণ দু লক্ষ সাতান্ন হাজার টাকার একখানা চেক কর্তার নামে ব্যাঙ্ক থেকে ভাঙিয়ে নিয়েছি এবং ইতিমধ্যে বিদেশে যাবার পাসপোর্টও জোগাড় করে নিয়েছি। আমি জন্মের মতন ভারতবর্ষ থেকে পালিয়ে চললাম; বিদেশেই মনেব মতন সুন্দরী একটিকে বিবাহ করে সেই দেশেই বাস করবো। কোথায় চললাম সেই কথাটি বলবো না; মাকেও আমার

মতলবের বিন্দুবিসর্গ জানাই নি, তাঁকে কিছু টাকা দিয়ে দেশে পাঠিয়ে গেলাম। আমি কর্তার কাছে অনেক উপকার পেয়েছি; তাঁর শোকের সময় তাঁকে হঠাৎ এই খবর দিতে পারলাম না;আপনিই অবসর বুঝে তাঁকে জানাবেন। তিনি তো আমাকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তিই কন্যার সহিত দিতে প্রস্তুত ছিলেন; আমি তাঁর কন্যাটিকে বাদ দিয়ে, তাঁর কাছেই রেখে মাত্র যৎকিঞ্চিৎ পাথেয় নিয়ে সবে পড়লাম। কর্তা তো অজস্র দাতা; তিনি মনে করবেন আমাকে টাকাটা দান করেছেন; স্পেকুলেশনে তো টাকা লোকসান হয়, মনে করবেন জামাই-ধরা ব্যবসায়ে কিছু টাকা মারা পড়লো। আর তাঁকে বলবেন যে না দেখে শুনে কোনো কাগজপত্রে যেন আর সই না করেন। আমার শেষ প্রণাম কর্তার ও আপনার চরণে জানিয়ে চিরবিদায় নিলাম।

চিরকৃতজ্ঞ থাকোহরি জানা।

পুনশ্চ—আমার বসবার ঘরেব দেবাজের ডান দিকের টানার মধ্যে আপিসের কতকগুলো কাগজপত্র আছে, বা'র করে যথাবিহিত ব্যবস্থা করবেন।—থাকোহরি।

পরান-বাবু পত্রখানি পড়া শেষ করে মিনিট খানেক স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন, তার পর আবার পড়তে আরম্ভ করলেন, তিনি যেন আপনার দৃষ্টি ও বোধশক্তিকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। দ্বিতীয়বার পত্রখানা পড়া শেষ করেও তাঁব সন্দেহ হলো এ কি থাকোহরির লেখা? তিনি নিপুণ পরীক্ষকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগলেন যে ঐ হাতের লেখা কি থাকোহরির নিজের, না আব কারো জাল। তাঁর জীবনে তিনি উপকাব করতে গিয়ে অনেক প্রবঞ্চিত হয়েছেন, অনেক অকৃতজ্ঞতার আঘাত খেয়েছেন, কিন্তু এতো বড়ো প্রবঞ্চনাময় অকৃতজ্ঞতা যেন তাঁব ধারণার অতীত বলে মনে হচ্ছিলো।

পরান-বাবুকে নির্বাক স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকতে দেখে রামযাদু কথা বললে—পুলিশে খবর দিলে এখনও কোনো পোর্টে তাকে ধরতে পারা যায়।

রামযাদুর কথার আঘাতে পরান-বাবুর চেতনা যেন ফিরে এলো; তিনি চমকে উঠে বললেন—কাশীর জ্যোতিষী ঠিক গণনা করে বলেছিলো থাকোহরির সঙ্গে কৃষ্ণকলির বিবাহ হবে না, তার চেয়ে সৎপাত্রের সঙ্গে হবে। যাক্, বাঁচলাম। টাকার লোভে বিয়ে করে পরে যদি সে কৃষ্ণকলিকে অনাদর অবহেলা করতো তো সে বড়ো বিষম দুঃসহ ব্যাপার হতো; সে এখন কেবল টাকাই নিয়েছে, কৃষ্ণকলির জীবনের সুখ তো হরণ করে নি। এর জন্যেই আমি তার উপরে সন্তুষ্ট। মুখুজ্জে মশায়, আপনি লোক-চরিত্রজ্ঞ; আপনি আমাকে অনেক আগেই সাবধান করেছিলেন; কিন্তু আমি তখন আপনাকে অতিসাবধানী সন্দিগ্ধচরিত্র মনে করেছিলাম। সেজন্য আমিই দোষী; থাকোহরির কোনো দোষ নেই।

রামযাদু অল্পক্ষণ অবাক হয়ে পরান-বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে—থাকোহরিব দোষ নেই! অতোগুলো টাকা আপনি তাকে অমনি ছেড়ে দেবেন! পুলিশে খবর দিলে. .

পবান-বাবু দীর্ঘনিশ্বাস চেপে বললেন—আমি জীবনে সকলের ভালো করবার, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করবারই চেষ্টা করেছি, কাউকে কোনো রকমে উৎপীড়ন করতে ইচ্ছাও করি

নি; জীবনের এই শেষ অবস্থায় যাকে পুত্র-তুল্য স্নেহ করেছি তার পীড়া ঘটাতে পারবো না। যাক সে যেখানে খুশি, সুখে থাকুক।

রামযাদু পরান-বাবুর মহত্ত্বের অত্যুচ্চতার নাগাল ধরতে না পেরে বিস্ময়ে সম্ভ্রমে পূর্ণ হয়ে বললে—কিন্তু আপিসের এতো টাকা...!

পরান-বাবু মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে বললেন—এখন আপনি এ কথা কাউকে বলবেন না; আমি টাকাটা দু-তিন দিনের মধ্যেই শোধ করে দেবো; ব্যাঙ্কে আমার লাখ দুই টাকা জমা আছে; এই বাড়িখানার দাম হাজার পঞ্চাশ হবে, আমি আজই দালাল লাগিয়ে বিক্রির ব্যবস্থা করছি, আপনিও একটু চেষ্টা দেখবেন, দশ পাঁচ হাজার কম হলেও ছেড়ে দেবো; বাঁশতলা গলির বাড়িটারও দাম বিশ-পঁচিশ হাজার হবে...

রামযাদু আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলো—তা হলে তো আপনার সর্বস্বই গেলো! থাকলো কি?

পরান-বাবু ম্লান হাসি হেসে বললেন—থাকলো মান, মুখুজ্জে মশায়, থাকলো ইজ্জৎ।

পরান-বাবুর এই কথায় রামযাদুর মনে শ্রদ্ধার সঞ্চার হলো না, উল্টে উদয় হলো অবজ্ঞা— লোকটার বৈষয়িক বুদ্ধি যে এতো কাঁচা তা তার আগে জানা ছিলো না। রামযাদু বললে—কিন্তু পরের চুরির গুনাহ্‌গারি আপনি দিতে যাবেন কেন? সাহেবদের বলে দিন না যে থাকোহরি চুরি করে পালিয়েছে। তার পর তাদের প্রাণ যা চায় তারা করুকগে।

পরান-বাবু বললেন—মুখুজ্জে মশায়, আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে থাকোহরিকে আমি নিযুক্ত করে দায়িত্বের কাজ দিয়েছিলাম, আমি তার জামিন ছিলাম।

রামযাদু বললে—কিন্তু জামানতনামা তো লেখাপড়া কিছু নেই?

পরান-বাবু হেসে বললেন—মুখের কথাও কারো কাছে নেই।

রামযাদু অধিকতর আশ্চর্য হয়ে চক্ষু বিস্ফারিত করে বললে—তবে?

পরান-বাবু ম্লান মুখে হেসে বললেন—তবে অ-বলা একটা বোঝাপড়া আছে যে আমার সকল কাজের জন্য আমি দায়ী।

রামযাদু পরান-বাবুর মহৎচরিত্রের ধাঁধায় পড়ে বললে—কিন্তু সর্বস্ব খোয়ালে কৃষ্ণকলির জন্য কি থাকবে?

পরান-বাবু ক্ষণকাল গম্ভীর হয়ে চিন্তা করে বললেন—থাকবে তার পিতার সত্য-রক্ষার সুকৃতি, আর আপনাদের দশজনের আশীর্বাদ। টাকা দিয়ে বর কেনবার সঙ্কল্প ত্যাগ করলাম। ধনগর্বে মনে করেছিলাম সুখ-সৌভাগ্য প্রীতি-ভক্তিও বুঝি টাকাতেই কিনতে পাওয়া যায়! সে ভুল থাকোহরি ভেঙে দিয়ে গেছে। সন্তান-বাৎসল্য অন্ধ; তাই আমাদের চোখে মেয়েব কুরূপ স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে নি; আজ থাকোহরি সে অন্ধতাও মোচন করে দিয়েছে। মেয়েকে আমি লেখাপড়া শেখাবো, বয়স বেশি হলে বয়োধর্মে যে যদি কাউকে ভালোবেসে তার ভালোবাসা আকর্ষণ করতে পারে, আর সেই ব্যক্তি যদি কুরূপের অন্তরালে সদ্‌গুণের পরিচয় পেয়ে আমার মেয়েকে প্রার্থনা করে, তা হলে মেয়ের বিয়ে হবে, নয় তো মেয়ে আমরণ কুমারীই থাকবে।..

রামযাদু এ কথার উত্তরে বলবার কিছু খুঁজে না পেয়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

পরান-বাবু ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বললেন—আচ্ছা, আপনি এখন আসুন মুখুজ্জে মশায়। আমার প্রত্যেক মুহূর্ত এখন দরকারী।

রামযাদু মুখ কাচুমাচু করে ঘর থেকে বাহির হয়ে চললো। কিন্তু পরান-বাবুর দিকে পিছন ফিবতেই তার মুখ উজ্জ্বল ও দৃষ্টি চঞ্চল হয়ে উঠলো; ঘরের দরজা পার হয়েই তার মনে হলো—কেওটের পো এইবার কারে পড়েছেন! জলের দামে বাড়ি দুখানা বিকিয়ে যাবে। দেখি আমি যদি দাঁও মারতে পারি। আমাকে যে দুখানা বাড়ি ওই দিয়েছে, সেই দুখানা বন্ধক রেখে টাকা তুলে অন্তত একখানা বাড়ি কিনে ফেলতে হবে...তা হলে মাছের তেলে মাছ-ভাজা হবে!

রামযাদু রাস্তায় বেরিয়েই একখানা ট্যাক্‌সি-গাড়ি ভাড়া করে ছুটে চললো; তার সময় নেই, যথাসম্ভব সত্বর তার সব কাজ চুকিয়ে ফেলতে হবে।

রামযাদু ট্যাকসি ছুটিয়ে সব-প্রথমে গেলো সাহেবদের বাড়ি। তাকে অসময়ে ব্যস্ত হয়ে আসতে দেখে সাহেবেরা জিজ্ঞাসা করলে—হ্যালো রায় বাহাদুর, এমন অসময়ে কি কাজ?

রামযাদু ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে বললে—থাকোহরি ফেরার হয়েছে!...

সাহেবেরা আশ্চর্য ও ভীত হয়ে বললে—অ্যাঁ! কে বললে...?

থাকোহরি যে তাকে চিঠি লিখে পালিয়েছে এ কথা গোপন করে বললে—আমি এইমাত্র কতকগুলো চিঠিপত্র সই করাতে পরান-বাবুর বাড়িতে গিয়েছিলাম, তাঁর কাছেই শুনে এলাম।

সাহেবেরা উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—পরান-বাবু কি বললেন..?

—তিনি বললেন, এ কথা এখন কাউকে বোলো না; থাকোহরি করমচাঁদ ধরমচাঁদ ঠাকরসির তুলার চেক আমাকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়ে টাকা ক্যাশ করেছে; আমি চুপিচুপি ঐ টাকাটা আপিসে পুরিয়ে দেবো...

—ঠাকরসীব তুলার বিল তো অনেক টাকার! সব টাকাই কি থাকোহরি নিয়ে পালিয়েছে? কিন্তু পরানবাবুকে দিয়ে চেক সই করালে কেমন করে?

—পবান-বাবু তো এখন পত্নীশোকে বিহ্বল হয়ে আছেন, কোনো কাজকর্মই দেখেন না, তাতে আবাব থাকোহরিকে অত্যন্ত বিশ্বাস করতেন...

—আপনি রায় বাহাদুর, থাকোহরির দিকে নজর রাখতে আমাদের আগেই বলে সাবধান করেছিলেন; আমরা আপনাব সেই উপদেশ গ্রাহ্য করি নি, তথাপি আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজও আপনি সব প্রথমে দৌড়ে এসেছেন আমাদের খবর দিতে, এর জন্য আমরা আপনাব কাছে কৃতজ্ঞ।...আচ্ছা, আমরা এখনই আপিসে যাচ্ছি, এবং দেখছি কতো টাকা থাকোহরি নিয়ে ভেগেছে...পুলিসেও তো খবর দিতে হবে...আপনিও একটু সকাল-সকাল আপিসে যাবেন রায়-বাহাদুর, আপিসের সমস্ত হিসাব-নিকাশ অডিট করাতে হবে, আমাদের অডিটারদের এখনি ফোন্ করছি...

রামযাদু যে আজ্ঞে বলে খুব নিচু হয়ে লম্বা হাতে সেলাম করে বিদায় হলো।

ট্যাক্‌সি ছুটিয়ে রামযাদু গেলো মাড়োয়ারী ধনী ব্যাঙ্কার মূলজি শেঠির কাছে।

মূলজি রামযাদুকে দেখেই হেসে অভ্যর্থনা করলে—আস্‌সেন রায় বাহাদুর, কী মনে করিয়ে আসিয়েসেন? সবেরে আপকে দর্শন মিল্‌লো, হামিতো বহুৎ ভাগমান। আপনকার কোন্ খিদ্‌মতে হামি লাগতে পারি?

রামযাদু জুতা খুলে ফরাসের উপর বসতে বসতে বললে—আমার হাজার পঞ্চাশ ষাট টাকা চাই শেঠজি। আজই এখনই। পরান-বাবু বাড়ি বিক্রি করবেন, সেই বাড়ি আমি কিনবো।

মূলজি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—পরান-বাবু বাড়ি বিক্কিরি করিয়ে ফেলবেন? কেনে?

রামযাদু বলতে লাগলো—বৌ মরে গেছে; এখন তো শুধু নিজে আর মেয়ে; অতো-বড়ো বাড়ি রেখে আর কি করবেন? আর চাকরিও করবেন না, তীর্থে-টির্থে গিয়ে বাস করবেন, বোধ হয়..

মূলজি বললে—হাঁ হাঁ, এ বাত মুনাসিব আছে! তিরথ-বাস বহুত ভালা!

রামযাদু মনে মনে বললে-— তোমার গুষ্টির মাথা! তিরথ বাস ভালা তো তোদের আবু পাহাড় ছেড়ে কলকাতায় এসে টাকার কুমির হয়ে বসে আছিস কেন?...

তার পর সে প্রকাশ্যে বললে—টাকাটা হয় আমার ফড়িয়াপুকুরের বাড়ি আর বালিগঞ্জের অন্নপূর্ণা-আশ্রয় বাঁধা বেখে দেবেন, নয় তো পরান-বাবুর বাড়িটা আপনি বেনামিতে কিনে নিয়ে বাঁধা রাখুন, আমি টাকা জোগাড় করে বাড়ি খালাস করে নেবো।

মূলজি বললে—উ তো মুনাসিব বাত আছে! হামি দোনোমে রাজি! আপনকার হ্যাণ্ডনোট ভি চলতে পারে। টাকা কি এখনই চান?

বামযাদু ঘাড় নেড়ে ইঙ্গিত করলে দেখে শেঠজি বলতে লাগলো— তো চলেন গদিমে। আপকে সাথ গাড়ি-উড়ি কুছু আসে?

রামযাদু বললে—হ্যাঁ আছে, ট্যাক্‌সি। তবে আপনি একটু মেহেরবানি করে তক্‌লিফ উঠান...

"চলেন..." বলেই শেঠজি হাঁক দিলেন—এ হরকরাম, হম্‌রা কুর্তা ঔর চদ্দর ঔর জুতি তো লাও...

মিনিট দুই পবে এক ভৃত্য একটা গিলে-করা সদ্য ধোপার পাট ভাঙা আদ্দির পাঞ্জাবি, রেশমি ও জরির পাড়-দেওয়া একখানা উড়ানি ও এক জোড়া সেলিমশাহি জুতা এনে মূলজিকে দিলে। মূলজি প্রস্তুত হতেই রামযাদু তাকে নিয়ে প্রস্থান করলে।

মূলজির গদি থেকে টাকা নিয়ে মূলজিকে সঙ্গে করে রামযাদু ট্যাক্‌সি ছুটিয়ে পরান-বাবুর বাড়িতে গেলো।

রামযাদু পরান-বাবুর ঘরে গিয়ে বললে—আমি মূলজি শেঠিকে গিয়ে বলতেই ও আপনার বাড়ি কিনতে রাজি হয়েছে। ও টাকা নিয়ে এসেছে। এটর্নিকে ফোন করেছে, তিনিও এলেন বলে, এখনই লেখাপড়া হয়ে যাবে, আব আজই বেজেস্টাবিও হয়ে যাবে।

পরাণ-বাবু আশ্বস্ত হয়ে বললেন—আপনি আমাকে বাঁচালেন মুখুজ্জে মশায়! আপনার ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারবো না।

রামযাদু মুখ কাচুমাচু করে বললে—এর জন্যে আপনি এতো ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, এ তো আমার কর্তব্য, আপনার কাছে কৃতজ্ঞতার ঋণে তো আমার মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে আছে, তারই কিঞ্চিৎ পরিশোধ করবার চেষ্টা করছি।...শেঠজিকে নিচে বসিয়ে এসেছি...

পরান-বাবু ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িযে কোমরের কাপড়ের ঢল্‌কো খুঁট এঁটে কষে গুঁজতে গুঁজতে বললেন—চলুন, চলুন।

পরান-বাবু নিচের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করতেই মূলজি ত্রস্ত ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে দুই হাত জোড় করে সামনের দিকে অল্প মাথা ঝুঁকিয়ে বললে—আপনকাব বিপদের কথা শুনিয়েসে বাবুজি। বড়ি আফশোষকি বাত! আদ্‌মির নসিবই এয়ওসা...রামজি ললাটমে জো লিখা হ্যায়...রায় বাহাদুর বোললেন আপনি বাড়ি-উড়ি বিক্কিরি করে তিরথ-বাস করতে যাবেন! সো তো বহুৎ মুনাসিব হিচ্ছা!

পরান-বাবু শেঠের কথা শুনে রামযাদুর উপরে খুশি হয়ে উঠলেন—রামযাদু যে তাঁর বাড়ি বেচার প্রকৃত কারণ প্রকাশ করে নি, এবং কৌশলে তাঁর মানসম্ভ্রম বজায় রেখেছে, এতে তাঁর মন রামযাদুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে উঠলো। এবং তীর্থবাসের কথাটা তাঁর মনে উদিত হবা মাত্রই তিনি পরম আগ্রহে বললেন—হ্যাঁ শেঠজি, আমি তীর্থবাসই করবো! বুড়া বয়সে আর সংসারে জড়িয়ে থাকবো কার জন্যে?

শেঠজি খুব জোরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—আপকা লেড়কির সাদি হোয়েসে?

পরান-বাবু বললেন—না, সেটা হয়ে গেলেই আমার অবশিষ্ট একটা বাঁধন কেটে যায়।

এমন সময় শিবাপ্রসাদ দত্ত এটর্নি তাঁর এক কেরানিকে সঙ্গে করে দলিল লেখবার কাগজপত্র নিয়ে ঘরে এসে প্রবেশ করলে।

মূলজি এটর্নিকে দেখেই বললে—এই যে এটর্নি বাবুজি আসিয়েসেন। হামি পরান-বাবুর দুটা বাড়ি কিনবো, বাকি বেনামি কিনবো... রায় বাহাদুরের নামে কিনবো...

পরান-বাবু রামযাদুর দিকে একবার অপাঙ্গে দেখে নিয়ে বললেন—"বেশ!" তাঁর মন সংশয়ে সন্দেহে আন্দোলিত হয়ে উঠলো—শেঠ রামযাদুর বেনামিতে বাড়ি কিনছে কেন? এর মধ্যেও রামযাদুর নিশ্চয় কোনো কৌশল আছে! নিশ্চয় রামযাদু তাঁর বাড়িখানি একেবারে বেহাত হয়ে না যায় তার জন্যে কোনো গোপন উপায় অবলম্বন করেছে! এই কথা মনে হতেই পরান-বাবুর মন রামযাদুর প্রতি প্রীতি ও কৃতজ্ঞতায় উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। তিনি প্রসন্ন উজ্জ্বল দৃষ্টিতে রামযাদুর দিকে চাইলেন।

রামযাদুর মুখ অপ্রতিভ হয়ে শুকিয়ে উঠলো, সে তাড়াতাড়ি মাথা হেঁট করলে; তার মনে আশঙ্কা হলো—কেওটের পো বোধ হয় আমার চালবাজি ধাপ্পাবাজি ধরে ফেলেছে।

রামযাদুকে মুখ কাচুমাচু করে মাথা নিচু করতে দেখে পবান-বাবুর মুখ ও মন আরো প্রসন্ন হয়ে উঠলো—মুখুজ্জে মশায়ের চরিত্র কী স্নিগ্ধ অনাড়ম্বব নিরহঙ্কার! তিনি বিনয় মূর্তিমান। লোকের মঙ্গল করে প্রশংসা পেতে পর্যন্ত চান না; কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি পর্যন্ত সহ্য করতে পারেন না, সঙ্কোচে মুষড়ে যান!

মূলজি বললে—রায় বাহাদুর আপনকার নাম লিয়ে যেই বোললেন হামি ঐসা তুরন্ত, চলিয়ে আলাম রূপেয়া লিয়ে। আপনার জরুরি কাম, হামি ঔর দালাল-উলাল দিলোম না, যাচাই ভি করলোম না, দরাদরি ভি করতে হিচ্ছা নাই। দরদাম আপনিই একটা মুনাসিব সম্ঝে ঠিক করে দিবেন বাবুজি।

পরান-বাবু বললেন—আমার এই বাড়ি আর বাঁশতলার বাড়ি সময় নিয়ে বেচলে এক লাখ টাকা স্বচ্ছন্দে পাওয়া যেতে পারে। আপনি এখন আমাকে ষাট হাজার টাকা দিলে আমার কাজ মেটে।

শেঠ বললে—আচ্ছা বাবুজি, আপনার কোথা ভি থাক, হামের কোথা ভি থাক, হামি পচাস হাজার এক রূপেয়া দিবো।

পরান-বাবু তৎক্ষণাৎ বললেন—আচ্ছা, তাই সই।

পরান-বাবুর এই উক্তি শুনেই রামযাদু মনের খুশি মুখের কাচুমাচু ভাবে চাপা দিয়ে বললে—আমি তা হলে এখন আসি। আপিস যেতে হবে...

পরান-বাবু তার দিকে তাকিয়ে বললেন—আচ্ছা। লেখাপড়াটা হলে দলিলটা রেজেস্টারি করিয়ে আমিও যতো শিগ্‌গির পারি আপিসে যাচ্ছি। কিন্তু এ কথা এখন. .

রামযাদু বলে উঠলো সে কথা আমাকে আপনার বলতে হবে না।..তবে আমি আসি শেঠজি..শিববাবু নমস্কার...

রামযাদু ঘরে উপস্থিত তিনজনের কাছে এক নমস্কারে বিদায় নিয়ে প্রস্থান করলো।

তাব ট্যাক্সি ছুটে চললো বালিগঞ্জে অন্নপূর্ণা আশ্রমে।

সে স্ত্রীর কাছে গিয়েই উৎফুল্ল স্বরে বললে—কেল্লা ফতে রে পাগলি, কেল্লা ফতে! অসমঞ্জ মুখুজ্জেব গল্পের জগদীশ লাহিড়ি যেমন বলেছে বিট্ দি ফোর্ট উইলিয়ম আর কি!

খাসা লোক সেই জগদীশ লাহিড়ি! আমাকেও হার মানিয়েছে! তার কাছে আমি অনেক কারচুপি শিখতে পেরেছি!

মনোমোহিনী বিস্ময়ে কৌতূহলে নির্বাক হয়ে উৎসুক দৃষ্টি মেলে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে রইলো। রামযাদু কোটের ভিতরের বুক-পকেট থেকে দু তাড়া কাগজ বাহির করে বললে—পরান-বাবু এই দলিলে সই করে তাঁর স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আমাকে দান করেছেন, আর এই দলিলে বিক্রি করেছেন; এখন আমি যে দলিলটা সুবিধা বুঝবো সেইটে দিয়ে সম্পত্তি দখল করবো। কিন্তু বাড়ি দুটো ছেড়ে দিতে হলো, লোকটাব অনেক খেয়েছি, একেবারে মূলে হাভাত করতে পারলাম না। একবার মনে করেছিলাম বোকা মাড়োয়ারিটাকে দিয়ে বাড়ি দুখানা কেনাই, তার পর আমার স্বত্ব দাবি করে বেটাকে দি কলা খাইয়ে। কিন্তু শেষে ভেবে দেখলাম তাতে আমার দুর্নাম হয়ে যেতে পারে। তাই বাড়ি দুখানার লোভ সামলাতে হলো। এখন কেওটের পো পটল তুললে হয়, তার পর কালপেঁচি মেয়েটাকে যৎকিঞ্চিৎ দিয়ে বিয়ে দিয়ে দূর কবে দিয়ে রামযাদুর রামরাজত্বি! আপিসের বড়ো-বাবুও হবে এই রামযাদু! সাহেব বাঁদর দুটোও রামযাদুর মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছে! এখন কেওটের বাচ্চাকে চট্‌পট্ ভবযন্ত্রণা থেকে সরানো যায় কি করে। বুড়ো মেরে তো খুনের দায়ে পড়া যায় না!

মনোমোহিনী ভীত হয়ে বলে উঠলো—না গো না, ও-সব সর্বনেশে মতলব মনের কোণেও ঠাঁই দিও না। মা অন্নপূন্নো এমনই মনোবাঞ্ছা পুন্নো করবেন—আমরা এতো কায়মনবাক্যে তাঁর সেবা করছি।

রামযাদু বিরক্ত স্বরে বললে—দেবতার হাতে কাজের ভার দিয়ে রাখলে বড়ো দেরী হয় রে ক্ষেপি! নিজের হাতে চট্‌পট্ কাজ সারা যায়!

মনোমোহিনী শঙ্কাকুল কণ্ঠে বললে—না গো না, তোমার নিজের হাতে আর কোনো কাজ সেরে কাজ নেই। আর দুটো দিন সবুরই করো না; বুড়ো যে শোক পেয়েছে, তাতে আর কদিনই বা বাঁচবে?

রামযাদু বললে— তোমার মুখে পুরুষের এই প্রশস্তিটা শুনতে আমার কানে মন্দ লাগলো না। কিন্তু অনেক বুড়ো যে আবার কেঁচে ছুঁড়ি বিয়ে করে ঘরকন্না পাতে! সহমরণে যাওয়া যে ইংরেজ গভর্মেন্ট বন্ধ করে দিয়েছে।

মনোমোহিনী বললে—তা করুক। তুমি নিজে অনেক কীর্তি কবেছো, এখন এই শেষ কাজটা দেবতার হাতেই দিয়ে রাখো।

রামযাদু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—নাচার হয়ে দিতেই হবে। কিন্তু মোনো, তুমি রোজ দুবেলা হরির লুট...না না, হবি আবার বষ্টম মানুষ প্রাণী বধে তাঁর আপত্তি হতে পারে.. আর আপত্তিই বা কোথায়?... দৈত্য দানব তো কম সাবাড় কবেন নি!... তা যাই হোক, তাঁকেও ডেকো, আর মা-কালীর কাছে পাঁঠা মোষ মানত কোরো যেন পরানের প্রাণটা চট করে চম্পট দেয়!

মনোমোহিনী বিরক্তির ভাণ করে বললে—না; ও-সব অমঙ্গল-কামনা আমি করতে পারবো না।

রামযাদু বললে—আহা! আমাব সময়েব অত্যন্ত অভাব বলেই তো সহধর্মিণীর উপব বরাত দিচ্ছি। পরের অমঙ্গল না হলে নিজের মঙ্গল হয় কৈ?...

মনোমোহিনীকে আবার কিছু আপত্তি তুলতে উদ্যতা দেখেই রামযাদু তাকে বাধা দিযে তাড়াতাড়ি বললে—আচ্ছা, এখন তর্ক থাক, আমাকে এখনই আপিস যেতে হবে। ঝাঁ করে মাথায় দু ঘটি জল ঢেলে আসি, তুমি বামুনঠাকুরকে ভাত দিতে বলো...

রামযাদু ও মনোমোহিনী ঘরের দুদিকের দরজা দিয়ে দুদিকে নিষ্ক্রান্ত হযে গেলো।

পরান-বাবু বেলা দ্বিপ্রহরে আপিসে গিয়েই দেখলেন দুজন অডিটর আপিসের সমস্ত হিসাবের খাতা নিয়ে অডিট করতে লেগে গেছে। এই ব্যাপার দেখেই তাঁর মুখ শুকিয়ে গেলো। থাকোহরির চুরি ধরা পড়া অনিবার্য; তাঁরও অপমান হওয়া অনিবার্য। তাঁর মনে হলো সমস্ত আপিস যেন থমথম করছে, সকলে যেন তাঁর দিকে বাব বার আড় চোখে তাকাচ্ছে। পরান-বাবু সঙ্কোচে কুণ্ঠায় অপ্রতিভ ভাবে চোরের মতন নিজের জায়গায় বসতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় রামযাদু তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে এসে মুখ খুব কাচুমাচু করে বললে—সাহেবরা থাকোহরির চুবির খবর টেব পেয়েছে কেমন করে; তারা আপনাকে বলতে বলেছে যে যে কদিন অডিট হবে সে কদিন আপনি আপিসে আসবেন না...

পরান-বাবুর মুখ কালো হয়ে উঠলো, তিনি নীরবে একবার রামযাদুর মুখের দিকে তাকিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে চললেন; লজ্জায় অপমানে তাঁর উঁচু মাথা এমন হেঁট হয়ে গেলো যে তিনি আর কারো দিকে চাইতে পারছিলেন না। যেখানে তিনি এতোদিন সিংহবিক্রমে প্রভুত্ব করেছেন, সেখান থেকে অপদস্থ হয়ে বেরিয়ে যেতে তাঁর পা যেন ভেঙে পড়তে চাচ্ছিলো। তিনি কোনোমতে আপিস থেকে বেরিয়ে গিয়ে গাড়িতে চড়লেন, এবং অপমানের আতিশয্যে মুহ্যমান অচৈতন্যপ্রায় হয়ে বসে রইলেন।

রামযাদু পরান-বাবুকে চলে যেতে দেখেই সাহেবদের কামরায় গিয়ে ঢুকলো এবং সাহেবদের সেলাম করে বললে—পরান-বাবু আপিসে এসেছিলেন, অডিট হচ্ছে দেখে তিনি চলে গেলেন, বললেন সাহেবদের বোলো যতোদিন অডিট হবে ততোদিন আমি আপিসে আসবো না।

সাহেবরা বললে—বেশ। তা হলে আজ থেকে আপনি আপিসের চার্জে থাকবেন...

রামযাদু মাথা নত করে হাত তুলে কপালে ঠেকিয়ে সেলাম করবার ছলে তার পরিতোষের হাসি ঢাকা দিয়ে সাহেবদের কাছ থেকে সরে পড়লো এবং আপিসে ফিরে এসে পরান-বাবুর আসনে গিয়ে জেঁকে বসলো।

পরান-বাবু নিজের বাড়িতে ফিরে গিয়েও যেন অপরাধ ধরা পড়ায় ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন, চাকর-বাকরদের দিকেও তাকিয়ে দেখতে তাঁর সাহসে কুলাচ্ছিলো না। ঘরে ঢুকে দেখলেন কৃষ্ণকলি ঘুমিয়ে পড়েছে। কন্যার দিকে দৃষ্টি পড়তেই তাঁর বুক ঠেলে দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো।

পরানবাবু সেই ঘরে বসে একখানা চিঠি লিখলেন; নিজের উইলখানা বাহির করে তাতে কিছু লিখলেন; তার পর টেলিফোন করে আপিসে রামযাদুকে ডাকলেন।

রামযাদু টেলিফোনে সাড়া দিতেই তিনি বললেন—মুখুজ্জে মশায়, আপনি একবার দয়া করে শীঘ্র আসুন; আমি দীর্ঘকালের জন্য খুব দূর দেশে চলে যাচ্ছি, আপনাকে আমার কিছু ভার দিয়ে যাবার আছে...

রামযাদু এই সংবাদ পেয়েই উৎফুল্ল হয়ে উঠলো,...পরান-বাবু দীর্ঘকালের জন্য আপিসে অনুপস্থিত থাকলে সে-ই আপিসের বড়ো বাবু হবে, এই কথা মনে হতেই সে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বললে—আমি এখনই যাচ্ছি, আপনার সকল ভার আমি নেবো, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে কিছুদিন ঘুরে আসুন ..

পরান-বাবু যে বিদেশে বেড়াতে যাচ্ছেন এ কথা রামযাদু কাউকে বললে না; তার মনে হলো সে যদি পরান-বাবুকে কিছুদিনের জন্য নিরুদ্দেশ যাত্রায় পাঠাতে পারে তা হলে সে সাহেবদের সহজেই বুঝিয়ে দিতে পারবে যে পরান-বাবু তহবিল ভেঙে ফেরার হয়েছে। রামযাদু তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সেরে সাহেবদের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে ট্যাক্‌সি ছুটিয়ে চল্‌লো পরান-বাবুর বাড়ির দিকে।

পরান-বাবু রামযাদুকে টেলিফোনে ডেকেই এসে ঘুমন্ত কৃষ্ণকলিকে একবার চুমু খেলেন ও তার মাথায় হাত রেখে অনেকক্ষণ ধরে তাকে মনে মনে আশীর্বাদ করলেন।

তার পর কৃষ্ণকলির বিছানার পাশে অপর একটি খাটের উপর শুয়ে তিনি একটা শিশি থেকে খানিকটা কিছু গলায় ঢেলে দিয়ে চোখ বুজলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হাত নেতিয়ে বিছানার উপর ঢলে পড়লো।

রামযাদু যখন এসে সেই ঘরে ঢুকলো তখন দেখলে পরান বাবু আড়ষ্ট হয়ে বিছানার উপর পড়ে আছেন, তাঁর হাতে একটা শিশি...

এই অবস্থা দেখেই প্রথমে রামযাদুর মনটা ছাঁৎ করে উঠলো, মানুষের স্বাভাবিক পরার্থপরতা তাকে উদ্বিগ্ন করে তুললো...পরান-বাবু আত্মহত্যা করেছেন না কি? কী সর্বনাশ! এই জন্যেই কি তিনি বলছিলেন যে তিনি দূর দেশে চলে যাবেন...

রামযাদুর এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে পরমুহূর্তেই তার মনে হলো যে সে একা আত্মহত্যার ঘরে রয়েছে, সে না খুনের দায়ে পড়ে যায়। সে অমনি চেঁচিয়ে উঠলো—ওরে বোচা, ওরে কে কোথায় আছিস ছুটে আয়...

চাকরেরা দৌড়ে এলো, চেঁচামেচিতে কৃষ্ণকলির ঘুম ভেঙে গেলো; সে ঘরে লোক-সমাগম ও সকলের ব্যস্ততা দেখে সে ধড়মড় করে উঠে বসলো এবং হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে অবাক হয়ে সকলের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগলো।

রামযাদু প্রথমেই একজন চাকরকে বললে—কৃষ্ণকলিকে এখান থেকে নিয়ে যাও...ওকে কোলে করে নিয়ে বেড়াও গে...

কৃষ্ণকলিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে রামযাদু তাড়াতাড়ি পরান-বাবুর কাছে গিয়ে দেখলে যে পরান-বাবুর হাতের শিশিতে লেবেলে লেখা রয়েছে পোটাশিয়াম সায়ানাইড!

সেই কথা দুটো পড়বার সঙ্গে সঙ্গে রামযাদুর বুক কেঁপে উঠলো—তা হলে আর কোনো আশা নেই...

তথাপি তখনই সে টেলিফোন ধরে পরান-বাবুর অনুগ্রহভাজন দু-তিন জন ডাক্তারকে ডাক দিলে এবং পুলিসেও খবর দিলে।

চাকরেরা জল পাখা নিয়ে এসেছিলো। রামযাদু তাদের দিকে ফিরে ম্লান মুখে বললে—আর ও-সব কি হবে, শেষ হয়ে গেছে...।

চাকরেরা সেইখানে বসে পড়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো।

পরমুহূর্তেই রামযাদু একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলো, তাব স্বার্থবুদ্ধি সচেতন হয়ে উঠলো। সে দেখলে পরান-বাবুর বালিশের পাশে একখানা খামের চিঠি আছে, তার উপবে তারই নাম লেখা এবং সেই চিঠির পাশে একখানা লেখা কাগজ খোলা পড়ে আছে। সে তাড়াতাড়ি নিজের নাম লেখা চিঠিখানা তুলে পকেটে ফেললে এবং খোলা কাগজখানার উপর একটু ঝুঁকে পড়লে তাতে পরান-বাবুর লিখে রেখে গেছেন যে তিনি পত্নীশোক ও অপমানের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য আত্মহত্যা করেছেন।

এইবার রামযাদুর মুখের মলিনতা অনেকখানি কেটে গেলো। সে তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গেলো নিজের চিঠি পড়তে। চিঠি খুলেই রামযাদু যেমন যেমন এক এক লাইন দ্রুত পড়ে যেতে লাগলো তেমন তেমন তার মুখ ক্রমশ উজ্জ্বল প্রফুল্ল উৎফুল্ল বিকশিত হয়ে উঠতে লাগলো। পরান-বাবু সেই চিঠিতে লিখে রেখে গেছেন—

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু

প্রণামান্তে নিবেদনম্

মুখুজ্জে মশায়, আমি মহাযাত্রায় চলিলাম। পিতৃমাতৃহীনা বালিকা কৃষ্ণকলি রহিল, তাহাকে দেখিবেন। তাহার মাতার অঙ্গের যে অলঙ্কার রহিল, তাহার মূল্য পাঁচ হাজার টাকা হইবে; সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিলে হাজার পঞ্চাশ টাকা পাওয়া যাইবে; ইহা হইতে কৃষ্ণকলির গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় হইয়া যাহা উদ্‌বৃত্ত থাকিবে তাহা তাহার বিবাহের সময় তাহার যৌতুক হইবে। একটি শিক্ষিত সৎপাত্র দেখিয়া তাহাকে সম্প্রদান করিবেন।

আমার শেষ উইল আয়রন-চেস্টের মধ্যে রহিল। তাহাতে আমি আপনাকে কৃষ্ণকলির অভিভাবক ও অছি নিযুক্ত কবিয়াছি। আপনি ব্যতীত আমার হিতাকাঙ্ক্ষী আত্মীয় বন্ধু আর কেহ নাই। কৃষ্ণকলির মঙ্গলের জন্য সম্পত্তি বিক্রয় বন্ধক দিবার ক্ষমতা ও অধিকার আপনার রহিল।

আমার ঋণ কিছু নাই; দোকানদারদের পাওনা সব চুকাইয়া চলিলাম। যদি কাহারো বাকি থাকে তবে আয়রনচেস্টে যে নগদ দশ হাজার টাকা রহিল তাহা হইতে শোধ করিয়া দিবেন। ঐ টাকা হইতে আমার শ্রাদ্ধ করাইবেন—বেশি ঘটা করিবেন না, কেবল কাঙালি ভোজন কবাইলেই আমাব সন্তপ্ত আত্মা তৃপ্ত হইবে।

আপিসেব ঋণ শোধ করিবার জন্য মূলজি মাড়োয়ারির কাছে বাড়ি বেচার দেড় লক্ষ টাকার চেক সই করিয়া আপিসে লইয়া গিয়াছিলাম, সাহেবদের দিবার অবসর পাই নাই; সেই চেক আপনার নামে এন্‌ডর্স কবিয়া সই করিয়া রাখিয়া গেলাম; আপনি তাহা আপিসের হিসাবে জমা করাইয়া দিবেন।

আপনার উপর অনেক ভার চাপাইয়া গেলাম; আপনি পরোপকারী ধার্মিক মহাশয় ব্যক্তি; আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া এই ভার গ্রহণ ও সম্পাদন করিবেন এই আশা সঙ্গে লইয়া গেলাম। আপনাবে মুখে কিছু বলিয়া যাইতে পাবিলাম না; আপনি আমার মহাপ্রয়াণের আভাস পাইলে আমাকে বাধা দিতেন এই আশঙ্কায়।

যাহা মনে আসিল লিখিলাম। যাহা অনুক্ত রহিল তাহা আপনি নিজের বুদ্ধি বিবেচনা ও ধর্ম অনুসারে করিবেন এই অনুরোধ।

কৃষ্ণকলি রহিল তাহাকে দেখিবেন।

পরলোকের যাত্রী

প্রণত

শ্রীপরানচন্দ্র বিশ্বাস।

পত্র পড়েই রামযাদুব মুখ আনন্দিত হাস্যে একেবারে বিকশিত হয়ে উঠলো। পত্র পড়া শেষ হতে না হতে সে শুনতে পেলে বাড়ির দরজায় মোটর-গাড়ি এসে থামলো। রামযাদু অমনি তাড়াতাড়ি পত্রখানা জামাব পকেটে পুরে মুখ ম্লান করে ঘর থেকে বেরিয়ে যে ঘবে পরান-বাবুর দেহ পড়ে আছে সেই ঘরে গেলো। একটু পরেই ডাক্তার

এসে ঘরে ঢুকলো এবং উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—কী মুখুজ্জে মশায়! ব্যাপার কি?

রামযাদু কপালে করাঘাত করে বললে—আর ব্যাপার কি? সর্বনাশ হয়ে গেছে! হাইড্রোসিয়ানিক অ্যাসিড!

ডাক্তার তাড়াতাড়ি গিয়ে পরান-বাবুর দেহ পবীক্ষা করতে প্রবৃত্ত হলো। অল্পক্ষণ পরে ডাক্তার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—হোপলেস্...ডেড্ অ্যান্ড গন্...

দেখতে দেখতে আরো তিন জন ডাক্তার এলো। থানার দারোগা, ডেপুটি কমিশানার অফ্ পুলিশ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, করোনাব প্রভৃতিতে ঘর ভরে গেলো। সবাই দেখে শুনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌লে—এ ক্লিয়ার কেস্ অফ্ সুইসাইড্!

রামযাদু মুখ বিষণ্ন করে বললে—আপনারা একটা সার্টিফিকেট দিয়ে যান...এতো বড়ো মানী লোকটাকে মর্গে নিয়ে যেতে যেন না হয়...

সকলে একবাক্যে বলে উঠলো—অফ কোর্স...অবশ্য...

রামযাদু সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে পরান-বাবুর শব শ্মশানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। এতো সব লোক বাড়িতে অধিকক্ষণ থাকে এ তার পছন্দ হচ্ছিলো না।

পরান-বাবুর সৎকারের পর বাড়ি ফিরে গিয়ে রামযাদু মনোমোহিনীকে বললে—মনো, মা অন্নপূর্ণার কৃপাতে আমাদের অন্নের ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে উঠেছে। পবান তো প্রাণত্যাগ করলেন এখন কালপেঁচি মেয়েটা সরলেই আমরা নিশ্চিন্ত হই।

মনোমোহিনী বললে—আহা কচি মেয়ে, এসে অবধি কেবলই বাবা বাবা বলে কাঁদছে...ওর কি আপনার লোক কেউ নেই?

রামযাদু বললে—ওর মার কেউ কোথাও ছিলো না; অনাথ মেয়ে দেখে পরানের বাবা দয়া করে ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন; পরানের নিজের লোক কেউ থাকলেও থাকতে পারে...পয়সা থাকলে আপনার লোকের অভাব হয় না...পয়সার লোভে আত্মীয়তার দাবি করতে কেউ না কেউ আসবে...কিন্তু পবানের উইলে আমি কৃষ্ণকলির সম্পত্তির অছি নিযুক্ত হয়েছি...যদি কেউ আত্মীয়তা দাবি করতে আসেন, কৃষ্ণকলিকে স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু সম্পত্তি না.. সম্পত্তি ডবল-ব্যারেল বন্দুক-বিক্রিব খত আর উইল—দিয়ে আমি বক্ষা করবো...

মনোমোহিনী গম্ভীর ভাবে বললে—তা বেশি লোভ করতে গিয়ে বিপদে পড়ো না যেন...যা রয় সয় তাই ভালো...

রামযাদু বললে—কিছু ভয় নেই রে ক্ষেপি! রামযাদু সব আটঘাট বেঁধে কাজ করে..

রামযাদু পরান-বাবুর বাড়ির সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি তুলে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছে, একদিনও বিলম্ব করে নি। পাছে পুরাতন চাকরেরা থাকলে তারা পরান-বাবুর সম্পত্তির সাক্ষী হয়ে থাকে এবং কৃষ্ণকলিকে জানিয়ে দেয় যে তার বাবার কী ঐশ্বর্য ছিলো, তাই রামযাদু পরান-বাবুর ভৃত্যদের বিদায় করে দিয়েছে; বিদায় দিবাব সময় সে

তাদের বলেছে—বাবু তো দেনায় ডুবে আত্মহত্যা করলেন; বাবুর মেয়ে তো এখন আমার ঘাড়েই পড়লো, আমি বাবুর নিমক খেয়েছি, আমি তো আর ওকে ফেলতে পারবো না, আমরা খেতে পরতে পেলে কৃষ্ণকলিও খেতে পরতে পারবে; তা ছাড়া মেয়ের বিয়েও তো আমাকেই দিয়ে দিতে হবে...বাবু তো এক পয়সাও রেখে যান নি...কিন্তু আমার তো এমন অবস্থা নয় যে তোমাদের সকলকে আমি রাখি, তোমরা এখন এসো গে, পরে দরকার হলে তোমাদের খুঁজে ডেকে নেবো, তোমরা হলে পুরোনো বিশ্বাসী চাকর...তোমাদের আমি অমনি ছাড়িয়ে দিতে পারবো না, তোমাদের আমি এক বছরের মাইনে দিয়ে বিদায় দেবো...আমার যতক্ষণ এক পয়সা আছে ততক্ষণ বাবুর বদনাম হতে দেবো না...

চাকরেরা চোখের জল মুছতে মুছতে ও রামযাদুর বদান্য সদাশয়তার প্রশংসা শতমুখে প্রচার করতে করতে বিদায় হয়ে চলে গেছে।

তারপর রামযাদু মূলজি শেঠির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে বললে—শেঠজি, পরান-বাবু তো তার বাড়িঘর সব কিছু আগেই আমাকে বিক্রি করে চুকেছিলেন; আরও টাকার দবকার হওয়াতে আমাকে বললেন—দেখুন মুখুজ্জে মশায়, আমার আরও পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকার দরকার হয়েছে, আপনি যদি ধার দিতে পারেন...আমার কাছে অতো টাকা কোথায় যে আমি ধার দেবো? তখন আমি আমাব নিজেরই কেনা বাড়ি আপনার কাছে বন্ধক রেখে পরান-বাবুকে টাকা জোগাড় করে দিলাম। তা পরান-বাবু তো আত্মহত্যা করে আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা মেরে চলে গেলো। আমি যখন মধ্যস্থ হয়ে আপনার কাছ থেকে টাকা নিয়েইছি, তখন ও-টাকার জন্যে আমিই দায়ী, যদিও আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে ফাঁকি দিতে পারতাম...আপনার টাকাটা আপনি বুঝে নিন...কিন্তু কিছু কম নিতে হবে মূলজি.. কিছু লোকসান আপনারও হোক, কিছু আমারও হোক...

মূলজি মাড়োয়াড়ী রামযাদুর কথা শুনে কিছু বলতে যাচ্ছিলো—হামি...

কিন্তু মূলজির বাক্যের উপক্রমেই রামযাদু বাধা দিয়ে বললে—বেশি ছাড়তে বলছি না...দশ হাজার...মকদ্দমা মামলা করতেও তো খরচ আছে. .

মূলজি বলে উঠলো—এ ক্যা বাত বাবুজি! আপকো বিস্‌ওয়াস করকে হামি রূপৈয়া দিলো...

রামযাদু অমনি বললে—আপনার আপত্তি থাকে আমি জেদ করবো না, আমি যখন মধ্যস্থ হয়েছিলাম, তখন আমিই দায়ী, আমার এক পয়সা থাকতে আমি কাউকে ফাঁকি দিতে পারবো না...আচ্ছা আপনার টাকা নিন, কেবল সুদটা ছেড়ে দিন...

মূলজি সন্তুষ্ট হযে বললে—আচ্ছা সো হামি ছাড়িয়ে দেলো.. পান সও রূপৈয়া তো...

রামযাদু পরান-বাবুর আপিসের ঋণ শোধের জন্য সংগৃহীত টাকা থেকে মূলজির ঋণ শোধ করে দিলে এবং পাঁচ শত টাকা সুদ বাঁচিয়ে লাভ ক'রে যথালাভের আনন্দ নিয়ে বাড়ি ফিরে এলো।

কিন্তু রামযাদুর লাভ পাঁচ শত টাকাব চেয়ে ঢের বেশি হযে গেলো...বামযাদুর বরাত-জোর। রামযাদু যে নিজের টাকা দিযে পবান-বাবুর ঋণ শোধ করে দিচ্ছে এই খোশনাম

শীঘ্রই শহরময় রাষ্ট্র হয়ে গেলো; বাজারে তার ক্রেডিট দ্বিগুণ বেড়ে গেলো। খবরের কাগজে রায় বাহাদুর রামযাদু মুখুজ্জের প্রশংসা বিঘোষিত হতে লাগলো।

পরদিন রামযাদু আপিসে গিয়ে সাহেবদের সঙ্গে দেখা করতে গেছে, সাহেবরা বললে—পরান-বাবু আত্মহত্যা করলেন, বড়োই দুঃখের কথা! তিনি যদি আমাদের বলতেন তা হলে আমরা তাঁকে ঋণ শোধ করবার দীর্ঘ সময় দিতাম, তিনি ক্রমে ক্রমে শোধ করে দিতেন...তা ছাড়া বাস্তবিক এ ঋণ তো তাঁর নয়, যদিও তাঁর জামিনের জন্য তিনি ন্যায়ত ধর্মত দায়ী ছিলেন...

রামযাদুর মুখ বিষম মলিন করে বললেন বড়োই দুঃখের কথা। আমাকেও যদি ঘুণাক্ষরে আগে জানাতেন, আমি আমার সর্বস্ব বেচে বন্ধক রেখে তাঁকে টাকা জোগাড় করে দিতাম...

সাহেবরা খুশি হয়ে বললে—আপনার মতন বিপদের বন্ধু পাওয়া-বড়ো সৌভাগ্যের কথা রায় বাহাদুর! আমরা কাগজে দেখলাম, আপনি পবান-বাবুর অনেক ঋণ শোধ করে দিয়েছেন, চাকরদের বকশিশ দিয়ে বিদায় দিয়েছেন, অনাথা মেয়েটিকে আশ্রয় দিয়েছেন! ধন্য আপনি!

রামযাদু মুখ কাচুমাচু করে বললে—আমি প্রশংসা পাবার যোগ্য কিছুই করি নি; আমার যা কিছু সবই পরান-বাবুর...আপনারা যদি বলেন তা হলে আপিসের ঋণটাও...

সাহেবরা উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলো—না না, সে আপনাকে দিতে হবে না, আমরা পরান-বাবুর কর্মকুশলতায় অনেক রকমে অনেক লাভ করেছি, দেড় লাখ টাকা তাঁব নামে আমরা খরচ লিখে দিয়েছি...তা ছাড়া প্রভিডেন্ট ফান্ডে তাঁব কিছু টাকা আছে.. থাকোহরিটাকে গেরেপ্তার করতে পারলে তার কাছ থেকেও কিছু আদায় হবে...সে যাই হোক, আপনার সদাশয় প্রস্তাবের জন্য আপনাকে শত ধন্যবাদ রায় বাহাদুর...আজ থেকে আপনিই আপিসের বড়ো-বাবু নিযুক্ত হলেন বায় বাহাদুর...

রামযাদু অবনত হয়ে সেলাম করে প্রফুল্ল মুখে বললে আমার উপর আপনাদেব অসীম অনুগ্রহের উপযুক্ত হতে আমি চেষ্টা কববো...

রামযাদুর মনোবাঞ্ছা সম্পূর্ণ হলো, তার জীবন-তরণী অনুকূল পবনে লাভের বাণিজ্যে যে বন্দরেই ভিড়ছে সেখানেই তার ধূলা-মুঠা ধবতে সোনা-মুঠা হয়ে উঠছে।

কয়েক দিন পবে এক ব্যক্তি এসে বামযাদুকে বললে—আমি পরান-বাবুর ভাইপো...আমি তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকাবী...

রামযাদু তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাব মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—সম্পত্তি রেখে মরে গেলে অনেক ভাইপো জোটে। বেশ, ভাইপো মশায়, পরান-বাবুর সম্পত্তির মধ্যে আছে একটি খাঁদা কালো-কুচ্ছিত মেয়ে, স্বচ্ছন্দে নিযে যেতে পারেন, আর কুল্লে লাখ দুই টাকা ঋণ, যা আমি শোধ করে দিয়েছি, সেটাও নিয়ে গেলে আমি সুখী হবো, বুঝছেন তো আজ কালকাব দিনে অতোগুলো টাকা...

সে ব্যক্তি ক্রুদ্ধ স্বরে বলে উঠলো—আপনি প্রবঞ্চনা কবছেন...

রামযাদু রুষ্ট না হয়ে হেসে বললে—বেশ, তা হলে আমার দাবোয়ানকে ডাকবার

আগে আপনি রাস্তা দেখুন...আদালতের দরজা তো খোলা আছে...স্ট্যাম্পকাগজের দাম ট্যাকে না থাকে, আমি দিয়ে দিচ্ছি...

এই বলে রামযাদু পকেট থেকে একমুঠো টাকা তুলে ভাইপোর দিকে ছড়িয়ে ফেলে দিলে।

পরান-বাবুর ভাইপো হতে অভিলাষী লোকটি একেবারে নরম হয়ে গিয়ে বললে—আপনি রাগছেন কেন? আপনারা বড়ো লোক, আপনাদের সঙ্গে কি আমরা মামলা-মকদ্দমা করতে পারি? তবে আমার যেটা ন্যায্য পাওনা...

রামযাদু ঈষৎ হেসে বললে—আপনার ন্যায্য পাওনা হচ্ছে, পরান-বাবুর ঋণ আর তাঁর মেয়েটি...তা আপনি স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পারেন, আমার একটুও আপত্তি নেই...কিন্তু পরান-বাবুর উইল চিঠি দলিল সব আমার কাছে আছে, আপনি কৃষ্ণকলিকে অবলম্বন করেও আমাকে কাবু করতে পারবেন না।...

তখন সেই লোকটি মুখ শুষ্ক করে উঠে চলে যেতে যেতে বলে গেলো—আমি কাল আবার আসবো, আপনি একটু ভেবে দেখবেন ধর্মত ন্যায়ত আমি কিছু পেতে পারি কি না...

রামযাদু বললে—ধর্ম আব ন্যায় আপনার দিকে কিছুমাত্র অনুকূল থাকলে পরান-বাবু তাঁর উইলে আপনাব নাম উল্লেখ করতে ভুলতেন না।

এর পরে আর কোনোদিন সেই লোকটি রামযাদুকে দেখা দিযে বিরক্ত করতে আসে নি। রামযাদুও অতি শীঘ্র অনায়াসে পরান-বাবুব সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ ও আয়ত্ত করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসলো।

কিন্তু এর অল্প পরেই আর একটি ক্ষুদ্র উপদ্রব এসে রামযাদুর স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত ঘটাবার উপক্রম করলে। সত্যদাস রামযাদুকে ব্যাঘাত ঘটাবার উপক্রম করলে। সত্যদাস রামযাদুকে বললে—পরান-বাবুর কোন বিক্রি-কবালায় আমি নাকি সাক্ষী আছি?

রামযাদু হেসে বললে—তোমার স্মৃতি-শক্তি এতো ক্ষীণ! দলিলে সই করেছিলে মনে নেই...

সত্যদাস বললে—সে তো আপনি বলেছিলেন 'আমার পাবলিশারের সঙ্গে একখানা বইয়ের রয়ালটির লেখাপড়া হবে, তাতে তুমি একটা সাক্ষীর স্বাক্ষর দাও।' আমি আপনার কথায় বিশ্বাস করে সাদা স্ট্যাম্পকাগজে সই করে দিয়েছিলাম।

রামযাদু আশ্চর্য হয়ে চক্ষু বিস্ফারিত করে বললে—তুমি কারো কাছে টাকা খেয়ে উৎপাত তুলতে এসেছো নাকি?

সত্যদাস বললে—টাকা আমি আপনারই খেয়েছি, কিন্তু ধর্মের মাথা খেতে পারি নি...যদি দরকার হয় তবে আমি সত্য কথা বলবো তাই আপনাকে বলে রাখছি...

রামযাদু চোখ পাকিয়ে ভয় দেখিয়ে বললে—আমার সঙ্গে শত্রুতা করলে তোমার কি ভালো হবে?

সত্যদাস নম্রস্বরেই বললে—শত্রুতা আমি করছি না; সত্য আমি গোপন করবো না; তাতে আপনি রাগ করলে কি করবো?

রামযাদু চোখ রাঙিয়ে বললে—তোমার চাকরি, কবিত্বের যশ কার হ'তে?

সত্যদাস বিনীতভাবে বললে—কিন্তু সে সবের চেয়েও সত্য বড়ো.. আমার বাবা আমার নাম রেখেছিলেন সত্যদাস...

রামযাদু এ কথার উত্তরে কেবল বললে—আচ্ছা!

সেইদিনেই রামযাদু আপিসে গিয়ে সত্যদাসকে এক মাসের নোটিশের বদলে একমাসের মাইনে আগাম দিয়ে বল্‌লে—তোমাকে আর বিশ্বাস নেই তুমি পথ দেখো; আমার বাড়িতেও আর তোমার থাকা হবে না...

সত্যদাস নম্রভাবে নমস্কার করে বললে—যে আজ্ঞে.

সত্যদাস যখন আপিস থেকে বেরিয়ে যায় তখন তার সহকর্মীরা চুপিচুপি তাকে জিজ্ঞাসা কবলে—বড়ো বাবু সমস্যা কিসে?

সত্যদাস হেসে বলে গেলো—আমাকে আর বিশ্বাস করতে পারছেন না...

সকলে বলাবলি করতে লাগলো—একা থাকোহরি চুবি করে সকলের উপবই অবিশ্বাস টেনে দিয়ে গেছে; ছোঁড়া কী সর্বনাশই না করে গেলো—

পরদিন বামযাদু অনেক খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে—

চুরি! চুরি! চুরি!

সত্যদাস দত্ত নামে এক ব্যক্তি আমার বাড়িতে থাকিত; তাহার অসৎচরিত্র মিথ্যাবাদিতা ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাহাকে চাকবি হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে; সে যাইবার সময় আমার লেখা বহু কবিতার খাতা চুরি কবিয়া লইযা গিযাছে, সে হয় তো আমার ছদ্মনাম রামশর্মা ব্যবহার করিয়া অথবা নিজেরই নামে ঐসব কবিতা সাময়িক পত্র অথবা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে চেষ্টা কবিবে; কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই আমার কবিতার স্টাইল দেখিয়াই চিনিতে পারিবেন যে সেগুলি চোবাই মাল। ঐ ব্যক্তি আমার শত্রুতা সাধনের জন্য অন্যবিধ চেষ্টাও কবিতে পারে। সুতরাং পূর্বাহ্নেই তাহার পরিচয় দিয়া রাখিলাম। শ্রীরামযাদু মুখোপাধ্যায়।

সত্যদাস সেই বিজ্ঞাপন পড়ে হতাশার হাসি হেসে আপন মনে বললে—কবি বলে পরিচিত হবার সখ ছিলো; যা লিখে প্রকাশ করেছি তাতে সুখ্যাতি পেয়েচে রামযাদু; এখন তো প্রকাশেব পথও বন্ধ হলো; নিজেব জিনিস এখন আমাব চোবাই মাল। ধন্য রামযাদুব মহিমা! ধন্য তার কপাল!

"আমি শুনে হাসি আঁখিজলে ভাসি,
এই ছিল মোর ঘটে!
তুমি মহাবাজ, সাধু হলে আজ,
আমি আজ চোর বটে!"

পরান-বাবুর মৃত্যুর বারো বৎসব পরে। রায় বাহাদুর রামযাদু নিরুপদ্রব প্রতিষ্ঠা লাভ কবে সমাজে ও আপিসে আধিপত্য করছে। তার সংসারে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটেছে—তার

মেয়েদের বিয়ে হয়ে তারা শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে; তার ছেলে বনমালী কেবল মাত্র রামযাদুর ছেলে বলেই প্রত্যেক পরীক্ষায় খুব সম্মানিত উচ্চ স্থান অধিকার করে করে এম-এ পাস করেছে, এখন সে সিংহলে মহেন্দ্র কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছে। তাব এই কর্ম সংগ্রহ করে দিয়েছে রামযাদুরই প্রথমা পত্নীর পুত্র প্রিয়তোষ—সে ঐ মহেন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ। রামযাদু শ্বশুরের সঙ্গে ঝগড়া করে তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে এবং তাদের জব্দ করবার জন্য সে পুনরায় মনোমোহিনীকে বিবাহ করে। কিন্তু তারপর তার শ্বশুর বা স্ত্রী কেউ রামযাদুর কাছে অবনতি স্বীকার না করাতে রামযাদুও আর তাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখেনি; প্রিয়তোষ তার মাতামহের বাড়িতে থেকেই মানুষ হয়েছে, কৃতবিদ্য হয়েছে, এবং রামযাদুর স্বার্থপরতার প্রভাব না পড়াতে তার চিত্ত উদাব প্রশস্ত ও ন্যায়নিষ্ঠ হবার অবকাশ পেয়েছে। প্রিয়তোষের মাতামহেব ও মাতার মৃত্যু হয়েছে, তথাপি রামযাদু তার কোনো খোঁজ খবর কখনো নেয় নি, এবং প্রিয়তোষও কেবল পিতার নাম জনশ্রুতিতে জানা ছাড়া পিতার কোনো পরিচয়ই পায় নি। রামযাদুও তার সম্বন্ধে এমন উদাসীন ছিলো যে কেউ জানতোই না যে রামযাদুর অপর এক স্ত্রী ছিলো বা তাব গর্ভজাত এক পুত্র কুত্রাপি বর্তমান আছে। পূরা সিকি শতাব্দী পরে রামযাদুর পুত্রস্মৃতি সঞ্জীবিত ও পুত্রস্নেহ উদ্বেলিত হয়ে উঠলো হঠাৎ যেদিন সে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলে সিংহলের মহেন্দ্র কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক চাই এবং সেই পদপ্রার্থীদের আবেদন করতে হবে কলেজের অধ্যক্ষ প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায়েব কাছে। বামযাদু বনমালীকে ডেকে সেই বিজ্ঞাপনটি দেখিয়ে বললে—"বুনো তুই দরখাস্ত কর—আমি অন্য জোগাড় দেখবো।" বাবার জোগাড যে কী রকম অমোঘ তার ধারণা বনমালীর বিলক্ষণই ছিলো; সে প্রফুল্ল অন্তরেব উৎসাহের সঙ্গেই আবেদন করলে। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে রামযাদুরও একখানি বাৎসল্য রসসিক্ত পত্র প্রিয়তোষের নামে রওনা হয়ে গেলো। পিতার প্রথম পত্র পেয়ে প্রিয়তোষ এতো আনন্দিত হলো যে সে শূন্য অধ্যাপকের পদে বনমালীকেই নিযুক্ত করলে এবং মনে মনে তার আশা জেগে উঠলো যে হয তো তার কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত পরিচয়েব সূত্র ধরে তার পিতৃপরিচয়ও একদিন ঘটে উঠবে, অন্তত সে ভাইয়ের মুখে তাদের পিতার পরিচয় তো কিছুও জানতে পারবে। পিতৃপরিচয় না জানার লজ্জা ও ক্ষোভ প্রিয়তোষকে পীড়া দিতো; সেই পীড়া থেকে অব্যাহতি পাবার সম্ভাবনায় তার লোভ প্রবল হয়ে উঠলো। এই অবস্থায় বনমালীকে কাছে পেয়ে তাকে যত্ন করতে পারবে বলে সে যেন কৃতার্থ হয়ে উঠলো। এতোদিন পরে বনমালী সিংহলযাত্রার দিনে ট্রেনে উঠে ট্রেন ছাড়বার দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়ার পর বাবার মুখ থেকে যখন শুনলে—প্রিয়তোষ তোমার জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভাই—তখন সে আশ্চর্য হয়ে গেলো এবং পরক্ষণেই বুঝতে পারলে কেন অতো সহজে সে ঐ চাকরিটি পেয়ে গেছে। পিতাব রহস্যজটিল জীবনের সম্বন্ধে তার কৌতূহল জেগে উঠলো কিন্তু আর কিছু জানবার আগেই ট্রেন ছেড়ে দিলে। বনমালী ক্ষীণ আশা নিয়ে চললো অচেনা দাদার কাছ থেকে তার পরিচয় হয় তো কিছু জানতে পারবে।

রামযাদুর পরিবারের লোক যেমন স্থানান্তরিত হয়ে কমে গেছে, তেমনি একজন লোক

তাদের পরিবারভুক্ত হয়েছে,—সে কৃষ্ণকলি। কৃষ্ণকলির বয়স এখন উনিশ বছর হয়েছে, কিন্তু এখনো তার বিবাহ হয় নি; তার বিবাহ দেবার জন্যে রামযাদু বিশেষ কোনো চেষ্টাও করে নি। কৃষ্ণকলি অকস্মাৎ বাপ মাকে হারিয়ে পরের আশ্রিত হয়ে এমন লজ্জায় সঙ্কুচিত ও ধীর শান্ত হয়ে পড়েছে যে সে যে বাড়িতে আছে তা রামযাদুরা অনেক সময় অনুভবই করে না; তার উপর কৃষ্ণকলি একটু বড়ো হয়ে উঠে জ্ঞানলাভ করতেই আশ্রয়দাতার সংসারে যে রকম কাজ করতে নিজেকে নিযুক্ত করে তাতে তাকে বিয়ে দিয়ে বাড়ি থেকে সরিয়ে দিতে রামযাদুর মন চাইছিলো না।

মনোমোহিনী আর অনাথ-আশ্রমের ছেলেমেয়েরা রামযাদুর গোরুর গোয়াল সাফ করে, জাব দেয়; বাগান নিড়ায়, ফল পাড়ে, তরি-তরকারির ক্ষেতে জল দেয়; গাড়ি ধোয়; ঘর ঝাঁট দেয়, ঝুল ঝাড়ে; এমন করে তারা সবাই স্বাবলম্বন শেখে। এইসব দেখে কৃষ্ণকলিও তাদের সঙ্গে কাজ করতে যায়। কিন্তু মনোমোহিনী বলে—আহা, তুমি কি ও-সব পারো? তোমার বাড়িতে কতো গণ্ডা চাকর-দাসী খাটতো! তুমি রেখে দাও রেখে দাও...

মনোমোহিনী আর রামযাদু কৃষ্ণকলিকে যেন আহা দিয়ে ঘিরে রেখেছে—সে চলতে শোনে আহা! ফিরতে শোনে আহা! এতে সে লজ্জার সঙ্কোচ কাটিয়ে এদের বাড়িটাকে নিজের বাড়ি করে নিতে কিছুতেই পারছিলো না; সে একটি সহজ স্থান এ পরিবারের মধ্যে করে নিতে পারছিলো না; পরানুগ্রহের কুণ্ঠা ও পরগলগ্রহ হওয়ার অপ্রতিভ ভাব কৃষ্ণকলির দেহ মন ও আচরণকে জড়িয়ে তাকে ভারি নম্র, ধীর, স্নিগ্ধ করে তুলেছিলো; তার এই মৃদুতা তার দেহের কুৎসিতাকে ঢেকে তাকে একটি মাধুর্য ও শ্রীদান করেছে। মনোমোহিনী আর রামযাদু যতোই কৃষ্ণকলিকে কাজ করতে বারণ করে, ততোই সে অধিক লজ্জিত হয়ে অধিকতর কাজের মধ্যে নিজেকে লিপ্ত করে দেয়; অনেক সময় সে তার আশ্রয়দাতাদের লুকিয়ে লুকিয়ে কাজ করে। এতে তার কাজের নিপুণতা ক্ষিপ্রকারিতা এবং সৌন্দর্যবোধ অসামান্যরকমে বেড়ে চলছিলো। মনোমোহিনী আর রামযাদু ঘুম থেকে ওঠাবার আগেই কৃষ্ণকলি শয্যা ত্যাগ করে, এবং তৎপরতার সহিত সমস্ত গৃহকর্ম সম্পন্ন করে রাখে। মনোমোহিনী স্নান করতে গিয়েই দেখে তার কাপড়, শেমিজ স্নানের ঘরের আলনায় সাজানো আছে; রামযাদু ঘর থেকে বেরিয়ে অল্পক্ষণ পরে ফিরে এসেই দেখে ঘরখানি সুশৃঙ্খলার শ্রী ধারণ করে ধূলিলেশশূন্য হয়ে আছে; রামযাদু বাহির থেকে এসে জুতো ছেড়ে রেখে যায়, ফিরে এসে আবার পায়ে দেবার সময় দেখে জুতো ধূলিমুক্ত হয়ে আয়নার মত চকচক করছে। রামযাদু স্নান করে এসে দেখে তার পূজার জো প্রস্তুত , পূজা সেরে উঠে দেখে তার জলখাবার তার জন্যে অপেক্ষা করছে। রামযাদু আপিসে যাবার সময় এককৌটা পান নিয়ে যায়; আপিসের চাপকান গায়ে দিতে গিয়ে দেখে সদ্য সাজা সিক্ত পানের খিলি চুন আর পানের বোঁটা দিয়ে কৌটার উদর পরিপূর্ণ হয়ে আছে। মনোমোহিনী আর রামযাদুর কিছু চেয়ে পেতে হয় না; এবং কামধেনুর মতন তাদের সকল কামনা কে যে অলক্ষ্যে পূরণ করছে তা তারা বিলক্ষণ জানে।

একদিন রাত্রে খেতে বসে রামযাদু বললে—আজকে আমার কসের পোকা-খাওয়া দাঁতটা একটু কন্‌কন্‌ করছে।

মনোমোহিনী কোনো কথা বললে না।

রামযাদু খেয়ে উঠে আঁচাতে গিয়ে দেখলে তাব ঘটিতে গরম জল রয়েছে।

মনোমোহিনী কথায় আদর মাখিয়ে বলে—দেখ্ মা কলি, তুই আমাদেব মাথা খেলি; তুই যদি কখনো পরের বাড়ি চলে যাস, তা হলে আমবা মা-ছোড় হবো; তখন আমাদেব দুর্দশার অন্ত থাকবে না।

কৃষ্ণকলি লজ্জায় সুখে অপ্রতিভ ও সঙ্কুচিত হয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

একদিন দুপুব বেলা কৃষ্ণকলি মনোমোহিনীকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে চুপিচুপি আলোর চিমনিগুলো নিয়ে সাবানজল দিয়ে ধুতে বসেছে। সে আপন মনে কাজ করে যাচ্ছে; একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। হঠাৎ সে তার পিছনে মনোমোহিনীর কোমল কণ্ঠের আদরমাখা ভর্ৎসনা শুনে চমকে উঠলো—তুমি চাকরদাসীগুলোকে একেবার কুড়ে বানিয়ে দিলে। সব কাজ যদি তুমিই করবে তো ওরা কি শুধু বসে বসে মাইনে নিয়ে ভাতের কাঁড়ি গিলবে।

কৃষ্ণকলি মনোমোহিনীর অপ্রত্যাশিত আগমনে ও হঠাৎ পিছন থেকে তার কথা শুনে চম্‌কে উঠেছিলো এবং গোপন অপরাধ ধরা পড়ে গেছে এইরূপ ভাবে একটু ব্যস্ত হয়ে পড়াতে সাবানে পিছল হাত থেকে একটা চিমনি স্খলিত হয়ে শানের উপর পড়ে গেলো এবং চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেলো।

কৃষ্ণকলি আরো অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি সেইসব ভাঙা কাঁচ কুড়াতে লাগলো।

মনোমোহিনী ব্যস্ত হয়ে বললে—ভাঙা কাঁচে হাত দিয়ো না, হাত কেটে যাবে; রেখে দিয়ে উঠে এসো.. ধীরাকে ডেকে দিচ্ছি কাঁচগুলো ঝাঁটিয়ে ফেলে দিক...

মনোমোহিনীর নিষেধ শোনবার আগেই কৃষ্ণকলির আঙুল কাঁচে কেটে গেলো। সে মনোমোহিনীর আদেশ মান্য করে যখন উঠে দাঁড়ালো তখন তার আঙুল দিয়ে টসটস করে রক্ত পডছে। সে তাড়াতাড়ি সেই হাত কাপড়ের তলায় লুকালে, কিন্তু মাটিতে পড়া রক্তের ফোঁটা মনোমোহিনীর দৃষ্টিতে পড়লো।

মনোমোহিনী বলে উঠলো—হাত কাটলে বুঝি? দেখি দেখি...

মনোমোহিনী জোর করে কৃষ্ণকলির হাত কাপড়ের তলা থেকে বাব করেই চেঁচিয়ে উঠলো—ওমা! কাঁচে-কাটা হাত লুকিয়ে পালাবার চেষ্টা! চলো চলো টিংচার আয়োডিন দিয়ে বেঁধে দি গে।

মনোমোহিনী কৃষ্ণকলিকে হাত ধরে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে কাটা আঙুলে টিংচার আয়োডিন লাগিয়ে দিলে; এবং নিজের পরনের কাপড়ের আঁচল ছিঁড়ে কৃষ্ণকলির আঙুলে পটি বেঁধে দিলে।

কৃষ্ণকলি আঙুলের আঘাতের চেয়ে মনোমোহিনীর মমতার আঘাতে বেশি অভিভূত হয়ে পড়লো; মনোমোহিনীর পবনের কাপড়খানা যে জীর্ণ ছিন্ন পুরাতন ছিলো সেদিকে তার লক্ষ্যই গেলো না, তার কেবল মনটা জুড়ে এই কথাই কেবল ঘুবে বেড়াতে লাগলো যে কাকিমা নিজেব পরনের কাপড় ছিঁড়ে আমার আঙুল বেঁধে দিলেন!

রামযাদুর ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েগুলিব যত্ন সেবা করার ভারও কৃষ্ণকলি স্বেচ্ছায়

গ্রহণ করেছে। তারাও ছোড়দি ছাড়া কারো কাছে আবদার উপদ্রব করতে যায় না।

কৃষ্ণকলির অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও স্মরণশক্তি। রামযাদুর বাড়িতে আসার পর সে লেখাপড়া করবার অবকাশ পায় নি; কিন্তু সে রামযাদুর ছেলেমেয়েদের পড়া শুনে আব অঙ্ক কষা দেখে পড়তে লিখতে শিখেছে; সে নিজে নিজে লুকিয়ে লুকিয়ে যে বই হাতের কাছে পায় বাছ বিচার না করে পড়ে, এবং যা একবার পড়ে তা তার মনে মুদ্রিত হয়ে যায়। এই রকম করে সে ইতিহাস ভূগোল স্বাস্থ্যরক্ষা বস্তুপরিচয় এবং বাংলা ইংরেজি সংস্কৃত ভাষা প্রভৃতি সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ কবেছে সে রকম জ্ঞান এ বাড়িতে আর কারো নেই; কিন্তু সে এই জ্ঞানও গোপন কবেই রাখে; তার সকল তাতেই লজ্জা ও সঙ্কোচ। বামযাদুর কাছে ভারতবর্ষের প্রায় সকল সাময়িক পত্রই অমনি আসে; সেগুলি খোলবার সময়ও রামযাদুর হয় না; ডাক এলেই কৃষ্ণকলিই কাগজগুলির মোড়ক খুলে রামযাদুর টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখে; এবং রামযাদু আপিসে গেলে ও মনোমোহিনী দিবানিদ্রায় অভিভূত হলে কৃষ্ণকলি সেইসব কাগজ নিয়ে পড়ে। অল্প সময়ের মধ্যে বেশি পড়ে নেবার ইচ্ছায় আগ্রহে ও চেষ্টায় কৃষ্ণকলি দ্রুত পাঠের শক্তি অর্জন করেছে। মাসিকপত্রের গল্প উপন্যাস থেকে আরম্ভ করে ভূতত্ত্ব জীবতত্ত্ব বা বৈজ্ঞানিক বাসায়নিক কোনো প্রবন্ধই সে বাদ দেয় না। এবং কোন্ বছবের কোন্ কাগজের কোন্ সংখ্যায় কোন্ প্রবন্ধ বা গল্প আছে তা তার মনে থেকে যায়; সে যেন জীবন্ত সূচীপত্র।

রামযাদু অতি পুরাতন কাগজে প্রকাশিত নানা লেখকের লেখা একই বিষয়ের কতকগুলি প্রবন্ধ একত্র সংগ্রহ করে সবগুলির তথ্য মিলিয়ে একটি একটি প্রবন্ধ লেখে, এবং তাতে তার বিদ্যা ও জ্ঞানের খ্যাতি চারিদিকে বিঘোষিত হতে থাকে। রামযাদু এই বকম একটা অরিজিন্যাল রিসার্চ বা মৌলিক গবেষণার কার্যে নিযুক্ত ছিলো; প্রাচীন ভারতে নাবীর সামাজিক অধিকার সম্বন্ধে সে প্রবন্ধ লিখবে এবং এ সম্বন্ধে প্রাচীন কোন মাসিক পত্রে কি প্রবন্ধ আছে তাব সন্ধানে বিব্রত হয়ে উঠেছে; অথচ এই চুরিবিদ্যায় সে অপরের সাহায্যও নিতে পারে না, তা হলে তার চাতুরি ফাঁস হয়ে যাবে যে।

রামযাদুব স্মরণ হচ্ছে বৌদ্ধযুগে নারীর অবস্থা সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ সে কোথায় পড়েছে; কিন্তু কোন্ কাগজের কোন্ বছরে তা সে মনে আনতে পারছে না: সে যতো রাজ্যেব কাগজ পেড়ে হাঁটকে গলদঘর্ম হয়ে উঠেছে।

এমন সময় সদাসঙ্কুচিতা ব্রীড়াবনতা স্বল্পভাষিণী কৃষ্ণকলি এসে সেখানে দাঁড়ালো। রামযাদুকে বিব্রত দেখেই কৃষ্ণকলির চোখে একটি কাতর প্রশ্নসূচক দৃষ্টি ফুটে উঠলো।

বামযাদু কৃষ্ণকলিকে এসে দাঁড়াতে দেখেই তার দিকে ফিরে তাকিয়ে হেসে বললে— তুমি তো আমার বিপত্তারিণী, এই লেখাপড়ার কাজেও যদি তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারতে!

কৃষ্ণকলি নিজের অক্ষমতার লজ্জায় লজ্জাবতী-লতার মতো সঙ্কুচিত হয়ে গেলো; তার মনে হলো—'হায় হায় নির্বুদ্ধি আমি! আমি কেন ভালো করে লেখাপড়া শিখি নি?" তার

একবারও মনে হলো না যে তার এই অজ্ঞানের জন্য দায়ী রামযাদুই, সে তাকে লেখাপড়া শেখাতে নিতান্তই অবহেলা করেছে।

কৃষ্ণকলিকে লেখাপড়া না শেখানোর মধ্যেও রামযাদুর স্বার্থবুদ্ধি খেলা করেছে; লেখাপড়া শিখে চালাক চতুর হয়ে কৃষ্ণকলি পাছে রামযাদুর প্রবঞ্চনা ধরে ফেলে, তার পৈতৃক অধিকার দাবি করে, এই ভয়েই রামযাদু কৃষ্ণকলিকে লেখাপড়া শেখানোর কোনো ব্যবস্থাই করে নি। আর এই ভয়েই সে কৃষ্ণকলির বিবাহ দেবারও চেষ্টা করছিলো না, পাছে তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তার পিতৃধন পুনরুদ্ধারের জন্য কোনো রকম চেষ্টা করে রামযাদুর উদ্বেগ উৎপন্ন করে। এবং পাছে লোকে ঘুণাক্ষরেও বলে যে ওর বাপের টাকায় বড়োলোক হয়ে ওকে অবহেলা অনাদর করছে, এই ভয়েই বামযাদু ও মনোমোহিনী দুজনে মিলে কৃষ্ণকলিকে সমাদর দিয়ে ঘিরে তাকে অভিভূত সম্মোহিত করে রাখতে সতত সচেষ্ট।

কৃষ্ণকলি রামযাদুকে তার আশ্রয়দাতা উপকর্তা বলেই জানে; সে তো নিঃস্ব নিরাশ্রয়া অনাথ; সে তো রামযাদুর অনাথ-আশ্রমেই স্থান পেতে পারতো; কিন্তু রামযাদু যে তাকে নিজের পরিবারভুক্ত করে রেখে তাকে কন্যার অধিক যত্ন করে এই কৃতজ্ঞতার বোঝার চাপে কৃষ্ণকলিব মন নিতান্ত সঙ্কুচিত কুণ্ঠিত লজ্জিত হয়ে থাকে। সে রামযাদুর মুখে স্নেহবিদ্ধ মৃদু ভর্ৎসনা শুনে অত্যন্ত অপ্রতিভ হলো, কিন্তু তার দুই চোখে ভরে উঠলো ব্যাকুল জিজ্ঞাসা যে তোমার কোথায় কি অসুবিধায় তোমার স্বচ্ছন্দতা আটকে বাধাগ্রস্ত হয়েছে আমায় যদি বলো তো আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।

রামযাদু কৃষ্ণকলির দৃষ্টিতে প্রশ্নের ব্যাকুলতা দেখতে পেয়ে বললে—আমি প্রাচীন ভারতে নারীর সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু উপকরণ সংগ্রহ করতে চাচ্ছি...

কৃষ্ণকলির ব্যাকুল মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠলো, সে লজ্জাস্মিত মুখে রামযাদুর বইয়ের তাক থেকে ১৩২৭ সালের প্রবাসী ও ১৩২৯ সালের নব্যভারত এনে রামযাদুর সামনে রেখে দিলে এবং আবার বইয়ের শেল্‌ফের কাছে চলে গেলো। রামযাদু পরান বাবুর প্রকাণ্ড লাইব্রেরি নিজের বাড়িতে উঠিয়ে এনেছিলো।

রামযাদু অবাক হয়ে একবার বই দুখানার দিকে একবার কৃষ্ণকলির দিকে দেখলে; তার পর বললে এতে আছে?

কৃষ্ণকলি শেল্‌ফ থেকে Sir Ashutosh Mukherjee Silver Jubilee Commemoration Volume III, Dr. Dwarknath Mitter's The Position of Women in Hindu Law, মহাভারত শান্তিপর্ব ও অনুশাসন পর্ব, স্কন্দপুরাণ নাগরখণ্ড এনে রামযাদুর সামনে রাখলে। রামযাদুর চোখে যে বিস্ময় ও প্রশংসা ফুটে উঠেছিলো তার আঘাতে কৃষ্ণকলির মাথা লজ্জাতে অবনত হয়ে পড়েছিলো। কোন্ পৃষ্ঠায় কোন্ প্রবন্ধে যে নারী সম্বন্ধে আলোচনা আছে তার সে ইচ্ছা সত্ত্বেও বই খুলে বাহির করে দিতে পারলে না।

রামযাদু বললে—এইসব বইয়ে ঐ সম্বন্ধে লেখা আছে?

কৃষ্ণকলির লজ্জিত দৃষ্টি একবার রামযাদুর দিকে উঠে আবার অবনত হয়ে পড়েছিলো। সে মুখ নত করে একটু মৃদু হাসলে।

রামযাদু বইগুলি খুলে তাদের সূচীর উপর চোখ বুলাতে বুলাতেই হেসে বললে—তুই আমার ঘরের শুধু লক্ষ্মীই নোস সরস্বতীও! তোর দাম লাখ টাকা!

রামযাদুর এই কথা যে কতো বড়ো সত্য, বা সত্যকেও খর্ব করা তা বুঝতে না পেরে, কৃষ্ণকলি এই কথাকে স্নেহের অত্যুক্তি মনে করলে এবং অত্যন্ত লজ্জা পেয়ে ধীর নিঃশব্দ পদে যে ঘর থেকে পলায়ন করলে। তার মনের মধ্যে কেবলই এই কথা গুঞ্জন করতে লাগলো—কাকাবাবু আর কাকিমা আমাকে কী ভালোই বাসেন! আমার মতন লক্ষ্মীছাড়াকে বলেন কিনা লক্ষ্মী, আর আমার দাম লাখ টাকা।

কৃষ্ণকলি যদি জানতো যে তার বাস্তবিক দাম রামযাদুব কাছে চার লাখের কাছাকাছি, এবং রামযাদু সত্যের অপলাপ করে তার দাম কমিয়ে বলেছে, তাহলে তার মনের ভাব ঠিক এই রকম শ্রদ্ধান্বিত কৃতজ্ঞতায় ভরে থাকতো কি না তা বলা শক্ত।

কৃষ্ণকলি রামযাদুর লাইব্রেরি-ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই রামযাদু আপন মনে অস্ফুট স্বরে বলে উঠলো—এ কালপেঁচিটা তো দেখি কালসাপ! আমি যা লিখবো তাই হয়তো টের পাবে আমি কোথা থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে লিখেছি। এ আবাব এক অস্বস্তি হলো; ও যেন হয়েছে আমার পক্ষে সাপের ছুঁচো গেলা...না পাবি গিল্‌তে না পারি ওগলাতে না পারি বাড়িতে রাখতে, আর না পারি পরের বাড়িতে পাঠাতে...

কৃষ্ণকলি বাড়ির মধ্যে গিয়ে দেখলে মনোমোহিনী সদ্য ঘুম থেকে উঠে হাই তুলছে। কৃষ্ণকলি অমনি তাড়াতাড়ি ডাবর, একঘটি জল আর গামছা নিয়ে গিয়ে তার পাশে দাঁড়ালো।

মনোমোহিনী নিদ্রালস জড়িত চোখে কৃষ্ণকলির দিকে তাকিয়ে হেসে বললে,—তুই কি আমাকে নড়ে বসতে দিবি নে? বসে বসে থেকে দেখতো কী মোটাই হয়ে উঠছি!

কৃষ্ণকলি স্মিতমুখে নীরবে মনোমোহিনীর সামনে ডাবর পেতে দিলে এবং তার হাতে জল ঢেলে দেবার জন্য ঘটি ধরে নত হলো।

মনোমোহিনী মুখ ধুয়ে গামছা দিয়ে মুখ মুছতে লাগলো, কৃষ্ণকলি সেই অবসরে ডাবর আর ঘটি বাইরে রেখে এক ডিবে পান ও পিকদান এনে মনোমোহিনীর সামনে রাখলে।

মনোমোহিনীর মুখ মোছা শেষ হতেই কৃষ্ণকলি গামছা নেবার জন্য হাত বাড়ালে। কিন্তু মনোমোহিনী গামছা কৃষ্ণকলির হাতে না দিয়ে মাটিতে রাখলে এবং দুটো পান একসঙ্গে মুখে পুরতে পুরতে শূন্যহীন ভরাট মুখবিবর থেকে স্পষ্ট গম্ভীর শব্দ কষ্টে বাহির করে বললে—গামছা থাক, চুলের দড়ি নিয়ে আয়, চুল বেঁধে দি, মাথাটা যে একেবারে ডোকলা কাগের বাসা হয়ে রয়েছে...আজকে আমাদের পাশের বাড়ির নতুন ভাড়াটে ঝিকড়কোটার রানি বেড়াতে আসবে।

কৃষ্ণকলির কালো মুখ লজ্জায় বেগুনে হয়ে উঠলো। সে বিশেষ করেই জানে সে কালো কুৎসিত; তাই সে নিজেকে লোকলোচন থেকে লুপ্ত গুপ্ত করে রাখতে চায়, এমন

কি সে কোনো দিন নিজে আয়নায় মুখ দেখে না। সে অতি সাধারণ সামান্য বেশে থাকে, পাছে বিশেষ বেশ-বিন্যাস দেখে কেউ বলে—আহা ঐ তো রূপের ছিরি! তার আবার অতো ভাবন কেন!

মনোমোহিনীর আদেশ শুনে কৃষ্ণকলি শঙ্কাসঙ্কোচে কাতর হয়ে বললে—খোকার জামাটা আধখানা সেলাই হয়ে আছে...

মনোমোহিনী বললে—সে কাল হবে। আজ বাইরেব লোক আসবে; এমন হয়ে কি থাকে? তারা দেখে কি বলবে? ভাববে, আমরা তোকে অযত্ন করি।

এর পরে আর কৃষ্ণকলি আপত্তি করতে পারলে না। কৃষ্ণকলির মনে হলো শরৎচন্দ্রের অরক্ষণীয়া যেমন নিজেকে সাজিয়ে তুলতে চেষ্টা করে অধিকতর কুৎসিত করে তুলেছিলো, তেমনি দুর্দশা হয়তো তারও হবে; কিন্তু সে মরণাধিক লজ্জার আঘাত পেলেও এ কথা লোককে ভাববার অবসর দিতে পারবে না যে সে এ বাড়িতে অনাদরে আছে। কৃষ্ণকলি চুল বাঁধবার দড়ি নিয়ে এসে মনোমোহিনীর সামনে বসলো। লজ্জায় সঙ্কোচে সে অত্যন্ত পীড়িত হলেও মনোমোহিনীর প্রসাধন আয়োজন নীরবে সহ্য করতে লাগলো।

কৃষ্ণকলির সুদীর্ঘ চুলের বিনুনি তখনও শেষ হয় নি, এমন সময় একটি গৌরাঙ্গী সুন্দরী প্রৌঢ়া বিধবা ও একটি রূপসী কিশোরী বালিকা সেইখানে এসে উপস্থিত হলো।

তাদের আসতে দেখেই মনোমোহিনী কৃষ্ণকলিব বিনুনি ছেড়ে দিয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো এবং মোটা শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়াবার বিলম্বিত সময়ের মধ্যে বললে—আসুন রানিদিদি আসুন, আজ আমার কী সৌভাগ্যি, গরিবের দরজায় হাতির পাড়া, আপনার পায়ের ধুলো যে আমার বাড়িতে পড়বে...

রানি বললে—এসে অবধি অন্নপূর্ণা দর্শন করতে আসবো মনে করি, হয়ে ওঠে না, আজ এলুম .

মনোমোহিনী চিৎকার করে ডাকলে—লছিয়া, এই লছিয়া, শিগগির করে কার্পেটখানা এনে এইখানে পেতে দে..

রানি বাড়িতে এসেছেন, এই সংবাদ বাড়িময় ছড়িয়ে পড়েছিলো; চাকর দাসী ছেলেমেয়ে সবাই উৎসুক হয়ে রানি দেখতে ছুটে এসেছিলো; মনোমোহিনীর আদেশ শোনবামাত্র একজন দাসী দৌড়ে গিয়ে কার্পেট এনে রানির সামনে বিছিয়ে দিলে।

কৃষ্ণকলির ইচ্ছা হচ্ছিলো সে ছুটে পালিয়ে গিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে কোথাও লুকায়; কিন্তু অসমাপ্ত বেণী নিয়ে সে উঠে যেতেও লজ্জায় বাধা পাচ্ছিল।

রানি আসনে বসতে বসতে বললে—এ মেয়েটি? আপনার?

এই প্রশ্নের ধাক্কায় কৃষ্ণকলির মাথা কোলের দিকে ঝুঁকে পড়লো।

মনোমোহিনী কৃষ্ণকলির পিঠের কাছে বসে তার অসমাপ্ত বেণী হাতে তুলে নিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—হ্যাঁ, আমার মেয়েই বটে, যদিও পেটে ধরি নি। এতোটুকু বেলা থেকে মানুষ করে এতোবড়োটি করেছি। ওর বাপ-মা কেউ কোথাও নেই, আমরাই এখন ওর বাপ মা।

রানি জিজ্ঞাসা করলে—আপনাদের অনাথ-আশ্রমে এসেছিলো বুঝি?

মনোমোহিনী বললে—না, ও মস্ত বড়লোকের মেয়ে; কিন্তু বাপ এক পয়সাও রেখে যেতে পারে নি। এর বাপই ওঁর চাকরি করে দিয়েছিলেন; আমাদের যা কিছু তা সব এর বাপ হতেই; তাই অমন বন্ধুর মেয়েকে তো আমরা ফেলতে পারি নি...

রানি আবার জিজ্ঞাসা করলে—এর বিয়ে হয়েছে কোথায়?

মনোমোহিনী বললে—বিয়ে হয় নি এখনও। বাপ তো এক পয়সাও রেখে যেতে পারে নি; তা উনি খরচ করে বিয়ে দিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু ভালো পাত্র তো পাওয়া যায় না, আর যার-তার হাতেও তো দেওয়া যায় না...

মনোমোহিনীর কথার মধ্যে কিন্তুটার যে কি মানে তা কৃষ্ণকলি বেশ বুঝতে পারলে; তার কুরূপের জন্যই যে ভালো পাত্র ভয় পেয়ে পালায় তা তো সে অনেক বার শুনেছে। লজ্জাতে তার মাথা কাটা যাচ্ছিলো; অথচ তার পালাবার পথ বন্ধ, মনোমোহিনীর হাতে তার বেণী আটকে আছে; তার মনে হচ্ছিলো যে বল্গাবদ্ধ ঘোড়া এমনই করেই চাবুকের আঘাত সহ্য করে।

মনোমোহিনীর কথার উত্তরে রানি বললে—আমার এই মেয়ের জন্যে একটি পাত্র খুঁজতেই আমার কলকাতায় এসে থাকা। তা দিদি, তোমার কর্তাকে একটু বোলো না, যদি কোনো সৎপাত্রের সন্ধান দিতে পারেন। সৎচরিত্র আর লেখাপড়াজানা ছেলে হলেই হবে।

মনোমোহিনী বললে—তা আমি বলে দেখবো...একটি খুব ভালো পাত্র আমাদের সন্ধানে আছে, তবে বাপ-মা তেমন বড়োলোক নয়, তাই বলতে সাহস হয় না, বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার চেষ্টার মতন সে যে হাসির কথা হবে।

রানি হাসিমুখে বললে—সেটি তবে আপনারই ছেলে বেয়ান! আমার মেয়ের কি অমন ভাগ্য হবে যে এমন উঁচু ঘরে পড়বে? আপনাদের নাম যশ যে বাংলা-জোড়া।

মনোমোহিনী বললে—আপনি যখন বেয়ান বলে স্বীকার করে নিলেন তখন বলি সেটি আমারই ছেলে বেয়ান। তা আমি ওঁকে আজই বলে ছেলেকে আসতে তার করাবো।

রানি জিজ্ঞাসা করলে—ছেলে কোথায় আছে?

মনোমোহিনী বললে—সে লঙ্কায় না সিলোনে কোথাকার কলেজের পফেচার,...

এতোক্ষণে কৃষ্ণকলি ছাড়া পেয়ে উঠে আস্তে আস্তে সেখান থেকে চলে গেলো। যাবার সময় দেখে গেলো কিশোরী মেয়েটির মুখ বিবাহের কাথায় গোলাপ ফুলের আভায় সুন্দর দেখাচ্ছে।

রানি রামযাদুর বাড়ির ঐশ্বর্য, অন্নপূর্ণা ঠাকুর, আর অনাথ-আশ্রম দেখে চলে গেলো। যাবার সময় অনাথ-আশ্রমে পাঁচ শো টাকা এবং অন্নপূর্ণাকে প্রণামী একখানি গিনি দিলো।

রানি চলে গেলে এই টাকাগুলি নিয়ে মনোমোহিনী স্বামীসন্দর্শনে গেলো।

রামযাদু মনোমোহিনীর হাতে টাকা দেখে জিজ্ঞাসা করলে—ও টাকা কিসের?

মনোমোহিনী বললে—এই পাশের বাড়িতে ভাড়াটে কোথাকার যে রানি এসেছে, সেই আজ বেডাতে এসেছিলো; অন্নপুন্নোকে গিনি দিয়ে পেন্নাম করে গেছে, আর অনাথ-আশ্রমে পাচ শো টাকা দিয়েছে.

রামযাদু হেসে বললে—ভালোই হলো, আমাকে আর ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে হলো না, তুমি ব্রেসলেট গড়াবে বলে টাকা চেয়েছিলে। ঐ টাকাটা তোমার কাছেই রেখে দাও।

মনোমোহিনী খুশি হলো। কিন্তু গহনার সম্বন্ধে কোনো কথা না বলে বললে—আর দেখো, রানির একটি খাসা সুন্দরী ডাগর মেয়ে আছে; তার জন্যে পাত্র দেখতে বলছিলো। আমাদের বনমালীর যদি বিয়ে হয়ে না যেতো তা হলে রানির এক মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারলে ওর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি আমাদের হতো...

রামযাদু ঈষৎ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—দেশ থেকে কুলীনের বিয়ের ব্যবসা উঠে গেলো, এখন আর এ সম্বন্ধে ভেবে কি হবে বলো?

মনোমোহিনী বললে—আমি রানিকে প্রিয়তোষের কথা বলেছি; সে তো খুশি হয়ে আমার সঙ্গে বেয়ান সম্পর্ক পাতিয়ে গেছে; তা তুমি প্রিয়তোষকে আসতে টেলিগ্রাম করো; তার সঙ্গে বিয়ে হলেও বিষয় সম্পত্তিটা আমাদেরই বংশের একজনের হবে।

রামযাদু লাফিয়ে উঠে আট ছেলের মা প্রৌঢ়া পত্নীর মুখচুম্বন করে বললে—মনোমোহিনী, কে বলে তোমার বুদ্ধি নেই? তুমি আমার সহধর্মিণী প্রেয়সী!

মনোমোহিনী খুশি হয়ে হাসি মুখে বললে—রাখো তোমার নেকরা রাখো, বুড়ো বয়সে আর থিয়েটারি ঢং করতে হবে না। প্রিয়তোষকে আসতে লেখো।

রামযাদু টেলিগ্রামের ফর্ম টেনে নিয়ে বললে—এখনই লিখ্‌ছি।

প্রিয়তোষ পিতার কাছ থেকে এই প্রথম আহ্বান পেয়ে পুলকিত হয়ে উঠেছে। বনমালী তার কাছে আসা অবধি সে বারম্বার প্রশ্ন করে করে পিতা মাতা ভাই ভগিনী প্রভৃতির সম্বন্ধে সমস্ত খুঁটিনাটি খবর জেনে নিয়েছে; তার পিতার বাড়িতে কজন দাসদাসী আছে, তাদের নাম কি, তাদের প্রকৃতি কি রকম, তাও জানতে তার বাকি নেই, এবং কৃষ্ণকলির সমস্ত ইতিহাসও সে জানে। বনমালীর কাছে তাদের পরিবারের যে সম্মিলিত ফটোগ্রাফ আছে তাই দেখে দেখে প্রিয়তোস পিতৃপরিবারের সকলকে বেশ করে চিনেও রেখেছে, যদি কখনো তাদের সঙ্গে চাক্ষুষ সাক্ষাৎ হয়, তবে যেন পরিচয়ে কোনো বাধা না ঘটে।

প্রিয়তোষ যখন পিতার টেলিগ্রাম পেলে, তার অল্পদিন পরেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বিলাতযাত্রার পথে কলম্বোতে আসার কথা; রবীন্দ্রনাথের পরম ভক্ত সে; তাঁকে প্রণাম করবার সুযোগ আসছে বলে সে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে মুগ্ধ প্রাণের শ্রদ্ধাঞ্জলি সাজিয়ে শুভক্ষণের অপেক্ষায় দিন গুনছিলো। এমন সময় পিতার টেলিগ্রামে আহ্বান পেয়ে সে একটু দ্বিধান্বিত হলো, কিন্তু পিতার প্রথম আহ্বান সে অবহেলা করতে পারলে না। সে কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে কলকাতায় রওনা হলো।

রামযাদু স্টেশনে পুত্রকে প্রত্যুদগমন করে আনতে গিয়েছে। সে তো পুত্রকে চেনে না: পুত্রের জননীর আদল হয় তো পুত্রের মুখে কিছু থাকতে পারে; কিন্তু পরিত্যক্তা পত্নীর মূর্তি তো রামযাদুর মন মুদ্রিত হয়ে নেই। কোন্ ক্লাসের গাড়িতে প্রিয়তোষ আসছে তাও সে জানে না। তাই ট্রেন যখন প্লাটফর্মে এসে লাগলো তখন রামযাদু চারিদিকে উদ্‌ভ্রান্তের

মতন তাকাচ্ছে। একটু পরেই একটি প্রিয়দর্শন গৌরবর্ণ দীর্ঘ ঋজুকায় যুবক এসে রামযাদুর পায়ের গোড়ায় ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিয়ে দাঁড়ালো।

রামযাদু যুবকের ঈষৎ লজ্জিত স্মিত মুখের দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলে—তুমি প্রিয়তোষ?

প্রিয়তোষ কুণ্ঠিত দৃষ্টি অবনত করে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ।

রামযাদু বলে উঠলো—এসো বাবা এসো। তোমার জিনিসপত্র কোথায়?

প্রিয়তোষ বললে—সঙ্গে বেশি কিছু জিনিসপত্র আনি নি, এই মুটের মাথাতেই আছে।

রামযাদু একবার মুটের মাথায় সুটকেস ও হাতে একটা ব্যাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করেই বললে—চলো বাবা চলো, ঐদিকে আমার মোটরগাড়ি আছে।

প্রিয়তোষ পিত্রালয়ে এসে সকলের সঙ্গে পরিচয় করলে। কিন্তু সব চেয়ে তার দৃষ্টি আর মনোযোগ আকর্ষণ করলে কৃষ্ণকলি। কৃষ্ণকলির কদর্য কুৎসিত কুশ্রীতাই দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করবার পক্ষে যথেষ্ট; তার উপর আবার তার দুরদৃষ্টের ইতিহাস শুনে অবধি তার প্রতি অনুকম্পার উদ্রেক হয়েছিলো; এখন এখানে এসে কৃষ্ণকলির সেবানিপুণতা ও কর্মতৎপরতার সঙ্গে তার সলজ্জ মৃদুতা প্রিয়তোষকে পুনঃপুনঃ তার সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে লাগলো।

কৃষ্ণকলিও যুবতী স্ত্রীলোকের অনুভবন-শক্তির দ্বারা বুঝতে পারতে লাগলো যে সে সর্বদা একটি তরুণ সুকুমার পুরুষের লক্ষ্যের বিষয় হয়ে উঠেছে। এতে তার স্বাভাবিক লজ্জা চতুর্গুণ বর্ধিত হয়ে তার কদর্যতা ঢেকে তাকে ব্রীড়ার মাধুর্য দিতে লাগলো।

একদিন রানি তার কন্যা নিয়ে বেড়াতে এলো। মনোমোহিনী প্রিয়তোষকে ডেকে পাঠালে।

প্রিয়তোষ সেই ঘরে এসেই অপরিচিতা মহিলাদের দেখে থমকে দাঁড়ালো।

মনোমোহিনী প্রিয়তোষের দিকে তাকিয়ে হেসে রানিকে বললে—এইটি আমার বড়ো ছেলে, প্রিয়তোষ। —প্রিয়, আমার ইনি রানি বেয়ান, পেন্নাম করো—

প্রিয়তোষ মনে করলে এই মহিলা হয়তো বা তার মাতার কোনো আত্মীয়া হবে, তাই সে মাতৃ-আদেশ পেয়ে রানিকে প্রণাম করলে।

রানি বললে—বেঁচে থাকো বাবা, রাজ-রাজেশ্বর হও—

তার পর মনোমোহিনীর দিকে ফিরে রানি বললে—খাসা ছেলে, রাজপুত্রের মতন ছেলে!

মনোমোহিনী হেসে প্রিয়তোকে বললে—আচ্ছা বাবা, তুমি এখন এসো--

প্রিয়তোষ চলে গেলো। যাবার সময় একবার কিশোরী রাজকন্যাকে অপাঙ্গে দেখে নিয়ে গেলো।

রানি প্রিয়তোষকে দেখে সন্তোষ প্রকাশ করে বললে—আমার মাধুরীকে তোমরা নিয়ে আমাকে নিশ্চিন্ত করো বেয়ান।

মনোমোহিনী বললে—আচ্ছা একটু বোসো বেয়ান, এখনই ছেলের মত জেনে আসি।

মনোমোহিনী প্রিয়তোষের ঘরে যেতেই প্রিয়তোষ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

মনোমোহিনী হেসে বললে—রানির মেয়েটিকে তো দেখলে বাবা, পছন্দ হয়?

হঠাৎ এই প্রশ্নে প্রিয়তোষ লজ্জিত হয়ে কোনো উত্তর দিতে পারলে না; লজ্জিত মুখ নত করলে।

মনোমোহিনী বলতে লাগলো—আমাদের বড়ো ইচ্ছে তোমার সঙ্গে ঐ মেয়েটির বিয়ে দি; খাসা মেয়েটি, নম্র ধীর, দেখতে যে কেমন তা তো নিজেই দেখলে; আর ও মায়ের এক মেয়ে, সব সম্পত্তি মেয়ে-জামাইয়েরই হবে; রানির খুব ইচ্ছে যে মেয়ের বিয়ে তোমার সঙ্গে দেন, তোমাকে তাঁর খুব পছন্দ হয়েছে; আমাদেরও মেয়েটিকে খুব পছন্দ হয়েছে; এখন তোমার মত হলে আমরা এই শুভ কার্যের আয়োজন করি। এই জন্যেই তোমাকে অতো তাড়াতাড়ি তার করে আনানো হয়েছে।

প্রিয়তোষ বললে—আপনারা আমাকে যা আদেশ করবেন আমি তাই করবো।

মনোমোহিনী খুশি হয়ে বললে—বেশ, বাবা বেশ বেঁচে বর্তে থেকে রাজরাজেশ্বর হও। আমি বেয়ানকে সুখবর দিই গিয়ে...

মনোমোহিনী প্রিয়তোষের কাছ থেকে রানির কাছে ফিরে আসতে আসতে উলু দিয়ে উঠলো এবং রানি যে ঘরে বসে ছিলো সেই ঘবে ঢুকেই হাসতে হাসতে বললে—বেয়ান-রানি, ছেলের আমার বৌমাকে পছন্দ হয়েছে...অমন প্রতিমার মতন মেয়েকে পছন্দ হবে না আবার! এইবার নিকটেই যে শুভদিন আছে সেই দিনেই দু হাত এক করে দিতে হবে...

রাজকন্যার সুশ্রী সুন্দর মুখখানি লজ্জার অরুণরাগে সুন্দরতর হয়ে উঠলো।

সেই ঘরের পাশেব ধরে কাজ করছিলো কৃষ্ণকলি। মনোমোহিনীর কথা শুনে তার কালো মুখ আরো কালো মলিন হয়ে গেলো; কি জানি কেন ঐ সুন্দরী মেয়েটির প্রতি ঈর্ষায় তার মন ভরে উঠলো আর অবারণ কান্না তার বুকের মধ্যে ঠেলে ঠেলে উঠতে লাগলো। সে তাড়াতাড়ি লাইব্রেবিব দিকে চললো; সেই ঘরগুলাই নির্জন, বইয়ের আলমারির অরণ্যের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে সে হৃদয়বেদনা গোপন করতে চায়।

লাইব্রেরির দিকে যেতে যেতে কৃষ্ণকলির সামনে পড়লো প্রিয়তোষ। তাকে দেখেই তার লজ্জা ও দুঃখ প্রবল হয়ে উঠলো, সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে চলে গেলো।

বাড়ির দাসীরা জোড়া শাঁখ বাজিয়ে আসন্ন বিবাহ-উৎসবের আনন্দ ঘোষণা করছে, থেকে থেকে উলুধ্বনি হচ্ছে। এই-সব শুনে ও ম্লানমুখী কৃষ্ণকলিকে দেখে প্রিয়তোষের মনে হলো—আমি বাবাকে বলে কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দেবো, আর একটি সৎপাত্র পেলে কৃষ্ণকলিরও বিবাহ দেবার চেষ্টা করবো। মেয়েটি কালো বটে, কিন্তু খাসা স্বভাব! আমি ওকে যতোই দেখছি ততোই ভালো লাগছে।

কৃষ্ণকলি লাইব্রেরিব বিজনতায় গিয়ে ধরা পড়বার সম্ভাবনা থেকে অপসৃত হতেই তার চোখ দিয়ে টস টস করে জল পড়তে লাগলো। সে এক-গাদা বইয়ের উপর বসে চোখে আঁচল চাপা দিলে।

খানিক্ষণ চোখের জল ফেলে কৃষ্ণকলির মনটা যখন কথঞ্চিৎ হাল্কা হলো, সে তখন সমস্ত অবস্থাটা ভেবে দেখবার অবকাশ পেলে। বিয়ে হবে প্রিয়তোষের, তাতে সে কাঁদে

কেন? রাজকন্যার রূপ আর ঐশ্বর্য তো তার নেই, তবে তার সৌভাগ্যে সে ঈর্ষা অনুভব করে কেন? কৃষ্ণকলি নিজের এই স্বার্থপর ক্ষুদ্রচিত্ততায় অত্যন্ত ব্যথিত ও লজ্জিত হলো; তার মনে হলো সে দু-দিনের দেখা প্রিয়তোষের প্রতি অনুরাগিণী হয়ে অপরাধিনী হয়েছে; সে নিজেকে ব্যভিচারিণী মনে করে অত্যন্ত সন্তপ্ত হলো...যাকে পাবার লেশ মাত্র আশা নেই তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ব্যভিচার নয় তো কি? কিন্তু কৃষ্ণকলির লজ্জা-সন্তাপ-পীড়িত অন্তরে নিরন্তর গুঞ্জন করে ফিরতে লাগলো এই কথা—

"তবে পরানে ভালোবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে।
পূজার তবে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া,
পূজিব তারে গিয়া কি দিয়ে?"

অল্পক্ষণ পরেই কৃষ্ণকলি শুনতে পেলে মনোমোহিনী কোন্ দাসীকে জিজ্ঞাসা করছে—হ্যাঁ রে ক্ষেমি, কলি গেলো কোথায়? তাকে ডেকে দে তো...প্রিয়র গায়ে হলুদের জোগাড় করতে হবে...আর তো বেশি দিন নেই...মাঝে আর দুটি দিন মাত্র...

কৃষ্ণকলি মনোমোহিনীর এই কথা শুনেই চকিত হয়ে উঠলো,—এর আগে তো কোনোদিন তাকে খুঁজে কাজ করতে বলতে হয় নি; এমন কর্তব্যের ত্রুটি তার ঘটছে কেন? তার যে কারণই থাকুক, এই ত্রুটির জন্য সে লজ্জিত ও সন্তপ্ত হলো। সে তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে চোখ মুখ মুছে উঠে পড়লো। কিন্তু প্রিয়র গাযে হলুদের জোগাড় করে দিতে যেতে তার পা চলতে চাইছিলো না।

কৃষ্ণকলি ব্যস্ত হয়ে চলে গেলো। এইজন্যই সে দেখতে পেলে না তাব পিছনে বইয়ের আলমারির পাশে দাঁড়িয়ে প্রিয়তোষ তার কান্না দেখছিলো।

প্রিয়তোষ কৃষ্ণকলিকে কাঁদতে দেখে অবাক ও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলো। সে চিন্তা করতে লাগলো কৃষ্ণকলি কাঁদে কেন? এ বাড়িতে সে সর্বজনসমাদৃতা; প্রিয়তোষ তো এতো দিনের মধ্যে কোনো দিন কাউকে কর্কশ কটু কথা বলে কৃষ্ণকলিকে সম্বোধন করতে শোনেই নি, বরং সকলের অত্যাদর তাকে আশ্চর্য করলেও প্রীত করেছে। তবে কৃষ্ণকলির দুঃখ কোথায়? পিতা-মাতাকে সে হারিযেছে শৈশবে; তাঁদের স্মৃতি বা অভাব এতোদিন পবে তাকে পীড়া দিচ্ছে এও সম্ভব মনে হয় না। তবে? এ কি নিঃসঙ্গ যৌবনের বেদনা? প্রিয়তোষ চিন্তিত মনে ঘুরতে ঘুবতে বাড়ির বাইরে রাস্তার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো।

কিছুক্ষণ পরে একজন পথিক পথ দিয়ে যেতে যেতে রামযাদুর বাড়ির দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েই বলে উঠলো—আরে প্রিয়তোষ যে?

সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়তোষও সহাস্যবদনে বলে উঠলো—আরে সত্যদা যে! অনেক কাল পরে দেখা! কি কবছো তুমি?

সত্যদাস বললে—ভেরেণ্ডা ভাজছি। তুমি তো কলম্বেতে ছিলে শুনেছিলাম; এখানে দেখছি যে?

প্রিয়তোষ হেসে বললে—বাপের বাড়ি এসেছি।

সত্যদাস আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—রামযাদু-বাবু তোমার পিতা?

প্রিয়তোষ ঘাড় নেড়ে স্বীকৃতি জানালে।

তখন সত্যদাস বললে—ভাই, তুমি যদি আমার সঙ্গে একটু আসো তা হলে তোমায় একটা কথা বলি। এখানে তোমার বাবার বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে আমার সাহস হয় না...

প্রিয়তোষ আশ্চর্য হয়ে বললে—চলো, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

প্রিয়তোষ সত্যদাসের সঙ্গে সঙ্গে চললো। সত্যদাস ও প্রিয়তোষ পূর্বপরিচিত; প্রিয়তোষের মাতামহ যখন কৃষ্ণনগরে প্রফেসার ছিলেন তখন সত্যদাস ছিলো তাঁর প্রিয় ছাত্র; প্রিয়তোষ তখন বালক। বয়সের অসমতা সত্ত্বেও সত্যদাসের সঙ্গে প্রিয়তোষের বন্ধুত্ব জমে উঠেছিলো। তার পর প্রিয়তোষের মাতামহ বদলি হযে রাজসাহি যান, তখন সত্যদাস ও প্রিয়তোষ ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। বহুকাল পরে আজ দুই অসমবয়সী বন্ধুর সাক্ষাৎ ঘটেছে।

খানিক দূর অগ্রসর হয়ে গিয়ে প্রিয়তোষ আর ঔৎসুক্য দমন করতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলে—কি বলবে সত্যদা?

সত্যদাস প্রিয়তোষের দিকে ফিরে গম্ভীর মুখে বললে—তোমার কাছে আমার একটা নালিশ আছে ভাই; তোমার কাছে আমি বিচার প্রার্থনা করি।

প্রিয়তোষ অধিকতর আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—আমাব কাছে নালিশ? কিসের বিচার?

সত্যদাস গম্ভীর ভাবে বললে—শোনো সব বলছি।...আমি কিছুদিন তোমাব পিতার আশ্রয়ে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি, অনুলেখক, বাজার সরকার, ছেলে-মেয়েদের মাস্টার ইত্যাদি বহুরূপী ভাবে ছিলাম। ছেলেবেলা থেকে আমি কবিতা লিখতাম জানো। বই ছাপাবার সখ ছিলো, কিন্তু পয়সার সঙ্গতি ছিলো না। তোমার বাবা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন দুঃস্থ লেখকের লেখা তিনি প্রকাশ করে দেবেন, যদি সে লেখার বাস্তবিক সাহিত্যিক মূল্য থাকে। প্রলোভনে পড়ে আবেদন করেছিলাম; আর আমাব লেখাই বোধ হয় সর্বোৎকৃষ্ট মনে হওয়াতে তোমার বাবা আমাকে ডেকে বাড়িতে থাকতে বলেন। তার পর বই ছাপা হলো রাম শর্মা নামে; মাসিক পত্রে লেখা বেরুতে লাগলো রাম শর্মা নামে; সবাই মনে করলে প্রসিদ্ধ লেখক রামযাদু মুখুজ্জেরই রচনা। আমার যশ অপহরণ আমি সহ্য করেই ছিলাম। কিন্তু পরম পুণ্যবান আর হিতৈষী বন্ধু পরান বাবুকে ঠকিয়ে জাল উইল আর জাল দলিল তৈরি করে যখন পরান বাবুর কন্যা কৃষ্ণকলিকে বঞ্চিত করলেন, তখন সে অধর্ম আমি আর সহ্য করতে পারি নি। আমি প্রতিবাদ করলাম। তার ফল হলো—আমার চাকরি গেলো, আর বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচার করা হলো আমি তাঁর কবিতার খাতা চুরি করে নিয়ে পালিয়েছি, আমার লেখা কোনো কাগজে যেন আর ছাপা না হয়! আমার নিজেব লেখায় আমি চোর হয়ে রইলাম।...কৃষ্ণকলিকে তুমি দেখে থাকবে...পাছে তার বিয়ে হলে তার শ্বশুরবাড়ির লোকে তার পিতৃ-সম্পত্তি উদ্ধার করে তাই তার বিয়ের চেষ্টা পর্যন্ত করা হয় না, লোককে ও তাকে বোঝানো হয় যে তার কুরূপ দেখে নিঃস্ব তাকে

কেউ বিয়ে করতে চায় না। কৃষ্ণকলিকে বঞ্চনা করার কথা এক কেবল আমি জানি; কিন্তু প্রকাশ করতে পারি না, লোকে বলবে আমার চাকরি থেকে জবাব দিয়েছিলেন বলে আমি শত্রুতা করে অতোবড়ো প্রতিষ্ঠাবান লোকের নামে অপবাদ ঘোষণা করছি। যেখানেই অন্যায় অধর্ম হোক, তার প্রতিবাদ ও প্রতিকার করা প্রত্যেক সৎ ব্যক্তির কর্তব্য; কিন্তু আমার কর্তব্য তার চেয়েও বেশি।.. সেই জাল উইলে আর জাল দলিলে আমাকে সাক্ষী করে আমাকেও অধর্মের ভাগী করে রাখা হয়েছে। এরই আমি সুবিচার আর প্রতিকার প্রার্থনা করি।

প্রিয়তোষও চিন্তান্বিত ও গম্ভীর হয়ে বললে—তুমি আমাকে সব কথা আর-একটু খুলে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলো সত্যদা।

সত্যদাস যা জানতো যা সন্দেহ করতো সব কথাই একে একে খুলে বিস্তারিত করে প্রিয়তোষকে বললে। প্রিয়তোষের মুখ বড়ো ম্লান ও কাতর হয়ে উঠলো। সে সত্যদাসকে বললে—তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে যাও সত্যদা। পিতৃপাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি নিশ্চয় করবো।

সত্যদাস খুশি হয়ে চলে গেলো। প্রিয়তোষ চিন্তিত হয়ে গৃহে ফিরলো।

কৃষ্ণকলি দূরে আড়ালে থেকে যতোবার পারে প্রিয়তোষকে দেখে দেখে ফেরে। সে প্রিয়তোষের পায়ের শব্দ শুনেই চঞ্চল হয়ে একবার তাকে দেখতে পাওয়া যায় এমন পথ দিয়ে চলে গেলো; এবং এক নিমেষের দৃষ্টিতেই সে বুঝতে পারলে প্রিয়তোষের প্রিয়দর্শন প্রফুল্ল মুখশ্রী চিন্তাক্লিষ্ট ম্লান হয়ে উঠেছে।

প্রিয়তোষ কি করে যে প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করবে সেই চিন্তায় অভিভূত হয়ে বেড়ায়, সে যেন ডিটেক্‌টিভ, রহস্য উদ্‌ঘাটনে নিযুক্ত হয়েছে। একবার সে ভাবে কৃষ্ণকলিকে জিজ্ঞাসা করবে সে কিছু জানে কি না; আবার ভাবে যদি সে কিছু না জানে তবে তার এই নিশ্চিন্ত শান্তি ভঙ্গ করে কি লাভ হবে। কখনো কখনো সে ভাবে একেবারে গিয়ে পিতাকেই প্রশ্ন করে বসে; কিন্তু তিনি পুত্রের কাছে এতোবড়ো লজ্জার কথা প্রকাশ করবেন না, এ তো নিশ্চয়। তবে সে কি চুরি করে পিতার বাক্‌স তল্লাস করবে? তারই বা সুযোগ কোথায়? সে যে কি করবে কিছুই স্থির করতে পারছিলো না বলেই সে দিন দিন বেশি চিন্তিত ও গম্ভীর হয়ে উঠছিলো।

প্রিয়তোষের মলিন মুখ দেখলেই কৃষ্ণকলির কেমন কান্না পায়। সে পালিয়ে একলা নির্জন স্থানে লুকায়। বাড়ির মধ্যে বিজন স্থান লাইব্রেরির ঘরগুলি। সে মাঝে মাঝে পালিয়ে বইয়ের আলমারির সারির ফাঁকে লুকিয়ে বসে থাকে, উদ্‌গত অশ্রু দমন করতে চেষ্টা করে।

একদিন কৃষ্ণকলি দুপুরবেলা লাইব্রেরিতে গিয়ে একান্তে বসে আছে; এমন সময় প্রিয়তোষের অতি-পরিচিত চটিজুতার শব্দ শুনে কৃষ্ণকলি চমকে উঠলো। সে সন্তর্পণে উঠে আলমারির পাশ ঘেঁসে দাঁড়ালো। প্রিয়তোষ তার সামনে দিয়ে চলে গেলো। কৃষ্ণকলি নিষ্কৃতির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো—যাক, উনি দেখতে পান নি। কিন্তু প্রিয়তোষ দেখতে পেয়েও দেখতে পায় নি এমনি ভাবে চলে গিয়েছিলো; কৃষ্ণকলি যে তার কাছ থেকে লুকাতে চেষ্টা করছে এটা জানতে পেরে প্রিয়তোষ আর তার লজ্জা বাড়াতে ইচ্ছা করে নি।

প্রিয়তোষ চলে যাচ্ছে এমন সময় দেখলে খানকতক চিঠি ফরফর করে উড়তে উড়তে

তার সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে; এবং পাশের ঘর থেকে তার পিতার ব্যস্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে—ওরে ওরে পচা, খেঁদি, কে কোথায় আছিস...ছুটে আয়...সব কাগজপত্তর উড়ে গেলো।

প্রিয়তোষ পত্রগুলো তুলে নিলে। এবং হাতে তুলতেই একখানা চিঠিতে তার চোখে পড়লো কৃষ্ণকলির নাম। তাড়াতাড়ি উল্টে সই দেখলে পরান-বাবুর। তার পর তারিখ দেখলে তাঁর মৃত্যুর দিনের। অমনি চকিতে প্রিয়তোষের মনে হলো এই পত্র পরান-বাবুর মৃত্যুর পূর্বে লিখিত শেষ পত্র হওয়া সম্ভব। অমনি সেখানাকে পকেটে ফেলে সে পিতার ঘরে গিয়ে ঢুকলো এবং দমকা বাতাসে ঘরময় ছড়ানো কাগজ কুড়িয়ে তুলতে ব্যাপৃত পিতাকে সাহায্য করতে প্রবৃত্ত হলো।

সমস্ত কাগজপত্র কুড়িয়ে দিয়ে প্রিয়তোষ নিজের ঘবে গিয়ে ঢুকলো এবং দরজায় খিল দিয়ে অপহৃত পত্র পড়তে আরম্ভ করলে।

পত্রখানা তিনবার পড়লে। তার পব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সেখানা বাক্‌সের মধ্যে বন্ধ করে রেখে বিছানায় বসে পড়লো। এই তার পিতার চরিত্র! তাব মাতার প্রতি অবিচারী, তার প্রতি উদাসীন, পরপ্রবঞ্চক এই পিতার প্রতি অশ্রদ্ধায় তার মন ভরে উঠলো। সে দেবীচৌধুবানির ব্রজেশ্বরের মতন পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ বলে নিজের মনকে সংযত করতে চেষ্টা কবতে লাগলো। এই পিতৃপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি—এই ভাবনায় সে ডুবে রইলো।

পবদিন প্রত্যুষে প্রিয়তোষ নিত্যকার নিয়মিত অভ্যাসবশে বেড়াতে বাহির হয়ে গেছে। সেই অবকাশে কৃষ্ণকলি এসেছে প্রিয়তোষেব ঘরখানিকে গুছিয়ে রেখে যেতে। কৃষ্ণকলি সব ঝাড়পোছ করে প্রিয়তোষের চটিজুতা জোড়াব উপব মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে যেই মুখ তুলেছে অমনি দেখলে দরজার কাছে দাড়িয়ে আছে প্রিয়তোষ এবং তার চোখ থেকে স্নেহার্দ্র বেদনা ঝরে পডছে। আর তখন তাদের বাড়ির পাশে রানির বাড়িতে নহবতের সানাই বিনিয়ে বিনিয়ে বাজছে—কাল বাজকন্যা মাধুরীর অধিবাস ও গায়ে হলুদ হবে।

প্রিযতোষকে এতো শীঘ্র প্রত্যাবৃত্ত দেখে লজ্জা পেয়ে কৃষ্ণকলি ঘব থেকে চলে যাচ্ছিলো; কিন্তু প্রিয়তোষ দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে থেকে স্নিগ্ধ মৃদু স্বরে বললে—তুমি যেয়ো না কৃষ্ণকলি, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

কৃষ্ণকলি মাথা নত করে এক পাশে সরে দাঁড়ালো।

প্রিয়তোষ বলতে লাগলো—বেশি কথা বলবার সময় নেই। তোমাকে আমাব বিশেষ দরকার.. আমার জন্যে এক রাজকন্যা ও অর্ধেক বাজত্ব স্থির হয়েছে, জানো; কিন্তু তার চেয়েও আমার কাছে তুমি বেশি আবশ্যক। তুমি আমার সঙ্গে যাবে? এই বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক একেবারেই চুকিয়ে যেতে হবে বোধ হয়, তোমাব সে ক্ষতি আমি যত্ন দিয়ে পূরণ করবো, হয় তো কালে ভালবাসাও দিতে পারবো। তুমি আজকের দিনটা ভেবে দেখো...কালকে গায়ে হলুদ, তার আগে তোমাব অভিমত আমাকে জানিয়ো...

প্রিযতোষ দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ালো। কৃষ্ণকলি ধীর কম্পিত পদে ঘব থেকে বেরিয়ে অন্ধকার লাইব্রেরিব পুস্তকারণ্যে গিয়ে লুকালো। এ কী অসম্ভাবিত অভাব্য অঘটন-ঘটনা? এ যে দুরাশারও দুরাশা। এতো বড়ো সৌভাগ্য তার জন্য বিধাতা নির্দেশ করে রেখেছিলেন! কিন্তু কাকাবাবু আর কাকিমা যে রাগ করবেন, বিশ্বাসঘাতক নিমকহারাম মনে করবেন! সে

যে অসহ্য, সে যে অতি গর্হিত অন্যায় অকৃতজ্ঞতা হবে। কিন্তু উনি যে আমাকে চাচ্ছেন; আমাকে তিনি তো মিথ্যা বলে প্রলোভন দেখান নি, তিনি যে আমাকে ভালো বাসেন না, কুরূপাকে ভালোবাসা যে শক্ত, সে কথা তো তিনি গোপন করেন নি, তবু তাঁর আমাকে আবশ্যক আছে বলছেন, এ আদেশই বা আমি অমান্য করবো কি করে?

বিরুদ্ধ চিন্তায় উদ্বেজিত হয়ে কৃষ্ণকলি কেঁদে ফেললে। সেদিনটা সমস্তই সে একলা হতে পারলেই চোখের জল ফেলে ফেলেই কাটালে।

আজ প্রিয়তোষের গায়ে হলুদ। ভোর বেলা থেকে দুই বাড়িতেই নহবৎ বাজছে।

মনোমোহিনী প্রত্যুষে উঠে দেখলে আজ কৃষ্ণকলি তার নিয়মিত সেবায় উপস্থিত নেই। সে মনে করলে আজ সে অসময়ে আগে জেগেছে তাই কৃষ্ণকলি এখনো এখানে আসে নি। মনোমোহিনী উঠে কৃষ্ণকলির ঘরে গিয়ে দেখলে সেখানেও কৃষ্ণকলি নেই। মনোমোহিনী স্নানের ঘরে গিয়ে দেখলে সেখানেও কৃষ্ণকলি নেই। সে দাসীদের ডেকে তুলে বললে—দেখ্ তো কলি কোথায়? তাকে ডেকে দে, সব জোগাড় করতে হবে। আমি চট্ করে মাথায় জল ঢেলে আসি।

দাসীরা সমস্ত বাড়ি খুঁজেও কৃষ্ণকলিকে দেখতে পেলে না।

মনোমোহিনী ফিরে এলে দাসীরা বললে—দিদিমণিকে তো কোথায় দেখতে পেনু নি।

মনোমোহিনী অল্পক্ষণ অবাক হয়ে থেকে বললে—দেখ দেখি অনাথ-আশ্রমে গেছে কি?

দাসীরা বললে—সেখানেও দেখা হয়েছে, সেখানে নেই।

—অন্নপূর্ণার মন্দিরে?

—না, সেখানেও নেই।

মনোমোহিনী চিন্তিত হয়ে বললে—দেখ্ তো তোদের বড়ো দাদা-বাবু বেড়িয়ে ফিরেছে কি না।

একজন দাসী দেখে এসে বললে—দাদাবাবু এখনো ফেরে নি।

কৃষ্ণকলির অনুসন্ধানে সমস্ত বাড়ি ব্যস্ত চঞ্চল হয়ে উঠলো। প্রিয়তোষের সম্বন্ধে কারো কোনো উদ্বেগ বোধ হয় নি, সে বেড়াতে গেছে এখনই ফিরবে।

বেলা বেড়ে উঠছে। কৃষ্ণকলি আর প্রিয়তোষ কারোই দেখা নেই। তখন অল্প অল্প করে উভয়ের অদর্শন সকলের মনে একই সূত্রে গ্রথিত হয়ে উঠতে লাগলো। প্রথমে সন্দেহ, ও বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহ প্রত্যয়ে পরিণত হলো।

মনোমোহিনী নাক সিঁটকে রামযাদুকে বললে—আরে ছ্যাঃ। প্রবৃত্তিকে যাই বলিহারি! শেষ কালে ঐ কেলে পেত্নিতে মন মজলো! আমরা মনে করতাম ছুঁড়িটে বুঝি ভালো!

রামযাদু নিষ্ফল ক্রোধে গর্জন করে উঠলো—আরে ঝাড়ু মারো ছোটো জাতের মাথায়! ছোট লোক আর কতো ভালো হবে! আর এ বেটা তো কুলাঙ্গার! যেমন মাতৃবংশে জন্ম!

কিন্তু রামযাদুর তখনই মনে হলো কাশীর জ্যোতিষী পরান-বাবুকে বলেছিলো

কৃষ্ণকলির সঙ্গে থাকোহরির চেয়েও সুপাত্রের বিবাহ হবে। সেই সুপাত্র কি তারই পুত্র এই প্রিয়তোষ!

মনোমোহিনী নিজের মাতৃগর্বে স্ফীত হয়ে বললে—আমার বনমালী, পচা, নেদো এরা তো সোনার টুকরো ছেলে! কিন্তু রানি বেয়ানকে আমরা যে মুখ দেখাতে পারবো না।

রামযাদু বললে—গায়ে হলুদের আগে গেছে এই এক রক্ষে!

শীঘ্রই প্রিয়তোষ ও কৃষ্ণকলির পলায়ন-ব্যাপারের সংবাদ শহরময় ছড়িয়ে পড়লো। দুবাড়ির লজ্জায় অপমানে নহবতের বাক্‌রোধ হয়ে গেলো।

পরদিন প্রভাতে কাগজে কাগজে সংবাদ প্রকাশিত হলো রায়বাহাদুর রামযাদু মুখোপাধ্যায় জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে অসবর্ণ বিবাহ দিয়েছেন; উপকারক পরান বিশ্বাসের ঋণ এই মহৎ উপায়ে পরিশোধ করেছেন। সমাজসংস্কারক কাগজগুলাতে রামযাদুর জয়জয়কার ও রক্ষণশীল কাগজে নিন্দা বিঘোসিত হতে লাগলো।

রামযাদু আপিসে যেতেই আপিসের সাহেবেরা রামযাদুর করস্পর্শ করে অভিনন্দন করলে—We congratulate you Rai Bahadur, for your very bold and generous act. It's just like you. We wish the happy pair good luck and unhampered happiness.

রামযাদু যেন নিজের সৎকর্মের প্রশংসায় সুখী ও অপ্রতিভ হয়েছে এইরকম ভাব দেখিয়ে একটু শুধু হাসলে।

রামযাদু বিকালে বাড়ি ফিরে গিয়েই দেখলে তার বাড়ি ব্রাহ্ম ক্রিশ্চান অগ্রসরমতাবলম্বী হিন্দু বহু লোকের সমাগমে ভরে উঠেছে, সকলে তাকে দেখবা মাত্র প্রশংসার ধারা বর্ষণে অভিভূত করে তুললে। একজন ব্রাহ্ম বললে—আপনি অসামান্য সাহস ও ন্যায়পরতা দেখিয়েছেন রায় বাহাদুর। তবে বিবাহটা সমাজকে দেখিয়ে বাড়িতে দিতে পারলেই আপনার যোগ্য কাজ হতো।

একজন দোমনা না-ব্রাহ্ম না হিন্দু গোছের লোক বললে—তা এই বেশ হয়েছে...সাপও মরলো, লাঠিও ভাঙলো না...বিয়েও হলো অথচ হিন্দু গোঁড়াদের একটি কথা বলবার জো রইলো না...রায় বাহাদুরের বাড়িতেও বিয়ে হয়নি, আব রায় বাহাদুর তাদের নিয়ে আহার ব্যবহারও করছেন না..

একজন ব্রাহ্মণ বললে—তা তো সবই ভালো হলো, কেবল আমরাই মিষ্টান্নে বঞ্চিত হলাম।

উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ বলতে ওস্তাদ রামযাদু হেসে বললে—বঞ্চিত হবেন কেন, অনুগ্রহ করে একটু বসুন, আমি জোগাড় দেখছি...ওরে জগা, শিগগির সরকার মশায়কে বল ভীম নাগের দোকান থেকে পঞ্চাশ টাকার সন্দেশ আর ন্যাংড়া বোম্বাই আম এক হাজার মোটরে করে গিয়ে এখনই কিনে নিয়ে আসে..

একজন আগন্তুক হেসে বললে—শুধু আম সন্দেশেই সারলে চলবে না, রায় বাহাদুর! একদিন পাত পেতে ভূরি ভোজনের নিমন্ত্রণ রইলো। জ্যেষ্ঠ পুত্রের শুভ বিবাহ! ফাঁকিতে কাজ সারতে দেবো না আমরা।

রামযাদু হেসে বল্‌লে—সে তো আমার সৌভাগ্য! আসছে শনিবারই হবে।

সেদিন ইংলণ্ডের রাজার জন্মদিন। সেদিন রাজভক্তি দেখাবার জন্যে রামযাদু অনাথ-আশ্রমে উৎসব করে থাকে ও সেই উপলক্ষ্যে লোকও খাওয়ায়। চালাক রামযাদু এক ঢিলে দুই পাখি মারবার ব্যবস্থা করে রাখলে।

ছাতের উপর সমস্ত লোক খেতে বসেছে। রামযাদু সকলের পাতের কাছে কাছে খাওয়া দেখে তদারক করে বেড়াচ্ছিলো। চাকর এসে খবর দিলে—এটর্নিবাবু এসেছে।

রামযাদু অভ্যাগতদের বললে—আপনারা বসে বসে খান আমি এক্ষণই ফিরে আসছি, আমাকে একটু মাপ করবেন...

স্বয়ংযাচক নিমন্ত্রিতরা আমের উপর কামড় বসাতে বসাতে বললে—বিলক্ষণ! পেট না ভরলে উঠবো এমন আশঙ্কা আপনি করবেন না...আঃ আজ কী আনন্দের দিন!

রামযাদু নিচে নেমে গিয়ে এটর্নিকে দেখেই বললে—দেখুন অকৈতন-বাবু, আমি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম একটা উইল করবো বলে; আমার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিয়তোষ আমার ত্যাজ্য পুত্র, সে আমার বিষয়ের এক পয়সাও পাবে না। এই মর্মে একটা উইল করে আনবেন। আজ আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি, কাল আপনার আপিসে না হয় যাবো। এখন আপনি আসুন একটু জল খেয়ে যাবেন।

সেই সময় প্রিয়তোষ আর কৃষ্ণকলি জাহাজে সমুদ্রের অকূল জলরাশির উপর দিয়ে সিংহলের দিকে চলেছে। কালো জলের দিকে চেয়ে চেয়ে প্রিয়তোষ একবার কৃষ্ণকলির দিকে চেয়ে হাসলে।

কৃষ্ণকলি লজ্জিত মুখ নত করে মৃদু মধুর স্বরে বললে—তুমি হাসছো যে?

প্রিয়তোষ বললে—শরৎ-বাবুর শ্রীকান্ত ঠিক বলেছিলো যে কালোর বুকেও আলো আছে। কালো সমুদ্রের বুক থেকেই লক্ষ্মী আর অমৃত উঠেছিলো।

কৃষ্ণকলি কৃতার্থ হয়ে বললে—কিন্তু বিষও তো উঠেছিলো। সে কথাটা ভুলো না।

প্রিয়তোষ বললে—হ্যাঁ, যিনি শিব শঙ্কর তিনি সেই বিষ জীর্ণ করে জগৎকে সর্বদা রক্ষা করেন।

কৃষ্ণকলি সঙ্কোচ ও ব্রীড়ার সহিত বললে—তুমি আমাকে এতো আদর করো, আমি লজ্জায় মরে যাই। আমি অনাথা দরিদ্রা...

প্রিয়তোষ কৃষ্ণকলির হাত চেপে ধরে গাঢ় স্বরে বললে—ইয়ং গেহে লক্ষ্মীর্ অমৃতবর্ত্তির্ নয়নয়োঃ

কৃষ্ণকলি সুখের লজ্জায় অভিভূত হয়ে বললে—আমি কুৎসিত কালো...

প্রিয়তোষ কৃষ্ণকলির হাতে একটু চাপ দিয়ে বললে—

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,
কালো বলে যারে গাঁয়ের লোক।
কালো? তা সে যতোই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ!

———

# প্রবন্ধ

# শ্রীজয়দেব কবি

## সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

'গীতগোবিন্দ'-রচয়িতা কবি শ্রীজয়দেব সংস্কৃত-সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি, এবং সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রুতি-মধুর গীতি-কবিতার কবি বলিয়া তিনি সর্ব্ববাদি-সম্মতি-ক্রমে সম্মানিত হইয়া আছেন। সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠ প্রাচীন কবিগণের নাম উল্লেখ করিতে হইলে সহজেই তাঁহার নাম আসিয়া পড়ে—অশ্বঘোষ, ভাস, কালিদাস, ভর্তৃহরি, ভারবি, ভবভূতি, মাঘ, ক্ষেমেন্দ্র, সোমদেব, বিহ্লণ, শ্রীহর্ষ, জয়দেব। বাস্তবিক, নিখিল ভারত ব্যাপিয়া যাঁহাদের যশ বিস্তৃত, সেই শ্রেণীর প্রধান সংস্কৃত কবিদের মধ্যে জয়দেবকে অন্তিম কবি বলিতে হয়। এক মহাকবি কালিদাসের ভারত-ব্যাপী প্রভাবের সঙ্গেই জয়দেবের প্রভাব তুলিত হইতে পারে ; জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যখানি কবির পরবর্ত্তী কালের ভারতীয় সাহিত্যের অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া আছে। জয়দেবের জীবৎকাল খ্রিস্টীয় ১২ ও ১৩-র শতকের পরেও সংস্কৃত কাব্য ও শ্লোক রচনার ধারা অব্যাহত ছিল বটে, কিন্তু উত্তর-ভারত তুর্কিদের দ্বারা বিজিত হইবার পরে এবং ভাষা-সাহিত্যের উদ্ভবের ফলে পরবর্ত্তী শতক-সমূহে সংস্কৃতে কাব্যাদি রচনা রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতা হইতে বঞ্চিত হইল, এবং আর পূর্ব্বের মত জনপ্রিয় থাকিতে পারিল না ; এই জন্য এই ধারা কতকটা ক্ষুণ্ণ হইয়া যায়। মুসলমান যুগে সংস্কৃত ভাষাকে আশ্রয় করিয়া কতকগুলি বড় বড় কবি নিজ প্রতিভার প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং ইঁহাদের আবির্ভাব ইহাই প্রমাণিত করিয়াছিল যে, মুসলমান যুগে অনেকটা প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়াও হিন্দুর কাব্য-প্রতিভা তাহার অর্থ-সহস্র বা সহস্র বর্ষ পূর্ব্বেকার কৃতিত্বের প্রতিস্পর্ধা হইতে সমর্থ হইযাছিল। শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীজগন্নাথ পণ্ডিত, শ্রীনীলকণ্ঠ দীক্ষিত প্রভৃতি কবিগণ মুসলমান যুগেও সংস্কৃত সাহিত্যের গৌরব বর্ধন করিয়া গিয়াছেন ; তাঁহাদের কাব্য নাটকাদি ও অন্য পুস্তক, প্রাচীন হিন্দু যুগের কবিদের রচনার মতই আদর করিয়া আলোচিত হইবার যোগ্য, ভারতের সংস্কৃতিপূত চিত্তের বিগত কয়েক শতক ধরিয়া যে বিকাশ ঘটিয়াছিল, তাহা ইঁহাদের রচনাতেই বহুল পরিমাণে প্রতিফলিত হইয়া আছে। সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের ও বিদ্যাগর্ভ সাহিত্যের নদী অবিলুপ্ত গতিতে আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিলেও, খ্রিস্টীয় ১৩-র শতকের আরম্ভ হইতে, জয়দেব কবির পরে যে সংস্কৃতের প্রাচীন যুগের অবসান ঘটিল এবং নূতন ভাষা-সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা হইল, সে কথা স্বীকার করিতে হয়। জয়দেব হইতেছেন যুগ-সন্ধির কবি, তাঁহার রচনায় প্রাচীনের বিজয়া ও নবীনের আগমনী উভয়ই যেন যুগপৎ ঝঙ্কৃত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণলীলা—রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথা—অবলম্বন করিয়া অতি মনোহর ও শ্রুতি-মধুর কবিতা ও গানের রচয়িতা বলিয়াই, অতি সহজে শ্রীজয়দেব—অন্তত সম্প্রদায়-বিশেষের

জনগণের সমক্ষে—দিব্য অনুপ্রাণনা দ্বারা প্রণোদিত রসিক ও কবিরূপে এবং ভক্তরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছেন। রাধা ও কৃষ্ণের স্বর্গীয় ও শাশ্বত প্রেমকে মানব আকারে রূপ দান করিয়া নবীন হিন্দু সমাজের সমীপে রসের অনন্ত ভাণ্ডাররূপে উপনীত করা হয় ; তুর্কি বিজয়ের পরে যখন মুখ্যত সুফি-মতাবলম্বী ফকির ও প্রচারকদের চেষ্টায় ভারতের জনগণের নিকট ইসলাম ধর্ম্ম অল্পে-অল্পে প্রসার লাভ করিতে থাকে, ভারতের ধর্ম্ম-জীবন ও সংস্কৃতি যখন এইভাবে বিদেশী ধর্ম্মের অভ্যুত্থানে ও প্রসারে বিপন্ন হইয়া পড়ে, তখন হিন্দু ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিকে দেশের হৃদয়ে সুদৃঢ় করিয়া রাখিবার জন্য পুনরুদিত ভক্তিবাদকে আবাহন করা হইল; ভারতের সাধক ও ভক্তগণ দেশের মধ্যে ভক্তির ধারার প্রবাহ ফিরাইয়া আনিতে বা তাহাতে নবীনতা দান করিতে চেষ্টা করিলেন; তখন শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীরামচন্দ্রলীলা এই ভক্তিমার্গের প্রধান পরিপোষকরূপে দেখা দিল। ধীরে ধীরে জয়দেব কবির 'গীতগোবিন্দ' কাব্যখানি ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্যাদা পাইল, এবং স্বয়ং জয়দেব শ্রীকৃষ্ণের বিশেস অনুগৃহীত বৈষ্ণব ভক্ত ও মহাপুরুষের সম্মান প্রাপ্ত হইলেন। আধুনিক ভারতের বৈষ্ণব ভক্তকথার মধ্যে জয়দেব অচ্ছেদ্য ভাবে সংযুক্ত হইলেন, বৈষ্ণব ভক্ত ও সাধকদের মধ্যে তাঁহার সম্মাননীয় আসন প্রতিষ্ঠিত হইল। জনসাধারণের মধ্যে এইভাবে ভক্তরূপেই তাঁহার নাম সুপরিচিত; যে সকল ভক্তিপূত ইতিবৃত্ত পাঠে মানুষের মন ভগবদাভিমুখী হইয়া উন্নীত হয়, জয়দেবের নামের সঙ্গে বিজড়িত কাহিনিগুলি সেই ইতিবৃত্ত-সমূহের অন্যতম হইয়া এখন বিদ্যমান। এইরূপে মানুষের ধর্ম্মজীবনে অনুপ্রাণনা আনিবার সৌভাগ্য ভারতের অতি অল্পসংখ্যক কবির পক্ষে ঘটিযাছিল; ব্যাস ও বাল্মীকি এবং কতকটা কালিদাস ভিন্ন আর কোনও কবি এইভাবে সাহিত্যেতিহাসের দৃঢ় পার্থিব ভূমি হইতে পুরাণ-সুলভ কাহিনি ও মধ্য যুগের ধর্ম্মসাধনার গগনপথে উন্নীত হইতে পারেন নাই।

শ্রীজয়দেব কবির জীবৎকাল সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই—তিনি খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জীবিত ছিলেন এবং গৌড় বঙ্গের শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা লক্ষ্মণসেনের সভার অন্যতম কবি ছিলেন। স্বর্গত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় ১৯০৬ সালের Journal and Proceedings of a Asiatic Society of Bengal পত্রিকার ১৬৬-১৬৯ পৃষ্ঠায় Sanskrit Literature in Bengal during the Sena Rule নামে তাঁহার মূল্যবান্ প্রবন্ধ-মধ্যে জয়দেবের কথা পূর্ণভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। 'গীতগোবিন্দ' কাব্য পাঠে আমরা জয়দেবের সম্বন্ধে কতকগুলি কথা জানিতে পারি। তাঁহার পিতার নাম ছিল ভোজদেব, মাতার নাম রামা দেবী (বা বামা দেবী অথবা রাধা দেবী), তাঁহার পত্নীর নাম ছিল পদ্মাবতী, এবং পরাশর নামে তাঁহার এক প্রিয় বন্ধু ছিলেন যিনি 'গীতগোবিন্দ'র গান গাহিতেন। জয়দেব তাঁহার সমসাময়িক অন্য কবিদের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন—উমাপতিধর, শরণ, আচার্য্য গোবর্ধন ও ধোয়ী কবিরাজ। অন্যত্র ইঁহাদের কথা শুনা যায়; ইঁহাদের রচনাও পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার নিজ গ্রাম কেন্দুবিল্বর নাম তিনি গীতগোবিন্দে করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে জয়দেব নামে একাধিক কবি উদ্ধৃত হন,

কিন্তু গীতগোবিন্দ-কার জয়দেব ভিন্ন আর কাহাবও সম্বন্ধে বিশেষ কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। জয়দেব নামে এক ছন্দঃ-সূত্র রচয়িতা ছিলেন, ইনি আলঙ্কারিক অভিনবগুপ্ত (খ্রিস্টাব্দ ১০০০) কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছিলেন, এবং হর্ব্বট (খ্রিঃ ৯০০) ইঁহার ছন্দঃ-সূত্রের একটি টীকা প্রণয়ন করেন; সুতরাং ইনি আমাদের জয়দেবের কয়েক শতক পূর্ব্বেকার লোক। রামায়ণ-কথা অবলম্বন করিয়া রচিত 'প্রসন্ন-রাঘব' নাটকের রচয়িতা আর এক জয়দেব ছিলেন, ইহার পিতার নাম মহাদেব ও মাতার নাম সুমিত্রা, ইনি কৌণ্ডিন্য-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইঁহার গুরুর নাম ছিল হরিমিশ্র, ইনি গীতগোবিন্দ-কার জয়দেবের কাছাকাছি সময়ের হইবেন, কারণ ১২৫৭ খ্রিস্টাব্দে সংকলিত কাশ্মীরীর কবি জহ্লণ কৃত 'সূক্তিমুক্তাবলী' নামক সংগ্রহ-গ্রন্থে 'প্রসন্ন-রাঘব' হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, এই জয়দেবের আর কোন পরিচয় নাই, তবে কেহ-কেহ অনুমান করেন ইনি বিদর্ভের অর্থাৎ উত্তর-মহারাষ্ট্রের অধিবাসী ছিলেন। 'চন্দ্রালোক' নামে অলঙ্কার-গ্রন্থও ইঁহার রচিত। বাঙ্গালা দেশে ইঁহার খ্যাতি তাদৃশ বিস্তৃত হয় নাই। "জয়দেব' বলিলে আমরা 'গীতগোবিন্দ'-কার জয়দেবকেই বুঝিয়া থাকি। আমাদের জয়দেব বাঙ্গালার কবি ছিলেন, তাঁহার কেন্দুবিল্ব এখন কেঁদুলি নামে তাঁহার পীঠস্থানরূপে পরিচিত। বীবভূম জেলার অজয় নদের তীরে এই গ্রামে পৌষ-সংক্রান্তির বার্ষিক মেলায় এখনও তাঁহাব স্মৃতি রক্ষিত হয়। ষোড়শ শতকে নাভাজিদাসের ব্রজ-ভাষা বা প্রাচীন হিন্দিতে রচিত 'ভক্তমাল' গ্রন্থে ও সপ্তদশ শতকে প্রিয়াজিদাসের রচিত ঐ গ্রন্থের টীকাতে, তখনকার দিনে বিশেষ প্রচারিত, জয়দেব সম্বন্ধে কতকগুলি কাহিনি পাওয়া যায়—বিশেষত জয়দেব-পত্নী পদ্মাবতী সম্বন্ধে কাহিনিটি—এটি বিশেষ লোকপ্রিয় হয় ; পদ্মাবতীর পিতার ইচ্ছা ছিল যে নিজ কন্যাকে দেবদাসীরূপে তিনি জগন্নাথ-মন্দিরে সমর্পণ করিয়া আসেন, কিন্তু নারায়ণ-কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া পরে জয়দেবের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দেন। "দেহি পদপল্লবমুদারম্" সংক্রান্ত ভক্তি-মূলক আখ্যায়িকাটি বাঙ্গালা দেশে সুপ্রসিদ্ধ। 'সেকশুভোদয়া'-তে জয়দেব ও পদ্মাবতী সম্পর্কে এই কথা সংরক্ষিত আছে যে—বুঢ়নমিশ্র নামে বাঙ্গালা দেশের বাহির হইতে আগত জনৈক সঙ্গীতজ্ঞ জয়দেবকে সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আহ্বান করেন, বিদেশাগত এই দাম্ভিক কালোয়াতকে জয়দেব-পত্নী পদ্মাবতী পরাজিত করিয়াছিলেন। 'সেকশুভোদয়া'র এই উপাখ্যানের মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য থাকা খুবই সম্ভবপর। পদ্মাবতী সঙ্গীত বিদ্যায় সুশিক্ষিতা ছিলেন, ইহা এই কথা হইতে প্রমাণিত হয়, এবং ইহার দ্বারা তাঁহাকে যে দেবদাসী-রূপে মন্দিরে গান গাহিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার পিতা সমর্পণ করিতে চাহিয়াছিলেন, এই কাহিনিও যেন কতকটা সমর্থিত হয় ; অপর, জয়দেব আপনাকে যে "পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তী" বলিয়া গর্ব্বের সঙ্গে উল্লিখিত কবিয়াছেন, তদ্দ্বারা যেন ইহাও সূচিত হইতেছে পদ্মাবতী নৃত্যকুশলা ছিলেন। এই সকল কাহিনি অনুসারে, এবং 'গীতগোবিন্দ' গ্রন্থে একাধিক স্থানে নিজ পত্নীর নাম কবি-কর্তৃক উল্লিখিত হওয়ায়, ইহা বুঝিতে পারা যায় যে জয়দেব-পদ্মাবতীর দাম্পত্য জীবন বিশেষ সুখের ছিল।

জয়দেব মহারাজ লক্ষ্মণসেনেব সভায় কবি ও পণ্ডিতদের মধ্যে যে বিশেষ সম্মানিত

ছিলেন, তাহার বহু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। জয়দেবের সমকালীন পণ্ডিত ও কবি এবং সামন্ত ভূম্যধিকারী বটুদাসের পুত্র শ্রীধর দাস ১১২৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১২০৫ খৃস্টাব্দে 'সদুক্তি-কর্ণামৃত' নামে একখানি সংস্কৃত শ্লোক-সংগ্রহ সঙ্কলিত করেন, ঐ পুস্তক বাঙ্গালা দেশে রচিত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় এবং মুসলমান-পূর্ব্ব যুগের গৌড়-বঙ্গের কবি-মনের সমীক্ষায় অমূল্য। 'সদুক্তি-কর্ণামৃত' ১৯৩৩ সালে লাহোর হইতে স্বর্গত পণ্ডিতদ্বয় রামাবতার শর্ম্মা ও হরদত্ত শর্ম্মার সম্পাদনায় সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পাঁচটি প্রবাহে বিভিন্ন ছন্দে রচিত প্রায় ২৪০০ সংস্কৃত শ্লোক আছে। এগুলির মধ্যে ৫০০টি শ্লোকের রচয়িতার নাম অজ্ঞাত বা লুপ্ত, কিন্তু অবশিষ্ট আনুমানিক ১৯০০ শ্লোকের রচক বলিয়া ৪৮৫ জন কবির নাম পাওয়া যাইতেছে। এই ৪৮৫ জন কবির মধ্যে বোধ হয় ৩০০ব অধিক গৌড়-বঙ্গের কবি হইবেন। যে পাঁচটি 'প্রবাহ' অর্থাৎ অধ্যায়ে এই নাতিক্ষুদ্র সংগ্রহ-গ্রন্থ বিভক্ত, সেগুলি যথাক্রমে হইতেছে [১] অমর-বা দেবপ্রবাহ, [১] শৃঙ্গাবপ্রবাহ, [৩] চাটুপ্রবাহ, [৪] অপদেশপ্রবাহ ও [৫] উচ্চাবচপ্রবাহ। প্রত্যেক প্রবাহের অন্তর্গত কতকগুলি করিয়া 'বীচি' বা তরঙ্গ অর্থাৎ শ্রেণী আছে, এবং প্রত্যেক বীচি পাঁচটি করিয়া শ্লোকে সম্পূর্ণ। দেবপ্রবাহে আছে এইরূপ ৯৫ বীচি, শৃঙ্গারপ্রবাহে ১৭৯, চাটুপ্রবাহে ৫৪ অপদেশপ্রবাহে ৭২ ও উচ্চাবচপ্রবাহে ৭৪। এই সমস্ত সংস্কৃত কবিতাব অনেকগুলিতেই খ্রিস্টীয় ১২০০-র অর্থাৎ বাঙ্গালাদেশ তুর্কি কর্ত্তৃক বিজিত হইবার পূর্ব্বের যুগের বাঙ্গালী কবিচিত্ত প্রতিফলিত হইয়া আছে ; ভবিষ্যযুগেব বাঙ্গালা কবিতাব ভাবধারা ও তাহার ঝঙ্কার বহুল পরিমাণে এই সকল শ্লোকেই আমবা ধবিতে পাবি। সংস্কৃতে নিবদ্ধ এই সকল শ্লোকে মধ্যযুগেব এমন কি আধুনিক কালেব বাঙ্গালা কবিতাব পূর্ব্বাভাস দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা কাব্যেতিহাসের আলোচনায় 'সদুক্তি-কর্ণামৃত'কে বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের অন্যতম সংস্কৃতময়ী প্রতিষ্ঠাভূমি স্বরূপ মনে করিবতে হয়।

এখন, সদুক্তি-কর্ণামৃতে 'জয়দেবস্য' বলিযা ৩১টি শ্লোক বিভিন্ন প্রবাহে ধৃত হইয়াছে; এগুলির মধ্যে ৫টি শ্লোক গীতগোবিন্দে পাওয়া যায়। ছন্দঃসূত্রকার জয়দেবের কবি-প্রসিদ্ধি নাই ; এবং প্রসন্ন রাঘব'-কার জয়দেব হয তো আমাদেব জয়দেবেরই সমকালীন ছিলেন, কিন্তু তাঁহার নাম-যশ বাঙ্গালা দেশে তখন পঁহুছায় নাই ; 'গীতগোবিন্দ'-কার জয়দেব হইতে পৃথক্ আর কোনও জয়দেবের কথা জানিয়া থাকিলে, শ্রীধরদাস অবশ্যই তাঁহার উল্লেখ করিতেন ; তাঁহার সমকালীন জীবিত কবি, রাজসভায় যিনি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং যাঁহার 'গীতগোবিন্দ' হইতে শ্লোক তিনি উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার সহিত কোনও জয়দেবকে শ্রীধরদাস নিশ্চয়ই বিজড়িত করিয়া ফেলিতেন না; সুতরাং, 'গীতবোবিন্দ' হইতে গৃহীত পাঁচটি শ্লোকের বলে, এবং জয়দেব শ্রীধরদাসের পরিচিত কবি ছিলেন, এই কথাও ধরিয়া (শ্রীধরদাসের পিতা বটুদাস লক্ষ্মণসেন দেবের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন এ কথা সদুক্তি-কর্ণমৃতের ভূমিকায় তিনি আমাদের জানাইয়া দিয়াছেন। এই ৩১টি শ্লোকের সব কয়টিরই রচয়িতা গীতগোবিন্দ-কার জয়দেব ছিলেন, এরূপ অনুমান করা অযৌক্তিক হইবে না। সদুক্তি-কর্ণামৃতে জয়দেব-সামসময়িক কবিদের মধ্যে, উমাপতিধরের রচিত ৯১টি শ্লোক

আছে, লক্ষ্মণসেন-পুত্র যুবরাজ কেশবসেন দেবের ১০টি, আচার্য্য গোবর্ধনের ৬টি, ধোয়ী কবির ২০টি (তন্মধ্যে ২টি 'পবন-দূত' হইতে), শরণের ২০টি, মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেবের ১১টি, হলায়ুধের ৫টি। এতদ্ভিন্ন আরও বহু কবি যাঁহারা জয়দেবের আশপাশের সময়ের ছিলেন, তাঁহাদেরও রচনা আছে। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে শ্রীরূপগোস্বামী 'পদ্যাবলী' নামে যে একখানি বৈষ্ণব-শ্লোক-সংগ্রহ পুস্তক প্রণয়ন করেন, তাহাতে এই সমস্ত কবিদের লেখা কতকগুলি শ্লোক মিলিতেছে।

জয়দেব-রচিত এই শ্লোকগুলির মধ্যে শৃঙ্গাররস ভিন্ন বীররসের শ্লোকও পাইতেছি, এবং আমাদের চক্ষে বৈষ্ণব-সাধক-রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত জয়দেব রচিত শিবের স্তুতিময় শ্লোকও পাইতেছি। এই শ্লোক-সমূহ হইতে দেখা যায়, জয়দেবের বাণী কেবল বাঁশীর ঝঙ্কারেই মাতেন নাই, অসিব ঝঞ্ঝনাও তাঁহাকে মাতাইয়াছিল ; রণক্ষেত্র, তূর্য্যধ্বনি প্রভৃতি বিষয়ে তিনি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। এই সব দেখিয়া মনে হয়, জয়দেব পঞ্চদেবতার উপাসক সাধারণ ব্রাহ্মণ গৃহস্থ ছিলেন, পরবর্ত্তী কালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-কর্তৃক তিনি যে একজন বিশিষ্ট সাধক বৈষ্ণব বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন, আদৌ সম্ভবত তিনি তাহা ছিলেন না। খ্রিস্টীয় ১১০০-১২০০-এর দিকে, চৈতন্যোত্তর যুগের আদর্শে গঠিত বৈষ্ণব সমাজ বা ধর্ম্ম ছিল বলিয়া মানিতে পারা যায় না। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত বিদ্যাপতির 'কীর্ত্তিলতা'র ভূমিকায় দেখাইয়াছিলেন যে, বিদ্যাপতি, 'বৈষ্ণব মহাজন' বলিলে আমরা যে সাম্প্রদায়িক সাধক বুঝি, তাহা মোটেই ছিলেন না, সহজিয়া সাধকও ছিলেন না, তিনি পঞ্চদেবতার উপাসক স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং শিবের উমার ও গঙ্গার উপাসক ছিলেন। 'গীতগোবিন্দ' রচনা করিলেও জয়দেব সম্বন্ধেও ঐরূপ কথা বলা যাইতে পারে।

পরবর্ত্তী সাম্প্রদায়িক মতবাদ জয়দেবের কবিতার ব্যাখ্যাতেও আরোপিত হইয়া স্থলে-স্থলে নানা জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের প্রথম শ্লোকের "নন্দ-নিদেশতঃ" শব্দের ব্যাখ্যার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

> "মেঘৈর্ম্মেদুরমম্বরং, বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈর;
> নক্তং; ভীরুরয়ং—তদেব ত্বমিমং, রাধে। গৃহং প্রাপয।"
> —ইত্থং নন্দ-নিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
> রাধামাধবয়ো র্জয়ন্তি যমুনা-কূলে রহঃ-কেলয়ঃ॥

এই সুপরিচিত শ্লোকের সরল অর্থ ইহাই দাঁড়ায় যে নন্দ-গোপের নির্দেশেই তাঁহার অজ্ঞানত মেঘাচ্ছন্ন বর্ষার রাত্রে পথস্থ কুঞ্জমধ্যে রাধা ও মাধবের মিলন ঘটিয়াছিল। কিন্তু রাণা কুম্ভের সভার আলঙ্কারিক পণ্ডিতগণ, কুম্ভ-রাণার নামে প্রচলিত 'রসিকপ্রিয়া' নামে 'গীতগোবিন্দ'র টীকা প্রণয়নে যাঁহাদের হাত ছিল, তাঁহারা, "নন্দ-নিদেশতঃ" শব্দের অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং এই ব্যাখ্যা ("নন্দ" অর্থাৎ মিলন-আনন্দের উদ্দেশ্যে, নন্দ-গোপের আদেশে নহে, শ্লোকটির প্রথম দুই ছত্রের উক্তি এই মতে নন্দ-গোপের নহে, ইহা সখীর উক্তি রাধার প্রতি) গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে (এ সম্বন্ধে

দ্রষ্টব্য, শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের সম্পাদিত 'গীতগোবিন্দ'র ভূমিকা, এবং ১৩৪৯ সালের দোল-সংখ্যার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-তে সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধ)। কিন্তু 'সদুক্তি-কর্ণামৃত' গ্রন্থে দুইটি শ্লোক পাওয়া যাইতেছে, গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকের মতই শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে রচিত,—একটি কেশবসেন দেবের রচিত, অন্যটি লক্ষ্মণসেন দেবের;—সে দুইটি হইতে বুঝা যায় যে গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকের "নন্দ" শব্দ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পিতা নন্দ-গোপকেই ধরিতে হইবে এবং এই তিনটি শ্লোক—জয়দেবেব, কেশবসেন দেবের ও লক্ষ্মণসেন দেবের—এক সঙ্গেই বিচার করিতে হইবে। 'সদুক্তি-কর্ণামৃত'ব এই দুইটি শ্লোক শ্রীরূপগোস্বামীর 'পদ্যাবলী'-তেও আছে, কিন্তু 'পদ্যাবলী'তে দুইটিই লক্ষ্মণসেন দেবের রচিত বলিয়া ধরা হইয়াছে। শ্লোক দুইটি এই—

(কেশবসেন-রচিত)—

"আহূতাদ্য ময়োৎসবে, নিশি গৃহং শূন্যং বিমুচ্যাগতা;
ক্ষীবঃ প্রৈষ্যজনঃ; কথং কুলবধূয়েকাকিনী বাস্যতি?
বৎস, ত্বং ত্বদিমাং নয়ালয়ম্"—ইতি শ্রুত্বা যশোদা-গিরো
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি মধুর স্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ॥

এখানে দেখা যাইতেছে যে এই শ্লোকটি যে গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকের প্রতিধ্বনি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখানে যশোদাও না জানিয়া রাধা ও কৃষ্ণের মিলনে সহায়তা করিতেছেন; ইহাতে যেন "নন্দ-নিদেশতঃ" শব্দের প্রত্যুত্তর বা পালটা জবাব 'যশোদা-গিরঃ" পাওয়া যাইতেছে। "যশোদা-গিরঃ"-কে "নন্দ-নিদেশতঃ"-র মত অন্য ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস আশা করি কেহ করিবেন না।

(লক্ষ্মণসেন রচিত)—

"কৃষ্ণ, ত্বদ্‌বনমালয়া সহকৃতং," কেনা পি, "কুঞ্জোদরে
গোপীকুন্তলবর্হদাম, তদিদং প্রাপ্তং ময়া; গৃহ্যতাম্।"
—ইত্থং দুগ্ধমুখেন গোপাশিশুনাখ্যাতে, ত্রপানম্রয়ো
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি বলিত-স্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ॥

এই শ্লোকে যেন রাজা লক্ষ্মণসেন, অন্যতম সভাকবি জয়দেব ও বাজকুমার রচিত যুগ্মশ্লোকের সমাধান করিয়া দিতেছেন, কি করিয়া রাধাকৃষ্ণের গোপন মিলনের রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তিনটি শ্লোকেরই চতুর্থ ছন্দের "রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি" এই অংশ লক্ষণীয়. তিনটি শ্লোকই যেন সমস্যাপূর্ত্তির জন্য রচিত হইয়াছিল, যেন সভায় রসিক ও বিদ্বান্ রাজা সমস্যাস্বরূপ শ্লোকাংশ দিলেন,—"রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি," ও পরে সভাস্থ কবিদের আহ্বান করিলেন, এই শ্লোকাংশকে চতুর্থ ছত্রের প্রথমে সন্নিবেশিত করিয়া শ্লোক রচনা করিতে হইবে। কিংবা হয় তো জয়দেবেব গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক পাঠ করিয়া অথবা শুনিয়া প্রীত হইয়া রাজা ও রাজকুমার উভয়েই এই ভাবের কবিতা রচনা করিয়া কবিকে সম্মানিত করিয়া থাকিবেন। মোটের উপর, আমরা শ্রীধরদাসের নিকট কৃতজ্ঞ, তিনি

এই শ্লোক দুইটি তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধার করিয়া না দিলে, মহারাজ লক্ষ্মণসেন ও যুবরাজ কেশবসেনের সঙ্গে জয়দেবের এই সাহিত্যিক সংযোগের কথা জানিতে পারিতাম্ না; এবং এই দুই শ্লোকের দ্বারা "নন্দ-নিদেশতঃ" পদের সহজ সরল অর্থই সমর্থিত হইতেছে, পরবর্ত্তী সাম্প্রদায়িক অখ-কল্পনা নহে।

এক্ষণে জয়দেবের রচিত শ্লোকগুলি 'সদুক্তি-কর্ণামৃত' হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। এগুলির দ্বারা জয়দেবের কবি-প্রতিভার কতকগুলি অজ্ঞাত ও অপ্রকাশিত দিক্ প্রকাশিত হইতেছে।

[১] ১।৪।৪। মহাদেব॥

ভূতিব্যাজেন ভূমীমমরপুরসরিৎকৈতবাদম্বু বিভ্রল্
ললাটাক্ষিচ্ছলেন জ্বলনমহিপতিশ্বাসলক্ষাৎ সমীরম্।
বিস্তীর্ণাঘোরবক্ত্রোদরকুহরনিভেনাম্বরং পঞ্চভূতৈর্
বিশ্বং শশ্বদ্ বিতন্বন্ বিতরতু ভবত সম্পদং চন্দ্রমৌলিঃ॥

[২] ১।৫০।৩। কল্কী॥

কল্কী কল্কং হরতু জগতঃ স্ফূর্জদূর্জস্বিতেজা
বেদোচ্ছেদস্ফুরিতদুরিতধ্বংসনে ধূমকেতুঃ।
যেনোৎক্ষিপ্য ক্ষণমসিলতাং ধূমবৎ কল্মবেচ্ছান্
ম্লেচ্ছান্ হত্বা দলিতকলিনাকারি সত্যাবতারঃ॥

[৩] ১।৫৯।৪। কৃষ্ণভুজঃ॥

জয়শ্রীবিদ্যস্তৈর্ম্মহিত ইব মন্দারকুসুমৈঃ [=গীতগোবিন্দ ১১।৩৪]॥

[৪] ১।৬০।৫। গোবর্ধনোদ্ধারঃ॥

"মুগ্ধে!" "নাথ কিমাত্থ?" "তন্বি, শিখরিপ্রাগ্ভারভুগ্নো ভুজঃ;"
"সাহায্যং, প্রিয়! কিং ভজামি?" "সুভগে, দোর্ব্বল্লিমায়াসয়।"
—ইত্যুল্লাসিতবাহুমূলবিচলচ্চেলাঞ্চলব্যক্তয়ো
রাধায়াঃ কুচয়োর্জয়ন্তি চলিতাঃ কংসদ্বিবো দৃষ্টয়ঃ॥

[এই শ্লোকের সহিত উমাপতিধর-রচিত নিম্নলিখিত শ্লোকটি তুলনীয়—এটি সদুক্তি-কর্ণামৃতের ১।৫৫।৩ সংখ্যক শ্লোক, বিষয়, "হরিক্রীড়া"; 'পদ্যাবলী'-তেও এটি উদ্ধৃত হইয়াছে, সংখ্যা ২৫৯ ঃ—

ভ্রূবল্লীবলনৈঃ কয়াপি নয়নোন্মেষৈঃ কয়াপি স্মিত-
জ্যোৎস্নাবিচ্ছুরিতৈ কয়াপি নিভৃতং সম্ভাবিতস্যাধ্বনি।
গর্ব্বোদ্ভেদকৃতাবহেলবিনয়শ্রীভাজি রাধাননে
সাতঙ্কানুনয়ং জয়ন্তি পতিতাঃ কংসদ্বিষো দৃষ্টয়ঃ॥

—উভয় শ্লোকের শেষ ছত্র দুইটি তুলনীয়; "পতিতাঃ—চলিতাঃ"—এই দুইটি পদের যে কোনও একটি ধবিতে পারা যায়; সমস্যাপূর্ত্তির শ্লোক হিসাবে শেষ ছত্রের আধারে এই দুই সভাকবি নিজ নিজ শ্লোক রচিয়া থাকিবেন।]

[৫] ১।৮৫।৫। বহুরূপকশ্চঃ॥

ক্রীড়াকর্পূর দীপস্ত্রিদশমৃগদৃশাং কামসাম্রাজ্যলক্ষ্মী-
প্রোৎক্ষিপ্তৈকাতপত্রং শ্রমশমনচলচ্চামরং কামিনীনাম্।
কস্তুরীপঙ্কমুদ্রাঙ্কিতমদনবধূমুগ্ধগণ্ডোপধানং
দ্বীপং ব্যোমাম্বুরাশেঃ স্ফুরতি সুরপুরকেলিহংসঃ সুধাংশুঃ॥

[৬] ২।৩৭।৪। বাসকসজ্জা॥

অঙ্গেধ্বাভরণং করোতি বহুশঃ [=গীতগোবিন্দ ৫।১১]॥

[৭] ২।৭২।৪। অধরঃ॥

বিভাতি বিম্বাধরবল্লিরস্যাঃ স্মরস্য বন্ধুকধনুর্লতেব।
বিনাপি বাণেন গুণেন যেয়ং যূনাং মনাংসি প্রসভং ভিনত্তি॥

[৮] ২।৭৭।৪। রোমাবলী॥

হরতি রতিপতের্নিতম্ববিম্বস্তনতটচংক্রমসংক্রমস্য লক্ষ্মীম্।
ত্রিবলিভবতরঙ্গনিয়নাভীহ্রদপদবীমধিরোমরাজিরস্যাঃ॥

[৯] ২।১৩২।৪। রতারম্ভঃ॥*

উন্মীলৎপুলকাঙ্কুরেণ নিবিড়াশ্লেষে চ [=গীতগোবিন্দ ১২।১০]॥

[১০] ২।১৩৪।৪। বিপরীতরতম্॥

মারাঙ্কে রতিকেলি ইত্যাদি [=গীতগোবিন্দ ১২।১২]॥

[১১] ২।১৩৭।৫। উষসি প্রিয়াদর্শনম্॥

অস্যাঃ (তস্যাঃ) পাটলপাণিজাঙ্কিতমুরো [=গীতগোবিন্দ ১২।১৪]॥

[১২] ২।১৭০।৫। শরৎখঞ্জনঃ॥

মধুরমধুয়ং কুজরগ্রে পতন্ মুহুরুৎপতন্ন
অবিরতচলৎপুচ্ছঃ স্বেচ্ছং বিচুম্ব্য চিরং প্রিয়াম্।
ইহ হি শরদি ক্ষীবঃ পক্ষৌ বিধুর মিলন্ মুদা
মদয়তি রহঃ কুঞ্জে মঞ্জুস্থলীমধি খঞ্জনঃ॥

[১৩] ৩।৫।৪। ধর্ম্মঃ॥

যূপৈরুৎকটকণ্টকৈরিব মখপ্রোদ্‌ভূতধূমোদ্‌গমৈব্
অপ্যান্ধংকরণৌষধৈরিষ পদে নেত্রে চ জাতব্যথৈঃ।
যস্মিন ধর্ম্মপরে প্রশাসতি তপঃসম্ভেদিনীং মেদিনীম্
আস্তামাক্রন্দিতুং বিলোকিতুমপি ব্যক্তুং ন শক্তঃ কলিঃ॥

---

* এই শ্লোকটি যে গীতগোবিন্দ হইতে গৃহীত তাঁহা বন্ধুবব হবেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আমায় দেখাইয়া দিয়াছেন।

[১৪] ৩।৯।৪। করঃ॥

তেষামল্পতরঃ স কল্পবিটপী তেষাং ন চিন্তামণিশ্
চিন্তামপ্যপয়াতি কামসূরভিস্তেষাং ন কামানুদম্।
দীনোদ্ধারধুরীণপুণ্যচরিতো যেষাং প্রসন্নো মনাক্
পাণিস্তে ধরণীন্দ্র সুন্দবযশঃ সংরক্ষিণো দক্ষিণঃ॥

[১৫] ৩।৯।৫ করঃ॥

দেযত্বৎকরপল্লবো বিজয়তামশ্রান্তবিশ্রাণন-
ক্রীড়াস্কন্দিতকল্পবৃক্ষবিভবঃ কীর্ত্তিপ্রসূনোজ্জ্বলঃ।
যস্যোৎসর্গতিলচ্ছলেন গলিতাঃ স্যন্দানদানোদক-
স্রোতোভির্বিদুষাং ললাটলিখিতা দৈন্যাক্ষবশ্রেণয়ঃ॥

[১৬] ৩।১০।৪। চরণঃ॥

লক্ষ্মীবিভ্রমসদ্মপদ্মসুভগং কে নাম নোবীভুজো
দেব স্বচ্চরণং ব্রজন্তি শরণং শ্রীবেক্ষণাকাঙিক্ষণঃ।
ছায়ারামনুগম্য সম্যগভয়াঋদ্‌বীর্য্যাসূর্য্যাতপ-
ব্যাপ্তামপ্যবনীমটন্তি রিপবস্ত্যক্তাতপত্রাঃ সুখম্॥

[১৭] ৩।১১।৫। প্রিয়াব্যাখ্যানন্। (মহারাজ লক্ষ্মণসেনেব প্রশস্তি)।

লক্ষ্মীকেলিভুজঙ্গ! জঙ্গমহরে! সংকল্পকল্পদ্রুম!
শ্রেয়ঃসাধকসঙ্গ! সঙ্গরকলাগাঙ্গেয়! বঙ্গপ্রিয!
গৌড়েন্দ্র! প্রতিরাজরাজক! সভালংকার! কারার্পিত-
প্রত্যার্থিক্ষিতিপাল! পালক সতাং! দৃষ্টো সি, তুষ্টা বয়ম্॥

[১৮] ৩।১৫।৪। দেশাশ্রয়ঃ॥ (মহারাজ লক্ষ্মণসেনের প্রশস্তি)॥

"ত্বং চোলোল্লোললীলাং কলয়সি, কুরুষে কর্ষণং কুন্তলানাং;
ত্বং কাঞ্চন্যঞ্চনায় প্রভবসি, বভসাদঙ্গসঙ্গং করোষি।"
—ইত্থং রাজেন্দ্র! বন্দিস্তুতিভিরুপহিতোৎকম্পমেবাদ্য দীর্ঘং
নারীণামপ্যরীণাং হৃদয়মুদয়তে ত্বৎপদারাধনায়॥

[১৯] ৩।১৯৫। বিক্রমঃ॥

শিক্ষন্তে চাটুবাদান্ বিদধতি যবসানাননে কাননেষু
ভ্রাম্যন্তি জ্যাকিণাঙ্কং বিদধতি শিবিরং কুর্ব্বতে পর্ব্বতেষু।
অভ্যস্যন্তি প্রণামং ত্বার চলতি চমুচক্রবিক্রান্তিভাজি
প্রাণত্রাশায় দেব! ত্বদরিনৃপতয়শ্চ ক্রিরে কার্ম্মণানি।

[২০] ৩।২০।৫। পৌরুষম্॥

ভীষ্মঃ ক্লীবকতাং দধার, সমিতি দ্রোণেন মুক্তং ধনুর
মিথ্যা ধর্ম্মসুতেন জল্পিতমভুদ্ দুর্যোধনো দুর্ম্মদঃ।
ছিদ্রেধেব ধনঞ্জয়স্যাবিজয়ঃ, কর্ণঃ প্রমাদী ততঃ;

শ্রীমন্নস্তি ন ভারতে পি ভবতো যঃ পৌরুষৈ র্ব্বর্ধতে॥

[২১] ৩।২৩।৫। তেজঃ॥

একং ধাম শমীষু লীনমপরং সূর্যোৎপলজ্যোতিষাং
ব্যাজাদদ্রিষু গূঢ়মন্যদুদধৌ সংগুপ্তমৌর্ব্বায়তে।
ত্বত্তেজস্তপনাংশুমাংসলসমুত্তাপেন দুর্গং ভয়াদ্
বার্ক্ষং পার্ব্বতমৌদকং যদি যযুস্তেজাংসি কিং পার্থিবাঃ॥

[২২] ৩।২৯।৫। আশ্চর্যখড়্গা॥

শ্রীখণ্ডমূর্ত্তিঃ সরলাঙ্গযষ্টির্ম্মাকন্দমামূলমহো বহন্তী।
শ্রীমন্! ভবৎখড়্গতমালবল্লী চিত্রং রণে শ্রীফলমাতনোতি॥

[২৩] ৩।৩৪।৩। তূর্যধ্বনিঃ॥

গুঞ্জৎ ক্রৌঞ্চনিকুঞ্জকুঞ্জরঘটাবিস্তীর্ণকর্ণজ্বরাঃ
প্রাক্প্রত্যগ্ ধরণীন্দ্রকন্দরজরৎপারীন্দ্রনিদ্রাদহঃ।
লঙ্কাঙ্কত্রিককুৎপ্রতিধ্বনিঘনা পর্যন্তযাত্রাজয়ে
যস্য ভ্রেমুরমঙ্গমঙ্গরববৈরাশারুধো ঘোষণাঃ॥

[২৪] ৩।৩৪।৪। তূর্যধ্বনিঃ।। (অনুপ্রাস লক্ষণীয়)॥

যস্যাবির্ভূতভীতিপ্রতিভটপৃতনাগর্ভিণীভ্রূণভার-
ভ্রংশপ্রেশাভিভূত্যৈ প্লবনমিষব ভজন্নম্ভসাম্ভোনিধীনাম্।
সংভারং সংভ্রমস্য ত্রিভুবনমভিতো ভূভৃতাং বিভ্রদুচ্চৈঃ
সংরম্ভোজ্জৃম্ভণায় প্রতিরণমভবদ্ ভূরি ভেরীনিনাদঃ॥

[২৫] ৩।৩৪।৫। তূর্যধ্বনিঃ॥

বিঘট্টয়ন্নেব হঠাদকুণ্ঠবৈকুণ্ঠকণ্ঠীরবকণ্ঠগর্জাম্।
ভয়ঙ্করো দিক্করিণাং রণাগ্রে ভেরীরবো ভৈরবদুঃশ্রবস্তে॥

[২৬] ৩।৩৮।৩। বুদ্ধম্॥

শত্রূণাং কালরাত্রৌ সমিতি সমুদিতে বাণবর্ষান্ধকারে
প্রাগ্ভারে খড়্গধারাং সরিতমিব সমুত্তীর্য্য মগ্নারিবংশাম্।
অন্যোন্যাঘাতমত্তদ্বিরদঘনঘটাদন্তবিদ্যুচ্ছটাভিঃ
পশ্যন্তীযং সমন্তাদভিসরতি মুদা সাংযুগীনং জয়শ্রীঃ॥

[২৭] ৩।৩৯।৪। যুদ্ধস্থলী॥

নির্ব্বন্নারাচধারাচয়খচিত পতনমত্তমাঙ্গজাতং
জাতং যস্যারিসেনারুধিরজলনিধাবন্তরীপভ্রমায়।
সুপ্তা যস্মিন্ রতান্তে সহ চ সহচরৈ র্নালবন্নাগনাসা-
রন্ধ্রদ্বন্দ্বৈকপাত্রে রুধিরমধুরসং প্রেতকান্তাঃ পিবন্তি॥

[২৮] ৩।৪০।৫। দিগ্বিজয়ঃ॥

একঃ সংগ্রামরিঙ্গত্তুবগখুররজোরাজিভির্নষ্টদৃষ্টির

দিগ্‌যাত্রাজৈত্রমত্তদ্বিরদভরণমদ ভূমিভগ্নাস্তথান্যঃ।
বীরাঃ কে নাম তস্মাৎ ত্রিজগতি ন যযুঃ ক্ষীণতাং কাণকুব্জ-
ন্যায়াদ্ এতেন মুক্তাবভয়মভজতাং বাসবো বাসুকিশ্চ

[২৯] ৩।৫২।৫। প্রশস্তকীর্ত্তিঃ॥
মলিনয়তি বৈরিবদনং সুজনং রঞ্জয়তি ধবলয়তি ধাত্রীম্
অপি কুসুমবিশদমূর্ত্তি যৎ কীর্ত্তিশ্চিত্রমাচরতি॥

[৩০] ৫।১৬।৪। দিশঃ॥
অস্তু স্বস্ত্যয়নায় দিগ্‌ধনপতে কৈলাসশৈলাশ্রয়-
শ্রীকণ্ঠাভরণেন্দুবিভ্রমদিবানক্তং ভ্রমৎকৌমুদী।
যত্রালং নলকুবরাভিসরণারম্ভায় রম্ভাস্ফুটৎ-
পাণ্ডিম্নেব তনোস্তনোতি বিরহব্যগ্রাপি বেশগ্রহম্॥

[৩১] ৫।১৮।২। বীরঃ॥
ধাত্রীমেকাতপত্রাং সমিতি কৃতবতা চণ্ডদোর্দণ্ডদর্পাদ্
বাস্থানে পাদনম্রপ্রতিভটমুকুটাদর্শবিম্বোদরেষু।
উৎক্ষিপ্তচ্ছত্রচিহ্নং প্রতিফলিতমপি স্বং বপুর্বীক্ষ্য কিঞ্চিৎ
সাসূয়ং যেন দৃষ্টাঃ ক্ষিতিতলবিলসন্ মৌলয়ো ভূমিপালাঃ॥

জয়দেব যে কেবল শৃঙ্গার রসের কবি ছিলেন না, অন্য রসও তাঁহার কাব্য-সরস্বতীর দ্বারা পরিবেশিত হইয়াছে, তাহা উপরের শ্লোক কয়টি হইতে সুপরিস্ফুট হয়। 'সদুক্তি-কর্ণামৃত' ধৃত ৩১টি শ্লোকের মধ্যে ৫টি গীতগোবিন্দ হইতে গৃহীত হইয়াছে। বিষয় বস্তুর বিচার করিলে এইরূপ অনুমান করিতে প্রবৃত্তি হয় যে, জয়দেব অন্যূন দুইখানি অন্য কাব্য লিখিয়া থাকিতেও পারেন—একখানি 'গীতগোবিন্দ'র-ই মত শ্রীকৃষ্ণলীলাবিষয়ক (উপরের ২, ৭, ৮ ও ১২ সংখ্যার শ্লোকগুলির বিষয়-বস্তু বিচার্য) এবং অপরখানি সম্ভবত মহারাজ শ্রীলক্ষ্মণসেন দেবের প্রশস্তি-বিষয়ক (উপরের ১৩—৩১ সংখ্যক শ্লোকগুলি এই দ্বিতীয় কাব্য হইতে গৃহীত হইয়া থাকিতে পারে)। লক্ষ্মণসেনের বীরত্বের খ্যাতি ছিল, যুদ্ধের জন্য তিনি দক্ষিণ-দেশেও গিয়াছিলেন; ধোয়ী-কবির 'পবন-দূত' কাব্যে এই দক্ষিণ অভিযানের কথার উল্লেখ করা হইয়াছে; ধোয়ীর ন্যায়, কিন্তু একটু অন্য ভাবে, সংস্কৃত কাব্য রচনা করিয়া, সভাকবিদের মধ্যে অন্যতম জয়দেব, পৃষ্ঠপোষক রাজার গুণগান করিয়া থাকিতে পারেন। এতদ্ভিন্ন, অন্য কবিতাগুলি (১, ৪, ৫, এবং সম্ভবত ১২ ও ১৩) জয়দেবের প্রকীর্ণ শ্লোক-রচনা হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শ্রীধরদাসের জীবৎকালে জয়দেবের বিশেষ প্রতিষ্ঠা না হইয়া থাকিলে তাঁহার লেখা এতগুলি শ্লোক শ্রীধরদাস নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়া দিতেন না। ধোয়ীর 'পবন-দূত' হইতেও তিনি দুইটি শ্লোক দিয়াছেন।

শ্রীজয়দেবের কবি-খ্যাতি শীঘ্রই সমগ্র ভারত-খণ্ডে বিস্তৃত হয়। অনুমান হয়, তাঁহার 'গীতগোবিন্দ' ঐ যুগের সংস্কৃত-ভাষার কবি এবং উদীয়মান আধুনিক-ভাষাগুলির কবি, উভয় দলেরই প্রিয় হইয়াছিল, কারণ ইহাতে প্রাচীন সংস্কৃত রচনাশৈলীর সঙ্গে অপভ্রংশ

এবং নবোদ্ভুত ভাষা রচনাশৈলী, এই উভয়ের গঙ্গা-যমুনা-সংগম ঘটিয়াছিল। একান্ত মনোহর ও হৃদয়গ্রাহী ভাবে 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে দেবকাহিনি ও প্রেমগাথা ভক্তি মার্গের সাধন-রূপে হিন্দু সাংস্কৃতিক জাগরণের সেবায় মিলিত হয়। 'গীতগোবিন্দ'-রচনার শতবর্ষ-মধ্যে সুদূর গুজরাটে পাটন বা অণহিলবাড়া নগরে প্রাপ্ত সংবৎ ১৩৪৮ (অর্থাৎ খৃস্টাব্দ ১২৯২) তারিখের এক সংস্কৃত লেখের মঙ্গলাচরণ শ্লোক-রূপে ইহা হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছিল (মনোমোহন চক্রবর্ত্তী কৃত পূর্ব্বোল্লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। বাঙ্গালাদেশে ও উড়িষ্যায় যেমন, তেমনি গুজরাট ও রাজপুতানায় এবং উত্তর-পাঞ্জাবের গিরিদেশে ও উত্তর ভারতের বিশাল সমতল ভূভাগে, সর্ব্বত্র 'গীতগোবিন্দ' জনপ্রিয় কাব্য হইয়া উঠে। 'গীতগোবিন্দ' হইতে উদ্ধৃত শ্লোকাংশ ও বাক্যাংশ এবং উহার ভাব ও আশয় প্রাচীন কাল হইতেই বাঙ্গালা উড়িয়া হিন্দি ও গুজরাটি কাব্য ও কবিতায় প্রযুক্ত হইতে থাকে। মধ্য-যুগের বাঙ্গালার অন্যতম প্রধান কবি, এবং তুর্কি-বিজয়ের পরে সম্ভবত বাঙ্গালাদেশের প্রথম বড় কবি অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস (? আনুমানিক ১৪০০ খৃস্টাব্দ) তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' কাব্যে গীতগোবিন্দের দুইটি সঙ্গীতের অনুবাদ দিয়াছেন, এবং বহুস্থানে তাঁহার রচনাতে গীতগোবিন্দের ছায়া পড়িয়াছে। সুপরিচিত প্রাচীন গুজরাটি কাব্য 'বসন্ত বিলাস' (এক মতে ১৪৫০ খৃস্টাব্দে রচিত, অন্য মতে ১৩৫০ খৃস্টাব্দে) পাঠে দেখা যায়, ইহাতেও বহুস্থলে গীতগোবিন্দের ভাব পরিস্ফুট, এবং ভাষাও অনুকৃত বা প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। গীতগোবিন্দের প্রায় ৩৭খানি বিভিন্ন টীকা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে রচিত হইয়াছিল, মেবাড়-পতি মহারানা কুম্ভের নামে প্রচলিত 'রসিকপ্রিয়া' টীকাখানি এগুলির মধ্যে একখানি প্রাচীন টীকা (মহারানার রাজ্যকাল, ১৪৩৩-১৪৬৮ খৃস্টাব্দ); গীতগোবিন্দ সংস্কৃত ভাষার অন্যতম বহুলটীকাময় গ্রন্থ। অন্তত খানবারো বিভিন্ন সংস্কৃত-কাব্য গীতগোবিন্দের অনুকরণে রচিত হয়; ইহা ভিন্ন ভাষা-কাব্যও কতকগুলি আছে। পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরে খৃস্টীয় ১৪৯৯ অব্দে উৎকীর্ণ একটি উড়িয়া লেখ হইতে জানা যায় যে, মহারাজ প্রতাপরুদ্রের আজ্ঞানুসারে ঐ সময় হইতে 'গীতগোবিন্দ' ভিন্ন অন্য কোনও রচনা হইতে শ্লোক ও গান পুরীর মন্দিরে দেবদাসী ও অন্য গায়কগণ কর্তৃক গীত হওয়া নিষিদ্ধ হয়। (দ্রষ্টব্য, মনোমোহন চক্রবর্ত্তী-কৃত প্রবন্ধ, Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. LXII, 1893, পৃঃ ৯৬-৯৭)। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের চিত্র-শিল্পে, বিষয়-বস্তুর ভাণ্ডার হিসাবে গীতগোবিন্দের প্রভাব বিশেষ লক্ষণীয়; পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের "অপভ্রংশ" (অথবা তথা-কথিত "প্রাচীন গুজরাটী") এবং "প্রাচীন-হিন্দি" (অথবা "প্রাচীন রাজপুত") শিল্পে এবং সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের রাজপুতানা, বুন্দেলখণ্ড, বসোহলী, কাঙ্গড়া প্রভৃতি স্থানের "অর্ব্বাচীন-হিন্দি" চিত্র-রীতিতে, ও উড়িয়্যা ও বাঙ্গালা দেশ, নেপাল ও অন্ধ্রদেশের চিত্ররীতিতে, গীতগোবিন্দের অনুসারী রাধাকৃষ্ণ-লীলার ছবি পাওয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য ও পরবর্ত্তী যুগের অপভ্রংশ ও ভাষা কাব্য এই উভয়ের ধারা মিলিত হইয়াছে। এই কাব্যের ১২টি সর্গে ২৪টি পদ বা গান গ্রথিত হইয়াছে। কাব্যের আখ্যায়িকা, অর্থাৎ কাব্যের বর্ণনামূলক অংশ, প্রাচীন

ধারায় সংস্কৃত কবিতায় লেখা; ভাবে ভাষায়, শব্দাবলীতে এই অংশগুলি অতীতের রীতি বজায় রাখিয়াছে। কিন্তু পদ বা গানগুলিতে যে বাতাবরণ পাই, তাহা হইতেছে অপভ্রংশ ও ভাষা সাহিত্যের। পদগুলির ছন্দ, সংস্কৃতের অক্ষর-বৃত্ত ছন্দ নহে—অপভ্রংশ ও ভাষায় মাত্রা-বৃত্ত ছন্দ; এবং অপভ্রংশ ও ভাষা কবিতার মত, ছত্রের অন্ত্য ও আভ্যন্তর অক্ষরের মিল ইহার প্রাণ। একাধিক পণ্ডিত এরূপ মত প্রকাশ করিযাছেন যে গীতগোবিন্দের পদগুলি মূলত সংস্কৃতে রচিত হয় নাই, এগুলি রচিত হইয়াছিল হয় অপভ্রংশে না হয় প্রাচীন ভাষায়, অর্থাৎ প্রাচীন বাঙ্গালার (Lassen লাসেন ও বিজয়চন্দ্র মজুমদারের এই মত)। ইহা অসম্ভব নয় যে জয়দেব এই গানগুলি প্রথম অপভ্রংশ বা প্রাচীন বাঙ্গালায় রচনা করেন, পরে এগুলি বিশেষ লোকপ্রিয় হয়, ইহাতে জয়দেব স্বয়ং এগুলিকে সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত করিযা দেন, এবং এইভাবে এগুলিকে নিখিল ভারতের আস্বাদনের উপযোগী করিয়া ও চিরন্তন করিয়া দেন। অবশ্য ইহা স্বীকার্য যে, এইরূপ মতবাদ কেবল অনুমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত মাত্র, ইহা প্রমাণিত সত্য নহে। অনুমানের স্বপক্ষে এই চারিটি বস্তু বিচার্য ঃ—

(১) পদগুলির ধরণ—এগুলির রচনাশৈলী অপভ্রংশ ও ভাষাপদের অনুরূপ, সংস্কৃত কবিতার অনুরূপ নহে। এই অপভ্রংশানুকারিতা সর্ব্বজন-স্বীকৃত।

(২) জয়দেবের গীতগোবিন্দের পদেব অনুরূপ সমসাময়িক বহু অপভ্রংশ ও প্রাচীন ভাষা গীত বা পদের অস্তিত্ব (যেমন 'প্রাকৃত-পৈঙ্গল' ও 'মানসোল্লাস' অথবা 'অভিলষিতার্থ-চিন্তামণি' প্রভৃতি গ্রন্থে)।

(৩) গীতগোবিন্দের কতকগুলি পদের দুই চারিটি করিয়া ছত্র যদি সংস্কৃত হইতে অপভ্রংশে রূপান্তবিত করিয়া পাঠ করা যায়, তাহা হইলে সেগুলির ছন্দের গতি আরও সাবলীল হয়। অপভ্রংশ বা পুরাতন বাঙ্গালা রূপে ভাঙ্গিযা লইয়া এগুলিকে পাঠ করিলে, প্রাচীন বাঙ্গালার সহিত ছন্দ বিষয়ে চমৎকার মিল দেখা যায়। (যেমন ৫ সংখ্যক পদে "স্মরতি মনো মম কৃত-পরিহাসম" এই ছত্রটিকে অপভ্রংশ করিয়া "সুমরই। মন মর্ব কিঅ-পরিহাসং রূপে পডিলেই নিখুঁত পয়াযের মত অক্ষরের সমাবেশ যুক্ত ছত্র পাওয়া যায়, যথা ঃ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ । ⌣ ⌣ ⌣ ⌣॥ ⌣ ⌣ ⌣ ⌣ । — —॥

"শ্রীজয়দেবকবেরিদং। কুরুতে মুদং মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি"— ২-এর পদের এই ছত্রে প্রথম ও দ্বিতীয অংশে একটি করিয়া মাত্রা বেশী আছে, যদি "ইদং" ও "মুদং"-কে অপভ্রংশ-মতে "ইদঁ" ও "মুদঁ" পড়া যায়, তাহা হইলে ছন্দো-দোষ সংশোধিত হইয়া যায়। এই সমস্ত ছন্দের বাঙ্গালা-আসামী-উড়িয়া ও ভোজপুরী-মগহী-মৈথিল প্রতিরূপ আছে, কিন্তু এগুলির প্রতিরূপ বা অনুরূপ ছন্দ প্রাচীন সংস্কৃতে নাই।

[৪] শেষ বিচার্য, 'গীতগোবিন্দ' বইখানি কাব্য হইলেও, ইহার মধ্যে নাটকীয় অংশ বিদ্যমান। পদগুলি রাধার সখিদের অথবা স্বয়ং রাধা ও কৃষ্ণের গীত, যেন এগুলি নাটকে তাঁহাদেরই উক্তি-প্রত্যুক্তি। আমাদের বাঙ্গালা যাত্রা-গানের উদ্ভবে 'গীতগোবিন্দ' জাতীয় রচনার একটা বড় স্থান ছিল ইহাতে সন্দেহ নাই; এই যাত্রা-গানেরই পূর্ব্ব রূপ হইতেছে

মধ্য-বাঙ্গালার পালা-গান; ইহাতে একাধারে বর্ণনাত্মক অংশ ও পাত্র-পাত্রীর কথোপকথন থাকে (পালা-গানে মূল গায়েন ও তাঁহার দোহারেরা নাটকীয় আলাপ অংশ চালাইতেন। অপর পক্ষে, 'গীতগোবিন্দ' মিথিলাতে প্রচলিত এক ধরনের নাটকের ধারার সঙ্গেও বিজড়িত বলিয়া মনে হয়—এইরূপ নাটকে সংস্কৃত বা প্রাকৃত গদ্যে পাত্র-পাত্রীদের উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে সংস্কৃত নাটকে যেখানে বিভিন্ন ছন্দে সংস্কৃত শ্লোক ব্যবহৃত হয় সেখানে দেশভাষা মৈথিলে পদ বা গান থাকে। এইরূপ কতকগুলি নাটকের উল্লেখ স্যর্ জ্যর্জ আব্রাহাম গ্রিয়সন্ সাহেব করিয়াছেন, এবং 'পারিজাত-হরণ' নামে উমাপতি উপাধ্যায় কর্তৃক ১৪শ শতকে রচিত একখানি নাটক তিনি ১৯১৭ সালে প্রকাশিত-ও করিয়াছেন। এইরূপ নাটক-রচনার ধারা মিথিলা (এবং বঙ্গদেশ) হইতে নেপালে প্রসারিত হয়, এবং সতেরর শতক হইতে আরম্ভ করিয়া কতকগুলি এইরূপ নাটক নেপালে পাওয়া গিয়াছে—এইসব নাটকে গদ্য অংশ ভাঙ্গাভাঙ্গা বাঙ্গালা বা মৈথিলে (সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে), এবং পদ্যশ্লোকের স্থানে মৈথিলী বা কোসলী (অথবা পূবী-হিন্দি)-তে পদ বা গান আছে, নাটকের পাত্র-পাত্রীদের কার্য-কলাপ (প্রবেশ, নির্গমন, উপবেসন ইত্যাদি) পূর্ব্ব-নেপালের প্রাচীন ভাষা, ভোট-ব্রহ্ম শাখার অনার্য মোঙ্গোলীয় ভাষা নেওয়ারীতে লিপি-বদ্ধ আছে। এই সব নাটক দেখিয়া অনুমান হয়, হয় তো 'গীতগোবিন্দ' ভাষায় বা অপভ্রংশে (সংস্কৃতের লঘু ভাষাতে) নিবদ্ধ কথোপকথনাত্মক পদ বা গান এবং সংস্কৃতে নিবদ্ধ বর্ণনাত্মক অংশ লইয়া গঠিত গীতিনাট্যের একটি ধারার অন্তর্গত ছিল যে ধারা পূর্ব্ব-ভারতে বিশেষ করিয়া প্রচলিত ছিল। অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে বর্ণনাত্মক অংশ আছে, আবাব কথোপকথন-ও আছে, যাহাতে দুই বা তিন পাত্র-পাত্রীর উক্তি-প্রত্যুক্তি বা কথা-কাটাকাটি পাওয়া যায়। গীতগোবিন্দে এইরূপ ভাষা বা অপভ্রংশ পদকে সংস্কৃত ভাষায় আনিয়া ইহার আকৃতি একটু বদলাইয়া দেওয়া হয় মাত্র, কিন্তু এই পরিবর্ত্তিত আকারে ইহার প্রসার ও প্রভাব আরো ব্যাপক হইয়া পড়ে। রামানন্দ রায় কর্তৃক এই সংস্কৃতময় গীতগোবিন্দের অনুকরণে ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে 'জগন্নাথ-বল্লভ' নামে "সঙ্গীত-নাটক" রচিত হইয়াছিল। ভাষা (বা অপভ্রংশে) পদময় সঙ্গীত নাটক বা কাব্য-নাট্যের ধারা বিচার করিলে, 'গীতগোবিন্দ'কে ঐ পর্যায়ে ফেলা যাইতে পারে।

জয়দেব-রচিত বীররসাত্মক অন্য সংস্কৃত কাব্য সম্বন্ধে অনুমানের অনুকূলে প্রমাণ যে আছে, 'সদুক্তি-কর্ণামৃত'-ধৃত শ্লোকাবলী হইতে তাহা দেখা যায়। সেরূপ কোনও কাব্য থাকিলে তাহা এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। জয়দেব ক্রমে-ক্রমে বৈষ্ণব সাধক ও ভক্তগণের পর্যায়ে নীত হইলেন, তাঁহার গীতগোবিন্দের কল্যাণে। 'গীতগোবিন্দ'-কার ভক্ত জয়দেব ভাষাতেও পদ রচনা করিয়াছিলেন, এই ধারণা উত্তর-ভারতের সন্ত বা ভক্ত-মণ্ডলীর মধ্যে পাওয়া যায়।

পাঞ্জাবে জয়দেব উত্তর-ভারতের প্রধান ভক্ত ও সাধুদের মধ্যে পরিগণিত হন। শিখ সম্প্রদায়ের পঞ্চম গুরু শ্রীগুরু অর্জুনদেব মধ্য-যুগের উত্তর-ভারতের ভক্তগণের পদ-সংগ্রহের ঋগ্বেদ-স্বরূপ 'শ্রীগুরু-গ্রন্থ' বা 'শ্রী আদি-গ্রন্থ' অথবা 'শ্রীগ্রন্থ সাহেব' খৃস্টীয়

ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে যখন সঙ্কলিত করেন, তখন তিনি সাধকদের পদ (তাঁহার পূর্ব্বগামী চারিজন শিখ গুরু ও তাঁহার নিজ রচিত ভিন্ন) যাহা হাতের কাছে পান তাহা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন। কবীরের বহু পদ এই ভাবে গুরু-গ্রন্থে গৃহীত হয়; রবিদাস, বাবা ফরীদ, রামানন্দ, মহারাষ্ট্রের ভক্ত নামদেব এবং বাঙ্গালার জয়দেব, অন্য কয়জন ভক্তের পদের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদেরও পদ গুরু-গ্রন্থে স্থান পায়। জয়দেবের রচিত বলিয়া দুইটি পদ গুরু-গ্রন্থে আছে। এই দুইটির ভণিতায় জয়দেবের নাম আছে। পদ দুইটি যে 'গীতগোবিন্দ' কার জয়দেবের রচিত তৎসম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ নাই; তবে সেগুলি যে জয়দেবের নহে, সে পক্ষেও প্রমাণ নাই। শিখ গুরু-পরম্পরা অনুসারে গুরু-গ্রন্থের যে ব্যাখ্যা চলিয়া আসিয়াছে, তাহাতে এই দুই পদের রচযিতা রূপে 'ভক্তমাল'-গ্রন্থ-বর্ণিত গীতগোবিন্দ-কার ভক্ত কবি জয়দেবকেই স্বীকাব করা হয়। গ্রন্থ-সাহেবের জয়দেব ও গীতগোবিন্দের জযদেব এক হইলে,—এবং এক বলিয়া মানিয়া লইতে কোনও অন্তবায় নাই—তাঁহাকে ভাষা-সাহিত্যের একজন আদি কবি বলিয়া স্বীকার করিতে হয় (গীতগোবিন্দের পদকয়টিব মূল ভাষার প্রশ্ন না ধরিলেও)।

গুরুগ্রন্থ-ধৃত পদ দুইটি "রাগ গুজরী" ও "রাগ মান্দ"-ব অন্তগত। M. A Macauliffe রচিত শিখ-ধর্ম্ম-বিষয়ক সুবৃহৎ ও সুবিখ্যাত ইংরেজি গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডের ১৫-১৭ পৃষ্ঠায এই দুইটি পদের ইংরেজি অনুবাদ দেওযা হইয়াছে। নিম্নে এই পদ দুইটির বিচার করা যাইতেছে।

(১) শ্রীজৈদেব-জীউ-কা পদা (বাগ গুজরী)॥
পবমাদি পুরুখ মনোপিমং সতি আদি ভাব-রতং।
পরমন্তুতং পরক্রিতিপরং জদি চিন্তি সবব-গতং॥ ১ ॥
রহাউ—
কেবল রাম-নাম মনোরমং বদি অম্রিত-তত-মঈঅং।
ন দনোতি জসমরণেন জনম-জরাধি-মরণ ভইঅং॥
ইছসি জমাদি-পরাভয়ং জসু স্বসতি সুক্রিতি-ক্রিতং।
ভব-ভূত-ভাব সমব্যিঅং পবমং পরসন্নমিদং॥ ২ ॥
লোভাদি-দ্রিসটি পবগ্রিহং জদি বিধি আচরণং।
তজি সকল দুহক্রিত দুরমতী ভজু চক্রধর-সরণং॥ ৩ ॥
হরি-ভগত নিজ নিহকেবলা বিদ কবমণা বচসা।
জাগেন কিং জগেন কিং দানেন কিং তপসা॥ ৪ ॥
গোবিন্দ গোবিন্দেতি জপি নর সকল সিধি-পদং।
জৈদেব আইউ তস সকুটং ভব-ভূত-সরব-গতং॥ ৫ ॥

এই পদটি E. Trumpp কর্তৃক ১৮৭৯ খৃস্টাব্দে Munich মুনিক নগরেব বাভারীয় রাজকীয় বিজ্ঞান-পরিষদের দর্শন-সাহিত্যেতিহাস শাখার কার্যবিবরণীতে জরমান ভাষায় অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। ইহার ভাষা বিকৃত সংস্কৃত, কেবল মাঝে মাঝে (বিশেষত

শেষ শ্লোকে) ভাষা বা অপভ্রংশের শব্দ দুই চারিটি আছে। পদটি মূলে অপভ্রংশ বা প্রাচীন বাঙ্গালায় লিখিত হইয়া থাকিতে পারে, পরে ইহার সংস্কৃতীকরণের চেষ্টা হয়; এই সংস্কৃত রূপান্তরে যে বাঙ্গালাদেশের (অথবা পূর্ব্ব-ভারতের) উচ্চারণ অনুসৃত হইয়াছিল, তাহা অনুমিত হয়। অসম্পূর্ণ গুরুমুখী বর্ণমালার নীত হওয়ার কালে আরও বিকৃতি ঘটে। এই পদের সংস্কৃত ছায়া এইরূপ হইবে—

পরমাদিপুরুষম্ অনুপমং সদ্-আদি-ভাবরতম্।
পরমাদ্ভুতম্ প্রকৃতিপরং যদ্ (=যম্) অচিন্ত্যং সর্ব্বগতম্॥ ১॥
রহাউ(=ধ্রুয়া)—
কেবলং রামনাম মনোরমং বদ অমৃত-তত্ত্বময়াম্।
ন দুনোতি যৎস্মরণেন জন্ম-জরাধিমরণভয়ম্॥
ইচ্ছসি যমাদিপরাভবং, যশঃ, স্বস্তি, সুকৃত কৃতং
(=সুকৃতং কুরু?)।
ভবভূত ভাব-সমব্যয়ম্ পরমম্ প্রসন্নম ইদম্ (অথবা
মিদ, মিদু=মৃদু? Trumpp-এর ব্যাখ্যা)।
লোভাদি-দৃষ্টি-পরগৃহং যদ্ অবিধি-আচরণম্।
ত্যজ সকল-দুষ্কৃ-তং দুর্ম্মতিম্, ভজ চক্রধর-শরণম্॥
হরিভক্তিঃ নিজা নিষ্কেবলা—হৃদা কর্ম্মণা বচসা।
যোগেন কিং, যজ্ঞেন কিং, দানেন কিং, [কিং] তপসা॥
গোবিন্দ গোবিন্দেতি জপ, নর, সকল-সিদ্ধি-পদম্।
জয়দেবঃ আয়াত তস্য স্ফুটম্—ভব-ভূত-সর্ব্ব-গতম্॥

পদটির সাধারণ অর্থ গ্রহণে কোনও কঠিনতা নাই, যদিও ভাব ও ভাষা উভয়ের একটা অসামঞ্জস্য স্থলে-স্থলে বিদ্যমান। এই ভাব-সমূহের অসামঞ্জস্য এবং ভাষার আড়ষ্ঠতা দেখিয়া এই পদের মূল রূপকে অপভ্রংশ বা প্রাচীন বাঙ্গালায় রচিত বলিয়া ধরিতে ইচ্ছা হয়। ভাষা এখানে ভাবের সম্পূর্ণ অনুগামী নয়।

(২) বাণী জৈদেবজীউ-কী (রাগ মারূ)॥

চন্দ সত ভেদিয়া নাদ সত পুরিয়া সূর সত খোডসা দত্তু কীরা।
অচল বল তোড়িয়া অচল চল থপ্পিয়া অঘড ঘড়িয়া, তহা আপিউ পীরা॥ ১॥
মন আদি গুণ আদি যখাণিয়া।
তেরী দুবিধা দ্রিস্‌টি সম্মানিয়া॥ রহাউ॥
অর্ধ-কৌ অরধিয়া সর্ধি-কৌ সরধিয়া, সলল-কৌ সললি সম্মানি আয়া।
বদতি জৈদেব জৈদেব-কৌ রম্মিয়া, ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লিব লীণ পারা॥ ২॥

এই পদটির ভাষা, ঠিক অপভ্রংশ নহে, ইহাকে মিশ্র-অপভ্রংশ মিশ্র-ভাষা বলা যাইতে পারে; হয় তো ইহা মূলে প্রাচীন বাঙ্গালা ছিল। এখানেও সংস্কৃত (অর্ধ-তৎসম) শব্দগুলির বানান, প্রাচ্য-ভারতের সংস্কৃত উচ্চারণের অনুসারী। E. Trumpp এই পদটির অনুবাদ

করেন নাই—তাঁহার অসম্পূর্ণ গ্রন্থ-সাহেবের অনুবাদেও ইহা নাই। Macauliffe-এর অনুবাদ ও ভাই বিসন সিংহ গ্যানী রচিত পাঞ্জাবী ভাষা টীকা "ভগত-বাণী" অনুসরণ করিয়া এই পদের বঙ্গানুবাদ দিতেছি—

চন্দ্রকে (অর্থাৎ ঈড়া বা বাম নাসারন্ধ্রকে) সত্ত্ব (অর্থাৎ প্রাণবায়ু) দ্বারা ভেদ করিয়াছি (অর্থাৎ আমি প্রাণায়ামের পূরক করিয়াছি), সত্ত্ব (অর্থাৎ প্রাণবায়ু) দ্বারা নাদ (অর্থাৎ সুষুম্না, অর্থাৎ নাসিকার ভিতর দুই নাসারন্ধ্রের উপবিভাগের মধ্যস্থ স্থান) পুরিয়াছি (অর্থাৎ কুম্ভক-যোগ করিয়াছি); সত্ত্ব বা প্রাণবায়ুকে সূর (অর্থাৎ সূর্য, বা পিঙ্গলা নামে দক্ষিণ নাসারন্ধ্র) দ্বারা আমি বাহির করিয়া দিয়াছি ("দত্তু কীয়া"=দত্ত করিয়াছি) (অর্থাৎ আমি রেচক দ্বারা নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রাণায়াম পূর্ণ করিয়াছি)—ষোল বার ("খোড়সা", অর্থাৎ প্রত্যেক পূরক, কুম্ভক ও রেচক কালে ষোড়শ বার প্রণব বা ওঁ-কার উচ্চারণ কবিয়া এইভাবে প্রাণায়াম করিয়াছি)।

অবল বা বলহীন (যে এই ভঙ্গুর দেহপিণ্ড), ইহার বল ভগ্ন করা হইয়াছে ("তোড়িয়া"=তোড়া হইয়াছে); চল অর্থাৎ চঞ্চল (যে মন, তাহাকে) অচলে (অর্থাৎ অব্যয় ব্রহ্মে) স্থাপিত করা হইয়াছে; অঘটিত (মন)-কে ঘটিত বা সুগঠিত করা হইয়াছে; তদনন্তর অমৃত (আপিউ=অপ্পিউ=অব্বিউ=অম্বিঅ=অম্বিত=অম্রিত =অমৃত) পীত হইয়াছে॥ ১॥

(যে ব্রহ্ম) মনেরও আদিতে এবং (সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই তিন) গুণেরও আদিতে, তাহার ব্যাখ্যান কবিয়াছি। তোমার দ্বিবিধা দৃষ্টি (অর্থাৎ ব্রহ্ম ও জীবে ভেদ দর্শন) অবলুপ্ত হইয়াছে (সম্মানিয়া = সামাইয়া গিয়াছে, প্রবেশ করিয়াছে, বিলুপ্ত হইযা গিয়াছে)॥ ধুয়া॥

আরাধ্যকে আরাধিত করা হইয়াছে; শ্রদ্ধী (বা শ্রদ্ধার পাত্র)-কে শ্রদ্ধা করা হইয়াছে; সলিলকে সলিলে প্রবেশ করানো হইয়াছে (সামানো হইয়াছে)। জয়দেব বলে—জয়যুক্ত দেবে (অর্থাৎ পরমেশ্বরে) রমণ করা হইয়াছে; ব্রহ্মনির্ব্বাণ লইয়া ("লিব"), আমি লীন পাইয়াছি (= লীন হইয়া গিয়াছি)॥ ২॥

জয়দেবের এই "বাণী" বা ভাষা-পদটি হইতেছে যোগমার্গের পদ—খৃস্টীয় ১০০০-এর ওদিকে এবং এদিকে সহস্র বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া, এই যোগ-সাধনের কথায় ভারতীয় সাহিত্য, বিশেষ করিয়া আধ্যাত্মিক কথার সাহিত্য, ভরপুর। ধর্ম্ম-সাধনার, পথে, ভক্তি-মার্গ ও যোগ-মার্গ এই দুই পথ অপক্ষপাতের সহিত প্রায় সমস্ত সম্প্রদায়েবই উপজীব্য হইযা উঠিয়াছিল, খৃস্টীয় ১০০০-এর পূর্ব্ব হইতেই। যোগ-সাধনের কথা—ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্না, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মলীন হওয়ার কথা, সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মাবলম্বী ধর্ম্মমতের কথা। যোগ-মার্গের কথা ওদিকে যেমন মহাযান বৌদ্ধমতের সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাহিত্যের মধ্যে পরিব্যাপ্ত (প্রাচীন বাঙ্গালা 'চর্যাপদ' হইতে ইহা দেখা যায়), তেমনি এদিকে নাথ-পন্থ প্রভৃতি শৈব সম্প্রদায়ে, কবীর প্রমুখ সন্ত বা নবীন মতের সাধুদের সম্প্রদায়ে, শিখ সম্প্রদায়ে এবং বৈষ্ণবাদি ভক্তিবাদী অন্য সম্প্রদায়েও অল্পবিস্তব প্রবল-ভাবে বিদ্যমান। জয়দেব-পরবর্ত্তী কালের রামাওতী, গৌড়ীয়, বল্লভাচারী প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক ধরণের বৈষ্ণব ছিলেন না—তিনি সম্ভবত পঞ্চোপাসক স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণই ছিলেন।

তাঁহার রচিত পদে পূরক-কুম্ভক-রেচক সাধন ও ব্রহ্ম-নির্ম্মাণ লাভ করার কথা থাকা কিছু বিচিত্র নহে।

উত্তর-ভারতের ভাষা-সাহিত্যের উপরে জয়দেব সাধারণ ভাবে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন সে কথা ছাড়িয়া দিলেও, বিশেষ ভাবে তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের স্রষ্টা এবং প্রাণ-দাতা বলিতে পারা যায়। জয়দেব বাঙ্গালার আদি কবি চর্যাপদের রচক বৌদ্ধ কবিদের সমসাময়িক ছিলেন। গীতগোবিন্দের গানগুলিকে উক্ত গ্রন্থ মধ্যে "গীত" বলা হইয়াছে অন্যত্র এগুলি "পদ" নামে প্রচলিত। শিখদের আদি-গ্রন্থেও জয়দেবের একটি গানকে "পদা" অর্থাৎ "পদ" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; জয়দেব নিজেও এগুলিকে "পদ" আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন—'মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলীং শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীম্," 'গীতগোবিন্দ', ১।৩। উপস্থিত সংস্কৃত-ভাষা-গ্রথিত রূপে এই গীত বা পদগুলি মিলিলেও, বৌদ্ধ চর্যাপদের মত গীতগোবিন্দের এই পদগুলিকেও বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের আদিতে স্থান দিতে হয়। জয়দেবোত্তর মধ্য-যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে দুইটি মুখ্য ধারা দেখিতে পাওয়া যায়; একটি, কথাত্মক কাব্যের ধারা, ইহাতে কোনও দেবতা বা অবতার অথবা ঐতিহাসিক বা অন্যবিধ মহাপুরুষের কাহিনি বা জীবনী বিবৃত থাকে; এই প্রকার কথাত্মক কাব্যকে "মঙ্গল-কাব্য" বা "মঙ্গল" বলা হইত। মঙ্গল-কাব্যে নিখিল ভারতীয় পৌরাণিক দেবতা বা অবতারকে লইয়া কথা রচিত হইত— যেমন শিব, চণ্ডী, শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র; অথবা কেবল গৌড়-বঙ্গে প্রসিদ্ধ দেবতা বা পাত্র-পাত্রীদের চরিত্র অবলম্বন করিয়া বচিত হইত— যেমন ধর্ম্মদেব ও লাউসেন, মনসা ও চাঁদ সদাগর এবং লখিন্দর-বেহুলা, ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগর, কালকেতু ব্যাধ ও ফুল্লরা; অথবা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ও ক্বচিৎ অন্য সম্প্রদায়ের পূত-চরিত্র সাধক বা ভক্তের জীবনী লইয়া রচিত হইত। দ্বিতীয় ধারাটি গীতাত্মক; এই ধারায় পাওয়া যায় কেবল ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় অথবা ধর্ম্মাশ্রয়ী বা লীলাশ্রয়ী শৃঙ্গার রসের, কিংবা পার্থিব প্রেমের গান; এই গানের ধারাকে "পদ" বলা হইত। বৌদ্ধ চর্যাপদ, বৈষ্ণব মহাজন-পদ, সহজিয়া পদ, দেহতত্ত্বের গান, রামপ্রসাদ-প্রমুখ শাক্ত সাধকদের পদ, শ্যামাসঙ্গীত, বাউলের গান, মুসলমান মারফতী গান প্রভৃতি বাঙ্গালা সাহিত্যের গীতির বিভিন্ন ধারা, এই পদ-সাহিত্যেরই অন্তর্গত। জয়দেবের গীতগোবিন্দ-স্থ পদাবলী মধ্য-যুগের বাঙ্গালা পদ-সাহিত্যের সূত্রপাত স্বরূপ—চর্যাপদের চেয়েও জয়দেবের পদ বাঙ্গালা পদ-সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পৃক্ত। বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি বৈষ্ণব পদ হইতে আরম্ভ করিয়া নিধুবাবু প্রভৃতি প্রাচীন ধারার কবিদের প্রেমের গান,—জয়দেবের পদেই এই গীতগঙ্গার গঙ্গোত্তরী মিলিতেছে। অপর, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কথা-কাব্যও বটে; সেই হিসাবে ইহা একটি "মঙ্গল-কাব্য"; একাধাবে "পদ" ও "মঙ্গল", উভয় ধারা গীতগোবিন্দে বিদ্যমান। সংস্কৃত-শ্লোক-নিবদ্ধ হইলেও ইহার স্থান একদিকে বাঙ্গালা মঙ্গল-কাব্যের পর্যায়ে; তেমনি ইহার গানগুলি হইতেছে "পদাবলী" বা পদ-সংগ্রহ। জয়দেব স্বয়ং ইহাকে "মঙ্গল" অর্থাৎ "মঙ্গল-কাব্য" বলিয়া বর্ণনাও করিয়াছেন—"শ্রীজয়দেব কবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলম উজ্জল-গীতি", অর্থাৎ "শ্রীজয়দেব কবির রচিত উজ্জ্বল রসের অর্থাৎ প্রেমের

গীতিময় এই মঙ্গল-কাব্য আনন্দ দান করে।" সুতরাং স্বদেশে এবং স্বদেশ-ভাষায় সাহিত্যের দুইটি মুখ্য ধারার অগ্রণী বলিয়া জয়দেব কবির প্রতিষ্ঠার কারণ সহজেই প্রণিধান করা যাইতে পারে। যদিও গীতগোবিন্দের পদাবলীর সম্ভাব্য অপভ্রংশ বা প্রাচীন বাঙ্গালা রূপ মিলিতেছে না, এবং যদিও আদি-গ্রন্থ-ধৃত দুইটি মিশ্র ভাষা সংস্কৃত ও ভাষাময় পদের সহিত আমাদের জয়দেবের সংযোগ নিঃসন্দিগ্ধ রূপে প্রমাণিত হয় নাই, তথাপি তাঁহাকে আমরা নবীনের আবাহন-কর্ত্তা, মধ্য-যুগের বাঙ্গালা মঙ্গল ও পদেব অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবে. বাঙ্গালার আদি কবি বলিয়া মর্যাদার আসন দিতে পারি; যেমন তিনি ছিলেন প্রাচীন ধারার, মুসলমান-পূর্ব্ব যুগের সংস্কৃতের অন্তিম মহাকবি। সংস্কৃত ও ভাষা, উভয় প্রকার সাহিত্যে জয়দেবের বিরাট প্রভাবের কথা মনে করিয়া, এবং মধ্য-যুগের বৈষ্ণব সাহিত্যে তিনি যে একজন মহাজন অর্থাৎ ভক্ত কবি বলিয়া বিরাজমান সে কথাও স্মরণ করিয়া, নাভাজিদাস ষোড়শ শতকে তাঁহার 'ভক্তমাল'-গ্রন্থে ব্রজভাষা-নিবদ্ধ পদে জযদেবের যে প্রশস্তি গাহিয়া গিয়াছেন, তাহা সুন্দর ও সার্থক—

জযদেব কবি নৃপচক্কবৈ, খণ্ড-মণ্ডলেশ্বর আনি কবি॥
প্রচুর ভয়ো তিহুঁ লোক গীত-গোবিন্দ উজাগব।
কোক-কাব্য-নবরস-সবস-শৃঙ্গার-কৌ আগর॥
অষ্টপদী অভ্যাস করৈ, তিহি বুদ্ধি বঢ়াবৈ।
রাধা-রমন প্রসন্ন সুনত হাঁ নিশ্চৈ আবৈ॥
সন্ত-সরোরুহ-খণ্ড-কৌ পদুমাবতি-সুখ-জনক রবি।
জযদেবকবি নৃপ-চক্কবৈ, খণ্ড-মণ্ডলেশ্বর আনি কবি॥

কবি জয়দেব হইতেছেন চক্রবর্ত্তী রাজা, অন্য কবিগণ খণ্ড-মণ্ডলেশ্বর (=ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ডের প্রভু) মাত্র। তিন লোকে 'গীতগোবিন্দ' প্রচুর ভাবে উজ্জ্বল (উজ্জাগর) হইযাছে। (ইহা) কোকশাস্ত্র (কামশাস্ত্র), কাব্য, নবরস ও সরস শৃঙ্গারের আগার-স্বরূপ। যে (গীতগোবিন্দের) অষ্টপদী (=গীত) অভ্যাস কবে, তাহাব বুদ্ধি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। শ্রীরাধারমণ প্রসন্ন হইয়া শুনেন, তিনি নিশ্চয় সেখানে আগমন কবেন। সন্ত (ভক্ত) রূপ কমল-দলের পক্ষে (তিনি) পদ্মাবতী-সুখ-জনক রবি। কবি জয়দেব চক্রবর্ত্তী রাজা, অন্য কবিগণ খণ্ড-মণ্ডলেশ্বর মাত্র।।

১ আষাঢ়, বিক্রম-সংবৎ ২০০০, বঙ্গাব্দ ১৩৫০॥

*শ্রাবণ, ১৩৫০*

# বাংলার বিপ্লববাদের জন্মদাতা স্বামী নিরালম্ব

## জীবনতারা হালদার

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে বাংলায় যে বিপ্লববাদের সূচনা হইয়াছিল, পরবর্ত্তীকালে তাহাই সমগ্র ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ সুগম করিয়াছিল। সুখের বিষয় এই সত্য আজ উদ্ভাসিত হইয়াছে এবং বাংলার এই অসামান্য অবদান সকলেই উপলব্ধি করিয়াছেন। বৈদেশিক শাসনের বিশ্লেষণে এই বিপ্লব প্রচেষ্টা লোকচক্ষুর অন্তরালে অত্যন্ত গুপ্তভাবে পরিচালিত হইত। এইজন্য ইহার নির্ভরযোগ্য ধারাবাহিক বিববণ পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু বাংলার বিপ্লবের সম্পূর্ণ ইতিহাস প্রকাশিত হইলে বহু আশ্চর্য্য ও বিস্ময়কর তথ্য উদঘাটিত হইবে।

সেই যুগে যাঁহারা জাতির নবচেতনা উদ্বুদ্ধ করিতে সহাযতা করিয়াছিলেন, তাঁহাদেব মধ্যে বরণীয় রাজা রামমোহন রায়, স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র পণ্ডিত যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলের সুপরিচিত।

কিন্তু ভারতবর্ষকে বিদেশী শাসন হইতে মুক্ত কবিতে বীতিমত অস্ত্রশস্ত্র লইযা যুদ্ধ করিতে হইবে, এই পরিকল্পনা যাঁহার মনে প্রথম উদয় হইয়াছিল তাঁহার নাম প্রায অজ্ঞাত রহিযা গিয়াছে। গার্হস্থ্য জীবনে তাঁহার নাম ছিল শ্রীযতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায। পরবর্ত্তীকালের প্রসিদ্ধ বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নামের সহিত তাঁহার নামের সাদৃশ্য থাকায় তাঁহাব প্রকৃত পরিচয় অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে। বিশেযতঃ বাঘা যতীন শৌর্য্য, বীর্য্যে জনসাধাবণের মধ্যে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। পরন্তু যতীন্দ্রনাথ সংসাব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন এবং স্বামী নিরালম্ব নাম পরিগ্রহ করিয়া নির্জনে সাধনা ও সিদ্ধিলাভ করেন।

প্রকৃতপক্ষে শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই বাংলাব বিপ্লববাদের জন্মদাতা—"ব্রহ্মা প্রপিতামহ"। সুখের বিষয় অধুনা তাঁহার পরিচয জনসাধারণের সম্মুখে প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহার সহকর্ম্মী ও সহযোগীরা প্রকাশ্যে তাঁহার যথোপযুক্ত সম্মান দিতে সক্ষম হইয়াছেন।

বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী খানা জংসন (ই, আই, আর) ষ্টেশন হইতে প্রায় তিন মাইল উত্তর দিকে চান্না গ্রামে ১৮৭৭ খৃঃ ১৯শে নভেম্বর তারিখে যতীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ কবেন। গ্রামের পার্শ্বে একটি ছোট পার্ব্বত্য নদী প্রবাহিত—নাম "খড়ে"। স্বাস্থ্যকর স্থান, অপরূপ পল্লীদৃশ্য। বাল্যকাল হইতেই তিনি অসীম সাহস ও তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছেন। ছয়ফুট লম্বা দেহ, সুগঠিত শবীব, প্রশস্ত বক্ষস্থল, সুবিশাল বাহু সম্বলিত তাঁহাকে প্রায় পাঞ্জাবীদের মত দেখাইত।

মাতৃভূমিকে শৃঙ্খলমুক্ত করিতে হইলে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হইতে হইবে—এই উদ্দেশ্য কোথায় সিদ্ধ হইবে, যৌবনকালে যতীন্দ্রনাথ তাহাই অনুসন্ধান করিতে থাকেন। তখন বাঙ্গালীকে সকলেই ভয় করিত, কোন প্রদেশে সৈন্যদলে ভর্ত্তি করা হইত না। (অবশ্য বাঙ্গালী ভারতের সর্ব্বত্র গৌরবের সহিত চাকুরী করিয়াছে) অনুমান ১৮৯৭ খৃঃ তিনি দেশীয় রাজ্য বরোদায় গমন করেন এবং নিজের নাম বিকৃত করিয়া "যতীন উপাধ্যায়" নামে তথাকার অশ্বারোহী বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। দৈবযোগে সেই সময় শ্রদ্ধেয় শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ মহাশয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইয়া বারোদা রাজ্যে শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হ'ন। এই সুযোগে যতীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দের সহিত মন্ত্রণা করেন যে বিদেশে পড়িয়া থাকা বৃথা, শক্তি ও সামর্থ্যের অপচয—বাংলায় ফিরিয়া বিপ্লবের আয়োজন করিতে হইবে। স্বাধীনতা লাভের ইহাই প্রকৃষ্ট উপায় স্থিব কবিয়া তাঁহারা অনুমান ১৯০৩ সালে বাংলায় ফিরিয়া আসেন। তাঁহারা কলিকাতায় আসিয়া শ্যামপুকুরে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বাড়ী মিলিত হইলেন—একটি গুপ্ত সমিতি স্থাপন করিলেন এবং মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপযুক্ত কর্ম্মী সংগ্রহ ও অন্যান্য ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। পরে ১৯০৫-৬ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ জন্য সে "স্বদেশী আন্দোলন" হইযাছিল, তাহাতে তাঁহাদেব কার্য্যের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল।

ইহারই ফলে মাণিকতলা মুবারীপুকুবে সুবিদিত বোমার কাবখানার উদ্ভব ও বৈপ্লবিক কর্ম্মের প্রসার। এই বোমার কাবখানায় শ্রীবারীন্দ্রনাথ ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত প্রমুখ অনেক বিপ্লবী সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তখন বাংলার বিপ্লবীদেব কার্য্যকলাপে বিদেশী গভর্ণমেণ্ট সন্ত্রস্ত হইলেন ও শাসনকার্য্য প্রায় অচল হইল। বাংলার সহিত বিভিন্ন প্রদেশের যোগাযোগ স্থাপনেব উদ্দেশ্যে যতীন্দ্রনাথ ভারত ভ্রমণ করেন। বিশেষতঃ এইজন্য তিনি পাঞ্জাব যান এবং তথায় বিপ্লবীদলের এক শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সূত্রে প্রসিদ্ধ "গধর পার্টি"র নাম উল্লেখযোগ্য। "কোমাগাটামারু" খ্যাতির বাবা গুরুদিৎ সিংও যতীন্দ্রনাথের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় সৈন্যদলের সহযোগিতা করিবার প্ররোচনার জন্য তিনি প্রথম হইতেই সচেষ্ট ছিলেন।

অপরদিকে বিদেশী সরকারও নিশ্চেষ্ট ছিল না তাহাদের গুপ্তচরের সাহায্যে পুলিশ মাণিকতলায় "বোমার আড্ডা" আবিষ্কাব করিয়া উহার নেতৃবন্দ ও কর্ম্মীদের বন্দী করিল এবং ষড়যন্ত্রকারীদেব বিরুদ্ধে বাজদ্রোহের মামলা করিল। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে কার্য্যকারী কোনও প্রমাণ না থাকায় তাঁহারা মুক্তিলাভ করেন। তাঁহাদিগকে কিরূপ দক্ষতার সহিত গোপনে এই সকল কঠিন কার্য্য করিতে হইত ইহা হইতেই তাহা প্রতিভাত হইবে।

সবই করিলেন, অথচ ধবা ছোঁয়া নেই। তাঁহারা আত্মগোপন করিয়া সকলকে কার্য্যের নির্দেশ দিতেন। হয়ত প্রমাণ পাইলে অন্যান্য শহীদের ন্যায় তাঁহাদেবও প্রাণদণ্ড ও দ্বীপান্তর হইত। বাংলার বিপ্লব সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অনেক স্থলেই যতীন্দ্রনাথের উপবোক্ত কর্ম্মের ইঙ্গিত আছে। এই আলিপুর বোমার

মামলায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁহার ব্যবহারিক জীবনের প্রারম্ভে শ্রীঅরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করিয়া প্রভূত যশ ও খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

অনুমান ১৯০৭ খৃঃ যতীন্দ্রনাথ শ্রীমৎ সোহং স্বামীর (ঢাকার বাঘ-মারা শ্যামাকান্ত) সংস্পর্শে আসেন এবং গৃহস্থ জীবন ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ও তদবধি স্বামী নিরালম্ব নামে পরিচিত হন। সন্ন্যাসী হইয়া তিনি ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থান দর্শন করেন এবং বহুদিন হিমালয়ে বিচরণ করিয়া তিব্বতে মানস সরোবর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। পরিশেষে নিজ জন্মস্থান চান্নাগ্রামের বহির্দেশে লোকালয় হইতে দূরে, নির্জন প্রান্তরে, নদীতীরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই স্থানেই শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি মধ্যে মধ্যে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইতেন এবং বৎসরে দুই একবার কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার প্রিয় শিষ্য বসাক ফ্যাক্টরীর স্বত্বাধিকারী শ্রীবিজয়বসন্ত বসাক মহাশয়ের বরাহনগরস্থ উদ্যানবাটিতে থাকিতেন।

স্বামী নিরালম্ব অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক রাজযোগী, আত্মজ্ঞানী ব্রহ্মবিদ্ মহাপুরুষ, তাঁহার সান্নিধ্যে দেহমন অনুপম সান্ত্বনা লাভ করিত, এক অপূর্ব্ব চিদানন্দের অনুভূতি হইত। নানাশাস্ত্রে তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল এবং স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। তিনি সর্ব্ববিধ সংস্কার বিমুক্ত ছিলেন এবং ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, বিদ্বান-মূর্খ, হিন্দু-মুসলমান-শিখ সকলেরই প্রতি সমান প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিয়া আকৃষ্ট করিতেন। সস্নেহ আপ্যায়নে সকলকেই প্রিয়জন করিয়া লইতেন।

তাঁহার আশ্রম নিতান্ত আড়ম্বরহীন, পর্ণ কুটির মাত্র। নদীতীরে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য—অতীব চিত্তাকর্ষক। পৌরাণিক যুগের বশিষ্ঠ মুনির আশ্রম স্মরণ করাইয়া দেয়। তথায় অনাবিল শান্তি বিরাজমান। বাস করিলে স্বর্গসুখ অনুভব হয়।

সুবিখ্যাত সিদ্ধযোগী ভগবান্ তিব্বতীবাবার সহিত নিরালম্ব স্বামীর অত্যধিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তাঁহার মধ্যেও অনেক অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ পাইত। তিনি স্বয়ং প্রায় ১৫০ বৎসর প্রাণ ধারণ করিয়া ছিলেন। তিনি অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির অব্যর্থ ঔষধ জানিতেন এবং প্রার্থীদের দিতেন। চিকিৎসক পরিত্যক্ত কলেরা রোগীকে দেশী ঔষধ দ্বারা আশ্চর্য্যভাবে নিরাময় করিয়াছেন।

১৯৩০ খৃঃ ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে স্বামী নিরালম্ব বরাহনগরে শ্রীবিজয়বসন্ত বসাক মহাশয়ের ভবনে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার নশ্বর দেশের ভগ্নাবশেষ লইয়া চান্না আশ্রমে সমাধি রচনা হয়।

গার্হস্থ্য জীবনে শ্রীমতী চিন্ময়ী দেবীর সহিত যতীন্দ্রনাথের পরিণয় হইয়াছিল। পরে তিনিও সন্ন্যাসিনী হইয়া স্বামীর প্রকৃত সহধর্ম্মিণীরূপে ধর্ম্মসাধনার সহায়তা করিয়া ছিলেন। তিনি আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও শিষ্যদিগের মাতৃ-স্বরূপিণী ছিলেন। তিনি স্বামীর পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করেন। আশ্রমে তাঁহারও সমাধি আছে।

আধ্যাত্মিক জগতে স্বামী নিরালম্বের প্রধান শিষ্য স্বামী প্রজ্ঞানপাদ বর্ত্তমান। তিনিও রাজযোগী আত্মজ্ঞানী ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ। বিপ্লববাদে তাঁহার প্রধান শিষ্য প্রসিদ্ধ বিপ্লবী নেতা ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্-বি।

যতীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে জনৈক লেখক অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে "বাংলায় নবযুগের সূচনা করিয়াছেন দুইজন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী—ধর্ম্মক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ ও কর্ম্মক্ষেত্রে স্বামী নিরালম্ব।" ইহা বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি নয়। বস্তুতঃ নিরালম্ব স্বামীর অনুভূত প্রেরণা না পাইলে ও তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার নির্দেশ না থাকিলে বাংলার বিপ্লবী যুবকবৃন্দ স্বাধীনতা যজ্ঞে স্মিতমুখে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আত্মাহুতি দিতে পারিত কি? স্বাধীনতা যুদ্ধ সফল হইত কি?

লেখকের পরম সৌভাগ্য যে স্বামী নিরালম্বের ন্যায় মুক্ত পুরুষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সেবা করিবার এবং আশ্রমে তাঁহার সংসর্গে থাকিবার সুযোগ হইয়াছিল।

*কার্ত্তিক, ১৩৫৫*

# মাও সে তুং

## অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ধূমকেতুর মতোই মাও সে তুংএর আবির্ভাব। কিছুদিন আগেও যার নাম জানতো এমন লোকের সংখ্যা ছিল অতি বিরল, আজ সেই ব্যক্তিই পাশ্চাত্য জগতের অন্যতম সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে ; সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ; সবচেয়ে আলোচ্য ব্যক্তি আজ চীনের নব নায়ক মাও সে তুং, ভারতবর্ষও যার প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারছে না।

এতো অল্প সময়ের মধ্যে খ্যাতি ও নিজের দেশে জনপ্রিয়তার এতো উচ্চশিখরে আর কেউ উঠতে পেরেছে বলে জানা নেই ইতিহাসে। মাত্র তিন বছর আগেও যে ব্যক্তি উত্তর-পশ্চিম চীনের এক দুর্গম পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে দিন যাপন করতো, কোনদিন অর্দ্ধাশনে কোনদিন বা অনশনে, আজ সেই লোকই চীনের অবিসম্বাদিত নেতা, পৃথিবীর ভীতি ও বিস্ময়।

তিন বছর আগেও মাও সে তুং ছিলেন এক পলাতক রাজবিদ্রোহী। জেনারেলিসিমো চ্যাং কাই শেকের সৈনারা তুং-এর শৈশবের আবাসস্থল ও কর্ম্মকেন্দ্র ইয়েনান্ দখল করে নিয়েছিল এবং চ্যাং-এর সদম্ভ ঘোষণা শোনা গিয়েছিল,—"এইবার তুং-এর দলের শেষ।"

কিন্তু ইতিহাস তার বিপরীত কাহিনী আজ লিপিবদ্ধ করেছে। কোথায় চ্যাং-কাইশেক? সমগ্র চীন আজ মাও সে তুংকে বরণ করে নিয়েছে। চীনের মরাগাঙে জোয়ার এসেছে। শ্রদ্ধা ও সম্মানের শ্রেষ্ঠ আসন আজ মাও সে তুংএর করতলগত। কিছুদিন আগে মসকো-তে স্টালিনের ৭০তম জন্মদিবসে স্টালিনের ডানপাশে শ্রেষ্ঠ সম্মানের আসনটি তারই জন্যে নির্দিষ্ট হয়েছিল।

এই অসাধারণ মানুষটির প্রথম জীবনের ইতিহাস জানবার জন্য আগ্রহ বোধ করা বিচিত্র নয়; কিন্তু জানা যায় অতি সামান্যই, হুনান নগরে এক চাষার ঘরে তাঁর জন্ম। শিশুকাল থেকেই তাঁর প্রকৃতির মধ্যে ছিল একটা চাপা বিদ্রোহের ভাব। যখন তার সাত বছর বয়স তখন তাঁর বাবা তাঁকে ক্ষেতখামারের কাজে নিযুক্ত করলেন, কিন্তু মাও সে তুং সে কাজে রাজী হলেন না, প্রকাশ্যেই বাপের বিরুদ্ধাচরণ করলেন। তার এই অবাধ্যতা দেখে পড়শিরা অবাক হল। ছেলে হয়ে বাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ! কনফুসিয়াসেব আদর্শের এত বড় অপমান বিস্ময়কর বৈকি! কিছুদিন পরে মাও সে তুং স্কুলে ভর্ত্তি হলেন। পিতা ভাবলেন, লেখাপড়া শিখে ছেলে তাঁর এইবার মানুষ হবে ; কিন্তু সেখানেও শিক্ষকরা তাকে বাগ মানাতে পারলেন না। ধরা-বাঁধা লেখাপড়ায় মাও সে তুংএর মন নেই। অঙ্ক? চীনের পুরাতন সাহিত্য? নীরস ও নিরর্থক। তুং এদিকে ঘেঁষলেন না। একমাত্র ইতিহাস তাঁর সারা মন আকৃষ্ট করল।

১৮ বছর বয়সে তুং ডাঃ সান ইয়াটসেনের বিদ্রোহে যোগ দিলেন একাত্মনে ; এবং কিছুদিন পরেই চাংসায় নর্ম্মাল স্কুলে পড়বার সময় তিনি তাঁর প্রথম সশস্ত্র বিদ্রোহ পরিচালনা করলেন। অসম ছিল তাঁর সাহস। অদ্ভুত কর্ম্মশক্তি। চ্যাং কাইশেকের এক কুখ্যাত প্রদেশপালের পলায়নপর সৈন্যরা তুং-এর স্কুলটিকে আত্মরক্ষার ঘাঁটি করবাব উদ্দেশ্যে স্কুলে হানা দিলে। শিক্ষকরা ছিলেন চম্পট, তাদের সঙ্গে অধিকাংশ ছাত্ররাও। তুং তখন স্কুলের যোয়ান যোয়ান খেলোয়াড়দের নিয়ে এক দল গঠন করলেন। তারা স্কুলের প্রবেশ পথে চেয়ার টেবিল প্রভৃতি দিয়ে বেড়া রচনা কবলে এবং কয়েকজন ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমাণ সৈন্যদের বেকায়দা করে তাদের বন্দুক ও কার্তুজ কেড়ে নিলে, তারপর চলল রীতিমতো লড়াই। স্কুলেব ভিতর থেকে তুং-এব দল গুলি চালাতে লাগল। উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যরা হঠে গেল। প্রথম যুদ্ধেই তুং জয়লাভ করলেন।

* * *

তিনখানা বই মাও সে তুংএর জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছে এবং তাঁর বর্ত্তমান জীবনকে গঠন করেছে। কমুনিস্ট ইস্তাহার, কটস্‌কি প্রণীত শ্রেণীযুদ্ধ এবং কিরকাপ রচিত সোস্যালিজমেব ইতিহাস। ১৯২১ সালে মার্কসীয় মতবাদের এই নূতন ভক্ত সাংহাই সহরে এক গুপ্ত সভায় অপর এগারোজন সদস্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে চীনা সাম্যবাদী দলের পত্তন করলেন। কিছুদিন পরে নিজের জন্ম-প্রদেশে ফিরে এসে তিনি চাংসা বিভাগীয় কেন্দ্র স্থাপনা করলেন, এবং নিজে হলেন তার কর্ম্ম সচিব।

কিন্তু তখনো তুং-এর প্রতিপত্তি তেমন বিস্তার লাভ করেনি। তখনো তাঁর অনুগামীর দল ছিল নগণ্য। সে সময় দলেব শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন মস্‌কৌ ফেরৎ লিলিসান্। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে লিলিসানের প্রভাব ছিল অপ্রতিহত। বিভিন্ন সহরের শ্রমিক সংঘগুলি নির্ব্বিচারে লিলিসানকে মান্য করতো। তারাই ছিল তাঁর শক্তি ও প্রভাবেব মূল।

কিন্তু তুংএর লক্ষ্য ছিল ভিন্নতর। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে রাজনৈতিক সংহতির মূলে চীনা মজুরেরাই হল আসল শক্তি। তিনি গ্রামে গ্রামে তাদের মধ্যে কাজ করতে লাগলেন, তাদের নূতন আদর্শে গডে তুলতে লাগলেন, নূতন প্রেবণায় তাদের উদ্বুদ্ধ করলেন।

কালক্রমে লিলিসান্ পিছিয়ে যেতে লাগলেন এবং ১৯৩১ সালে প্রভাব প্রতিপত্তি হারিয়ে মস্‌কো চলে গেলেন। তারপব তিন বছর বয়ে চলল চ্যাং কাইশেকের সৈন্যদের সঙ্গে তুংএর দলের লড়াই। তুং এবং তাঁর প্রধান সহকর্ম্মী জেনাবেল চুটে প্রবল পরাক্রমে আত্মরক্ষা করতে লাগলেন। সেই জীবন মরণ সংগ্রামে বারবার আশ্চর্য্য সাহস ও কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। অবশেষে ১৯৩৪ সালে মাং সে তুং বিস্ময়কর সাফল্যের সঙ্গে তাঁর দলের লোকদের ৬০০০ মাইল দূরবর্ত্তী ইয়েসান সহরে স্থানান্তরিত করলেন। নিরাপদ হলেন নিজে, নিরাপদ করলেন দলের সবাইকে। সেই দেশ বিখ্যাত আলোড়নে কারুর আর জানতে বাকি রইল না চীনা সাম্যবাদের প্রকৃত নেতা কে?

*　　　　　　　　*　　　　　　　　*

নিজের দলে সৈন্য সংগ্রহ করার কাজে মাও সে তুং বিলক্ষণ দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। সাধারণতঃ সৈনিক হয় সমাজের নীচুস্তরের মানুষ। চাষীরা তাদের ভয় করে, ঘৃণা করে, অবিশ্বাস করে, সহরবাসীরা তাদের বরদাস্ত করতে চায় না। সম্মান বা শ্রদ্ধা কেউ করে না তাদেব। তুংএর সৈন্যরা ভিন্ন আদর্শে গঠিত। "জনসাধারণের সেবাই তাদের ধর্ম্ম।" এছাড়া তাদের জন্য কোন নীতি নেই। তুংএর সৈন্যগণ সেই আদর্শকে মেনে নিয়েছে। সৈন্যদের জীবন পরিচালিত করবার জন্যে তিনি আটটি নীতির প্রবর্ত্তন করেছেন। মিষ্টভাষী হবে, ন্যায্য দাম দিযে জিনিস কিনবে, ধার নিলে তা শোধ করবে, ক্ষতি করলে তা পূরণ করবে, মারধোর বা গালাগালি করবে না, শস্যের ক্ষতি করবে না, স্ত্রীলোকের পিছু নেবে না, যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করবে না।

ধীরে ধীবে চ্যাং কাইশেকের অপদার্থ, আদর্শভ্রষ্ট এবং কলুষপূর্ণ রাজত্বের অবসান হল। তুংএর বিদ্রোহের কাছে চ্যাংএর সৈন্যরা সর্ব্বক্ষেত্রে পর্য্যুদস্ত হল। চ্যাংএর সৈন্যরা যেখানে সেখানে পরাজয়ের গ্লানি, হতাশা আর বিশৃঙ্খলা। তুংএর কবলে যে সব স্থান একের পর এক আসতে লাগল, সে সব স্থানে শৃঙ্খলা নিয়ম, শান্তি আর প্রাচুর্য্যের প্রত্যাশা দেখা দিল। অতএব তুংএর জয়ের পথ প্রশস্ততর বিলম্ব ঘটল না।

*　　　　　　　　*　　　　　　　　*

পাহাড়ের গুহা থেকে বেবিয়ে মাও সে তুং আজ দেশের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। এতদিন পরে লোকে ভাল ক'রে তাঁকে দেখবাব অবকাশ পেয়েছে। চীনাদেব তুলনায় তিনি যথেষ্ট দীর্ঘাকৃতি ; প্রায় ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি। ঈষৎ আনতভঙ্গী। সাজ পোষাকে অযত্নবান। চমৎকার স্বাস্থ্য।

তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ইতিবৃত্তকে আড়াল কবে রাখা হয়েছে। জানা গেছে, তিনি চারবার বিবাহ করেছেন। তাঁর প্রথম স্ত্রীকে নির্ব্বাসিত করেছিলেন তাঁব পিতা। দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন, এক পিকিং অধ্যাপকের সাম্যবাদী মেয়ে। হুনানের সাম্যবাদী বিরুদ্ধ প্রদেশ-পাল মেয়েটিকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কবে। তাঁর তৃতীয় স্ত্রীর গর্ভে কয়েকটি সন্তান হয় ; তার বেশী কিছু জানা নেই ; তাকেও তিনি পরিত্যাগ করেন। বর্ত্তমানে তাঁব চতুর্থ পক্ষের স্ত্রীর নাম হল ল্যান পিং। মেয়েটি আগে ছিল অভিনেত্রী। উভয়ের একটি আট বছরের মেয়ে আছে।

নির্জীব বণবিক্ষত ও পরিশ্রান্ত চীনারা আজ মাও সে তুংএর নেতৃত্বে নবজীবনের সম্মান লাভ করেছে। পেযেছে নবতম উজ্জীবন-মন্ত্র। তাই আজ চীনের সহরে নানা স্থানে যে-সব অনুষ্ঠান হয়, সেই সব অনুষ্ঠানেব আরম্ভে ও শেষে স্বতঃ উৎসারিত সহস্র কণ্ঠে বিঘোষিত হয় "মাং সে তুংএব জয়।"

*পৌষ, ১৩৫৮*

# ফরাসী সভ্যতা

## বিনয়কুমার সরকার

( ১ )

ফরাসী অ্যাঁস্তিতিউয়ের (Institut France) বার্ষিক অধিবেশন হইল। নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলাম। রাস্তায় হাঁকা হাঁকি কবিয়া "ইন্‌স্টিটিউট্, ইন্‌স্টিটিউট" বলিয়া গলা ফাটাইলেও প্যাবিসের কোনো লোক পথ দেখাইয়া দিবে না। বলিতে হইবে ঠিক অ্যাঁস্তিতিউ। তথাস্তু। প্রকাণ্ড বাড়ী। সেইন নদীর কিনারার বাস্তার উপব এক বিরাট সৌধ। প্রবেশ কবিতে-করিতে মনে হইতে লাগিল, যেন বা সেনাপতি মার্শ্যাল ফশের সঙ্গেই মোলাকাত কবিতে চলিয়াছি। আশে-পাশে ঘোড়-সওয়ার, এখানে-ওখানে সশস্ত্র, সুসজ্জিত পল্টনের দল।

যথাস্থানে আসন গ্রহণ করিলাম। গোলযোগ খুব। শ-তিনেক লোকের জায়গা। সবই ভবা। আমার চোখের সম্মুখেব দেওয়ালে বাঁ দিকে লেখা "ও সিয়্যাঁস" (aux sciences) ; ডাইনে লেখা "ও বোজোর" (aux beauxarts) । আর আর মাঝে-মাঝে লেখা "ও লেতর" (aux letters) ; অর্থাৎ ভবনটা বা অ্যাঁস্তিতিউ স্বযংই বিজ্ঞান, সুকুমার শিল্প আব সাহিত্যেব উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছে।

ঠিক একটা বাজিল,—অমনি বাহিবে ভ্যাঁপো-ভ্যাঁপো করিয়া আওয়াজ। দেখিতে-দেখিতে ধড়াচূড়া পরিয়া পল্টনী পোষাকে গৃহে প্রবেশ করিলেন ২৫।৩০ জন আধ-বুড়ো লোক। বুঝিলাম, ইঁহাবাই জ্ঞানেন বয়সা চ বৃদ্ধ,—অ্যাঁস্তিতিউয়ের মেম্বর। কোমরে তলোয়ার ঝুলিতেছে; কোটেব চওড়া কলাবে সোনালি জরির কাজ—আর মাথায় নেপোলিয়ানী টুপী। এই টুপির রেওয়াজ আজকাল ফ্রান্সে এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। কখনো-কখনো রাস্তায় কোনো দ্বারোয়ান, বরকন্দাজ, চাপরাশি বা পত্রবাহকের মাথায় নেপোলিয়ানের ষ্টাইল বিরাজ করে মাত্র। যাহা হউক, অ্যাঁস্তিতিউয়ের আদব-কাযদা নেপোলিয়ানকে আজও বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

অ্যাঁস্তিতিউয়ের সভাপতি শার্ল্ ডীল (Charles Dihle) প্রধান স্থানে বসিলেন। অন্যান্য মেম্বারদের জন্য স্বতন্ত্র আসন আছে। অধিবেশনের কার্য্য সুরু হউক, এই কথা বলিয়া ডীল এক লম্বা বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার পর জানানো হইল, অমুক-অমুক লোককে অ্যাঁস্তিতিউ অমুক-অমুক পুবস্কাব বা পদক প্রদান করিয়াছেন। বিজ্ঞান হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্নতত্ত্ব পর্য্যন্ত, আর আফ্রিকার কঙ্গো মুল্লুকের ভৌগোলিক বিবরণ ও নৃতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ফরাসী লোক-সাহিত্যের ছড়া পর্য্যন্ত, এমন কোনো বিদ্যা নাই, যে বিদ্যার ব্যাপারীদের এই সম্বর্দ্ধনার তালিকায় দেখিলাম না। ডীলের বক্তৃতার পর আব দুইটা বক্তৃতা হইল। দুই ঘণ্টা

পরে সভা হল ভঙ্গ। দুইধারের পল্টনের দেওয়াল ভেদ করিয়া রাস্তায় আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। তিনটা বক্তৃতার মধ্যে ত্রিশটা শব্দও দখল করিতে পারি নাই। ফিরিবার সময়ে ঘরের ভিতরকার পাঁচটা মূর্ত্তি ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। চার কোণে বোসে (Bossaut), ফেনেলঁ (Fenelon), দেকার্ত্ত (Descartes) ও সুঈ (Sully)—চার দিগ্‌গজ। যে দেওয়ালে লেখা তিনটা খোদা, সেই দেওয়ালের মধ্যস্থলের মূর্ত্তি ওর্লিয়াঁর নবাবের। ইনি অ্যাঁস্তিতিউ ভবনের জন্য ভূমি দান করিয়াছিলেন বলিয়া।

কয়েকদিন পরে খাইতে গিয়াছিলাম শার্ল্ জিডের বাড়ীতে। উপস্থিত ছিলেন সেস্তর্। কথা উঠিল—"হাঁ মহাশয়, আপনি না কি অ্যাঁস্তিতিউয়ের অধিবেশনে গিয়া ছিলেন। কিরীচ তলোয়ারের ঝন্‌ঝনানি কেমন লাগল?" আমি বলিলাম—"তাই ত! কিছুই যেন বুঝিতে পারিলাম না। ব্যাপারটা কি?" দুইজনে একসঙ্গে বলিলেন—"ব্যাপার আর কি;—নেপোলিয়ানের কাণ্ড!" ফ্রান্সের যা কিছু—গির্জাই হউক বা ইস্কুলই হউক—নেপোলিয়ান সব প্রতিষ্ঠানের উপর পল্টনী কায়দা চাপাইয়াছিল। এই যে অ্যাঁস্তিতিউ—এটাও নেপোলিয়ানের কীর্ত্তি। কাজেই নেপোলিয়ানী রীতি এখানে ১৯২০ সালেও চলিতেছে।

ফ্রান্সে মোটের উপর পাঁচটা অ্যাকাডেমী বা পরিষদ। সর্ব্বপুরাতন অ্যাকাডেমী গঠিত হইয়াছিল সপ্তদশ শতাব্দীতে চতুর্দশ লুইয়ের আমলে। সেটা মন্ত্রিপ্রধান পাদ্রী রিশলিয়্যো (Richelieu) এর গড়া। পরিষদ্ বলিলে দুনিয়ার লোকে এবং ফরাসীরাও এই রিশলিয়্যো-প্রবর্ত্তিত অ্যাকাডেমীই বুঝিয়া থাকে। এই অ্যাকাডেমীরই জগতে যা কিছু নাম-ডাক। এই অ্যাকাডেমীর মেম্বর নির্ব্বাচিত হওয়া ফরাসী পণ্ডিতগণের চিন্তার নরজন্ম সার্থক হওয়ার সমান। ফরাসী রিপাবলিকের যিনি প্রেসিডেন্ট, তিনি ঘটনাচক্রে পাণ্ডিত্যের জোরে যদি কখনো অ্যাকাডেমীর মেম্বর নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে গোটা দেশের মাথায় বসিয়াও, কাগজ-পত্রে নিজ নামের সঙ্গে লিখিয়া জানান যে তিনি অ্যাকাডেমীর মেম্বর। এই পদবীর দাম এতই বেশী। বোধ হয় বিলাতী রয়্যাল সোসাইটির মেম্বর পদবীও ইংলেজ সমাজে এত উঁচু কি না সন্দেহ।

যাহা হউক, নেপোলিয়ান রিশলিয়্যোর মুখে ঝাল খাইবার পাত্র নন। তাই রিশলিয়্যো-গঠিত অ্যাকাডেমীকে ট্যাকে পুরিবার মতলবে নেপোলিয়ান নয়া চার-চারটা অ্যাকাডেমী কায়েম করেন। তাহার পর এই পাঁচটা অ্যাকাডেমীকে এক শাসনে আনিয়া, এক সর্ব্বগ্রাসী সঙ্ঘ গঠন করিলেন। সেই সঙ্ঘের নাম অ্যাঁস্তিতিউ। অ্যাকাডেমী পাঁচটার মেম্বারী, কাজকর্ম্ম, নিয়মকানুন, সভাসমিতি—সবই পৃথক্-পৃথক্ চলে। তবে কতকগুলা বিষয়ে পাঁচটায় একত্র মিলিয়া কাজ হয়। আর বৎসরে একবার করিয়া সম্মিলিত বৈঠক বসে। সেই বৈঠকেই আমি গিয়াছিলাম।

নেপোলিয়ান রিশলিয়্যোকে হারাইতে পারে নাই। কারণ, নেপোলিয়ানের অ্যাকাডেমীগুলিকে ফরাসীরা পুছে না। এইগুলার ইজ্জত এমন বিশেষ কিছু নয়। যাঁহারা রিশলিয়্যোর অ্যাকাডেমীর সভ্য, তাঁহারা নিজ-নিজ নামের পশ্চাতে লিখিয়া থাকেন "মাম্‌ব্ দ লাকিদেমি member de l' academie)। কিন্তু যাঁহারা নেপোলিয়ানী অ্যাকাডেমীর

সভ্য, তাঁহারা অ্যাঁস্তিতিউয়ের সভ্য (দ' ল্যাঁস্তিতিউ del' Institut) বলিয়া নিজের পরিচয় দেন। অবশ্য যাঁহারা রিশলিয়োর অ্যাকাডেমীর সভ্য, তাঁহারাও অ্যাঁস্তিতিউযেরও সভ্য ও বটেই। কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে এই পরিচয় দেওয়া কুলে খাটো হইবার সমান বিবেচিত হয়।

ভারতবাসীর সুপরিচিত কোনো ফরাসী পণ্ডিত অ্যাকাডেমীর মেম্বর কি না, মনে পড়িতেছে না। কিন্তু অ্যাঁস্তিতিউয়ের মেম্বাব অন্ততঃ একজনকে ভারতবর্ষে জানে। তাঁহার নাম সেনার (Senart)। ইনি হিন্দুর জাতিভেদ বিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়া প্রসিদ্ধ। অফরাসীরাও অ্যাঁস্তিতিউয়ের সভ্য নির্ব্বাচিত হইতে পারেন। ম্যাক্সমুলাব এইরূপ সভ্য ছিলেন। মেম্বার হইতে হইলে আগে অ্যাঁস্তিতিউযের কোন প্রকার পুরস্কাব বা মেডেল পাওয়া আবশ্যক। আর, পুরস্কার মেডেল ইত্যাদি পাইতে হইলে নিজ প্রণীত গ্রন্থ-গবেষণাদি অ্যাকাডেমীতে বাচাই হওয়া চাই। অবশ্য এই দুই দফায়েই হাঁটাহাঁটি, আনাগোনা, দহবম মহরম, ইত্যাদি দস্তুর মতনই দরকার। ফ্রান্স ত আর সৃষ্টি-ছাড়া মুল্লুক নয়।

( ২ )

জাহাজের সহযাত্রী দুইটি মার্কিন রমণী বলিতেছেন- -"মহাশয় এই কয় সপ্তাহ প্যারিসে কাটাইয়া কোনো দিন একজনও আহত লোক দেখিলাম না। কাগজে-কলমে ত পড়িয়াছি যে, ফরাসীদের পুরুষের অনেকেরই হাত পা ভাঙা' বা নাক চোখ জখম ইত্যাদি! অথচ স্বচক্ষে যুদ্ধের কোন লক্ষণ ত দেখিতে পাইতেছি না। আর একটা জিনিষও বেশ লক্ষ্য করিতেছি। হোটেলে, ক্যাফেতে, থিযেটারে, বড় বড দোকানে লোকের হুড়াহুড়ি যথেষ্ট। ফবাসী জাত যুদ্ধে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বিবেচনা করা সুকঠিন।"

নিউইযর্কের বাজারহাটে আর প্যারিসের বাজারহাটে খরিদদাবের সংখ্যা হিসাবে কোন প্রভেদ নাই। এদিকে জিনিসের দামও এক প্রকার। যুদ্ধ লড়াই হাঙ্গামের কথা যারা খবরের কাগজে পড়ে, তারা অনেক কাল্পনিক দৈন্য-দুঃখ আবিষ্কার করিয়া থাকে। কিন্তু যারা যুদ্ধে লড়িতে লাগিয়া যায়, তাদের অভিজ্ঞতা অন্যবিধ। তারা হেসে খেলে বেড়াইবার সুযোগও ঢুঁড়িয়া লইতে জানে। দূর হইতে যুদ্ধ যত ভয়াবহ কাছে আসিলে তত নয়। কথাটা সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক। কারণ, লড়াই মানুযেব সংসারে একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। যুদ্ধের উপক্রম দেখিবামাত্র, মানুযের পক্ষে আঁতকাইয়া উঠা অস্বাভাবিক।

প্যারিসে কতকগুলা "বাঙাল" দেখিতেছি। ইহাদের কথা শুনিবামাত্র বুঝিতে পারি। বস্তুতঃ, যখনই কোনো ব্যক্তির মুখের ফরাসী বোল সহজে ধবিতেছি, তখনই সন্দেহ কবি যে লোকটা নিশ্চয়ই বিদেশী। যে ইয়োরোপীয় বিদেশীদের ফরাসী উচ্চারণ প্রায় আমারই মতন। ফ্রান্সে এই ধরণের বাঙাল আসে ক্যানাডা হইতে, ইউনাইটেড্ ষ্টেটস হইতে, ইংল্যাণ্ড হইতে, আর রুশিয়া হইতে। এই পর্য্যন্ত কোনো খাঁটি ফরাসীর বক্তৃতা শুনিয়া বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু রুশিয়ার এক ব্যক্তি এখানকার বিশ্ববিদ্যালযের অধ্যাপক-সম্মিলনে এক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। হাঁ করিবামাত্র ইহার কথা অন্ততঃ অর্দ্ধেক পাকড়াও করিয়া ফেলিলাম। ইনি পেট্রোগ্র্যাড বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিচালক। নাম গ্রিম্ (Grim) । ইনি বলিলেন,

"রুশিয়ায় আজকাল বাজারে কালী কলম কাগজ পেন্সিল পাওয়া যায় না। ইস্কুলে টেবিল নাই, চেয়ার নাই। রাস্তায় আলো নাই। কাজেই বুঝিতে পারিতেছেন—রুশ সমাজে শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ কতটুকু। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা কিই বা বলিব? বুঝিয়া রাখুন যে, ঐ বস্তু রুশিয়ার আর নাই। প্রবীণ মাষ্টার মহাশয়েরা গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়িলেন। বোল্‌শেভিকের বিরুদ্ধে আন্দোলন ফরাসী সমাজে বেশ প্রীতিকর। বোধ হয় প্রবন্ধটা কোন বৈজ্ঞানিক ফরাসী কাগজে ছাপা হইবে।

মুক্তার ব্যাপারী কয়েকজন গুজরাটির সঙ্গে আলাপ হইল। বৎসরে প্রায় দুই কোটি টাকার ব্যবসায় এই ৫০।৬০ জন ভারতবাসীর হাতে চলিতেছে। ব্যবসাটা ইহাদের এক প্রকার একচেটিয়া। মুক্তা উঠে পারস্যোপসাগরে। তোলে আরব জেলেরা। পারস্যের লোকেরা না কি আনাড়ি। ইয়োরোপীয় জহুরিরা খরিদ করিতে চায় খোদ আরবদের নিকট হইতে। কিন্তু আরবরা পশ্চিমাদের সঙ্গে কারবার করিতে নারাজ। আবার জেলেরা সাগর হইতে উঠায় যে অবস্থায়, সেই অবস্থায় মুক্তার কদর বুঝা পশ্চিমাদের অসাধ্য। কাজেই মুক্তার বাজার আসিয়া ঠেকিয়াছে বোম্বাইয়ে। কিন্তু মারাঠা সিন্ধী বা পার্শীরা এদিকে ঝোঁকে নাই। ঝুঁকিয়াছে গুজরাতীরা। গুজরাতীদের হাতে ব্যবসাটা নিতান্ত "পাড়াগেঁয়ে" অবস্থায় রহিয়াছে।

একজন বলিলেন—"আমাদের একমাত্র কাজ—মুক্তাগুলা পরিষ্কার অবস্থায় ফরাসীদের কাছে বেচা। কিন্তু এইগুলা ব্যবহার করিয়া অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করিতে, এবং ইয়োরোপে ও আমেরিকায় সেই সকল অলঙ্কার চালাইতে, যত মূলধনের প্রয়োজন, তত মূলধন আমাদের নাই। কাজেই, যে সকল ব্যবসাতে লাভ বেশী হইতে পারে, সেই ব্যবসাগুলা ইয়োরোপীয়ানদের হাতে। বস্তুতঃ, ফরাসীদেরই একচেটিয়া। ইংরেজ, মার্কিন, জার্ম্মাণ, দক্ষিণ আমেরিকাবাসী ইত্যাদি সকল জাতিই বেশী দামের মুক্তার গহনা প্যারিসের "সোনার"দের দ্বারাই তৈয়ারি করাইয়া লয়। অলঙ্কার-শিল্পে এবং সৌখীন সাজসজ্জা সংক্রান্ত সকল কারবারেই ফ্রান্সের একাধিপত্য। অন্যান্য দিকেও যেমন, মুক্তার ব্যবসাতে ভারতবাসী কেবল প্রকৃতিগত উৎপন্ন দ্রব্যগুলা রপ্তানি করিয়াই খালাস। এই সমুদায়ের "শিল্পের" দিকটা পশ্চিমা ওস্তাদদের হাতে। ফ্রান্সে গুজরাতীরা এই শিল্পের দিকে আজও নজর দিতে সাহসী নয়। নূতন পথে চলিতে অভ্যাস করা কঠিন। ১৯১৯।২০ সালের নব-স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে যদি বা কোনো ধনীব মাথা খুলিয়া যায়।

স্যালোঁ দোতনের শিল্প-প্রদর্শনীর সঙ্গে প্রায় রোজই একটা করিয়া বক্তৃতা হয়। একদিন বক্তৃতা শুনিলাম পোষাক সম্বন্ধে। বাঙলা দেশের কোনো দর্জি আসিয়া যদি বক্তৃতা দ্বারা বুঝায় কোন্ জামার কি বাহার ইত্যাদি, তাহা হইলে এই ফরাসী বক্তৃতার আলোচ্য বিষয় বুঝা যাইবে। বক্তৃতার পর পিয়ানো বাজিতে থাকিল। আর একে-একে ৪।৫ রমণী ভিন্ন-ভিন্ন পোষাকে সাজিয়া মঞ্চের উপর হাঁটিয়া যাইতে লাগিল। দর্শক-সংখ্যায় ঘর ভরিয়া গিয়াছে। কোন্ পোষাকে কার চেহারা কেমন খুলিবে, লোকেরা ঠাওরাইয়া লইতেছে।

সিল্‌ভাঁ লেভির বাড়ীতে একপাল জাপানী মাষ্টারের সঙ্গে দেখা হইল। ইহারা সকলেই

আসিয়াছেন ফিয়োতোর এক বৌদ্ধ কলেজ হইতে। প্রত্যেকেই ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনায় ব্যাপৃত। সিল্‌ভাঁ লেভির বৈঠকখানায় প্রত্যেক শনিবার রাত্রি নয়টার সময় অনেক লোকের গতিবিধি হয়। তিনি তখন "শে লুই" (chezlui) । ইংরাজীতে বলে অ্যাট্ হোম্। অর্থাৎ বাবু তখন ঘরে। ফরাসী অধ্যাপকদের অনেকেরই এই দস্তুর। এই সময়ে ছাত্র মাষ্টার এবং অতিথিদের সঙ্গে হরেক রকম কথাবার্ত্তার পালা। জাপানীরা ইংরাজীতে যেমন ওস্তাদ, ফরাসীতেও ঠিক তেমনি মনে হইতেছে। গীমে (Gimmet) প্রতিষ্ঠিত মিউজিয়ামে ম্যিজে গীয়েতে (Music Gimmet) প্রাচীন ধর্ম্ম বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মিশর, চীন, জাপান, ও ভারত এই চার দেশের মূর্ত্তি, চিত্র ও গ্রন্থাদি এখানে রক্ষিত হইতেছে। মাঝে মাঝে বক্তৃতাদি হয় এবং সেইগুলা ছাপাইয়া গ্রন্থাকারে প্রচারিত হয়। একদিন বিকালে এখানে সান্ধ্য-সম্মিলন হইল প্যারিসের চীনা ছাত্রদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য। জলযোগেরও ব্যবস্থা ছিল। এক ফরাসী নারী চীনা-কবিতা পাঠ করিলেন। কয়েকজন চীনা ছাত্র বীণা-যন্ত্র সঙ্গীতের নমুনা শুনাইল। আয়োজন করিয়াছিলেন "আমি দ' লোরিআ" "প্রাচ্য সুহৃৎ সমিতি।" ফ্রান্সে Amis de l'orient নামে এক কমিটি গঠিত হইয়াছে। ইহাদের কর্ত্তা সোয়ার (Seriart) । সমিতির কার্য্যালয় সম্প্রতি ম্যিজে গীমেতে। এখানে ৩০।৩২ জন চীনা যুবক উপস্থিত ছিল। আর কোনো এশিয়ানকে দেখিলাম না।

থিয়েটারে এক রুশ ওস্তাদের গান শুনিলাম। গান হইল রুশ ভাষায়, অনুবাদ ছাপা হইয়াছে ফরাসীতে। বিশটা গানের ভিতর গায়িকার গলায় একটা মাত্র সুরই নানাভাবে বাহির হইল, করুণ, করুণতর, করুণতম। গানগুলার ভাবার্থও একদম তাই। এই গানের আয়োজনেও কি বোলশেভিকীর বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিতেছে? কে জানে? বাছিয়া বাছিয়া পূরাপূরি মরার কান্না শুনাইবার আর ত কোন কারণ দেখিতেছি না।

( ৩ )

খৃষ্টান-জগতের সর্ব্বত্র ইহুদি বিদ্বেষ প্রবল, এমন কি আমেরিকায়ও যে পাড়ায় বা যে বাড়ীতে ইহুদিরা বাস করে, সেই পাড়ায় ও সেই বাড়ীতে খৃষ্টানেরা ঘর করে না। নিউ ইয়র্কে কোন ইহুদির বৈঠকখানায় বিশ পঁচিশজন বন্ধু-সমাগমের সময়ে কদাচ একজন খৃষ্টান দেখা যায়। ইয়াঙ্কিস্থানে এমন অনেক হোটেল আছে, যেখানে বংএর বিদ্বেষ থাকা সত্ত্বেও ভারতসন্তানের ঠাঁই মিলে, কিন্তু ইহুদিকে ঘর দেওয়া একদম নিষিদ্ধ। বলা বাহুল্য, ইয়োরোপে ইহুদিনির্য্যাতন আমেরিকা হইতেও বেশী হইবারই কথা। শুনিতে পাই ফরাসীরা যুদ্ধের সময়েও ফ্রান্সের ইহুদি সিপাহীদিগকে অনেকটা সেই চোখেই দেখিয়াছে। ইহুদি হইয়া জন্মগ্রহণ করা সামাজিক হিসাবে অস্পৃশ্য হইয়া থাকার সমান। অথচ ইয়োরামেরিকার বড় বড় ব্যাঙ্কে, মহাজনীতে, বিজ্ঞান-চর্চ্চায়, বিশ্ব-বিদ্যালয়ে, দর্শনে, সুকুমার-শিল্পে, সঙ্গীতে, সাহিত্যে—সকল ক্ষেত্রেই ইহুদিরা মাত্রায় এবং গুনতিতে যারপর নাই অগ্রণী। ইয়োরামেরিকার যে কোন দেশের দশবিশ জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামজাদা লোকের নাম করিতে হইলে অন্ততঃ আট দশজন ইহুদির নাম না করিয়া উপায় নাই। আমরা বিদেশী

বলিয়া নাম শুনিবামাত্র জাতিভেদটা ধরিয়া লইতে পারি না; কিন্তু সমাজের লোকেরা এক ডাকে বুঝে—কার কার "জল চল", আর কার কার সঙ্গেই বা "পংক্তি-ভোজন" চলিবে না।

ইহুদিরা স্বজাতি-বৎসল জাত। যথাসম্ভব আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিবার জন্য ইহারা স্বজাতীয় নরনারীর অভাব দূর করিতে সচেষ্ট। নানাপ্রকার ফণ্ড, ধর্ম্মগোলা সেবাসমিতি, ইত্যাদি গঠন করা ইহুদিদের একপ্রকার স্বধর্ম্মে দাঁড়াইয়াছে। ফ্রান্সের সর্ব্ববৃহৎ ইহুদি হিতসাধক-মণ্ডলীর নাম "বাঁফেঁজাঁৎ ইজরায়েলিৎ" (La Bienfaisante Istaelite)। এই মণ্ডলী অনেক দিনের পুরানো। ১৮৪৩ সালে স্থাপিত। ইহাদের বার্ষিক সভা এক প্রকাণ্ড হোটেলে অনুষ্ঠিত হইল। লাখ লাখ টাকা খয়রাতির হিসাব শুনিলাম। প্যারিসের বহু ধনীলোকের এবং গণ্যমান্য করিৎ-কর্ম্মা লোকের পরিচয় পাওয়া গেল। ফরাসী রিপাব্লিকের প্রেসিডেন্টের পত্নী ফুলের তোড়া উপহার পাঠাইয়াছেন। উৎসবটা এক প্রকার দিবসব্যাপী। "হোটেল লুটোনিয়া" প্যারিসে সুপরিচিত; ইস্কুল পাড়ার নিকটে ইহার অবস্থান।

প্যারিস, ভিয়েনা, কন্‌ষ্টান্টিনোপল ইত্যাদি শহর ষড়যন্ত্র প্রধান। এই সকল কেন্দ্রে ইউরোপের সকল দেশের এবং আজকাল এশিয়ারও নানা মতলবী লোক নানা ফিকিরে বসবাস করিয়া থাকে। এই লোকগুলাকে নাকে দড়ী দিয়া ঘুরাইবার মতলবে এক শ্রেণীর পশ্চিমা-মহিলা ব্যবসা খুলিয়াছে। এই মহিলারা লিখাপড়া জানা লোক; খবরের কাগজওয়ালাদের পরিচিত; দুই চারজন নামজাদা লোকেরও বন্ধু। ইহাদের পাল্লা এড়াইয়া কাজ করা কোনো বিদেশীর পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব; বিশেষতঃ যাহারা দুই চার সপ্তাহ অথবা দুইচার মাস মাত্র প্যারিসে ভিয়েনাতে কিম্বা কন্‌ষ্টান্টিনোপলে থাকিতে চায়, তাহারা এই ধরণের মহিলাদের সাহায্য না লইয়া উঠিতে-বসিতেই পারে না। অথচ খাঁটি কথায়, ইহাদের দ্বারা মতলব হাসিল হওয়া নিতান্ত অসম্ভব; কেবল অর্থব্যয় করা। কথাটা ভারতবাসীর কাণে বিশেষ করিয়া পৌঁছান আবশ্যক। ফরাসী ভাষায় ওস্তাদজি না হইয়া, অথবা হইতে চেষ্টা না করিয়া ফ্রান্সে রাষ্ট্রনৈতিক কিম্বা আর কোনো আন্দোলন চালাইতে আসা ঝক্‌মারি। জলের মতন টাকা খরচ করিতে পারিলেই অথবা বেকুবের মতন কতকগুলা মেয়ে-মানুষের সঙ্গে লাফালাফি করিলেই, বিদেশীয় রাষ্ট্র-নায়কদের "লোকমত" তৈয়ারি করা হয় না। কি রকম লোক তোমার পেছন ধরিয়াছে, তাহা বুঝিয়া উঠিতেও খানিকটা সমজদার হওয়া চাই। এই উদ্দেশ্যে বিদেশেই করিৎ-কর্ম্মা ভারত-সন্তানের স্থায়ী উপনিবেশ থাকা দরকার।

প্যারিসের লাইব্রেরীগুলা দুর্গ বা জেলখানা-বিশেষ। আমেরিকার গ্রন্থশালাগুলা যেমন খোলা, ফ্রান্সের কেতাবখানাগুলা তেমন আটক। যে-সে লোকের পক্ষে যখন তখন প্রবেশ করা অসাধ্য। ছাড়-পত্র বা কার্ড প্রত্যেক লাইব্রেরিতেই দরকার। কার্ড সংগ্রহ করাও কঠিন ব্যাপার। কোনো লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি-বিশেষের সার্টিফিকেট চাই। অবশ্য ছাত্রেরা সহজেই এই সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিতে পারে। কিন্তু হঠাৎ কোনো দরকার উপস্থিত হইলে, এক মিনিটের জন্য কোনো লাইব্রেরিতে গিয়া কোনো কেতাব দেখিয়া আসা প্যারিসে অসম্ভব।"

পাঁচ-সাতটা লাইব্রেরীতে কর্ত্তাদের নিকট হইতেই কার্ড পাইয়াছি। ঘটনাচক্রে এজন্য কোনো আফিসী কায়দার ভিতর দিয়া চলিতে হয় নাই। কিন্তু প্যারিসের লাইব্রেরিগুলায়, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতেও ব্যবস্থা, কলম্বিয়া, হার্ভার্ড অথবা নিউইয়র্ক পাব্লিক লাইব্রেরীর মতন সুবিধা-জনক নয়। কোনো এক জায়গায় বসিয়া সহজে কম সময়ে দুনিয়ার যে কোনো গ্রন্থ বা পত্রিকার সন্ধান পাওয়া প্যারিসে এক-প্রকার কঠিন।

এখানকার সর্ব্ব-বৃহৎ লাইব্রেরির নাম বিব্লিওটেক্ ন্যাশন্যাল (Bibliotheque Nationale)। বিদেশীর পক্ষে এখানে প্রবেশলাভ করা এক মহা হাঙ্গামা! এমন কি, একদিনের জন্য মাত্র প্রবেশ করিতে চাহিলেও পাশপোর্ট দেখাইতে হয়। তার পর যদি কেহ একটা স্থায়ী বাৎসরিক কার্ড চাহে, তবে নিজ দেশীয় অ্যাম্ব্যাসাডারের সহি-করা এক সার্টিফিকেট আবশ্যক হয়। বলা বাহুল্য, পৃথিবীতে এমন অনেক লোক আছে, যাহারা বিদ্যা-চর্চ্চায় ইস্তফা দিতে রাজি, তথাপি এম্বাসীর ত্রিসীমানায়ও পা-মাড়াইতে নারাজ। ফ্রান্স আগাগোড়া আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা;—এই হিসাবে মার্কিণমুল্লুক সত্য-সত্যই স্বাধীন এবং ডেমোক্রাটিক।

পঞ্জাবের আর্য্যসমাজীরা পতিত-হিন্দুকে এবং বোধ হয় অহিন্দুকেও হিন্দু করিয়া তুলে। ইহার নাম শুদ্ধি। আমেরিকায় এই ধরণের এক প্রক্রিয়া আছে। ইয়োরোপ হইতে আমদানি করা ইতালীয় গ্রীক, হাঙ্গারিয়ান, পোল, চেকো স্লোভাক ইত্যাদি জাতীয় লোকগুলিকে ইংরেজি শিখানো মার্কিণ রাষ্ট্রের এক প্রধান সমস্যা। এই কাণ্ডটাকে মার্কিণ পারিভাষিকে বলা হয় "আমেরিকানিজেশন" (Americanization) বা মার্কিণীকরণ। ফ্রান্সেও দেখিতেছি এই শ্রেণীর এক আন্দোলন। "ফরাসী সম্মিলন" নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য বিদেশী ছাত্র, শিক্ষক ও পর্য্যটকগণকে ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য শিখানো। কেন্দ্রের নাম আলিয়ান্স ফ্রান্সেজ (Alliance Francaise)। অনেক বিদেশীই এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্য লইয়া থাকে।

এক পরিবারে কয়েক ঘণ্টা কাটানো গেল নৈশ-বৈঠকে। কর্ত্তা ছিলেন যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় সিপাইদের তত্ত্বাবধানে। ইঁহার পত্নী ও কন্যা বন্ধুবর্গকে গুর্খাদের এক কুক্রি দেখাইলেন। কর্ত্তা মহাশয় ইয়ারদিগকে বুঝাইয়া দিলেন—"নেপাল দেশটা পুরাপুরি স্বাধীন। তথাপি নেপালবাসীরা 'যেচে এসে' ইংরেজকে সাহায্য করিয়াছিল। ভারতবর্ষ কি আর কখনো স্বাধীন হইতে পারে?"

প্যারিসে বহু পোল-জাতীয়ের বাস। যুদ্ধের পূর্ব্বে ত অনেকেই ছিল। এখনও সংখ্যায় কয়েক হাজার হইবে। এই পরিবারে দেখিতেছি স্ত্রীও চিত্রকর, স্বামীও চিত্রকর। স্বামীর শিল্প বিল্‌কুল কিউবিক,—স্ত্রী চলেন অনেকটা বাঁধা পথে। স্ত্রী-শিল্পীর কোনো-কোনো ছবি ইতিমধ্যে বিলাতের চিত্র পত্রিকায় স্থান পাইয়াছে। ইঁহাদের নাম মার্কুস্।

ভিক্টর বাশ্ একজন বক্তা বটে। অধ্যাপক মহলে এই ধরণের বাগ্মী সাধারণতঃ বড় চোখে পড়ে না। বাশের দুই বক্তৃতা শুনিলাম। একটাতে সাধারণের প্রবেশ অনুমোদিত। ইহাতে লোক উপস্থিত যুবায় বুড়ায় এবং স্ত্রী-পুরুষে প্রায় পাঁচশত। বক্তৃতার বিষয়

নৃত্যকলা। দ্বিতীয় বক্তৃতায় উপস্থিত একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী। সংখ্যা ৭৫। ইহাদের পঞ্চাশ জন বিদেশী। গ্রীকই অধিকাংশ; তবে ইংরেজ, মার্কিণ, পোল, হাঙ্গারিয়ান, স্পেনিশ, রুমেনিয়াণ, চেক এবং সার্ব্বও আছে। আলোচ্য বিষয় সুকুমার-শিল্প।

বাশ্ বলিলেন, প্যারিস ছাড়া জগতে আর কোথাও এস্‌থেটিক্‌স্ শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র অধ্যাপক নাই। বার্লিনে, হার্ভার্ডে সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব সাধারণ দর্শনের এক শাখা স্বরূপ আলোচিত হয় মাত্র। বাশ্ প্রণীত "কান্টের সৌন্দর্য্যতত্ত্ব" অতি প্রসিদ্ধ। ইতালীর দার্শনিক ক্রোচে (Croce) স্বকীয় "এস্‌থেটিক্" গ্রন্থে বাশের কর্বিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু বাশ্ বলিতেছেন—"ক্রোচে নিতান্ত অগভীর ও ভাসা-ভাসা। ইতালীর সকল পণ্ডিতই প্রায় এই ধরণের। ইঁহাদের চিন্তায় একটা গাম্ভীর্য্য বা নিরেট গবেষণা ঢুঁড়িয়া পাই না।" কয়েক মাস হইল বাশের দুইখানা নূতন বহি বাহির হইযাছে। একখানা চিত্র-শিল্পী টিসিয়ান (Titien) সম্বন্ধে। আর একখানার নাম Etudes d'oes thetique dramatique। বাশ্ সুকুমার-শিল্প বলিতে নাচ-গান, বাজনা হইতে আরম্ভ করিয়া নাটক, সাহিত্য, উপন্যাস সবই বুঝিয়া থাকেন। এক হিসাবে গোটা সভ্যতাই বাশের আলোচ্য বিষয়। একল দেজ ওৎ এতুদ্ সেসিযাল Ecoledes hautes etudes sociales) নামক সমাজ-বিদ্যার কলেজে ইনি বক্তৃতা করিতেছেন, "থিয়েটার ও মানব-জীবন" সম্বন্ধে।

(৪)

ফুল বিক্রী হয় প্যারিসে বিস্তর। ইযাঙ্কিস্থানে ফুলের রেওয়াজ এত বেশী দেখি নাই। এখানে সদরখানার সম্মুখেও এক প্রকাণ্ড ফুলের বাজার। নীল গোলাপ কেহ কখনো দেখিয়াছে কি? তাহাও দেখিলাম—ম্যাদলেইন (Madeleine) গির্জার লাগা, ফুলের বাজারে।

বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক বা ঐতিহাসিক গ্রন্থাদির ভাষা যত সহজ, নাটক বা কাব্যের ভাষা তত সহজ নয়। আজও ফরাসী নাটক পড়িয়া সহজে বুঝিতে পারিতেছি না। কবি, নাট্যকারেরা অনেক সময়ে নিতান্ত ঘরোয়া শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। অধিকন্তু বহু লেখকের রচনাতেই নিজ-নিজ মার্কামারা অনেক শব্দ দেখা যায়। কাজেই অভিধানের সাহায্য না লইয়া নব্য ফরাসী কবিদের টাট্‌কা লেখাগুলা বুঝিতে পারিলে বলা যাইতে পারে যে, ফরাসী দখল হইয়াছে দস্তুর মত। তাহার পূর্ব্বে নয়। খবরের কাগজ পড়িতে পারা বিশেষ বাহাদুরীর কাজ নয়।

এদিকে কথা বলার এক নূতন পরীক্ষা আবিষ্কার করিয়াছি। পুরুষের সঙ্গে বাক্যালাপ করা যত সোজা, স্ত্রীলোকের সঙ্গে তত সোজা নয়। পুরুষের উচ্চারণ আজ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বোধ হয় বুঝি; কিন্তু স্ত্রীলোকের আওয়াজ দশভাগও কানে ধরিতে পারি না। কাজেই যে বিদেশী ফরাসী মেয়েদের কথা বুঝিতে পারে, সে ভাষাটা আয়ত্ত করিয়াছে বলিতে পারে।

লড়াইয়ের ধাক্কায় ফরাসীরা অনেকে ইংরেজি শিখিয়াছে। রাস্তায়-ঘাটে যেখানে-সেখানে ইংরেজি-জানা স্ত্রী-পুরুষের সন্ধান পাই। ছোট-খাটো হোটেলে, ক্যাফেতে এবং

দোকানেও একটা বিজ্ঞাপন প্রায়ই চোখে পড়ে। তাহার মর্ম্ম এই ঃ—"এখানে ইংরেজি বলা হয়।" আর পণ্ডিত-মহলে ত দেখিতেছি, ইংরেজি জানে না, এমন লোক এক প্রকার বিরল।

বৃটানি প্রদেশের পৈতৃক ভিটা হইতে আনাটোল লে-ব্রাজ (Anatole Le-Braj) লিখিয়াছেন ঃ—আপনি আমাদের আদ্রো বেণাকের (Audre Benac) সঙ্গে আলাপ করিয়াছেন কি? তাঁহাকে আমরা বন্ধুবর্গ যীশুখৃষ্ট জ্ঞানে সম্মান করি। ইনি এতই অমায়িক ভাল মানুষ। বেণাক্ ব্যাঙ্কারদের এক অগ্রণী লোক। প্রকাণ্ড কয়লার খনির কারবাবের ইনি প্রেসিডেন্ট। ব্যবসা সম্বন্ধে নানা কথা হইল। লে-ব্রাজ মধ্য যুগের ফবাসী-সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ। সরকারী খাতিরে ইনি উচ্চ-পদস্থ।

গ্যালিয়েরা প্রতিষ্ঠিত মিউজিয়ামে ফরাসী শিল্পকলায় প্রদর্শনী খোলা হইল। এই শিল্প নব্য-তন্ত্রের কিউবিষ্ট বা ফিউচারিষ্ট মাল নয়। বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিল আসবাবপত্রগুলা। কাচ, পাথর, সোনা, রূপা, পোর্সলেন ইত্যাদি নির্ম্মিত বাসন-কোসন সু-প্রচলিত ফরাসী সৌখীনতার নিদর্শন। হাতীর দাঁতের ফুল, বই বাঁধাইবাব নানা প্রকার মলাট এবং ঘর, টেবিল ইত্যাদি সাজাইবার জিনিস—সবই দেখিতে চমৎকার। শিল্পের ধারাটা যদি বজায় থাকিত, তাহা হইলে ভারতবর্ষের কারিগরেরাও এই ধরণের মাল আজকালকার বাজারে জাহির কনিতে পারিত। কাজেই ফরাসী বিলাসদ্রব্য দেখিয়া আমাদেব চোখে ধাঁধা লাগিবার কিছু নাই। এ সব পয়সার খেলা।

প্যাবিসের মাষ্টারগুলা দেখিতেছি প্রায় সকলেই বাগ্মীবিশেষ , এমন কি চিত্তবিজ্ঞানের ক্লাশেও লোকেব ঝুলাঝুলি। বসিবাব দাঁড়াইবার ঠাঁই নাই। অধ্যাপকেব নাম ব্রুন্‌শ্বিগ্ (Brunschvicg) । ইনি রিআলিজম নমিনালিজ্‌ম্ ইত্যাদি বুঝাইতেছেন ঠিক কোনো উকীল "স্বদেশী বক্তা"র মতন। আর বুড়া-বুড়ী ছোড়া-ছুঁড়াবা শুনিতেছে হাঁ করিয়া। অদ্ভুত ক্ষমতা। বলিবার ভঙ্গীটাই চিত্তাকর্ষক।

এক স্পেনিশ ভাস্কর প্যারিসে বসতি কবেন বহুকাল। তাঁহার ষ্টুডিওতে দেখিলাম, একজন স্পেনিষ মহিলা টুলের উপর বস।। শিল্পী কাদামাটি দিয়ে তাঁহার মূর্ত্তি গড়িতেছেন। অল্পক্ষণের ভিতরই একটা জ্যান্ত মুখমণ্ডল সৃষ্টি হইল। শিল্পীর হাত পাকা। ইহার নাম ক্রেফ্‌ট (Creeft)। ক্রেফ্‌টের কর্ম্মশালায় অনেক‌গুলা ভাল ভাল কল্পনার গড়া মূর্ত্তি দেখিলাম। মামুলির চেয়ে উঁচু। স্বাধীন চিন্তা দেখিতে পাই রেখার টানে এবং অঙ্গেব গড়নে। কিন্তু ক্রেফ্‌ট বলিলেন "এগুলা বাজারে বিক্রী হয না। অন্ন বস্ত্রের জন্য আমাকে বাজারে জোগাইতে হয় অন্য প্রকার মাল।"

আর্লেঁদি একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। ইনি আলোচনা করেন জ্যোতিষ। এই সম্পর্কে ভারতের পরিচয়। সম্প্রতি বাতিক দেখিতেছি দ্বাদশ রাশিচক্রের প্রত্নতত্ত্বে। জ্যোডিয়াক (Zodiac) সম্বন্ধে নানা গ্রন্থ দেখিলাম ইঁহার বৈঠকখানায়। থিয়জফি হইতে ইনি জোডিয়াকে পৌঁছিয়াছেন, কি জোডিযাক হইতে থিযজফিতে ঝুঁকিয়াছেন বুঝা গেল না।

আমেরিকার ল্যাবরেটারিগুলাব তুলনায এখানকার কলেজ দ' ফ্রাঁসে" (College de

France)-এর ল্যাবরেটরি সব গোয়াল-ঘরের সমান। অথচ প্যারিসে যত বড় বড় আবিষ্কার হইয়াছে ও হইতেছে, ইয়াঙ্কিস্থানে তাহার জুড়ি বেশী নাই। বায়োলজির ল্যাবরেটরিতে প্রবেশ করিয়া ভাবিলাম যেন একটা সাদাসিধা তৃতীয় শ্রেণীর হাঁসপাতালের কয়েকটা ঘর দেখিতেছি। বহির্দৃশ্য ত নেহাৎ কদাকার বটেই। পরীক্ষালয়ের কর্ত্তার নাম গ্লে (Gley)। ইনি শারীরতত্ত্ব (ফিজিয়লজি) বিদ্যায় একজন ১ নং ফরাসী বৈজ্ঞানিক। গ্লে বলিতেছেন—"আমরা এখানে ছেলে পিটিয়া মানুষ করি না। লেখাপড়া শেষ করিবার পর যাহারা প্রাণবিজ্ঞানের সীমানা বাড়াইতে চায়, তাহাদের জন্য কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপন করা কলেজ দ' ফ্রান্সের উদ্দেশ্য।" সম্প্রতি দুইজন সুইডেনের ডাক্তার, দুইজন জাপানী অধ্যাপক, কয়েকজন স্পেনের বৈজ্ঞানিক গ্লে'র তত্ত্বাবধানে গবেষণা করিতেছেন।

সমর-মিউজিয়ামের কর্ত্তা ক্যামিল ব্লক (Camille Block) বলিলেন, "যুদ্ধের হিড়িকে পৃথিবীর সকল দেশেই সমর-লাইব্রেরী এবং সমর-মিউজিয়াম স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের সময়ে দুই পক্ষের গবর্ম্মেন্টগুলা ছাপাখানার কাজে যত টাকা খরচ করিযাছে, আব কোন যুদ্ধে তত খবচ করে নাই। প্রথমতঃ নিজ দেশীয় নরনারীকে যুদ্ধের উদ্দেশ্য বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ শত্রুপক্ষের নিন্দা প্রচার করিতে হইয়াছে। তৃতীযতঃ মিত্রশত্রু-রাষ্ট্রের বা উদাসীন রাষ্ট্রের জনগণেব সহানুভূতি সৃষ্টি করিবাব আয়োজন কবিতে হইয়াছে। ফলতঃ ছবি, পুস্তিকা, হ্যাণ্ডবিল, পোষ্টকার্ড, খবরের কাগজ, মাসিক পত্র ইত্যাদির লড়াই অস্ত্রশস্ত্রের ঝন্‌ঝনানি এবং এবোপ্লান সাবমেবিণের গুঁতাগুতি অপেক্ষা কোন হিসাবে কম চলে নাই।

"বাগ্-যুদ্ধের মাত্রা জাপানী লড়াইযেও খুব বেশীই হইবে। কাজেই এখন হইতে বিলাতে, জাপানে, জার্ম্মাণিতে, ইটালীতে, আমেরিকায় সর্ব্বত্রই পুরাণ যুদ্ধে ব্যবহৃত সকল প্রকার সাহিত্য রক্ষিত হইতেছে। ফ্রান্সেও আমরা এই গ্রন্থশালা ও মিউজিয়াম সুরু করিয়াছি।"

দেখিলাম দুনিয়ার সব ঠাঁই হইতে হরেক রকম কেতাব, বুলেটিন বিজ্ঞাপন-পত্র মজুত করা হইতেছে। ইংরেজের বিরুদ্ধে যে সকল নিতান্ত নগণ্য চিরকুট ছাপা হইতেছে, তাহাও বাদ পড়িতেছে না। হাজার হইলেও ইংবেজ যদিও ঘটনাচক্রে মিত্রই বটে, মিউজিয়ামের সংগ্রহালয়ে সবই সাদরে গ্রহণীয়।

প্যারিসে বইয়ের দোকান বেশী, কি মদের দোকান বেশী, গুণিয়া উঠিতে পারিতেছি না। শিল্প-দ্রব্যের ছোট, বড়, মাঝারি দোকান প্রায়ই চোখে পড়ে। নেহাৎ ছোট বইয়ের দোকানে—অতি উঁচুদরের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক কেতাব পাওয়া যায়।

মিউজিয়ামের সংখ্যাও কম নয়। ত্রোকাদেরো (Trocadero) মিউজিয়ামে দেখিতেছি, ফবাসী স্থাপত্যের নমুনা ও নকল। ফ্রান্সের নানা জেলার যে সকল সৌধ ও মূর্ত্তি দর্শনযোগ্য, সেইগুলা এইখানে একসঙ্গে দেখা যায়। এই জন্য মিউজিয়ামের নাম স্কুল্‌তুর কঁপারাতিফ্।

লড়াইয়ের হাঙ্গামায় উত্তর অঞ্চলের যে সকল গির্জা লুপ্ত হইয়াছে, সেইগুলির কোন-

কোন অংশের নকলও ত্রোকাদেরোতে আছে। আর মিউজিয়ামে গোটা ফ্রান্সের শিল্প-পরিচয় পাইলাম। এই পরিচয় লাভ হইল যুগ হিসাবে,—জেলা হিসাবে নয়। ভবনের নাম ম্যিজে দেজ্ আর দোকোরাতিফ্ (Muse'e des arts decoratifs) । বাড়ীটা প্রাসাদতুল্য।

লুভ্র্ (Louvre) মিউজিয়ামের নাম ভারতে অজানা নাই। অন্ততঃ, এখানকার "ভেনুস্" মূর্ত্তির কথা অনেকেই জানে। লুভ্র্ বলিলেই সাধারণ লোকেরা Venus (des Milo) অর্থাৎ মিসে বা মেলস দ্বীপে হঠাৎ প্রাপ্ত ভিনাসের মর্ম্মর-দেহ সমজিয়ে থাকে।

লুভ্রে ইচ্ছা করিলে সারা জীবন কাটানো যায়। এখানকার সংগ্রহ-সম্পৎ এতই বিপুল। শিল্পী সৌন্দর্য্যের তরফ হইতে, অথবা নিজ মন মাফিক কলা-সৃষ্টির মতলবে, এখান হইতে অসংখ্য ইঙ্গিত বহন করিয়া লইতে পারেন। ঐতিহাসিক গোটা দুনিয়া মন্থনের সুযোগ পাইবেন। কথায় বলে, লুভ্রে কোনো ব্যক্তি যদি এক ঘব হইতে আর এক ঘর করিয়া একবার মাত্র হাঁটিয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে অন্ততঃ ছয় ঘণ্টা কাটাইতে হইবে।

লুভ্র্টা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দুর্গ ছিল;—পরে বর্দ্ধিত ও প্রাসাদে পরিণত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে গোটা বাড়ীটা আর প্রাসাদরূপে ব্যবহৃত হয় নাই। কোন-কোন অংশ জনসাধারণের দেখিবার জন্য খুলিয়া দেওয়া হয়। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের সঙ্গে-সঙ্গে গোটা প্রাসাদই মিউজিয়ামে পরিণত করা হয়। আজ যে বাড়ীটা দেখিতেছি, তাহার নবীনতম অংশগুলা তৈয়ারী হইয়াছে ৫০।৬০ বৎসব পূর্ব্বে—তৃতীয় নেপোলিয়ানের আমলে। এখন লুভ্র্ পাড়ায় আসিলে, সেইনের কিনারা হইতে এক বিপুল প্রাসাদ-শ্রেণী দৃষ্টি-গোচর হয়। অপর পারে "অ্যাঁস্তিতিউ"—ভবন।

শীতকালে এফেল (Eiffel) মনুমেন্টেব মাথায় উঠিতে দেয় না। দোতলা পর্য্যন্ত উঠিলাম। কুয়াশায় বেশী কিছু দেখা গেল না। গোটা সহরটা অবশ্য নজরে আসে। উঠিতে হয়, বলা বাহুল্য, বিদ্যুতের গাড়ীতে। মনুমেণ্টটা বিখ্যাত "শাঁ দ' মারস্" নামক এক "গড়ের মাঠের" সীমান্তে অবস্থিত, সেইনের এক সাঁকোর মাথার নিকট। ব্যস্তিয় (Bastille) জেলটা যেখানে ছিল, সেখানে আজকাল এক মনুমেণ্ট বিরাজ করিতেছে। ঐটা কিন্তু প্রথম বিপ্লবের (১৭৮৯) স্মৃতি-চিহ্ন নয়; ইহা ১৮৩০ সালের জুলাই মাসের সাক্ষী। মনুমেণ্টে উঠা যায়। উঁচু যদিও অতি বেশী নয়,—সহরের অনেকটাই একবারে ভাল করিয়া দেখা গেল। প্যারিসের সৌধ-গৌরবের তারিফ করিতেই হইবে।

*ফাল্গুন, ১৩২৮*

# জাপানে সন্তান পালন ও নারী-শিক্ষা

## হরিপ্রভা তাগাতা

জাপানের গ্রামে কয়েক বৎসর থাকার সুযোগ পেয়ে তথাকার গ্রামের অবস্থা সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আভাস, আমার মাতৃভূমি বাংলার গ্রামের বোনেদের কাছে উপস্থিত করছি। এতদ্দ্বারা আমার সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা উর্ব্বরা, অফুরন্ত লক্ষ্মীর ভাণ্ডারপূর্ণ দেশের বোনেরা জাপানের পাহাড়ে পাথরভরা ছোট্ট অতি দরিদ্র দেশের মেয়েদের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করে—স্বীয় উন্নতি শ্রীবৃদ্ধি সাধনের দিকে উদ্যোগী হলে আনন্দিত হব।

জাপানের মায়েদের সন্তান কামনা ও সযত্নে শিশু পালনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেখা যায়। গর্ভবতী হলেই মা সর্ব্বদা চিকিৎসকের গৃহে যেয়ে পরামর্শ লন। গ্রামের কৃষকপত্নীরও এ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান আছে। গ্রামে গৃহেই প্রসব ব্যবস্থা করে এবং শিক্ষিতা ধাত্রী দ্বারা প্রসব করান হয়। শহরে অধিকাংশ মেয়েরা হাসপাতালে যায় এবং এজন্য হাসপাতালে যথেষ্ট ব্যয় হয়। সেখানে হাসপাতালে খরচ দিয়ে থাকতে হয়।

প্রথম সন্তান প্রসব কালে মেয়েরা প্রায় পিত্রালয়ে গমন করে। যুদ্ধ সময়ে অয়েলক্লথের অভাবে টাটকা খড়ের ছাই পুরে, পুরাতন বস্ত্রখণ্ড দ্বারা তোষক করে রাখে— তদুপরি প্রসব ব্যবস্থা করে এবং পরে ময়লাদি সহ ভূমিগর্ভে পুতে দেয়।

আঁতুড় ঘবকে এরা অশুচি মনে করে না। নিজ শয়ন-গৃহে কাঠের পাটাতনের মেজের উপরিস্থিত মোটা মাদুরের ওপর পরিষ্কার তোষক লেপ দিয়ে-প্রসূতি ও শিশুকে রাখা হয। অভিজ্ঞ ধাত্রী সপ্তাহ কাল প্রসূতি ও শিশুর পর্যবেক্ষণ করে।

একমাসান্তে শিশুর ক্ষৌরকার্য সমাধা হলে সসজ্জিত শিশু ক্রোড়ে মা মন্দিরে পুজার্চনা করে দেব আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করেন। প্রথম সন্তান তার মাতাসহ গৃহ হতে তার প্রয়োজনীয় যাবতীয় সামগ্রী—শিশুর শীত গ্রীষ্মেব পরিচ্ছদ বিছানা জুতা খড়ম বাক্স কাপড়কাটা টব বালতি দোলনা ঠেলাগাড়ি খেলা পুতুল—পরে স্কুলের পোষাক ব্যাগ জুতা ছোট সাইকেল ইত্যাদি পেয়ে থাকে। কর্ম্মব্যাপৃতা শ্রমিকগৃহে—ছোট ছেলের দোলনা ও ঠেলাগাড়ি বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে মনে করে। শিশুকে অতি সযত্নে শুইয়ে রেখে মা নিশ্চিন্তভাবে নিজের কার্যে নিযুক্ত থাকে। প্রয়োজন হলে শিশুকে ঠেলাগাড়িতে বসিয়ে ঘাটে মাঠে দোকানে সঙ্গে করে নিয়ে যায়—২।১ মাস গেলেই শিশুকে চওড়া ফিতা দ্বারা মায়ের পীঠের সঙ্গে জড়িয়ে বেঁধে নেয়। শীতে তুলার জামা দিয়ে ঢেকে দেয়। মায়ের পীঠের গরমে লেপেব মত তুলাব জাম্যর নীচে শিশু আরামে গরমে থাকে। পাইখানা প্রস্রাবের জন্য তুলার প্যাড দিয়ে, অয়েলক্লথে প্রস্তুত পাজামা পরিয়ে দেয়, তাতে শিশুর বা মায়ের বস্ত্রাদি অপরিষ্কার হতে পারে না। মাতৃ দেহলগ্ন থাকায় শিশুব অসুবিধা মা সহজেই বুঝিতে পারেন এবং

প্রয়োজন মত তার প্রতিকার করেন। এইভাবে শিশুকাল হতেই নিজ প্রয়োজন প্রকাশ করিবার শিক্ষা হয়।

শিশু আধস্বরে কথা বলতে আরম্ভ করলে, মা অনর্গল তার সঙ্গে কথা বলতে থাকেন। শিশুকে পিঠে বেঁধে মা নিজ কাজ কর্ম্ম করেন, ট্রামে বাসে চলা-ফেরা করেন। পথে চলতে, কার্যকালে, শিশুর সঙ্গে কথা বলে ছড়া শুনিয়ে, গান শিখিয়ে, শিশুর বিবক্তিতে নেচে দুলিয়ে নিত্য নূতন বিষয় শিখিয়ে শিশুর অজস্র প্রশ্নের জবাব দিয়ে মায়েরা চলেছেন—ট্রেনে ট্রামে বাসে এরূপ দৃশ্য সর্ব্বদা দেখা যায়। এতে মায়েদের বিরক্তি নেই। শিশুকে এঁরা মারধর করেন না।

এ দেশে প্রতি বৎসর তৃতীয় মাসের তৃতীয় দিন শিশু কন্যার এবং পঞ্চম মাসের পঞ্চম দিনে পুত্র সন্তানেব পব্ব দিন। শিশু জন্মের প্রথম পর্ব্বদিনে আত্মীয়দের নিকট হতে নানাপ্রকার পুতুল পায়। পাহাড়ের তুষার ববফ গলে যেতে শীতের প্রকোপ কমে আসে, বসন্তের সাড়া পেয়ে পুষ্প বৃক্ষলতা, "মোমো" বৃক্ষগুলির পীচ গাছ—সজীব হয়ে ওঠে। প্রকৃতির সজীবতায় শিশুরা তুলা-ভরা মোটা কিমোনোব বোঝা ছেড়ে ফেলে—হালকা হয়ে—বসন্তের প্রজাপতির মত রং বেরংএর কিমোনো পরে নেচে নেচে ঘুরে বেড়ায়। এই দিনে শিশু "মোমোনো সেক্কু" পর্ব্ব উৎসব সম্পন্ন করে। জন্মের প্রথম সেক্কুতে ও পরে আত্মীয়দের কাছ থেকে পাওযা পুতুলগুলি, সযত্নে তুলে বেখে দেয়, এই দিনে সেই পুতুলগুলি বের করে বাক্স বেঞ্চেব গ্যালাবী করে সুন্দর আস্তরণ ঢেকে, তার ওপর সুন্দর পবিচ্ছদে সজ্জিতা রাজা বাণী বুড়বুড়ি ছেলে মেয়ে নানা রং-এর নানা ঢং-এব পুতুলগুলি সাজিয়ে রাখে—সামনে ফুল বাতি আহার্য, ভাত পীঠা ফল সাজিয়ে দেয়। শিশুগণ তার ছোট বন্ধুদের ডেকে আমোদ ও আহ্বাব করে বাড়ি বাড়ি নিমন্ত্রণ খেয়ে বেড়ায়। মা শিশুদের সব ব্যবস্থা কবে দেন। উৎসব শেষে পুতুলগুলি সযত্নে তুলে রাখে, বৎসরান্তে আবার তাদেব উৎসবের সময় বার করে। পুতুল ভেঙ্গে গেলে, অপরিষ্কার হলে, ঠিক মত সাজান না হলে শিশুর নিন্দা হয়। এজন্য ছোট শিশুরাও সাবধানতা সহকারে তাদের সুন্দর পুতুলগুলি নাড়াচাড়া কবে। এদ্দ্বারা শৈশবকাল হতেই তাদের মাতৃত্ব ফুটিয়ে তোলা হয়।

পঞ্চম মাসেব পঞ্চম দিনে ছেলেদেব উৎসবে তারা বীব সেনা ঘোড়ার পুতুল পায়, আব কাপড়ে তৈরি খুব বড কৈ মাছ প্রাঙ্গণের গাছে কিংবা ছাদে বাঁশ দিয়ে উচ্চে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়। পুত্র সন্তান গৃহে এসেছে—সকলে আনন্দ জ্ঞাপন করে।

৩।৪ বৎসর বয়সে ছেলে মেয়ে শিশু স্কুলে যায। সেখানে শিক্ষয়িত্রীব তত্ত্বাবধানে খেলাধূলা, নাচ-গান, ছবিআঁকা, কাদা-মাটির পুতুল, বাগান পাহাড নদী গড়ে সারাদিন—প্রাতে ৯টা থেকে ৩টা পর্যান্ত কাটায়। মধ্যাহ্নাহাবেব ভাত বাক্স করে নিয়ে যায—স্কুলে ঝোল ব্যঞ্জনাদি মিষ্টদ্রব্য পায।

সপ্তম বৎসর বয়সে এপ্রিলে ছেলেমেয়ে প্রাথমিক স্কুলে ভর্ত্তি হয়। এই স্কুলে বিনাখরচে ৬ বৎসবকাল অধ্যয়ন কবতে জাপানের সব ছেলেমেয়ে বাধ্য। নূতন পোষাক জুতা ব্যাগ বই নিয়ে ছেলেমেয়ে ব্যাগটি পিঠে ঝুলিয়ে, মাব সঙ্গে মহাস্ফূর্ত্তিতে স্কুলে যেয়ে ভর্ত্তি হয়। এই দিনটি এদের বিশেষ দিন বলে—এতদিন প্রতীক্ষায কাটিয়েছে।

স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণ ছেলে-মেয়েদের কখনও মারধর করে না। স্কুলে ঝাড়ুদার দ্বারবান রাখা হয় না, ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকগণ পর্যায়ক্রমে যাবতীয় কাজ করে। বিদ্যালয়ে শৈশব হতেই রন্ধন সেলাই এবং সেরা কাজ শেখানো হয়। পাঠ্যাবস্থায়—কলেজে পড়লেও—ছাত্রছাত্রীগণ মাথায় চুলের বাহার করে না, ছাত্রগণ স্কুল কলেজে ও সৈন্য শিক্ষালয় পর্যন্ত চুলগুলি ছোট করে কাটে; ছাত্রীগণ ছোট চুল কোন প্রকার বিলাসহীন ভাবে বাঁধে। অধ্যয়ন শেষ হলে চুলের যত্ন করে—তৎপূর্বে নয়।

ছেলেমেয়ে একত্রে অধ্যয়ন ও খেলাধূলা করে, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণ ছাত্র-ছাত্রীদের পাহাড়ে সমুদ্রে তীর্থে কলকারখানাদি দ্রষ্টব্য স্থানে বেড়াতে নিয়ে যান; জুলাই আগস্ট মাসে নদী ও সমুদ্রে সাঁতার শেখানো হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন শেষ হলে উচ্চ শিক্ষা ও কৃষি শিল্প-শিক্ষার্থ গমন করে। অনেকে কলকারখানায় উচ্চ শিক্ষা বা অর্থোপার্জনার্থ গমন করে। মেয়েদের জন্য ভিন্ন উচ্চ শিক্ষালয় আছে।

জাপানী মেয়েদের সূচী-বিদ্যা শিক্ষা বিশেষ প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শেষ হলে কয়েক বৎসর সূচী-শিল্প শিক্ষা করতে হয়। জাপানী পরিচ্ছদ হাতে সেলাই করতে হয়। পরিপাটি পরিচ্ছদ প্রস্তুতি না শিখলে মেয়েদের সম্ভ্রান্ত সমাজে বিবাহ হয় না ও চলতেও অক্ষম হয়। এজন্য মেয়েরা সূচী শিক্ষালয়ে প্রতিদিন প্রাতে ৮টা হতে সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত একাসনে উপবিষ্ট হয়ে সূচী শিক্ষা লাভ করে। মধ্যাহ্ন ভোজনের ভাত বাড়ি থেকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে—শিক্ষালয়ে বসেই তা খেয়ে নেয।

বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য পরিচ্ছদের প্রচলন হওয়ায় দরজির কাজ শিক্ষা বিশেষ প্রযোজন বোধে, সকলেই সেলাইয়ের কল, ইলেকট্রিক ইস্ত্রি কেনে ও দবজির কাজ শিখে, পরিপাটিভাবে পোষাক পরিচ্ছদ প্রস্তুত ও বিক্রয় করে। এদের প্রতি গৃহে সেলাইয়েব কল ক্রয় করে।

সম্পন্ন গৃহে ফুল সাজান এবং "ওচা" (সবুজ পাতায প্রস্তুত) প্রস্তুতি শিক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয়। সূচী-শিল্প, ফুলসাজান এবং 'ওচা' শিক্ষা এই তিন কাজে জাপানী মেয়েদের যাবতীয় গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। পরিপাটি—পরিচ্ছদ পরিধান, নিখুঁত দৃষ্টিতে গৃহ সৌন্দর্য সাধনার্থ ফুল সাজান এবং অতিথিকে "ওচা" পরিবেশন—এই তিন কাজের ভেতর মেয়েদের বিশেষতঃ প্রকাশ পায়।

জাপানী গৃহে ফুল সকলেই ভালবাসে। গৃহ-দেবতার পূজার স্থানে ২।৪টি ফুল পাতার গুচ্ছ সাজানর ভেতর এদের সৌন্দর্যবোধ, গৃহকোণের ফুল পাতার ডালাটি ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। সম্মুখস্থ ছোট্ট প্রাঙ্গণে বৎসরের যাবতীয় ফুল একটির পর একটি ফুটে উঠেছে। ফুলেব সৌন্দর্যপ্রিয়তায় জাপানের দোকানভর্ত্তি ফুল পাতা তোড়া গুচ্ছ বিক্রয় হয়।

ফুল পাতা সহ গাছের ডালটির, ফুল পাতাগুলি নুইয়ে কেটে—একাসনে একদৃষ্টিতে বসে সাজান শিখে ঘবে সাজায় ও দোকানে বিক্রয় করে।

'ওচা' পরিবেশন ওচা পান পদ্ধতি শিক্ষায়।—এদের ওঠা বসা-চলা অঙ্গুলি

পরিচালনের মধ্য দিয়ে ধীরতা নিষ্ঠা অধ্যবসায় সহিষ্ণুতা ইত্যাদি সব গুণগুলিকে ফুটিয়ে তোলে।

আসবাবহীন গৃহ কোণের দেওয়ালে কয়েকটি কালীর আঁচড়টানা একখানি ছবি—তাঁর নীচে এককোণে অর্ধ শুষ্ক ছোট আঁকা বাঁকা ডালটিতে আধ ফোটা ২।৪টি ফুল ও পাতা,—মাদুর মোড়া গৃহ প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থানে আসনে উপবিষ্ট সুবেশী অতিথির পরিচর্যায় রতা, সুসজ্জিতা তরুণী—ধীর পদক্ষেপে, ওচাপাত্র হস্তে এগিয়ে আসছে—ধীরে অতি ধরে—অতিথিব সম্মুখে ভূমিষ্ট হয়ে অভিবাদনান্তে ওচা পরিবেশন করে ফিরে দ্বার রুদ্ধ করে চলে গেল, আর অতিথি সুন্দরীর প্রতি দৃক্‌পাত না করে অভিবাদান্তে 'ওচা' পাত্র গ্রহণ করে ওষ্ঠে ছুঁইয়ে দিল।

এই ওচা পদ্ধতি পুরাকাল হতে প্রচলিত। জাপানের সামুরাই যোদ্ধাগণ দেশরক্ষা ও যুদ্ধাদির জন্য নির্জন গৃহে গভীর মন্ত্রণায় নিমগ্ন থাকাকালে, তাদের চিন্তা ও কার্যে বিঘ্ন না ঘটিয়ে পরিচারক পরিচারিকাগণ এইভাবে ওচা পরিবেশন করত।

উচ্চ শিক্ষালয়ে বিশেযভাবে মার্জিত ভদ্রভাযায়, বিনম্র মিহিসুরে কথা বলতে শিক্ষা দেওযা হয। সম্ভ্রান্ত গৃহের মেয়েরা অপরিচিতের বা অতিথির সঙ্গে বাক্যালাপে মার্জিত ভাষা ব্যবহার করে এবং কণ্ঠস্বর বদলিয়ে মিহিস্বরে কথা বলে। সাধারণ কথার ভাষা এবং এই মার্জিত ভাষা বিভিন্ন—আদব কায়দাও শৈশব হতে বিশেষ ভাবে শিখতে হয়।

প্রথম সাক্ষাতে অভিবাদন, কুশল প্রশ্নোত্তর, ধন্যবাদ জ্ঞাপন; অযথা বিরক্ত করার জন্য ত্রুটি স্বীকার ও ক্ষমাভিক্ষা এবং তদুত্তরে অপর পক্ষ আনন্দ জ্ঞাপন ইত্যাদি বহুবাক্য বিনিময়েব সঙ্গে পুনঃ পুনঃ উভয়কেই মস্তক অবনত করা রীতি। প্রাতে মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে রাত্রিতে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন, কেহ বহির্গমনকালে ও পুনরাগমনে, বিদায়কালে বাক্য বিনিময় ও প্রতি বিষয়ে ক্ষমাভিক্ষা ও ধন্যবাদ মুখে লেগেই আছে। দাসদাসীকেও আদেশব্যঞ্জক কথা বলে না ও ধন্যবাদ জানাতে হয়। এদেশে গালাগালির প্রচলন নাই। বোকা ও পাগল এই দুটি কথা গালাগালিতে ব্যবহাব করে। ক্রোধে এঁরা কাঁদে না বা ক্রোধ প্রকাশক বহুকথা বলে না। রক্তবর্ণ মুখ ও ব্যবহারে এদের ক্রোধ প্রকাশ পায়। অতি ক্রুদ্ধ ব্যক্তিও অন্য লোকের সম্মুখীন হইলে তাহার ভাব ভাষা কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ বদলিয়ে ফেলে। এ জন্য অত্যল্পকালে এদেশীয়দের প্রকৃত মনোভাব ও ব্যবহার বোঝা কঠিন।

সুশিক্ষিতা সুবিনীতা মধুরস্বভাবা জাপানের মহিলা প্রাচ্যের প্রতীক স্বরূপা। তাদের বাক্যে ব্যবহারে পদক্ষেপে নারীত্ব ও নম্রতা ফুটে ওঠে।

এই মাধুর্যময়ী গ্রাম্য বালিকাও সভাসমিতি প্রকাশ্য স্থানে জীবন্ত প্রাঞ্জল ভাযায় বক্তৃতা করে, সাইকেলে চড়ে বহুদূর পথ গমনাগমন করে। পুরুষের সঙ্গে সমভাবে চলে—ট্রামে বাসে চলা ফেরা করে এবং চালক ও কণ্ডাক্টারেব কাজ কবে। কারখানায় অফিসে হাসপাতালে ষ্টেশনে দোকানে হোটেলে, কৃষিক্ষেত্রে, সমুদ্রে মাছধরা প্রভৃতি সমস্ত কাজ এরা করে, অথচ কৃষকপত্নী কৃযকমাতা জেলেনী সকলেই লেখা পড়া শেখে, দৈনিক কাগজ পড়ে।

ছেলেমেয়েদের শৈশবেই ছোট সাইকেল কিনে দেওয়া হয়। ছেলে ও মেয়ে সকলেই সাইকেল চালাতে শেখে। মেয়েরা দূর পথ সাইকেলে চলাফেরা করে। মেয়েদের কোন প্রকার অবরোধ প্রথা নাই। গৃহের ভাইবোনের মত শৈশবকাল হতে একত্রে অধ্যয়ন, খেলাধূলা করে, স্বল্প পরিচ্ছদে একত্রে নদী ও সমুদ্রে সাঁতার শেখে, পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে কোনরূপ দ্বিধা-সঙ্কোচের ভাব এরা মনে আনার সুযোগ পায় না—সহজ ও সকল ভাবে শৈশব কাল হতে মিশতে অভ্যস্ত হয়। ছেলেদের সঙ্গে এ ভাবে মেলামেশা খেলাধূলা করায় মেয়েরা ছেলেদের মতই সবল ও পরিশ্রমী হয়। পুরুষের সাহায্য ছাড়াই তারা অনেক পরিশ্রমের কাজ করতে সক্ষম হয়। মেয়েরা সকল অবস্থায় নিজেকে রক্ষা করতে পারে এবং পুরুষ মেয়েদের ওপর কোন প্রকার পাশবিক অত্যাচারের সাহস পায় না। প্রয়োজনবোধে শান্ত নম্রপ্রকৃতির মেয়েরা ক্ষিপ্তা সিংহীর মত বিক্রমশালিনী হতে দেখা যায়—তারা উদ্দীপ্ত তেজে স্বাধীন জীবিকার্জ্জন করে চলতে সক্ষম হয়।

স্বীয় উন্নতি প্রচেষ্টায় জাপানবাসী সমানে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করে আসছে—অন্যান্য অনুকরণের সঙ্গে তাদের পরিচ্ছদ চালচলন অনেক বদলিয়ে ফেলেছে। কিন্তু বর্ত্তমানে পরাজিত জাপানের মেয়েরা পাশ্চাত্যের সম্পূর্ণ অনুকরণে ব্যস্ত। এতদিন তাদের ঘাড় পর্য্যন্ত ছোট কাল চুল (বব্‌হেয়ার) ইলেকট্রিক কলে কুঁক্‌ড়িয়ে নিত কেবল—এক্ষণে রাসায়নিক ঔষধে কটা করে নিচ্ছে। এখন মেয়েদের নম্রতা ব্যাঞ্জক চালচলন পদক্ষেপ ও ভাব বদলিয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা দমাবার জন্য যুদ্ধপ্রিয় বীরের পূজা বন্ধ করার চেষ্টায় "ওমিয়া" দেবস্থান বনাকীর্ণ এখন।—এখন শহরে শহরতলীতে বায়স্কোপ থিয়েটার হলের সঙ্গে (dance hall) নাচ ঘর হচ্ছে আর ছেলেদের একত্রে dance করছে, আমোদ করছে—এখন তারা মার্কিন অনুকরণে মার্কিন অভিরুচিতে গঠিত হচ্ছে।

## জাপানের নারী

জাপানে অধিকাংশ স্থলে ঘটকের মধ্যস্থতায় বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়। পাত্র পাত্রীর মনোনীত সম্বন্ধও প্রায়ই ঘটক ঘটকী দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। ২০ বৎসরের নিম্নে মেয়েদের বিবাহ হতে দেখা যায় না। ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পিতামাতার উপর নির্ভর করে এবং ঘটকের মধ্যস্থতায় চলে। বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হলে বাগদান অনুষ্ঠানের পর পাত্র পাত্রী পরস্পর ঘনিষ্ঠতা করে। বিবাহের পূর্ব্বে কনে একদিন কুমারী খোঁপা বেঁধে আত্মীয়গণসহ আহারাদি ও আমোদ প্রমোদ করে। জাপানের মেয়েরা আজকাল মাথার লম্বা চুল কেটে ফেলেছে—এখন তাদের ঘাড় পর্য্যন্ত ছোট চুল ইলেকট্রিকে কুঁকড়িয়ে নেয়—পাশ্চাত্য ধরনে বাঁধে। কিন্তু বিবাহ কালে এই ঘাড় পর্য্যন্ত কালো ছোট চুলে আবো কালী দিয়ে কাল করে পর-চুল দিয়ে বড় জাপানী খোঁপা বাঁধে, তাতে ফুল কাঁটা ইত্যাদি গুঁজে চওড়া ফিতার মত একটুকরা কাপড় চড়িয়ে দেয়। মুখে সাদা রং, ঠোঁটে লাল, গালে গোলাপী, চোখের কোণে কাজল কালী দিয়ে—পটের ছবির মত কনে সাজান হয়, গাঢ় রং এর কিমোনো পায়ে লুটিয়ে পড়ে, কোমরে সোনালী রূপালী কাজ করা মূল্যবান চওড়া

ফিতা জড়িয়ে, পেছনে বড় করে ফাঁস দিয়ে দেয়। সুসজ্জিতা কনে ঘটক ঘটকী ও কন্যা কর্ত্তা সহ ধীর পদক্ষেপে নতনেত্রে, কনে-সাজান-দাসীর নির্দেশ মত তাহার সঙ্গে শ্বশুর গৃহে গমন করে। বধূ আগমনে প্রতিবেশীগণ হর্ষধ্বনি করে বিস্কুট, কমলা লেবু ছুড়িয়ে দেয়, পাড়ার ছেলেমেয়েরা মহানন্দে কুড়িয়ে খায়। বধূ গৃহদেবতাকে প্রণামান্তর অভ্যাগতগণের সম্মুখে বরের পার্শ্বে শ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ্ট হযে সকলেব সঙ্গে 'সাকে'—জাপানী মদ পান করে। কনে পিত্রালয হতে তাব পোযাক পরিচ্ছদ শয্যা আসবাব গৃহ সামগ্রী নিয়ে আসে। বধূ পিত্রালয় হতে যা আনে তাহা তার নিজস্ব। জামাতাকে কোন উপঢৌকন দেওয়া হয় না।

দরিদ্র পিতামাতার কন্যা বিবাহের পূর্ব্বে নিজের উপার্জিত অর্থে বিবাহসজ্জা প্রস্তুত কবে পিতামাতার সাহায্য কবে থাকে এবং পাঠ্যাবস্থা শেষ হলেই অর্থোপার্জন করে।

শ্বশুরালয়ে বধূকে শ্বশুর শাশুড়ীর মনোমত হয়ে চলতে হয়। তার অন্যথায় শাশুড়ী ননদের গঞ্জনা ভোগ এদেশেও আছে। পিতামাতার মনঃপূত না হলে, স্বামী অনায়াসে স্ত্রী ত্যাগ করতে কুণ্ঠিত হয় না। বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথা এখানে প্রচলিত আছে, বিচ্ছেদ হলে স্ত্রী তার দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে চলিয়া যায় এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই পুনর্ব্বিবাহ করতে পারে।

বিবাহের পব জ্যেষ্ঠপুত্র বা জ্যেষ্ঠের অনভিপ্রায়ে একপুত্র পিতামাতার নিকট একত্র বসবাস করে এবং পিতামাতার বৃদ্ধাবস্থায় তাঁদের তত্ত্বাবধান এবং ভাইভগ্নীর প্রতি যথা কর্ত্তব্য পালন করে। অন্যান্য সন্তান বিবাহেব পব ভিন্ন বাস করে। পিতা যথোচিত সাহায্য ও ব্যবস্থা করে দেন। কন্যা-সন্তান বিবাহান্তে শ্বশুরালয়ে যায়, অপুত্রক পিতার কন্যাকে ঘর জামাই বিবাহ দেয় ও জামাতা স্বীয় পদবী ত্যাগ করে কন্যার পদবী গ্রহণ কবে পুত্রস্থানীয় হয়।

এখানে স্ত্রীকে স্বামীর অনুগত হয়ে চলতে হয়। দুর্নীতিপরায়ণ অসচ্চরিত্র স্বামীরও সকল অত্যাচার স্ত্রী নীরবে সহ্য কবে এবং স্বামীর শাসন মেনে চলে। এদেশের স্বামী স্ত্রীকে দাসীবৎ জ্ঞান করে অথচ স্ত্রী স্বামীকে গুরুর ন্যায় শ্রেষ্ঠত্ব দান কবে। সাধ্বী স্ত্রী অসৎ প্রকৃতি স্বামীর পরিবর্ত্তন প্রতীক্ষায় স্বামীর মনোস্তুষ্টি সাধনের চেষ্টা করে। স্বামীর প্রতি সুমধুর নম্রব্যবহার স্বামী সেবায় মেয়েদের একনিষ্ঠ চেষ্টা দেখা যায়। গৃহের যাবতীয় কার্য-- সন্তানপালন, বাজাব, দোকান, প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় ইত্যাদি সকল কাজ মেয়েরাই করে। এ সকল কার্যে পুরুষ মাথা ঘামায় না। স্বামী কর্ম্মক্ষেত্রে যাত্রাকালে তাব পরিচ্ছদ ঠিক ভাবে গুছিয়ে দিয়ে, পোষাক পবিধানে সাহায্য কবে, যাত্রাকালে হাঁটু গেড়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে অভিবাদনান্তে "যেয়ে ঘুবে এসো" বলে বিদায় দেন। সন্তান পবিজন গৃহের বাহিরে যাত্রা কালে "বাইরে যাচ্ছি" বলে যায়, আব মা "যেয়ে ফিরে এসো" বলেন।

স্বামী স্ত্রী এক সঙ্গে ট্রামে বাসে চলার পথে স্ত্রী সন্তানকে পীঠে বেঁধে, বড়টির হাত ধরে সঙ্গে একটি পুট্‌লীও নিয়ে চলেন—আব স্বামী তার অফিস ব্যাগটি হাতে, ট্রামে উঠে বসে পড়লেন—স্ত্রী বসার স্থানাভাবে সামনে দাঁড়িয়ে বইল—এই দৃশ্য জাপানে সর্ব্বত্র দেখা যায়। এতে পুরুষ কোন দ্বিধা বোধ করে না। বৃদ্ধ বৃদ্ধা ও অশক্ত মহিলাও পৃষ্ঠে অতিরিক্ত বোঝা ব্যতীত পুরুষ মহিলাকে বসার স্থান ছেড়ে দেয় না।

স্ত্রীর সহিত আমোদ প্রমোদ, স্ত্রীর প্রতি ভালবাসার বাহ্যিক নিদর্শন প্রদর্শন অথবা স্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন এদেশীয় পুরুষের দেখা যায় না। স্ত্রী গৃহকর্ত্রী সন্তানের জননী, স্বামীর কাজকর্ম্মে সুখ সুবিধায় সাহায্যকারিণী। গৃহ সংসারের সকল ভার স্ত্রীর হাতে। সন্তানদের শিক্ষার ভারও স্ত্রীর ওপর। পুরুষ দেশরক্ষা ও অর্থোপার্জনে নিয়োজিত, মা সন্তানদের গড়ে তুলে দেশের জন্য অর্থোপার্জনে উপযুক্ত করে দেবেন, প্রয়োজন হলে নিজেও অর্থোপার্জন করবেন।

স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত স্বামীও স্ত্রীর প্রতি অনুরাগের কোন নিদর্শন প্রকাশ করাকে নিজের অসম্মানজনক বলে মনে করে। বাহ্যিক যে-কোনও ব্যবহারেও স্ত্রী স্বামীর মনোভাব জানে এবং এ দেশীয় প্রথা বলেই কোনরূপ ক্ষুব্ধ হয় না। স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে উভয়েই পুনর্বিবাহ করতে পারে। কিন্তু বুদ্ধিমতী স্ত্রী শান্তভাবে সকল অবস্থাতেই স্বীয় ভাগ্য পরীক্ষায় চলে। জাপানের মেয়েরা অত্যন্ত চাপা এবং সহিষ্ণু। স্বীয় দুঃখ ব্যথা সহজে প্রকাশ করে না—এদের মুখে বিনম্র হাসি সব অবস্থাতেই দেখা যায়—আনন্দে সুখে সম্পদে এরা হাসে, দুঃখ বিপদ শোকেও এরা হাসে, রাগেও হাসে—বুকভাঙ্গা ব্যথা হাসির আড়ালে ঢেকে রাখে।

এদেশে পুরুষ প্রায় "মেকাফে" রক্ষিতা স্ত্রী রাখে এবং তা দোষণীয় মনে করে না। এদেশের "গেইযা" নর্ত্তকী স্ত্রীলোক শিক্ষিতা ও সুমার্জিতা হয়, বুদ্ধিমান ধনশালী ব্যক্তি, শুধু আমোদ স্ফূর্ত্তির জন্য এদের সঙ্গলাভে কাটায় না, অনেক মন্ত্রণা বুদ্ধি জটিল প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা করে। এজন্য 'গেইযা'দের বিশেষ শিক্ষাচর্চার প্রয়োজন হয়। আসর নিমন্ত্রণাদিতে 'গেইযা' বালিকা পরিবেশন ও নাচ গান করে সকলের মনোরঞ্জন করে।

মেকাফে গেইযা লালসাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিমায় পুরুষকে আকর্ষণ করে আর স্ত্রী করুণ নত দৃষ্টিতে হাসিমুখে স্বামীর অনুগমন করে। মেকাফে ও গেইযা বালিকা বিবাহাদি করে সমাজে চল্‌তে পারে তাহাতে কোনও বাধা নাই।

জাপানবাসীর দেশপ্রিয়তায়—দেশের জন্যই তাদের গৌরব ও জীবন মনে করে। সন্তানদের সেইভাবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। পুত্র, দেশের জন্য জীবন দান করতে শিক্ষা পায় আর কন্যা উপযুক্ত পুত্রের মাতৃত্ব পদপ্রাপ্ত হবে এই তাদের লক্ষ্য এবং সে ভাবে গঠিত হয়। দেশের জন্য জীবন দানে যাত্রাকালে—মা বোন স্ত্রী কখনও বিচলিত হন না বা অশ্রুমোচন করেন না। বৃদ্ধা মাতা বলেন, দেশের সন্তান দেশের কাজে চলেছেন—সন্তান প্রতিপালনের ভার ন্যস্ত ছিল মাত্র তাঁর ওপর। স্ত্রী বলেন দেশের কাজে যাও—স্বামীর সন্তান প্রতিপালন করে স্বামীর নাম রাখার ভার তাঁর ওপর।

এ দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত। গ্রামে গ্রামে বড় বুদ্ধ মন্দির "ওখেরা"য় শিক্ষিত পুরোহিত পূজাদি করেন—গ্রামবাসীর ক্রিয়াকর্ম্ম সমাধা করেন। মন্দির পার্শ্বেই তাঁর বাসস্থান। মন্দিরের বৃহৎ পরিষ্কার সুন্দর সুদৃশ্য প্রকোষ্ঠে গ্রামবাসী সম্মিলিত হয়ে পূজার্চ্চনায় যোগ দেন। প্রতি গৃহে বুদ্ধ গৃহদেবতা অধিষ্ঠিত। ভক্তিভাবে সকলেই পূজোপাসনা করে।

জাপানে মৃত বীর আত্মার পূজা প্রচলিত। দেশের মঙ্গলার্থ এই সকল আত্মা ও অন্যান্য

বহু দেবতা পূজিত হয়। পূজা স্থান "ওমিযা"! প্রতি গ্রামে শহরে সমুদ্র তীরে নদী গিরি বন উপত্যকা পার্শ্বে বৃহৎ দ্বাবসংলগ্ন বড় বড় বৃক্ষ ঘেরা ঝবণা পুষ্করিণী সম্বলিত উন্মুক্ত বৃহৎ প্রাঙ্গণ ঘেরা এই 'ওমিয়াতে' দেবস্থানে অদৃশ্য দেবতাব নিকট দেশের মঙ্গলের জন্য আত্মীয় জনের মঙ্গলার্থ প্রার্থনা জানায় উৎসবাদি করে। গ্রামেব মেযেবা পর্য্যায়ক্রমে এই প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করে।

*ফাল্গুন,* ১৩৫৬

# হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে খেয়ালের স্থান

## অমিয়নাথ সান্যাল

আজকাল উত্তর ভারতীয় হিন্দুস্থানী সঙ্গীতবিৎগণের অধিকাংশই খেয়াল গায়ক এবং খেয়াল গান করিয়াই কৃতিত্ব লাভ করিতেছেন। খেয়াল ও ধ্রুপদের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, খেয়াল গায়ক ধ্রুপদ গায়কের সংখ্যার প্রায় দশ গুণ। ইহাও আবার প্রথম শ্রেণীর গায়কদের কথা; সুতরাং সাধারণ গায়কদের মধ্যে খেয়াল গায়কের সংখ্যা আরও বেশি হইবার কথা। সাধারণ গায়কদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, প্রথম শ্রেণীর খেয়াল গায়কদের সংখ্যা পঞ্চাশ-ষাট জনের কম হইবে না। তার মধ্যে আল্লাদিয়া খাঁ, আবদুল করিম, ফেয়াজ খাঁ, নাসির খাঁ, বদল খাঁ, মুস্তাফ্ হোসেন, গোফুর খাঁ, মজাফর খাঁ, রাজা ভাইয়া প্রভৃতি ধুবন্ধর খেয়াল গায়ক এখনও বর্ত্তমান। ইহা ব্যতীত, স্বনামধন্য পণ্ডিত ভাতখণ্ডেব কলেজ হইতে বৃত্তিলব্ধ আরও 'পাঁচ-সাতজনের নাম করা যাইতে পারে, যাঁহারা এখনও তরুণ, এবং শীঘ্রই যে তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর গায়ক হইবেন, এরূপ প্রতিভা তাঁহাদের আছে। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বাইজী শ্রেণীর মধ্যেও প্রথম শ্রেণীর খেয়াল গায়িকাও অনেক আছেন; কিন্তু নিখিল-ভারতীয় সঙ্গীত-সম্মেলনে তাঁহাদেব এখনও প্রবেশ অধিকার জন্মে নাই; এবং তাঁহারা পুরুষ গায়কদের সমকক্ষ ও সমান আসনের অধিকারী কি না—এ প্রশ্নেরও মীমাংসা হয় নাই।

উল্লিখিত খেয়াল গায়কদের গান,-- presentation, (বা যাহাকে গায়কী বলা হইয়া থাকে)—যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারাই খেয়াল গানের বিশিষ্টতা ও মনোহারিত্ব এই দুই গুণের পরিচয় পাইয়াছেন।

খেয়ালের সৃষ্টি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সত্যাসত্য নির্ধারণ করিবার উপায় না থাকিলেও যে সকল কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তাহা অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। সমস্ত বাদ দিলেও মূল সত্যটুকু রহিয়া যায়। তাহা চিরন্তন এবং সর্ব্বপ্রকার চারুশিল্পকলার ক্রমবিকাশ ও বৈচিত্র্যের ইতিহাস। তাহা এই—মানুষের মন সর্ব্বদাই নূতন সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পাইতেছে; এবং পৃথিবীতে একটি ভাল জিনিস, একটি সুন্দর জিনিস আছে বলিয়া যে আরও দশটি ভাল ও সুন্দর জিনিস হইবে না, ইহা ব্যবহারিক ও চরম, দুই প্রকার সত্যেরই বাহিরে।

যদিও দুই তিন প্রকারের কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে একটা সাধারণ ও সহজ সারাংশ গ্রহণ করিলে, নিম্নলিখিত প্রকারের ঘটনা কল্পনা করা যায়; এবং তাহাকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে আপত্তি থাকিলেও, সম্ভব বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠা হওয়া উচিত নহে।

আকবর বাদশাহের পরবর্ত্তী কোনও সময়ে সদারঙ্গ নামক জনৈক প্রসিদ্ধ গায়ক মহম্মদ শাহ নামক কোনও বাদশাহের সভার গায়ক ছিলেন। ইনি তানসেনের দৌহিত্র-বংশের লোক; এবং ইঁহার পৈত্রিক নাম স্যামৎ খাঁ ছিল। শুনা যায় যে, ইঁহার পিতৃপুরুষগণ বীণাবাদক ছিলেন এবং দরবারে বসিয়া ধ্রুপদ গানের সঙ্গে বীণা বাজাইতেন। পরে ঐ প্রকার রীতি ইঁহারা অপমানসূচক বোধ করিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং স্বাধীন ভাবে সঙ্গীত-চর্চা করিতেন। সুতরাং সদারঙ্গ Reactionary school-এর লোক ছিলেন বুঝা যায়। তিনি ধ্রুপদ গান করিতেন এবং ধ্রুপদ রচনাও করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দুইজন তরুণ ইতরজাতীয় পরিচারক ছিল। সদারঙ্গ তৎকালীন ধ্রুপদের রাগ-রাগিণী অবলম্বন করিয়া এবং স্বীয় প্রতিভা ও কল্পনা-শক্তির সাহায্য লইয়া অভিনব সঙ্গীত রচনা ও তাহারই উপযোগী অভিনব প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া তাহার পরিচারকদিগকে শিক্ষাদান করেন। ইহারা কথঞ্চিৎ পটু হইলে সদারঙ্গ ইহাদিগকে রাজ দরবারে পেশ করেন, এবং ইহাদের অভিনব সঙ্গীত দরবারে উপস্থিত সভাসদদিগকে শুনান হয়। দরবারে বোধ হয় গোঁড়া সমজ্‌দার অপেক্ষা উদারপন্থী শ্রোতার সংখ্যা বেশি ছিল। তজ্জন্য এই তরুণ গায়কদের কণ্ঠনিঃসৃত অভিনব সঙ্গীত অনেকেরই চিত্তাকর্ষণ করে। ফলে, এই শ্রেণীর সংগীতের উত্তরোত্তর অনুশীলন, শ্রীবৃদ্ধি ও মর্যাদা লাভ হইতে থাকে। সদারঙ্গ ধ্রুপদ গায়ক হইয়াও যে এই প্রকার পাগলামির সৃষ্টি করেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধ্রুপদের গোঁড়াদিগের মুখে নানা প্রকার টিটকারী সহ্য করিতে হইয়াছিল, ইহাও কথিত আছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঠুংরীর সৃষ্টিকর্ত্তাকেও এই প্রকার ব্যবহার সহ্য করিতে হইয়াছে। ইহা ঠুংরীর ইতিহাস আলোচনার সময় জানা যাইবে।

যাহাই হউক, ক্রমে ইহার নূতনত্ব ও চমৎকারিত্ব সঙ্গীতামোদীদিগকে এতই মুগ্ধ করিয়াছিল যে, ঐ প্রকার রচনা, গীত-প্রণালী বা ঢং প্রচলিত হইয়া যায়। এমন কি, মহম্মদ শাহ্ স্বয়ং অনেকগুলি খেয়াল রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা এখনও গায়কেরা গাহিয়া থাকে।

কিংবদন্তীগুলি নানাপ্রকার কাল্পনিক ও অসঙ্গত ঘটনার শাখা-পল্লব দ্বারা বেষ্টিত বলিয়া এবং অতিরঞ্জন ও আড়ম্বর বহুল বলিয়া তাহাদের উল্লেখ প্রশস্ত বলিয়া বোধ হইল না। যে অংশ সত্য বলিয়া বোধ হইয়াছে তাহাই বলা হইয়াছে। অবশ্য ইহা দেখা যায় যে, একটা প্রাচীন ঘটনা বা কিংবদন্তী অসম্ভব কল্পনামূলক বা অদ্ভুত হইলেও, লোকে বিশ্বাস করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। সেই প্রকার ঘটনা লিখিয়া লাভও নাই, সময়ও নাই।

সদারঙ্গের পরে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম পাওয়া যায় না। সদারঙ্গ ও মহম্মদ শাহ রচিত ন্যূনাধিক আড়াই শত খেয়াল প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই 'বধাওবা" বা উৎসবাদির জন্য মাঙ্গলিক গান; কতকগুলি নায়ক-নায়িকা-ভাব অবলম্বন করিয়া রচিত, এবং কতকগুলি মিশ্র অর্থাৎ নায়কাদির ভাব ও প্রকৃতি-বর্ণনা দুইই আছে; অতি অল্প সংখ্যক ঈশ্বর বিষয়ক প্রার্থনার গানও আছে। উল্লেখযোগ্য এই যে, মহম্মদ শাহ রচিত কতকগুলি গানে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাদির বর্ণনা আছে।

তানসেনী যুগের ধ্রুপদ ধামার প্রভৃতির রচনাগুলি পাঠ করিলে প্রথমেই এই মনে হয়

যে, ভাগ্যক্রমে আকবরের ন্যায় বাদশাহ্ ছিলেন, তাই তানসেনের ন্যায় প্রতিভার বিকাশ সম্ভবপর হয়। অপর দিকে অনেক রচনায় আকবর বাদশাহের সভা বর্ণনা, বাদশাহের মাহাত্ম্য প্রভৃতি ব্যক্তিগত ভাব লক্ষ্য করিলেই একটু মোসাহেবীর চেষ্টা বুঝা যায়। যাহাই হউক, এই প্রকার গান শুদ্ধ রাগ-রাগিণীর রচনা-ভঙ্গীর জন্যই এখনও পর্য্যন্ত চলিত আছে। কারণ ভক্তিরস বা শৃঙ্গার রসে যেমন Universal appeal আছে—ইহাতে তাহা নাই। প্রায়ই দেখা যায়—আকবরকে প্রভু ও তানসেনকে ভৃত্য এই প্রকারের তুলনা আছে। ইহার মধ্যে আমাকে ও আপনাকে মোহিত করিবার কিছুই নাই. যদিও তানসেনের পক্ষে ঐরূপ রচনা বিশেষ দরকার ছিল।

খেয়াল রচনায় ঐ প্রকারের দাস্যভাব (মানুষের প্রতি) পাওয়া যায় না। বরং অনেক গানে সদারঙ্গ ও মহম্মদ শাহ যে পরস্পরের পরম বন্ধু, ইহারই উল্লেখ আছে। মোটের উপর ধ্রুপদগুলি যেমন aristocratic, খেয়ালগুলি তেমনই democratic ভাবাপন্ন।

দ্বিতীয়তঃ—mystic বা symbolic গান—(আধ্যাত্মিক গান বলা যাইতে পারে) ধ্রুপদে অনেক পাওয়া যায়। খেয়ালে একেবারেই তাহা নাই। অর্থাৎ খেয়ালের সময় হইতে বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে classical গানের মধ্যে romance এবং humanisation প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, ইহা আন্দাজ করা যাইতে পারে। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, তাহার পূর্ব্বে কি romantic গান বা সাধারণের উপযোগী গান ছিল না? ছিল—কিন্তু তাহা classical বলিয়া; দরবারী বা মাইফেলী বলিয়া চলিত ছিল না। আরও সতর্কতার খাতিরে বলা যাইতে পারে যে, যদিই বা চলিত ছিল, তাহা অতি অল্প। শ্রীকৃষ্ণ-রাধার সম্বন্ধে যে সকল গান ছিল, তাহা মন্দিরেই হইত এবং অধিকার ও সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। সাধারণ লোকের মধ্যে যাহা ছিল, তাহা দেশী বা Provincial শ্রেণীর অন্তর্গত। এখনও এই সব গান শুনিতে পাওয়া যায়।

এই কথার অবতারণা করিবার তাৎপর্য এই যে, যে কয়েকটি কারণে খেয়াল গান classical অধিকার লাভ করে—তাহার একটি প্রধান কারণ এই যে রচনাগুলির মধ্যে universal human interest ছিল—দুর্ব্বোধ্য আধ্যাত্মিকতা ছিল না; এবং democratic ছিল। অন্যান্য কারণের ক্রমশঃ আলোচনা করা যাইতেছে।

সদারঙ্গের যুগের পরেই আধুনিক যুগ। গোয়ালিয়রের মহম্মদ খাঁ, হর্দ্দু খাঁ, হাস্মু খাঁ, নথু খাঁর নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের জীবনও বিভিন্ন ঘটনাপূর্ণ।

মহম্মদ খাঁ আন্দাজ এক শত পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি প্রথমে গোয়ালিয়রের নিকটবর্ত্তী রেবা নামক স্থানে বাস করিতেন। পরে গোয়ালিয়রের রাজদরবারের গায়ক হইয়াছিলেন। ইঁহার জায়গীর ছিল, এবং অবস্থা সাধারণ লোকের অবস্থা অপেক্ষা স্বচ্ছল ছিল। ইঁহার পুত্র-পৌত্রাদির কোনও কথা শুনা যায় না। ইনি তৎকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেয়াল গায়ক ছিলেন। ইঁহার কণ্ঠ হইতে সম্পূর্ণ তিন সপ্তক তান নির্গত হইত। তিনি কলাবিদ্যা-দান বিষয়ে অত্যধিক কৃপণ ছিলেন। কাহাকেও শিখাইতেন না এবং রাজ-দরবার ব্যতীত কোথাও গান করিতেন না। শুনা যায় যে, ইনি কণ্ঠ ও স্বরের

সুস্থতা অব্যাহত রাখিবার জন্য গলদেশ গরম কাপড় দ্বারা সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখিতেন, ফল ভক্ষণ ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং পাছে কানে বেসুরা আওয়াজ যায় তজ্জন্য কানও তুলা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতেন।

ইঁহার যখন প্রৌঢ়াবস্থা তখন রেবার হর্দ্দু, হাম্মু ও নখু খাঁ নামক তিন ভাই,—উদীয়মান যুবক গায়ক ছিলেন। ইঁহারা সঙ্গীতকলা শিক্ষা করিবাব অভিপ্রায়ে মহম্মদ খাঁর সমীপস্থ হইলেও মহম্মদ খাঁ তাহাতে স্বীকৃত হন নাই। ফলে—ইঁহারা গুপ্তভাবে থাকিয়া মহম্মদ খাঁর গীত শ্রবণ কবিতেন এবং স্বগৃহে অভ্যাস করিতেন। ক্রমে ইঁহারাও খ্যাতনামা গায়ক হইয়া পড়েন। এক দিন ইঁহারা তিন ভাই রাজ দরবারে উপস্থিত হইয়া রাজাকে গান শুনাইবার নিবেদন করেন। মহম্মদ খাঁও সভায় উপস্থিত ছিলেন। ইঁহারা তিন-জনে একসঙ্গে গান করিতেন এবং তাঁহাদের কণ্ঠস্বরও সমধিক প্রশস্ত ছিল। ইঁহাদের গান শুনিয়া রাজা বিশেষ আনন্দিত হন এবং ইঁহাদিগকে যথোচিত পুরস্কৃত করেন। সেই মাইফেলের মধ্যেই মহম্মদ খাঁ ও ইঁহাদের মধ্যে ঈর্ষার সঞ্চার ও বাদানুবাদ হয়। তখন ইঁহারা মহম্মদ খাঁকে সঙ্গীতযুদ্ধে আহ্বান করেন। মহম্মদ খাঁও নিজের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য গান করেন। মহম্মদ যে সকল "কর্ত্তব" দেখাইয়াছিলেন, ইঁহারাও সেগুলি দেখাইতে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। পরিশেষে মহম্মদ খাঁ সমবেত ব্যক্তিবর্গকে আহ্বান করিয়া বলেন যে, আমি এইবার যে তান লইব, ইহা কাহারও সাধ্য নহে যে অনুকরণ করে। এবং অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিলে মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। এই বলিয়া সার্ধ-দ্বিসপ্তক স্বব দ্বাবা এক নিঃশ্বাসে তিনবার আরোহী ও অবরোহী তান গাইয়াছিলেন। তিন ভাই এই অদ্ভুত কার্যের অনুকরণ করিতে একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। কিন্তু হাম্মু খাঁ ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন আমি ঐ প্রকারে তান দেখাইব। এবং সভাস্থ অনেকের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া ঐ প্রকার তানের অনুকরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁহার ফুসফুস ফাটিয়া যায়, ও রক্তবমন করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করেন। সভাস্থ সকলেই যৎপরোনাস্তি সন্তপ্ত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। মহম্মদ খাঁও অতীব অনুতপ্ত হইয়া বলিলেন যে, হায়, কেন আমি এই তান ইহাদের শুনাইলাম! ইহারা যুবক—হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া অনুকরণ করিতে গিয়া, এমন একটি উজ্জ্বল তারকা ম্লান হইয়া গেল—ইত্যাদি।

যাহা হউক, অবশিষ্ট দুই ভাই মহম্মদ খাঁর সমতুল্য গায়ক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন; এবং রাজ-দরবারে আসন ও প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন। ইহার পর মহম্মদ খার আর বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ তিনিই হর্দ্দু ও নখু খাঁকে সুমার্জিত গায়করূপে পরিণত করেন।

হর্দ্দু খাঁর সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে; তন্মধ্যে দুইটি উল্লেখযোগ্য। প্রথম—তাঁহার কঠোর একাগ্র সাধনার প্রণালী। যদিও তিনি বিবাহিত ছিলেন, তথাপি একাদিক্রমে দশ বর্ষ কাল তিনি একাকী এক ঘবে বাস করিয়া কণ্ঠসাধনা করিতেন এবং সংযত ভাবে আহার বিহারাদি করিতেন। তাঁহার ঘবে তাঁহার পনেব কুড়িজন শিষ্য পালা কবিয়া ক্রমান্বয়ে তম্বুরা ছাড়িয়া স্বরযোজনা করিত—যাহাতে সকল সময়েই কোনও না কোনও রাগ-রাগিণী ধ্বনিত হইতে থাকিত। তাঁহাব কঠোর ব্রহ্মচর্য তাঁহার কুটুম্বগণের অভিযোগের বিষয় হইয়াছিল।

দ্বিতীয়—কোনও দিন, সভাতে হর্দ্দু ও নত্থু খাঁ বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা তান দ্বারা হস্তীর গতিরোধ পর্য্যন্ত করিতে পারেন। এই প্রকার কথার উপর বিশ্বাস করিয়া রাজা সত্যসত্যই একটি মাইফেল করিয়া—অবশ্য মাঠের মধ্যে—তন্মধ্যে একটি গুজরাটি হস্তী ছাড়িয়া দেন এবং সেই হস্তীটি ইহাদের সমস্বরের অদ্ভুত তান শুনিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করে।

এই ঘটনা অবিশ্বাস্য নহে; অন্ততঃ যাঁহারা গোয়ালিয়রের খেয়ালিয়াদের নিকট হলক্ তান শুনিয়াছেন, তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন যে, যদি প্রশস্ত কণ্ঠস্বর হয়, এবং ত্রিসপ্তক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে, এইরূপ দুইজন খেয়ালিয়া একসঙ্গে দুই-তিনবার তিনসপ্তক হলক্ তান লইলে যদি হস্তী পলায়ন করে, তাহা হইলে হস্তীকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। হলক্ তান কি প্রকারের বস্তু তাহা পরে আলোচনা করা যাইবে। আপাততঃ এই ঘটনা হইতে বুঝা যায় যে, হর্দ্দু ও নত্থু খাঁর অসাধারণ প্রশস্ত কণ্ঠস্বর ছিল এবং ততোধিক সাহসও ছিল। নতুবা ইহার তাৎপর্য এই নহে যে, হস্তীকে ভয় প্রদর্শন করিতে পারিলেই সঙ্গীতের চরম পরাকাষ্ঠা হয়। ইহা হইতে আরও সপ্রমাণ হয় যে, তৎকালে ঐ প্রকার কণ্ঠস্বরশালী লোক ছিল এবং আদর্শও ঐ প্রকারের ছিল।

এই প্রকার ঘটনা যে স্থানে ঘটিতে পারে, সে স্থান যে খেয়ালের পীঠস্থান হইয়া থাকিবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক। এখনও পর্য্যন্ত গোয়ালিয়র Classical খেয়ালের জন্য বিখ্যাত। অতঃপর খেয়ালের অদ্ভুত মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আর কোনও গল্প শুনা যায় না।

ইঁহাদের পরে, নিসার হোসেন, ইনায়েৎ হোসেন, বাহাদুর হোসেন, রহমৎ খাঁ, আহম্মদ খাঁ, মুন্না খাঁ, বড়াদুঁদি খাঁ, আলিয়া ও ফত্তু নামক কয়েক জন ধুরন্ধর খেয়ালীর খ্যাতি শুনা যায়। ইঁহারা কিছু দিন আগেও জীবিত ছিলেন; এবং এখন যাঁহারা যাট বৎসরের উপর বৃদ্ধ, এমন অনেক সঙ্গীতামোদী ব্যক্তির নিকট ইঁহাদের কথা শুনিয়াছি।

উল্লিখিত খেয়ালীদিগকে প্রথম শ্রেণীর খেয়ালী বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর Artist আমি তাঁকেই মনে করি, যিনি Institution-এর নিয়ম লঙ্ঘন না করিয়াও বিশিষ্ট বা ব্যক্তিগত ভাবে কোনও Art বা চারুশিল্পকলার উন্নতি সাধন করিতে পারেন ও বিচিত্র সৃষ্টি করিতে পারেন। আমাদের গান-বাজনার সমালোচনা সম্বন্ধে কয়েকটা গোড়ার কথা এ স্থলে আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করিতেছি। গান-বাজনার দুইটি ঢং আছে; প্রধানতঃ বা মূলতঃ—একটি Classical অপর Provincial বা দেশী। একই গান, এমন কি, রাগ-রাগিণী ভিন্ন ভিন্ন দেশে কিঞ্চিৎ ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে; আবার সেই গানই সমস্ত দেশের সেরা কলাবিদদিগের পরস্পর আলোচনা ও সম্বন্ধ দ্বারা একটি প্রধান বিশিষ্ট মূর্ত্তি ধারণ করে। ইহা ধ্রুপদেও আছে, খেয়ালেও আছে, টপ্পাতে কিছু কিছু আছে, ঠুংরিতে বিলক্ষণ আছে। বলা বাহুল্য, দুই প্রকার ঢংই সৌন্দর্য-সৃষ্টির সহায়তা করিয়াছে।

মনে করা যাউক—রামপুরের একটি অপরিণত বয়স্ক গায়ক রামপুরী ঢং-এ গান শুনাইতেছে। তদ্রূপ, গোয়ালিয়রের খাস দেশী ঢং-এ আর একজন গায়ক গান শুনাইতেছে। উভয়ই অতি চমৎকার; কিন্তু দেখা গেল যে, কতকগুলি "কাজ" বা কর্ত্তব গোয়ালিয়রী ঢং-

এ পাওয়া যায় ও রামপুরী ঢং-এ পাওয়া যায় না, এবং তদ্বিপরীত। মনে করা যাউক—ইঁহাদের দুইজনের নিকট হইতে একজন প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি গান শিখিল। এখন আমরা দেখিব যে, শেষোক্ত ব্যক্তি এমন একটি Standard সৃষ্টি করিয়াছে, যাহাকে আমরা "দেশী" বলিতেই পারি না; কিন্তু Classical বলিতে পারি। আমাদের হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ইতিহাসে এই প্রকার অসংখ্য ঘটনা পাওয়া যায়। দুই একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। স্বয়ং তানসেন প্রথমাবস্থায় মথুরাদেশী ছিলেন। তখন হরিদাস স্বামীর নিকট তাঁহার সঙ্গীত শিক্ষা হয। তার পব, গোয়ালিয়রে মহম্মদ গৌস-এর নিকট দরবারী ও গোয়ালিয়রী ঢং (যাহা হইতে গুবরহার বাণ্ হইয়াছে) শিক্ষা করিয়া যখন দরবারে গান করেন, তখন তিনি এমন একটি উচ্চতর স্তরে সঙ্গীতকে পৌঁছাইয়া দেন, যাহাকে Classical বলিতে পারি। অবশ্য Classical ঢংও দেশ, কাল, পাত্র হিসাবে Relative, এক যুগের Classical পরবর্ত্তী কোনও যুগের সাধারণ ঢং হইয়া যাইতে পারে। আর একটি উদাহরণ—বীণা সুরবাহার ও সেতার বাদ্যে অনেক দিন হইতে (অর্থাৎ তানসেনীয় যুগ হইতে) দুইটি বিশিষ্ট ঢং চলিয়া আসিতেছিল—পুরববাজ ও পছাঁওবাজ্—অর্থাৎ পূর্ব্বদেশীয় বাজনা ও পশ্চিমদেশীয় বাজনা। দিল্লিকে রাজধানী করিলে দিল্লির পূর্ব্বদিকের দেশের বাজনা পূবববাজ এবং পশ্চিমস্থ দেশের বাজনা পছাঁওবাজ। এখনও ইহাদের বিশুদ্ধ Representative আছে—আমি একজনকে মনে কবিতেছি—জয়পুরের হাফিজ খাঁ। ইনি বিশুদ্ধ পঁছাওবাজ। অমৃতসেনজী নামক সুপ্রসিদ্ধ বীণকার ও তাঁহার বংশীয় বাদকগণ সকলেই পছাঁওবাজ বাজাইতেন। আবার বন্দে আলী খাঁ বীণকার পূরববাজ ছিলেন। ইমদাদ খাঁ পূরববাজ ছিলেন। ইম্‌দাদের পুত্র আধুনিক শ্রেষ্ঠ সেতারী ইনায়েৎ খাঁর মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পাই—যাহাতে বুঝা যায় যে, ইনি পূরববাজ রাখিয়াছেন এবং পছাঁওবাজে অনেক সুন্দর "যোড়ের কাজ"ও যোজনা করিতেছেন। তদ্রূপ, মজিদ খাঁ নামক বীণকারও পূরব ও পছাঁওবাজের সুন্দর সম্মিলন করিয়াছেন। পরলোকগত প্রসিদ্ধ সরোদীয়া ফিদা হুঁসেন খাঁ (ইনি লক্ষ্ণৌ Conference-এ সরোদ বাজনায় প্রথম হইয়াছিলেন) প্রধানতঃ পছাঁওবাজী ছিলেন এবং ফরমাইয্ করিলে মধ্যে মধ্যে পূরববাজ গৎ ইত্যাদি বাজাইতেন। আধুনিক শ্রেষ্ঠ সরোদীয়া হাফিজ্ আলি খাঁ পূরব ও পছাঁওবাজেব সুমধুর সম্মিলন করিয়াছেন। ফলে—Standard উন্নত হইতেছে। আমার বিশ্বাস যে Provincial ঢংগুলির সার সৌন্দর্য গ্রহণ করিয়া, Mannerismগুলি বর্জন করিয়া যে প্রতিভাশালী ব্যক্তি সৌন্দর্য-সৃষ্টি করিতে পারে, তাহাকে প্রথম শ্রেণীর বলা যায় এবং তাহার রচিত সৌন্দর্যকে Classical নাম দেওয়া যাইতে পারে।

উপরি উল্লিখিত গায়কগণ সকলেই Institution এবং গুরুমুখী বিদ্যা শিক্ষা করিয়াও অনেক কিছু নূতন কাবয়া গিয়াছেন এবং এই উন্নতিশীলতার জন্য খেয়াল গানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

*অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫*

# দুর্গানামের ফল

## সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

হরিচরণের নাম হরিচরণ হইলেও লোকে তাহাকে দুর্গাদাস বলিয়া ডাকিত। অবশ্য তাহার একটু কারণও ছিল। সে যখন দীক্ষা লয়, তখন তাহার গুরুদেব বলিয়াছিলেন, 'বাবা! সর্ব্বদা দুর্গা দুর্গা জপ করিবে।'

দুর্গা দুর্গেতি দুর্গেতি দুর্গানাম পরং মনুঃ।
যো জপেৎ সততং চণ্ডি জীবন্মুক্ত সঃ মানবঃ॥

দুর্গা দুর্গা দুর্গা—এই দুর্গানামই পরম মন্ত্র, এ নাম যে মানব সতত জপ করে সে জীবন্মুক্ত। শ্রীগুরুদেবের মুখে এই কথা শুনিয়া পর্য্যন্ত হরিচরণ দুর্গা দুর্গা বলিতে আরম্ভ করিল। হরিচরণ সকালে দুর্গা দুর্গা করিতে করিতে উঠে, অবিরাম দুর্গা দুর্গা করিতে করিতে স্নান করিয়া আসে, পূজা জপান্তে দুর্গা দুর্গা করিতে করিতে শাঁখার পুঁটলি কাঁধে করিয়া যাত্রা করে।

হরিচরণ জাতিতে শাঁখারি, শাঁখা বিক্রয় দ্বারাই তাহার জীবিকানির্ব্বাহ হয়। এইরূপ কিছুদিন দুর্গা দুর্গা করার পরই সকলে সম্মুখে তাহাকে দুর্গাদাস আড়ালে দুগো পাগলা বলিতে লাগিল। হরিচরণ সে সব কথায় লক্ষ্য না করিয়াই আপন ভাবে দুর্গা দুর্গা করিত। সারাদিন দুর্গা দুর্গা করিত, শাঁখা বিক্রয় করিয়া বেড়াইত। সন্ধ্যার পর কর্ম্মক্লান্ত দেহে দুর্গা দুর্গা বলিয়া শয়ন করিত। তাহার এইরূপ অবস্থা হইল—সে নিদ্রিত থাকিলেও তাহার জিহ্বা জপ করিত।

তাহার এইরূপ মতিভ্রম দেখিয়া কামিনী-কাঞ্চনের ক্রীতদাস ভোগবিষ্ঠার কৃমি প্রতিবাসিগণ স্থির করিল—তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে—নচেৎ দিবারাত্রি দুর্গা দুর্গা করিবে কেন? যখন রোগে, শোকে, সুখে দুঃখে সকল সময়েই হাসিমুখে দুর্গা দুর্গা করিতেছে তখন এ পাগল না হইয়া যায় না। একটা পুরা পাগল। যাঁহারা বয়স্ক তাঁহারা দুর্গাদাস বলিয়া ঠাট্টা করিতে লাগিলেন, আর দুষ্টছেলেরা ছড়া বাঁধিয়া বলিত—

দুর্গা বলে দুগো খ্যাপা শাঁখ্যা নিয়ে যায়।
দুর্গা তার পিছু পিছু ঘুরিয়া বেড়ায়।

হরিচরণের শরীরটা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত, সে পিছু ফিরিয়া দেখিত বাস্তবিক দুর্গা তার পিছুতে আছে কিনা। আর ছেলেরা হাত তালি দিয়া হাসিয়া উঠিত এবং তাহার গায়ে যে ধুলা না দিত এমন নয়। সে সে-সব অগ্রাহ্য করিত ও শাঁখার পুঁটলি কাঁধে করিয়া দুর্গা দুর্গা বলিতে বলিতে প্রস্থান করিত।

যাই হোক, অবিরাম দুর্গানাম করার জন্য তাহার পিতামাতার দত্ত 'হরিচরণ' নামটি

লোপ হইয়া গেল। জনসমাজে দুর্গাদাস বলিয়া সে পরিচিত হইল, তাহাতে তাহার কোন দুঃখ ছিল না। সে এইরূপ দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর 'দুর্গা দুর্গা' বলিয়া অতিবাহিত করিতে লাগিল।

(২)

বৈশাখ মাস। দুপুরবেলা রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, দুর্গাদাস শাঁখার পুঁটুলি কাঁধে লইয়া দুর্গা দুর্গা করিতে করিতে তারিণীপুরের সীমা ছাড়াইয়া মাঠে পড়িল।

কিছুদুরে যাইবার পর মাঠের মাঝখানে একটি দীঘি আছে, দুর্গাদাস দীঘি পার হইয়া গিয়াছে এমন সময় তাহার কানে একটা আওয়াজ গেল—ওছেলে 'আমায় শাঁখা দিবে?' দুর্গাদাস এমন মিষ্টি কথা কখনও শুনে নাই। সে পিছু ফিরিয়া দেখিল একটা মেয়ে জলে দাঁড়াইয়া পা রগড়াইতে রগড়াইতে তাহাকে ডাকিতেছে। সে পিছু ফিরিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। অনেক বড় বড় লোকের বাড়ী সে শাঁখা পরাইয়াছে, কিন্তু এমন রূপ কখনও দেখে নাই। সে বলিল, 'কেন দিব না মা!'

একটা বট-গাছের তলায় সে বসিল। ধীরে ধীরে মেয়েটি তাহাব নিকটে আসিল, সে অপরূপ রূপ দেখিয়া দুর্গাদাস ভাবিল যে, ছেলেরা বলে দুর্গা তাহার পিছু পিছু ঘুরিয়া বেড়ায়—আজ সত্যই তাহা হইল না কি। মেয়েটি বালিকা কি যুবতী দুর্গাদাস ঠিক করিতে পাবিল না। কখনও তাহার মনে হইতেছে যুবতী—কখনও মনে হইতেছে বালিকা। মেয়েটি হাসিতে হাসিতে কাছে আসিয়া বলিল, 'বেশ ভাল দেখে আমায় শাঁখা দাওনা ছেলে।'

দুর্গাদাস বাছিয়া বাছিয়া খুব ভাল শাঁখা বাহির করিয়া পরাইতে লাগিল। যেমন মেয়েটির অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে, অমনি তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। দুর্গা দুর্গা বলিয়া সে তাহা সামলাইয়া লইল। দুর্গা দুর্গা বলিয়া শাঁখা পরাইতেছে। মেয়েটি—হ্যাঁ ছেলে। অমন করে দুর্গা দুর্গা বলছ কেন? আর বললে কি হয়?'

দুর্গাদাস কথা কহিতে পারিতেছে না। খানিক পরে দুর্গা দাস বলিল, 'গুরু ঠাকুর দুর্গা দুর্গা বলতে বলেছেন তাই বলি মা, আর দুর্গা দুর্গা বললে মা দয়া কবেন।

—হ্যাঁ ছেলে, তুমি মাকে দেখেছ?

—না মা! আমি এমন পুণ্যি কি করেছি যে মাকে দেখতে পাবো?

—কেন দুর্গা দুর্গা করলে কি দেখা যায় না? যদি দেখা না যায়, তবে ডাক কেন?

দুর্গাদাস বলিল, 'মা! আমি মুখ্যু মানুষ অত জানিনে। যদি নাম করলে দেখতে পাওয়া যায় তবে দেখা পাবই।'

শাঁখা পরান শেষ হইল। মেয়েটি হাসিতে হাসিতে বলিল, ওই যা। ও ছেলে! আমার কাছে তো পয়সা নেই। তোমাব কি করে দাম দেবো? তোমার শাঁখা খুলে নাও।'

দুর্গাদাস যেন কেমন হইয়া গিয়াছে। 'না থাকুক্‌গে এয়োস্ত্রী মানুষ সাক্ষাৎ ভগবতী, আমি হাতথেকে শাঁখা খুলতে পারবো না; আমার দামের কাজ নেই, বলিয়া পোঁটলা বাঁধিতে লাগিল।

মেয়েটি বলিল 'তা হবে কেন? আমিই বা তোমার কাছে অমনি শাঁখা পরব কেন? তুমি যেও না, তুমি এক কাজ কর; গ্রামের ভিতর যাও। আমার বাবার নাম উমাপদ ভট্টাচার্য্য। তাঁর কাছ্ থেকে দামটা আনগে। বলগে আপনার মেয়ে শাঁখা পরেছে, দাম দিন। তিনি যদি বলেন—কৈ আমার মেয়ে তো নেই! মেয়েকে তো কখনও দেখিনি। তুমি সে কথা শুনো না, বোলো—এই মাত্র শাঁখা দিয়ে এলাম। মেয়ে নেই বল্লে শুনবো কেন? ওই দুর্গাঠাকুরের পায়ের তলায় সিঁদুরের কৌটাতে একটা আধুলি আছে তিনি দিতে বলেছেন বলো। যাও ছেলে যাও।'

'আবার যাব আবার যাব—' বলিতে বলিতে দুর্গাদাস অগ্রসর হইল, আর মেয়েটি জলে নামিল।

(৩)

দিন তো আর চলে না। দোকানদার অনেক দিয়াছে তাহার গতিক খারাপ বুঝিয়াও এখনও ধার দিতেছে। প্রতিবেশীরা বুঝিয়াছে উমাপদ ভট্টাচার্য্যকে ধার দিলে আর পাইবার আশা নাই, তথাপি ধার দেয়।

উমাপদ ভট্টাচার্য্যের অবস্থা যে চিরদিন এরূপ তা নয়, আগে অবস্থা খুব ভালই ছিল। এক্ষণে উমাপদ ভট্টাচার্য্য দীক্ষা লইল—দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মতি ও অবস্থা দুইই পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। বাড়ীতে দুর্গা প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা, পাঠ, নামজপ, ধ্যান, আত্মবিচারে দিবারাত্রের অধিকাংশ ভাগ কাটাইতে লাগিলেন। সাধ্বী পত্নী অন্নপূর্ণাও পূজা-পাঠের সঙ্গিনী হইয়া সহধর্ম্মিণী নামের সার্থকতা করিলেন। পাঁচ ছয় বৎসরের পুত্র শিবরাম দুর্গা দুর্গা করিয়া হাততালি দিয়া নৃত্য করিয়া পিতা-মাতার আনন্দ বর্দ্ধন করিত। তাহাদের ভোগের বাসনা ক্ষীণ হইতে লাগিল। শ্রীভগবানের মন্দির দেহ; তাহার রক্ষার জন্য আহার, আর রহিল অতিথিসেবা।

উমাপদ ভট্টাচার্য্য নিত্য ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের পূর্ব্বে উঠিয়া দুর্গা দুর্গা বলিতে বলিতে স্নান করিয়া আসিতেন, প্রাতঃ-সন্ধ্যা, জপ ইত্যাদি সারিয়া পুষ্পচয়ন করিতেন, তদন্তে গীতা ও চণ্ডী পাঠ করিতেন, অধ্যয়নন্তে পূজা, হোম, মার ভোগ দিতেন, তাহার পর বৈশ্বদেব-বলি, গোগ্রাস দিয়া অতিথির অপেক্ষা করিতেন। অতিথি সেবার পর প্রসাদগ্রহণ করিয়া দেবীভাগবত, মহাভাগবত, দেবী পুরাণ, দেব্যুপনিষৎ ইত্যাদি গ্রন্থের আলোচনায় অপরাহ্ণ অতিবাহিত করিতেন। যথাসময়ে সায়ংসন্ধ্যা সারিয়া দেবীর আরত্রিক করিয়া শীতল দিয়া জপে বসিতেন। বহুক্ষণ জপান্তে লীলাচিন্তা করতঃ কণ্টকিতদেহে আত্মবিচার করিয়া সায়ংকৃত্য সমাপনান্তে অতিথি থাকিলে অতিথির সেবার পর কিছু প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। আবার মধ্য রাত্রে জগৎ যখন নিস্তব্ধ হইত তখন হৃদ্‌কমলে চিত্ত ধারণা করিয়া মার আশাপথ চাহিয়া বসিয়া থাকিতেন। এইরূপে তাঁহার দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। তিনি দুর্গা দুর্গা করিতে করিতে সাংসারিক কাজ করিতেন। গৃহকর্ম্ম, স্বামীসেবা দেবসেবা, অতিথিসেবা লইয়াই তিনি সর্ব্বদা থাকিতেন। জিহ্বা কিন্তু একদণ্ড দুর্গা দুর্গা না করিয়া স্থির থাকিত না।

উমাপদ ভট্টাচার্য্যের পৈতৃক যজমান কয়েক ঘর ছিল। উপনয়ন ও বিবাহ ভিন্ন আর পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না, কাজেই যজমান থাকা-না-থাকা সমান হইয়াছিল। তিনি অন্য কোন প্রকারে অর্থ চেষ্টা করিতেন না।

উপার্জ্জনের ঔদাসীন্যে ধীরে ধীরে অভাব আসিয়া আপন প্রভাব দেখাইতে লাগিল। বাজারে ধাব হইযা পড়িল, যদি কোন দিন অভাবের কথা মনে পড়িত, অমনি গুন গুন করিয়া গাহিতেন—

ভাবিলে শঙ্করীপদ সমপদ কোথা পাবে।
সমপদনাশা সে পদ নইলে শিব কেন
শ্মশানবাসী হবে।

গাহিতে গাহিতে তৃপ্ত হইয়া যাইতেন, অভাব আব বোধ হইত না। প্রাণের ভিতর একটা সাড়া পেতেন, অভয আশ্বাস মাভৈঃ ধ্বনি শুনিযা দুর্গা দুর্গা করিতেন।

একটি সংশয় তাঁহার মনে মাঝে মাঝে উঠিত—দেবতার দর্শন ভাবের উপরই হয়, অথবা চর্ম্মচক্ষে হয়। কলির জীব চর্ম্মচক্ষের দ্বাবা দেবদর্শন লাভ কবিতে পারে কিনা? এ সংশয়ের কোন মীমাংসা করিতে পারেন নাই। জয়দেবের গীতগোবিন্দ "দেহি পদপল্লবমুদারম্" মিলাইয়া দিয়াছিলেন একথা তিনি জানিতেন। গীতাভক্ত ব্রাহ্মণকে উপলক্ষ্য করিযা "তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্" এই বাক্যের সততা প্রতিপাদনের জন্য নরাকার ধারণ করিয়াছিলেন, সে উপাখ্যানও তাহার অবিদিত ছিল না। তুলসীদাস মহারাজজী একাধিক বার শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভ করিযা ছিলেন—তিনি তুলসীদাসেব জীবনীতে তাহা পড়িয়াছিলেন। সাধক রামপ্রসাদের বেড়া বাঁধার কথাও যে শুনেন নাই তাহা নয়; তথাপি তাহার সংশয় ছিল। ক্রমশঃ যখন অধিক ঋণ হইয়া পড়িল তখন তিনি বলিলেন—না, আর ঋণও করিব না, কাহারও নিকট প্রার্থনাও করিব না। মা দেন খাব, না দেন না খাব; ঋণ করিয়া অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত করিব কেন? দেখি মা কি ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রাণ যায় সেও স্বীকার, তথাপি মা ছাড়া আর কাহারও কাছে প্রার্থনা করিব না। সন্ধ্যাপূজাদি করিলেন; আজ আব ভোগ দিবার কিছুই নাই। মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গেল, তিনি ধ্যানমগ্ন, শিববাম ক্ষুধার জ্বালায কাদিতেছে, অন্নপূর্ণা দুগা দুর্গা করিতেছে। এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল, ও শিবরাম! একবার বাহিরে এস না।' শিবরাম চক্ষু মুছিয়া বাহিরে যাইল, একটু পরে একটি ঝুড়ি করিয়া কযেকটি আম ও চারিটি সন্দেশ লইয়া বাড়ীতে আসিয়া মাকে দিযা বলিল, মা—কে একজন ঠাকুরের ভোগের জন্য আম সন্দেশ দিয়া গেলেন। কে যে দিয়াছেন অন্নপূর্ণার আর বুঝিতে বাকী রহিল না, অশ্রুসিক্ত নযনে সেই সমস্ত লইয়া গিয়া দেবীর সম্মুখে রাখিলেন। কিছুক্ষণ পবে উমাপদর ধ্যান ভঙ্গ হইল।

তিনি দেখিলেন মার ভোগের যোগাড় হইয়াছে; জিজ্ঞাসা করিলেন, এসব কোথায় পেলে? অন্নপূর্ণা বলিল, কে দিয়া গেছেন। উমাপদ মনে করিলেন আমার অভাব আর ত কেউ জানে না, তবে কি তিনি নরাকারেও আসেন। আচ্ছা দেখা যাক্।

দেবীর ভোগ দিলেন—বলিলেন শিবরামের জন্য মা পাঠিয়েছেন, আমরা উপবাস করি এস। তাহাই হইল। দুর্গা দুর্গা করিয়াই ব্রাহ্মণ দম্পতির দিবারাত্র চলিয়া গেল। দ্বিতীয় দিন মধ্যাহ্নে কে এক ঘটী দুধ শিবরামের হাতে দিয়া গেল, তাহার দ্বারা ভোগ হইল, শিবরামের জীবন রক্ষা হইল। ব্রাহ্মণ দম্পতি দুর্গা দুর্গা করিয়া দিবারাত্র উপবাসে অতিবাহিত করিলেন। তৃতীয় দিন পূজা শেষ হইল, মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গেল, ক্ষুধার জ্বালায় শিবরাম অত্যন্ত কাঁদিতেছে, তাহাকে আর কিছুতেই রাখা যাইতেছে না।

উমাপদ প্রতিমার নিকট গিয়া মার মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—মা তুমি কি আছ? তিনি যেন তাঁর অধরকোণে কী হাসির রেখা দেখিলেন। এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল, ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাড়ী আছেন? একবার বাহিরে আসুন, আমরা অতিথি। উমাপদ তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া দেখিলেন, তিন জন সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া আছেন, সাদরে বাহিরের ঘরে লইয়া গিয়া পা ধোয়াইয়া দিয়া বসিবার আসন দিলেন, তারপর পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। এইবার তাঁহাদের মধ্যে যিনি প্রধান তিনি বলিলেন, কাল হইতে আমাদের আহার হয় নাই আমরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত আমাদের আহারের ব্যবস্থা করুন।

উমাপদর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল,—কি করবো কেমন করে অতিথির সেবা করবো—কিছুই যে নাই, কি হবে অন্নপূর্ণা! অন্নপূর্ণা দুর্গা দুর্গা বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। উমাপদ উন্মাদের মত মার কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিল, মা অতিথি বিমুখ হয়ে যায়। ওমা বিপৎতারিণী, ওমা মহাভয়নাশিনী, মা দুর্গা রক্ষা কর মা। এমন সময়, দেওয়ালের গায়ে মুণ্ডমালাতন্ত্রের একটা শ্লোক লিখিয়া রাখিয়াছিলেন তাহাতে লক্ষ্য পড়িল।

মহোৎপাতে মহাবোগে মহাবিপদসঙ্কটে।
মহাদুঃখে মহাশোকে মহাভয়সমুখিতে॥
য স্মরেৎ সততং দুর্গা জপেৎ য পরমং মনুঃ।
স জীবলোকে দেবেশি নীলকণ্ঠত্বমাপ্নুয়াৎ॥

দুর্গা দুর্গা দুর্গা। মা আমি নীলকণ্ঠ হইতে চাইনা আজ এ দায় হইতে রক্ষা কর। ছেলে যায় দুঃখ নাই, অতিথি বিমুখ হয়ে যায়। রক্ষা কর মা।

বাহির হইতে অতিথিরা ডাকিলেন, দেরী কচ্ছেন কেন? আমরা কি অন্যত্র যাব? উমাপদ পাগলের মত বলিতে লাগিলেন—বাড়ী থেকে অতিথি ফিরে যাবে কি করবো? কাহার কাছে কি প্রার্থনা করবো! আমি মাব কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, মা ভিন্ন আর কাহারও কাছে কিছু চাহিব না, কি করি, কি করি? বাহির হইতে অতিথিরা বলিলেন—আমরা অত্যন্ত পিপাসিত, একটু জল নিয়ে আসুন। অন্নপূর্ণা সেইখানে লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতেছে, সর্ব্বনাশ হলো, আজ অতিথি বিমুখ হয়ে যায়, ম'-মা-মাগো।

উমাপদ বলিলেন, 'অন্নপূর্ণা! ভাঁড়ার ঘর বেশ করে তন্ন তন্ন কবে খুঁজে দেখ, যদি কিছু

মিষ্টি থাকে নিয়ে এস, এখানে জল আছে এই নিয়ে যাই।' অন্নপূর্ণা চলিয়া গেল। সহসা একটা বিড়াল লাফাইয়া পড়িয়া জলের কলসীটা ফেলিয়া দিল। কি সর্ব্বনাশ! বাড়ীতে জল পর্য্যন্ত নাই। না না, অতিথি বিমুখ দেখবো না—তার আগে আত্মহত্যা করি'—এই বলিয়া তাড়াতাড়ি মায়ের হাত হইতে খাঁড়া গ্রহণ করিয়া আত্মহত্যার উদ্যোগ করিলেন।

ঠিক্ এমন সময় দুর্গাদাস গিয়া ডাকিল, 'ভট্টাচার্য্য মশাই! ও ভট্টাচার্য্য মশাই! কি করছেন, একবার আসুন না। তিনি খাঁড়া ফেলিয়া বলিলেন, আবার কে ডাকে?' দেখি আরও কি আছে।' মা-মা বলিতে বলিতে বাহিরে গেলেন। দুর্গাদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি বাপু?' অতিথিরা বলিলেন, 'দেরী করেন কেন?' তিনি জোড়হাতে কাতরস্বরে বলিলেন, 'দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন।'

দুর্গাদাস বলিল, 'আপনার মেয়ে শাঁখা পরেছেন, দাম দিন।'

—কি বলছো?

—আপনার মেয়ে শাঁখা পরেছেন, দাম দিন।

উমাপদ সাশ্চর্য্যে বলিলেন, 'সে কি! আমার তো মেয়ে নেই!' দুর্গাদাস বলিল, 'আপনি ও কথা বলবেন—তিনিও তাহা বলেছেন। আমায় তিনি বলে দিয়েছেন—তুমি সে কথা শুনো না।'

—মেয়েকে কোথায় দেখ্‌লে?

—ঐ মাঠের মাঝখানে দীঘিতে।

—এ কি ব্যাপার—আমার মেয়ে। আচ্ছা দেখতে কেমন! দুর্গাদাস বলিল, 'দুর্গা প্রতিমা, আমি অমন রূপ আর কখন দেখিনি। হাঁ, তিনি বলে দিয়েছেন—আপনার প্রতিমার পায়ের তলায়, সিঁদুরের কোটায একটা আধুলি আছে আমায় দিতে।'

তিনি তাড়াতাড়ি ছুটিলেন, দেখিলেন—সত্যই একটা সিঁদুরের কৌটা—তাহাতে একটা আধুলি রহিয়াছে। তিনি সেই আধুলিটা লইলেন। এ কি! আবার একটা আধুলি রহিয়াছে! আবার লইলেন, আবার আধুলি। 'এ কি ব্যাপার! শুধু কৌটায এত আধুলি কোথা থেকে আসছে!' হাত পূর্ণ হইয়া গেল। একটা ছোট কৌটায় এত আধুলি! একি ব্যাপার! এ কি ইন্দ্রজাল। মাব মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, 'বাজিকরের মেয়ে! একি বাজি মা!"

এমন সময় বাহিরে আবাব কে ডাকিল, 'ভট্টাচার্য্য মহাশয়! বাড়ী আছেন?' ভিতর হইতে বলিলেন, 'কে হে?' এই জমিদারবাবুরা মায়ের ভোগের জন্য সিধা পাঠাইয়াছেন। তিনি বাহিরে গিয়া দেখিলেন—এক বড় ধামায় দশ-বারোজনার উপযোগী চাল, ডাল তেল, নুন, তরকারী, আম, সন্দেশ। এইবার উমাপদ—'করুণাময়ী, করুণাময়ী বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। একটু স্থির হইয়া বলিলেন—মহাশয়গণ। এইবার আপনাদের আহারের ব্যবস্থা করছি।' ঘরপানে চাহিয়া দেখিলেন—কেহই নাই। কি সর্ব্বনাশ! অতিথি বিমুখ হইয়া গেলেন। দুর্গাদাস বলিল, 'ও ঘর থেকে কেউ বেবোন নি; এখান দিয়ে কেউ যান নি।' উমাপদ বলিলেন, 'ও গৃহের ত অপর দ্বার নাই—এ প্রকাশ্য দিবালোকে কি আমার দৃষ্টিভ্রম

হলো? আমি কি জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছি, মা মা! এ কি—প্রহেলিকা মা! দুর্গা দুর্গা দুর্গা! মা! একি পরীক্ষা মা! মা যেমন বিপদ দিস্, তেমনি বিপদ থেকে উদ্ধার করিস্।'

তিনি আম ও মিষ্টি দেবীকে নিবেদন করিয়া দিয়া দুর্গাদাস ও শিবরামকে প্রসাদ দিলেন; নিজে চরণামৃত লইলেন। দুর্গাদাস ভোজন করিবার পর তাহার হাতে আধুলি দিয়া উমাপদ বলিলেন, 'বাবা! কোথায় আমার মেয়েকে দেখেছ শীঘ্র আমায় সেখানে নিয়ে চল!' দুর্গাদাস কেমন হতভম্ব হইয়া গিয়াছে। সে অতিথিগণকে ঘরে দেখিয়াছিল, তারপর তাহারা কোথা দিয়া চলিয়া গেলেন কিছু ঠিক করিতে পারিল না। যাহা হউক উভয়ে দীঘির দিকে ছুটিলেন।

'কোথায় দেখেছিলে বাবা?' দুর্গাদাস বলিল, 'এই স্থানে ছিলেন।' সে স্থানে কেহ কোথাও নাই। 'ও মা, অবিশ্বাসীর অবিশ্বাস চূর্ণ করে দিয়ে কোথায় লুকালি মা! একবার দেখা দে মা, একবার আয় মা, এত করুণা তোর আমি তাত জানি না মা।' উমাপদ মা মা বলিয়া বালকের মত আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

দুর্গাদাস এইবার ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল—আজ কাহাকে শাঁখা পরাইয়াছে, এতক্ষণে তাহার জ্ঞান হইল। সেও হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। 'ওরে! আমি পেয়েও পেলুম না রে, ওরে! ধরেও ধরতে পারলুম না রে' বলিয়া বুক চাপড়াইতে চাপাড়াইতে কাঁদিতে লাগিল। 'ওমা তোকে পেয়েও চিনতে পারলাম না। ওমা একবার দেখা দে মা। তুই শাঁখা পরেছিস্—একবার বল মা, আমার কথা সত্য কর মা!'

ধীরে ধীরে দীঘির কালজল ভেদ করিয়া শাঁখা পরা লাল টুকটুকে দুখানি ননীর মত হাত বাহির হইল। 'ওই যে মা' বলিয়া দুজনে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

# গায়ক কবি রামনিধি গুপ্ত

## দীপঙ্কর নন্দী

কবিকঙ্কণ ভাবতচন্দ্র ও কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের পর বাঙলা সাহিত্যে কোন উল্লেখযোগ্য কাব্য রচিত না হওয়ায় কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দুঃখ করে লিখেছিলেন,

আব কি আছে সে সুরভি ঘ্রাণ
আর কি আছে সে কোকিল গান
আর কি এখন সুগন্ধময়,
গউড় নিকুঞ্জে মলয় বয়?
মুকুন্দ, ভাবত, প্রসাদে শেষ
শুকায়ে গিয়াছে সুধায় লেশ।

সুধাব লেশ কিন্তু একেবারে অন্তর্হিত হয় নি, এই সময় বাঙলা সাহিত্যে নিধুবাবু (রামনিধি গুপ্ত) শ্রীধর কথক, রাম বসু, হরু ঠাকুর, দাশরথী বায় প্রভৃতি কয়েকজন প্রতিভাবান কবির আবির্ভাব হয। এঁদের রচিত অপূর্ব্ব ভাব, ভাষা ও বস মাধুর্য্যে অভিসিক্ত মধুব গান সে যুগে অসাধাবণ সমাদর লাভ করে এবং বাঙ্‌লা সাহিত্যকে সমৃদ্ধির পথে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যায়। বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যেব প্রথম ইতিহাসকার রামগতি ন্যাযরত্ন এই সময়কে গানের যুগ বলে অভিহিত করেন। এই সমস্ত গীত-রচয়িতাদের মধ্যে গাযক-কবি রামনিধি গুপ্ত অন্যতম নন—প্রধান।

"উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে'র অমব লেখক সমালোচক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "আমার বিবেচনায়, এই সকল গীত-রচকদিগের মধ্যে নিধুবাবু সময়েব হিসাবে যেমন সকলের অগ্রবর্ত্তী, প্রতিভা ও ক্ষমতার হিসাবেও তেমনি শ্রেষ্ঠ। প্রতিভাব একটা প্রধান লক্ষণ এই যে তাহা সময়েব প্রভাব অল্পাধিক পবিমাণে অতিক্রম করিতে পারে এবং করিয়া থাকে। এই সময়কাব গীত রচকদিগের মধ্যে কেবলমাত্র নিধুবাবুর গানেই কালপ্রভাব অতিক্রমের নিদর্শন পাওযা যায়।

ঋষি রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন, রামপ্রসাদের পব গীত রচনায় নিধিরাম গুপ্ত (নিধুবাবু) প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইহার প্রণীত গ্রন্থের নাম 'গীতরত্ন' গ্রন্থ। উহা সচবাচব "নিধুর টপ্পা' নামে প্রসিদ্ধ। নিধুবাবু ভারতচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই জন্ম গ্রহণ করিযাছিলেন। ...নিধুর রচিত গীতে মধ্যে মধ্যে চমৎকার ভাব আছে।

নির্ভয় শরীব মোর
উল্লসিত অন্তর
হৃদয় উদব সদা প্রেমপূর্ণ চন্দ্র।

এই বাক্য মানবীয় প্রেম অপেক্ষা ঐশী প্রেমের প্রতি আরো অধিক খাটে।

নিধুবাবু টপ্পা অর্থাৎ প্রণয়-সঙ্গীত রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং এই প্রণয় সঙ্গীত রচনা করেই তিনি অমর হয়ে আছেন। বিদ্যাসুন্দরের পঙ্কিলতায় মানুষের মন যখন কলুষতায় ভরে উঠেছে, সেই সময় নিধুবাবু চিরাচরিত সেই কীর্ত্তন বা বাউল গান শুনিয়ে মানুষের ক্লান্ত মনকে ভারাক্রান্ত করতে চান নি। তিনি জীবনের বাস্তব প্রেম অবলম্বনে প্রণয় সঙ্গীত রচনা করেন, যা শুনে মানব-মন প্রেমরসে অভিষিক্ত হয়—প্রশান্ত শান্তিলাভ করে। বাঙালী যেন নিধুবাবুর প্রণয় সঙ্গীত শোনার জন্যই উৎকর্ণ হয়েছিল।

রামনিধি গুপ্ত ওরফে নিধুবাবুর জন্ম হয় ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে ত্রিবেণীর নিকট চাঁপ্তা গ্রামে। কবির পৈত্রিক বাসস্থান কলিকাতায়—কুমারটুলী অঞ্চলে। কলকাতায় যখন বর্গির হাঙ্গামা হয় সেই সময কবির পিতা কবিরাজ হরিনারায়ণ গুপ্ত কুমারটুলী পরিত্যাগ করে মাতুলালয় চাঁপ্তা গ্রামে আসেন। এই সময় কবির জন্ম হয়। চাঁপ্তা গ্রামের গ্রাম্য পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে কবি কলকাতায় ফিরে আসেন ইংরেজী শিক্ষা লাভের জন্য। কলকাতায় একজন ফিরিঙ্গীর নিকট কবির ইংরেজী শিক্ষা শুরু হয়। কয়েক বছরের মধ্যেই কবি ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। সে যুগে কিছু ইংরেজী জানলেই চাকরী পাওয়া যেত। কবিও একটি চাকুরী পান প্রতিবেশী রামতনু পালিতের চেষ্টায়। ছাপরার কালেক্টারী অফিসের' কেরাণীর চাকরী।

চাকুরী উপলক্ষে নিধুবাবু ছাপরা যাত্রা করেন। ছাপরায় অবস্থান কালে অবসর সময় তিনি সঙ্গীতপ্রিয় একজন মুসলমান ওস্তাদের নিকট সঙ্গীত-শিক্ষানবিশী গ্রহণ করেন। খেয়াল গজল প্রভৃতি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্বন্ধে তিনি জ্ঞানার্জ্জন করেন। তবে ওস্তাদের কাছে তিনি খুব বেশী কিছু শিক্ষা করতে পারেন নি। ওস্তাদের খুব বেশী কিছু শিক্ষা দানে ইচ্ছাও ছিল না—ওস্তাদের মনোভাব বুঝতে পেরে নিধুবাবু মিয়াসাহেবকে সেলাম জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করেন।

ক্ষুব্ধ মনে গৃহে ফিরে এসে নিধুবাবু সঙ্গীত সাধনায় নিমগ্ন হন। দিনের পর দিন সঙ্গীত চর্চ্চার মধ্যে দিয়ে কেটে যায়। কখনও তিনি গান রচনা করেন, কখনও তালে সুর দেন, আবার কখনও সেই সুর সংযুক্ত গান করেন উদাত্ত কণ্ঠে। এইভাবে কয়েক বছর কেটে গেল। নিধুবাবু এক অভিনব বাঙ্লা গান সৃষ্টি করলেন। সুললিত হিন্দুস্থানী টপ্পা গানের সুর ও তাল অবলম্বনে তিনি এই গান রচনা করেন। এই গান নিধুর টপ্পা নামে খ্যাত। টপ্পা গানে নিধুবাবু কথা ও সুরের যে অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন, তার তুলনা নেই। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন, বাঙ্লা গীতে রাজা সুরের ব্যাপারে ইনি (নিধুবাবু) যদ্রূপ ক্ষমতা প্রকাশ করেন, তাহাতে 'সারি মিয়া'র অপেক্ষা ইহাকে কোন অংশে ন্যূন বলা যাইতে পারে না। ইঁহার প্রণীত টপ্পাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যেমন হিন্দুস্থানে সারির টপ্পা তেমনি বঙ্গ-দেশে নিধুর টপ্পা। ''' নিধুবাবুর এক একখানি সুর খেয়ালের অপেক্ষা কৌশল কলাপে পরিপূরিত ও অতি মধুর।"

সঙ্গীত-সাধক নিধুবাবু যখন সঙ্গীত-সাধনায় বিভোর, সেই সময় একদিন ভাবাবেশে অফিসের ডেসকে একটি টপ্পা গান লেখেন। এতে অফিসের অধ্যক্ষ নিধুবাবুর উপর অত্যন্ত

ক্ষুব্ধ হন এবং তাকে ভীষণ ভাবে তিরস্কার করেন। নিধুবাবুর প্রাণে লাগে। তিনি তৎক্ষণাৎ চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে সোজা কলকাতায় চলে আসেন।

কলকাতায় ফিরে এসে নিধুবাবুর সঙ্গীত চর্চ্চায় ছেদ পড়েনি। তিনি প্রতিদিন বিখ্যাত জমিদার জয় মিত্রের পিতার বাসভবনে সঙ্গীতালাপ করতেন। সে গানের আসরে সহরের গণ্যমান্য লোক-সমাগম হত। সেকালের কলকাতার বিখ্যাত বৈঠক বটতলায় নিধুবাবু সঙ্গীতালাপ করতেন। বটতলার আসর উঠে গেলে দেওয়ান শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় বাগবাজারের রসিক গোস্বামীর বাসভবনে গানের আসর বসে। এই গানের আসরে নিধুবাবু যে সমস্ত সঙ্গীত পরিবেশন করতেন তা ভাব, ভাষা, সুর ও বস মাধুর্য্যে অনন্য।

শুধু কলকাতায় নয়—সারা বাঙ্লা দেশে নিধুবাবুর সঙ্গীতের খ্যাতি ছড়িয়ে দেশবিদেশের সঙ্গীতাসরে নিধুবাবুব ডাক পড়তে লাগল। কিন্তু কলকাতা ছেড়ে কোথাও তিনি যেতেন না। মুর্শিদাবাদের মহারাজা মহানন্দ রায় ও বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র রায় কলকাতায় এসে নিধুবাবুর গান শুনে যেতেন।

কলকাতায় মহারাজা মহানন্দ রায়েব শ্রীমতী নামে এক অপরূপ সুন্দরী প্রণয়িনী ছিলেন। কলকাতায় এলেই মহারাজা শ্রীমতীর অঙ্গনে উঠতেন। সেখানে বসত গানের আসর এবং নিধুবাবুর ডাক পড়ত। মহারাজা নিধুবাবুর মধুর কণ্ঠের প্রণয় সঙ্গীত শুনতেন তন্ময় হয়ে। প্রতি রজনীতেই শ্রীমতীর বাড়ীতে নিধুবাবু সঙ্গীতালাপ করতেন। নিধুবাবুর প্রণয় সঙ্গীত শুনে শ্রীমতী নিধুবাবুর প্রতি প্রণয়াসক্ত হন। প্রেমিক নিধুবাবু শ্রীমতীর প্রেমের অপমান করেন, কিন্তু শ্রীমতীকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসতেন। শ্রীমতীর সাহচর্য্যে নিধুবাবুর মনে নব নব ভাবের উদয় হয়, তা তিনি ভাষা ও ছন্দে বেঁধে ফেলতেন এবং তাতে সুর সংযুক্ত করে গাইতেন। শ্রীমতী মুগ্ধ বিস্ময়ে সে গান শুনতেন, আর ভাবতেন এ গান তারই উদ্দেশে রচিত---তারই উদ্দেশে গাওয়া।

নিধুবাবুর প্রণয় সঙ্গীত আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। তিনি বাধাকৃষ্ণ বা বিদ্যাসুন্দরের প্রেম অবলম্বনে গান রচনা করেন নি। নিজের জীবনেব প্রেম-বিরহ মিলন অবলম্বন করে স্বাধীনভাবে গান রচনা করেন। বাঙ্লা সাহিত্যে এ এক অভিনব বস্তু—নতুন জিনিস। নিধুবাবুর প্রণয় সঙ্গীতে অশ্লীলতার স্পর্শ নেই;--আছে আত্ম সমর্পণেব আকুলতা—

তোমার বিরহ সয়ে বাঁচি যদি দেখা হবে
আমি এই মাত্র চাই মরি তাহে ক্ষতি নাই
তুমি আমার মুখে থেকো, এ দেহ সকল সবে

অথবা—

খেও খেও প্রাণনাথ, প্রেম নিমন্ত্রণ,
নয়ন জলে স্নান করাব, কেশেতে মুছাব নয়ন।

মানুষের জীবনের যখন প্রেম আসে তখন সে প্রেমানন্দে আত্মহারা হয়। কিন্তু হায়। প্রেম তো চিরস্থায়ী নয়। প্রেমের পরেই আসে বিরহ। আলোর পবই অন্ধকার। প্রেমিক তখন

বিরহ যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হয়—ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। এইটাই জগতের নিয়ম। কিন্তু প্রেমিকের মন তো মানে না। প্রেমিক কবি নিধুবাবুরও মনে তাই প্রশ্ন জেগেছে ঃ—

"তবে প্রেমে কি সুখ হতো
আমি যারে ভালবাসি সে যদি ভালবাসিত।
কিংশুক শোভিত ঘ্রাণে কেতকী কণ্টকহীনে
ফুল ফুটি. চন্দনে ইক্ষুতে ফল ফলিত?
প্রেম সাগরের জল হইত শীতল
বিচ্ছেদ বাড়বানল যদি তাহে না থাকিত।

ইংরেজী ভাষার প্রথম ভারতীয় কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষ নিধুবাবুর প্রণয় সঙ্গীত বা টপ্পা গান পাঠ করে মুগ্ধ হন এবং নিধুবাবুর ধরণেব তিনশত প্রণয় সঙ্গীত রচনা করেন। কাশীপ্রসাদ তাঁর On Bengali Words and writers ও 'On Bengali Poetry' গ্রন্থদ্বয়ে নিধুবাবুর প্রণয় সঙ্গীতের সমালোচনা করেন। সমালোচনা উপলক্ষে তিনি নিধুবাবুর কিছু কিছু প্রণয় সঙ্গীত ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। প্রেমিক কবি মধুসূদন নিধুবাবুর প্রণয় সঙ্গীতের অনুবাগী ছিলেন। একদা তিনি মুগ্ধ বিস্ময়ে বন্ধু গৌরদাস বসাককে লিখেছিলেন, I mean to try Nidhoo's ode as soon I get my Pandit.

শুধু প্রণয়-সঙ্গীত নয়—অন্য ভাবের গানও নিধুবাবু রচনা করেছেন ঃ

যদি সুখী হইবে হে মন রাজন,
অহঙ্কার দূর কর, ক্রোধ নিবারণ।

অথবা—

নানান দেশে নানান ভাষা
বিনা স্বদেশীয় ভাষা, পুরে কি আশা।।
হ্রদ নদে কত নীর কিবা বল চাতকীর?
ধারা জল বিনে তার মিটে কি তিয়াসা?

মাতৃ ভাষার প্রতি এমনি অকৃত্রিম অনুবাগ এক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছাড়া সে যুগের বাঙ্‌লা সাহিত্যে বিরল।

মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে নিধুবাবু স্বরচিত গীতগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য এই গ্রন্থের নাম 'গীতরত্ন'। গীতরত্ন প্রকাশের কারণ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন,

এই গীত সকলে বহু দিবসাবধি সুন্দর রূপ ব্যক্ত থাকাতে কোন প্রকারে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিতে আমার বাসনা ছিল না, এক্ষণে সময়ক্রমে এই কারণ বশতঃ সর্ব্বসাধারণ গুণগ্রাহীগণের অবগতির জন্য মুদ্রাঙ্কিত করিতে হইল। এই গীত সকলের অল্প অল্প অংশ অশুদ্ধ করিয়া আমার অজ্ঞাতে প্রচার করিতে লাগিল। কিঞ্চিৎকাল পরে তাহা হইতে অধিকাংশ ভূরি ভূরি বর্ণাশুদ্ধি এবং অশুদ্ধপদে পূর্ণিত করিয়া প্রচার করিল। এই নিমিত্ত বিবেচনা করিলাম, মৎকৃত সঙ্গীতসকল এক্ষণে ও যদ্যপি বাস্তবিক এবং শুদ্ধরূপ প্রকাশিত

না হয়, তবে হানি আছে। এই আশঙ্কা প্রযুক্ত প্রকাশ কবিলাম।” তথাপি নিধুবাবুব অনেক গান শ্রীধব কথকেব নামে চলে। শ্রীধব কথকও সে যুগেব একজন খ্যাতনামা কবি ছিলেন।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে নিধুবাবু পবলোকগমন কবেন। কবিবব নবকৃষ্ণ ঘোষ নিধুবাবুব প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন কবে লিখেছেন,

বাঙ্গালীব 'সাবি মিএগ্রা তুমি গীতকাব
টপ্পা গানে বাঙ্গালীব স্বকৃত গজল এ
'তোমাবি তুলনা তুমি মহী মণ্ডলে'
বসে, ভাবে, সুবে, তব গীত একাকাব
কি গভীব ভাব যোগ্য কথায তোমাব
ফুটিযা তুলিযা যেন যাদু মন্ত্র বলে
ববি কবে পদ্ম পত্রে বাবি কণা জ্বলে
প্রেমেব স্বভাব তুমি, বুঝিলে সাব।
সুবজ্ঞ সুপণ্ডিত তুমি সঙ্গীত কলায
তাই সব প্রেম গীতে কথাব বাঁধুনী
শক্তি পেযে সুব লযে মীব মূর্ছনায
দ্বিগুণিত হযে আজো প্রাণে বাজে শুনি
প্রবাহিত কবে গেছ তুমি বাঙলায
মানবীয প্রেম বস গীত সুবধ্বনি।

*অগ্রহাযণ* ১৩৬৬

# কালিদাসের যুগে ভারতবর্ষ

## প্রবোধচন্দ্র সেন

প্রাচীন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস ঠিক কোন্ সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তা এখনও সম্পূর্ণ নিঃসংশয়ে বলা যায় না। তবে আজকাল ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে, কালিদাস খুব সম্ভব খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথম ভাগে তাঁর অমর কাব্যগুলি রচনা করেছিলেন। সে সময়ে উত্তর-ভারতে গুপ্তবংশীয় সম্রাটগণের অখণ্ড প্রতাপ। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত পরাক্রমাংক আর্যাবর্ত্তের রাজাদের পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করে উত্তর-ভারতের অধিকাংশ স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। তারপর তিনি দক্ষিণাপথ জয় করার উদ্দেশ্যে বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম তীরপথে অগ্রসর হয়ে দক্ষিণ-কোশল প্রভৃতির বহু জনপদের অধিপতিদের পরাভূত করে আধুনিক মাদ্রাজ নগরের নিকটবর্ত্তী কাঞ্চী রাজ্যে উপনীত হলেন। কিন্তু তিনি দক্ষিণাপথের বিজিত জনপদগুলি স্বীয় অধিকারভুক্ত করলেন না ; আনুগত্য স্বীকারের পর পরাজিত রাজাদের রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন। এই অস্ত্র-বিজিত ভূখণ্ডের বাইরেও সমুদ্রগুপ্তের রাজশক্তি বহু বিভিন্ন জনপদে স্বীকৃত হয়েছিল। পূর্ব্বে সমতট অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গ এবং কামরূপ বা আসাম, উত্তরে নেপাল, পশ্চিমে পাঞ্জাব ও রাজপুতানার অন্তর্গত মালব, যৌধেয় প্রভৃতি জাতিদের রাজ্যেও সমুদ্রগুপ্তের রাজপ্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তা-ছাড়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কুষাণ রাজ্য এবং মালবের শক রাজারাও মগধের গুপ্ত রাজশক্তির প্রাধান্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। আর সুদূর সিংহল-দ্বীপেও সমুদ্রগুপ্তের প্রভাব প্রসার লাভ করেছিল। সুতরাং দেখতে পাচ্ছি, কামরূপ থেকে গান্ধার (অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত) এবং নেপাল থেকে সিংহল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রান্তেই সমুদ্রগুপ্তের শক্তি ও খ্যাতি পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। একমাত্র অশোক ছাড়া সমুদ্রগুপ্তের পূর্ব্ববর্ত্তী আর কোনো রাজার আমলেই এমন সমগ্র ভারতব্যাপী শক্তি ও খ্যাতির পরিচয় পাওয়া যায় না। মৌর্য যুগের পর ভারতীয় রাজশক্তি বহুধা খণ্ডিত হয়ে পড়ে এবং অখণ্ড ভাবতের ধারণাও সম্ভবত কিছুকালের জন্য তিরোহিত হয়। কয়েক শতাব্দী পরে আবার অখণ্ড ভারত-বোধের পরিচয় পাই গুপ্তযুগের সাহিত্যে। আর ওই সাহিত্যের মধ্যে এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য হচ্ছে সমুদ্রগুপ্তের মহা সেনাপতি কবি হরিষেণের একখানি প্রশস্তিকাব্য এবং মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত ও রঘুবংশ নামক দুখানি কাব্য। হরিষেণের প্রশস্তিখানি প্রয়াগে মৌর্যরাজ অশোকেব একটি স্তম্ভের গায়ে উৎকীর্ণ আছে; ওই উৎকীর্ণ লিপি থেকেই আমরা সমুদ্রগুপ্তের দিগ্‌বিজয় কাহিনী ও তৎকালীন ভারতের রাষ্ট্রবিভাগের কতকটা পরিচয় পাই। সমুদ্রগুপ্তের পর তৎপুত্র চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের (৩৮০-৪১৩) সময়ে গুপ্ত সাম্রাজ্যের আয়তন ও খ্যাতি প্রতিপত্তি আরও

বেড়ে যায়। রাজ্যগ্রহণের অল্পকাল পরেই চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য সুরাষ্ট্র (কাঠিয়াবার) ও মালবের শক রাজাকে পরাজিত করে ওই দুই জনপদ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। গুপ্তসম্রাটগণের আদি রাজধানী ছিল মগধের (দক্ষিণ বিহারের) পাটলিপুত্র নগরে। মালব রাজ্যাধিকারের পর শকারি বিক্রমাদিত্য অর্থাৎ সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত উক্ত রাজ্যের প্রধান নগরী উজ্জয়িনীকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানীরূপে গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে করার হেতু আছে। মহাকবি কালিদাস এই চন্দ্রগুপ্তের আমলে উজ্জয়িনী নগরীতে অন্তত কিছুকাল বাস করেছিলেন বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। মেঘদূত কাব্যে কালিদাস উজ্জয়িনীকে স্বর্গগামীদের পুণ্যবলে ধরাতলে আনীত একখানি অতি সুন্দর স্বর্গ-খণ্ড বলে বর্ণনা করেছেন। ভারতবর্ষের আর কোনো স্থানকে কালিদাস এত খানি মর্যাদা দেন নি। এর থেকেই মনে হয়, কালিদাস খুব সম্ভব বিক্রমাদিত্যের রাজধানী বিশাল উজ্জয়িনী নগরীর অধিবাসী ছিলেন। পূর্ব্বেই বলেছি, মৌর্যযুগের পরে এই সময়ে আবার সমগ্র ভারতবর্ষের চেতনা ভারতবাসীর মনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কালিদাসের কাব্যেই তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। শুধু অখণ্ড-ভারতবর্ষের চেতনা নয়, কালিদাসেব কাব্যে যে গভীর ও নিবিড় ভারত-প্রীতির পরিচয় পাই সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যে তার তুলনা বিরল। ভারতবর্ষের প্রতি প্রান্তের নদী পর্ব্বত জনপদ প্রভৃতির সঙ্গে ভারতের এই শ্রেষ্ঠ কবির যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাঁর কাব্যগুলিতে পাওয়া যায় তা সত্যই বিস্ময়কর। সুদূর বংক্ষুনদী বা আমুদরিয়া থেকে তাম্রপর্ণী নদী এবং আসামের অন্তর্গত প্রাগজ্যোতিষপুর থেকে কুমারিকা অন্তরীপের নিকটবর্তী মলয় পর্ব্বত পর্য্যন্ত ভাবতবর্ষেব প্রত্যেক অংশই কবিচিত্তের প্রীতিরসে অভিষিক্ত হয়ে যে মহিমা অর্জন করেছে আজও তা আমাদের হৃদয়কে অভিভূত করে। বস্তুত রামায়ণ, মহাভারত, পুরান, কৌটিল্যেব অর্থশাস্ত্র, বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা, কালিদাসের কাব্য, রাজশেখরের কাব্যমীমাংসা প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ভারতবর্ষকে সমগ্রভাবে আয়ত্ত ও উপলব্ধি করার যে ঐকান্তিক প্রয়াস দেখতে পাই, আধুনিক ভারতের প্রাদেশিক সাহিত্যে তার চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট নেই। এটা সত্যই বড় আক্ষেপের বিষয়। প্রাচীন কালে তীর্থ পর্যটন প্রভৃতি নানা উপলক্ষে সমগ্র দেশের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় স্থাপনের যে ব্যবস্থা ছিল, আধুনিক বিজ্ঞানের যুগেও তার পরিবর্ত্তে কোনো সন্তোষজনক ব্যবস্থার উদ্ভব হয় নি। তাব ফল এই হয়েছে যে, আজকাল আমরা স্কুলপাঠ্য ভূগোলপুস্তকেব সাহায্যে ভারতবর্ষকে চিনতে পারলেও তাকে অন্তরের মধ্যে কিছুতেই উপলব্ধি করতে পারিনে।

কালিদাস তাঁর কাব্যগুলিতে নানা উপলক্ষে তৎকালীন ভারতবর্ষকে সমগ্রভাবে বা আংশিকভাবে বর্ণনা করেছেন। এই সবগুলি বর্ণনা একত্র মিলনে গুপ্তযুগের ভারতবর্ষের যে চমৎকার চিত্রটি ফুটে ওঠে তা সত্যই অপূর্ব্ব। রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে রঘুর দিগ্‌বিজয় বর্ণনা উপলক্ষে কবি ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রান্তেরই একটি অতি মনোবম বিববণ দিয়েছেন। আবার ঐ কাব্যের ষষ্ঠ সর্গে ইন্দুমতীব স্বয়ংবর-সভায় আগত রাজকন্যার পাণিপ্রার্থী নরপতিদের বর্ণনা-প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের বহু জনপদের উল্লেখ করেছেন। তারপর ঐ কাব্যেরই ত্রয়োদশ সর্গে রাক্ষসপুরী থেকে সীতাকে উদ্ধার কবে রামচন্দ্র যখন পুষ্পক-বথে আরোহণ

করে আকাশমার্গে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন তাঁর বর্ণনা উপলক্ষে কবি সিংহল থেকে অযোধ্যা পর্য্যন্ত রামচন্দ্রের পথরেখার একটি অপূর্ব্ব চিত্র অংকন করেছেন। আর তাঁর মেঘদূত-কাব্যে বিরহী যক্ষের বার্ত্তাবাহী দূতরূপী মেঘের পথ নির্দেশ উপলক্ষে বিন্ধ্যপর্ব্বত ও নর্ম্মদা-নদীর দক্ষিণস্থিত রামগিরি থেকে হিমালয়ের পরপারস্থিত কৈলাসপর্ব্বত ও মানস সরোবর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের যে ছবিটি এঁকেছেন, তা যুগে যুগে ভারতবর্ষের চিত্তকে মুগ্ধ করেছে। ভারতবর্ষের সমগ্র উত্তরসীমাব্যাপী বিশাল হিমালয় পর্ব্বতের একটি বর্ণনা পাই কুমারসম্ভব কাব্যের প্রথম সর্গে ; আর ভারতবর্ষের দক্ষিণদিকবর্ত্তী মহাসমুদ্রের একটি বর্ণনা পাই রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গে। এই সবগুলি বর্ণনা একত্র মিলিয়ে পাঠ করলে তদনীন্তন ভারতবর্ষের একটি অখণ্ড ছবি যেন চোখের সামনে প্রত্যক্ষবৎ ভেসে ওঠে। রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে দেখি রাজা রঘু দিগ্‌বিজয়-বাসনায় ষড়্‌বিধ সেনাদল নিয়ে প্রথমেই পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হলেন। সুহ্ম অর্থাৎ দক্ষিণ রাঢ়ের অধিবাসীবা বেতস লতার ন্যায় নত হয়ে আত্মরক্ষা করল। তৎপরে রঘু গঙ্গাস্রোতোন্তরবর্ত্তী বঙ্গদেশে (আধুনিক প্রেসিডেন্সী বিভাগ) উপনীত হয়ে নৌযুদ্ধ-নিপুণ বাঙালীদের পরাজিত করে ঐ দেশে জয়স্তম্ভ স্থাপন করলেন এবং বাংলা দেশের কলম ধান্য অর্থাৎ রোয়া ধান যেমন প্রথমে উৎখাত ও পরে প্রতিরোপিত হয়ে প্রচুর শস্য দান করে বঙ্গদেশের রাজাও তেমনি প্রথমে রাজ্যচ্যুত ও পবে রাজপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে রাজা রঘুকে প্রচুর উপহার দিয়ে সংবর্ধনা করেছিলেন। তৎপবে তিনি কপিশা অর্থাৎ মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাসাই নদী উত্তীর্ণ হয়ে উৎকল (উত্তর উড়িষ্যা) দেশের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে কলিঙ্গ অর্থাৎ বৈতরণী ও গোদাবরী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী দেশে উপস্থিত হলেন। তাম্বুল, নারিকেল ও মহেন্দ্র পর্বতের জন্য কলিঙ্গ বিখ্যাত। এই দেশের অধিপতিকে পরাভূত ও স্বপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে ধর্ম্মবিজয়ী রঘু আরও দক্ষিণে কাবেরী নদী অতিক্রম করে মরীচ, এলা ও চন্দন-সুরভিত মলয়-পর্ব্বতের উপত্যকাস্থিত পাণ্ড্য (দক্ষিণ তামিল) দেশে গিয়ে তাম্রপর্ণী-সাগর সংগমে জাত প্রচুর মুক্তা উপহার গ্রহণ করলেন। তৎপরে তিনি ক্রমে দদূর (সম্ভবত নীলগিরি) ও সহ্য (পশ্চিম ঘাট) পর্ব্বত অতিক্রম করে কেরল (ত্রিবাংকুর ও মালাবার) দেশে প্রবেশ করলেন। তৎপর অপরান্ত (কোংকন) দেশের চিত্রকূট পর্ব্বতের পার্শ্ব দিয়ে এগিয়ে পারসীকদের দেশে গিয়ে যবনদের অর্থাৎ পারসীকদের অসংখ্য শ্মশ্রুমণ্ডিত শির ভূপতিত করেন। পরে তিনি উদীচ্য দেশ জয়ে অগ্রসর হয়ে বংক্ষু অর্থাৎ আমুদরিয়াব তীরবর্ত্তী কুংকুম-রঞ্জিত বাহ্লীক দেশে উপনীত হলেন। সেখানে হূণদের যুদ্ধে পবাজিত করে রাজা রঘু আধুনিক কাশ্মীরের অন্তর্গত কাম্বোজ দেশের মধ্য দিয়ে হিমালয়ের উপত্যকায় প্রবেশ করেন। ক্রমে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হয়ে গঙ্গা নদী। অতিক্রম করে ও কিরাত প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতিদের বিধ্বস্ত করে তিনি লৌহিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে কালা গুরুদ্রুম শোভিত প্রাগ্‌জ্যোতিষ-রাজ্যে প্রবেশ করেন। তৎপর ভয়ত্রস্ত কামরূপাধিপতি অসংখ্য রত্ন পুষ্পোহার দ্বাবা দিগ-বিজয়ী রঘুর চরণ বন্দনা করেন। এভাবে সুহ্ম বা রাঢ় দেশ থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে কামরূপ বা আসামে এসে রঘুর দিগ্‌বিজয় সমাপ্ত হয়। এই বর্ণনাটিতে শুধু ভারতবর্ষের সীমান্তস্থিত

নদী-পর্ব্বত জনপদ গুলিরই উল্লেখ আছে, ভারতবর্ষের মধ্যবর্ত্তী জনপদসমূহের কোনো উল্লেখ নেই—এটা লক্ষ্য করার বিষয়।

রঘুবংশের ষষ্ঠ সর্গে বিদর্ভ (অর্থাৎ আধুনিক বেরার) দেশের রাজার ভগিনী ইন্দুমতীর স্বয়ংবর-সভাব বর্ণনা উপলক্ষে ভারতবর্ষের আর একটি চিত্র আমাদের সম্মুখে উদঘাটিত হয়েছে। স্বয়ংবর-সভায় বহু জনপদের বাজন্যবৃন্দ উপস্থিত হয়েছেন, তার মধ্যে রঘু-পুত্র কুমার অজও উপবিষ্ট আছেন। এমন সময় বিবাহবেশে সজ্জিতা পতিম্বরা রাজকন্যা ইন্দুমতী পরিচারিকা-সহ স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত হলেন। নৃপতিগণের চরিত্র ও বংশ বিষয়ে অভিজ্ঞা এবং পুরুষের মত প্রগল্‌ভা সহচরী সুনন্দা ইন্দুমতীকে একে একে রাজাদের কাছে নিয়ে গিয়ে প্রত্যেকের পরিচয় দিতে লাগল এবং ইন্দুমতী যখন রাজাদের অতিক্রম করে যেতে লাগলেন তখন তাঁদের আশা-সমুজ্জ্বল মুখগুলি একে একে নৈরাশ্যের অন্ধকারে কালো হয়ে গেল। যাহোক, সুনন্দা প্রথমেই ইন্দুমতীকে মগধের (দক্ষিণ বিহারের) রাজার কাছে নিয়ে মগধরাজের পরিচয় দিলে; সব শুনে ইন্দুমতী তাঁকে একটি শুষ্ক প্রণাম করে অন্য রাজার দিকে অগ্রসর হলেন। তারপর অঙ্গ (মুঙ্গের ও ভাগলপুর জেলা) দেশেব অধিপতিকেও প্রত্যাখ্যান করে সিপ্রানদীতীরস্থিত অবন্তি (অর্থাৎ মালব)-রাজের নিকট গেলেন। তারপর অনূপ বা দক্ষিণ মালবের অধিপতির পালা, ঐ জনপদের বাজধানী রেবা অর্থাৎ নর্ম্মদা নদীর তীরস্থিত মাহিষ্মতী (আধুনিক মান্ধাতা) নগরীর খ্যাতিও ইন্দুমতীর চিত্তকে আকৃষ্ট করতে পারল না। তারপর ক্রমে ক্রমে কালিন্দী অর্থাৎ যমুনার তীরবর্ত্তী শূরসেন বা মথুরা রাজ্য, পূর্ব্ব সমুদ্রের তীরস্থিত মহেন্দ্র পর্ব্বত শোভিত কলিঙ্গ দেশ, মলয় পর্ব্বতের উপত্যকাস্থিত তাম্বুল লতা ও গুবাক বৃক্ষ এবং এলা লতা ও চন্দন বৃক্ষ শোভিত পাণ্ড্য (রাজধানী উরগপুর) প্রভৃতি জনপদের অধিপতিদের উপেক্ষা করে অবশেষে ইন্দুমতী উত্তর কোশলের অধিপতি রঘুর পুত্র অজেব কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ কবেন। এই বর্ণনাটিতে ভাবতবর্ষের মধ্যবর্ত্তী কতকগুলি নূতন জনপদেব নাম পাওয়া গেল।

ভাবতবর্ষেব তৃতীয় ভৌগোলিক বিবরণ পাই রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গে। রামচন্দ্র রাবণ বিনাশের পর সীতাসহ পুষ্পকরথে আরোহণ করে আকাশ-পথে লংকা থেকে অযোধ্যায় ফিরে চলেছেন। পুষ্পক রথ দ্রুতবেগে উড়ে চলেছে এবং দক্ষিণ ভারতের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক দৃশ্য ঘন ঘন পটপরিবর্ত্তনেব মত একে একে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে, আর রামচন্দ্র সীতার নিকট ঐ সব দৃশ্যের বর্ণনা করছেন। লংকা ছেড়ে প্রথমেই চোখে পড়ল রামেশ্বর সেতুবন্ধ। শবৎকালে ছায়াপথ যেমন তারকাখচিত সুনীল আকাশকে দ্বিধা বিভক্ত করে, মলয় পর্ব্বত থেকে লংকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ঐ সেতুটিও তেমনি ফেনখচিত নীল সমুদ্রকে দ্বিধা বিভক্ত করেছে। তারপর নক্র-শংখসংকুল সমুদ্রের শোভা দেখতে দেখতে দূর থেকে তমাল ও তালবন-শোভিত বেলাভূমি একটি বৃহৎ লৌহচক্রের প্রান্তস্থিত কলংক রেখার ন্যায় দৃষ্টিগোচর হল। অতঃপর পম্পা অর্থাৎ তুঙ্গভদ্রা এবং গোদাবরী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী জনস্থান, পঞ্চবটী প্রভৃতি জনপদ ও মাল্যবান্‌ পর্ব্বত আবির্ভূত হয়ে রাম ও সীতার মনে বনবাসকালের কত আনন্দ-বেদনার স্মৃতি জাগিযে ছিল। দেখতে দেখতে প্রয়াগের নিকটবর্ত্তী

চিত্রকূট পর্ব্বত এসে উপস্থিত হল; অদূরে স্বচ্ছসলিলা মন্দাকিনী নদী প্রবাহিত হচ্ছে—মনে হচ্ছে যেন চিত্রকূটের পার্শ্ববর্ত্তী ভূমি কণ্ঠদেশে একছড়া মুক্তার মালা পরেছে। তারপরেই এল শুভ্রসলিলা গংগা ও নীল-সলিলা যমুনার অপূর্ব্ব সংগমস্থল। সর্ব্বশেষে উত্তর কোশলের সুবিখ্যাত সরযূ নদী দৃষ্টিগোচর হল—দেখা মাত্রই রামচন্দ্রের মনে হল যেন জননী কৌশল্যার মতই ঐ নদীটি তাঁকে তরঙ্গহস্ত প্রসারিত করে বুকে টেনে নিতে ব্যাকুল হয়েছে। অতঃপর রাম ও সীতা পুষ্পক রথ থেকে অবতরণ করে প্রতীক্ষমাণ বশিষ্ঠ, ভরত ও প্রজাবৃন্দ কর্তৃক অভ্যর্থিত হয়ে অযোধ্যার সংলগ্ন সাকেত নগরের একটি সুরম্য উপবনে গিয়ে কিছুকাল অবস্থান করেন। এই বর্ণনাটিতে সুস্পষ্ট কারণবশত কালিদাসের যুগের চেয়ে রামায়ণের যুগের ভৌগোলিক চিত্রটিই অধিকতর পরিস্ফুট হয়েছে।

কালিদাসের যুগের ভারতবর্ষের আর একটি ভৌগোলিক বিবরণ পাই মেঘদূত কাব্যের পূর্ব্ব খণ্ডে। এটি স্পষ্টতই কালিদাসের নিজের যুগের বর্ণনা এবং এ বর্ণনার অনেকটাই কবির নিজের ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাজাত বলে মনে হয়। ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ছাপ রয়েছে বলেই মেঘদূতের দেশ বর্ণনা রঘুবংশের দেশ বর্ণনার চেয়ে আমাদের চিত্তকে অধিকতর আকর্ষণ করে। কোনো সময়ে এক যক্ষ কর্ত্তব্যে অবহেলা করার দরুণ প্রভু কর্তৃক এক বৎসরের জন্য নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে রামগিরি (আধুনিক নাগপুরের নিকটবর্ত্তী রামটেক) পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করে। কয়েক মাস পরে নব বর্ষার আবির্ভাবকালে পত্নী-বিরহকাতর যক্ষ একটি মেঘকে দৌত্যে বরণ করে হিমাদ্রির পরপারস্থিত অলকাপুরীতে পতি-বিরহবিধুরা পত্নীর নিকট প্রেরণ করে এবং মেঘ কোন্ পথ ধরে অলকায় যাবে তার নির্দেশ দান করে। এই নির্দেশদান উপলক্ষেই কবি তৎকালীন ভারতবর্ষের একাংশের একটি অতি অপূর্ব্ব বর্ণনা করেছেন। রামগিরির নিকট বিদায় নিয়ে উত্তরদিকে মালভূমির উপর দিয়ে একটু এগিয়েই পক্ক আম্র শোভিত আম্রকূট পর্ব্বত। আর একটু অগ্রসর হলেই হস্তী দেহে অংকিত শ্বেত রেখার ন্যায় বিন্ধ্য পর্ব্বতের পাদদেশে শীর্ণকায় রেবা অর্থাৎ নর্ম্মদা নদী দেখা যাবে। তারপরেই সুবিখ্যাত দশার্ন (পূর্ব্ব মালব) দেশ, সেখানে বাগানে বাগানে কেয়া ফুটেছে, গাছে গাছে কালো জাম পেকেছে, গ্রামের বড় বড় গাছে গৃহবলিভুক্ পাখীরা বাসা বেঁধেছে; এই দশার্ন দেশেই বেত্রবতী (অর্থাৎ বেতোয়া) নদীতীরে সুবিখ্যাত রাজধানী বিদিসা নগরী (আধুনিক বেস্ নগর) অবস্থিত। তারপর মেঘ নীচৈঃ নামে একটি পাহাড় ও একটি ধননদী অতিক্রম করে একটু বাঁকা পথে উজ্জয়িনীর দিকে অগ্রসর হবে; পথে পড়বে নির্ব্বিন্ধ্যা অর্থাৎ আধুনিক নির্ব্বাক্ ও কালীসিন্ধু নদী। তারপর অবন্তি (পশ্চিম মালব) দেশে পৌঁছে ধরাতলে স্বর্গতুল্য শিপ্রা নদীতীরে অবস্থিত বিশাল উজ্জয়িনী পুরীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। উজ্জয়িনীর অনতিদূরে শিপ্রার শাখা গন্ধবতীর তীরে সুবিখ্যাত মহাকালের মন্দির অবস্থিত। এই বিশাল নগরীর অতুল ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য করে একটু এগিয়েই মেঘ ক্ষীণকায় গম্ভীরা নদী ও তৎপর দেবগিরি (আধুনিক দেবগড়)-স্থিত কার্ত্তিকেয়ের মন্দির দেখতে পাবে। আরও অগ্রসর হয়ে চর্ম্মন্বতী অর্থাৎ আধুনিক চম্বলা নদী অতিক্রম করে মেঘ দশপুর (সিন্ধিয়ার রাজ্যের মন্দশোর) নগরে

উপনীত হবে। অতঃপর মেঘ দ্রুতগতিতে ব্রহ্মাবর্ত্ত অর্থাৎ আধুনিক থানেশ্বর অঞ্চল ও সরস্বতী নদী পার হয়ে কনখলের নিকটে যেখানে জাহ্নবী হিমালয় থেকে অবতীর্ণ হচ্ছেন সেখানে যাবে। তারপরে হিমালয়ের সানুদেশের সমস্ত সৌন্দর্য দর্শন করে যক্ষের দূতরূপী মেঘ অবশেষে ক্রৌঞ্চ রন্ধ্র নামক গিরিসংকটের মধ্য দিয়ে তিব্বতের অন্তর্গত সুবিখ্যাত মানস সরোবর ও তার নিকটবর্ত্তী কৈলাস পর্ব্বতের উপরে অবস্থিত কবি কল্পিত অলকাপুরীতে পৌঁছোবে। মেঘদূতের পাঠককেও এখানে বাস্তব জগৎ থেকে কল্পনা জগতে প্রবেশ করতে হয়। এই বর্ণনাটিতে দশার্ন ও অবন্তির ছোট খাটো পরিচয়গুলিও কবি অতি সযত্নে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেছেন, অন্যান্য জনপদের বর্ণনায় কবির এমন পুংখানুপুংখ প্রয়াসের পরিচয় পাওয়া যায় না। তার থেকেই মনে হয় দশার্ন ও অবন্তি জনপদের সঙ্গে কবির ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। এই পরিচয়ের জন্যেই পূর্ব্ব মেঘের জনপদ-বর্ণনার রস এমন নিবিড় হয়ে উঠেছে।

যাহোক্, বংক্ষু নদী থেকে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর এবং সিংহল দ্বীপ থেকে মানস সরোবর পর্যান্ত সমগ্র ভারতবর্ষের সম্বন্ধে কালিদাসের যে গভীর জ্ঞান ও প্রীতির আকর্ষণ ছিল, আশা কবি এই আলোচনা থেকে তার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাবে। বস্তুত প্রাচীন বা আধুনিক আর কোনো কবির কাব্যেই ভারতবর্ষের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের নিদর্শন পাওয়া যায় না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে অখণ্ড ভাবতবর্ষ সম্বন্ধে এমন গভীর উপলব্ধির পরিচয় থাকা সত্ত্বেও কালিদাসের কাব্যে 'ভাবতবর্ষ' এই নামটি কিংবা তার কোনো প্রতিশব্দও পাওয়া যায় না। কিন্তু নাম না থাকলেও ভারতবর্ষের যে রূপটি তাঁর কাব্যে ফুটে উঠেছে তা চিবকাল অক্ষয় হয়ে বিবাজ করবে।

*আষাঢ়, ১৩৪৬*

# কলম্বাসের পূর্ব্বে আমেরিকা আবিষ্কার

## ভাগবতদাস বরাট

আমেরিকার প্রথম আবিষ্কারক কলম্বাস—এ তথ্য সবারই জানা আছে। স্পেন দেশের তদানীন্তন রাজা ফার্ডিনাণ্ড ও রাণী ইসাবেলার অর্থসাহায্য নিয়ে খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত ইতালীয় নাবিক ক্রিস্টোফার কলম্বাস্ ভারতবর্ষ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে সমুদ্রযাত্রা করেন। তাঁর প্রথম আবিষ্কার বামাস, কিউবা, ও অপরাপর পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং তৃতীয়বারের সমুদ্রযাত্রায় তিনি দক্ষিণ আমেরিকার নিম্নভূমিতে অবতরণ করেন খৃষ্টাব্দে।

এরপর অপর এক ইতালীয় নাবিক আমেরিগো ভেসপুচি খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় পৌঁছান। তিনি জানতেন না যে তাঁর ঠিক এক বৎসর আগে কলম্বাস আমেরিকায় এসেছিলেন। তিনি ভাবলেন যে তিনিই এই দেশটির প্রথম ও প্রধান আবিষ্কর্ত্তা। সুতরাং ঐ নূতন দেশের নাম তিনি স্বনামে আখ্যাত করেছিলেন। অনেকের ধারণা,—এই দু'জনই আমেরিকার আবিষ্কারক। এ কথা ঐতিহাসিক সত্য।

কিন্তু কয়েক বছর পূর্ব্বে দীর্ঘ গবেষণার পর দক্ষিণ আফ্রিকার একজন বৈজ্ঞানিক এই প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে দৃঢ়তর প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর মতে কলম্বাসের প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে কয়েকজন আরবীয় নাবিক কর্তৃক আমেরিকার প্রথম আবিষ্কার হয়। উইট ওয়াটারস্ র‍্যাণ্ড নামক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ ডি. ডবলিউ, জেফ্রিজ জোহানেসবার্গের এক সভায় জানান যে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের প্রায় চার শ' বৎসর পূর্ব্বে কয়েকজন আরবীয় নাবিক আমেরিকা আবিষ্কার করেন। তাঁদের আবিষ্কারের কাল ১০০০ খৃষ্টাব্দে বা তার কিছু পবে মনে হয়।

কলম্বাস যখন আমেরিকার মাটিতে পদার্পণ করেন সেই সময় তিনি দেখতে পান যে সেখানে কতকগুলো ছোট ছোট নিগ্রো কলোনী গড়ে উঠেছে; এই নিগ্রোরা আরবাধিকৃত অঞ্চলের ক্রীতদাসদের বংশধর। প্রভুমালিকদের অত্যাচার থেকে উদ্ধার পাবার মানসে তারা গোপনে এই সকল স্থানে এসে বসবাস করে।

অধুনা টেক্সাস নদীগর্ভে কতকগুলো নিগ্রো হামাটিক কঙ্কাল পাওয়া গেছে। এই কঙ্কালসমূহ প্রাপ্তিব পর এই ধাবণা আরও বদ্ধমূল হয় যে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্ব্বে অপর কারো দ্বারা আমেরিকা নিশ্চয়ই আবিষ্কৃত হয়েছে। ডাঃ জেফ্রিজের অভিমত এই যে আরবেরাই আফ্রিকাজাত শস্য বীজ নিয়ে গিয়ে সর্ব্বপ্রথম আমেরিকায় কৃষিকার্য্যের প্রবর্ত্তন করে এবং আমেরিকাজাত শস্যাদিও আফ্রিকায় নিয়ে আসে।

কলম্বাসই যে প্রথম আমেরিকা আবিষ্কারক নয়,—এ কথা স্বীকার করেন কানাডাবাসী

সুধী ঐতিহাসিক জন্ মারে জিবন। কয়েক বৎসর গভীর গবেষণার পর জন্ মারে জিবন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে ৪৯৯ খৃষ্টাব্দে এশিয়াবাসী চৈনিক বৌদ্ধভিক্ষু হিউসান প্রথম প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করে আমেরিকা আবিষ্কার করেন। তাঁর "Steel of Empire" গ্রন্থে এ বিষয়ের উল্লেখ করে তিনি বলেছেন,—"America was first discovered from abroad by a Chinese Buddhist Priest named Hui Sien, who crossed the Pacific and landed somewhere around what is now Vancouver in 499 A. D."

অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৯৯ সালে জনৈক চৈনিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করে বর্ত্তমান ভ্যাঙ্কুভারের নিকট কোনও স্থানে অবতরণ করেন। কোন বিদেশী কর্তৃক ইহাই প্রথম আমেরিকা আবিষ্কার।

উত্তর আমেরিকার অবিষ্কারক যে একজন চৈনিক তা প্রমাণ করবার জন্যে Steel of Empire গ্রন্থের লেখক বহু তথ্যের উল্লেখ করেছেন। Liang রাজবংশের রাজত্বকালে "ফুসাঙ্" পবিভ্রমণ করেছেন বৌদ্ধ বিক্ষু হিউ সান। ইহা ঐতিহাসিক সত্য। পরবর্ত্তীকালে কয়েকজন ভৌগোলিক ও প্রাচ্যদেশীয় পণ্ডিত আমেবিকাকে ফুসাঙ্ নামে অভিহিত করেছেন। রাজবংশের ইতিহাসের এক অধ্যায়ে এইরূপ উল্লেখ আছে—"During the reign of * Tsi Dynesty in the first year of the year (A. D 499) Came a Biddhist priest from the kingdom, who bore the cloister name of Hocischin (or Hui Sien meaning universal compassion) to the present district of Hunwong who narrated that Fusang is about* 20,000 chinese miles in an easterly direction from Tahau (Alaska) and east of the middle kingdom."

Tom Macinnes নামে আর একজন কানাডার লেখক "Chinook Days" নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। এতে তিনি লিখেছেন যে "Chinese had visited Nootka in the west coast of Vancouver island a thousand years before Columbus discovered America."

অর্থাৎ কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের এক হাজার বৎসর আগে চীনারা ভ্যাঙ্কুভারের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত নৌটকাতে এসেছিল।

প্রাচ্য দেশীয় বিখ্যাত পণ্ডিত Samuel Couting এই মত স্বীকার করেন।

চীনদেশের ইতিহাস পাঠে আমরা জানতে পারি যে সেখানে ৪৯৯ খৃষ্টাব্দে Tsi রাজবংশ রাজত্ব করত। এই Tsi রাজবংশের মুদ্রা জনৈক নাবিক কর্তৃক নৌটকাতে আবিষ্কৃত হয়েছে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে।

সে যাই হোক, এই সব তথ্য হতে প্রমাণিত হয় যে কলম্বাসের আমেরিকায় পদার্পণের পূর্ব্বে আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়েছিল। কলম্বাস আমেরিকার প্রথম আবিষ্কারক নয়।

---

* চীনের ইতিহাস হতে জানা যায় যে ৪৯৯ খৃষ্টাব্দে ওখানে টাঁস (Tsi) রাজবংশ রাজত্ব করত।

*অগ্রাহায়ণ, ১৩৭১*

# শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস যাত্রা

## রমেশচন্দ্র মজুমদার

রামায়ণে বর্ণিত শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস যাত্রার কাহিনী করুণ রসের আধার—দুই হাজার বছরেরও বেশী ইহা ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ নরনারীর চিত্ত দ্রব করিয়াছে। কিন্তু করুণ রস ছাড়াও ইহাতে প্রাচীন ভারতের যে ভৌগোলিক বিবরণ আছে আজ তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। শ্রীরামচন্দ্রের ঐতিহাসিকতা অর্থাৎ সত্য সত্যই এই নামে কোন মানুষ ছিলেন কিনা, এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু কাল্পনিক কাহিনী হইলেও রামায়ণের রচয়িতা ইহাকে বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই জন্যই তিনি ভৌগোলিক যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা মোটামুটিভাবে প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

প্রথমেই বলা আবশ্যক যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রামায়ণের যে সমুদয় পুঁথি আছে তাহাদের মধ্যে গুরুতর পাঠভেদ বর্ত্তমান। ইতালীয় পণ্ডিত গোয়েসিও বাংলাদেশে প্রচলিত পুঁথির উপর নির্ভর করিয়া শতাধিকবর্ষ পূর্ব্বে রামায়ণের যে সংস্করণ প্রকাশিত করেন ইউরোপে তাহাই সমধিক প্রচলিত এবং ইহার উপর নির্ভর করিয়াই পণ্ডিত-প্রবব পার্জিটাব রামচন্দ্রের বনবাস যাত্রার ভৌগোলিক বিবরণ আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গবাসী প্রেস হইতে ঁপঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত যে রামায়ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাহা অনেকাংশে বিভিন্ন। এই দুই গ্রন্থের তুলনা করিলে সহজেই বুঝা যায় যে বঙ্গবাসী সংস্করণই অধিকতর নির্ভরযোগ্য। ঁপঞ্চানন তর্করত্ন লিখিয়াছেন যে তিনি ভারতে প্রচলিত নানাবিধ পুঁথি দেখিয়া এই গ্রন্থ সংকলন করিয়াছেন। কিন্তু আমি যতদূর দেখিয়াছি তাহাতে মনে হয় তিনি বোম্বাই প্রদেশে প্রচলিত রামায়ণের পাঠই হুবহু গ্রহণ করিয়াছেন। মোটের উপর রামায়ণের বঙ্গবাসী সংস্করণকে বোম্বাই সংস্কবণ বলাও চলে। কিন্তু বঙ্গবাসী সংস্করণ বাংলা অক্ষরে লিখিত এবং এদেশে সমধিক পরিচিত— সুতরাং আমরা এই নামই ব্যবহার করিব। তর্কবত্ন মহাশয ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে এই আদিকাব্যের অতিশয় প্রাচীনতা হেতু এরূপ পাঠভেদের উৎপত্তি হইয়াছে যে দুই বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত রামায়ণ যে একই কবির লেখনীপ্রসূত তাহা হঠাৎ মনে হয় না (অস্যাদিকাব্যস্য অতিপ্রাচীনতরা এবং পাঠভেদাঃ সঞ্জাতাঃ যৎপ্রভাবতো দেশদ্বয়ীয়য়োঃ পুস্তকয়োরেককর্ত্তৃকত্ববুদ্ধিরেব সহসা ন স্পিদ্যতে)। একথা অনেকাংশে সত্য।

বঙ্গবাসী সংস্করণের রামায়ণ পাঠে আমরা জানিতে পারি যে রামচন্দ্র সরযূ নদীর তীরস্থিত অযোধ্য হইতে রথে চড়িয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া তমসা নদীর তীবে উপনীত হইলেন এবং প্রজাবর্গের সহিত তথায় সেই বাত্রি যাপন করিলেন। কিন্তু প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই উঠিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন "দেখ অযোধ্যার পৌরজন আমাদের অপেক্ষায়

এক্ষণ পর্য্যন্ত বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া আছেন। ইঁহারা আমাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য যেরূপ যত্ন করিতেছেন উহাতে বোধ হইতেছে যে ইঁহারা প্রাণ-পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিবেন, তথাচ সঙ্কল্প ত্যাগ করিবেন না; অতএব যে পর্য্যন্ত ইঁহারা ঘুমাইয়া থাকেন, আইস, আমবা তন্মধ্যেই শীঘ্র রথে উঠিয়া অকুতোভয়ে পথ অতিক্রম করি।" লক্ষ্মণ ইহাতে সম্মতি দিলে তাঁহারা দ্রুতগতিতে রথে চড়িয়া তমসা নদী পার হইলেন। পরে তিনি পৌবগণকে বঞ্চনা করিবার মানসে সুমন্ত্র-সারথিকে বলিলেন, 'তুমি রথে আরোহণ করিয়াই উত্তর দিকে যাও এবং মুহূর্ত্তকালমাত্র উত্তরাভিমুখে যাইয়া বথ ফিরাইও। যাহাতে পৌরগণ আমার গন্তব্য পথ জানিতে না পারেন তুমি সাবধান হইয়া সেইরূপ কর।' তদনুসারে সুমন্ত্র উত্তর দিকে একটু গিয়া পরে রথ ফিরাইয়া আনিলে রাম লক্ষ্মণ ও সীতাসহ তাহাতে চড়িয়া বনে যাইতে লাগিলেন এবং অবশিষ্ট রাত্রি মধ্যেই বহু দূর গমন করিলেন। পরে তিনি বেদশ্রুতিনাম্নী মহানদী পার হইয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমে ক্রমে গোমতী ও স্যন্দিকা নদী পার হইয়া কোশল রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করিলেন এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই গঙ্গাতীরে প্রিয়সখা গুহের রাজধানী শৃঙ্গবেরপুরে উপস্থিত হইয়া তথায় বনবাসেব দ্বিতীয় রাত্রি যাপন করিলেন।

রাম যে চারিটি নদী পার হইলেন তাহাব মধ্যে তমসা এখন পূর্ব্ব-টন্‌স, বেদশ্রুতি বিসুই ও স্যন্দিকা সই নামে পবিচিত। গোমতী নদীর প্রাচীন নাম লোকমুখে ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া গুম্‌তি এই আকার ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে রাম অযোধ্যা হইতে বরাবর দক্ষিণ দিকে গিয়া মোটামুটি বর্ত্তমান কালের ফৈজাবাদ—এলাহাবাদ রেল লাইনের পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তা ধরিযা ভরতপুরকুণ্ড ষ্টেশনের নিকট তমসা নদী, খজুরাহাটের নিকট বিসুই নদী, সুলতানপুরের নিকট গুম্‌তী নদী এবং প্রতাবগড়ের নিকট সই নদী উত্তীর্ণ হইয়া গঙ্গাতীরে উপনীত হন। শৃঙ্গবেরপুর এক্ষণে সিংরোর নামে পরিচিত। ইহার পূর্ব্ব নাম শৃঙ্গীবেরপুর এখনও প্রচলিত আছে। ইহা এলাহাবাদের ২২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত এবং ইহার পার্শ্বে গঙ্গা নদীর প্রাচীন পরিত্যক্ত খাত এখনও বিদ্যমান।

পার্জিটার সাহেব বামের বনবাস যাত্রার এই অংশের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে তমসা নদী পার হইয়া রাম সুমন্ত্রকে কিয়ৎক্ষণের জন্য রথ উত্তরদিকে নিযা পরে ফিরাইয়া আনিতে আদেশ করিয়াছিলেন, এবং সুমন্ত্র এইরূপে রথ ফিরাইয়া আনিলে তাহাতে চড়িয়া বনে গিয়াছিলেন। বামায়ণের উভয় সংস্করণেই এই অংশের পাঠ একরূপই আছে। কিন্তু পার্জিটার রামায়ণের এই অংশ হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে রামচন্দ্র নিজেই রথে চড়িয়া প্রায় ৫০।৬০ মাইল উত্তবদিকে গেলেন এবং পুনরায় সরযূ নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। তমসা নদী উত্তীর্ণ হওযাব বর্ণনার পরে গোরেসিও সম্পাদিত রামায়ণে দুইটি শ্লোক আছে— ইহা বঙ্গবাসী সংস্করণে নাই। বস্তুত পূর্ব্বোক্ত যে দুই শ্লোকে তমসা নদী পার হওয়াব কথা আছে—এই শেষোক্ত দুই শ্লোক তাহারই পুনরাবৃত্তি মাত্র। পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে আছে ঃ—

তং স্যন্দনমধিষ্ঠায় রাঘবঃ সপরিচ্ছদঃ।
শীঘ্রং তামাকুলাবর্ত্তামতবত্তমসানদীং॥

পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আছে ঃ—

তং স্যন্দনমধিষ্ঠায় সভার্যঃ সপবিচ্ছদঃ।
শ্রীমতীমাকুলাবর্ত্তামতরত্তাং মহানদীং॥

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের 'তং' এই সর্ব্বনামের সার্থকতা আছে কাবণ ইহার পূর্ব্বেই স্যন্দনের উল্লেখ আছে। কিন্তু শেষোক্ত অধ্যায়ে এই শ্লোকের পূর্ব্বে স্যন্দনের কোন উল্লেখ নাই। বিশেষতঃ শেষোক্ত অধ্যায়ের এই দুইটি শ্লোক ব্যতীত আর সব শ্লোকই বঙ্গবাসী রামায়ণে আছে। এই সমুদয় বিবেচনা করিলে কোন সন্দেহ থাকে না যে শেষোক্ত অধ্যায়ের এই শ্লোক দুইটি প্রক্ষিপ্ত। সম্ভবতঃ প্রথমে ভ্রমক্রমে পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায় হইতে ইহা শেষোক্ত অধ্যায়ে সংযোজিত হয়, পরে অর্থ সৌকর্য্যার্থে ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হয়। পার্জিটার রামায়ণের অন্য সংস্করণ না দেখিয়া এই দুইটি শ্লোক খাঁটি বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন, এবং রাম শ্রীমতী মহানদী পার হইয়াছিলেন এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি নিজেই স্বীকার কবিয়াছেন যে শ্রীমতী নামটি অতি অদ্ভুত এবং এই নামের কোন নদীর উল্লেখ আর কোন স্থানে পাওয়া যায় নাই। কিন্তু শ্লোকের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দ্বারা তিনি রামকে উত্তরে বহুদূরে নিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তিনি অনায়াসেই সিদ্ধান্ত করিলেন যে শ্রীমতী মহানদী সরযূ নদীকেই সূচিত করিতেছে। এক ভুল হইতেই আর এক ভুল আসে। রাম যদি সরযূতীরে গেলেন তবে পরবর্ত্তী নদী বেদশ্রুতি কোথায়? পার্জিটার সিদ্ধান্ত করিলেন যে চৌকা নামে যে শাখানদী অযোধ্যাব প্রায় ৫০ মাইল উত্তরে সরযূ নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে তাহাই বেদশ্রুতি। অর্থাৎ তমসার তীর হইতে উত্তরে গিয়া রাম সরযূ নদী পার হইলেন, তার পর আবার এপারে ফিরিয়া আসিয়া চৌকা নদী পার হইলেন। তিনি বরাবর সোজা উত্তর দিকে গেলে কোন নদী পার না হইয়াই চৌকা নদীর পশ্চিম পাড়ে পৌঁছিতে পারিতেন—অথচ অনর্থক তিনবার নদী পারপার কবিলেন। তারপর মনে রাখিতে হইবে যে অযোধ্যার লোক জাগিয়া উঠিয়া পাছে তাহার সঙ্গ লয় এই জন্যই তিনি রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই তমসা পার হইলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত দক্ষিণ দিকে গিয়া গঙ্গাতীরে পৌঁছিলেন। অথচ পার্জিটারের মতে তিনি পবদিন প্রকাশ্য দিবালোকে উত্তর দিকে অযোধ্যার পাশ দিয়াই প্রায় ৫০।৬০ মাইল গেলেন, পরে অনর্থক তিনবার নদী পারাপার করিয়া লক্ষ্ণৌর নিকট গোমতী নদী পার হইয়া গঙ্গাতীরে পৌঁছিলেন। এইরূপ ঘুরপথে যাওয়া রামের পক্ষে একেবারে অস্বাভাবিক, এবং বস্তুতঃ বামের এইরূপ উত্তর দিকে যাওয়ার কথা গোরেসিও বা বঙ্গবাসীর রামায়ণ কোন সংস্করণেই নাই। উভয় সংস্করণেই আছে যে রাম শেষ রাত্রে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই গঙ্গাতীবে পৌঁছিলেন। পার্জিটাব বামকে যে ঘুরাপথে লইয়া গিয়াছেন তাহার দূরত্ব প্রায় ১৭০ মাইল এবং এই পথে রামকে অন্ততঃ ছয়বার নদী পার হইতে হইয়াছে। ১৪।১৫ ঘণ্টার মধ্যে দ্রুতগামী রথের পক্ষেও ইহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু রামায়ণের বর্ণনা অনুসারে রাম যে সোজা দক্ষিণ পথে গিয়াছিলেন বলিয়া পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহার দূরত্ব মাত্র ৬০ মাইল। সুতাবাং এই পথেই রাম গিয়াছিলেন এই সিদ্ধান্তই সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। পার্জিটারের মত ৫০ বৎসরের অধিককাল * পর্য্যন্ত বিদ্বন্মণ্ডলী

* ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দেব JRAS পত্রিকায ইহা প্রকাশিত হয।

কর্তৃক প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে গৃহীত হইলেও তাহা সর্ব্বথা বর্জনীয়।

প্রিয় সুহৃদ নিষাদপতি গুহের রাজধানী শৃঙ্গবেরপুরের নিকটে নৌকায় গঙ্গানদী পার হইয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতাসহ পদব্রজে দক্ষিণ দিকে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে অবস্থিত ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে যাত্রা করিলেন।

গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্ত্তী এই প্রদেশ এক্ষণে দোয়াব নামে পরিচিত এবং ধনধান্যে সমৃদ্ধিশালী। কিন্তু তৎকালে ইহার অধিকাংশই হিংস্রজন্তুসমাকুল নিবিড় অরণ্য ছিল এবং ইহারই মধ্যে একটু স্থান পরিষ্কৃত করিয়া ভরদ্বাজ মুনি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রাম তথায় উপস্থিত হইলে ভরদ্বাজ মুনি তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা কবিলেন। এবং সেইখানেই বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তদুত্তরে রাম বলিলেন "ভগবন্ এই আশ্রম হইতে আমাদিগের নগরী ও জনপদ অতি সন্নিকট, অতএব আমি এস্থানে বাস করিতে ইচ্ছা করি না; আপনি এরূপ আর একটি নির্জন উত্তম আশ্রমের বিষয় বলিয়া দিউন।" তখন ভরদ্বাজ বলিলেন "বৎস, এখান হইতে দশ ক্রোশ দূরে চিত্রকূট নামে বিখ্যাত এক পুণ্য শুভদর্শন পর্ব্বত আছে, তুমি সেইখানে বাস কর।" রাম ইহাতে সম্মত হইলেন এবং ভরদ্বাজ মুনির নির্দেশ অনুসারে গঙ্গা ও যমুনা নদীর সঙ্গমস্থানে যাইয়া যমুনা নদীর উত্তর পাড়ে কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়া ভেলার সাহায্যে ঐ নদী পার হইলেন। পরে যমুনা নদীর দক্ষিণ তীরবর্ত্তী বনমধ্য দিয়া যাইতে লাগিলেন। নদীতীরবর্ত্তী এক সমতলভূমিতে রাত্রিযাপন করিয়া পবদিন চিত্রকূটে উপস্থিত হইলেন এবং মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে প্রবেশ কবিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন।

চিত্রকূট পর্ব্বতের অবস্থান সমন্ধে বিশেষ কোন সন্দেহ নাই। যুক্তপ্রদেশের বান্দা জিলার অন্তর্গত কার্ব্বি-তহশীলে এখনও চিত্রকূট অথবা চিত্রকোট নামে পর্ব্বত বিদ্যমান। ইহা কার্ব্বি হইতে ছয় মাইল এবং ঝান্সি-মাণিকপুর রেলওয়ে লাইনের চিত্রকোট রেলওয়ে ষ্টেশনের চারি মাইল দূরে। এই পর্ব্বতের পাদভূমির পরিধি প্রায় দেড় মাইল। পইসুনি নদী ইহার অর্দ্ধ মাইল দূরে প্রবাহিত। মন্দাকিনী নামে এই নদীর এক শাখা ঐ পর্ব্বতের এক মাইল দূরে। স্থানীয় পণ্ডিতেরা বলেন যে, যে নদী এখন পইসুনি নামে পরিচিত উহারই প্রকৃত নাম মন্দাকিনী। চিত্রকূট পর্ব্বত হিন্দুদিগের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। স্থানীয় প্রবাদ এই যে অযোধ্যা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া রাম, সীতা ও লক্ষ্মণসহ এই স্থানে বাস করেন। পাহাড়ের গায়ে নাকি এখনও রামের পদচিহ্ন আছে এবং এইখানে চরণ-পাদিকা মন্দিরে যাত্রীরা পূজা দেয়। এখানে অমাবস্যা, রাম-নবমী এবং অন্যান্য পর্ব্বে বড় বড় মেলা হয়। পূর্ব্বে তাহাতে ৩০।৪০ হাজার যাত্রীর সমাগম হইত। ইহাব চতুস্পার্শ্বে প্রায় ৩৩টি দেবস্থান আছে—যাত্রীরা সেখানে পূজা করে।

রামায়ণে উক্ত হইয়াছে যে রামচন্দ্র গিরিবর চিত্রকূটেব মধ্যভাগ হইতে বিনির্গত হইয়া জানকীকে বিমলসলিলবাহিনী রমণীয় মন্দাকিনী নদী দেখাইলেন। এই প্রসঙ্গে চিত্রকূট ও মন্দাকিনীর বিস্তৃত ও সুন্দর বর্ণনা আছে। ভবত যখন রামচন্দ্রকে ফিরাইবার মানসে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপনীত হইয়া বামেব অনুসন্ধান করেন তখন মুনিবর তাঁহাকে বলেন—

"ভরত এইস্থান হইতে সার্দ্ধযোজনদ্বয় দূরে চিত্রকূট নামক পর্ব্বত আছে। রমণীয় কুসুমিত-কাননা মন্দাকিনী নদী তাহার উত্তর দিক দিয়া প্রবাহিতা হইতেছে। বৎস, সেই নদীর পরপারে চিত্রকূট গিরি এবং তাঁহার পর্ণশালা দেখিতে পাইবে।" কালিদাসের রঘুবংশেও চিত্রকূটের উপকণ্ঠে মন্দাকিনী নদীর উল্লেখ আছে (মন্দাকিনী ভাতি নগোপকণ্ঠে)।

নাম-সাদৃশ্য, প্রচলিত লোকপ্রবাদ এবং এই মন্দাকিনী নদীর সান্নিধ্য—এই সমুদয় বিবেচনা করিলে বর্ত্তমান চিত্রকূট পর্ব্বতই যে রামায়ণ বর্ণিত চিত্রকূট তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। কিন্তু একটি বিষয়ে বেশ একটু গরমিল দেখা যায়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ভরদ্বাজ রামকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার আশ্রম হইতে চিত্রকূট দশক্রোশ দূরে। অন্যত্র ভরতকেও বলিয়াছিলেন যে ইহার দূরত্ব সার্দ্ধযোজনদ্বয়। দশ ক্রোশ ও আড়াই যোজন একই দূরত্ব অর্থাৎ প্রায় কুড়ি মাইল সূচিত করে। ভরদ্বাজ রামকে বলিয়াছিলেন যে তিনি বহুবার উক্ত পথে চিত্রকূট গিয়াছেন—সুতরাং দূরত্ব বিষয়ে তাঁহার ভুল হইবার সম্ভাবনা কম। আর রাম সীতাকে লইয়া বনসঙ্কুল পথ দিয়া হাঁটিয়া দ্বিতীয় দিনেই চিত্রকূট পৌঁছিয়াছিলেন। ভরদ্বাজের আশ্রম হইতে যে চিত্রকূট ২০।২৫ মাইলেব বেশী দূরে ছিল না ইহা হইতেও তাহা প্রমাণিত হয়।

কিন্তু বর্ত্তমানে যেখানে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থল সেই এলাহাবাদ হইতে চিত্রকূটেব দূরত্ব প্রায় ৬৫ মাইল। সুতরাং হয় বামায়ণ-বর্ণিত দূরত্ব ভুল, নচেৎ রামায়ণেব চিত্রকূট ও বর্ত্তমান চিত্রকূট বিভিন্ন, সাধারণত এইরূপ মনে হইতে পারে। কিন্তু ইহা ব্যতীত যে আরও একটি সম্ভাবনা আছে সাধারণত কেহ তাহা লক্ষ্য করেন না। এখন যেখানে যমুনা গঙ্গানদীর সহিত মিলিত হইয়াছে বামায়ণের যুগে হয়ত তাহা হইতে অনেক পশ্চিমে এই দুই নদীর সঙ্গমস্থল ছিল। অতঃপর এই তিনটি সম্ভাবনার বিষয়ই আলোচনা করিব।

রামায়ণের এই অংশ যিনি রচনা করিয়াছেন তাঁহার যে এই অঞ্চলের ভৌগোলিক বিবরণ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল আমরা পদে পদে তাহার পরিচয় পাই। এই অধ্যায়ের তিনটি স্থানে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার সবগুলিই পরস্পরের সমর্থক, সুতরাং বামাযণ বর্ণিত ২০ মাইল দূরত্ব অন্য দুইটি সম্ভাবনার একান্ত অসদ্ভাব না হইলে কখনই বর্জন করা উচিত নয়।

রামায়ণেব চিত্রকূট ও বর্ত্তমান চিত্রকূট যে অভিন্ন এ বিষয়ে বিস্তৃত প্রমাণ পূর্ব্বেই দিয়াছি। তবে পার্জিটার সাহেব রামায়ণে বর্ণিত দূরত্ব ও বর্ত্তমান চিত্রকূটের অবস্থিতিব সামঞ্জস্য বিধান করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এলাহাবাদ হইতে ২০।২৫ মাইল দূরে যে অনুচ্চ পর্ব্বতমালার আবম্ভ হইয়াছে তাহাই বরাবর পশ্চিমে চিত্রকূট অবধি গিয়াছে। পার্জিটার বলেন যে হয়ত এককালে এই সমুদয় পর্ব্বতমালাই চিত্রকূট নামে অভিহিত হইত—এবং ভবদ্বাজমুনি যে দশ ক্রোশ বা আড়াই যোজন ব্যবধান বলিয়াছেন তাহা এই চিত্রকূট পর্ব্বতমালার পূর্ব্বসীমা সম্বন্ধে প্রযোজ্য। কিন্তু এই যুক্তিও বিচারসহ নহে। ভরদ্বাজ মুনি স্পষ্ট ভরতকে বলিয়াছেন যে মন্দাকিনীর ওপারে চিত্রকূটে অবস্থিত রামেব আশ্রম আড়াই যোজন দূবে। এলাহাবাদেব ২০।২৫ মাইল দূরে চিত্রকূট পর্ব্বতমালার

আরম্ভ স্বীকার করিলেও মন্দাকিনী নদীর দূরত্ব কিছুমাত্র কমে না। সুতরাং রামচন্দ্রেব চিত্রকূটস্থিত আশ্রম যে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের মাত্র ২০ মাইল দূরে ছিল বর্ত্তমান সঙ্গমের সহিত তাহার সামঞ্জস্য বিধান করা যায় না।

এক্ষণে তৃতীয় সম্ভাবনার বিষয় আলোচনা করা যাউক। বর্ত্তমান কালে এলাহাবাদের সন্নিকটে যেখানে গঙ্গা ও যমুনা মিলিত হইয়াছে, সাধারণের বিশ্বাস যে আবহমানকাল হইতেই তাহা চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এই বিশ্বাসের মূলে কোন বিশেষ যুক্তি নাই। ভারতবর্ষের নদ-নদীর গতির যে গুরুতর পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা সকলেই স্বীকার করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ পঞ্জাব ও বঙ্গদেশের বহু নদীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ দুয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশেও যে এইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহারও প্রমাণ আছে। মৌর্য্য রাজধানী পাটলিপুত্র (বর্ত্তমান পাটনা) গঙ্গা ও শোন নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল। কিন্তু এই সঙ্গমস্থল এখন পাটনার ২০।২৫ মাইল পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে। ঠিক এলাহাবাদের নীচে গঙ্গার অনেক পুরাণ খাৎ দেখিতে পাওয়া যায় যাহা বর্ত্তমান গঙ্গানদী হইতে বহু দূরে অবস্থিত। এককালে প্রাচীন শৃঙ্গবেরপুর অর্থাৎ বর্ত্তমান সিংরোবের নীচ দিয়াই গঙ্গা প্রবাহিত হইত, কিন্তু পরে ইহা অনেকদূরে সরিয়া যায়। সুতরাং ইহা কিছুমাত্র অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে যে গঙ্গা ও যমুনা নদীর স্রোতের পরিবর্তনের ফলে ইহাদের সঙ্গমস্থল একাধিকবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

সাধারণ যুক্তি ব্যতীত এ বিষয়ে কিছু ঐতিহাসিক প্রমাণও আছে। চীন দেশীয় পরিব্রাজক হুয়েনসাং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এদেশ ভ্রমণ করেন। তিনি লিখিয়াছেন যে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল প্রয়াগ হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম অভিমুখে হিংস্রজন্তু-সমাকুল বনের মধ্য দিয়া ৫০০ লি (প্রায় ১০০ মাইল) গিয়া তিনি কৌশাম্বীতে উপনীত হন। হুয়েন সাংয়ের জীবনীতেও এই কথা আছে, এবং আরও বলা হইয়াছে যে প্রয়াগ হইতে কৌশাম্বী পৌঁছিতে তাঁহার সাতদিন লাগিয়াছিল। বর্ত্তমান কোশাম নামক স্থানই যে প্রাচীন কৌশাম্বী ইহা এখন সকলেই স্বীকার করেন। এই কোশাম গ্রাম এলাহাবাদ হইতে মাত্র ৩০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। সুতরাং হয় হুয়েন সাংয়ের জীবনী ও ভ্রমণ কাহিনী উভয়ই মিথ্যা, নচেৎ গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল এলাহাবাদ হইতে অন্ততঃ ৬০।৭০ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে বর্ত্তমান এলাহাবাদের অদূরেই চিরকাল যাবৎ যমুনা নদী গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে, এই ধারণার সহিত রামায়ণে বর্ণিত রামের বনবাস-যাত্রার কাহিনী এবং হুয়েন সাংয়ের বৃত্তান্ত, ইহার কোনটিরই সামঞ্জস্য বিধান করা যায় না। সুতরাং আমাদের এই চিরাচরিত ধারণা সত্য নাও হইতে পারে এবং বিভিন্ন যুগে যমুনা নদী কখনও এলাহাবাদের পূর্ব্বে এবং কখনও বা ইহার পশ্চিমে গঙ্গানদীর সহিত মিলিত হইত, এরূপ সম্ভাবনা একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের আলোচনায় প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হইয়া পড়িল। সুতরাং শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস যাত্রার প্রথম পর্ব্ব এই খানেই শেষ করিতেছি।

*ফাল্গুন, ১৩৫৬*

# ক্ষীরচোরা গোপীনাথ

## বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

যস্মৈদাতুং চোরয়ণ ক্ষীরভাণ্ডং
গোপীনাথঃ ক্ষীরচোরাভিধো ভূৎ।
শ্রীগোপালঃ প্রাদুরাসীদ্বশঃ সন্
যৎ প্রেয়া তং মাধবেন্দ্রং নতো স্মি॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত॥

"যাহাকে অর্পণ করিবার জন্য ক্ষীরপাত্র অপহরণ করিয়া গোপীনাথ "ক্ষীরচোরা" নামে অভিহিত হইয়াছেন, যাঁহার প্রেমে বশীভূত হইয়া শ্রীগোপাল (গোবর্দ্ধনে) আবির্ভূত হইয়াছি, আমি সেই মাধবেন্দ্রপুরীকে নমস্কার করি।"

"পূর্ব্বে মাধবপুরীর লাগি ক্ষীর কৈল চুরি।
এতএব নাম হৈল ক্ষীরচোরা হরি॥"
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত॥

বালেশ্বর হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে রেমুণা নামক গ্রাম আছে। এই গ্রামে ক্ষীরচোরা গোপীনাথের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দিরেও ক্ষীরচোরা গোপীনাথের বিগ্রহ আছে; তাহার মূল বিগ্রহ রেমুণাতে। রেমুণা এবং ক্ষীরচোরা গোপীনাথ বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ।

শ্রীচৈতন্যদেব গয়াতে ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরপুরীর গুরুর নাম মাধবেন্দ্রপুরী। অতএব মাধবেন্দ্রপুরী চৈতন্যদেবের গুরুর গুরু—অর্থাৎ পরমগুরু। মাধবেন্দ্রপুরীর অপর নাম পুরী গোসাঞি। মাধবেন্দ্রপুরী বৃন্দাবনে স্বপ্নাদেশ পাইয়া জঙ্গলের মধ্যে একটি গোপালমূর্ত্তি পাইয়াছিলেন। ঐ মূর্তি লইয়া তিনি বৃন্দাবনে মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং বিগ্রহের সেবা করিতেন। মাধবেন্দ্রপুরী একবার পুরী যাইবার পথে রেমুণাতে গোপীনাথের বিগ্রহ দেখিয়াছিলেন। তখন বার ভাণ্ড ক্ষীর দিয়া গোপীনাথের ভোগ দেওয়া হইতেছিল। পুরী গোসঞি পূর্ব্বে জানিযাছিলেন যে রেমুণার ক্ষীর বিখ্যাত। *পুরী গোসাঞির মনে হইল তিনি যদি একভাণ্ড ক্ষীর পান, তাহা হইলে ক্ষীর খাইয়া দেখেন এবং কি প্রকারে ঐ ক্ষীর প্রস্তুত হয় তাহাও বুঝিতে পারেন। তাহা হইলে তিনি ঐ প্রকারে ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া বৃন্দাবনে তাঁহার গোপালের ভোগ দিতে পারেন। পুরী গোসাঞি

---

* গোপীনাথেব ক্ষীব করি প্রসিদ্ধ নাম যার।
পৃথিবীতে ঐছে ভোগ কাছে নাহি আব॥ শ্রীচৈতন্য

অযাচক সাধু ছিলেন; কখনও কাহারও নিকট ভিক্ষা করিতেন না। তাঁহার মনে ক্ষীরের প্রতি লোভ হওয়াতে তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া মন্দিরের অনতিদূরে রেমুণার হাটে বসিয়া মালা জপিতে লাগিলেন।

রাত্রে গোপীনাথ স্বপ্নে পূজারিকে দেখা দিয়া বলিলেন, "দেখ, এক ভাণ্ড ক্ষীর আমার ধড়ার অঞ্চল দিয়া ঢাকিয়া লুকাইয়া রাখিযাছি, তোমরা দেখিতে পাও নাই। ঐ ক্ষীরভাণ্ড লইয়া যাও। হাটে, মাধবেন্দ্রপুরী নামক সাধু আছেন; তাঁহাকে ঐ ক্ষীর দাও।" পূজারি উঠিয়া দেখিল বাস্তবিক এক ভাণ্ড ক্ষীর ধড়ার অঞ্চলে ঢাকা রহিয়াছে। সে আশ্চর্য হইয়া ঐ ক্ষীর লইয়া হাটে মাধবেন্দ্রপুরীর সন্ধান লইয়া তাঁহাকে দিল এবং স্বপ্নের বিবরণ বলিল। "কাহার নাম মাধবেন্দ্রপুরী, সে এই ক্ষীর লও। গোপীনাথ তাহার জন্য এই ক্ষীরভাণ্ড চুরি করিয়া রাখিয়াছিলেন।"

"ক্ষীর লহ এই যার নাম মাধবপুরী।
তোমার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি॥"
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত॥

গোপীনাথের এত দয়া দেখিয়া মাধবেন্দ্রপুরী অভিভূত হইলেন। তিনি নিঃশেষে ক্ষীর পান করিয়া ভাণ্ডটি ভাঙ্গিয়া সঙ্গে রাখিলেন এবং প্রত্যহ একটি করিয়া খণ্ড খাইতেন।

মাধবেন্দ্রপুরী রেমুণাতে দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার সমাধি ও পাদুকা অদ্যাপি সেখানে পূজিত হয়। সেখানে একটি টোল স্থাপিত হইয়াছিল। শুনিলাম ছাত্রের অভাবে টোলটি উঠিয়া গিয়াছে।

গোপীনাথের মন্দিরটি প্রাচীন। সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। মন্দিরটি সাধারণ বাসগৃহের আকারের; ছাদের নিকট প্রস্তরময় মূর্ত্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। মন্দিরমধ্যে তিনটি কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত কৃষ্ণমূর্ত্তি। মূর্ত্তিগুলি ক্ষুদ্র। মধ্যের মূর্ত্তিটি গোপীনাথের। দুই পার্শ্বে মদনমোহন এবং বংশীধরের মূর্ত্তি। মূর্ত্তি সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, শ্রীরামচন্দ্র বনবাসকালে চিত্রকূট পাহাড়ে প্রস্তরের উপর ধনুর শাণিত অগ্রভাগ দিয়া তাঁহার দ্বাপরযুগের ভাবী মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া সীতাদেবীকে দেখাইয়াছিলেন। পুরীর রাজা লাঙ্গুলা নৃসিংহদেব ৭।৮ শত বৎসর পূর্ব্বে সেই মূর্ত্তি চিত্রকূট পর্ব্বত হইতে এখানে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। * রেমুণা রমণীয় অর্থাৎ মনোহর শব্দের অপভ্রংশ। কথিত আছে, লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে সীতাদেবীর স্ত্রীজনসুলভ শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন শ্রীরামচন্দ্র এখানে চারি দিবস অপেক্ষা করিয়াছিলেন। চতুর্থ দিবসে সীতাদেবীর স্নানের জন্য সাতটি শর নিক্ষেপ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র এখানে একটি স্রোত সৃষ্টি করেন। নদীর নাম সপ্তশরা। একটী অতিশয় সঙ্কীর্ণ স্রোতকে সেই প্রাচীন নদী বলিয়া লোকে আজকাল দেখাইয়া থাকে। নিকটে একটি কুণ্ডের তীরে গর্গেশ্বর নামক প্রাচীন শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরটি অল্পদিন হইল সংস্কার করা হইয়াছে।

* রেমুণার মূর্ত্তি সম্বন্ধে আর একটি প্রবাদ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত উদ্ধব বারাণসীতে এই মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া পূজা করিযাছিলেন, পরে বারাণসী হইতে মূর্ত্তিটা এখানে আনীত হয়।

এতদ্ভিন্ন রেমুণাতে একটি প্রাচীন গ্রাম্যদেবী আছেন, তাঁহার নাম রামচণ্ডী। প্রবাদ এই যে শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবী এই মূর্ত্তি পূজা করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেব পুরী যাইবার সময় রেমুনায় গোপীনাথজি দর্শন করিয়াছিলেন।

"রেমুনাতে গোপীনাথ পরম মোহন।
ভক্তি করি কৈল প্রভু তাঁর দরশন।।
তাঁর পাদপদ্ম নিকট প্রণাম করিতে।
তাঁর পুষ্পচূড়া পড়িল প্রভুর মাথাতে।।
চূড়া পাঞা প্রভু মনে আনন্দিত হৈঞা।
বহু নৃত্য গীত কৈল ভক্তগণ লৈঞা।।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

মাধবেন্দ্রপুরী জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে যে শ্লোক পড়িতে-পড়িতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, চৈতন্যদেব সেই শ্লোক আবৃত্তি করিয়া মন্দিরমধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। শ্লোকটি এই,

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে,
মধুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদালোককাতবং
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহ।।

ইহা রাধাঠাকুরাণীর উক্তি, ঠাকুরাণীর কৃপায় মাধবেন্দ্রপুরীর হৃদয়ে স্ফুরিত হইয়াছিল। শ্লোকের অর্থ, হে দীনদয়ার্দ্রনাথ, হে মথুবাপতি, তুমি কখন আমাকে দর্শন দিবে? হে দয়িত, তোমাকে দর্শন করিবাব নিমিত্ত আমাব হৃদয় অতিশয় কাতর হইয়াছে এবং ঘূর্ণিত হইতেছে। আমি কি করি?

"এই শ্লোক পড়িতে প্রভু মূর্চ্ছিত হইলা।
প্রেমেতে বিবশ হঞা ভূমিতে পড়িলা।।
*      *      *
অয়ি দীন অয়ি দীন প্রভু বলে বারবার।
কণ্ঠে না উচ্চরে বাণী নেত্রে অশ্রুধার।।"

রেমুণা একটি বড গ্রাম। গ্রামের নিকটে প্রাচীন দীঘি আছে। অদূরে পাহাড়ের শ্রেণী দেখা যায়। পাহাড়ের নাম নীলগিবি। তাহার পরেই উড়িষ্যার করদরাজ্য কেওঝর প্রভৃতি।

বাণেশ্বব শব্দ বালেশ্বব শব্দের অপভ্রংশ। এখানে দ্বাপর যুগে নাকি বাণাসুর রাজত্ব কবিত। বাণাসুর চারিটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করিযাছিলেন—বাণেশ্বর, গর্গেশ্বর, ঝাড়েশ্বর ও মণিনাগেশ্বর। গর্গেশ্বর বেমুণাতে। *ঝাড়েশ্বর, বালেশ্বব শহরে। বাণেশ্বর ও মণিনাগেশ্বরবালেশ্বর হইতে ৩।৪ ক্রোশ দূরে বিভিন্ন দিকে অবস্থিত। বাণাসুর প্রত্যহ এই

---

* বাবাণস্যামুদ্ধয়েন স্থাপিতঃ পূজিতঃ পুবা।
ব্রাহ্মণ্যানুগ্রহার্থায তত্র গত্বা স্থিতো হবিঃ।।      মুবারি।
এ সম্বন্ধে বিচাবপতি সাবদাচবণ মিত্র প্রণীত "উৎকলে শ্রীচৈতন্য" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

চারিটি শিবলিঙ্গ পূজা করিতেন।" বাণাসুরির কন্যার নাম উষা। কৃষ্ণের পুত্র অনিরুদ্ধ উষাকে হরণ করিয়াছিলেন। উষামেড় নামক স্থানে উষার প্রাসাদ ছিল বলিয়া লোকে এখনও দেখাইয়া থাকে।

বালেশ্বর হইতে সমুদ্রতীর চারিক্রোশ দূরে। পথে Orissa coast canal পার হইতে হয়; canal এর উপর সেতু আছে। সমুদ্রতীরে একটা সরকারি আফিস আছে, নাম Proof office। এখানে কামানের গোলা পরীক্ষা করা হয়। সমুদ্রতীরে আফিস এবং কয়েকটি কর্ম্মচারীর বাড়ী। নিকেটে অনেকগুলি বালির ঢিপি আছে, সেগুলি দেখিয়া কপালকুণ্ডলার বালিয়াড়ির কথা মনে হইল। এখানে সমুদ্রতটে বেশী বালি নাই। তটভূমি দৃঢ়, সমুদ্র অগভীর, একক্রোশ চলিয়া গেলেও নাকি বেশী জল পাওয়া যায় না। একটি বালিয়াড়ির উপব একটি ডাকবাঙ্গালা আছে; আমরা তাহার বাবাণ্ডায় বসিয়া সমুদ্রেব শোভা দেখিতে লাগিলাম। পশ্চাতে বহুদূব পর্য্যন্ত ভূমি দেখা যাইতেছিল। তখন সূর্য্যদেব দিগ্বলয় হইতে বহু উর্দ্ধে ছিলেন, কিন্তু সৌররশ্মি অতি মৃদু ও অতি ম্লান বোধ হইল। সম্ভবতঃ আর্দ্রবায়ুর উৎক্ষেপক্ত ও তিরোধানকারী গুণে এইরূপ প্রতীতি হইতেছিল (Diffraction and absorption of rays)।

সমুদ্রের কি আশ্চর্য প্রভাব! একদণ্ড সমুদ্রের তীরে বসিলে মন জুড়াইয়া যায়। এই দিগন্ত-বিস্তৃত বিশাল সমুদ্রেব তুলনায় মানব কি ক্ষুদ্র; মানবের সুখদুঃখ, যে সকল চিন্তা অহরহঃ তাহার মনকে পর্য্যাকুল করে—এই বিশাল জগৎব্যাপাবের নিকট তাহারা কি নগণ্য, এই ভাব স্বভাবতঃই মন উদয় হয়। সমুদ্রেব কল্লোলধ্বনি আমাদের চিত্তকে নিমজ্জিত করিয়া শান্ত ও স্থির করিয়া রাখে। তাহার উপর হৃদয়স্নিগ্ধকারী সমুদ্রবায়ু সর্ব্বশরীর জুড়াইয়া দেয়। যুগপৎ চক্ষু কর্ণ ও স্পর্শ এই তিনটি ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া সমুদ্রের প্রভাব বিস্তৃত হয় বলিয়া আমাদের হৃদয় এত শীঘ্র অভিভূত হয়। আমবা এরূপ একটা অস্তিত্বের সান্নিধ্য উপলব্ধি করি যাহাব বিস্তার অনন্ত, যাহার অন্তর রহস্যময়ই ও ভয়ানক, যাহার শক্তি দুর্জয় ও অপরিমেয়। স্বভাবতঃই আমাদের চিত্ত হইতে সকল ক্ষুদ্রচিন্তা স্খলিত হইয়া পড়ে এবং যে অনাদি অনন্ত পুরুষের মহিমা এই রুদ্র মনোহর সমুদ্রের মধ্যে প্রকশিত হইতেছে, আমাদের মন তাঁহার শ্রীচরণ উদ্দেশে বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়ে।

*কার্ত্তিক, ১৩৩০*

# গোয়ালিয়র দুর্গ

## যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

দুর্গ হিসাবে গোয়ালিয়র দুর্গ যেরূপ সুবিখ্যাত, স্মৃতিগাথাপূর্ণ করুণ কাহিনীতেও ইহা অন্যান্য দুর্গের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। দাস সুলতানগণের সময়ে জহর, তুগলক্ রাজত্বে রাজপুত্রগণের প্রাণান্ত, ও মুগলবাদশাহজাদাদিগের হত্যা—সবই এই দুর্গে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

দুর্গটী কোন্ সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং ইহার প্রাচীন ইতিহাস কি, তাহা অবগত হওয়া যায় না। চারণদিগের গীতে অবগত হওয়া যায় যে, গালিপ নামক এক সন্ন্যাসীর আদেশানুসারে সুবাজসেন নামক জনৈক রাজপুত রাজপুত্র এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। কথিত হয় যে, সন্ন্যাসীপ্রদত্ত জলপানে বাজপুত্রের কুষ্ঠব্যাধি আরোগ্য হয়। গোয়ালিয়ব দুর্গোপরি অবস্থিত সূর্যমন্দিরে হুণ মিহিরকুলের রাজত্বের পঞ্চদশ বৎসরে উৎকীর্ণ লেখই ইহাব প্রথম ঐতিহাসিক উল্লেখ। দুর্গের অন্যতম দর্শনীয় চতুর্ভুজ-মন্দিবের ৮৭৫ ও ৮৭৬ খৃষ্টাব্দের দুইটী লিপিতে অবগত হওয়া যায় যে. তৎকালে দুর্গটি প্রতিহাবরাজ কনৌজাধিপতি মিহিরভোজের অধীন ছিল। দশম শতাব্দীর শেষভাগে বজ্রদমন নামক নবপতি প্রতিহারবংশ হইতে দুর্গটী নিজ করতলগত করেন। বজ্রদমনেব বংশধরগণ প্রায় দ্বিশতাব্দী কাল এই স্থানে রাজত্ব করেন। তৎপবে, ইহা পুনর্ব্বার প্রতিহারবংশ কর্তৃক অধিকৃত হয়। ১২৩২ খৃষ্টাব্দে দাসসুলতান আল্‌তামাশ দুর্গটী অবরোধ করিয়া বহু কষ্টে উহা অধিকার করেন। দুর্গ মুসলমানগণের হস্তগত হইবার পূর্ব্বেই রাজ্ঞী ও অন্যান্য অন্তঃপুরিকাগণ জহর-ব্রত অবলম্বন করেন।

এই সময় হইতে ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দুর্গ মুসলমান-গণেরই অধীন ছিল। ১৩৯৮ সন ভারতবর্ষেব ইতিহাসে একটা স্মবণীয় বৎসর। তৈমুলবং এই বৎসবেই দিল্লী আক্রমণ কবেন। পাঠান-সাম্রাজ্য এই আঘাত সহ্য কবিতে পাবে নাই। ফলে উত্তব-ভাবতেব নানা স্থানে স্বাধীন বাজ্যসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। বীরসিংহদেব নামক একজন তোমর রাজপুত গোযালিয়র দুর্গ অধিকাব করেন। তোমব-রাজ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর কতকাংশ কাল এই দুর্গ ভোগ করিযাছিলেন। মানসিংহই এই বংশের প্রধান রাজা। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এই দুর্গ ইব্রাহিম লোদীর হস্তগত হয় এবং লোদী-বংশের অধঃপতন হইলে গোয়ালিযর মুগল বাজ্যভুক্ত হয়।

হুমায়ুনেব পবাজয় হইলে শেরশাহ দুর্গাধিপতি হইলেন এবং তাঁহার বংশধরগণ কিছুদিন এই স্থানেই বাজধানী স্থাপন করিযাছিলেন। ১৫৫৯ সালে আকবর বাদশাহ দুর্গ জয় করেন এবং তৎপরে প্রায় দুইশতাব্দী কাল গোয়ালিয়র মুগলগণের হস্তগত ছিল। এই

সময়ে ইহা কারাগার রূপে ব্যবহৃত হইত এবং রাজপুত্র মুরাদের শেষ জীবন এই দুর্গেই অতিবাহিত হয়।

১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রগণ এই দুর্গ অধিকার করেন। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহা সিন্ধিয়া-রাজভুক্ত। ঐ সালে পেশোয়া সিন্ধিয়াবংশকে দুর্গ প্রদান করেন। তিন বৎসর পরে ইংরাজ সেনানী মেজর পপহাম ইহা অধিকার করিয়া ১৭৮১ সালে দুর্গটীকে গোহাদের ছত্রসিংহের হস্তে প্রদান করেন। কিন্তু, দুই বৎসর পরেই সিন্ধিয়াবংশ পুনর্ব্বার ইহা অধিকার করেন। দ্বিতীয় মারহাট্টা যুদ্ধের সময় সেনাপতি হোয়াইট ইহা হস্তগত করেন; কিন্তু ১৮০৫ সালে সন্ধির সর্ত্তানুসারে ইহা পুনর্বার সিন্ধিয়ার হস্তে প্রত্যার্পিত হয়। ১৮৪৪ সালে মহারাজপুরের যুদ্ধের পরে ইংরাজ সৈন্য দুর্গে প্রতিষ্ঠিত হয়। মহারাজা জয়াজী রাও বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ইহা সিন্ধিয়াকে প্রদান করা হয়। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে ইহা তাহাদেরই কবতলগত হয় কিন্তু ১৮৫৮ সালে ইংরাজকীয় স্যাব হিউ রোজ ইহা অধিকার করেন। আট বৎসর ইংরাজের হস্তে থাকিয়া ইহা ১৮৮৬ সালে ঝাঁসির বিনিময়ে সিন্ধিয়াকে প্রদান করা হয়। তদবধি ইহা সিন্ধিযারই অধিকারভুক্ত রহিয়াছে।

গোয়ালিযবে দর্শনীয় অনেকগুলি স্থান আছে। বাবর, হুমায়ুন ও আকবরের সমসাময়িক মুহম্মদ ঘৌসের সমাধিস্থল (প্রথম চিত্র) দুর্গ হইতে প্রায় একচতুর্থাংশ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। ইহা মুগল স্থাপত্য-বিদ্যার নিদর্শন বলিয়া বিবেচিত হইতে পাবে। ইহা চতুষ্কোণ,—প্রতিদিকই একশত ফীট করিয়া। অভ্যন্তরস্থ কক্ষটীও চতুষ্কোণ, ইহার প্রত্যেক দিক ৪৩ ফীট। এই চতুষ্কোণটীর চর্তুর্দিকে কুড়ি ফীট প্রশস্ত সুন্দর অলিন্দ রহিয়াছে। এই অলিন্দেব চতুষ্পার্শ্বে উৎকৃষ্ট শোভাসাধক কারুকার্য্যসমন্বিত যবনিকা শোভা পাইতেছে।

জুম্মা মস্‌জিদটীও (দ্বিতীয় চিত্র) সুন্দর। ইহা দুর্গেব বহির্দেশে আলম্‌গিরি ফটকের সন্নিকটে অবস্থিত। ইহা বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল; তবে কতকাংশ ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দেও যোগ করা হয। ইহাও মুগল স্থাপত্যানুযাযী নির্ম্মিত। তৃতীয়চিত্রে গুজারী মহলের বহির্দেশ প্রদর্শিত হইয়াছে। পঞ্চদশ শতব্দীতে রাজা মানসিংহ তাঁহার প্রিয়তমা রাজ্ঞী মৃগনয়নাব জন্য ইহা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহা প্রস্তরনির্ম্মিত দ্বিতল প্রাসাদ। ইহা দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর। বহির্দেশস্থ তোরণগুলির জন্য ইহার শোভা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

চতুভুজ মন্দিরের (চতুর্থ চিত্র) কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহা পর্ব্বতগাত্র হইতে খুদিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। মধ্যে চতুর্ভুজ বিষ্ণু-মন্দিব,—তজ্জন্যই মন্দিবের এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। মন্দিবমধ্যস্থ লিপি হইতে অবগত হওযা যায় যে, ইহা কনৌজের রাজা বামদেবেব সময়ে ৮৭৫ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল। রাজা মানসিংহ (১৪৮৬-১৫১৬) নির্ম্মিত মানমন্দির (ষষ্ঠ চিত্র) গোয়ালিয়রের অন্যতম প্রধান দর্শনীয় বস্তু; এবং ইহাকে এই স্থানের প্রধান দর্শনীয় স্থান বলিলেও বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। ইহাব সম্মুখভাগ তিনশত ফীট লম্বা এবং ইহা ঊর্ধ্বে ৮০ ফীট। ডোমযুক্ত ছযটী সুগোল অভ্রভেদী বুরুজ অত্যন্ত সুন্দব। মানমন্দিবেব অভ্যন্তরস্থ (সপ্তম চিত্র) অঙ্গনগুলি আকারে

ছোট হইলেও ইহার নির্ম্মাণ-কৌশল সুন্দর। সচ্ছিদ্র যবনিকাসমূহ, কার্নিস এবং রঙ্গীন টাইল দ্বারা সজ্জিত এই স্থানটী বাস্তবিকই নয়নরঞ্জক।

"শাশবহু" (অষ্টম চিত্র) মন্দিরের দৃশ্যও সুন্দর। 'শাস' অর্থাৎ শ্বশ্রূ এবং 'বহু'—পুত্রবধূ—এই দুইয়ের সমন্বয়ে মন্দিরের এইরূপ নামকরণ হইয়াছে; কিন্তু কি কারণে মন্দিরটিকে এই নামে অভিহিত করা হয়, তাহা জানা যায় না। আমরা যে শাসবহু মন্দিরের চিত্র প্রদান করিলাম, তদ্ব্যতীত বৃহত্তর অন্য একটি শাহবহু মন্দির আছে। শেষোক্তটী বিষ্ণুমন্দির। মন্দিরমধ্যস্থ সুদীর্ঘ লিপিতে অবগত হওয়া যায় যে, ১০৯৩ খৃষ্টাব্দে মহীসাল নামক রাজপুত রাজপুত্র কর্তৃক ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। আমরা নবম চিত্রে এই বৃহত্তর শাসবহু মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ ছাদের চিত্র প্রদান করিলাম। ইহা নানারূপ কারুকার্য্যবিশিষ্ট এবং নয়নরঞ্জক। বৃহত্তর শাসবহু মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ দরজাটীও দেখিবার মত। (দশম চিত্র)। দ্বারদেশের ঊর্দ্ধে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের নয়নাভিরাম চিত্রত্রয়—মধ্যস্থলে বিষ্ণু—তাঁহার নিম্নদেশে গরুড় শোভা পাইতেছেন। এতদ্ব্যতীত একটি ক্ষুদ্রতর শাসবহু মন্দিরও গোয়ালিয়রে আছে;—উহাতে বিষ্ণুমূর্ত্তি রহিয়াছেন। মন্দিরটী মধ্যযুগের স্থাপত্যের নিদর্শন বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

দুর্গাভ্যন্তরস্থ তেলির মন্দির (একাদশ চিত্র) সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, একশত ফীট অপেক্ষাও বেশী। ইহাও বিষ্ণুমন্দির—দশম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরগুলির ন্যায় ইহার শিখর নির্ম্মিত, অথচ, অন্যান্য অংশ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের উভয় স্থাপত্য-বিদ্যার সমন্বয় এই মন্দিরে হইয়াছে বলা যাইতে পারে।

দ্বাদশ চিত্রে আমরা মহারাজাধিরাজ স্যার মাধোরাও সিন্ধিয়ার প্রাসাদসমূহের ও রাজা জর্জ্জের নামে সংযুক্ত উপবনের চিত্র প্রদান করিলাম। *চিত্রের বামদিকে মতিমহল, দক্ষিণে জয়বিলাশ প্রাসাদ—মহারাজাধিরাজের বাসস্থান। পরলোকগত জয়াজি রাও মহারাজা কর্তৃক এই দুইটি প্রাসাদই নির্ম্মিত। রাজরাজেশ্বর পঞ্চম জর্জের নামসংযুক্ত উপবন বর্ত্তমান মহারাজের সময়ই প্রস্তুত হইয়া ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে রাজপুত্র প্রিন্স জর্জ কর্তৃক উন্মুক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যস্থলে হিন্দুমন্দির, মুসলমানের মস্‌জিদ, শিখের গুরুদ্বার এবং একটী থিয়োজফিক্যাল মন্দির রহিয়াছে;—সকল ধর্ম্মের সমন্বয়ের এরূপ সুদৃষ্টান্ত আব দৃষ্ট হয় না। ইহা হইতেই বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজের পরমতসহিষ্ণুতার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। *

---

* এই ও প্রবন্ধের অন্তর্গত চিত্রগুলি আমবা দিতে পাবলাম না।—সম্পাদক

*আশ্বিন*, ১৩৩০

# হরিকৃষ্ণ মন্দির

## নরেন্দ্র দেব

শ্রাবণ মাস। চলেছে অবিরল ধারাবর্ষণ ঃ আকাশের কান্না যেন আর থামে না। দিবা-রাত্রিই ঝরছে—ঝর ঝর বারিধারা। বাড়ী থেকে সংকল্প করে বেরিয়েছিলুম পুনায় এবার যেতেই হবে। ছত্রপতি শিবাজীর কীর্ত্তি-স্মৃতি বিজড়িত পুনা। একদা স্বাধীন মহারাষ্ট্রের গৌরবোজ্জ্বল রাজধানী ছিল এদেশ। চারিদিক দুর্ভেদ্য পর্ব্বতমালায় ঘেরা এই পুনা। ঘন অরণ্য পবিবেষ্টিত এক মনোরম ভূমি। দুটি বিশাল গিরিনদীর সঙ্গমতীরে এই সুন্দরী নগরী। পুনার মাটিতে মিশে রয়েছে সাধু রামদাস স্বামীর পুণ্য পদধূলি। মিশে রয়েছে কত মারাঠাবীরের মহান বীরত্বের ইতিহাস। বড় ভাল লাগে আমাব এই শিখর সমারোহে সমৃদ্ধ স্নিগ্ধ নির্জন পুরী। প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য একে নানা ঐশ্বর্যে ঘিরে রেখেছে। মেঘের পবে মেঘ জমে ওঠা ধূসব আকাশের মতো পাহাড়ের পর পাহাড় জমে আছে পুনাব বুকে। এ পর্ব্বতমালা তরুতৃণহীন শুষ্ক নীরস পাযাণ স্তূপ নয। শ্যামলে শ্যামলে ঘেরা এই পাথরের বুকে বিরাজ করছে তরুঘন বনবাজিনীলা।

পুনায় এর আগেও দু'একবাব বেড়িয়ে গেছি, সে শুধু অকারণ পুলকে, দেশভ্রমণেব নেশার ঝোঁকে, এবার পুনায় এসেছি অন্য এক আকর্ষণে। কিন্নর-কণ্ঠ শ্রীমান দিলীপ রায় এখানে থাকেন। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল বায়ের সুযোগ্য পুত্র তিনি। একাধারে কবি, কথাশিল্পী, নাট্যকার, জীবনী রচয়িতা, প্রবন্ধকার, বিশ্ব-পরিব্রাজক, সঙ্গীতাচার্য। উপরন্তু প্রেমভক্তির একনিষ্ঠ সাধক তিনি। সর্ব্বত্যাগী পরম বৈষ্ণব। পুনার ইন্দিরা-নিলয়ে হরিকৃষ্ণমন্দির স্থাপনা করে সেখানেই বাস করছেন। মন্দিবে গিরিধারী গোপালের বিগ্রহ মূর্ত্তি আছে। ব্রজবিহারী বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণের রূপ। সেটি না কি অপরূপ! সেই বিগ্রহ দর্শনের লোভ, দিলীপের কণ্ঠে গান আর ইন্দিরা দেবীর দিব্য মধুর আলাপন—এই ত্রিবিধ সৌভাগ্য লাভের সম্ভাবনায় পুনায় ছুটেছিলুম এবার। একটা সুযোগও পাওয়া গিয়েছিল। কন্যা নবনীতাকে আমেরিকাযাত্রার পথে জাহাজে তুলে দিয়ে আসবার জন্যে বোম্বাই বন্দরে যেতে হয়েছিল। পুনা থেকে বোম্বাই মাত্র ১২০ মাইল পথ। সুতরাং এই সুযোগে পুনায় এবার তীর্থযাত্রা।

তীর্থযাত্রায় আমাব সঙ্গী হয়েছিলেন পত্নী বাধারাণী দেবীর অগ্রজ শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষ। মানুষটি হৃদয়বান। সরল সদানন্দময় পুরুষ। তিনি আকাশপথে উড়ে এসেছিলেন তাঁর ভাগিনেয়ীকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে। যাওয়া আসার টিকিট করেই এসেছিলেন। আমি পুনা হয়ে কলকাতায় ফিরবো শুনে তিনি আমায় একলা ছাড়লেন না। ভাবলেন, একমাত্র মেয়েকে সাতসাগরের পারে পাঠিয়ে আমার মনটা বোধহয় খুব বিচলিত হয়ে পড়েছে। তাই বিমানে না ফিরে তিনি রেলপথেই আমার সঙ্গ নিলেন। জিজ্ঞাসা কবলেন—পুনা যাবেন কেন?

বললুম, মন্টুর ঠাকুরকে দেখবার টানে চলেছি। দিলীপকে আমরা মন্টু বলেই ডাকি। আমায় সে তার ঠাকুরের একখানি ছবি পাঠিয়েছিল। অতি সুন্দর মূর্ত্তি। তার সেই ভুবনমোহন বিগ্রহটিকে এবার চাক্ষুষ দেখতে যাচ্ছি।

আমার কথা শুনে তিনি একটু বিস্মিত হলেন; কারণ, তিনি জানতেন, মূর্ত্তি পূজাকে আমি ঠাকুর নিয়ে ভক্তিপ্রেমের খেলা করাই বলি। সংসাবী মানুষেরা যেমন তাদের ছেলে-মেয়ে নিয়ে নাতি-নাতনি নিয়ে স্নেহমায়ার বশে খেলায় মেতে থাকে, ঠিক তেমনি সংসারবিরাগী সাধু ভক্তরাও ঠাকুর ঠাক্‌রুণের মূর্ত্তি এনে প্রেমভক্তিবশে তন্ময় হয়ে সংসার পেতে খেলায় মেতে থাকেন।

কিন্তু, এটাও আমি বিশ্বাস করি—যিনি এ খেলা সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আত্মভোলা হয়ে একান্তভাবে খেলতে পারেন মাটির প্রতিমা বা পাষাণ বিগ্রহ তাঁর কাছে একদিন সত্য হয়েই ওঠে। একাগ্র সাধনা কখনো ব্যর্থ হয় না। কিন্তু কজন মানুষ পারে ভগবানকে আত্মীয় বন্ধু বা প্রিয়তম ভেবে তেমন করে ভালবেসে তন্ময় হয়ে ডাকতে? সংসারে কিন্তু দেখেছি এমন তন্ময় মানুষ, যাঁরা পিতা-মাতা বা পুত্রকন্যাকে নিয়ে প্রতিদিনের তুচ্ছ গৃহ কর্ম্মকে জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কর্ম্ম বলে মনে করেন। আমি তাঁদের সংসারের কীট বলবো না। তাঁরাও নমস্য। তারাও ভগবানকে পাবেন। যেহেতু ইহসংসারও তাঁর এবং সর্ব্বভূতে তিনি বিরাজ করেন এটা যদি আমরা মনে প্রাণে যথার্থ মানি।

স্টেশন থেকে আমরা একখানি ট্যাক্সি নিয়ে ঁহরিকৃষ্ণ মন্দির রওনা হলুম। বেলা তখন প্রায় দুটো হবে। কোন্ রাস্তায় কোন্ মহল্লায় এ মন্দিব আমি চালককে তা বলতে পাবিনি। কারণ ঠিকানাটা ভুলে ফেলে এসেছিলুম। বৃদ্ধ বয়সে স্মরণশক্তি ম্লান হয়ে এসেছে। কিছুতেই মনে পড়লো না। তবে মন্দিরের একটা মোটামুটি বর্ণনা দিলুম, কারণ মন্দিরেরও ছবি পাঠিয়েছিল মন্টু। চতুর সারথি বুঝে নিয়ে ঠিক মন্দিরে এনে হাজির করে দিল।

বাইরে থেকে মন্দিরটি দেখতে অনেকটা আধুনিক পাশ্চাত্য স্থাপত্য কলানুসাবী সৌখীন বাস-গৃহ। মন্দির শীর্ষের সুবৃহৎ 'ও' এই প্রণব অক্ষরটি মন্দিরের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। তোরণ দ্বারের একধারে একটি ফলকে লেখা 'ইন্দিরা নিলয়' অপরদিকে লেখা 'হবিকৃষ্ণ মন্দির।' তোরণের ভিতরে সুদৃশ্য রেলিং দিয়ে ঘেরা প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। বিচিত্র তরুলতা ও নানা ফুল ফলের বৃক্ষে সুশোভিত। প্রাঙ্গণ পার হয়ে মন্দিবেব মর্ম্মর সোপান বেয়ে উপরে উঠতে না উঠতেই সর্ব্বাগ্রে মন্দির-লক্ষ্মী ইন্দিরা দেবী এগিয়ে এসে আমাদের স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন। শিশুসুলভ নির্ম্মল হাস্যোজ্জ্বল মুখে দিলীপকুমার এসে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, একলা খুঁজে খুঁজে আসতে কষ্ট হলো তো? একটা তার করলে না কেন নরেনদা? আমি গাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে স্টেশন থেকে নিয়ে আসতুম। আমাদের একাধিক ভক্তের গাড়ী সর্ব্বদাই এখানে হাজির রয়েছে। মুখ হাত ধুয়ে খেয়ে নেবে চলো। বেলা দুটো বাজে।

বললুম, বেলা হবে জেনেই আমরা স্টেশনের রিটায়ারিং রুমে স্নানাহার সেরে এসেছি।

দিলীপ শুনে বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হল। তাকে বোঝালুম, খাওয়া কি পালাচ্ছে? আজ বিকেলে খাবো, রাত্রে খাবো। আবার কাল সকালে খাবো, দুপুরে খাবো। কত খাওয়াবে খাইযো না ভাই।

শুনলুম গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে কাল এখানে বহু ভক্তের সমাগম হয়েছিল। সকালের ও দুপুরের ট্রেণে তাঁরা অনেকেই চলে গেছেন। আর মাত্র জন-দশ বারো আছেন। তাঁরাও কেউ বিকেলের ট্রেণে কেউ কাল সকালের ট্রেণে চলে যাবেন। ভক্তজন-বন্দন-মুখরিত এ হরিকৃষ্ণ মন্দির চত্বর কাল থেকে আবার নিস্তব্ধ হয়ে পড়বে। মন্টু বার বার বলতে লাগলো, কাল এলে আরও ভাল লাগতো।

আশ্রমের জন্য সামান্য কিছু ফলমূল মিষ্টান্ন সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলুম। ইন্দিরার হাতে সে ডালিটি তুলে দিয়ে মন্টুকে বললুম—তুমি থাকতে মন্দির নিস্তব্ধ হয়ে পডবে কি? তুমি একাই তো একশো ভাই! গানে গল্পে হাস্য-পরিহাসে কাব্যে সাহিত্যে যথেষ্ট মাৎ করে রাখতে পারবে আমাদের।

অল্পক্ষণ আলাপের পরই মন্টু অতিথিদের জন্য নির্দিষ্ট একখানি সুসজ্জিত কক্ষে আমাদের নিয়ে গিয়ে বললেন, অনেকটা পথ ট্রেণে এসেছো, একটু বিশ্রাম করো। ঠিক চারটে বাজলেই বিকেলে আসবো। চায়ের আসরে ডেকে নিয়ে যাবো। আমিও একটু গড়িয়ে নিইগে।

চেয়ে দেখলুম ঘরখানি চমৎকার। অতিথিদের আরামের যা কিছু প্রয়োজন সমস্তই সাজানো রয়েছে। আমাদের আর 'হোল্‌ডঅল' খুলে বিছানা বার করতে হলনা। পাশাপাশি দুখানি একক খাটে পরিপাটি শয্যা বিছানো। টেবিল, চেয়ার, ড্রেসিং মিরার, আলমারি, কোনও কিছুরই অভাব নেই। কক্ষ সংলগ্ন সুন্দর একটি বাথ্‌রুম, সুসজ্জিত। জানালা দরজায় সুন্দর ভারতীয় কারুকার্য বিচিত্রিত পর্দা। মনটি বেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠলো। বৈদ্যুতিক আলো পাখাও রয়েছে। একে বারে যেন হাইক্লাস হোটেলের কামরার মতো। ধর্ম্মশালার মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পেয়ে মনটা খুসি হয়ে উঠলো।

ট্রেণের কাপড় বদলে মুখহাত ধুয়ে বিশ্রামের জন্য শুভ্র কোমল শয্যায় আরামে শুয়ে পড়লুম। সঙ্গী বিভূতিবাবু একটু ধূমপানাসক্ত। তিনি হরদম বর্ম্মা চুরুট টানেন। জিজ্ঞাসা করলেন আশ্রমের মধ্যে ধুমপান করা চলবে কি? অভয় দিয়ে বললুম, নিশ্চয় চলবে? ও তো আমাদের ধর্ম্মের মতই শুধুই ধোঁয়া। তুমি অবশ্যই টানতে পারো। কোনও দোষ নেই। বিভূতিবাবু আশ্বস্ত হয়ে একটি লম্বা চুরুট বার করে ধরাতে গিয়ে দেখেন তাঁর দেশলাইয়ের বাক্স একেবারে শূন্য হয়ে গেছে। ভদ্রলোক মুষড়ে পড়লেন। এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়লো খাটের পাশে সাইড টেবিলে একেবারে নতুন আনকোরা একটি দেশলাই রয়েছে। সম্ভবতঃ অতিথিদেরই ব্যবহারের জন্য। বললুম, দেখলে তো দাদা, ধুমপান নিষেধ হলে ঘরে দেশলাই থাকতোনা।

তিনি চুরুট ধরিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তারপর নানা গল্প করতে করতে দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামের অবসরে কখন যে নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানি না। দরজায় টুকটুক্ আওয়াজ হচ্ছে শুনে আমরা ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লুম। ঘড়িতে দেখি চারটে বেজে গেছে। বাইরে থেকে মন্টুর গলা পেলুম; চা যে জুড়িয়ে গেল নরেনদা। বেরিয়ে এস। তোমাদের জন্য সকলে অপেক্ষা করছেন।

আমরা সত্বর প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে আসতেই মন্টু আমাদের ডাইনিং হলে নিয়ে গিয়ে নিজের আসনের দু'পাশে দুজনকে বসালেন। চায়ের সঙ্গে ইন্দিরা দেবী বিবিধ সুস্বাদু জলযোগেরও ব্যবস্থা করে টেবিলে সাজিয়ে দিয়েছেন। উষ্ট্রপৃষ্ঠবৎ টেবিলের পৃষ্ঠদেশ দস্তুর মতো লোভনীয় হয়ে উঠেছে। সধূম গরম চা ও বিচিত্র টা'র আস্বাদ নিতে নিতে অনেক রকম সরস ও চিত্তাকর্ষক আলোচনা চলছিল বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে। চা সেবার পর মন্টু আমাদের আশ্রমটি ঘুরিয়ে নিয়ে দেখালেন। দোতালায় তিনখানি প্রশস্ত ঘর ও একটি আধ ঢাকা দালান। এখানে মন্টুর লেখাপড়াও চলে আবার বৈঠকও বসে। সামনে খোলা ছাদ। ছাদে বেরিয়ে এলে পুনার চারিদিকের নিসর্গ দৃশ্য চোখে পড়ে। ভারী ভালো লাগলো পর্দার বাইরে অনবগুণ্ঠিতা প্রকৃতির সেই অপরাহ্ণ বেলার রূপ। মেঘমেদুর আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্নিগ্ধ সবুজের উষ্ণীষপরা ধূমল পাহাড়। অদূরে পাহাড়ের কোলে পুনার প্রসিদ্ধ পার্ব্বতী দেবীর মন্দির-চূড়া দেখা যাচ্ছে। এবার এলুম তিনতলার ছাদে। নির্জন ছাদের নিভৃত এক কোণে দিলীপের ধ্যানের জন্য একটি শিলাবেদী স্থাপিত রয়েছে। দেখে মনে হল এমন সুন্দর পরিবেশে যদি কেউ ধ্যানে বসে, তবে মহাসুন্দরের সঙ্গে তার যোগে বিহার বিচিত্র নয়!

ছাদ থেকে আমরা সবাই নেমে এসে দিলীপের সেই বৈঠকে সমবেত হলুম। আমবা দুই অতিথি, দিলীপ ও তাদের কয়েকজন ভক্তশিষ্য। ঠাকুরের সন্ধ্যারতির পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের আসর চললো। আলোচনা যে শুধু দৈবী রহস্যের গূঢ় তত্ত্ব নিয়েই হচ্ছিল তা নয়। কাব্য, সাহিত্য, সমালোচনা, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণ, রমণ ঋষি, এঁদেব নিয়েও আলাপ চলছিল। 'অঘটন আজও ঘটে' এ নিয়েও গল্প হল অনেক। হরিপ্রেমের পরমসাধিকা ইন্দিরা দেবী কৃষ্ণপ্রেমিকা রাজরাণী মীরার যে ভজনগুলি সমাধি অবস্থায় শোনেন 'শ্রুতাঞ্জলি' 'সুধাঞ্জলি' প্রভৃতি গ্রন্থে দিলীপকুমার সেগুলি মূল হিন্দী ও তার অনুবাদ সহ প্রকাশ করেছেন। এই ভজনগুলির কথা উঠতে, বললুম, ভাবের ঐশ্বর্য ও কাব্য সম্পদে এগুলি অতুলনীয়। পড়ে আনন্দের সঙ্গে বিস্মিতও না হয়ে পারা যায় না। ইন্দিরা দেবী নিশ্চয় খুব ভাল হিন্দী কবিতা রচনা করতে পারেন? কিন্তু শুনে আশ্চর্য হলুম যে ইন্দিরা একেবারেই হিন্দী জানেন না। তাঁর মাতৃভাষা উর্দু। অবশ্য উর্দুতে ইন্দিরা দেবী ভালই কবিতা লিখতে পারেন। কিন্তু, মীরার ভজনগুলি তিনি ভাব-সমাধি অবস্থায় কানে শুনে বলে যান এবং সে-গুলি ভক্তেরা লিপিবদ্ধ করে রাখেন।

দিলীপ উঠে গিয়ে দুখানি মোটা খাতা তাঁর দেরাজ থেকে বার করে নিয়ে নিয়ে এলেন। খাতার পাতা উল্টে পাল্টে ইন্দিরার সমাধিশ্রুত কয়েকটি মীরার ভজন পড়ে আমাদের শোনালেন এবং তার ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, সেগুলি এত উচ্চ স্তরের প্রেমভক্তিমূলক রচনা যে সে একমাত্র গিরিধারী গোপালের অন্তরঙ্গ সেবিকা মীরার পক্ষেই রচনা করা সম্ভব।

এঁদের ভক্ত শিষ্য বিষ্ণুদাসজী বললেন, যে-সব হিন্দী রচনা ভারত সরকারের আকাদামী পুরস্কার পায় সেগুলি এর পাশে দাঁড়াতে পারে না। তাঁরা বোধহয় ইন্দিরা দেবীর বইগুলির

সন্ধানই জানেন না। আমাদের উচিত এগুলির প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, তাহলে ইন্দিরাদেবীকে তাঁরা পুরস্কৃত না করে পারবেন না। ইন্দিরা দেবী এই সময় আমাদের চা দিতে সেই ঘরে এসেছিলেন। দিলীপের ইনি মন্ত্রশিষ্যা। গুরুকে 'দাদাজী' বলে সম্বোধন করেন। ভক্তি ও সেবা করেন পিতার মতো। আবার স্নেহ যত্ন করেন আপন সন্তানের তুল্য। মনে হল ইন্দিরা দেবী তাঁর ইষ্টদেব হরিকৃষ্ণের পর আমাদের দিলীপকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন। এমন অকপট শ্রদ্ধা ও ভক্তি আর কোনও গুরুর ভাগ্যে কখনো মিলেছে কিনা জানি না। এই ভক্তিমতী মহিলাকে আমাদের এক পরম বিস্ময় বলে মনে হল। এঁর স্বাস্থ্য ভাল নয়! দুঃসহ হাঁপানি রোগে প্রায়ই নিদারুণ কষ্ট পান। কিছুদিন থেকে তাঁর শরীরের গ্রন্থিগুলিতে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক বাতরোগ আশ্রয় করেছে। কিন্তু, না-দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন যে দেহের সমস্ত ক্লেশ ও রোগযন্ত্রণা তিনি অসামান্য মনের জোরে জয় করে ভোর রাত্রি চারটে থেকে প্রায় মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত আশ্রমের যাবতীয় কাজ একা স্বহস্তে সুসম্পন্ন করেন। ঠাকুর সেবা থেকে গুরু সেবা, অতিথি সৎকার থেকে ভক্তগণের পরিচর্যা। মন্দিরের পূজারিণী হয়ে শ্যাম সোহাগিনী দেবদাসীর কর্ত্তব্যও সমস্ত নিজে করেন। আবার রন্ধনশালায় এসে সকলের জন্য বিবিধ অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে নিজেই স্বহস্ত-পরিবেশনে সকলকে তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন করান। কখনও পীড়িত অতিথির শুশ্রূষা ও ভক্তবৃন্দের সেবা করছেন, আবার কখনো বা অনুসন্ধিৎসু ভক্তগণের কঠিন প্রশ্নের সরল সদুত্তর দিচ্ছেন। এই রুগ্ন দেহ নিয়ে তাঁকে এত কাজ করতে দেখে আমরা বিস্মিত হচ্ছিলুম। আকাদামী পুরস্কারের আলোচনাটা ইন্দিরা দেবীর কানে যেতে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, দোহাই আপনাদের, এমন কাজ কখনো করবেন না। আমি সরকারী পুরস্কারের প্রার্থী নই। ওর ওপর আমার কোনও লোভও নেই। আমার গিরিধারী গোপালকে ভজন শুনিয়েই আমি কৃতার্থ। দিল্লীর স্বীকৃতির মূল্য তার কাছে তুচ্ছ। এই বলে কিছুটা বিরক্ত হয়েই তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন।

মন্টুর মুখে শুনেছি—এঁর জপতপ পূজা ধ্যানের ইষ্টদেব শ্রীগিরিধারী গোপাল এঁর কাছে নাকি প্রত্যক্ষ রূপ ধরে দেখা দেন। এঁর সেবায়, পূজায়, প্রেমে ভক্তিতে প্রীত ও পরিতুষ্ট হয়ে তিনি নাকি সানন্দেই ধরা দিয়েছেন এই পরম প্রেমিকার কাছে। ইন্দিরা দেবীর নিবেদিত ভোগ ঠাকুর স্বয়ং গ্রহণ করেন। আরও শুনলুম, ইন্দিরা দেবী যখন ভাবাবেগে ব্যাকুল হয়ে তাঁর ঠাকুরের চরণতলে লুটিয়ে দেন, পাদুখানি দুহাতে জড়িয়ে ধরেন, ঠাকুর তাঁর এই ভক্ত-প্রেমিকার শ্রী অঙ্গে আপন পদ্মহস্ত বুলিয়ে দিয়ে আশীর্ব্বাদ করেন। শুনলে হয়ত অনেকেই এটা বিশ্বাস করতে পারবেন না যে এই শ্রীহরি চরণ স্পর্শের পর সৌভাগ্যবতী ইন্দিরা দেবীরও করপুটে পদ্মনাভের পদ্মগন্ধ সংক্রামিত হয়। এই অবস্থায় ইন্দিরা দেবীর চরণ স্পর্শ করে যদি কোনও ভক্ত শিষ্য তাঁকে প্রণাম করে, তাঁরও করপুটে কমল গন্ধ সঞ্চারিত হয়ে যায়। একাধিক ভাগ্যবান ভক্তের কাছে এটা নাকি পরীক্ষিত সত্য। অবশ্য, ভক্তের সাক্ষ্য কোনদিনই প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হয় না। আমার সে পদ্মগন্ধ আঘ্রাণের সৌভাগ্য ঘটেনি এবং কোনওদিন ঘটবে কি না জানি না, তবে আমাদের মতো অল্পবুদ্ধি

অজ্ঞান জীবেরা বিশ্বাস করে সংসারে সকলই সম্ভব. কারণ, অবিশ্বাস মনে বড় অশান্তি আনে। বিশ্বাসের মধ্যে একটা শান্তির আরাম আছে।

মন্টু বললেন, শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী তাঁর ঐকান্তিক হরিপ্রেম সাধনায় বেশ একটু দৈবশক্তির অধিকারিণী হয়েছেন। তিনি যে-কোনও মানুষের দিকে এক নজরে চেয়েই তার মনের ছবিটি দেখতে পান। সুদূর প্রবাসী তাঁদের কোনও ভক্ত কবে কখন লোকান্তরে চলে গেলেন তিনি তৎক্ষণাৎ তা জানতে পারেন। বলেন—সে আর নেই। সন্ধান নিয়ে দেখা যায় সত্যই তাকে গুরু-ভাই-বোনেরা হারিয়েছেন। তাঁর পরিচিত কেউ মরণাপন্ন রোগে আক্রান্ত হলে ইনি বুঝতে পারেন সে এ যাত্রা রক্ষা পাবে কিনা। অনেক সময় তাঁর অকৃত্রিম ভক্তজনকে নাকি মৃত্যুর দ্বার থেকেও ফিরিয়ে এনে দিয়েছেন। শুনলুম কোনও এক বিশ্বাসী ভক্তের লুপ্তপ্রায় দৃষ্টি শক্তিকে প্রভুর দয়ায় তিনি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। সবচেয়ে আশ্চর্য হলুম একথা শুনে, ইন্দিরাদেবীর প্রেমের আরাধনায় পরিতুষ্ট পাষাণ বিগ্রহ মূর্ত্ত হয়ে উঠে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন।

সন্ধ্যা হয়ে এল। ইন্দিরা দেবী এসে জানিয়ে গেলেন সন্ধ্যারতি ও উপাসনার সময় সমাগত। আমরা আসর ছেড়ে উঠে পড়ে মন্দিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলুম। এই প্রথম আমাদের ঠাকুর দর্শন হল। চিত্রে যে মূর্ত্তি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম প্রত্যক্ষ দর্শনে মনে হল তিনি আরও সুন্দর।

ধূপ ধুনার সুরভি ভরপুর দীপোজ্জ্বল মন্দিরে একটি পবিত্র গাম্ভীর্য বিরাজ করছে। কক্ষতলে বিস্তৃত গালিচার উপর ভক্ত সাধকবৃন্দ সমাসীন। নিমীলিত নেত্রে সংগত চিত্তে ধ্যান নিমগ্ন তাঁরা। সেই প্রশস্ত নাট মন্দিরের একপ্রান্তে সুদৃশ্য দেবমঞ্চ। সেটি ভারতীয় গর্ভমন্দিরের ঐতিহ্য অনুসারে ঈষৎ অপ্রশস্ত হলেও অপূর্ব্ব কারুকার্য খচিত। দেবমঞ্চটিতে ঠাকুর দালানের মত তিনটি তোরণাকৃতি সুন্দর খিলান। মধ্যের খিলানের মধ্যে বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণের মর্ম্মর মূর্ত্তি। কিন্তু শ্যামবর্ণ নয়, শুভ্রকান্তি। হাতে বাঁশী, মুখে হাসি, গলে বনমালা, শিরে ময়ূর-মুকুট, চরণে নূপুর। মধুর সে-মূর্ত্তি। দেবতার দু'পাশের দুটি খিলানে ভারতের যোগীশ্বর শ্রীঅরবিন্দ ও কবীশ্বর রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি। মন্দিরের মাঝামাঝি একদিকের দেয়াল ঘেঁষে একটি সুসজ্জিত সঙ্গীত ও উপাসনা বেদী স্থাপিত।

সমবেত সকলেই উৎসুক আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন দিলীপকুমার, ও ইন্দিরা দেবীর মন্দির প্রবেশের। যথাসময়ে তাঁরা এলেন। দাঁড়িয়ে উঠে সকলে তাঁদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানালেন। গুরুজী ও ইন্দিরামাতা আসন গ্রহণ করলে সকলে বসলেন। গুরু ও ইষ্ট বন্দনার পর উপাসনা শুরু হল। উপাসনা অবশ্য ইংরাজীতেই হল কারণ সমবেত শিষ্য ও ভক্তবৃন্দের অধিকাংশই অবাঙালী। মারাঠী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, রাজস্থানী, পার্শী ও তামিলনাদের অধিবাসী ও অধিবাসিনী। আমরা দুজন ছাড়া আর কোনও বাঙালী ছিল কিনা জানিনা। বিচিত্র ভারতের ঐক্য যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে এখানে।

দেবতা ও গুরুর চরণ বন্দনান্তে প্রার্থনা শুরু হল। প্রথমে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা মুখবন্ধ, পরে ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণস্তুতি। তদনন্তর দিলীপকুমার আজকের সান্ধ্য উপাসনার

বিষয় সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ইংরাজী ভাষায় একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিলেন এবং ইন্দিরার ভাবসমাধি অবস্থায় শ্রুত একটি মীরার ভজন গাইতে শুরু করলেন। গানখানির বিষয়বস্তু আগেই তিনি ইংরাজীতে অনুবাদ করে সকলকে বুঝিয়ে দিলেন। তারপর গান আরম্ভ হল। গানখানি সময়োপযোগী হয়েছিল। বাদল সাঁঝে প্রিয় বিরহে উতলা শ্রীরাধা যেন বলছেন—সজল বরষার ঘনঘটায় আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। বাদল মেঘে গুরু গুরু মাদল বাজছে। কলাপীর কেকারবে বনভূমি মুখরিত। কুঞ্জে কুঞ্জে সদ্যফোটা কুন্দ কদম্ব করবী চম্পক সুরভি বিকীর্ণ করছে, কিন্তু তাতে কী এসে যায়! এতে আনন্দই বা কোথায়, যদি কৃষ্ণকেই না আমার কাছে পেলুম? ইত্যাদি। সকরুণ মর্ম্মছোঁয়া কৃষ্ণ বিবহ সঙ্গীত দিলীপের দেবকণ্ঠে সুরের ঐশ্বর্যে মধুময় হয়ে উঠে সকলের হৃদয়ে বাধার বিরহ বেদনাকে সঞ্চারিত করে তুলল। গানের সঙ্গে ইন্দিরার হাতে মন্দিরার নিক্কণ সুন্দর সঙ্গত সৃষ্ট করছিল।

প্রায় এক ঘণ্টা আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে এই পবিত্র অনুষ্ঠান উপভোগ করলুম। চমক ভাঙলো যখন নারায়ণং নমস্কৃত্য এর পর শান্তিবাক্য। উচ্চারণ শেষে ঠাকুরের আরতি শুরু হল। অবাক হয়ে চেয়ে দেখলুম, দিলীপ-শিষ্য ব্রিগেডিয়ার জেনারেল থাডানীর রূপান্তর। দুপুরে তাকে দেখেছিলুম আপাদমস্তক সামরিক পোষাকে ঢাকা সাম ব্রাউন বেল্ট আঁটা এক মিলিটারীম্যান। এখন তাঁব সে রণবেশ আর নেই। হরিভক্ত বৈষ্ণবেব রেশমী পীতবাসে সজ্জিত তাঁর সে পুজারীর শান্ত সুন্দর মূর্ত্তি বড় ভাল লাগলো। পীতভবন প্রান্ত ভূচুম্বিত, পীত উত্তরীয় স্কন্ধের উভয় অংশে শোভিত। কণ্ঠে স্ফটিক-সংহিত তুলসী মালা বিলম্বিত, প্রশস্ত ললাট চন্দন তিলক চর্চিত, দু'হাতে প্রজ্বলিত পঞ্চ-প্রদীপ প্রসারিত কবে ধরে ভক্তিভবে তদ্গতচিত্তে তিনি মদনমোহনেব আবতি কবছেন।

মন্দিবে আরতির সময় উচ্চ রবে ঢাক-ঢোল কাসর ঘণ্টা বাজে নি। স্তব্ধ নিঃশ্বাসে নিঃশব্দ আরতি সে। শেষ হল আরতি। আরতি প্রদীপেব স্তিমিতপ্রায় শিখার মৃদু তাপ প্রসারিত যুক্ত করে ভক্তি ভরে গ্রহণ করে ললাটে ছুঁইয়ে নিলেন মেয়ে পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকল ভক্তবৃন্দ। তাবপব তাঁদের পবম প্রেমময় গুব ও আচায দিলীপকুমার ও ইন্দিরা দেবীর চরণে মাথা ছুঁইযে একে একে তাঁরা মন্দিব থেকে বার হয়ে গেলেন। একে একে দীপও নিভতে শুরু হল। আমরা যেন এক স্বপ্নের বৈকুণ্ঠ থেকে আবার মর্ত্তোব মাটিতে ফিবে এলুম। ভক্তি কিছু থাক বা-না থাক, অনুষ্ঠানটি আমার লাগলো বেশ। জন্ম জন্মান্তরেব সংস্কারেব প্রভাব হয়তো।

অল্প কয়েকটি ভক্তসেবক ও অতিথি আমরা মন্দিব দ্বাব সংলগ্ন দালানটিতে বসে কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনা করলুম। তখনও সকলেব চিত্ত একটি বিশুদ্ধ পবিত্র ভাবে ভরে রয়েছে। আলোচনা ঠাকুরেব মহিমাকে কেন্দ্র করেই চললো। ভক্তি ও ভক্তের প্রভাবেব কথাও হল। তৃণাদপি সুনীচেন ও তরোরপি সহিষ্ণু পরম ভাগবতগণের বৈষ্ণবী ঐশ্বর্যেব অন্ত নেই। এই নিয়ে যখন জগতেব নানা অঘটন ঘটনার মধ্যে এসে পড়েছে আমাদের আলোচনা, এমন সময় ইন্দিরা দেবী এসে জানালেন আপনাদের প্রসাদ প্রস্তুত, সেবা করবেন আসুন।

ডাইনিং হলে গিয়ে দেখি অতিথি সংকারের জন্য আশ্রমলক্ষ্মীর সে কি বিপুল আয়োজন। বিবিধ ভোজ্যসম্ভারে ভারাক্রান্ত টেবিলখানি। দেখি জুঁই ফুলের মতো ধবধবে ভাত। রুটিও গোছা করা রয়েছে। পাঞ্জাবী পরোটা এবং ফুলকো লুচিও সাজানো। ছোলার দাল, আলুর ডালনা, ভেজিটেবিল চপ, চাটনি, পাঁপড়, আচার রকমারী; আম, আপেল, কলা, কমলালেবু, পেঁপে প্রভৃতি বিবিধ ফল। পায়েস, রাবড়ি, সন্দেশ, রসগোল্লা, রসোমালাই, আর গরম দুধ ও কফিটুকু পর্য্যন্ত। ইন্দিরা দেবী সকলের কাছে ঘুরে ঘুরে এসে অন্নপূর্ন্নার মতো উদার হাতে পরিবেশন কবে খাওয়াচ্ছিলেন। শুনলুম এ সমস্ত কিছু আহার্যই স্বয়ং ইন্দিরা দেবী স্বহস্তে পাক করেছেন। আশ্রমের পাকশালাতেও তিনিই পাটেশ্বরী! আমরা প্রায় দশ বারো জনে নৈশ ভোজনে একত্রে বসেছিলুম। তাঁদেব মধ্যে অধিকাংশই এখনও যৌবনরাজ্যের অধিবাসী। আমি ছিলুম সে দলের বাইরে। বয়সে ও অজ্ঞানতায় সকলের চেয়ে প্রবীণ। আমি জানি আমার ভক্তিও নেই, মুক্তিও পাব না। যে কদিন বাঁচার মেয়াদ আছে নির্দিষ্ট, সেই কদিন সদ্ভাবে জীবন যাপন করে চলে যাবো। চিত্রগুপ্তের সামনে গিয়ে যেন কোনও কৈফিয়ৎ না দিতে হয়। কিন্তু, ইন্দিরা দেবীর দিব্য দৃষ্টিতে তো ফাঁকি দেবার উপায় নেই কারুর। তিনি এক লহমায় ধরে ফেললেন, এই লোভাতুর বৃদ্ধটি ঠাকুরের প্রেমরসাস্বাদনের চেয়ে তাঁর উদ্দেশে নিবেদিত প্রসাদের রসাস্বাদনেই অধিকতর আসক্ত। কাজেই তাঁর ভোজ্য পরিবেশনও পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়লো। সব কিছু চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় আমার পাত্রেই বেশি বেশি পড়তে লাগলো। ভদ্রতার আইন মেনে কিছুটা লজ্জা ও কুণ্ঠার সঙ্গে আপত্তি করা সত্ত্বেও তিনি রেহাই দিলেন না।

একে মনসা তাতে ধুনোর গন্ধ। দিলীপ ফোড়ন কাটলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি নরেনদাকে বেশি করে দাও ইন্দিরা। ওঁর খাইয়ে বলে সুনাম আছে। আমার সেই বৃকোদরতুল্য আহার দেখে আশে পাশের ভক্ত শিষ্যবৃন্দ বিস্মিত হচ্ছিলেন নিশ্চয়। ঈর্ষান্বিত হচ্ছিলেন কিনা জানিনা। ভক্তবৃন্দের মধ্যে ঈর্ষা যে একটু থাকেই এ আমার নানা সম্প্রদায়ে গিয়ে দেখা। গুরুদেব কার প্রতি অধিক প্রসন্ন, কাকে বেশি স্নেহ কবেন, কে তাঁর সেবা ও পরিচর্যায় অধিক সুযোগ পায়, শিষ্যবর্গের মধ্যে এ নিয়ে কারুর মনে অহংকার ও কারুর যে মনঃক্ষোভ হয়না এ কথা কি হলফ্ করে বলা যায়? প্রেম ভক্তিও ঈর্ষাপীড়িত হয়। শ্রীরাধার ঈর্ষা কম ছিল?

খেতে খেতে আমাদের আলাপ আলোচনা দৈবীস্তর থেকে ক্রমে মানবিক স্তরে নেমে এল। অনেক দিন পরে মন্টুর সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ আলোচনার সুযোগ পাওয়াতে বহু পুরাতন স্মৃতি ও হারিয়ে যাওয়া বন্ধুদের কথা আপনিই এসে পড়েছিল। কত যে ভাল লাগছিল বলা যায় না। জীবনের ফেলে আসা দিনগুলির প্রতি মানুষের একটা মমতা থাকেই। যে জন্যে সাধক দিলীপকুমার আজও পূর্ব্বাশ্রমের স্মৃতিচারণ করে চলেছেন।

নৈশ ভোজন শেষে টেবিল ছেড়ে আমরা উঠে এলুম আবার মন্দির দ্বারের সামনের সেই দালানটিতে। অনেকগুলি চেয়ার সাজানো আছে সেখানে। দু'ধারে দুটি বইয়ের

আলমারী রয়েছে। সামনেই খোলা আকাশের নিচেয় একটি চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণ। এটি সিমেন্টে বাঁধানো একখানি পাষাণ ফলকের মতো নির্ম্মল ঝকঝকে। এরই দু'ধারে দুটি আলপনা-অলংকৃত-সুদৃশ্য ঘটের মত আধারে দুটি পবিপুষ্ট তুলসীতরু মঞ্জরিত হয়ে ওঠবার অপেক্ষা করছে। অদূরে খিড়কীর খোলা দরজায় দেখা যাচ্ছিল বাইরের সবুজ ঘাসে ছাওয়া বধাধোয়া মাঠ। স্তব্ধ রাত্রির নিবিড়তায় প্রকৃতি যেন তন্দ্রাতুব। পার্ব্বতী পুনা মনে হচ্ছিল ঘুমন্ত পাহাড়ের কোলে ঝাউতলায় তার নিদ্রালস অঙ্গ এলিয়ে দিয়েছে। শুধু কজন ভক্ত শিষ্য ও বাইরের আমরা দুই-অতিথি দিলীপকে ঘিরে বসে নানা গল্প গুজবে মশগুল হয়েছিলুম। ঘড়ির কাঁটা ঘুবে চলেছে লক্ষ্য নেই কারুব সেদিকে।

ইন্দিবা দেবী আশ্রমের সমস্ত পাট চুকিয়ে এসে কিছুক্ষণ বসলেন আমাদের কাছে। সময় সম্বন্ধে তিনি সর্ব্বদা সজাগ। শান্ত বিনম্র কণ্ঠে মন্টুকে বললেন, দাদাজী! রাত এগারোটা বেজে গেছে। আপনার শোবার সময় উত্তীর্ণ হযে গেল যে! শুনে আমরা অপ্রতিভ হয়ে উঠে পড়লুম। আমি ও বিভূতিভূষণবাবু চলে এলুম আমাদেব ঘরে। পাহাড়িয়া পুনার মধ্যরাত্রি বৃষ্টিতে ভিজে বাদল বাতাসে বেশ ঠাণ্ডা হযে উঠেছিল। ঈষৎ শীতবোধ হচ্ছিল আমাদের দু'জনেবই। ভূষণবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি রাত্রে কী গায়ে দেবেন মশাই? আমি তো একখানা মোটা এণ্ডির চাদর এনেছি সঙ্গে। আপনার তো ফিনফিনে পাতলা উড়ুনী দেখছি শুধু। আমি তখন মাথায় বালিশটি একটু কৃশ দেখে তার তলায় কিছু শয্যা-বিবোধী বস্তু স্থাপন কবে সেটিকে উচ্চতর পর্যাযে নিয়ে যাবাব চেষ্টা কবছি। কাবণ আমাব নীরেট মাথাটা চিবদিন ডবল বালিশ আশ্রয় করে চোখ বুঝতে অভ্যস্ত। তাই বাড়ীতেও বলে রেখেছি, আমি মারা গেলে তোমরা যেন বালিশ বাঁচাবার চেষ্টায় আমার মাথার একটিমাত্র বালিশ দিয়ে ঘাটে পাঠিও না। তাহলে আমার সেই মহানিদ্রায ব্যাঘাত হতে পারে। ভূষণবাবুকে বললুম––দুশ্চিন্তার কারণ নেই তোমার। এই যে পুরু বেডকভারখানি রয়েছে, যদি শীত বোধহয় ওইখানাই টেনে নিয়ে মুড়ি দেবো। এমন সময দেখি ঘবে ইন্দিবা দেবীর আবির্ভাব। হাতে তার দুখানি নরম-গরম হালকা কম্বল। আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম আপনি কি করে জানতে পারলেন যে এই জিনিসটাই আমাদের সঙ্গে নেই। আপনি কি বাঁধা-ছাঁদা হোল্ড-অলের ভিতরেও দেখতে পান কি আছে না আছে? আপনাব দৃষ্টি দেখছি এক্স-বের মতো। আপনিতো বড় ভয়ানক লোক! তিনি স্নিগ্ধ হাস্যে জবাব দিলেন—আপনারা গরম দেশ থেকে আসছেন, সঙ্গে যে কম্বল আনেননি এটা সহজেই অনুমেয়। এ সময় এখানে রাত্রে এ জিনিসটা অনেকেরই দরকাব হয়। উত্তর দেবার আগেই পিছু পিছু দিলীপকুমার ঘরে এসে হাজির। আমাকে বালিশ উঁচু করতে ব্যস্ত দেখে বললেন আরে থামো থামো। ওকি করছো? আমার ঘরে অনেক বালিশ আছে এনে দিচ্ছি। বলতে বলতে মন্টু দোতলায় ছুটলো বালিশ আনতে। ইন্দিরা তাকে ডেকে বললেন—আমি এঁদের এখনি বালিশ বার করে দিচ্ছি দাদাজী, আপনি উপবে যাবেন না। কিন্তু কে শোনে? দিলীপ ততক্ষণে উধাও।

ইন্দিরা দেবী বেরিয়ে গিয়ে সিঁড়ির ধারে রাখা মালগাড়ীর ওয়াগনের মতো এক ঢাউস স্টীল ট্রাঙ্ক খুলে দুটি মোটা পুরু মাথার বালিশ বার করে এনে আমাদের বিছানায় যখন দিচ্ছেন—দিলীপ নেমে এলেন উপর থেকে দুই বগলো উপর দু'টো চারটে রঙীন বালিশ নিয়ে! আমরা তো দেখে হেসেই খুন! বললুম, এযে একেবারে গন্ধমাদন পর্ব্বত এনে হাজির করলে হে! দিলীপ বোধ করি শুনতেই পেলে না। সে আজকাল কানে একটু কম শোনে। বললে, বাখো এগুলো, আমি দটো পাশ বালিশ নিয়ে আসছি। পাশ বালিশ আমরা ব্যবহার করি না বলে বহু কষ্টে তাকে নিরস্ত করা হলো।

শুভভাত্রি জানিয়ে রাত্রের মতো বিদায় নিলেন তাঁরা।

ভোব রাত্রি। চারটে সাড়ে চারটে হবে। সুমধুর প্রভাতী সুর যেন বহু দূর থেকে কানে ভেসে আসছিল। মনে হচ্ছিল 'কোন্ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কী সঙ্গীত ওই ভেসে আসে!' কোনও কোনও ভক্ত অতিথিদের কক্ষ হতে যেন অস্পষ্ট মৃদু কাকলি কানে আসছিল। সেদিকে কান না দিয়ে ভোরাই সুরের মিষ্টি দোলায় আবার ঘুমিয়ে পড়লুম। যখন ঘুম ভাঙলো ঘড়িতে দেখি ছ'টা বেজে গেছে। মুখ হাত ধুয়ে রাত্রির সাজ বদলে নিঃশব্দে ঘবেব বাইরে বেরিয়ে এলুম। বিভূতিভূষণ ভাযা তখনও অগাধ-ঘুমের ঘোবে। মন্দির দ্বারের সম্মুখে সেই দালানটিতে এসে দেখি গুরু পুর্ণিমা উপলক্ষে সমবেত ভক্তশিষ্যগণের শেষ দলটি বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছেন আজ সকালেব ট্রেণে। তাঁদের জিনিসপত্র বাক্স বিছানা বাঁধা ছাঁদা সেখানে তৈরি রয়েছে। কিন্তু, কোনও মানুষজন দেখতে পেলুম না। একলাই দালানে পায়চারি শুরু করলুম। ইন্দিবা নিলয়ের প্রাঙ্গণে নেমেও একটু বেড়ালুম। এমন সময় গুস্ গুস্ করে খান দুই তিন ট্যাক্সী এসে ঢুকলো। রথের ঘর্ঘর শব্দ শুনে গৃহযাত্রী রথীরাও এবার বেরিয়ে এলেন। ইন্দিরা দেবী ও দিলীপকুমারও তাঁদের সঙ্গে এলেন। বিদায় দৃশ্য শুরু হল। আশ্রম অধিষ্ঠাত্রী ইন্দিরা দেবী সেই ভোরেই চা জলখাবার করে তাদের খাইয়ে দিয়েছিলেন।

বিদায় দৃশ্য সব সময় সর্ব্বত্রই সকরুণ। যথারীতি প্রণাম আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদের পর তাঁবা গুরুদেব ও ইন্দিরাদেবীব পাদ বন্দনা করে বিদায নিলেন। সবাব চোখেই জল। ইতিমধ্যে বিভূতিভূষণবাবুও শয্যাত্যাগ কবে প্রস্তুত হযে বেরিয়ে এলেন। তাঁর গায়ে ছিল গিলে করা আদ্ধির পাঞ্জাবী। সকালেও পুনায় বেশ ঠাণ্ডা দেখে আমি একটি মোটা কাপড়ের লম্বাকোট গায়ে চড়িয়ে বেরিয়েছিলুম। বিভূতিবাবুর গায়ে সেই পাতলা জামা দেখে পাছে ঠাণ্ডা লেগে যায় বলে মন্টু অস্থির হয়ে উঠলো। ইন্দিরা দেবী ছুটে গিয়ে একটি সুন্দর উলেন সোযেটার নিয়ে এসে বিভূতিভূষণ বাবুকে পরতে দিলেন। বিভূতিবাবু প্রথমটা না-না থাক, লাগবেনা, দরকার হবে না ইত্যাদি বলতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু আমার ও দিলীপের মৃদু ভর্ৎসনা ও ইন্দিরা দেবীর অনুবোধ উপেক্ষা করতে না পেরে শেষ পর্য্যন্ত সোয়েটারটি পরে ফেললেন। সেটি যেন তাঁর গায়ের মাপেই তৈরি এমন চমৎকার ফিট

করলো। তারপর মন্দির সংলগ্ন সেই দালানে বসে শান্ত শীতল আবহাওয়ায় আবার নানা গল্প শুরু হল।

দিলীপ বলছিল, কেমন করে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম ছেড়ে সে শূন্য হাতে পথে বেরিয়ে পড়েছিল। শ্রীঅরবিন্দের দেহরক্ষার পর পণ্ডিচেরী আশ্রমে সে যেন হাঁপিয়ে উঠছিল। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তার কাছে শূন্য মনে হচ্ছিল। দিলীপ পারলে না সে আবহাওয়ায় থেকে সহজভাবে নিঃশ্বাস নিতে। বেরিয়ে এল সে একদিন তার দীর্ঘপরিচিত প্রিয়তম আশ্রয়নীড় ছেড়ে। দিলীপের মন্ত্র-শিষ্যা ইন্দিরা তাঁর গুরুজীকে এমন ভাবে ছেড়ে দিতে ভয় পেলেন। শ্রীঅরবিন্দআশ্রম যে দিলীপের জীবনের অনেকখানিই অধিকার করে বসেছিল। তখন ইন্দিরাও তাঁর গুরুদেবের অনুগামিনী হলেন। তারপর কেমন করে তাঁরা হরিদ্বারে গেলেন, কিজন্য সেখান থেকে হতাশ হয়ে ফিরলেন এবং কেন যে ভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশ এই পুনায় এসে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন সমস্ত ইতিহাস সরলভাবে আমাদের শোনালেন। বার বার বললেন, সেই দুর্দিনে স্যার চূণীলাল মেটা যদি পুনায় তাঁর নিজের একখানি বাড়ী আমাদের আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য ছেড়ে না দিতেন তাহলে এই 'হরিকৃষ্ণ' মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়ত কোনও দিনই সম্ভব হত না। দীর্ঘ চার বৎসর তাঁরা স্যার চূণীলালের বদান্যতায় তাঁর 'ডলভিন্ কটেজে' বসে এই আশ্রমের স্বপ্ন দেখেছিলেন। বোধকরি ইচ্ছাময়ের কাছে তাদের সে ঐকান্তিক ইচ্ছা গিয়ে পৌঁছেছিল। দেখতে দেখতে ভক্তবৃন্দের দানে ও সহযোগিতায় গণেশ খন্দ রোডে জমি কিনে এই সুদৃশ্য আশ্রমটি গড়ে উঠলো। ঠাকুরের কৃপার কথা বলতে বলতে দিলীপের কণ্ঠস্বর ভক্তিপ্লুত হয়ে উঠছিল। উপন্যাসের চেয়েও চিত্তাকর্ষক সে কাহিনী।

ইন্দিরা দেবী এসে জানালেন প্রাতরাশ প্রস্তুত। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি আটটা বেজে গেছে। চায়ের টেবিলে গিয়ে দেখি প্রাতরাশের যে আয়োজন করেছেন তিনি, একমাত্র আমি ছাড়া আর কেউ তার সদ্ব্যবহার করতে পারবেন কিনা সন্দেহ। চায়ের সঙ্গে প্রচুর ফল, ফুলুরী, মিষ্টান্ন, রুটি মাখন জ্যাম জেলীর সমাবেশ হয়েছে। ভেজিটেবল চপ্ দালপুরি ও পরোটাও ছিল। আমি চা পান করিনি শুনে ইন্দিরা দেবী আমায় কফি কোকো, ওভ্যালটিন হর্লিক্স অনেক কিছু দিতে চাইলেন। সবেতেই আমার নেতিবাচক শিরঃসঞ্চালন দেখে শেষে যখন বললেন, তাহলে এক পেয়ালা গরম দুধ দিতে পারি কি? হেসে উঠে বললুম এইবার অন্তর্যামিনী আমার মনের খবরটা ঠিক ধরে ফেলেছেন দেখছি। বলতে না বলতে ইন্দিরা দেবী একবাটি গরম দুধ এনে হাজির করলেন। সকালে চায়ের আসরে বসে দুগ্ধপান করতে দেখে কেউ কেউ তাঁদের আস্তিনের আড়ালে গোপনে হাসছেন বুঝে ইন্দিরা দেবীকে বললুম, আপনাদের এই ভক্তেরা বোধহয় জানেন না যে It is only the innocent milkbabies who have the right to enter into the kingdom of Heaven! চায়ের টেবিল ঘিরে এইবার সশব্দ হাস্যরোল উঠলো। তার মধ্যে দিলীপের কণ্ঠের প্রাণখোলা হাসি আমাকে বার বার তার স্বর্গগত পিতা দ্বিজেন্দ্রলালের উচ্চহাস্য স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল।

চায়ের আসর ভাঙলো প্রায় বেলা দশটায়। ইন্দিরা দেবী নোটিশ দিলেন স্নানাদি সেরে আপনারা প্রস্তুত হয়ে থাকবেন। ঠিক সাড়ে বারোটায় আমি আপনাদের মধ্যাহ্ন ভোজ প্রস্তুত রাখবো। বললেন, আমি একটু বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছি। একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখিয়ে আমাদের জানালেন—এর মায়ের খুব অসুখ। তিনি আমায় একবার দেখতে চাইছেন। মেয়েটি গাড়ী নিয়ে এসেছে আমায় নিয়ে যাবার জন্যে। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসবো। মেয়েটি কাঁদছে দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, আপনার মায়ের অসুখ কি খুব বাড়াবাড়ি? মেয়েটি ফুঁপিয়ে উঠে বললেন, হ্যাঁ, মা বোধহয় আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন। ইন্দিরা দেবী তাকে নিয়ে চলে গেলেন।

আমরাও একটু আশ্রমের আশে পাশে বেড়িয়ে পার্ব্বতী মন্দিরটি দেখে আসবার জন্য বাইরে বেরিয়ে পড়লুম। সেই বন বিভাগের কর্ত্তাটি (কনজার্ভেটর অফ্ ফরেষ্ট) আশ্রমের একজন নৈষ্ঠিক ভক্ত। অতিথিদের দেখা শোনার ভার ছিল তাঁর উপর। তিনি ঘন ঘন আমাদের খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন, কি চাই না চাই, কোনও অসুবিধা হচ্ছে কিনা। কাল থেকে তাঁকে অনবরত পান চিবুতে দেখে আমি আশ্বস্ত হয়েছিলুম, প্রয়োজন হলে আশ্রমে পান পাওয়া যাবে বুঝে। পুনা স্টেশান থেকে আমি যে পানের রসদ সংগ্রহ করে এনে ছিলুম আজ প্রাতরাশ পর্য্যন্ত তা চলেছিল। প্রাতরাশের পর একটী টাকা দিয়ে তাঁকে বলেছিলুম গোটাকয়েক সাজা পান সংগ্রহ করে আনবার জন্য। তিনি হেসে টাকাটি ফেরত দিয়ে বলেছিলেন, পানের এখানে অভাব নেই। এখনি আনিয়ে দিচ্ছি।

আশ্রম থেকে বেরিয়ে বেড়াতে বেড়াতে পথে ভক্তপ্রবর বিষ্ণুদাসজীর সঙ্গে দেখা। তিনি আমাদের ধরে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়ীতে। অনেকক্ষণ তাঁর কাছে বসে অনেক গল্প শুনলুম। তিনি ছিলেন ঘোরতর নাস্তিক। প্রথমে ছিলেন কংগ্রেসাইট, তারপরে যোগ দেন সোস্যালিষ্টদের দলে। পরে কমিউনিস্ট হয়ে যান। তাঁর স্ত্রী ছিলেন বোম্বাইয়ের সোসাইটি গার্লদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট মহিলা। সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত তিনি রোজ ক্লাবেই কাটাতেন। তাসের জুয়া খেলায় তার প্রচণ্ড নেশা ছিল। তিনি বলতে লাগলেন আশ্চর্য এই দিলীপবাবু ও ইন্দিরা দেবীর প্রেমভক্তির দিব্যশক্তি। এঁরা আমাকে একেবারে নিরীহ বৈষ্ণব বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। শুনে হয়ত বিশ্বাস করতে পারবেন না আমাব স্ত্রীর পরিবর্ত্তন আরও অদ্ভুত! সেই ফ্যাশানেবল্ লেডী প্রেমভক্তির প্রভাবে প্রায় সর্ব্বত্যাগিনী। এ আশ্রম তাঁব কাছে শান্তির স্বর্গ। ভুলে গেছে সে তাব টয়লেট প্রসাধন, তার লিপষ্টীক, নেইন-পালিশ, রুজ, ব্লুম, পাউডার, এসেন্স। আমারই মতো সে আজ একেবারে যেন নতুন মানুষ হয়ে জন্মেছে! আরও অনেক কথা অনেক কাহিনী তাঁর মুখে শুনে এলুম।

বাড়ী ফিরে স্নান সেরে নিলুম। ইন্দিরা দেবী স্নানের জন্য গরম জলের ব্যবস্থা করে গেছলেন। স্নানান্তে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য প্রস্তুত হয়ে বাড়ীতে চিঠি লিখে দিলুম আমরা ২৩শে এখান থেকে বেরিয়ে ২৫শে সকালে কলকাতায় ফিরবো। তারপর সংবাদপত্রে মনোনিবেশ করলুম। ঠিক সাড়ে বারোটায় মন্টু এসে ডাক দিলে—নরেনদা খাবে এস।

মধ্যাহ্ন ভোজনের টেবিলে আজ আমরা মাত্র অল্প কয়েকজন ছিলুম। ভক্তশিষ্যরা অধিকাংশই যে যার গৃহে ও কর্ম্মস্থলে ফিরে গিয়েছেন। দ্বিপ্রাহরিক আহারের যে ব্যবস্থা দেখলুম সেটাকে ভূরিভোজের আয়োজনই বলা চলে। ভাত ও লুচির সঙ্গে ভাজাভুজি, দাল, বিবিধ তরিতরকারী, চাটনি, পাঁপর, আচার, দধি, পায়স, মিষ্টান্ন, আম, কমলা, কলা সে এক বিরাট তালিকা। খাওয়ার অবকাশে নানা সবস আলাপ আলোচনা চলছিল। আমাদের সকলকে হাসিমুখে মুক্ত হস্তে পরিবেশন করছিলেন ইন্দিরা দেবী। গল্প করে খেতে খেতে অনেক বেলা হয়ে যাচ্ছে দেখে আমরা সকলে ইন্দিরা দেবীকে আমাদের সঙ্গে বসে খাবার জন্য অনুরোধ জানালুম। ভয়ও দেখালুম, আমাদের সঙ্গে বসে না খেলে আমরা আর খাবনা, উঠে পড়বো কিন্তু। সকলের সনির্ব্বন্ধ উপরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে বাধ্য হয়ে বসলেন তিনি আমাদের সঙ্গে। আশ্চর্য হয়ে দেখলুম, তিনি গুরুর প্রসাদী অন্ন দু এক গ্রাস মাত্র মুখে দিয়েই উঠে পড়লেন। কাল রাত্রেও দেখেছি তিনি গুরুর পাতের উচ্ছিষ্ট একটু তরকারী দিয়ে মাত্র একখানি হালকা ফুলকো লুচিতেই তাঁর নৈশভোজ শেষ করেছিলেন। ভাবনা ঢুকলো এত স্বল্পাহারে এ মেয়েটি বেঁচে আছে কেমন করে আর উদয়াস্ত এত পরিশ্রমই বা করে কি করে? গুরু ভোজনে চিরাভ্যস্ত আমার কাছে এ যেন এক প্রহেলিকা। তবে কি গুরুর প্রসাদ-কণিকা মাত্র উদরস্থ হলে বিশ্বের ক্ষুধার শান্তি হয়? ভাবলুম একবার পরীক্ষা করে দেখলে হয় না? কিন্তু, তেমন গুরু পাই কোথায় যাঁর উচ্ছিষ্ট খেতে মনে কোনো দ্বিধা বা কুণ্ঠা হবেনা। দিলীপের মতো গৌরকান্তি সুপুরুষ প্রিয়দর্শন গুরু খুঁজে পাওয়া বড় কঠিন। অতএব ও চেষ্টা না করাই ভাল।

মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপ্ত করে উঠতে না উঠতে সেই অরণ্যপাল ভক্ত এসে আমার হাতে একডজন সাজা পানের খিলি দিয়ে গেলেন। ধন্যবাদ দেবার আগেই তিনি নিরুদ্দেশ। কথায় কথায় দিলীপ জিজ্ঞাসা করলুম—রাত্রি চারটে নাগাদ বেশ একটি প্রভাতী সুর কানে আসছিল। তুমি কি শুনেছিলে?

দিলীপ হেসে উঠে বললেন, তোমরা তখন কোথায় ছিলে? বললুম—কোথায় আবার থাকবো? আশ্রমের সুসজ্জিত কক্ষে আরাম শয্যায় কম্বলাবৃত হয়ে সুখ শয়নে সুপ্ত ছিলুম।

দিলীপ বললেন, আমাদের ঠাকুরের উষারতি ও উপাসনা থেকে তাহলে তোমরা আজ বঞ্চিত হয়েছো। রোজই তো ভোর চারটে থেকে মন্দিরে পূজারতি, উপাসনা ও স্তবগান হয়। নৃত্যগীতও বাদ যায় না। ইন্দিরা ভক্তদের কাছে ভাষণ দেয়, নিজ হাতে ঠাকুরের আরতি করে। আবার রাধাভাবে ভাবিত হয়ে মাঝে মাঝে নৃত্যও করে। তুমি বোধহয় ইন্দিরার নাচ কখনো দেখনি? অদ্ভুত নৃত্যপটীয়সী ও। ঠাকুর ওর নৃত্য দেখে মুগ্ধ হয়ে নিজে এসে ওর নিবেদিত ভোগ খেয়ে যান। কখনও কখনও কথাও বলেন ওর সঙ্গে। কিন্তু, আমার সে সৌভাগ্য এ পর্য্যন্ত হয়নি। আজও ঠাকুরের প্রত্যক্ষ দর্শন আমার ঘটেনি। আরও কতদিন আমার কাছ থেকে লুকিয়ে থাকবেন ঠাকুর কে জানে? হয়ত আমার ইন্দিরার মতো এমন গভীর প্রেমের আকুতি নেই, তাই ঠাকুর আময় দেখা দেন না।

অনুরোধ করে দিলীপকে বললুম, কেন তুমি আমাদের ঘুম থেকে ডেকে তুলে আনলে না। আমরা নতুন মানুষ, এই প্রথম এসেছি এখানে। মন্দিরের উষারতির সংবাদ আমাদের জানা ছিল না। দেখ দেখি কতবড় আনন্দ থেকে আমাদের বাদ দিলে।

দিলীপ বললেন, তোমরা কলকাতার মানুষ। বেলা পর্য্যন্ত ঘুমোনো তোমাদের বরাবরের অভ্যাস। রাত চারটেয় বিছানা থেকে ডেকে তুললে কি ভবিষ্যতে আর কখনো এ আশ্রমের পথটি মাড়াবে?

জনৈক ভক্ত বলে উঠলেন, আপনারা দিদিজীকে বলে রাখেননি কেন? উনি নিশ্চয় আপনাদের ঘুম থেকে ডেকে তুলে দিতেন। আমরা কেউ কেউ কোনদিন গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি এই ভোর রাত্রির দিকে। ঠাকুরের উষারতি আর উপাসনার কথা একেবারেই ভুলে যাই। কিন্তু দিদিজীকে আমাদের বলা আছে, তাই ঠিক সময়ে তিনি আমাদের পিছনে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে মধুর কণ্ঠে বলেন, পুজোর সময় হয়েছে যে। আর কত ঘুমুবে ভাই? এইবার ওঠো তোমরা। ঠাকুর যে অপেক্ষা করে রয়েছেন তোমাদের জন্য।

আমরা ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে আলো জ্বেলে দেখি চারটে বেজে গেছে বটে, কিন্তু, দিদিজী কোথায় গেলেন। এইমাত্র তো আমাদের ডেকে তুলে দিলেন। ঘরের দরজার দিকে চেয়ে দেখি কাল রাত্রে শোবার সময় যেমন খিল এঁটে শুয়ে ছিলুম, দরজা ঠিক তেমনি খিল আঁটা বন্ধ রয়েছে। কিন্তু, আমবা যে সুস্পষ্ট দেখলুম তাঁকে। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনলুম। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ি আমরা। ভাবি এই দিদিজী কে? দাদাজীকে জিজ্ঞাসা করলে বলেন, ও কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী মীরা।

দিলীপের মুখে শুনেছি ইন্দিরা লক্ষপতির কন্যা। ওর স্বামীও একজন খুব ধনী ব্যবসায়ী। ইন্দিরার দুটি ছেলে আছে। বড় ছেলে বয়োপ্রাপ্ত। সে সামরিক নৌবিভাগে আছে। ছোট ছেলে শ্রীমান প্রেমলের বয়স বছর দশেক হবে। সে মার কাছে এই আশ্রমেই থাকে। ইন্দিরার স্বামী মাঝে মাঝে আশ্রমে এসে স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে দেখা করে যান। এই আশ্রম ও মন্দির নির্ম্মাণে তিনিও মোটা টাকা সাহায্য করেছেন। শ্রীঅরবিন্দের আদশেই দিলীপ শিষ্যারূপে ইন্দিরাকে গ্রহণ করেছিলেন। ইন্দিরাব মধ্যে ঐশী শক্তির সমাবেশ দেখে শ্রীঅরবিন্দ তাকে একটি ভাল আধার বুঝে স্বয়ং দীক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইন্দিরা নাকি তাঁকে বলে সে স্বপ্ন পেয়েছেন—দিলীপই তার জন্মজন্মান্তরের গুরু। তখন শ্রীঅরবিন্দ দিলীপকেই বলেন, ইন্দিরার সাধন মার্গের পথ প্রদর্শক হতে। ইন্দিরা একবার কঠিন রোগে মরণাপন্ন হয়েছিল। দিলীপ সেই সময় মরণোন্মুখী ইন্দিরার শিয়রে বসে ঠাকুরের কাছে একান্ত মনে প্রার্থনা করেছিল ওকে ফিরিয়ে দেবার জন্য। দিলীপের সে প্রার্থনা ঠাকুর শুনেছিলেন। ইন্দিরা মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে ফিরে এসেছে। তারপর আরও অনেক অদ্ভুত কথা শুনেছি এই মেয়েটির সম্বন্ধে।

বেলা বেড়ে চলেছে। তিনটের ট্রেনে আমরা সেইদিনই ফিরবো এবং বোম্বাই থেকে কলকাতার ট্রেন ধরবো। বললুম, আর না। এইবার যাই দিলীপ। চলো মুশাফের, বাঁধো

গাঠারিয়া' আমাদের জিনিসপত্রগুলো একটু গুছিয়ে নিই। মন্টু বলে, আরে না না, তা কি হয়। তেরাত্রি না কাটালে তীর্থযাত্রা সফল হয় না। আরও দুটো দিন অন্ততঃ তোমবা থেকে যাও এখানে।

বললুম— তোমাব এখান থেকে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না একটুও, কিন্তু ভাই, না গেলেই যে নয়। মেয়েকে জাহাজে তুলে সাগর জলে ভাসিয়ে দিয়ে এলুম। নবনীতাব মা অসুস্থ দেহে শূন্য ঘরে অপেক্ষা কবছেন আমাব জন্য একান্তই একা।

প্রেমকোমল হৃদয় দিলীপকুমার অবস্থা বুঝে আর বাধা দিলেন না। 'পুনরাগমনায়চ' বলে গাঢ় আলিঙ্গন দিয়ে বিদায় দিলেন। ইন্দিরাদেবীর পদস্পর্শ করে প্রণতি জানিয়ে হরিকৃষ্ণ মন্দিরেব আনন্দময় পুণ্য স্মৃতি নিয়ে 'ইন্দিরা-নিলয়' থেকে বেবিয়ে স্টেশানের দিকে রওনা হলুম।

*আশ্বিন,* ১৩৬৬

# চাঁদনীচকের ইতিকথা

## শচীন্দ্রনাথ গুপ্ত

পুরান দিল্লীর পৌর সভায় গৃহীত প্রস্তাবাদি পর্যবসিত না হয়ে যথার্থই কার্যের দ্বারা সমর্থিত হয়, তা হলে চাঁদনী চক যে শীঘ্রই শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সাম্প্রতিক এক প্রস্তাব অনুযায়ী, চাঁদনী চকের অন্তর্গত ফোয়ারাটি অনতিবিলম্বে সংস্কৃত ও মার্জিত হয়ে নব কলেবর ধারণ করবে। চাঁদনী চকের কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত নাভিপদ্মের মত— সৌন্দর্যের আকর এই ফোয়ারাটি।

দিল্লী পত্তনের সময় হতে আজ পর্য্যন্ত চাঁদনী চক এই নগরীর এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই চাঁদনী চক বাজার বা রূপা বাজার বিশেষ করে এই ফোয়াবা অঞ্চলটি। ইহার প্রতিটি ধূলিকণায় ইতিহাসের পদচিহ্ন নির্মম আঘাতে অঙ্কিত হয়ে আছে।

সাজাহান তনয়া জাহানারা বেগম চাঁদনীচক নামের স্রষ্টা। সে সময়ে চাঁদনীর রূপ ছিল অষ্টভুজাকার এবং মধ্যে তার ছিল একটি খাল। কালক্রমে সে খালটি ভরাট হয়ে পথের রূপ নিয়েছে; চাঁদনী চকও পরিবর্ত্তিত রূপে বিস্তৃতি লাভ করেছে।

চাঁদনীর দুইশত বর্ষের দীর্ঘ জীবনধারা অবিরাম রক্ত-রঞ্জনে করুণ ও বীভৎস। নাদির শাহের আজ্ঞায় এই অঞ্চলে বেসামরিক জনসাধারণের বেপরোয়া হত্যানুষ্ঠান সে দেখেছে, ১৭৩৯ সালের ১১ই মার্চ; তিন মোগল রাজপুত্রের ছিন্ন মস্তকের প্রদর্শনী দেখেছে ১৮৫৭ সালে এর কোতোয়ালির পুরোভাগে; আবার ইংরাজ কর্তৃক দিল্লী বিজয়ের পর শত শত নির্দোষ জনসাধারণের নির্ব্বিরোধ হত্যার বর্ব্বরতা—সেও ১৮৫৭ সাল।

তারপর, মোগল সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট বাহাদুর শা'র অভ্যুদয়; চাঁদনীচক তারও সাক্ষী। ইংরাজ কর্তৃক দিল্লী অবরোধ ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোবর্ত্তী হয়ে বাহাদুর শাহ হস্তীপৃষ্ঠে এই অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল জনগণের উৎসাহ বর্ধন ও তাদের সাহস দান। আর, যে ফোয়ারাটির সংস্কার সাধনে নিরত পৌরবাসী—আজ অশ্রুসজল কাহিনীর পটভূমিকায় তা সমুজ্জ্বল। ইংরাজ সেনাধ্যক্ষ হাডসন কর্তৃক নৃশংসভাবে নিহত বাহাদুর শা'র পুত্রদের ছিন্নমস্তক এইখানটিতে স্থাপিত হয়ে প্রদর্শিত হয় বিপুল জনতার সামনে। তাছাড়া, সিপাহী বিদ্রোহের পর, ফাঁসিকাঠ খাড়া করে হাজার হাজার নিরপরাধ নরনারীর বীভৎস হত্যাকাণ্ডের রক্তাক্ত স্মৃতিও এই ফোয়ারাটির ললাট ফলকে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

১৯১২ সালের ১৩ই ডিসেম্বর—লর্ড হার্ডিঞ্জ আনুষ্ঠানিক ভাবে রাজধানীতে প্রবেশ

করেন; তখন তাঁকে হত্যার চেষ্টা হয় এই চাঁদনীচকেই। বস্তুতঃ রূপার স্রোতের পাশে রক্তের স্রোত—এই চাঁদনীচকের চিরন্তন কাহিনী হয়তো সমগ্র পৃথিবীরও।

বিগত ত্রিশ বৎসর যাবৎ আবার চাঁদনীচক দেখেছে সশস্ত্র ইংরাজ প্রভুদের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র জনসাধারণের অভূতপূর্ব্ব স্বাধীনতা সংগ্রাম।

ফোয়াবার কিছু দূরেই ঘণ্টাঘর। ১৮৬৪-৬৯ সালেব মধ্যে নির্ম্মিত এটি। ইহাব সম্মুখভাগে কংগ্রেসেব ঐতিহাসিক অধিবেশন হয় ১৯৩২ সালে; সরকাবী নিষেধাজ্ঞা অবমাননা করে পণ্ডিত মালব্য সভাপতিত্ব করেন তাতে।

১৬ই আগষ্ট, ১৯৪৭—ভাবত ইতিহাসেব স্বর্ণোজ্জ্বল অবিস্মরণীয দিন। এই দিন এই অঞ্চলস্থ ইতিহাস প্রসিদ্ধ লাল কেল্লায়—সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘোষণা করে, নেতাজী সুভাষচন্দ্রেব অন্তরতম বাসনাব প্রতীক স্বরূপ—ভাবতেব জাতীয় পতাকা উড্ডীন হল, পণ্ডিত নেহরু কর্তৃক।

ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী রক্তাক্ত ইতিহাস কোনদিন ভুলবে না ভারতবাসী। ১৯৪২-এর জনজাগরণ দমনের উদ্দেশ্যে চাঁদনীচকেব সমগ্র অঞ্চলটিই বিবাট সৈন্যাবাসে পরিণত হয়ে উঠেছিল—আব, ব্রিটিশ সৈন্যেব যথেচ্ছাচাব আর উচ্ছৃঙ্খলতায় প্রতিটি সূর্যোদয় রক্তরঞ্জিত হয়ে উঠেছে।

কোতোযালিব নিকটবর্ত্তী রোসন-উৎ-দৌলার মসজিদ। এখান থেকেই নাদির শাহের উদ্দেশ্যে গোলা বর্ষিত হয়েছিল। কথিত আছে, ২০০,০০০ লোক সেই হত্যাকাণ্ডে প্রাণবিসর্জন করে এবং নাদির শাহ আশি কোটি টাকা মূল্যেব লুণ্ঠন দ্রব্য নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বহুরূপী চাঁদনীচক। বহুবাব তার রূপ বদল হয়েছে, রাজা ও রাজ্যের উত্থান পতনের সঙ্গে। পাঞ্জাব-আগত শবণার্থীব ভিড়ে এখন আবার নবরূপ নিয়েছে চাঁদনীচক। দিকে দিকে দৃষ্টিকটু বস্ত্রাচ্ছাদনে যেন তেন প্রকারে তৈরি বিপণি শ্রেণী সমগ্র পথটাই অবরুদ্ধ করে আছে। সেই বিচিত্র পরিবেশের মাঝে ফোয়ারাটি মুহ্যমান যেন; তার জলধারার উদ্ধত ফণা আব আকাশের পানে প্রসারিত হয় না এখন—ধীরবাহী নিম্নাভিমুখী ক্ষীণ স্রোতা সে। তার স্নিগ্ধ প্রচ্ছায়তলে শরণার্থী নবনারীগণ তাদের অলঙ্কার বর্জিত অস্থায়ী বিপণি সাজিয়ে বসেছে—মূর্ত্তিমান বীভৎসভাব মত। মোগল বাদশাহ কালের রূপা বাজারের রূপের পলক আজ এসব থেকে তিলমাত্র বুঝবার উপায় নেই।

ঐতিহাসিক এই সব ঘটনাপুঞ্জেব পটভূমিকায় চাঁদনীব মধ্যমণি এই ফোয়াবাটি আবার সুসংস্কৃত হয়ে নবরূপায়ণে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত আপনাব প্রগল্‌ভ জলধারায় পূর্ব্বের মতই অবিশ্রাম স্বয়ং স্নান করে চলবে—মূকদ্রষ্টা সে—মানুযের বিচিত্র জীবনপ্রবাহের ছায়া তার স্বচ্ছ জলে ক্ষণে ক্ষণে প্রতিফলিত হয়ে মুহুর্মুহুঃ কেবল মিলিয়ে যাবে।

# চিত্রশিল্পে মহিলার সাধনা

## পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ভারতীয় চতুঃষষ্ঠি কলা (বিদ্যা)র মধ্যে চিত্রকলা অন্যতম। ঋষি বাৎসায়ন ইহাকে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলিয়াছেন। প্রাচীন ভারতে মহিলারা অনেকে সঙ্গীতকলার ন্যায় চিত্রকলারও বিশেষ অনুরাগিণী ছিলেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে উল্লেখ আছে, সখী বিশাখা শ্রীরাধাকে শ্যামের মূর্তি আঁকিযা দেখাইতেছেন। এমনও আছে যে শ্রীমতী নিজেও শ্রীকৃষ্ণের ছবি আঁকিয়াছেন। চিত্রলেখা অনিরুদ্ধের পট আঁকিয়া উমাকে দেখাইয়াছিলেন। বৌদ্ধযুগে চিত্রকলার বিশেষ সমাদর ছিল। গুহার এবং বৌদ্ধমন্দিরে অঙ্কিত প্রাচীর-চিত্র এখনো বিশ্ববিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। সে যুগে মহিলারা নিজেদের গৃহপ্রাচীরে নানা চিত্র অঙ্কন দ্বারা গৃহের শোভা বর্দ্ধন করিতেন, ঘটের উপরের নানাপ্রকারের চিত্র অঙ্কন করিতেন। মোগলযুগে হারেমের মহিলাদের মধ্যেও চিত্রকলাব বিশেষ সমাদব ছিল। সম্রাট দুহিতা জেব-উন্নিসা সুকণ্ঠী এবং সুদক্ষ চিত্রশিল্পী উভয়রূপেই খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্ঞী নূরজাহানেব চিত্রকুশলতার বিষয় জগদবিখ্যাত।

ইংরাজের আগমনের সময়ে এদেশে আল্পনা, মৃৎপাত্রের উপর চিত্রাঙ্কন, সূক্ষ্ম সূচীকার্য্য প্রভৃতিতে বঙ্গ মহিলাদের বিশেষ দক্ষতা দেখা যাইত। ক্রমশঃ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন ঘটিতে থাকায় পুরুষদের ন্যায় মহিলাদেরও পুঁথিগত বিদ্যার দিকেই আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। চারুকলা অনাদৃত হইতে থাকে।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে পুনরায় পরিবর্ত্তন সুরু হইয়াছে। লেখাপড়াব সঙ্গে সঙ্গে এদেশে মহিলাদের মধ্যে কেহ কেহ চিত্রকলার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন। আমরা এই সম্পর্কে সুনয়নী দেবী, সুখলতা রাও, অমৃত গাবগিল এবং শীলা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নামোল্লেখ করিতে পারি।

বর্ত্তমানে শিল্পবিদ্যালয়সমূহে ছাত্রীসংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। কলিকাতা, বোম্বাই, লক্ষ্ণৌ, লাহোর প্রভৃতি স্থানের গবর্ণমেন্ট আর্টস্কুলে এবং শান্তিনিকেতনের কলাভবনে ছাত্রীসংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতের অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানেও মহিলাদের চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য্যে আগ্রহ দেখা যাইতেছে। শিক্ষালয়ের বাহিবেও পুরনারীরা কেহ কেহ চিত্রকলাব অনুশীলনে রত রহিয়াছেন।

আজকাল নানাস্থানে যে সকল শিল্প-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে মহিলা শিল্পীরাও অংশ গ্রহণ করেন। তাঁহাদেব অঙ্কিত চিত্রাবলী ক্রমশঃই চিত্ররসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। এবার কলিকাতায 'একাডেমি অফ্ ফাইন আর্টস্' অনুষ্ঠিত একাদশ বার্ষিক প্রদর্শনীতে বিশ জনেরও অধিক মহিলা-শিল্পীর অঙ্কিত চিত্র স্থান পাইয়াছিল। তাঁহাদের

প্রদর্শিত চিত্রের সংখ্যা প্রায় ৬০ হইবে। মহিলা শিল্পীরা ছয়টি পারিতোষিকেরও অধিকারিণী হইয়াছেন।

ভারতীয় পদ্ধতিতে মহিলা অঙ্কিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রের জন্য এবৎসর শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী রায় চৌধুরাণী পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। পুরস্কার প্রাপ্ত চিত্র—"বুদ্ধের গৃহত্যাগ"। সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিলে এই জলরঙা চিত্রখানি অনবদ্য হইয়াছে। এই মহিলাশিল্পী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের ছাত্রী। অঙ্কিত চিত্রের মধ্যে অপূর্ব্ব বর্ণ-সমাবেশ করিতে ক্ষিতীন্দ্রবাবুর মত সুদক্ষ শিল্পী ভারতীয় চিত্রকলার পদ্ধতি অনুগামীদের মধ্যে অতি বিরল। তাঁহার বহু ছাত্রছাত্রীর মধ্যে আর কেহ গুরুর শিক্ষার এরূপ ভাবে বর্ণসুষমাকে যে আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহা আমাদের জানা নাই। বিশিষ্ট শিল্পীরা সকলেই চিত্র খানির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। বুদ্ধের মুখে বিষাদ ও সঙ্কল্পের ভাব উভয়ই একসঙ্গে অতি সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। নিদ্রিতা গোপা দেবীর মুখ সুষমামণ্ডিত। তিনি শিশুপুত্র সহ নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছেন। তাঁহার জীবনের পরম বিপদক্ষণ যে সমাগত সে বিষয়ে তাঁহার কোনই ধারণা নাই। সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত এই চিত্রখানি শিল্পীর গৌরব বহুলাংশে বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

প্রদর্শনীতে এই মহিলাশিল্পীর অঙ্কিত আরও পাঁচখানি চিত্র—"গাঁয়ের বৈঠক", "অভিসারিকা", "কর্ণবধ", "রবীন্দ্রনাথ" এবং "শিল্পীর পুত্র" স্থান পাইয়াছিল। সেগুলিও চিত্রানুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও প্রশংসা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী রায় চৌধুরাণী মৈমনসিংহ গৌরীপুরের স্বনামধন্য জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের পুত্রবধূ এবং তদীয় একমাত্র শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর সহধর্ম্মিণী। এই অভিজাত পরিবারের শিক্ষা ও সঙ্গীত শাস্ত্রে ব্রজেন্দ্রবাবুর মত সুপণ্ডিত ব্যক্তি এদেশে অতি বিরল। বীরেন্দ্রবাবুও সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এই গুণী পরিবারের মধ্যে যে একজন সুদক্ষ মহিলা শিল্পীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে, ইহা অতি আনন্দেরই বিষয় বলিতে হইবে। আশা করা যায় ইঁহার আদর্শে বাঙ্গালী মহিলাদের মধ্যে চিত্রাঙ্কন শিল্পের প্রতি অনুরাগী সঞ্চার ঘটিবে।

অতি অল্প বয়স হইতেই চিত্রকলার প্রতি ইন্দিরা দেবীর অনুরাগ প্রকাশ পায়। সর্ব্বপ্রথমে ইউরোপীয় মহিলার নিকট ইনি চিত্রাঙ্কন বিদ্যা শিক্ষা করেন। ক্রমশঃ একাগ্র সাধনা ও অধ্যবসায়ের বলে, উপযুক্ত শিক্ষাগুরুদের সযত্ন শিক্ষায় ইনি প্রাকৃতিক দৃশ্য, পৌরাণিক ও কাল্পনিক চিত্র এবং প্রতিকৃতি চিত্র অঙ্কনে দক্ষতা লাভ করেন। খ্যাতনামা প্রতিকৃতি-চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অতুল বসু ইঁহার অন্যতম শিক্ষাগুরু। জলরঙ্ ও তৈলরঙ্ উভয় প্রকারের চিত্র অঙ্কনেই এই মহিলা-শিল্পী সমান অধিকার অর্জ্জন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ইঁহার অঙ্কিত চিত্রাবলীর সংখ্যা শতাধিক হইবে। শিল্পীর ভবনকে একটি স্থায়ী চিত্র প্রদর্শনী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সম্প্রতি রায় চৌধুরী মহাশয়ের বালিগঞ্জের ভবনে যাইয়া এই মহিলা শিল্পীর অঙ্কিত চিত্রগুলি দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। দেখিয়া সত্যই মুগ্ধ হইয়াছি। প্রতিকৃতি চিত্রের মধ্যে

শিল্পী স্বীয় পুত্র এবং শ্রীঅরবিন্দের যে দুইখানি চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয় হইয়াছে। অন্তরের শ্রদ্ধাভক্তি দিয়া তিনি "শ্রীঅরবিন্দ" চিত্রখানিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। মাতৃস্নেহধারার স্নাত স্বীয় পুত্রের চিত্রখানিও অনবদ্য হইয়াছে। স্বীয় কন্যা ও 'একটি মহিলা' চিত্র দুইখানিও সবিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

প্রাকৃতিক দৃশ্যের বহু চিত্রই নয়নানন্দকর। "পাহাড়ী ঝরণা" চিত্রখানি অতি মনোরম। স্থান নির্ব্বাচনে শিল্পীর বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে। জলের ধার ও চারিদিকের বর্ণসুষমা অতি সুন্দর। "তুষার শিখর" চিত্রে অস্তগামী সূর্য্যের স্বর্ণাভ রশ্মি সমগ্র দৃশ্যকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। চিত্রখানিতে শিল্পীর সাধনা সার্থক হইয়াছে। "পাগলা ঝোরা" চিত্রের বর্ণসমাবেশ অতি সুন্দর এবং শিল্পীর সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচায়ক।

"নিভৃত পল্লী" এবং "বৃদ্ধা লামা" চিত্র দুখানি আমাদের বিশেষ ভাল লাগিয়াছে। শিল্পীর শান্ত সমাহিত ভাব দর্শককে মুগ্ধ করে। জপযন্ত্র হস্তে বৃদ্ধা লামা ভগবান তথাগতের নাম জপ করিতেছেন। মুখের ভাবে অন্তরের ভক্তি সুপরিস্ফুট। পারিপার্শ্বিক দৃশ্যও অতি সুন্দর।

পৌরাণিক চিত্রসমূহেব মধ্যে "রাসলীলা", "শ্রীরামচন্দ্রের বিদায় গ্রহণ", "কৈলাসে হর পার্ব্বতী", "মন্থরা কৈকেয়ী", "শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাত্রা", "মানভঞ্জন" প্রভৃতি চিত্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম দুইখানির মত এত বড় আকারের জলরঙা চিত্র সাধারণতঃ দেখা যায় না। শিল্পীর সাহস ও অধ্যাবসায় প্রশংসনীয়। "রাস-লীলা"ব আকার ৫´×৩´ ফুট হইবে। অপরটিও প্রায় অনুরূপ আকারের। "রাস-লীলা" চিত্রে দ্বাদশটি মূর্ত্তি প্রদত্ত হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের মুখে স্বর্গীয় সুষমা। গোপীদের ভাবে ও ভঙ্গীতে আনন্দ উছলিয়া পড়িতেছে। কদম্ব বৃক্ষসহ সমগ্র চিত্রখানি অতি সুনিপুণভাবে অঙ্কিত। "শ্রীরামচন্দ্রের বিদায় গ্রহণ" চিত্রখানি দর্শকের অন্তরে করুণ ভাবের উদ্রেক করে। পুত্রের বিদায়-ব্যথা মহারাজ দশরথের আননে অপরূপ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সঙ্কল্পে অটল শ্রীরামচন্দ্রেব মুখের ভাব যথাযথ হইয়াছে। সীতা ও লক্ষ্মণ করুণ বদনে দণ্ডায়মান। চিত্রখানির সম্মুখে দর্শকদের কিছুক্ষণ না থামিয়া অগ্রসর হইবার উপায় নাই। শিল্পীর শ্রম সার্থক হইয়াছে। অন্যান্য পৌরাণিক চিত্রগুলি আকারে ছোট হইলেও ভাবে ও বর্ণসুষমায় সুন্দর।

মহিলা শিল্পীর চিত্রশালায় রক্ষিত চিত্রগুলির মধ্যে মাত্র কয়েকখানির স্বল্প পরিচয় প্রদত্ত হইল। ইহাতে তাঁহার একাগ্র শিল্প-সাধনার গৌরব অতি সামান্যও বৃদ্ধি পাইবে কিনা জানি না। তবে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠে যদি একজন বঙ্গমহিলাবও চিত্রকলায় প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে নিজেকে ধন্য মনে করিব।

*ভাদ্র, ১৩৫৪*

# ঈভকুরী ও জহরলাল নেহরু

## প্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত

[ঈভ্কুরী স্বনামধন্যা বিজ্ঞানী মাদামকুরীর কন্যা; বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ও ভারতে ক্রীপপ মিশনের আলোচনাকালীন ঈভ্কুরী বিলাতের কয়েকটি বিশিষ্ট সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরূপে পৃথিবীর বহু দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং সে সকল দেশের বিশিষ্ট নেতাদের সান্নিধ্য লাভ করেন। এ প্রবন্ধে পণ্ডিত জহরলালের সঙ্গে ঈভ্কুরীর সাক্ষাৎকারের বিবরণ দেওয়া হলো—তাঁর লেখা 'জার্ণি এমঙ্গ দি ওয়ারিয়রস্' এর উপর নির্ভর করে।]

কলিকাতা-দিল্লী-গামী এয়ার-কণ্ডিসণ্ড্ ট্রেনখানি জনবহুল এলাহাবাদ ষ্টেশনে এসে থামলো। জহরলাল প্ল্যাটফর্ম্ম দিয়ে এগিয়ে এসে আমায় সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করলেন। যেন কতদিনের পরিচয় আমাদের! কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি আমার লাগেজগুলো মোটরে রাখার ব্যবস্থায় মন দিলেন এবং আমার চীন দেশ পরিভ্রমণের কথাও জিজ্ঞেস করলেন—সেখানে নেহরুর অনেক ভক্ত রয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমার সহযাত্রী সুপ্রসিদ্ধ কংগ্রেস সভ্য ডাঃ বি. সি. রায়ের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে কথোপকথন আরম্ভ করে দিলেন। ডা. রায়ই এলাহাবাদে তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু নেহরুর বাসভবনে আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তিনি আর এলাহাবাদে নামলেন না—তিনি চলেছিলেন সোজা দিল্লী অভিমুখে।

আমি দেখে অবাক্ হয়ে গেলাম—গান্ধীর পরেই যে জহরলাল জাতীযতাবাদী নেতা, তিনি অবাধে ভারতীয় ও ইংরেজ যাত্রীদের মধ্যে, এমন কি নানা শ্রেণীর ফেরিওয়ালাদের মধ্যে সকলের নজর এড়িয়ে ষ্টেশনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। জনসাধারণ তাঁকে চিনুক বা না-ই চিনুক, তারা তাঁর বাধা সৃষ্টি করলো না। বস্তুতঃ নেহরুই একটি থার্ড ক্লাশ গাড়ীর কাছে ছুটে গেলেন, সেখানে কতকগুলো ভারতীয় লোক গাড়ীর কাছে ভিড় জমিয়ে কলরব কচ্ছিল। একটি কলহের সূত্রপাত হয়েছিল মাত্র। এ কলহের কারণ নির্দ্ধারণের জন্যই নেহরুর তথায় গমন। এ থেকে জহরলালের বালকসুলভ চাপল্য ও সজীবতার পরিচয় আমি পেলাম। জনৈক যাত্রী অপর কোনো এক যাত্রীর আসনখানি দখল করে বসেছেন—এই হলো কলহের কারণ। তাঁর রাষ্ট্রনীতির শক্তি ও জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে তিনি এ কলহের উপর চাপ দেওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় মনে করলেন না। দেখতে পেলাম, তিনি ভিড থেকে বের হয়ে আসছেন, অসন্তোষ-জনতার কলহের অংশ গ্রহণ না করেই।

নেহরুরে কেমন দেখাচ্ছিলো? ঠিক যেন রূপকথার সুন্দর রাজপুত্রের মতো। সুন্দর শুভ্র পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত তাঁর দেহ, কংগ্রেসের লাল ও সবুজ ব্যাজ্ রয়েছে তাঁর দেহাবরণে সংলগ্ন, পরিধানে রয়েছে আঁটা পায়জামা ও মাথায় গান্ধীটুপি। দেখতে কৃশ ও একটু

খাটো। যদিও তাঁর চুল শাদা দেখাচ্ছিল, মাথায় একটু টাকও পড়েছিল, তবুও গান্ধী টুপিতে তাঁকে অল্পবয়স্ক বলেই মনে হচ্ছিল। যখন টুপিটি তিনি খুলে ফেল্‌লেন, তখনই মনে হলো—তাঁর বয়স বাহান্ন স্পর্শ করেছে। শুধু তাঁর সুন্দর অবয়ব ও সুন্দর কালো চোখ দু'টির জন্যই তাঁকে ভুলতে পারিনি তা' নয়। তাঁর অনুভূতি-সমাশ্রয় পাণ্ডুর মুখখানির দিকে দৃষ্টিপাত করলে, যে কেউ তাঁর অন্তরের ভাবের কথা জান্‌তে পারেন—তা' দুঃখেরই হোক বা আনন্দেরই হোক। তাঁর মুখে একটা বিস্ময়ের ভাব ফুটে রয়েছে, সুরসিকের ছাপও তাতে পরিস্ফুট। ঝড়েব দিনে আকাশের মতোই দ্রুত পরিবর্ত্তন আসে তাঁর মুখে নেমে।

তাঁর বাড়ীটির নাম "আনন্দ-ভবন। নেহরু তাঁর আইনজ্ঞ পিতা ও ভারতের সুপ্রসিদ্ধ নেতা মতিলাল নেহরুর কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এটি লাভ করেছেন। সুবৃহৎ শ্বেত অট্টালিকার মাথার উপর গোলাকৃতি একটি ডুম বসানো। বিস্তৃত উজানে সুন্দর ফুল ও ছোটো ছোটো গাছগুলো মিলে শোভা বৃদ্ধি করেছে। নীচের তলায় শিশুর দল, অতিথিরা, নেহরু পরিবারের লোকেরা এবং দাসদাসী মিলে বাড়ীটি মুখরিত করে তুলেছে। আমরা মোটরগাড়ী থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজন ছাত্র তাঁদের আদর্শ নেতা নেহরুর কাছে অগ্রসর হলে এলেন---অটোগ্রাফ নেবার অভিপ্রায়ে।

জহরলালকে পাওয়া ও দেখা খুব সহজ। কারণ, তিনি সরল ও সহজ ভাবে থাকেন, আর ভালোবাসেন মানুষকে। অবশ্য এমন সময় গিয়েছে যখন তিনি লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন ঃ "শুধু লোক আর লোক,—এতো কাজ হাতে, তবুও কেন দর্শনপ্রার্থী এসে ভিড় জমায়?" কিন্তু সব দিক থেকে বিচার করতে গেলে, বলতে হয়—তিনি খুব মিশুক। জহরলাল জানেন, তাঁকে প্রথম দেখে কেহ অপছন্দ করবে না। তিনি প্রকৃতই ভক্তদের দৃঢ অনুরাগের আবহাওয়ায় তাঁদের সান্নিধ্য বেশ উপভোগ করেন। হয় তো দেরাদুন ও লক্ষ্ণৌ জেলের একাকিত্বের অভিজ্ঞতার ফলেই—বন্ধু আত্মীয় স্বজনে পূর্ণ গৃহের আবহাওয়াটুকু তাঁর ভালো লাগতো। নেহরু তাঁর জীবনের প্রায় আটটি বছর কারাকক্ষে কাটিয়ে দিয়েছেন। তাঁর মেয়ের কাছে একবার একটি চিঠিতে তিনি তাঁর জীবনের গতির কথা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন ঃ "অনেক জিনিষের সংস্পর্শেই আমি এসেছিলাম। কলেজে অধ্যয়ন আরম্ভ হয় আমার বিজ্ঞান নিয়ে, পরে আইন ও অতঃপর জীবনে জন্মায় নানা বিষয়ে অনুরাগ, অবশেষে ভারতের সুপ্রসিদ্ধ ও সুবিদিত কাজ কারাবরণের পালা।"

"আনন্দভবনে" পৌঁছবার কিছুক্ষণ পরেই নেহরু আমায় বলেন, কাল তাঁর গৃহে-৭০ জন অতিথি আসবেন—তাঁর মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে। কংগ্রেস সভ্যদের মতো বরও খদ্দর পরবেন বিয়ের সময়। জহরলাল একটু গর্ব্বের সঙ্গেই প্রকাশ করলেন, রূপোর জরি শোভিত বিয়ের গোলাপী রঙের যে শাড়ীখানি তৈরী করা হয়েছে, তার সুতো তিনি নিজেই কেটেছেন। হাস্যোজ্জ্বল মুখে তিনি আরও বলেন, "হয়তো আপনি একথা বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু বস্তুতঃই জীবনে বন্দীশালায় কয়েক বছর ভালো সূতোই কাটতে পারতাম।"

দ্বিতলের একটি ঘরে আমার জিনিষপত্তরগুলো খুলে ফেল্লাম। শীতল জলে স্নান সেরে পরিষ্কার পোষাক পরে, বাড়ির অন্যান্য লোক ও অতিথিদের সঙ্গে দেখা করার অভিপ্রায়ে

নীচে নেমে এলাম। বিদেশী পোষাক পরিহিত যে কোনো বিদেশী লোক নিঃসন্দেহে এ বাড়ির যে কোনো সুন্দর লোককে দেখে ঠিক করে নিতে পারেন যে, এঁরা নেহরুরই আত্মীয়। নেহরুর ভগ্নী মিসেস্ বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত বেশ সুন্দরী। কমনীয়তা তাঁর অবয়বে পরিস্ফুট, শুভ্র কেশ সুন্দরভাবে পরিপাটি করা। তিনি হলেন কংগ্রেস-শাসিত একটি প্রদেশের মন্ত্রী এবং 'অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি'র সদস্য। নেহরুর মেয়ে ইন্দিরাও বেশ সুন্দরী। ছিপ্‌ছিপে লম্বা, পাণ্ডুর ও বিষণ্ণ মুখখানি গ্রীক পরিকল্পনারই প্রতীক। গ্রীসে জন্মালেও অশোভন হতো না।

নেহরু পরিচয় করিয়ে দেবার পালাটা খুব তাড়াতাড়ি সেরে ফেলেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, আমি তাঁর পরিবারভুক্ত প্রত্যেকের পরিচয়ই নিজে সংগ্রহ করে নেবো। কিন্তু বস্তুতঃ তা আমার দ্বারা সম্ভব হয়নি। ইন্দিরার বর ফিরোজ গান্ধীকে বের করা আমার পক্ষে একটু কষ্টসাধ্য হয়েই দাঁড়িয়েছিল। ফিরোজ গান্ধী হলেন পার্শী যুবক। সুপ্রসিদ্ধ গান্ধীর সঙ্গে এঁর কোনো সম্পর্ক নেই। বাড়ীর আঙিনায় উজ্জ্বল কালো কালো চোখযুক্ত যে সব শিশুরা খেলা কচ্ছিল, তারা কাদের ছেলে তা জানার আগ্রহ ছেড়ে দেয়েছিলাম। প্রশস্ত ললাটযুক্ত বুদ্ধিমতী মহিলাকে আবিষ্কার করতে আমার কিছু সময় লেগেছিল। ইনি যে ভারতীয় আধুনিক নারী-কবি, প্রাক্তন কংগ্রেস-প্রেসিডেন্ট ও ভারতীয় গণজাগরণের একজন অগ্রবর্ত্তিনী—সরোজিনী নাইডু—আর কেউ নয, এ সত্যটুকু আমার কাছে ধরা পড়লো।

কতিপয় খদ্দরপরিহিত সদাশয় ব্যক্তি একটি প্রকোষ্ঠে যাতায়াত কচ্ছিলেন, সেখানে তাঁদের পরামর্শ সভার বৈঠক বসেছিল। মাঝে মাঝে তাঁরা জহরলালকে ঘিরে ধরছিলেন তাঁর মতামত ও উপদেশের আশায়। এঁরা হলেন হিন্দু রাজনীতিজ্ঞের দল। স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপশের সঙ্গে ভারতবর্ষ সম্পর্কে ভবিষ্যতে যে আলাপ আলোচনা চলবে সে সম্বন্ধেই তাঁরা আলোচনা কচ্ছিলেন। নেহরুর মেয়ের বিয়ের সময়টায় এ ভাবে ভারতবর্ষে আসা স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপ্‌সের পক্ষে মোটেই শোভনীয় হয়নি। একদিকে মেয়ের বিয়ের বিরাট আয়োজন, অপরদিকে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ আলোচনা—এ দুয়ের মধ্যে নেহরুর সময় উত্তপ্ত ভাবে কেটে চলেছিল।

আমরা প্রায় বারজন লোক মধ্যাহ্ন ভোজনে বসেছিলাম। ভারতীয় খাদ্যের প্রচুর আয়োজন করা হয়েছিল। আমরা শুধু হাতেই সেগুলোর সৎকার কচ্ছিলাম। চার ভাঁজ-করা আটার রুটি, সঙ্গে মাংস ও তরকারী। সত্যি কথা বলতে কি—এগুলো আমি যতটা না উপভোগ কচ্ছিলাম, তার চেয়ে "নেহরু" শব্দটির ভেতর কতটা জটিল সমস্যা লুকিয়ে আছে, তারই কথা আমার মাথায় চিন্তাস্রোত প্রবাহিত করে দিয়েছিল। এই যে ধনী ভারতীয় সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব, পিতামাতার একমাত্র পুত্র। ইনি ইংরেজ গভর্নেস্ দ্বারা প্রতিপালিত। শিক্ষা পেয়েছেন আইরিশ শিক্ষকের কাছে। তারপর ইংরেজ উচ্চশ্রেণীর ছেলেদের মতোই শিক্ষা লাভ করেছেন—হ্যারো ও ট্রিনিটি কলেজে। তিনি হলেন আধুনিকভাবাপন্ন পাশ্চাত্য ভাবধারার ছাঁচে গড়া, একজন 'মার্কসিস্ট সোসালিষ্ট।' যিনি আজ ভারতীয় জনসাধারণের একজন প্রিয় ও আদর্শ নেতা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। মাদাম চিয়াং কাইসেক যেমন মার্কিণ ছাঁচে

গড়া চীনদেশের একজন নেত্রী, তেমনি জহরলালও ইংরেজদের আবহাওয়ায় গড়া ভারতীয় নেতা—'ব্রিটেনেই গড়া, ব্রিটেনের শত্রু।'

ইউ-এস্-এ, 'লেকচারটুর' সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল। জহরলালকে একটু ঠাট্টা করার-ছলেই আমি বলে উঠলাম ঃ "বক্তা হিসেবে স্টেটস্ (States) এ গিয়ে আপনি মোটেই সাফল্যলাভ কবতে পারবেন না (যদিও আন্তরিক ভাবে ঠিক উল্টো কথাই আমার মনে দৃঢ়বদ্ধ হয়েছিল)।" অপলক নেত্রে জহরলাল আমার দিকে চেয়ে রইলেন। যেন একটু আহত হয়েই আমাকে জিজ্ঞেস করলে, "কেন?"

আমি বল্লাম ঃ "তার কারণ, আপনার উচ্চারণ ভঙ্গী। আমেরিকানরা ভারতীয়দের বরদাস্ত করতে পারে না—যেমনটি ইংরেজরা আমেরিকানদের বেলায়"—এই বলে সবাই আমরা হেসে উঠলাম। নেহরু তাঁর মার্জ্জিত ইংরেজী ভাষায—ইংরেজদের কারাগারে তাঁর বন্দী জীবনের যে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন, তা বস্তুতঃই অদ্ভুত!

ভারতের শাসকদের সম্বন্ধে তিক্ত অভিজ্ঞতা ও ইংরেজদের সঙ্গে নেহরুর ব্যক্তিগত সম্বন্ধ—এ দু'টোর সমন্বয়ে নেহরু ব্রিটিশদের সম্বন্ধে যে মতবাদ পোষণ করতেন, তাঁতে তিনি তাঁদের বিরুদ্ধবাদ করেননি—যেমন "মানসিক অত্যাচারের" জন্য স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করতে চায়,—পরন্তু নেহরু তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্বের বন্ধনকেই বাঁচিযে রাখতে চেয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে নেহরুর সঙ্গে ইংলণ্ডের সম্বন্ধ বন্ধুত্বের। তাঁর শিক্ষা, দীক্ষা ও মনের দিক দিয়ে তিনি গড়ে উঠেছিলেন তাঁদেরই আবহাওয়ায়। এ কথা তিনি তাঁর আত্মচরিতেও মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু যখনি তিনি ব্যক্তিগত সম্বন্ধকে ছাড়িয়ে ইংলণ্ড ও সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সম্বন্ধের কথা বলতে গিয়েছেন, তখনই সে বর্ণনা হয়ে দাঁড়িয়েছে গভীর নৈরাশ্যের। নেহরুর কথায়; "ব্রিটিশেরা ভারতবর্ষ অধিকার করেছে অবৈধ বল প্রয়োগে। তারা ভারতবর্ষের, সুখ দুঃখের কথা জানে না—জানবার চেষ্টাও করেনি। তারা তার চোখের দিকে লক্ষ্য করেও দেখেনি। কারণ তাদের চোখে জেগেছে ঘৃণা, আর লজ্জা ও নিষ্পেষণে অবনত হয়ে আছে ভারতবর্ষ। শতবর্ষের যোগাযোগ সত্ত্বেও তারা যেন একের কাছে অপরে অপরিচিত—ঘৃণার পাত্র।"

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর নেহরু হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কংগ্রেসের দু'জন নেতা তাঁকে নিয়ে তাঁর অফিসে উধাও হয়ে গেলেন। স্থির করলাম, দুপুরে এলাহাবাদের দৃশ্য দেখে সময় কাটানো যাবে। কিন্তু সূর্য্যেব প্রচণ্ড প্রতাপে বাইরে বের হবার সাহস হলো না। বাড়ীতে অলসভাবে বসে বইলাম। 'মা'র মৃত্যুব পর গৃহের বন্ধন আমার কাছে শিথিল হয়ে গিয়েছিল। বস্তুতঃ গৃহের শান্তি ও আনন্দের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। গৃহের কল্পনা আমার একদিকে যেমনি এনে দিল আনন্দ, অপর দিকে তেমনি বিষণ্ণতা। এখানে একদিকে শিশুদের খেলা-ধূলা ও দুষ্টুমির বহর দেখছি, অপর দিকে বসে বসে সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে কথা বলার আনন্দ উপভোগ কচ্ছি। তাঁর সাহচর্য্য অপূর্ব্ব আনন্দদায়ক। তীক্ষ্ণ কথা, গভীর জ্ঞান আর আন্তরিকতা তাঁর প্রতি কার্য্যে প্রতীয়মান। আমাদের ঘরের চতুর্দিকে ফ্রেম্ করা ফটোগুলো সাজানো, নেহরু পরিবার ও বন্ধুবর্গের। তাঁর স্ত্রী কমলা নেহরুর রুগ্ন মুখখানি

আমার নজবে পড়লো। ১৯৩৬ সালে সুইজারল্যাণ্ডে ক্ষয়রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর (জহরলাল যাকে 'বাপুজী' বলে সম্বোধন করেন) প্রশান্ত মুখ দু'খানিও আমার নজর এড়ালো না।

কিছুক্ষণ পরে মিসেস্ পণ্ডিত ও ইন্দিরার সঙ্গে বাড়ীর বাইরের পেছন দিকটায় গিয়ে বসলাম। আগামী কালের ভাবী বধূর কাছে একজন সওদাগর নিয়ে এলেন এক ঝুড়ি ভর্ত্তি কাঁচের ব্রেস্‌লেট, রামধনুর সমস্ত বঙ উজাড় করে ঝলক দিচ্ছে সেগুলো। ইন্দিরা সেগুলো থেকে তাঁর পছন্দ মতো ব্রেস্‌লেটগুলো বেছে নেবার আনন্দ উপভোগ কচ্ছিলেন। তাঁর শাড়ীর সঙ্গে যেগুলো মানানসই হবে, তেমনি সব ব্রেস্‌লেট তুলে নিচ্ছিলেন অতি সন্তর্পণে। ইন্দিরা বল্লেন ঃ "কাঁচের বলে এগুলো সর্ব্বদাই ভাঙবে, কিন্তু এতই সুলভ যে, যে কেউ পুনরায় এগুলো অনায়াসে ক্রয় কবতে পারে। দশটা কি বারোটা এক সঙ্গে পরতে বেশ আনন্দ হয়।"

নেহরু বন্দীশালা থেকে একবার তাঁর মেয়ের কাছে অনেকগুলো চিঠি লিখেছিলেন পৃথিবীর ইতিহাস নিয়ে। তা' বস্তুতঃই অপূর্ব্ব। পরে 'Glimpees of World History' নামে চিঠিগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয। তার একাদশবর্ষীয়া প্রবাসী মেয়ের নিকট তিনি অপূর্ব্ব কৌশল ও আকর্যণীয় করে—যিশুখ্রীষ্ট, কার্ল মার্কস, আলেকজেণ্ডার দি গ্রেট্ ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস, নেপোলিয়ন ও যোশেফাইন, প্রভৃতিব গল্প বর্ণনা করেছেন। তিনি ইন্দিরাকে স্বদেশ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কথাই শিখিযেছেন। নেহরু ইন্দিরাকে রীতিমত দেশভক্ত করে তুলেছেন।

চা পানের পব 'আনন্দভবনে' একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে গেল। নেহরু পবিবারের সকলে, শিশুবদল এবং খদ্দর পরিহিত প্রায় বারজন কংগ্রেস সদস্য—সকলে এসে মিলিত হলেন বৃত্তাকার একটি হল ঘবে। নেহরুও বাদ পড়লেন না। ভাবলাম এঁদের ভেতর আজকার ব্যাপারে হয়তো কোনো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বৈঠক বসবে এবং আমি ও তাতে উপস্থিত থাকবো। কিন্তু সে সব কিছুই নয়। নেহরু আমার দিকে হঠাৎ ফিরে বল্লেন ঃ 'আমবা এখন পাঞ্জাব থেকে আগত জনৈক পাখীর শব্দ অনুকবণকাবীর অনুকরণ নৈপুণ্য শুনতে যাচ্ছি, পৃথিবীর ভেতর তিনি নাকি এ বিষয়ে খ্যাতনামা অনুকরণকারীদের একজন।'

এরূপ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে যে এলাহাবাদ কংগ্রেস হেড্‌কোয়ার্টারে একজন পাখীর শব্দ অনুকরণকারীর আবির্ভাব হতে পারে, এতে আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম। নেহরু বল্লেন, এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটিকে কথা দিয়েছিলেন, তাঁর পবিবারবর্গের কাছে তাঁর ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখাতে। পাখীর শব্দ অনুকারণকারী পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি সে কথা বিস্মৃত হননি। তিনি সুদূব পাঞ্জাব থেকে 'আনন্দভবনে' এসে হাজির হয়েছেন।

পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি ঘরে এসে ঢুকতেই তাঁর আলোচনা আরম্ভ হলো নেহরুব সঙ্গে। নেহরু তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "কতক্ষণ লাগবে আপনার এ সব খেলা দেখাতে?" ভদ্রলোকটি প্রত্যুত্তবে বল্লেন ঃ "চল্লিশ মিনিট।" নেহরু যেন নিরুৎসাহ হয়ে গেলেন! চল্লিশ মিনিট ধবে পাখীর ডাক শুনতে তিনি যেন প্রস্তুতই ছিলেন না। কিন্তু তাঁকে বিদায়

দিয়ে অসন্তুষ্ট করে অফিসে যাবার ইচ্ছেও নেহরুর মনে সাড়া দিল না। নেহরু হাবভাবে বুঝিয়ে দিলেন, প্রদর্শনীটি সংক্ষিপ্ত করা হোক। পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি রাগত ভাবেই এর প্রতিবাদ জানালেন। তিনি বল্লেন ঃ 'প্রদর্শনীটি চল্লিশ মিনিটের, এ থেকে একটুকু বাদ দিলেও সমস্ত প্রদর্শনীটিই ব্যর্থ হয়ে যাবে। অতএব এটি সংক্ষিপ্ত করা চলবে না।" নেহরু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাঁর কথায় রাজী হলেন। একটু কৌতুকের সঙ্গে নেহরু বল্লেন, আমি আর কি করতে পারি? যে করেই হোক পাখীর ডাক শোনা যাক।" তিনি বিহ্বল হয়ে বসে পড়লেন। তাঁর মধুর ব্যবহারটুকুর জন্য নেহরুকে আমার খুব ভালো লাগলো। আমরাও আসন গ্রহণ করলাম।

পাঞ্জাবী কৃশকায় ভদ্রলোকটি তাঁর আঙুলের ভেতর দিয়ে বাজাতে আরম্ভ করলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন পাখীর দল যেন সুদূর বৃক্ষচূড়া ও আকাশ থেকে একে একে আবির্ভাব হতে লাগলো। খুব বড় পাখী থেকে আরম্ভ করে নগণ্য ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পাখীর ডাক পর্য্যন্ত অনুকরণ করলেন তিনি। ভদ্রলোকটি অপূর্ব্ব নৈপুণ্য দেখালেন, আমরা প্রশংসা না করে পারলাম না। আমাদের প্রশংসার ফল খারাপই হলো। অনুকরণকারী ভদ্রলোকটি আমাদের প্রশংসা পেয়ে মোরগেব ডাক আরম্ভ করে দিলেন, পরে একে একে সমস্ত পশুর ডাকই আমাদেব শোনাতে আরম্ভ করলেন, ঘোড়া থেকে আরম্ভ করে মাছ, মশা পর্য্যন্ত কিছুই বাদ রইল না। এমন কি প্রথমে পুরুষ ও পরে মেয়ে মশার ডাকও তিনি আমাদের শোনালেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন চিড়িয়াখানার প্রশংসনীয় অনুকরণকারী তাতে সন্দেহ রইল না। পশুর চীৎকারে ঘরটি মুখরিত হয়ে উঠলো, ঘরেব অপর পার্শ্বে নেহরু যেন অস্বস্তি বোধ কচ্ছিলেন, তাঁর মুখ থেকে বিরক্তিকর ক্ষীণ শব্দ বের হয়ে আসছিলো। কিন্তু এতে পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটির মোটেই চেতনা হচ্ছিল না। ঠিক চল্লিশ মিনিট পর প্রদর্শনী শেষ হলো—৩৯ মিনিটেও নয়! স্বস্তির দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে নেহরু উঠে দাঁড়ালেন, তাঁকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিলো। কংগ্রেস সভ্যদের সঙ্গে পুনরায় একত্রিত হয়ে তাঁদের সঙ্গে কাজ কবাব অভিপ্রায়ে নেহরু চলে গেলেন। পশুপাখীর শব্দ অনুকরণকারী পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি যে ষ্টাফোর্ড ক্রীপশের খুব সাহায্যে আসতে পারতেন, এ কথাই আমার মনে হলো। একটি মাত্র লোক বারো জন বিশিষ্ট কংগ্রেস সভ্যকে একটি ঘণ্টার জন্য নির্ব্বাক ও নিশ্চল করে রাখলেন। তাঁদের কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি নিজের কথাই তাঁদের শুনিয়ে গেলেন।

সে রাত্রেই আহারের পর নেহরুর সঙ্গে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হলাম। আলোচনায় এতোই মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম যে, সময়ের জ্ঞান আমাদের ছিলই না। বিশেষ করে আমার। রাত্রি অনেক হয়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে অতিথিরা ও নেহরুর পরিবারবর্গ আমাদের কথায় ক্লান্ত হযে বসবার ঘব থেকে একে একে বিদায় নিলেন—শয্যা গ্রহণের আগ্রহে। অনেক পরে আমাদের চেতনা হলো মশার দংশনের জ্বালায। আমরা আত্মরক্ষার প্রস্তুত হলাম। মশাগুলো বর্ব্বরের মতো আমাদের নির্ম্মমভাবে দংশন করে যাচ্ছিল। আমবা হাত পা চুলকাচ্ছিলাম, কিন্তু তবুও আমাদের কথায় যেন সমাপ্তিই ঘটছিলো না।

নেহরুর গল্প বলার ভঙ্গীটি খুব সুন্দর। এমন আকর্ষণীয় করে গল্প বলেন যে, নিজেও বর্ণনা করতে করতে যেন অভিভূত হয়ে পড়েন। মাঝে মাঝে এক কথা বলতে গিয়ে অন্য এক ঘটনায় চলে আসেন, ভুলে যান কি কথা বলতে গিয়ে অন্য এক ঘটনার চলে আসেন, ভুলে যান কি কথা উত্থাপন করেছিলেন তিনি। তারপর হেসে উঠে বলেন ঃ 'যাই হোক—" এবং পুনরায় তাঁর গল্প চলতে থাকে। রোমান্টিক ফিগার বলে তাকে অনেকে আখ্যা দিয়ে থাকেন, কিন্তু তাঁকে আইডিয়লিষ্টদের শ্রেণীভুক্ত করাও অশোভন হবে না। নেহরুর কথায় আমার ফরাসীর প্রাক্তন মন্ত্রী Leox Blum এর কথাই স্মরণ হয়।

নেহরুর চিন্তাধারার সঙ্গে অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবর্গের চিন্তাধারার পার্থক্য হচ্ছে, বিশেষ করে মিঃ গান্ধীর সঙ্গে, এইটুকু— নেহরু বিশ্বাস করেন—ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে পৃথিবীর অগ্রগতির সংযোগ। দেশভক্ত নেহরু সংগ্রাম করে চলেছেন—স্বদেশের মুক্তি কামনায়। বস্তুতঃ নেহরু কোনো একটি বিশেষ দাবীর সংগ্রামেই লিপ্ত নন, পরন্তু বহু সমস্যার সমাধানেই জড়িত। প্রথমতঃ ভারতের মুক্তি কামনা, দ্বিতীয়তঃ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধবাদ, তৃতীয়তঃ ফ্যাসিষ্টবাদের বিরোধিতা এবং পরিশেষে মার্কসিষ্ট নীতির ভিত্তিতে অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান।

অন্যান্য ভারতীয়দের মতো, নেহরুও সঠিক ভাবে কোনো উপায় উদ্ভাবন করতে পারেননি—যাতে করে মুসলমান, হিন্দু, শিখ ও হরিজনদের মধ্যে মতান্তরকে ঐক্যবদ্ধ করা যায়। তিনি শুধু পুনরাবৃত্তি করলেন, যতোদিন ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ না করবে ও ডিভাইড এণ্ড রুল নীতি ত্যাগ না করবে— ততোদিন এ-সমস্যার সমাধান হওয়া অসম্ভব। তৃতীয় শক্তি হিসেবে যতোদিন ব্রিটেন ভারতে অবস্থান করবে ততোদিন হিন্দু ও মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া খুবই কঠিন হয়ে দাড়াবে।

চীন ও ভারতবর্ষের আভ্যন্তরিক অবস্থার যে একটুকু ঐক্য আছে, নেহরু সে কথাটি বেশ ভালো ভাবেই উপলব্ধি করেছেন। হাজার হাজার চীনবাসী যেমন তাদের শত্রুর বিপক্ষে শক্তি নিয়ে দাড়িয়েছে আত্মরক্ষার জন্য—ভারতবর্ষও বিপদের মুখে এমনি সাহস ও ধৈর্য্য নিয়ে শত্রুর সম্মুখীন হবে প্রয়োজন হলে। তার ঘরে বহু ইংরেজী পুস্তকের সঙ্গে সাজানো রয়েছে তার প্রিয়দর্শিনী কন্যা ইন্দিরার, জেনোরালিসিমো, মাদাম চিয়াং কাইসেক এবং সানিয়াৎ সেনের বাঁধানো ফটোগ্রাফ। নেহরুর সঙ্গে এখন পরদিন দুপুরে বহু আলোচনা হচ্ছিল, নেহরু আমায় জিজ্ঞেস করলেন, "মাদাম সানিয়াৎ সেন কেমন আছেন?" বল্লাম, "তিনি খুব দুঃখিনী।" নেহরুর মুখে একটা বিষাদের ছায়া নেমে এলো, তিনি ক্ষীণকণ্ঠে বল্লেন, 'সত্যি, তিনি খুব দুঃখিনী।" মাদাম সানিয়াৎ সেনকে কতটা তিনি অনুভব করেন, এ থেকেই তা' পরিস্ফুট হয়ে উঠলো।—

প্রচুর উপহার বহন করে এলাহাবাদ ও নেহরুর বাসভবন থেকে বিদায় গ্রহণ করলাম। জহরলাল তাঁর লেখা সমস্ত বইগুলোই আমাকে দিলেন। বিজয়লক্ষ্মী ও তাঁর রচিত পুস্তক আমায় উপহার দিলেন। সরোজিনী নাইডু আইভরির তৈরী সুন্দর ছোট্ট একটি মূর্ত্তি আমার হাতে তুলে দিলেন।

দিল্লী-গামী ট্রেনখানির উত্তপ্ত কামরায় বসে আছি—ধূলায় ধূসর হয়ে উঠেছে আমার পরিচ্ছদ, আর ভাব্‌ছি জহরলালের কথা। এতো বড় হয়েও কেমন সরল ও অমায়িক তিনি, সবাই তাঁকে ভালোবাসে। এখনও আমি যেন চোখের সুমুখে দেখতে পাচ্ছি, খদ্দরপরিহিত জহরলাল তাঁর গৃহে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন। প্রায়ই তাঁকে নগ্ন পদে দেখা যেতো। তাঁর পায়ের শব্দ কারো শ্রবণগোচব হতো না। আমি তাঁকে দেখার পূর্ব্বে—দেখতে পেতাম তাঁর ছায়াটিকে বারান্দায় প্রতিফলিত হতে, আর শুন্‌তে পেতাম তাঁর যুবকসুলভ হাস্য কলরব।

নেহরুর মতো অপূর্ব্ব গুণসম্পন্ন মানুষটিকে কি করে আট্‌টি বছর কারাগারে বন্দী করে রাখলো—তা ভাববার বিষয়। কে সে জেলার—যে জহরলালকে বন্দীশালার বন্দী করে তাতে তালা লাগাতেও কুণ্ঠা বোধ করে না? সে চাবি আমি ঘুরাতে পারতাম না! জহরলালের মতো প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে জেলে আট্‌কে রাখা যায় না। তাঁরা যে চির মুক্ত, কোনো বন্ধনই তাঁদের বাঁধতে পারে না। নেহরুর সঙ্গে ভারতবর্ষ প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ। নেহরুকে দেখেছি আমি, তাঁকে দেখে—ভারতবর্ষের সঙ্গেও যেন কিছুটা পরিচয় আমার হয়ে গেছে।

*কার্তিক, ১৩৫৫*

# সোমরস

## ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়

আপনি নিশ্চয়ই অনেক রকম রস পান করিয়াছেন, কিন্তু আপনি কি সোমরস পান করিয়াছেন? কবিগণ প্রকার-ভেদে সোমবস পান করিয়া থাকেন, এবং বলিয়া থাকেন, হে সোম, তুমি কি মধুর, তুমি আমারই তুমি আমারই। ইহাতেই সোমের সোমত্ব। যাহা কিছু মধুর তাহাই সোম। যাহা মধুর নহে, তাহা বৃত্র। সোমই আমাদের প্রাণে বাঁচাইয়া রাখেন। সুতরাং সোম অমৃত। কবির মধ্যে যে প্রাণভরা ভাব জাগিয়া উঠে, আমার প্রাণকে অনুপ্রাণিত করে, তাহাই সোম। দেবতারা এই সোম জানিতেন। এই সোমকে সর্বত্র পাইতেন। তাহা দ্বারা জ্যোতিষ্মান্ হইতেন। তাহাতেই দেবগণের দেবত্ব। এ সোম এক ভাবের সোম। কিন্তু শুদ্ধ এই ভাবে ত দেবগণের সংসার চলে নাই। আমাদেরও চলে না। ভাবে বিভোর হইয়া তন্ময় হইয়া থাকা কোনও দেবতাব ভাগ্যে ঘটে নাই। দেবতাবা এবং ঋষিরা দেখিলেন (এবং আমিও দেখিতেছি) যে, চাঁদ বড মিষ্ট। বায়ু বড় মিষ্ট। মধু বাতা ঋতায়তে। আকাশে চাঁদের মত মিষ্ট আর কিছুই নাই। সুতরাং আকাশের চাঁদ সোম—যাহা ছেলেবেলায় হাত বাড়াইয়া পাইবার চেষ্টা কবিতাম, এবং যাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া এখনও কাঁদি—এই সব মিষ্ট। এই চাদের নাম সোম। যে ফুরফুরে হাওয়াব মাতাইয়া তুলে,—সেই হাওয়া সোম। চাঁদ দ্যুলোকের অর্থাৎ আকাশেব সোম। হাওয়া তার নিচেকার অর্থাৎ অন্তরীক্ষের সোম। এইরূপ নানা কথা সোমের তো জানাই ছিল। কিন্তু এক ঘটনা ঘটিল। এ সব সোম লইয়া ত মনতুষ্টি হইল না। খাদ্যাদির মধ্যে এমন কোন দ্রব্যের কথা জানা ছিল না, যাহাকে সোম বলা চলিত। খাদ্য ছিল ত' ছাতু। তাহাতে এমন কিছু নাই, যাহাকে সোম বলা চলে। পানীয়েব মধ্যে ত সুরা। সে ত' দেবগণও খাইযাছেন, ঋষিবাও খাইযাছেন (অর্থাৎ পান করিয়াছেন), আর আমিও— (কেবল ব্যাকরণটা একটু তফাৎ করিয়া লইবেন)। যাহাই হউক, সুরার স্বাদে এমন কিছু মিষ্টতা নাই যে তাহাকে সোম বলিয়া নৃত্য করিতে থাকিব। এখন, এক সময় দেবতারা কেহ হাতীতে চড়িয়া, কেহ ঘোড়ায় চড়িয়া কেহ ষণ্ডে চড়িয়া (?), কেহ মহিষে চড়িয়া, কেহ গাধায় চড়িয়া দেশ-পর্যটন কবিতে-করিতে এক অজানা দেশে গিয়া পড়িলেন। সে দেশের লোকেরা দেবতাদের খুব আদর-অভ্যর্থনা করিল, এবং এক রকম গাছের রস হইতে প্রক্রিয়া-বিশেষে এক প্রকার পানীয় প্রস্তুত করিয়া দেবতাদিগকে পান করিতে দিল। তাহা পান করিয়া দেবতারা ত অবাক্। বিশেষতঃ তাঁহাদের যিনি রাজা (তাঁর নাম ইন্দ্র) তিনি এই পানীয় বড় তারিফ্ করিলেন। পানীয়ের মধ্যে কি এমন জিনিষ আর আছে? না,—না, ইহাই আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়। এই বলিয়া মহা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দেবতারা এতই মাতোয়াবা হইয়া পড়িলেন

যে, সে গাছটা কি, কোন্ জাতীয়, বা তাহার বৈজ্ঞানিক নাম লাটিন ভাষায় কি হওয়া উচিত, তাহার কিছুই অনুসন্ধান করিলেন না। কেবল রস পানেই বিভোর। সে গাছেরও নাম হইল সোম।

দেবতারা সেই দেশে থাকিবার সময় নজর করিলেন যে, সেই দেশের লোকগুলি সুগায়ক এবং ধনুর ব্যবহারে খুব পটু। সেই দেশ হইতে নিজদেশে ফিরিয়া আসিয়া, দেবতারা সকলে পরামর্শ আঁটিয়া গায়ত্রী দেবীকে অনেক অনুরোধ করিয়া বলিলেন, হে দেবী! তুমি একবার পক্ষ বিস্তার কর (তখন গায়ত্রী দেবীর ডানা ছিল, এখন আছে কি?), ঐ দেশে একবার যাও। তুমি স্ত্রীলোক,—তুমি উহাদের ভুলাইয়া, গান শুনাইয়া, সোমের গাছ সংগ্রহ করিতে পারিবে। কি আশ্চর্য!—অতগুলো গাধা-চড়া, ঋতী-চড়া সোণার বর্ম-পরা মরদ, তাঁহারা কেহ তীরন্দাজদের সঙ্গে লড়াই করিয়া সোম আনিতে সাহস করিলেন না। বোধ হয় বুঝিলেন যে, বর্মের ভারে যুদ্ধ করা একেবারেই অসম্ভব। যাহাই হউক, দেবতারা অনেক মিনতি করাতে, গায়ত্রী দেবী পক্ষ বিস্তার করিয়া আকাশ-মার্গে উড্ডীয়মানা হইলেন এবং অচিরেই সেই দেশে অবতীর্ণা হইলেন। সেই দেশের রাজা বা সেনাপতি ছিলেন কৃশানু। গায়ত্রী কৃশানুকে নানা রকম ছলে মোহিত করিতে অক্ষম হইয়া, চুপি-চুপি একটি গাছ তুলিয়া আকাশে উড়িলেন। তখনই সোমের ক্ষেতের চৌকীদার কৃশানুকে খবর দিল; এবং কৃশানু এক তীর ছুড়িয়া গায়িত্রীর একটি ডানা কাটিয়া ফেলিল; সোমের গাছটাও পড়িয়া গেল। সোমও পাওয়া গেল না, বরং গায়ত্রীর ডানা কাটা হইয়া গেল (বোধ হয় সেই অবধি গায়ত্রী দেবীর ডানা লুপ্ত হইয়াছে)। তার পর দেবগণ কৃশানুর দলের সঙ্গে একটা সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। তাঁহাব সর্ত্ত এই যে কিরাত ও গন্ধর্বগণ দেবতাদের রাজ্যে ঢুকিতে পারিবেন, কিন্তু কেবল ব্যবসায় চালাইবার জন্য। সোমের মূল্যও স্থির হইয়া গেল। কিরাতগণ শকটে করিয়া সোম হইয়া আসিবেন, এবং দেব-রাজ্যের লোকেরা নধর গাভী দিয়া সোম ক্রয় করিবেন। ঋষিরাও এই সর্ত্ত অনুসারে কার্য করিতে থাকিলেন। তাঁহারা দেবগণের সোমের ভাগ যথারীতি বজায় রাখিলেন, এবং কত গান বাঁধিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, হে ইন্দ্র, তুমি মর্ত্ত্যলোকে কত সোম পান করিয়া গিযাছ। আমাদের বিপদের সময় তুমি কোথায়? এস পুনঃ পুনঃ সোম পান কর, আমাদের রক্ষা কর। এই সোম লইযা শেষ কালে একটি বৃহৎ যজ্ঞ আরম্ভ হইল। তাহার নাম সোমযাগ। সেই যজ্ঞের আবার প্রকার-ভেদ করা হইল। কতকগুলি একাহনিষ্পাদ্য। এইগুলি একদিনের মধ্যে, কিন্তু তিনবারে সমাপ্ত হয়। ঠিক যেন শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা। আর এক রকম সোম যাগ হইতেছে অহীন। এইগুলিতে দুই তিন হইতে এগার দিন পর্যন্ত সময় লাগে। যেমন শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা। আর এক রকম হইল সত্র। ইহাতে অন্যূন তের দিন লাগে, এবং একটু বাড়াইয়া তুলিলে যত কাল ইচ্ছা হয়, তত কালই করা যাইতে পাবে। এই রকম কতকগুলি জটিল যজ্ঞ প্রচলিত হইয়া উঠিল। শ্বেতকেতু ঔদ্দালকি দেখিলেন যে, গাড়ী-গাড়ী সোম আসিতেছে; কিন্তু ভাবিলেন, যাহাদের দেশের গাছ; তাহাদের ভাষায় ঐ গাছের নাম কি? অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন, ঐ গাছের নাম অশনা-উশনা। এই ব্যাপারটি তিনি আর পাঁচজনকে জানাইয়া

রাখিলেন। যখন 'শতপথ-ব্রাহ্মণ' নামক গ্রন্থ সংগৃহীত হয়, তখন তন্মধ্যে এই সংবাদটুকু নিবদ্ধ করা হইল। সুতরাং অশনা বা উশনা শব্দটি কিরাতদের ভাষার শব্দ। কিরাতদের ভাষার একটি বৈচিত্র্য এই যে, উহারা কথা কহিবার সময় শব্দের পূর্বে অ বা উ যোগ করিয়া দেয়—যেমন উপ। উহাদের ভাষায় প অর্থে পিতা। কিন্তু উচ্চারণ করিবার সময় উহারা বলে উপ। এই রকমে "অ" যোগের দৃষ্টান্তও যথেষ্ট পাওয়া যায়। সুতরাং কিরাত ভাষার অশনা বা উশনা শব্দটিব মূল হইতেছে 'শনা'। এই শনা শব্দটির "ন" সংস্কৃত ভাষার "ণ" হয়। এ বিষয়ে হজসন ও গ্রিয়ারসন উভয়েই যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। শেষের "আ" কেবল উচ্চারণ জন্য। এই সকল নিয়মে অশনা বা উশনা শব্দটি বিশ্লেষণ কবিয়া দেখা যায় যে, এই শব্দের সংস্কৃত শব্দ হইবে "শণ"। শণ শব্দের অনুরূপ অর্থবাচক প্রাচীন গ্রীক ভাষাব প্রতিশব্দ হইতেছে Kanna। এই শব্দের প্রাচীন অর্থ ভাঙ্গ বা সিদ্ধির গাছ। ভাষাতত্ত্বের নিয়মানুসারে Greek শব্দ kanna এবং সংস্কৃত ভাষার শণ একই শব্দ বটে। এবং এই দুইটি শব্দের অর্থও একই বটে। (S B E 3² ²33) তাহা হইলে এ পর্যন্ত বুঝা যাইতেছে যে, সোম অশনা (উশনা) = শণ = সিদ্ধির গাছ। সোম আর শণ যে একই বস্তু, তাহার প্রমাণ শতপথ ব্রাহ্মণেও পাওয়া যায। ঐ গ্রন্থে (৬।৬।১।২৪) দেখা যায় যে, জবায়ু ও উল্বনের মধ্যে যেমন একটা সম্বন্ধ আছে, সেই রকম শণ ও উমার মধ্যে একটি সম্বন্ধ আছে। সোম বলিলেই বুঝিতে হইবে যে উমাব সহিত বর্তমান (উমায়াসহ বর্তমানঃ)। এবং শণেব সম্বন্ধে এই গ্রন্থ বলিযাছেন যে, সোমের নাম শণ এবং শণের ভিতরটাই উমা। সোম শব্দটি সিদ্ধি বা ভাঙ্গ অর্থে বৈদিক ভাষা ব্যতীত অন্য অনেক ভাষায়ও পাওয়া যায়; যথা, তাংগর্তাদিগের মধ্যে সিদ্ধির গাছেব নাম ছিল সোম (Dschoma); তিব্বতী ভাষায সিদ্ধির গাছেব নাম সোমবস। ডাহুবিয়ার মোগলেবা সিদ্ধির গাছকে বলিত সিম। চীন ভাষায সিদ্ধির গাছের নাম সিম, সুম। সিম পুরুষবৃক্ষেব নাম ও সুম স্ত্রীবৃক্ষেব নাম। Sir George Walt বলেন যে, সুম (স্ত্রীবৃক্ষ) মাদক রসের আধার। এই প্রমাণেও দেখা যায় যে, সোম অতি প্রাচীন শব্দ। নানা দেশে এই শব্দ বা এতদনুরূপ শব্দে অর্থ সিদ্ধির গাছ। চীনা, তিব্বতীয় ইত্যাদি জাতিদিগের ভাষা ও বৈদিক ভাষা এক বংশীয় বলিয়া বিবেচনা হয় না, এবং গ্রীক ও সংস্কৃত ভাষাব মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখিতে যাওয়া যায়, চীন, তিব্বত ইত্যাদিব মধ্যে সে বকম সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ সব ভাষার মধ্যে একই শব্দেব যে একই অর্থ তাহাও প্রমাণ করা যায় না। সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে যে, সোম শব্দটি কিম্বা ঐ শব্দের অনুরূপ শব্দগুলির অর্থ সামান্য হওয়ার একই মাত্র কারণ থাকিতে পারে। এবং সে কারণটি এই, যথা—যে জাতিদিগের নিবাস-স্থানে এই গাছের আদিম নজমস্থান, সেই জাতির ভাষায় সোমশব্দের একটি অর্থ হইতেছে সিদ্ধিব গাছ। এবং সিদ্ধির গাছ ঐ দেশ হইতে যখন অন্য দেশে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখনও ত তত্তদ্দেশীয় লোকেরা ঐ গাছের প্রাচীন নাম বজায় রাখিয়াছেন। ঋষিরাও কিরাত ও গন্ধর্বগণের ভাষায় সোম শব্দটি নিজেদের ভাষার অন্তর্গত করিয়া লইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বিবেচ্য, সোম শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে একটা গোলমাল আছে। সু ধাতু হইতে যদি বাস্তবিক এই

শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে পানীয় রস (সোমরস) প্রস্তুত করিবার প্রণালী হইতেই এই গাছের নাম দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহা সম্ভবপর বিবেচনা হয় না। পুনশ্চ, মন প্রত্যয়টিও বোধ হয় উপাদির অন্তর্গত। "উময়া সহ বর্তমান" এই বাক্য হইতেও এই পর্যন্ত বুঝা যায় যে, সোম নামের বিশ্লেষণ করিবার জন্যই এই ব্যাখ্যা করা হয়। এই ব্যাখ্যা হইতে যে সোম নামের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা নহে। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, সোম শব্দটি যে মৌলিক বৈদিক ভাষার শব্দ, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। সোম শব্দটি ভাষান্তর হইতে গ্রহণ করিবার পর, এই শব্দের অর্থ প্রসার হয়। তৎপরে ঋষিগণ মন্ত্রের মধ্যে 'মধুব' এই অর্থে এই শব্দ ব্যবহার করেন। নিরুক্তকার যাস্ক দেবগণকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করেন, যথা—দ্যুস্থানাঃ, মধ্যস্থানাঃ, ভূস্থানাঃ। অর্থাৎ আকাশের দেবতা, মধ্যস্থানের দেবতা ও ভূস্থানের দেবতা। সোম দেবতা তিন স্থানেই আছেন, সুতরাং তাঁহার তিন জায়গায় তিন রূপ আবশ্যক। দ্যুলোকের রূপ চাঁদ। মধ্যস্থানের রূপ মৃদুমন্দ বায়ু। ভূস্থানের রূপ সোম গাছ। বৈদিক মন্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইলে, মন্ত্র ও প্রকরণ বিবেচনা করিয়া অর্থ বুঝিতে হইবে। যাস্কেব মত স্বকপোল-কল্পিত নহে। শতপথ ব্রাহ্মণ নামক গ্রন্থে (৩।৯।৪।১২) বিশদ রূপে বলা হইয়াছে যে, সোমের তিন মূর্তি; যথা—আকাশে, মধ্যস্থানে ও পৃথিবীতে। প্রথম দুই মূর্তির সহিত তাঁহাদেব পরিচয় ছিল। কিন্তু তৃতীয় মূর্তি—যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহা গুপ্ত ভাবে ছিল।

বেদে সোমের বর্ণনা কিছু পাওয়া যায় কি না? শব্দ শাস্ত্রের ও ভাষাতত্ত্বের প্রমাণে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইযাছি, সে সিদ্ধান্ত প্রমাণান্তরে সিদ্ধ হয় কি না? একটি মন্ত্রে পাওয়া যায় (ঋ ৯।৪১।১) যে, সোমেব ত্বক কৃষ্ণবর্ণ, অথবা ঘোরবর্ণ। ইহা শীঘ্রই ইহার ত্বক্ ত্যাগ করে। ইহার বস পাতলা হরিদ্বর্ণ, অথবা, বভ্রুবর্ণ বা পিশঙ্গ বর্ণ বলা যাইতে পারে। ইহাকে 'উধঃ'ও বলা যায় (ঋ ৯।১০।৭৫)। উধঃ শব্দের অর্থ ঘোর বর্ণ (নিঘণ্টু ১।৭।২০)। সোমরস প্রস্তুত হইবার পর একটু ঘোলাটে সাদা বর্ণ দেখায়। মন্ত্রবিশেষে সোমকে "হরি" বলা হইয়াছে। নিরুক্তকার বলেন, "হবি সোমো হরিতবর্ণঃ" বলা যায় (ঋ৯।৯৭।৩); অর্থাৎ বেশ মনোবম উজ্জ্বল বর্ণ। দুগ্ধ ও দধি মিশ্রণের পূর্বে ইহাকে বভ্রুবর্ণ (৯।৯৮।৭) বলা যায়। দুগ্ধ, মধু ইত্যাদি মিশ্রণেব পূর্বে, অর্থাৎ সোম যখন কলসে থাকেন, তখন অরুষঃ (ঋ ৯।৮।৬) সোমকে ববাহ বলা হইযাছে। নিরুক্তকার বলেন যে, এ স্থলে বরাহ অর্থে জল টানে। ইহাকে অংশুমান্ বলে; অর্থাৎ ইহাব খুব সূক্ষ্ম বশ্মির ন্যায় শোঁয়া থাকে। সোম গোজাতির প্রিয় খাদ্য। ইহাকে ঔষধীনাংপতিঃ ও বীরুধাংপতিঃ বলা হয়। সোমেব শৃঙ্গ আছে এবং পর্ব আছে। ইহার সরু-সরু ডাল আছে। সোম পাহাড়-পর্বতে ফাটলের মধ্যে জলের নিকটে খুব প্রচুর পবিমাণে জন্মে। ইহার গন্ধ বড উগ্র এবং ঐ গন্ধে বমনের বেগ আইসে। জলে ভিজিলে ডালপালাগুলি খুব হৃষ্ট-পুষ্ট হইয়া ফুলিয়া উঠে। ঋষিরা যখন প্রথমে সোম পান করিতে শিখিলেন, তখন কড়া গন্ধে বমি করিয়া ফেলিতেন। ক্রমশঃ দুগ্ধ ও মধু মিশ্রিত করিয়া সভ্য ভাবে নেশা চালাইতে লাগিলেন। সোমকে বনস্পতি বলা হইয়া থাকে। বনস্পতি শব্দেব অতি প্রাচীন অর্থ বননীযানাং পতিঃ, অর্থাৎ

যাহাদেব প্রশংসা কবা হয, তাহাদেব শ্রেষ্ঠ। কিন্তু কালক্রমে এই শব্দেব অর্থ-সঙ্কোচ হইযা পড়ে, এবং এই শব্দেব অর্থ হয দণ্ডায়মান বৃক্ষ (ঋ ৯।১২।৭) ঐ ব্রা ২।১।১০, শত, ব্রা ৩।৮।৩।৩৩, হলায়ুধ ২।২২)। সোম গাছ যে দাঁড়া গাছ, তাহাব প্রমাণস্বরূপ আবও অনেকগুলি ঋক পাওযা যায যথা—১।১৬৬।৫, ৮।২০।৫, ৯।১৩।৭) ইত্যাদি। সোম যদিও দাঁড়া গাছ বটে, কিন্তু কত বড যে হয, তাহাব বর্ণনা আমি পাই নাই, ববং এ কথাব প্রমাণ পাওযা যায যে, সোম গাছ ঝোপেব মতন হইযা থাকে। সোমেব পত্রগুলিব আকাব যে কি বকম, কিম্বা কত বড তাহাব প্রমাণ পাওযা যায না। যাহাও বা উল্লেখ পাওযা যায, তাহাব অর্থবোধ হওযা সুকঠিন, যথা, একটা কথা শতপথ ব্রাহ্মণ গ্রন্থ লিখিযাছেন যে, পলাশপত্র সোমেব পত্র হইতে জাত। আমি এই বাক্যেব বহস্য ভেদ কবিতে পাবি নাই। এ পলাশ বৃক্ষ যে আমাদেব পবিচিত পলাশ, তাহাবও প্রমাণ নাই। আব তাহাই যদি হয, তাহা হইলে এই বাক্যেব অর্থ কি? সোম ও পলাশ যদি উভযই অজানা গাছ হয, তাহা হইলে ঐ বাক্য হইতে কোনও প্রকাব সিদ্ধান্তে উপনীত হওযা যায না। এই বর্ণনা হইতে যে সোমেব উপযুক্ত পবিচয পাওযা যায, তাহাও নহে। কিন্তু একেবাবে যে কোনও পবিচয পাওযা গেল না, এমনও নহে। মোট এই পর্যন্ত বুঝা গেল যে, সোম এক বকম ঝোপেব মত দাঁড়া গাছ, বর্ণ কিছু ঘোব, তাহাব গাত্রে অংশু বিদ্যমান, ডালগুলি নবম, অল্প আযাসেই ছাল ছাড়িযে ফেলা যায, ভযানক বড় গন্ধ তাহাব বস পান কবিলে খুব নেশা হয। বসটা দুগ্ধ ও মধু মিশাইযা খাইলে গন্ধ একটু কম অনুভূত হয। বেশি পান কবিলে বমন হয। ইহা একটি খুব প্রযোজনীয ঔষধ। ইহা ওষধি বিশেষ।

সোমেব আদি নিবাস কোথায? অর্থাৎ বৈদিক দেবগণ বা ঋষিগণ ইহাকে কোথায প্রথম দেখেন? এ বিষযেও কিছু প্রমাণ সংগ্রহ কবা যাইতে পাবে। সোমেব নিবাস মুঞ্জবান্ পর্বত। এই পর্বত কৈলাসেব নিকটে এবং গন্ধর্বগণেব দেশে অবস্থিত। সোম ও কুষ্ঠাব বাসস্থান এক স্থানেই। কুষ্ঠাব (Saussurea) বাসস্থান হিমালয পর্বত বলিযা প্রমাণ হইযাছে। সুতবাং মুঞ্জবান পর্বতও হিমালযেব অংশাবিশেষ। এ বিষযে পুবাণেব বর্ণনায দেখা যায যে, মেরুব দক্ষিণে হিমবান হেমকূট ও নিষদ পর্বত। উত্তবে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গী। এই প্রদেশেব দক্ষিণে ভাবতবর্ষ, কিংপুরুষবর্ষ ও হরিবর্ষ এবং উত্তবে বম্যক, হিবণ্ময ও কুরুবর্ষ। মেরুব পার্শ্বে ইলাবৃতবর্ষ। ইহাব পূর্বে মন্দব, ও দক্ষিণে গন্ধমাদন। পশ্চিমে বিপুল এবং উত্তবে সুপার্শ্ব। এই স্থানেব নাম জম্বুদ্বীপ। এখানে জম্বু নামে একটি নদ আছে। এই নদ গন্ধমাদন হইতে উঠিযাছে। এখানে স্বর্ণ পাওযা যায। মেরুব পূর্বে ভদ্রাশ্ব এবং পশ্চিমে কেতুমালবর্ষ এবং ইহাব মধ্যস্থিত স্থানেব নাম ইলাবৃতবর্ষ। ইহাব পূর্বে চৈত্রবথ বন, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে বৈভ্রাজ এবং উত্তবে নন্দনকানন। এই স্থলে চাবিটি বড হ্রদ আছে, যথা অরুণোদয, মহাভদ্র, অসিতোদ ও মানস। এখানে কতকগুলি ছোট পাহাড আছে,—সীতান্তক, মুঞ্জ, কুরবী ও মাল্যবান। এই সকল নামেব মধ্যে কতকগুলি আমাদেব পবিচিত, যথা, জম্বু নদ অর্থাৎ River Sanpo ইহাব উৎপত্তি Gurla Mandhata নামক পর্বতে। সুতবাং Gurla Mandhata ও গন্ধমাদন একই পর্বতেব নাম। ঐ স্থানেব মানচিত্র

দেখিলেই এ বিষয় বিশদ ভাবে বুঝিতে পারা যাইবে। মান্ধাতা ও Marian pass একই। ইহার নিকটে যে স্থানে সোনা পাওয়া যায়, তাহার নাম Thak Jahung gold field। মানস সরোবর প্রসিদ্ধ। সুতরাং মুক্তবান্ এই স্থানের নিকটে এবং কৈলাসের দক্ষিণে। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, men—nam—nyim নামক যে পর্বত আছে, তাহাই মঞ্জুবান্। নাম দুইটির মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। যে স্থানের উল্লেখ করা হইল, সেই স্থান ভঞ্জা ও কুষ্ঠার নিবাসস্থান। শতপথ ব্রাহ্মণে দেখা যায় যে, ঐ স্থান হইতে উত্তরদেশবাসী অসভ্য জাতিগণ সোম (= সিদ্ধি) আনিয়া বৈদিক ঋষিগণকে বিক্রয় করিত।

সোমের যে বর্ণনা বৈদিক গ্রন্থসকলে পাওয়া যায়, এবং ভাষাতত্ত্বের যে সকল প্রমাণ একত্র করা হইয়াছে, তাহা বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বৈদিক ভাষায় যাহাকে সোম বলা যায়, তাহার বাংলা নাম ভঙ্গা, ভাঙ্গ বা সিদ্ধি। কিরাত বা গন্ধর্ব দেশ হইতে বৈদিক জাতি যখন দূরে যাইতে লাগিলেন, বা সোম (অর্থাৎ ভাঙ্গ) সংগ্রহ করা যখন কঠিন হইয়া পড়িল, তখন সোমের অভাবে অন্যান্য বস্তুর ব্যবহার আরম্ভ হইল। মীমাংসা-শাস্ত্রের একটি পুরাতন বচন আছে—সোমাভাবে পূর্তিবিধিঃ। এ বচনের প্রকৃত মীমাংসা করিতে আমি অক্ষম; কারণ, এই বচনের উল্লিখিত পূর্তি যে কি পদার্থ, তাহা আমি অবগত নহি। ইহা যে পুঁই শাক, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায় না। অন্যান্য বস্তুর ব্যবহারে ক্রমশঃ মূলবস্তুর পরিচয়ে সন্দেহ হইতে লাগিল; এবং ঐতিহাসিক সমালোচনার অভাবে ব্রাহ্মণগণ ক্রমশঃ সোমের মূলপরিচয় ভুলিয়া গেলেন। কিন্তু সোম সম্বন্ধে কতকগুলি প্রাচীন প্রবাদ তাঁহারা এখনও বলিয়া থাকেন; এবং সোমযজ্ঞে (যদি কখনও হয়) ঐ প্রবাদ অনুসারে কার্যও করেন। সে প্রবাদটি এই যে, সোম দাঁড়া গাছ, ঝোপের মত হয় এবং উচ্চে সাধারণতঃ ৪।৫ ফিট হইয়া থাকে। এই প্রবাদ অনুসারে, দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণগণ সোম যজ্ঞ করিবার সময় পুণার নিকটস্থ পাহাড়জাত ঐ প্রবাদানুরূপ একরকম গাছের রস ব্যবহার করিয়া থাকেন। দাক্ষিণাত্য প্রদেশের ব্রাহ্মণগণের এই রীতি সম্বন্ধে আমি স্বয়ং অবগত নহি। কিন্তু Prof. Hang সাহেবের গ্রন্থে এই বিবরণ পাওয়া যায়। Prof. Hang-এর মত যাহাই হউক, দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণগণের প্রথা সম্বন্ধে তিনি যে সংবাদটুকু দিয়াছেন, সেই সংবাদটুকুই আমাদের আবশ্যক। উহাদের উক্তরূপ প্রথা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, উহাদেব মতে সোম ৪।৫ ফিট উচ্চ দাঁড়া গাছ ছিল। প্রাচীন পায়শী জাতির মধ্যেও প্রবাদ ছিল যে, সোম দাঁড়া গাছ; এবং সেই প্রবাদানুসারে Houtum Schindler সাহেবকে এক জাতীয় দাঁড়া গাছ সোম বলিয়া দেখান হইয়াছিল। আর একটি কথা জানা আবশ্যক। লতা শব্দের বৈদিক ভাষার শব্দ নিবুজা, কিন্তু সোমকে নিবুজা বা ব্রততি বা বল্লী বলিয়া কোথাও বর্ণনা করা হয় নাই। প্রবাদকে কি প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যায়? এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যদি কোনও প্রবাদের সপক্ষে প্রমাণান্তর থাকে, তবেই সেরূপ প্রবাদকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। প্রবাদ কিন্তু যথার্থ ভিত্তিমূলক কি না, সে বিষয়ে সর্বদাই সাবধান থাকিতে হইবে। জনরব যে, আমি যেখানে বসিয়া লিখিতেছি, এই জায়গার সম্মুখে যে গাছ আছে, তাহাতে ভূত আছে। প্রবাদগুলির মধ্যে অধিকাংশই এই প্রকারের হইয়া থাকে। কিন্তু

আপনি কি এই প্রকার প্রবাদ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিবেন? নিশ্চয়ই করিবেন না। না করার কারণ এই যে, এই রকম ব্যাপারের প্রমাণান্তর পাওয়া যায় নাই। কিন্তু যদি কোনও প্রকার অলৌকিক ঘটনায় প্রমাণান্তর দেখি, তাহা হইলে এইরূপ প্রবাদকে প্রমাণ বলিয়া গণ্য করি। মূল কথা, এই প্রবাদ সম্বন্ধে যদি প্রমাণান্তর থাকে, তাহা হইলে সেই প্রবাদকে প্রমাণ বলিয়া গণ্য করিব, নচেৎ করি না। এমন অনেক প্রবাদ আছে যে, তাহার মূলে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই। যেমন, একটি অন্ধকার ঝুপ্‌সি বাড়ি জঙ্গলের কাছে আছে; সে বাড়ির সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, সে বাড়িতে ভূত বাস করিয়া থাকে। ভূত বাস করে, কি করে না, এ বিষয়ে কোনও প্রমাণ না থাকিলেও, ঐ বাড়িতে কোন অজ্ঞাত অনিশ্চিত কারণে লোকেব মনে ভয়ের উদ্রেক হয়। সেই অজ্ঞাত কারণের একটা মৌলিকত্ব আছে বটে, এবং সে কারণটি কি তাহা অনুসন্ধান করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে ভূতের অস্তিত্বের প্রমাণ না থাকায়, ভূতই যে এই প্রবাদের কারণ, তাহা প্রমাণ হয় না। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, ভূত না থাকিলেও, ভূতের প্রবাদ হইতে পারে। লোক মুখে শুনিলাম, আমার মাতুলের বিয়োগ হইগাছে। ইহা প্রবাদ। এই প্রবাদ প্রামাণ্য কি না, সেটা বিবেচনা করিতে হইলে, মূল ঘটনার বিশেষ প্রমাণ লওয়া আবশ্যক, এবং যদি ঐ সকল প্রমাণেব সহিত প্রবাদটা মিলে, তাহা হইলে প্রবাদটা কতকটা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে পারিব। যথা, মামার বাড়ি যাইব, মাতুলানী-* (ঐ ভঙ্গা আসিয়া পড়িল) কে জিজ্ঞাসা কবিব, ইত্যাদি।

যদি প্রবাদ থাকে যে সোম নিষ্পত্র, তাহা হইলে কি কবিতে হবে? ঋষি-কথিত বা লিখিত গ্রন্থগুলিতে দেখিতে হইবে যে, এই প্রবাদটি প্রমাণমূলক কি না। অর্থাৎ আমার জানিতে হইবে যে, যাঁহারা সোমকে জানিতেন, তাঁহাব ইহাকে সপত্র বা নিষ্পত্র বলিয়াছেন? তাঁহাবা যদি নিষ্পত্র বলিয়া থাকেন, তবে বুঝিব এই প্রবাদটিও ঠিক। যদি সপত্র বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে নিষ্পত্র প্রবাদ অগ্রাহ্য কবিতে হইবে। কি কারণে নিষ্পত্র প্রবাদ আবম্ভ হয, সে বিষয়েব আলোচনা এ প্রবন্ধের পক্ষে আবশ্যক হইবে না। Prof Hang বলিযাছেন যে, যে গাছের রস হইতে সোম প্রস্তুত করা হইয়াছিল, সে গাছের পাতা নাই। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, সম্ভবতঃ ঐ সকল ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রবাদ ছিল যে, সোম নিষ্পত্র। কিন্তু এ প্রবাদের প্রমাণ্য বিচার করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, বৈদিক গ্রন্থ সোমেব পত্র সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন। দেখা যায়, বেদে অনেব স্থলেই সোমের পত্রের উল্লেখ আছে; সুতবাং নিষ্পত্র প্রবাদ আমরা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। আবও এক কথা এই যে, Houtum Schindlerকে পার্শীগণ যে গাছ সোম বলিয়া দেখাইয়াছিল, সেই গাছ সপত্র। সুতরাং নিষ্পত্র প্রবাদ অগ্রাহ্য। আর একটি প্রবাদ সম্বন্ধে দেখুন। একটি প্রবাদ আছে যে, সোম লতা। আমবা পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, সোম দাঁড়া গাছ। আমাদের এই সিদ্ধান্তমূলে বৈদিক প্রমাণ ও ভাষাতত্ত্বের প্রমাণ রহিয়াছে; যথা সোম— বনস্পতি, এবং নানা ভাষায় ঐ সোম শব্দের অর্থ ভাঙ্গ গাছ, এবং ভাঙ্গ গাছ

* ভাঙ্গা মাতুলানী ইতি।

নিশ্চয়ই দাঁড়া গাছ; সুতরাং সোম দাঁড়া গাছ। আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, সোমকে কখনও লতা বলা হয় নাই। এমন স্থলে যদিও একটা প্রবাদ থাকে যে, সোম লতা বিশেষ (লতাত্মক), সে প্রবাদের প্রামাণ্য উপরিলিখিত নিয়মানুসারে অগ্রাহ্য। দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণগণ Prof. Hangকে যে গাছ দেখাইয়াছিলেন, তাহা লতা-বিশেষ নহে; সেটি দাঁড়া গাছ। Houtum Schindler-কে পার্শীগণ যে গাছ দেখাইয়াছিলেন, সেটিও দাঁড়া গাছ-বিশেষ; লতা নহে। বৈদিক প্রমাণ ও প্রবাদ মধ্যে এ সম্বন্ধে প্রভেদ দেখা যায় না। সুতরাং যদি অন্য একটি প্রবাদ শুনা যায় যে, সোম লতা বিশেষ, তবে সে প্রবাদটি অগ্রাহ্য হইবে। সায়নাচার্য্য বোধ হয় শুনিয়াছিলেন যে, সোম লতা বিশেষ; কিন্তু তিনি এই প্রবাদের মূলে কিছু প্রমাণ আছে কি না, কিম্বা প্রবাদটিই ঠিক কি না, তাহার বিচার করেন নাই। যাহাই হউক, এ কথাটি বেশ বুঝা যাইতেছে যে, সায়নাচার্য্যের পূর্বেই এই প্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছিল। কোথা হইতে কি ভাবে এই প্রবাদের উৎপত্তি হইল, তাহার নির্ধারণ করা আমাদের আবশ্যক নহে; এবং যে কারণ হইতেই এই প্রবাদের উৎপত্তি হইয়া থাকুক না কেন, তাহাতে আমাদের সিদ্ধান্তের কোনও ব্যাঘাত ঘটিবে না। যাহাই হউক, এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায় যে আয়ুর্বেদে নানারকম সোমের উল্লেখ আছে। সে সবগুলির আলোচনা এ প্রবন্ধের মধ্যে আবশ্যক; কিন্তু দেখা যায় যে, তন্মধ্যে সোমলতা বা সোমবল্লীর উল্লেখ আছে। সেই সোমলতার বা সোমবল্লীর যতটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বৈদিক সোমের বর্ণনার সহিত মিলে না। ঐ সকল বর্ণনা যে প্রকৃত সোমের বর্ণনা নহে, তাহা সর্ববাদিসম্মত। একটি বচন আরও পাওয়া যায়, যেটি লইয়া সুবিখ্যাত Prof. Max Muller এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই কিছু-কিছু বিচার করিয়াছেন। সে বচনটি যে কোন্ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত, তাহা পণ্ডিতগণ অবগত নহেন। সে বচনটি এই;—যথা

শ্যামলাম্লা চ নিষ্পত্রা ক্ষীরিণী ত্বচি মাংসলা।
শ্রেষ্মলা বমনী বল্লী সোমাখ্যা ছাগভোজনম্॥

এই বচনটি বৈদিক গ্রন্থের নহে। ইহা আয়ুর্বেদের বচন বলিযাই স্বীকৃত। এই বচনে যে বৈদিক সোমের পরিচয় আছে, তাহার প্রমাণ নাই। কিন্তু এই শ্লোকটি লইয়া য়ুরোপ-খণ্ডের পণ্ডিতগণ এমনই হৈ-চৈ লাগাইয়া দিয়াছিলেন যে, যেন বাস্তবিকই ঐ শ্লোকে সোমের পরিচয় আছে। সোমলতা বলিতে যে লতা বুঝায়, তাহার পরিচয় সম্ভবতঃ এই শ্লোকে আছে। কিন্তু তাহাতে আমাদের কিছু আসে-যায় না। এই শ্লোক সম্বন্ধে পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই শ্লোক কোন্ গ্রন্থের, তাহা জানা যায় নাই; সুতরাং আমাদের মতে এই শ্লোকের কোন প্রামাণিকতা নাই। এই শ্লোকে সোমবল্লীর কথা বলা হইয়াছে। ইহাকে সোম সম্বন্ধে প্রবাদ বলিয়াও গণ্য করা যায় না, কারণ—আমাদিগের সন্ধান সোম; কিন্তু ঐ শ্লোকের সন্ধান সোমবল্লী। যদি বা কেহ এমন বলেন যে, এ স্থলে সোমকেই বল্লী বলা হইয়াছে, তাহার উত্তরে আমরা বলি যে, সোম যে বল্লীবিশেষ, তাহার কোনও রূপ বৈদিক প্রমাণ না থাকায় (বরং বিরুদ্ধ প্রমাণ থাকায়) উক্তরূপ প্রবাদটিকে আমরা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার

করিতে পারি না। সোম শ্যামল, তাহা স্বীকার করি; কারণ, বৈদিক মন্ত্রে তাহাকে কৃষ্ণবর্ণ বলা হইয়াছে। অম্লাস্বাদ স্বীকার করি না; কারণ, প্রমাণান্তর পাই নাই। নিষ্পত্র—প্রবাদও অগ্রাহ্য; এতৎ সম্বন্ধে প্রমাণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে; ক্ষীরিণী—অর্থ বুঝিলাম না। ইহার কোন্ অংশ-বিশেষে ক্ষীর আছে? ক্ষীর শব্দে কি অর্থ বুঝিতে হইবে? ত্বচি মাংসল্য ও শ্লেষ্মলা এ কয়টি কথায় ত ঘৃতকুমারীর গাছও বুঝা যাইতে পারে। বমনী—সোমের এই গুণ বিশ্বাসযোগ্য। কারণ, বেদে প্রমাণ আছে। ছাগভোজনম্—ছাগলের ভক্ষ্য। এই শ্লোক হইতে মাত্র এইটুকু জানা গেল যে, ছাগভক্ষ্য সোমবল্লী নামক লতাবিশেষ আয়ুর্বেদে বর্ণিত হইয়াছে। এই শ্লোক মধ্যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনেক প্রকার লতার আবিষ্কার করিয়াছেন; যথা—(১) Asclepias Acida, (২) Sarcostemma Brevistigma, (৩) Ephedra Vulgaris, (৪) Periploca aphylla। এগুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়। এবং এই শ্লোকার্থের সহিত কোনটিরই সম্পূর্ণ ভাবে মিল নাই। সম্প্রতি একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, সোম বোধ হয় রাগি ধান্যবিশেষ। এই সকল পরিচয় অপ্রমাণিক অনুমান ভিন্ন আর কিছুই নহে। Professor Roth সোম সম্বন্ধে কতকটা অনুসন্ধান করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হয়েন নাই। তাঁহার অকৃতকার্য হইবার প্রধান কারণ এই যে, তিনি বৈদিক প্রমাণ ও ভাষাতত্ত্ব অনুসন্ধান না করিয়া, মাত্র উপর্বিলিখিত শ্লোকটির উপর নির্ভর করিয়াছিলেন।

এ কথাটা সকলেই জানেন যে, শিবের আর একটি নাম সোম। বস্তুতঃ, যে সময়ে দেবদেবীর মূর্তি কল্পনা করিয়া প্রতিমা বা প্রতিমূর্তি প্রস্তুত করা হইল, সে সময়ে যেমন অন্য দেবদেবীর প্রিয় বস্তু, বা তাঁহাদের গুণপ্রকাশক বস্তুবিশেষ দ্বারা তাঁহাদিগকে অলঙ্কৃত করা হয়, তদ্রূপ স্বয়ং শিবেরও প্রতিমূর্তি ও প্রিয় বস্তু বর্ণনা করা হয় এবং তদনুসারে দেবতাদিগের আকৃতি গঠনে তাঁহাদের বৈদিক পরিচয়ের কিছু চিহ্ন রাখা হয়। শিবের নামান্তর সোম। অর্থাৎ সোম-দেবতার গুণ ইত্যাদি একত্র করিয়া শিবের আকৃতি গঠন করা হইল। তাঁহার প্রিয় বস্তুও বর্ণিত হইল; সেটি উক্ত নিয়মানুসারে সোমাত্মক হইবেই। শিবের প্রিয় খাদ্য বা পানীয় ভঙ্গা বলিয়া বর্ণিত হইল; সুতরাং ইহা বুঝা যাইতেছে যে, সোমই শিবের ভঙ্গা বটে।

সোমযজ্ঞ সদৃশ আধুনিক কালের যাগাদিতে, অর্থাৎ দুর্গাপূজা ইত্যাদি পূজাতে, ভঙ্গার এত আদরের কারণ কি, পাঠক অনুমান করিতে পারেন?

এই সঙ্গে ভঙ্গা শব্দের অভিধান একটু আলোচনা করিয়া দেখুন। শব্দকল্পদ্রুম ভঙ্গা শব্দে বলেন শণামাশস্যম্। যথা ভঙ্গা শস্যে শণাহ্বায়। এই মতের প্রমাণও দিয়াছেন। তৎপরে আরও দেখুন—

ত্রৈলোক্যবিজয়া ভঙ্গা বিজযেন্দ্রাশনং জয়া। ইতি শব্দচন্দ্রিকা।

এই বচনে দেখা যায় যে, ভঙ্গার আর একটি নাম ইন্দ্রাশন। ইন্দ্রাশন অর্থে বুঝায়, ইন্দ্রের প্রিয় খাদ্য (বা পানীয় ইত্যাদি)। ইন্দ্রের প্রিয়তম খাদ্য সোম। সুতরাং সোমই কি ভঙ্গা নহে?

অন্যান্য প্রমাণ মধ্যে একটা কথা সহজ ভাবে বলি।

| | |
|---|---|
| উশনা (অশনা) | = সোম (শত ব্রা ৪।২।৫।১৫) |
| সোম | = শণ (শত ব্রা ৬।৬।১।২৪) |
| শণ | = ভহ্গা (অভিধান) |
| সোম | = ভঙ্গা |

*ফাল্গুন* ১৩২৯

# সোম

## (দ্বিতীয় অংশ)

### সোম কি লতাবিশেষ?

এ প্রশ্ন সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই কিছু বলিয়াছি। সায়নাচার্য্য (14th Century A D) "লতাত্মকঃ সোমঃ", "উধঃ সোম-বল্লী লক্ষণং" ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যের কোন অংশেই সোমকে লতাবিশেষ বলিবার পক্ষে কারণ বা যুক্তি দেখান নাই। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে ঋগ্বেদে লিবুজা শব্দ ব্যবহার আছে। লিবুজা শব্দের অর্থ লতা (Creeper, Climber অথবা twiner) যথা "পরিষ্বজাতে লিবুজেব বৃক্ষং" (ঋ ১০।১১।১৩,১৪) কিন্তু সোমকে লিবুজা বলা হয নাই। পরন্তু সোমকে বনস্পতি ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হইযাছে। এই শব্দের অর্থ আমরা পূর্বেই বলিযাছি। বনস্পতি দণ্ডায়মান তরু। কৃষ্ণ যজুর্বেদে ওষধি ও বনস্পতি দুইটিই দণ্ডায়মান তরু; একটি ছোট ও অপরটি অপেক্ষাকৃত বড়। (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৭।৩।১৯; ৭।৩।২০)। সুশ্রুত গ্রন্থে সোমবল্লী, সোমবল্কল ইত্যাদির উল্লেখ আছে। বস্তুতঃ পক্ষে সোম শব্দ অবলম্বনে অন্যান্য বৃক্ষ লতাদির নাম হইয়াছে; যথা—সোমযোনি, সোমরাজী, (সোমরাজিকা), সোমলতা, সোমলতিকা, সোমবল্কঃ, ইত্যাদি। সোমযোনি অর্থে চন্দনবিশেষ, সোমরাজী অর্থে হাকুচ বা বাকুচী, সোমলতিকা অর্থে গুড়চী ইত্যাদি। সোমলতা সমন্ধে ভাবপ্রকাশ বলেন "সোমবল্লী সোমলতা সোমাক্ষীবা দ্বিজপ্রিযা। সোমবল্লী ত্রিদোষঘ্নী কটুস্তিক্তা রসায়নী।" রাজনির্ঘণ্ট মতে "সোমবল্লী মহাগুল্মা যজ্ঞশ্রেষ্ঠা ধনুর্লতা। সোমার্হা গুল্মবল্লীচ যজ্ঞবল্লী দ্বিজপ্রিয়া। সোমক্ষীরা চ সোমা চ যাজ্ঞাঙ্গা রুদ্রসংখ্যয়া। সোমবল্লী কটুঃ শীতা মধুরা পিত্তদাহহৃৎ। কৃষ্ণা বিশোষ শমনী পাবণী যজ্ঞসাধনী।" সোমবল্লী বা সোমবল্লরী অর্থে অমরকোষ অনুসারে ব্রাহ্মী বুঝায়। "ব্রাহ্মী তু মৎস্যাক্ষী বয়স্থা সোমবল্লবী।" এ সকল শব্দের মধ্যে কোন্‌টা যে বৈদিক সোমের প্রকৃতি, সে বিষয কোনও প্রমাণ পাওযা যায় না বটে, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, সোমবল্লী বা সোমলতা অর্থে ব্রাহ্মীশাক। ইহাই যে বৈদিক যজ্ঞের সোম, তাহার প্রমাণ কি আছে? সোমকে আমি যদি লতা বলিয়া স্বীকার না করি, তাহা হইলে সোম ও ব্রাহ্মীশাকের ঐক্য প্রমাণ করার কোনও উপায় দেখিতে পাই না। সায়নাচার্য্য সম্ভবতঃ আয়ুর্বেদের সোমলতা ইত্যাদি নাম দেখিয়া বৈদিক সোমকে লতাত্মক বলিয়াছেন। বেদবেত্তা চতুর্বেদের ভাষ্যকার সাযনাচার্য্যের উক্তি বা মত আমরা সহজে ত্যাগ

করিতে ইচ্ছা করি না; কিন্তু যে সকল মত বৈদিকপ্রমাণমূলক নহে, সে সকল মত শিরোধার্য্য করাও উপযুক্ত নহে। কিন্তু তাঁহার নামের মাহাত্ম্যে আমরা অনেক সময়ে তাঁহার স্বকপোলকল্পিত মতগুলিও শিরোধার্য্য করিয়া থাকি, ইহা আমাদের প্রকৃতিগত দোষ। ইহাকে তর্কশাস্ত্রে argumentum ad hominem বলা যায়। যুক্তি ও তর্ককালে এই দোষ হইতে সর্বদা সাবধান না থাকিলে, সত্যের অনুসন্ধানে আমরা প্রায়ই বিফল-মনোরথ হই। যুক্তি ও প্রমাণ সাহায্যে সোমের লতাত্মকতা যদি প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে সায়ন-মত আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য থাকিব। যেমন সায়নের মত সম্বন্ধে সাবধান হওয়া উচিত, তেমনই অন্যান্য খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের সম্বন্ধেও সাবধান হওয়া আবশ্যক। বিশেষরূপে সাবধান না হইলে, কোন বিষয়ের সত্যাসত্য বিচার করা অসম্ভব। পণ্ডিত-মাত্রেই অবগত আছেন যে বৈদিক সোম ও আবেস্তায় হেওম একই বস্তু এবং Sirozah (২।৩০) নামক গ্রন্থে হেওমকে দাঁড়াগাছ বলা হইয়াছে। Prof Rothও স্বীকার করিয়াছেন যে, বৈদিক গ্রন্থ সোমকে লতাত্মক বলা হয় নাই।

## Prof eggeling-এর মত।

Prof Eggeling বলেন যে, সোমের আকৃতি কি প্রকার, তাহা আমাদের নিশ্চিতভাবে জানা নাই; কিন্তু অনুমান করা যায় যে পার্শীগণ যে তরু হইতে হুমরস প্রস্তুত করেন, সেই তরুই বৈদিক সোম। এই অনুমান-মূলে কয়েকটি যুক্তি তিনি প্রদর্শন করেন।

১। কর্মান দেশীয় পার্শীগণ Houtum Schindlerকে একটি তরু দেখাইয়াছিলেন এবং তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে ঐ তরু তাঁহাদের ধর্মশাস্ত্রোল্লিখিত হুম্ বটে।

২। হুম্ ও সোম ভাষাতত্ত্ব প্রমাণে একই শব্দ ও সমানার্থক।

৩। যে তরু দেখান হইয়াছিল, তাহা উচ্চে প্রায় ৪ ফুট্ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহার ডালগুলি একটু গোল ভাবের এবং ইহাতে একটু লাল বা হরিৎ আভাযুক্ত লম্বা দাগ আছে; ইহার রস দুগ্ধের ন্যায়, কিন্তু একটু সবুজ আভাযুক্ত এবং সুস্বাদু; কিছুদিন রাখিলে অম্লরস হয়। গাঁটগুলি সহজেই ভাঙ্গা যায়, পত্র ক্ষুদ্রাকৃতি এবং বিরল।

৪। ধূর্ত্তস্বামিধৃত শ্লোকের বর্ণনার সহিত উপরিউক্ত বর্ণনার কতকটা সাদৃশ্য আছে। কারণ ঐ শ্লোকে দেখা যায় যে সোম লতাত্মক, কৃষ্ণবর্ণ, অম্লাস্বাদ বিশিষ্ট, নিষ্পত্র, ক্ষিরিণী এবং তাহার ত্বক্ মাংসলা, ইহা শ্লেষ্মা নিবারক, বমনী এবং ছাগগণের প্রিয় খাদ্য।

৫। দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণগণ যে সোম ব্যবহার করেন, তাহা বৈদিক সোম নহে, কিন্তু সমজাতীয় বটে।

৬। সোম কোমল এবং সক্ষীরা।

৭। সুতারাং সোম ও Sarcosteemma কিংবা Asclepias জাতীয় অন্য কোনও উদ্ভিদ্ যথা Periplca একই বটে।

৮। এ বিষয় নিশ্চিত ভাবে সিদ্ধান্ত করা দুরূহ; কারণ বৈদিক শব্দের প্রকৃত অর্থ আমরা অবগত নহি; যথা অংশু-শব্দ।

Prof. Eggeling-এর অনুমান-মূলক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে।

পার্শী-ব্রাহ্মণগণ যে হুম Houtum Schindlerকে দেখাইয়াছিলেন, তাহাই যে আন্দাজ পাঁচ সহস্র বৎসরের পূর্বের হুম এবং সেই হুমই প্রকৃত হুম, তাহাব প্রমাণ কি? এটা প্রবাদ-মূলক এবং এই প্রবাদ যে প্রমাণ-মূলক, তাহা আমরা কি প্রকারে জানিতে পারি? হুমের পরিচয় পার্শীগণের ধর্মশাস্ত্র হইতে Prof Spiegel সাহেব সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তাহা এই; ইহা উজ্জ্বলবর্ণ; ইহাব ডালপালাগুলি সরস; ইহা স্ফূর্ত্তিদায়ক ওষধি। ইহা পর্বত উপরে জন্মায়। জলে এবং বৃষ্টিতে স্ফূর্ত্তি পায। ইহার তীব্র গন্ধ আছে। ইহা দুগ্ধের সহিত পান করা বিধেয়। গোজাতির প্রিয় খাদ্য। ইহা দাঁড়া গাছ বিশেষ। (Sirozah 2-30) এই বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, পত্র, রস ও বর্ণ এবং ডালগুলি সম্বন্ধে Houtum Schindler যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রমাণ ধর্মশাস্ত্রে নাই। ধর্মশাস্ত্রে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, বেদ ও বৈদিক গ্রন্থেও সেই বা তদনুরূপ বর্ণনা আমরা পাইযাছি। সুতবাং Kerman দেশীয় পার্শী-ব্রাহ্মণগণ যে প্রবাদ বিশ্বাস করেন, সে প্রবাদটি অনেকাংশে ভ্রমাত্মক। ধূর্ত্তস্বামি-ধৃত বচনটিতে যে বর্ণনা পাওয়া যায় এবং Houtum Schindler যে বর্ণনা করিয়াছেন, এই দুইটির মধ্যে যে বিশেষ বৈষম্য রহিয়াছে, তাহা বর্ণনা দুইটি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। Prof. Haug বলিয়াছেন, তিনি যে সোমের রস পান করিয়াছিলেন, তাহা বৈদিক সোম না হইলেও, সমান জাতীয় বটে। এ বিষয়ের প্রমাণ কি? ইহার মূলে কোনও প্রমাণ পাওযা যায় না; ইহা ipse dixit মাত্র। কথিত হইয়াছে যে Asclepias acida বা Sarcostemma Brevistigma বা Periploca aphyllaর সহিত বৈদিক সোমের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। Asclepias acida (Roxburgh) এবং Sarcostemma Brevistigma একই উদ্ভিদের নামান্তর মাত্র। Roxburgh সাহেব কৃত বর্ণনায় দেখা যায় যে, ইহা নিষ্পত্রা। ইহার স্বদেশী নাম ব্রাহ্মী বা সোমলতা।

"Stems twining, woody, branches and branchlets most numerous, cylindric and smooth particularly the youngest shoots, and they are generally pendulous when not supported, naked and succulent, leaves, scarcely the rudiments of any to be seen. Flowers small, "pure white fragrant, pedicelled, collected round the extremities of the branchlets, calyx small, fine parted, starlike Carol flat seemingly, fine petiolled as the figures are continned close to the base. Nectary enlarged at the base in form of a cup, on which rests 5 large fleshy white segments."

"This plant yields a larger portion of very pure milky juice than any other I know, and what is rare, is of a mild nature and acid taste, the native travellers often suck the tender shoots to allay their thirst" Sarcosteemma Brevistigmaব লক্ষণ-সকল Brandis (Indian trees P 468) সাহেবের মতে যথা ঃ—"A trailing jointed leafless shrub with thick rough bark and green pendulous branches flowers pale greenish in corymbic form cymes at the nodes or at the ends of branches pedicels 1/2 in long corolla ratate 1/3 inch in diameter, lobes broad, overlapping to the right."

এই দুইটি বর্ণনাতে দেখা যায় যে, বর্ণিত উদ্ভিদ্‌টি নিষ্পত্র লতাবিশেষ, ইহার ত্বক্ মোটা এবং অমসৃণ; কিম্বা Roxburgh-দ্রাক্ষাবিশেষ। সাহেবের মতে মসৃণ। কিন্তু পাঠকবর্গ দেখিবেন যে এই সকল লক্ষণ সোমে বর্ত্তমান নাই। বৈদিক সোম লতা বিশেষও নহে এবং নিষ্পত্রও নহে। এই বর্ণনাগুলি ব্রাহ্মীশাক বা সোমলতার এবং ধূর্ত্ত-স্বামিধৃত শ্লোকোক্ত সোমবল্লীর উপযুক্ত বটে। ইহা মাত্র, পরন্তু ইহা বৈদিক সোম নহে। কথিত হইয়াছে যে Periploca বোধ হয় বৈদিক সোম। কিন্তু Periplocaর লক্ষণ কি?

"An erect shrub, stems green, surface covered with gum, usually leafless, at times with a few minute thick ovate leaves. Flowers 1/2-2/3 inches across, scented, dark purple in short lateral rounded, cymes. Follicles on short thick peduncles, divaricate, rigid, three in inches long."

এই বর্ণনাতেও সোমের লক্ষণ পাওয়া যায় না। সোমপুষ্পে যে সুগন্ধ আছে তাহার প্রমাণ নাই, বরং সোমে উগ্র গন্ধ আছে এবং সোম নিষ্পত্রও নহে। আরও দেখুন, ধূর্ত্ত-স্বামিধৃত শ্লোকে সোমবল্লীম বিবরণ যদি বৈদিক সোমের বর্ণনা বলিযাই স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে সুশ্রুতের উল্লিখিত সোম বা ঐ সোম শব্দযুক্ত ওষধি সকল বৈদিক সোম বলিযা স্বীকার করিতে হইবে। সুশ্রুত বলিয়াছেন,

সোমামৃতাশ্বগন্ধাসু কাকোল্যাদৌ-গণে তথা।
ক্ষীরিপ্ররোহেষ্বপি চ বর্ত্তয়ো রোপণাঃ স্মৃতাঃ।
সমঙ্গা সোমসরলা সোমবল্কা সচন্দনা।
কাকোল্যাদিশ্চ কল্কঃ স্যাৎ প্রশস্তো ব্রণরোপণে।

ডল্লনকৃত টীকা যথা ঃ—(সূত্র স্থান ৩৬ অং) সোমঃ সোম এব, সোম বল্কল ইত্যন্যে। অপরে সোমা ব্রাহ্মীত্যাহুঃ। অমৃতা গুড়ূচী, ক্ষীরিপ্ররোহাঃ ন্যগ্রোধোদুম্বরাদীনামঙ্কুরঃ। শেষং প্রসিদ্ধম্। রোপণং কল্কদ্রব্যং নির্দিশন্নাহ। সমঙ্গা অঞ্জলিকারিকা নজানুকীর্তি লোকে প্রসিদ্ধা, বরাহক্রান্তা অপরে। সোমঃ সোমএব, সবলা সবলঃ বিশংসিকামন্যে, সোমবল্কঃ, কটুফলম্। শেষং প্রসিদ্ধম।

পুনশ্চ—সোমবল্ল্যমৃতা শ্বেতা ইত্যাদি (কল্পস্থান ১ অং) এস্থলে সোমবল্লী অর্থে ডল্লনমতে গুড়ূচী।

পুনশ্চ— সোমরাজী ফলং পুষ্পং ইত্যাদি। এস্থলে ডল্লন মতে—সোমরাজী বাকুচী।

উপরিউক্ত প্রমাণে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বচনটি অবলম্বনে আজ পর্য্যন্ত অনেক মনীষী পণ্ডিতগণ বৈদিক সোমের অনুসন্ধান করিতেছিলেন, সে বচনে এই পর্য্যন্ত প্রমাণ হয় যে, যে বল্লীর সোম আখ্যা দেওয়া হয় সেই বল্লীর বর্ণনাই ঐ বচনে আছে। অন্য সোমের কথা ঐ বচনে নাই অর্থাৎ ঐ বচন সোমবল্লীর বা সোমলতার পরিচায়ক মাত্র।

Eggeling সত্যই বলিযাছেন যে, বৈদিক শব্দের অর্থ দুরূহ হওয়ায় সোমের যথার্থ পরিচয় পাওয়া প্রায় অসম্ভব হইয়াছে। কিন্তু আমরা বলি যে এই কারণে চেষ্টা স্থগিত করা উপযুক্ত নহে; পরন্তু আরও বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক। অংশু শব্দটি আবশ্যক শব্দ। অংশ

শব্দের অর্থ কি? বৈদিক মন্ত্র মধ্যে উংশু শব্দের ব্যবহার অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়,—অংশু শব্দ দুইটি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। একটি অর্থ রশ্মি, দ্বিতীয় অর্থ সোম। এই শব্দের প্রয়োগগুলি বিচার করিলে বোধ হয় যে অংশু শব্দের আদিম অর্থ চন্দ্রকিরণ বা সূর্য্যরশ্মি। Sumerian ভাষায় en-zu (অংশ) শব্দেব অর্থ sin (সোম)। যেমন চন্দ্ররূপী সোমকে অংশ বলা হইল, তেমনই ওষধিরূপী সোমকেও অংশু বলা হইল। অংশু সোমের বা সূর্য্যের রশ্মি, সুতরাং ওষধি-বিশেষ যে সোম, তাহার রশ্মিকেই অংশু বলা যায়। ওষধি-বিশেষের বশ্মি অর্থে তাহার যে সব সূক্ষ্ম লম্বা রশ্মি আছে তাহাই বুঝাইবে। এবং উদ্ভিদ সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে যে উহা কোমল; পত্র বা অন্যান্য অংশে কোমলতা ও জ্যোতিঃ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এ শব্দটির বৈদিক ভাষায় যে অর্থ ছিল, অমরসিংহের সময়েও প্রায় তাহাই ছিল এবং আধুনিক বাংলা ভাষায়ও প্রায় তদ্রূপ আছে। অংশু বলিতে আমরা এঁসো বা সাঁয়া বুঝিয়া থাকি অর্থাৎ সূক্ষ্ম সূত্র। সুতবাং তৎসদৃশ বস্তুকেও প্রশংসা করিয়া অংশু আখ্যা দেওয়া যায়। Prof Roth বলেন যে অংশু শব্দেব দ্বারা দুইটি গাঁটের মধ্যস্তর স্থানটিকে বুঝায়। কিন্তু এই মতের মূলে কোন যুক্তি বা প্রমাণ পাওয়া যায় না। আরও একটি কথা এই যে সোমের সম্বন্ধে গাঁট বা গ্রন্থির উল্লেখ নাই।

সুতরাং গ্রন্থিদ্বয়ের মধ্যগত স্থানকে অংশু বলা যায় না। যদি গ্রন্থিদ্বয়মধ্যগত স্থানকে অংশু বলিতে হয়, তাহা হইলে সোমের নাম অংশু হইতে পারে না। সোমের নাম অংশু বটে, কিন্তু ইহাকে অংশুমান্‌ও বলা হইয়া থাকে। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, অংশুপ্রাচুর্য্য হেতু সোমের নাম অংশুমান এবং অংশু বটেই (অংশুরেব) এই অর্থে উহার নাম অংশু। কোন কোন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন যে অংশু অর্থে Shoot কিন্তু Shoot শব্দের অর্থ পল্লব, কিশলয়, প্ররোহ, অংকুর ইত্যাদি। সুতরাং অংশু অর্থে যে Shoot তাহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। হেমচন্দ্রের মতে অংশ অর্থে সূত্রাদি-সূক্ষ্মাংশ। সর্বদাই আমাদেব স্মরণ বাখা উচিত, যে, ব্রাহ্মণগ্রন্থ হইতে বৈদিক শব্দের বা বৈদিক মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ নির্দ্ধারিত হইতে পাবে না। সে চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে মন্ত্রাদির অর্থ-বিকৃতি করিতে হইয়াছে এবং অনেক সময় কাল্পনিক ব্যাখ্যাও স্বীকার করিতে হইয়াছে। মন্ত্রার্থ হইতে বিনিয়োগ স্থিব করা সম্ভবপর বটে, কিন্তু, বিনিয়োগ হইতে মন্ত্রার্থ স্থিব হইতে পাবে না। সুতরাং "অংশু না তে অংশুঃ পৃচ্যতাং ইত্যাদি মন্ত্রের বিনিয়োগ (তৈ সং ১।২।৬) হইতে যদি অংশু শব্দের অর্থ নিদ্ধাবণ করিতে যাই, তাহাতে আমরা নিশ্চয়ই নিষ্ফল হইব। সোম অজ্ঞাত; অংশুও অজ্ঞাত, পদ্ধতি ও বিনিয়োগ অজ্ঞাত সুতরাং তাহার মধ্য হইতে জ্ঞান লাভের আশা দুরাশা মাত্র। আর একটি শব্দ—অন্ধঃ। অন্ধঃ অর্থে সাধারণতঃ অন্ন বুঝায়। যাহা খাওয়া যায় তাহাই অন্ধঃ, অন্ন। সোম অন্ধঃ, কারণ সোম খাওয়া যায়। নিঘণ্টুও এই অর্থই প্রকাশ করিয়াছেন। Oldenberg অন্ধঃ অর্থে Sap বলিয়াছেন; কিন্তু সাধারণ অর্থ ত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে অর্থান্তরের কল্পনা করার বিশেষ কারণ না থাকিলে করা উচিত নহে। ঋগ্বেদ ৪।১।১৯ মন্ত্র অনুবাদে অংশোঃ অন্ধঃ Sap of Soma shoot বলিয়াছেন, কিন্তু এ স্থলে সাধারণ অর্থ করিলে কোন ব্যাঘাত ঘটে না।

প্রকৃত অর্থ স্বীকার করিয়া ব্যবহারস্থলে তাহার বিশেষ প্রয়োগ স্বীকারেব কোন বাধা নাই। সুতরাং অন্ন শব্দের প্রয়োগ-ভেদে অন্ন শব্দে রস স্বীকার করিতে কোন বাধা নাই। চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, ভক্ষ্য ভোজ্য এ সকলই অন্নবিশেষ; সুতবাং অন্ধঃ শব্দের অর্থ পেয়-বস মাত্র বলাও ঠিক নহে। অন্ধঃ শব্দে অন্ধকারও বুঝা যায। সুতরাং প্রয়োগ দেখিয়া অর্থ বুঝিতে হইবে এবং যে স্থলে যে অর্থ উপযুক্ত, সে স্থলে তদুপযুক্ত অর্থ স্বীকার করিতে হইবে। ত উ সুতস্য সোমস্যান্ধসোহংশোঃ (ঋ ১০।৯৪।৮) স্থলে সায়ন অন্ধঃ শব্দে অন্ন স্বীকার করিয়াছেন। "প্রজাপতের্বা এতে অন্ধসী যৎ সোমশ্চ সুবাচ" (শত ব্রা ৫।১।২।১০) স্থলে অন্ধসী অর্থে নিশ্চয় অন্ন। ঐ স্থলে বলিতেছেন যে প্রজাপতির দুইটি খাদ্য (অন্ন) যথা সোম ও সুরা। (অর্থাৎ সিদ্ধি ও সুরা) প্রসঙ্গক্রমে বলি, সিদ্ধি ও মদ এখনও মাদক বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং পুরাকাল হইতেই প্রসিদ্ধ। কিন্তু ব্রাহ্মীশাক বা গুড়ূচী মাদক দ্রব্যরূপে ব্যবহারের প্রথা কখনও শুনা যায নাই। আব এক কথা, ব্রাহ্মী খুব বড ও ঘনলতা নহে। অথচ বাশি রাশি ব্রাহ্মীলতা সংগ্রহ করিয়া শকটে করিয়া আনাইয়া যজ্ঞ সম্পাদন অর্থাৎ সমারোহ কবিযা নেশা কবা, কি সম্ভবপর?

বৈদিক ভাষায় অনেক শব্দেব অর্থবোধ কঠিন বটে। কিন্তু আপাততঃ পাশ্চাত্য প্রণালী অনুসবণ কবিয়া শব্দগুলি আমরা যতদূব দুর্বোধ্য কবিযা তুলিয়াছি, বস্তুতঃ পক্ষে শব্দগুলি তেমন দুর্বোধ্য নহে। বৈদিক লক্ষণগুলি যথাবীতি সংগ্রহ না করিয়া সোমের পবিচয় স্থির কবিতে হইলে নিশ্চযই হাস্যাস্পদ হইতে হয়। যদি উপবিলিখিত লতাগুলিকে সোম বা সোমজাতীয় অনুমান কবিযা একটা বৃহৎ ব্যাপাব ঘটনা হয়, তাহা হইলে অন্য আবও অনেক লতাবৃক্ষাদিকেও সোম আখ্যা দেওযা যাইতে পাবে। Brandis (Indian Trees P 531) বলিয়াছেন, Machilus Bombycina (Machilus adora tissima নামে যে বৃক্ষ আছে তাহাই সোম। এই তরুটির সোমাখ্যা পাওয়াব দাবী ববং কিছু থাকিতে পাবে, কাবণ ইহা প্রমাণিত করা যাইতে পারে যে মুগা বা তজ্জাতীয় বস্ত্র পুবাকালে ব্যবহৃত হইত।

পণ্ডিতগণ অনুমানেব উপব নির্ভব কবিযা অনেক রকম সিদ্ধান্তই করিযাছেন। কেহ বলিযাছেন—সোম এক প্রকাব সাবগম্ বিশেষ। আব একজন বলিযাছেন যে সোম—দ্রাক্ষাবিশেষ। আব একজন বলিয়াছেন যে সোম—বাগি ধান্য মাত্র। কেহ বলেন ইহা মাদাব। আব একজন সোমকে চা বলিযা অনুমান কবিয়াছেন। এই সকল নানা প্রকাব উদভট মতেব মধ্যে কতকগুলির বিশেষ প্রতিবাদ আবশ্যক।

*চৈত্র, ১৩২৯*

# হিন্দুর পরলোকতত্ত্ব

## বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

মৃত্যুর পর আত্মার কি হয় এ বিষয়ে বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন মত দেখা যায়। খৃষ্টধর্মের মতে মৃত্যুর পর আত্মা দীর্ঘকাল নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করে; যখন পৃথিবীর ধ্বংস হয়, তখন আত্মা কবর হইতে উঠিয়া আসে; ঈশ্বরের নিকট তখন সকলের বিচার হয়; সেইদিনকে বিচারের দিন বলে—Day of Judgement—; সেই বিচারে যাহারা সাধু বলিয়া নির্ধারিত হয় তাহারা স্বর্গে যায়, যাহারা পাপী তাহারা নরকে যায়। এই স্বর্গ এবং নরকবাস অনন্তকালের জন্যই হয় বলিয়া মনে হয়, কারণ বাইবেলে এই প্রসঙ্গে eternal, everlasting এই সকল শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। মুসলমান ধর্মেও স্বর্গ ও নরকের ব্যবস্থা দেখা যায়, এবং সে স্বর্গ ও নরক অনন্তকাল স্থায়ী বলিয়াই বোধ হয়। অনন্ত স্বর্গের কল্পনাতে কোন কষ্টই না থাকিতে পাবে, কিন্তু অনন্ত নরকের কল্পনা অতি ভয়াবহ। অনেক সময় লোকে শিক্ষার অভাবে বা সঙ্গদোষে বা সাময়িক দুর্বলতার প্রভাবে পাপ করিয়া ফেলে। তাহার জন্য তাহাকে সম্পূর্ণ ভাবে দায়ী করা যায় না—বিশেষতঃ যদি পুর্বজন্ম স্বীকার না করা যায়, যেমন খৃষ্টান, এবং মুসলমান ধর্ম করেন না। এরূপ পাপের জন্য অনন্ত নরকের ব্যবস্থা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। হিন্দু শাস্ত্রে কোথাও অনন্ত নরকের কথা নাই। এজন্য হিন্দু শাস্ত্রের ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক। যুক্তির দিক দিয়া দেখিলেও মনে হয় যে, মানুষের পাপ যখন অনন্ত নহে, তখন তাহার ফলে নরক কেন অনন্ত হইবে? হিন্দুর পরলোকতত্ত্ব কর্মফলবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহাতে কর্মের গুরুত্ব এবং লঘুত্ব অনুসারে গুরু এবং লঘু কর্মফলের ব্যবস্থা আছে; পরিমিত স্বর্গ এবং নরক আছে। আবার পুনর্জন্ম আছে;—এক জন্ম যদি ভুলের উপর কাটিয়া গেল, তাহা হইলেও সাধু জীবন যাপন করিবার সুযোগ পাওয়া যাইবে। ইহাতে সান্ত্বনা পাওয়া যায়। মানুষই পশুর ন্যায় কর্ম করিয়া পশুদেহ প্রাপ্ত হয়, ইহা বুঝিয়া জ্ঞানী হিন্দু নিজের পশুপ্রকৃতি দমনের চেষ্টা করেন, এবং পশুর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ হইতে বিরত হন। এই সকল কারণে হিন্দুর পরলোকতত্ত্ব যুক্তিপূর্ণ এবং শিক্ষাপ্রদ। মোটামুটি সকল হিন্দুধর্ম সম্প্রদায়ের পরলোকতত্ত্ব একরূপ হইলেও, কোনও কোনও বিষয়ে সম্প্রদায়-ভেদে সামান্য মতভেদ দেখা যায়। অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে বর্তমান প্রবন্ধ লিখিত।

জ্ঞান কর্ম এবং ভক্তি অনুসারে জীব মৃত্যুর পর বিভিন্ন প্রকারের গতি প্রাপ্ত হন। যিনি ইহজন্মে ঈশ্বরদর্শন করিয়াছেন—অদ্বৈতবাদীর ভাষায় যিনি নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন—মৃত্যু হইবামাত্র তিনি ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হন, বা মোক্ষলাভ করেন। কারণ, ব্রহ্মদর্শন হইলে মায়ার প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া যায়। গীতায় শ্রীভগবান্

বলিয়াছেন,—

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।

"যাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়, তাহারা এই মায়া অতিক্রম করে।" মায়ার প্রভাব হইতে মুক্ত হইলে জীবের তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ হয়; তাহা হইলে আর পূর্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করিতে হয় না।

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে র্জ্জুন।

গীতা

অগ্নি যেরূপ বীজকে ভস্মীভূত করে, জ্ঞান সেইরূপ কর্মকে ভস্মীভূত করে, অর্থাৎ কর্মের ফলোৎপাদিকা শক্তি বিনষ্ট করে।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।। উপনিষদ

সেই সর্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মকে দর্শন করিলে হৃদয়ের বন্ধন ছিন্ন হয়, সকল সংশয় ঘুচিয়া যায়, এবং কর্ম সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

পূর্বকৃত কর্মের বিনাশ হয় বটে, কিন্তু যে কর্মগুলির ফলভোগ বর্তমান জন্মে আরম্ভ হইয়াছে, সেই প্রারব্ধ কর্মগুলির ফল ভোগ করিতে হয়। তবে অজ্ঞানাবৃত ব্যক্তি যে ভাবে কর্মফল ভোগ করেন, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সে ভাবে কর্মফল ভোগ করেন না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি প্রিয় বা অপ্রিয় ঘটনায় হর্ষ বা বিষাদ প্রাপ্ত হন না, কারণ তিনি যেই দেখিতে পান যে, এই জগৎ-সংসার মিথ্যা; ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই সত্য বস্তু নাই।

যথাইদমিন্দ্রজালমিতি জ্ঞানবান্ তৎ ইন্দ্রজালং
পশ্যন্নপি পরমার্থমিদমিতি ন পশ্যতি। বেদান্তসার

যেমন ইন্দ্রজালিকের ক্রিয়া দেখিবার সময় যে ব্যক্তি জানেন যে ইহা ইন্দ্রজাল, তিনি ঐ সকল ব্যাপারকে সত্য বলিয়া মনে করেন না, জ্ঞানী ব্যক্তিও জগৎ-ব্যাপার সেইভাবেই দেখেন।

সচক্ষুরচক্ষুরিব সকর্ণো কর্ণ ইব।
সমনা অমনা ইব সপ্রাণো প্রাণ ইব।। উপনিষদ

ব্রহ্মজ্ঞ বা জীবন্মুক্ত ব্যক্তির চক্ষু থাকিলেও তিনি চক্ষু-হীনের ন্যায় অবস্থান করেন (কারণ ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কোন বস্তু আছে, তাঁহার এ জ্ঞান হয় না)। তাঁহার কর্ণ থাকিলেও তিনি কর্ণহীন ব্যক্তির ন্যায় অবস্থান করেন। তাঁহার মন এবং প্রাণ থাকিলেও তিনি মনহীন এবং প্রাণহীন ব্যক্তির ন্যায় অবস্থান করেন (ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোন বস্তু তাঁহার মনে স্থান পায় না, আর কোন বস্তু লাভ করিবার জন্য তিনি সচেষ্ট হন না)।

অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ। উপনিষদ

যাহার দেহাভিমান নাই, বা দেহাত্মবোধ নাই, তাঁহার প্রিয় ও অপ্রিয় বোধ হয় না।

এইভাবে জীবন-যাপন করিয়া যখন তিনি নির্দিষ্ট সময়ে দেহত্যাগ করেন, তখন মৃত্যুমাত্র তিনি ব্রহ্মলাভ করেন; অর্থাৎ ব্রহ্ম হইয়া যান। অপর সকল ব্যক্তির মৃত্যুর সময়

তাহাদের বাসনা প্রভৃতি গঠিত সূক্ষ্ম শরীর স্থূল শরীর ত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করে। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির কোন বাসনা থাকে না, সুতরাং তাঁহার পরলোকগমনোপযোগী সূক্ষ্মশরীরও থাকে না। তাঁহার স্থূলদেহ পড়িয়া থাকে এবং তিনি ব্রহ্ম হইয়া যান।

ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি। বৃহদারণ্যক উপনিষদ

অপর সকল ব্যক্তির মৃত্যুর সময় প্রাণ যেরূপ দেহত্যাগ করিয়া যায়, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির প্রাণ সেরূপ দেহত্যাগ করে না।

তাহা হইলে প্রাণের কি হয়?

"অতএব সনবলীয়ন্তে"। বৃহদারণ্যক্ উপনিষদ

ব্রহ্মেই বিলীন হইয়া যায়।

ন হি সদ্যোমুক্তিভাজাং সম্যক্‌দর্শননিষ্ঠানাং
গতিরাগতির্ব্বা কচিদপ্তি। শঙ্করাচার্য্যকৃত গীতা ভাষ্য ৮, ২৮

যাঁহারা ব্রহ্মদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা মৃত্যুমাত্র সদ্যোমুক্তি লাভ করেন, তাহাদের পরলোক গমনাগমন নাই।

এইভাবে যাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মের সাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহারা মৃত্যুমাত্র মোক্ষলাভ করেন। ইহাই উৎকৃষ্ট গতি। যাঁহারা একনিষ্ঠ হইয়া সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, মৃত্যুমাত্র তাঁহারা মোক্ষ লাভ করেন না। মৃত্যুর পর তাঁহারা দেবযান পথ গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মলোক অভিমুখে গমন করেন। এ পথে গেলেও আর ফিরিয়া আসিতে হয় না, এবং শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মলাভ হয়। তবে বিলম্বে হয়, এ জন্য এই পথ প্রথমোক্ত পথ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। গীতা এবং উপনিষদ উভয়ত্রই দেবযান-মার্গের উল্লেখ আছে।

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ॥ গীতা ৮, ২৪

মৃত্যুর পর যোগিগণ যে "কালে" গমন করিয়া পুনরায় সংসারে ফিরিয়া আসেন না, এবং যে "কালে" গমন করিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসেন, হে অর্জ্জুন, আমি তোমাকে তাহা বলিব। এই "কাল" শব্দ সময়বাচক নহে, ইহা মার্গ-বাচক। শ্রীধর স্বামী ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কাল শব্দেন কালাভিমানিনীভিরতিবাহিকীভিঃ দেবতাভিঃ প্রাপ্যো মার্গ উপলক্ষ্যতে।

কালাভিমানী দেবতাগণ যে মার্গে (মৃত্যুর পর সাধককে) লইয়া যান, সেই মার্গ লক্ষ্য করিয়া এখানে কাল শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে।

গীতায় পরবর্তী শ্লোকে দেবযান-মার্গের বর্ণনা করা হইয়াছে। অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষন্মাসা উত্তরায়েণম্। তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥৮।২৪

অগ্নি ও জ্যোতিঃ দেবতার নাম। তাঁহারা যতদূর তাঁহাদের অধিকার, ততদূর সাধককে আগাইয়া দেন। "অহঃ" মানে দিবসাভিমানিনী দেবতা (দিবসেয় দেবতা)। "শুক্লঃ" হইতেছেন শুক্লপক্ষের দেবতা। তাহার পর উত্তরায়ণের ছয় মাসের দেবতা। এই সকল দেবতা জীবকে নির্দিষ্ট পথে লইয়া যান। এই পথে যাঁহারা গমন করেন, তাঁহারা অবশেষে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, কারণ তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ।

উপনিষদেও দেবযানের কথা আছে,—তে অর্চিষমভি সম্ভবন্তি, অর্চিষো হরহ্ন আপূর্য্যমানপক্ষম্। আপূর্য্যামানপক্ষাৎ যান্ ষন্মাসান্ উদঙ্ঙাদিত্যো এতি. মাসেভ্যো দেবলোকম্।

তাঁহারা অর্চি দেবতার নিকট যান, তাঁহার নিকট হইতে দিবসের দেবতা. তথা হইতে শুক্লপক্ষের দেবতা, শুক্লপক্ষের দেবতা হইতে যে ছয়মাস সূর্য উত্তরে থাকেন তাহার দেবতা, তথা হইতে দেবলোক। গীতা

গীতাতে আছে 'অগ্নির্জ্যোতি', তাহাব পরিবর্তে উপনিষদে বলিয়াছেন 'অর্চিঃ' উভয় বাক্যের সামঞ্জস্যের জন্য শ্রীধর স্বামী গীতা-ভাস্যে বলিয়াছেন যে, অগ্নির্জ্যোতিঃ এই শব্দদ্বয়ে অর্চিরভিমানিনী দেবতাকে বুঝিতে হইবে।

যাঁহাবা দেবযান-পথে গমন কবেন, তাঁহারা পূর্বকৃত পাপ-পুণ্য ত্যাগ করেন কখন? দেহ ত্যাগের সময়, কিম্বা দেবযান পথে যাইতে-যাইতে মধ্য পথে? কৌষীতকি ব্রাহ্মণে দেবযান-পথের যে বর্ণনা আছে, তাহাতে উল্লেখ আছে যে দেবযান পথে যাইতে যাইতে বিরজা নদীর তীবে উপস্থিত হওয়া যায় এবং সেই নদী পার হইতে হয়। এবং সেইখানে পুণ্য-পাপ পরিত্যাগের কথা উল্লেখ আছে। তাহাতে মনে হইতে পারে যে, অর্ধপথে বিবজা নদীতে পাপ পুণ্য ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মৃত্যুব সময়ই পাপ-পুণ্য ত্যাগ হয কারণ যাঁহাবা দেববান পথে অগ্রসর হন, তাঁহাদের মৃত্যুর পব পাপ-পুণ্যের ফলভোগের আব অবসর হয় না। এক্ষেত্রে বিবজা নদী পর্যন্ত অনর্থক পাপ-পুণ্য বহন কবিয়া লইয়া যাইবাব কোন যুক্তিসঙ্গত কাবণ নাই। শ্রুতিতে যদিও বিরজা নদী পার হইবার সময় পাপ-পুণ্য ত্যাগেব কথা আছে, তথাপি বুঝিতে হইবে যে, পাপ-পুণ্য ত্যাগ পূর্বেই অর্থাৎ দেহত্যাগের সময়েই হইয়াছে। (ব্রহ্মসূত্র তৃতীয়, তৃতীয় অধ্যায় পাদ ২৭ সূত্র)।

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, যে সগুণ ব্রহ্মোপাসক এই দেবযান-পথে গমন করিয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। এই ভাবে যে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তিনি পরব্রহ্ম নহেন,* তিনি সৃষ্টিকর্তা চতুর্মুখ ব্রহ্মা। সেই ব্রহ্মা যতকাল অবস্থান করেন, সাধক ততকাল তাঁহার সহিত ব্রহ্মালোকে বিবাজ করেন। মহাপ্রলযেব সময় যখন ব্রহ্মাব পরমায়ু অবসান হয এবং চতুর্মুখ ব্রহ্মা পরব্রহ্মে বিলীন হন, সগুণোপাসকও তখন পরব্রহ্মে বিলীন হন।** কারণ ব্রহ্মালোকে অবস্থান কালে তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয।

এই দুইটি গতি লাভ করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। এতদ্ব্যতীত যে সকল গতি আছে, তাহাতে পুনরায় জন্মগ্রহণ কবিতে হয়। যে সকল গতিতে পুনর্জন্ম আছে, ব্রহ্মসূত্রে তৃতীয় অধ্যায় প্রথম পাদে সেই সকল গতি নিরূপিত হইয়াছে।

---

* কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ। ব্রহ্মসূত্র ৪।৩।৭

** কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহ গতঃপরম্ অভিধ্যানাং। ব্রহ্মসূত্র ৪।৩।১০

সূত্রকারের উদ্দেশ্য এই যে, পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যুর কষ্ট আলোচনা করিলে লোকের মনে বৈরাগ্য হইবে এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ভিন্ন মুক্তি নাই জানিলে, সেই জ্ঞান লাভ বিষয়ে একান্ত যত্নবান হইবে। তখন তাহাব মনের ভাব এইরূপ হইবে,—

গতা গতেন শ্রান্তো স্মি ত্রাহিমাং মধুসূদন।

যে সকল গতিতে পুনরায় সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয়, তাহাদের মধ্যে ধূমযান-মার্গই শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা যাগ-যজ্ঞ করেন, পলোপকারের জন্য কূপাদি জলাশয় প্রতিষ্ঠা করেন, এবং দান করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর এই মার্গে গমন করেন।

অথ য ইমে গ্রাম ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে

তে ধূমমভিসং ভবন্তি। ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৫।১০।৩

এই সকাল জীব মৃত্যুর পর যখন অন্য দেহ গ্রহণ কবিবার জন্য প্রযাস করে, তখন প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন পূর্বকৃত কর্মের সংস্কার এবং ভবিষ্যৎ দেহ-গঠনোপযোগী সূক্ষ্মভূত—এই সকলের সহিত পরলোক গমন কবে। এই ধূমযান-মার্গে দেহ ত্যাগ করিয়া পুনরায় দেহ গ্রহণ করিবার তত্ত্ব পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা নামে প্রসিদ্ধ। এই পথে পাঁচটি অবস্থা আছে; তাহাকে পাঁচটি অগ্নির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। জীব এই পথে প্রথমে আকাশে যায়, সেখান হইতে চন্দ্রে যায়। এই চন্দ্রলোকে পুণ্যফলে সুখভোগ হয়। যখন পুণ্য ফুবাইয়া যায, তখন জীবেব শোক হয়; সেই শোকরূপ অগ্নির উত্তাপে তাহাব ভোগক্ষম দেহ গলিয়া যায এবং জীব চন্দ্র হইতে নামিযা আসিয়া মেঘের সহিত অবস্থান করে। মেঘ হইতে বৃষ্টির সহিত পৃথিবীতে নামিযা আসে, পৃথিবীতে নামিয়া, পৃথিবী হইতে উৎপন্ন শস্যের মধ্যে অবস্থান করে। তাহাব পর যে পুরুষ সেই শস্য ভক্ষণ করে, তাহার দেহমধ্যে উপনীত হয়। ঐ পুরুষের দেহ হইতে তাহাব শুক্রের সহিত স্খলিত হইয়া তাহার স্ত্রীর গর্ভে গমন কবে। এই ভাবে সে পুনরায় দেহ গ্রহণ কবে। আকাশ, মেঘ, পৃথিবী, পুরুষ এবং স্ত্রী এই পাঁচটি বস্তুকে অগ্নি বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। এই পাঁচটি অগ্নিতে যথাক্রমে শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি, অন্ন ও শুক্র এই পাঁচটি আহুতি দেওয়া হয়। শ্রদ্ধা পূর্বক যে যজ্ঞাদি কর্ম করা হয়, তাহাতে যে জল থাকে, সেই জল ঐ কর্মকারীর দেহ আশ্রয় করে। মৃত্যুব পব যখন তাহার দেহ সৎকার করিবাব সময ঋত্বিকগণ ঐ দেহ অগ্নিতে আহুতি দেন, তখন পূর্বোক্ত জল সেই জীবকে বেষ্টন কবিয়া তাহাকে স্বর্গে (চন্দ্রলোকে) লইয়া যায়। ইহাই শ্রদ্ধাব আহুতি। স্বর্গভোগ শেষ হইলে স্বর্গে যে দেহ গ্রহণ হইয়াছিল, সেই দেহ মেঘরূপ অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়। ইহাই সোমের আহুতি। তাহার পর পৃথিবীরূপ অগ্নিতে বৃষ্টিরূপ আহুতি পড়ে, পুরুষরূপ অগ্নিতে অন্নরূপ আহুতি পড়ে, এবং স্ত্রীরূপ অগ্নিতে শুক্ররূপ আহুতি পড়ে। তখন জীব পুনরায় মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হয়। দেহত্যাগেব পর জীব যে পথ দিযা চন্দ্রলোক পর্যন্ত গমন করে, তাহাই ধূমযান-মার্গ নামে প্রসিদ্ধ। এই পথটি গীতায় এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃষণ্মাসা দক্ষিণায়ণং।

তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে॥৮।২৫

মৃত্যুর পর ধূমদেবতা তাঁহাদিগকে কিছুদূর লইয়া যান, তাহার পর রাত্রি-দেবতা, তাহার পব কৃষ্ণপক্ষের দেবতা, তাহার পর দক্ষিণায়নের দেবতা; তিনি চন্দ্রলোক পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দেন; সেখান হইতে জীব (কর্মযোগী) ফিরিয়া আসেন।

উপনিষদে আছে যে এই সকল জীব চন্দ্রলোকে গমন করিয়া দেবতাদের অন্ন হন। সেখানে অন্ন শব্দটি গৌণ ভাবে প্রয়োগ কবা হইয়াছে। অর্থাৎ ইহা রূপকমাত্র, বাস্তবিক যে দেবতারা ইঁহাদিগকে ভক্ষণ করেন, তাহা নহে। শ্রুতির উদ্দেশ্য এই যে, দেবগণ এই সকল জীবের সহিত সুখে বিহার করেন, লোকে যেমন স্ত্রীপুত্র লইয়া সুখে বিহার কবে সেইরূপ। তবে তাঁহাদের আত্মজ্ঞান হয় নাই, এজন্য তাঁহারা দেবগণের ভোগেব বিষয় হন।

এই চন্দ্রমণ্ডলে স্বর্গসুখ ভোগকে লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিয়াছেন,

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা<br>
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থযন্তে।<br>
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকং<br>
অশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥ ৯।২<br>
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং<br>
ক্ষীণেপুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।<br>
এবং এয়ীধর্মমনুপ্রপন্না<br>
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ ৯।২১

বেদ অনুসাবে যজ্ঞ কবিযা যাঁহাবা স্বর্গ প্রার্থনা কবেন, তাঁহাবা স্বর্গে গিযা দেবোচিত সুখভোগ কবেন। দীর্ঘকাল স্বর্গসুখ ভোগের পব যখন তাঁহাদের পুণ্যফল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তখন তাঁহারা পুনবায় পৃথিবীতে ফিবিযা আসেন।

চন্দ্রমণ্ডল হইতে নামিবাব সময জীবেব যে যাবতীয কম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এমন নহে। যদি তাহা হইত তাহা হইলে চন্দ্রমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ সকল জীব তুল্যরূপ অবস্থাতে জন্মগ্রহণ করিত। কিন্তু দেখা যায় কেহ ধনীর গৃহে কেহ দরিদ্রের গৃহে, কেহ সুস্থ শরীবে, কেহ আজন্ম অন্ধ বা খঞ্জ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যে সকল কর্ম ক্ষয হয নাই, সেই সকল কর্ম অনুসাবে জন্মকালীন অবস্থা নির্ধারিত হয। এমন কতকগুলি কর্ম আছে, যাহাদেব ফলভোগ চন্দ্রলোকেই হইয়া থাকে। চন্দ্রলোক হইতে অবতবণের সময সেই জাতীয় কর্ম কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু যে সকল কর্মের ফল চন্দ্রলোকে হইবার কথা নহে, চন্দ্রলোক হইতে অবতবণের সময় সে সকল কর্ম বতমান থাকে; এবং সেই সকল কর্ম অনুসাবে জীব পুনর্জন্ম গ্রহণ কবিবার সময উৎকৃষ্ট বা অধম যোনি প্রাপ্ত হয়।

চন্দ্রমণ্ডলে আরোহণ কবিবার পথ এবং চন্দ্রমণ্ডল হইতে অববোহণ করিবার পথ কতকটা এক, আবাব কতকটা ভিন্ন।

শ্রুতিতে আছে চন্দ্রমণ্ডল হইতে অবরোহণের সময জীব প্রথমে আকাশ হয়, তাহার পর বায়ু হয, তাহার পব ধূম হয়, তাহার পর মেঘ হয়, তাহার পর বৃষ্টি হয়। শ্রুতিবাক্য হইতে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, জীব আকাশ বায়ু প্রকৃতির স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ

জীবই আকাশ বায়ু প্রভৃতি হইয়া যায়। শ্রুতির উদ্দেশ্য এই যে, জীব নামিবার সময় যথাক্রমে আকাশ বায়ু প্রভৃতির ন্যায় রূপ প্রাপ্ত হয়।

চন্দ্র হইতে নামিবার সময় আকাশ বায়ু প্রভৃতির রূপ ধরিয়া জীব দীর্ঘকাল অবস্থান করে না। অল্প সময়ের মধ্যেই এক অবস্থা হইতে ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কেবল শস্য হইতে পুরুষদেহে গমন করিতে দীর্ঘকাল লাগে।

হিন্দুশাস্ত্রের মত, শস্যেরও সুখ-দুঃখ-ভোগ করিবার ক্ষমতা আছে। জীবই কর্মফল বশে শস্য হইয়া সুখ-দুখ ভোগ করে। মনু বলিয়াছেন,

অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ॥

"এই সকল, উদ্ভিদের মধ্যে চেতনা আছে। ইহারা সুখ-দুঃখ অনুভব করে"। এক্ষণে মনে হইতে পারে যে, জীব যখন চন্দ্র হইতে অবতরণ করিবার সময় শস্যের মধ্যে অবস্থান করে, তখন ঐ জীব শস্যরূপে সুখ-দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু তাহা নহে। এই অবস্থায় জীব শস্যর মধ্যে অবস্থান করে মাত্র। তখন সুখ-দুঃখ ভোগ করিবার ক্ষমতা তাহার থাকে না। ঐ শস্যরূপে সুখ-দুঃখ ভোগ করে অন্য জীব—যে জীব তাহার বর্মফলে শস্য হইয' জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু যে জীব চন্দ্র হইতে অবতরণ করিতেছে, সে পুনরায় মনুষ্যদেহ ধারণ করিবে। পথিমধ্যে দীর্ঘকাল শস্যের মধ্যে অবস্থান করে, এই পর্য্যন্ত। শস্য হইতে সে যখন পুরুষের দেহে গমন করে, তখনও ঐ পুরুযেব সুখ-দুঃখ সে অনুভব কবে না। পুরুষের দেহ হইতে যখন স্ত্রীর গর্ভে প্রবেশ করিয়া ভ্রূণের আকার ধারণ কবে, তখন হইতে তাহার সুখদুঃখ অনুভব করিবার ক্ষমতা হয়।

যাঁহারা ইহজন্মে ঈশ্বরের উপাসনা করেন না, আবার দান প্রভৃতি পুণ্য কার্যও করেন না, তাঁহাদের গতি ভিন্নরূপ। যাঁহারা দেবযান-পথ ধূমযান-পথ গ্রহণ করেন না, তাঁহারা কীট পতঙ্গ সর্প প্রভৃতি হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। যাহারা পাপী নহে তাহারা নরকে যায় না,—মৃত্যুর পরই এই সকল দেহ ধারণ করে। যাহারা পাপী, তাহারা মৃত্যুর পর নরকে গমন করে এবং পাপের গুরুত্ব অনুযায়ী নরক-যন্ত্রণা ভোগ কবিয়া তদনন্তর কীটাদিদেহ ধারণ করে।

বহূনবর্ষগণান্ ঘোনাণ্ নরকাণ্ প্রাপ্যতৎক্ষয়াৎ।
সংসারান্ত্রতিপদ্যন্তে মহাপাতকিনস্ত্বিমান॥ মনুসংহিতা। ১২।৫৪

মহাপাতকীগণ বহু বর্ষ ঘোব নবক ভোগ করিয়া তাহাব পর সংসারে আসিয়া বিবিধ অধমযোনিতে জন্মগ্রহণ করে।

কোন্ পাপে কিরূপ ইতর জন্তুব দেহপ্রাপ্তি হয়, মনু তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন। বহুজন্ম ধরিয়া পশুদেহ ধারণ করিয়া যখন জীবের অধম প্রবৃত্তি মন্দীভূত হয় এবং উত্তম প্রবৃত্তি কথঞ্চিৎ উন্মোষিত হয়, তখন সে মনুষ্যদেহ ধারণ করে।

প্রশ্ন হইতে পাবে, যে মানব পাপ-পুণ্য উভয়ই করিয়া থাকে এবং কিছু কিছু ঈশ্বর পূজাও করিয়া থাকে তাহার কোন্ গতি হইবে? তাহার উত্তর এই যে, যে কার্য সে সর্মাধিক অনুরাগের সহিত অধিকবার আচরণ করে, সেই কার্য্যেব ফল প্রবল হয এবং সেই কর্মফল অপর কর্মফলকে বাধা দিযা থাকে। যে কর্মেব ফল এখন হইল না, পরে সুযোগ পাইলে

সেই কর্মফল প্রসব করে। যে ব্যক্তির পাপের অংশ বেশি, পুণ্যের অংশ কম, সে হয়ত পাপের ফলে নরক ভোগ করিয়া পরে পশুদেহ ধারণ করিল। তাহার পর সে যখন মনুষ্যদেহ ধাবণ কবিবে, তখন বহুপূর্বে অনুষ্ঠিত পুণ্যের ফলে তাহার শুভমতি উৎপন্ন হইতে পারে।

অতএব অদ্বৈতবাদ অনুসাবে পরলোকতত্ত্ব সংক্ষেপে এইরূপ। যাঁহারা ইহজন্মে ব্রহ্মলাভ কবেন, মৃত্যুর সময় তাঁহারা ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যান। যাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনায় ইহজন্ম যাপন কবেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর দেবযান পথে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। সেখানে তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, মহাপ্রলয়ের সময় তাঁহারা ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যান। যাঁহারা যাগযজ্ঞ জলাশয়-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পুণ্যকর্ম করেন, তাঁহারা মৃত্যুব পর চন্দ্রলোকে গিয়া স্বর্গসুখ ভোগ কবেন, পুণ্য ফুরাইলে তাঁহারা পুনবায পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন। যাহারা পৃথিবীতে নানাবিধ পাপানুষ্ঠান কবে, তাহাবা মৃত্যুর পর নবকে যায়; সেখানে কষ্টভোগ কবিয়া পৃথিবীতে ক্ষুদ্র জন্তু বা উদ্ভিদ হইয়া বার বার বার জন্ম ও মৃত্যু লাভ করে। আব যাহারা পাপ-পুণ্য কিছুই কবে না, তাহাবা মৃত্যুর পর নবকে যায় না, ইতর জন্তু হইযা জন্মগ্রহণ কবে।

*আষাঢ়, ১৩৩১*

# কবিকঙ্কণের রসিকতা

## শচীন্দ্রলাল রায়

বাংলা সাহিত্যে কৌতুক-রসের সমগ্র ভাবে আলোচনা হওয়া দূরে থাকুক, এক-একজন কবির কাব্য লইয়া পৃথক ভাবে আলোচনাই এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ রূপে হয় নাই। আধুনিক কবিগণের কৌতুক-রস সম্বন্ধে আলোচনা কিছু-কিছু হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রাচীন কবিদের কিছুই দেখা যায় না। আমাদের সাহিত্যের যে ইহা একটা বিশেষ অভাব, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। নানা বিভাগ লইয়া আলোচনা এবং গবেষণা যত অধিক হইবে, ততই সাহিত্যের পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

ইয়োরোপীয় অনেক সাহিত্যে কৌতুক-রসের আলোচনা ধারাবাহিক ও সমগ্র ভাবেই হইয়াছে। কোন্ কবি কিরূপ রসিক (Witty) ও কিরূপ কৌতুকপ্রিয় (humourist) ছিলেন, ইহা লইয়া অনেক গ্রন্থ ইংরাজী, জার্মাণ ও ফরাসী ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে বাংলা ভাষায় এরূপ কোনও পুস্তক নাই। লিখিতে গিয়া কবিগণ যে কয়েকটি রস সৃষ্টি করেন, কৌতুক-রস তাহার মধ্যে তাহার মধ্যে একটি। ইহা সাহিত্যকে সজীবতা প্রদান করিয়া থাকে। কৌতুক রসের বিভিন্ন ধারা আছে। কোনটি নির্দোষ ভাবে আনন্দ দান করে, আবার কোনটি একজনকে আঘাত করিয়া অন্যকে আনন্দ দান করিয়া থাকে। কবি নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী এই রস সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

যাহা হউক, কৌতুক-রসের সমগ্র ভাবে আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে—মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম কিরূপ রসিক ছিলেন, তিনি কি ভাবে তৎকালীন সমাজ, জাতি, পুরুষ ও স্ত্রী-চরিত্র লইয়া কৌতুক করিয়াছেন, তাহারই কিছু দেখাইবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

(১) নারী চরিত্র—কবিকঙ্কণ নারী জাতির মহত্ত্ব দেখাইতে কুণ্ঠিত হন নাই, কিন্তু মাঝে-মাঝে তাহাদেরই দুর্বলতা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি এমন কৌতুক পূর্ণ ভাষায় চিত্রিত করিয়াছেন যে, তাহা পাঠ করিয়া না হাসিয়া থাকা যায় না। অবশ্য এই গ্রন্থ পাঠ কালে কোনও সময়েই হাসিতে হাসিতে দম ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হয় না, কিন্তু তবু সেগুলি মনের উপর বেশ একটু কৌতুক-রসের ছাপ রাখিয়া যায়।

পার্বতী ও খুল্লনার বিবাহের সময় তাহাদের স্বামীর অপূর্ব সৌন্দর্য দর্শন করিয়া অন্যান্য সীমন্তিনীগণ ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিতেছেন, এবং নিজ-নিজ পতির কুরূপ ও কুব্যাধির উল্লেখ করিয়া মনস্তাপ প্রকাশ করিতেছেন। এই চিত্রটি কবির লিপি চাতুর্য্যে অতি মনোরম হইয়া ফুটিয়াছে, এবং অপূর্ব কৌতুক-রসের সৃষ্টি করিয়াছে।

নারীগণের প্রতিনিন্দা।

"সভে বলে গৌরীর বর মিল্যাছে ভাল।
মদনমোহন বরের রূপে ঘর কর‍্যাছে আলো।।
এক যুবতী বলে সই মোব করম মন্দ।
অভাগিয়া পতি মোর দুই চক্ষু অন্ধ।
কোন দেশে নাঞিও গো দুঃখিনী মোর পারা।
কোলে কাছে থাকিতে সদাই হই হারা।।
আর যুবতী বলে পতি পীড়ার সদন।
শাক সূপ ঘণ্ট বিনে না করে ভোজন।।
দড় ব্যঞ্জন আমি যেই দিন রান্ধি।
মারযে পীড়ার বাড়ি দ্বাবে বসে কান্দি।।
আব যুবতী বলে সই মোর গোদা-পতি।
কোঁ-আ জ্বরের ঔষধ সদাই পাব কতি।।
ভাদ্র মাসের পাঁকুই বড়ই দুরবাব।
গোদে তেল দিয়া কত ভুলিব ন্যাকাব।।
আব যুবতী বলে সই মোর স্বামী কালা।
আনের সংসার সুখ আমাব বিষম জ্বালা।।
ঠাবে ঠোবে কথা কই দিনে পতির সনে।
বাত্রি হৈলে নিদ্রা যাই গরুড় শয়নে।।

এই সমস্ত যুবতী হয় ত অনেক সময় সতীসাধ্বী বলিয়া গৌরব কবিযা থাকেন; কিন্তু যেই অন্যের সুন্দব স্বামী দেখিলেন, অমন পরশ্রীকাতব মন বাঁকিয়া বসিল—নিজেব দুবদৃষ্টেব কথা ভাবিযা অস্থির হইয়া উঠিলেন, ও নিজ নিজ স্বামীব নিন্দা আরম্ভ করিয়া দিলেন। অবশ্য অন্ধ, কালা, গোদা পুরুষেও যে সামান্য কারণেই 'পীড়ার বাড়ি' মাবিয়া বসে—এমন লোকেব স্ত্রী হওযা অতি দুর্ভাগ্যের কথা; কিন্তু তবু হাটের মাঝে অমনি করিয়া বিলাপ করা কখনই সাধ্বী স্ত্রীর কর্তব্য নয। সতী রমণীব উচিত স্বামী যেমনই হউক, তাহাকে ভালবাসা, ভক্তি করা।* কবিকঙ্কণ এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"সতী রমণী বলে খালি আপন জাতি কুল।
আপন স্বামী কনকচাঁপা পব সিমুলেব ফুল।।"

অনেক সময় দেখা যায়, অতিবৃদ্ধাও যুবতীর সঙ্গে মিশিয়া আপনাকে যুবতী প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন। কবিকঙ্কণ এই ধবনের বৃদ্ধাদের লইয়া কৌতুক করিতেও ত্রুটি করেন নাই। যথা—

---

* পাঠিকাগণেব নিকট আমাব এই নিবেদন, ইহা যেন আমাব নিজস্ব মত মনে কবিযা ভুল না করেন। আমি নিজে এমন উৎকট পতিভক্তির সমর্থন কবি না—লেখক।

"আইওর মিলানে বুড়ি নানা কাচ কাছে।
পাকতেলে চুল পেকেছে বয়স কোথা গ্যাছে॥
পোএর হয়্যাছে পো নাতির হয়্যাছে ঝি।
স্থবির হয়্যাছে তনু বয়স বটে কি॥"

নারীজাতি যে অলঙ্কারপ্রিয়—এ দুর্নাম তাঁহাদের সর্বত্র। তাঁহার গহনার জন্য অনেক হীন কাজ, এমনকি স্বামী পর্যন্ত ত্যাগ করিতে পারেন, এমন কথা অনেকের মুখেই শুনা যায়। কবিকঙ্কণও এই বিষয়ে ইঙ্গিত করিয়া কৌতুক করিতে ছাড়েন নাই। ইহার প্রমাণ—লহনা। ধনপতি সদাগর খুল্লনার রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাহার পাণিগ্রহণ কবিবার সঙ্কল্প করিয়া লহনার নিকট অনুমতি লইতে আসিলেন। লহনা অভিমান করিয়া বসিল—কিছুতেই অনুমতি দিবে না। ধনপতি জানিতেন—লহনার দুর্বলতা কোথায়—কি ভাবে তাহার অনুমতি লইতে হইবে। তখনই ধনপতি—

"পরিতোষে লহনাকে দিল পাটশাড়ী।
পাঁচপণ দিল সোণা গড়িবারে চুড়ি॥"

হীরা মতি, চুণীর নেকলেশ, ব্রেসলেট নয়, শুধু পাটশাড়ী ও চুড়ি গড়িবার পাঁচপণ সোণা দিয়াই ধনপতির কার্যসিদ্ধি হইল—

"রত্ন পায়্যা যত্নে লৈল লহনা যুবতী।
বিবাহের তরে তবে দিল অনুমতি॥"

ইহা অপেক্ষা আর স্ত্রীজাতির অলঙ্কারপ্রিয়তার কি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

লহনা অলঙ্কার পাইয়া স্বামীকে পুনরায় বিবাহ করিতে অনুমতি দিল বটে, কিন্তু যেই স্বামী সতিনীর রূপ-যৌবনে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন অমনি তাহার গাত্রদাহ আরম্ভ হইল, এবং তাহার সই লীলাবতীকে পরামর্শের জন্য ডাকিয়া পাঠাইল। লীলাবতী আসিয়া স্বামী বশীভূত করিবার জন্য নানা তুকতাক ঔষধের লম্বা ফর্দ দিয়া বসিল। সেই ঔষধের দীর্ঘ তালিকা ও তাহাদের উদ্ভট প্রক্রিয়া দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠে। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য লীলাবতীর ঔষধ ব্যবস্থার কিছু নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"মোর বোলে লহনা করহ অবধান।
ঔষধ করিয়া তোর সাধিব সম্মান॥
পত্রিকার কলাগাছ রোপিবে অঙ্গনে।
ঘৃতের প্রদীপ তায় দিবে প্রতিদিনে॥
নিরামিষ অন্ন খাবে তার পত্র পাড়ি।
সাধু হবে কিঙ্কর খুল্লনা হবে চেড়ী॥
শ্মশানের কাঁথা আর কবর বিদ্যাতী।
বসন ত্যজিয়া আনিবে শেষ বাতি॥
ইহা বাটি দিবে সাধু খুল্লনা বসনে।
যেন খুল্লনা পড়ে সাধুর বিষ নয়নে॥

চূণ পান খয়েরে করিহ তার ক্ষার।
কাল গোরুর গোঁজ আনা ঔষধের সার॥
দুর্গায় মূলের আনিহ হরতাল।
উপবাগ সময়ে আনিব বেড়াজাল॥
দুই বস্তু কপালে ধরিহ সাবধানে।
সোহাগ বাড়িবে তোব দুর্গার সমানে॥

* * *

ছিনা ঝোঁক আর শ্বেত কাকের শোণিত।
লালিয়া কুকুর মারি আন তার পিত্ত॥
কচ্ছপেব নখ আন কুম্ভীরের দাঁত।
কোঠবের পেঁচা আন গোধিকার আঁত॥
বাদুড়েব পাখা আন সজারুর কাঁটা॥
তে-মাথায় পোড়ায়ে ললাটে লিহ ফোঁটা॥
শঙ্কের মুলুটি জঠী মুষিকের মুণ্ড।
ডোমা গারডের শিং চাতকের তুণ্ড॥
দিগম্ববী হইয়া ফাগুরী মুলে বাটে।
অলক্ষিতে পায স্বামী শযনের খাটে॥
মালীব মালঞ্চে ফুল আনবে গুলাল।
শিরীষ কুসুম কুন্দ পদ্মেব মৃণাল॥
পঞ্চফুল সমতুল কবিয়া আধান।
মন্ত্র পডি স্বামীবে হানিবে পঞ্চবাণ॥
পঞ্চপতি এক নারী দ্রুপদ নন্দিনী।
ইহাতে বঞ্চিত কৈল সকল সতিনী॥
স্বামীর সম্ভোগে চান্দ রাখিবে যতনে।
বাঘতেল সনে রামা মাখিবে বদনে॥"

স্বামী বশীভূত করিবাব ঔযধেব এই লম্বা ফর্দেব মধ্যে সত্য কিছু আছে কি না জানি না; তবে ইহা দ্বারা কবিকঙ্কণ কৌতুক কবিযা বুঝাইয়াছেন যে স্ত্রীলোক স্বামী বশীভূত করিবার জন্য কতদূর অসাধ্য সাধন করিতে পারে। বশীকরণ ঔষধেব লম্বা ফর্দ দিয়া কবিকঙ্কণ লিখিয়াছে—

"ঔসধ প্রসঙ্গে মুকুন্দ বিশারদ।
বুঢ়াকে না করে গুণ মোহন ঔষধ॥"

এখানে একটা মজার গল্প বলি। শুনা যায় মুকুন্দরামের দুই স্ত্রী ছিল। তাহাবা স্বামীকে বশীভূত করিবার জন্য অনবরত তুকতাক ঔযধ প্রয়োগ করিত। সম্ভবতঃ তাহাদের নিকট হইতেই তিনি এই ঔষধের উপকবণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন; এবং রহস্য করিবার জন্যই

তাঁহার কাব্যে ইহার লম্বা ফর্দ দাখিল করিয়া প্রচার কবিয়াছেন—

"ঔষধ প্রসঙ্গে মুকুন্দ বিশারদ।"

(২) পুরুষ চরিত্র—

পুরুষজাতির স্বার্থপবতা লইয়া রসিকতা করিতেও কবি ক্ষান্ত হন নাই। নিঃস্ব পুরুষ, যাহার এককড়া উপার্জনেবও ক্ষমতা নাই—তাহাবও স্ত্রীর নিকট লম্বা-চওড়া কথা বলিয়া পৌরুষ প্রকাশ করিতে দ্বিধা নাই। আমাদের বাহিরে বীরত্ব প্রকাশ করিতে সাহসে কুলায না, অথচ গিন্নীর নিকট তেজ দেখাইতে কুণ্ঠিত হই না। ইহা লইয়া কবিকঙ্কণ কৌতুক করিয়াছেন 'হরগৌরীব কলহে।' মহাদেবের ঘরে কিছুরই সংস্থান নাই—ভিক্ষার অন্নে জীবনযাত্রা নির্বাহ হয়। অথচ তিনি পার্বতীকে ডাকিয়া তাঁহার খাদ্যের লম্বা তালিকা দিতেছেন—

"আজিগো গণেশের মা রান্ধিবে মোর মত।
নিমে শিমে বেগুণে রান্ধিয়া দিবে তিত।।
সুকুতা শীতের কালে বড়ই মধুর।
কুমড়াতে বাগ্যনেতে রান্ধিবে প্রচুর।।
রান্ধিবে ছোলার দালি তথি দিবে খণ্ড।
আলস্য ঘুচায়্যা জ্বাল দিবে দুই দণ্ড।।
বেশম মাখিয়া রান্ধ সর্পিষার শাক।
কটু তৈলে বেথুয়া করিবে দৃঢ পাক।।
ঘৃতে ভাজি খর করি রান্ধিবে ফুলবড়ি।
চোঁয়া চোঁয়া করি ভাজ পলতা কাঁকড়ি।।
বান্ধিবে মসুর দালি দিয়া টাবা জল।
খাঁড় মিশাইয়া রান্ধ করঞ্জার ফল।।
নটিয়া কাঁটাল বাঁচি সারি গোটাদশ।
ঘৃতে সম্বরিয়া তায় দিবে আদাব রস।।
আমড়া সংযোগে গৌরী রান্ধিবে পালঙ্গ।
ঝাট স্থান কর গৌরী না কর বিলম্ব।।
খণ্ডে মুগের সূপ উভায় ডাবরে।
আচ্ছাদন থালাবালী তাহার উপবে।।
কুরুণীতে কুরিয়া আনিবে নারিকেল।
পিঠালি মিশায়্যা তলি দিবে কিছু জল।।
ঘনকাটি খরজালে রান্ধিবে ভাল ঘণ্ট।
তবে সে পূরিবে মোর উদব আকণ্ঠ।।
গোটা কাসুন্দিতে দিবে জাম্বুরের রস।

এ বেলার মত এই রান্ধ ব্যঞ্জন দশ।।
আপনি উদ্যোগ করি রান্ধ যদি গৌরী।
ভোজনের শেষে খাব হাঁড়ি দুই ক্ষীরি।"

যার ঘরে এক কাণা কড়ির সম্বল নাই, তাহার ভোজনের এই বিরাট ফর্দ দেখিয়া পার্বতী তো অবাক্। তিনি করজোড়ে স্বামীর নিকট নিবেদন করিলেন—

"রন্ধনের তরে ভাল কহিলে গোঁসাই।
প্রথমে যে পাতে দিব সেই ঘরে নাই।।"

কিন্তু পশুপতি এ কথায় ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। কারণ, তিনি যে স্বামী! স্ত্রীর উচিত যে স্বামীর যাহা মনের অভিলাষ, তাহাই বিনা প্রতিবাদে পূর্ণ করা। তিনি স্ত্রীর অবাধ্যতায় গৃহত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিয়া বলিলেন—

"আমি ছাড়িব ঘর, যাব দেশান্তর, কি মোর ঘর করণে।" এবং এই বলিয়াই নন্দীকে সঙ্গী করিয়া সত্য সত্যই গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ইহা খাঁটি বাঙ্গালীর ঘরের চিত্র নয় কি? কবিকঙ্কণ এই চিত্র অঙ্কিত করিয়া পুরুষের স্বার্থপরতার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন বলিয়া আমার বিশ্বাস।

(৩) জাতীয় চরিত্র—কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে হিন্দুজাতির সমস্ত শাখা-প্রশাখার কথাই পাওয়া যায়। তিনি যেখানে সুবিধা পাইয়াছেন, সেইখানেই জাতিগত চরিত্রের দোষগুণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, অগ্রদাণি, বণিক, কর্মকারের জাতীয় চরিত্র লইয়া বিদ্রূপ করিয়া তাহাদের দোষ অতি নিপুণভাবে দেখাইয়াছেন।

(ক) ব্রাহ্মণ—মুকুন্দরাম নিজে ব্রাহ্মণ হইয়াও ব্রাহ্মণকে যতদূর সম্ভব হীন করিয়াছেন। তখন মূর্খ ও লোভী ব্রাহ্মণের মাত্রাই সমাজে বেশি হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা লইয়া যখনই সুবিধা পাইয়াছেন তিনি তখনই ব্যঙ্গ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে, নগরে যাজন করে,
মৃন্ময়ে পূজার অধিষ্ঠান।
চন্দন তিলক পরে দেব পূজে ঘরে-ঘরে
চাউলের বোচকা কান্ধে টান।।
ময়রা ঘরে পায় মণ্ড, গোপ ঘরে দধি ভাণ্ড
তেলিঘরে তৈল কুপী ভরি
কোথাও মাসরা কড়ি, কেহ দেয় দালি বড়ি
গ্রামযাজী আনন্দে সাঁতরি।।
গুজরাট নগরে, নগরিয়া শ্রাদ্ধ করে
গ্রামযাজী হয় অধিষ্ঠান।।
সাঙ্গ করি দ্বিজে কয় কাহণ দক্ষিণা হয়,
হাতে কুশে দক্ষিণা ফুরাণ।।
গালি দিয়া লণ্ডেভণ্ডে, ঘটাবে ব্রাহ্মণ দণ্ডে

কুল পাঁজি করিয়া বিচার॥
যে নাহি গৌরব করে,          সভায় বিড়ম্বে তাঁরে,
যাবৎ না পায় পুরস্কার॥"

মূর্খ ব্রাহ্মণ-চরিত্রেব যে ইহা খাঁটি চিত্র, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

(খ) বৈদ্য—বৈদ্যগণ সম্বন্ধে কবিকঙ্কণ কৌতুক করিয়া লিখিয়াছেন—

"বৈদ্যজনের তত্ত্ব,          গুপ্তসেন দাস দত্ত
কর আদি বৈসে কুলস্থান।
বটিকায় কার ফল,          কেহ প্রয়োগের বশ
নানা তন্ত্র করয়ে বাখান॥
উঠিয়ে প্রভাত কালে,          উর্দ্ধ ফোটা করে ভালে
বসন মণ্ডিত কবি শিরে।
পরিয়া জর্জ্জর ধুতি,          কাঁখে করি নানা পুঁথি
গুজরাটে বৈদ্যগণ ফিরে॥
কার দেখি সাধ্য রোগ          ঔষধ করায় যোগ
বুকে ঘা মারিয়া অর্থ চায়।
অসাধ্য দেখিয়া বোগ,          পলাইতে কবে যোগ
নানা ছলে করয়ে বিদায়॥
কর্পূর পাচন করি,          তবে জিয়াইতে পারি
কর্পূরের কবহ সন্ধান।
বোগী সবিনয় বলে,          কর্পূর আনিতে চলে
সেই পথে বৈদোর পয়াণ।"

(গ) অগ্রদানিব জাতীয় ব্যবসার প্রতি কটাক্ষ করিয়া কবি বলিয়াছেন—

বৈদ্যজনের পাশে,          অগ্রদানি জন বৈসে
নিত্য কবে রোগীর সন্ধান।
রাজ কর নাহি দেই,          বৈতরিণী ধেনু লেই,
হেম বজত তিল লয় দান।"

(ঘ) সুবর্ণ বণিক—বেণেজাতির কথা লইযা কবিকঙ্কণ যতদূর সম্ভব বিদ্রূপ কবিয়াছেন।—তাঁহাব গ্রন্থের মুরারী শীলেব চরিত্র এক অপূর্ব সৃষ্টি। —কবি এই চিত্র অঙ্কনে অতি অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কালকেতু অঙ্গুরী বিক্রয় করিতে আসিলে—মুরারী শীল ভাবিল যে মাংসের বাকি দাম লইতে আসিয়াছে। তাই কালকেতুর ডাকাডাকিতেও ঘর হইতে বাহির হইল না। কিন্তু যেই শুনিল যে অঙ্গুরী বিক্রয করিতে আসিয়াছে—অমনি—

"ধনেব পাইযা বাস,          আসিতে বীবের পাশ
ধায় বেনে খড়কীর পথে।
মনে বড কুতূহলী,          কান্ধেতে কড়িব থলি
সুপডি তরাজু লইযা হাথে॥"

বেণে পায়ে ধুলা মাখিয়া খিরকী দরজা দিয়া বাহির হইয়া কালকেতুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল ও তাহার সহিত আত্মীয়তা প্রকাশ করিতে লাগিল। তার পর সেই মহামূল্য অঙ্গুরী দেখিয়া শঠতা করিয়া বলিল—

"সোণা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল।
ঘষিয়া মাজিয়া বাপু করেছ উজ্জ্বল।।
রতি প্রতি হয় যদি দশ গণ্ডা দর।
দুই ধানের কড়ি তার পাঁচ গণ্ডা ধর।।
অষ্টপণ পাঁচগণ্ডা অঙ্গুরীর কড়ি।
মাংসের পিছিলা ধার ধারি দেড় বুড়ি।।
একুণে হইল অষ্ট পণ আড়াই বুড়ি।
চাল খুদ লহ কিছু কিছু লহ কড়ি।।"

কবিকঙ্কণ শঠ চূড়ামণি মুরারী-চরিত্র চিত্রিত করিয়া তৎকালের লোভী, অর্থগৃধ্নু বণিক সম্প্রদায়কেই বিদ্রূপ করিয়াছেন।—

(৩) স্বর্ণকার—মুকুন্দরাম স্বর্ণকার জাতির প্রতি ব্যঙ্গ করিয়া লিখিয়াছেন—

"নিবসে পলাতো হব, পুন মধ্যে যাব ঘর,
নির্ম্মাণ করয়ে আভরণে।
দেখিতে দেখিতে জন, হরয়ে সভার ধন,
হাথ বদলিতে ভাল জানে।।"

(৪) রাজনৈতিক অত্যাচার লইয়া কৌতুক।

কবিকঙ্কণের সময় রাজনৈতিক ক্ষেত্র অন্ধকারাবৃত ছিল। অত্যাচার, উৎপীড়নই রাজনীতির অস্ত্র হইয়া দাড়াইয়াছিল। তখনকার দিনে যারা বড় ছিল— তাদেরই ভয় ছিল বেশি। সামান্য প্রজা অপেক্ষা জমিদার তালুকদারদের অবস্থাই দীন হইয়া উঠিয়াছিল। তাই, কবি পশুগণের মুখ দিয়া তখনকার অবস্থা ব্যক্ত করিয়া কৌতুক করিয়াছেন। বীরকালকেতু কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া পশুগণ দেবী চণ্ডীর নিকট তাহাদের অবস্থা জানাইতেছে। ভালুক বলিতেছে।

"উইচারা খাই পশু নামেতে ভালুক
নেউগী চৌধুরী নহি না করি তালুক।'

কবি কতদূর রহস্যপ্রিয় ছিলেন—তাহা পশুর মুখে রাজনীতির কথা শুনিয়াই উপলব্ধি করা যায়।—

(৫) বাঙ্গালদের কথা বলিবার ভঙ্গী লইয়া বিদ্রূপ।

একালের মত কবিকঙ্কণের সময়ও- -পূর্ববঙ্গবাসীর কথার উচ্চারণ লইয়া কৌতুক করা হইত দেখিতে পাই। কবিকঙ্কণও বাঙ্গালদের কথা বলিবার ভঙ্গী লইয়া কৌতুক করিয়াছেন। ধনপতি ও শ্রীমন্তের বাঙ্গাল নাবিকগণের কাঁদিবার ভঙ্গী ও কথাবার্তা শুনিয়া আমাদের দুঃখ হওয়া দূরে থাকুক, হাসিই পায়। কবিকঙ্কণ রহস্য করিবার জন্যই ইহা লিখিয়াছেন।

"কান্দেরে বাঙ্গাল সব বাফই বাফই।
কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই॥
পলায় বাঙ্গাল ভাই পেলাইয়া সোলা।
হেঁট মাথা করি তোলে কাঁখতলির মালা॥
আর বাঙ্গাল বলে মিছে কৈনুঁ দ্বন্দ্ব।
পুরুষ সাতের মুই হারানুঁ বাসন্দ॥
আর বাঙ্গাল বলে মুঞি হইনুঁ অনাথ।
সর্ব্বধন গেল মোর হুকুতার পাত॥
আর বাঙ্গাল বলেরে কহিতে বাসি লাজ।
ইসদন্ত গেল মোর জীবনে কি কাজ॥
হলুদ গুঁড়া হুধ্বাপাতা চিহ্ন নাহি পাই।
মজিল হকল ধন কেমনে কুলাই॥
আর বাঙ্গাল বলে ভাই এই ছিল গতি।
সিংহল পাটনে মৃত্যু লিখ্যাছিল বিধি॥"

কবিকঙ্কণের রসিকতার দৃষ্টান্ত অনেক দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িবে আশঙ্কায় ক্ষান্ত হইলাম। মুকুন্দরাম এইরূপে কৌতুক-রসের অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু কোনও স্থানেই তিনি অশ্লীল হইয়া উঠেন নাই। তাঁহার সহজ লিখিবার ভঙ্গীতে ইহা অধিকতর মনোজ্ঞ হইয়াছে। তিনি রহস্য ও ব্যঙ্গ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে সমস্তই পরিমার্জিত ও ভদ্রোচিত ভাষায়,—ইহাই তাঁহার কৌতুক রসের বিশেষত্ব।

*পৌষ ১৩২৯*

# গীতগোবিন্দ

## রাজশেখর বসু

রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি অসীম, কিন্তু তাঁর কাব্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় প্রধানত বাঙালীরই আছে। বাংলা ভাষায় ব্যুৎপন্ন অবাঙালী বেশি নেই, যাঁরা মূল রচনা পড়ে রবীন্দ্রকাব্য পূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারেন। বিশ্বসাহিত্য রূপে গণ্য হলেও রবীন্দ্রসাহিত্য সর্বভারতে ব্যাপ্ত হয় নি।

আর এক বাঙালী কবি জয়দেব প্রায় আট শ বৎসর পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তখন মুদ্রাযন্ত্র না থাকায় গ্রন্থের বহুপ্রচার অসম্ভব ছিল, শিক্ষিত পাঠকের সংখ্যাও অল্প ছিল, এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে যাতায়াতও কষ্টসাধ্য ছিল। তথাপি জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্য সব ভারতে প্রচারিত হয়েছে, কাশ্মীর থেকে পাণ্ড্যদেশ, দ্বারকা থেকে মণিপুর—সর্বত্র তাঁব পদাবলী বহুকাল থেকে পণ্ডিত সমাজে পঠিত এবং বৈষ্ণব মন্দিরে গীত হয়ে আসছে। এই প্রসিদ্ধির কাবণ, জয়দেব তৎকালীন সর্বভারতীয় সাহিত্যিক ভাষা সংস্কৃতে তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যদি সেকালে জন্মাতেন এবং সংস্কৃতে লিখতেন তবে তিনি সমগ্র ভারতেব অপ্রতিদ্বন্দ্বী সার্বভৌম কবি রূপে গণ্য হতেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি যদি এই যুগে সংস্কৃতে লিখতেন তবে বিশেষ খ্যাতি পেতেন না, কারণ অন্যান্য ভারতীয় ভাষার অভ্যুদয়ে সংস্কৃতের চর্চা এবং প্রতিপত্তি এখন কমে গেছে।

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের 'কবি জয়দেব ও শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ' গ্রন্থের বর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ* সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। আমি এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কিছু লিখতে আহূত হয়েছি। গীতগোবিন্দের আলোচনা দুই দিক থেকে হতে পারে, কাব্য রূপে এবং ভক্তিগ্রন্থ রূপে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই দুই দৃষ্টির কোনওটির অধিকারী আমি নই। অগত্যা অন্ধ যেমন হাত বুলিয়ে হস্তীদর্শন করে, আমিও তেমনি অমর্মগ্রাহী সামান্য পাঠকের স্থূল দৃষ্টিতে গীতগোবিন্দের আলোচনা করছি।

বহু বৎসর পূর্বে একটি প্রাচীন-কাব্য-সংগ্রহ গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—'এই সকল কবিতা অনেক আধুনিক বাঙ্গালীর অরুচিকর।... সামান্য নায়কের সঙ্গে কুলটার প্রণয় হইলে যেমন অপবিত্র অরুচিকর এবং পাপে পঙ্কিল হয়, কৃষ্ণলীলাও তাঁহাদের বিবেচনায় তদ্রূপ।...এ সকল কবিতা অনেক সময় অশ্লীল এবং ইন্দ্রিয়ের পুষ্টিকর—অতএব ইহা সর্বথা পবিহার্য। যাঁহারা এইরূপ বিবেচনা করেন তাঁহারা নিতান্ত

* কবি জয়দেব ও শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ—শ্রীহবেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্‌স। ২২৩ + ১৬০ পৃষ্ঠা। মূল্য চার টাকা।

আসারগ্রাহী। যদি কৃষ্ণলীলার এই ব্যাখ্যা হইত তবে ভারতবর্ষে কৃষ্ণভক্তি এবং কৃষ্ণগীতি কখনও এত কাল স্থায়ী হইত না।...যিনি কবিতা লিখেন তিনি জাতীয় চরিত্রের, সামাজিক বলের এবং আত্মস্বভাবের অধীন।...প্রাচীন কবি মাত্রেরই কতকগুলি দোষ গুণ আছে যাহা আধুনিক কবিতে অপ্রাপ্য। সেইগুলি তাঁহাদের সাময়িক লক্ষণ।'

বঙ্কিমচন্দ্র গীতগোবিন্দকে অশ্লীল বলেন নি, কিন্তু জানিয়েছেন যে তাঁর সমকালীন অনেকের দৃষ্টিতে এই প্রকার রচনা আপত্তিকর ছিল। প্রাচীন কবিদের যে সাময়িক লক্ষণের কথা তিনি বলেছেন, তাঁর সময়ের শিক্ষিত পাঠকসমাজের বিচারপদ্ধতিতেও সেই সাময়িক লক্ষণ দেখা যায়। রুচি কালে কালে বদলায়। যা স্বাভাবিক মনুষ্যধর্ম তার সম্বন্ধে কোনও দেশের প্রাচীন কবিদের সংকোচ ছিল না। তাঁরা কাম ও প্রেমের বড় একটা পার্থক্য করতেন না। আদিরস পরিবেশনে তাঁদের অনেকে মুক্তহস্ত ছিলেন, পাঠকবর্গও তাতে দোষ ধরতেন না। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা এবং ভিক্‌টোরীয় সাহিত্যের প্রভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে শিক্ষিত জনের রুচি বদলে গিয়েছিল। তাঁরা ভাবতে পারতেন না যে পঞ্চাশ ষাট বৎসর পরে পাশ্চাত্য রুচি এদেশের প্রাচীন রুচিকে হার মানাবে। বর্তমান কালের অনেক সুবিখ্যাত লেখক লালসার বর্ণনায় কার্পণ্য করেন না। আদিরস ভক্তির বাহন হতে পারে কিনা সে বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু আধুনিক সমালোচকের দৃষ্টিতে গীতগোবিন্দে এমন কিছুই নেই যা কাব্যে বর্জনীয়।

বৈষ্ণবমতে শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর রসের যে-কোনওটির অবলম্বনে কৃষ্ণভক্তি চরিতার্থ হতে পারে, কিন্তু মধুর বা শৃঙ্গার রসই শ্রেষ্ঠ, যাতে উপাস্য-উপাসকের মধ্যে কামগন্ধহীন প্রণয়িসম্পর্ক হয়। চৈতন্যদেবের প্রশ্নের উত্তরে রায় রামানন্দ কৃষ্ণসাধনার নানা ভেদ উল্লেখ করে পরিশেষে বলেছেন, 'কান্তা ভাব সর্ব সাধ্য সার।' চৈতন্যদেবও বলেছেন, 'বরঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ'—অর্থাৎ সাধকের পক্ষে কিশোর রূপই ধ্যানযোগ্য এবং আদিরসই পরম রস। মরমী বা মিষ্টিক সাধকগণের ঈশ্বরোপলব্ধি কি প্রকার, তা অন্য লোকের ধারণার অতীত। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে শুধু ভারতীয় ভক্ত নয়, বহু খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসী এবং সুফী সাধকও প্রেমাতুরা বিরহিণী নায়িকার দৃষ্টিতে ঈশ্বরের অন্বেষণ করেছেন এবং ঈশ্বরোপলব্ধির ফলে প্রিয়সমাসমতৃষ্ণা নায়িকার তুল্যই নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করেছেন।

তথাপি প্রশ্ন ওঠে, স্থূল আদিরস কি ভক্তির বাহন হতে পারে? পূর্বোক্ত প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—'প্রকৃতি ও পুরুষ সাংখ্যমতানুসারে পরস্পরে আসক্ত।... শ্রীমদ্‌ভাগবতকার এই দুরূহ তত্ত্ব জনসাধারণের বোধগম্য করিয়া মৃত ধর্মে জীবনের সঞ্চারের অভিপ্রায় করিলেন। মহাভারতে যে বীর ঈশ্বরাবতার বলিয়া লোকমণ্ডলে গৃহীত হইয়াছিল, তিনি তাঁহাকেই পুরুষ স্বরূপে স্বীয় কাব্যমধ্যে অবতীর্ণ করিলেন এবং স্বকপোল হইতে গোপকন্যা রাধিকাকে সৃষ্ট করিয়া প্রকৃতিস্থানীয় করিলেন।...সাংখ্যের মতে ইহাদের মিলনই জীবের দুঃখের মূল—তাই কবি এই মিলনকে স্বাভাবিক এবং অপবিত্র করিয়া সাজাইলেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতকারের গূঢ় তাৎপর্য, আত্মার ইতিহাস—প্রথমে প্রকৃতির সহিত

সংযোগ, পরে বিয়োগ, পরে মুক্তি। জয়দেব প্রণীত কৃষ্ণচরিত্রে এই রূপক একেবারে অদৃশ্য। আর্যজাতির জাতীয় জীবন দুর্বল হইয়া আসিয়াছে। অস্ত্রের ঝঞ্ঝনার স্থানে রাজপুরী সকলে নূপুর-নিক্বণ বাজিতেছে। গীতগোবিন্দ এই সমাজের উক্তি। শব্দভাণ্ডারে যত সুকুমার কুসুম আছে, সকলগুলি বাছিয়া বাছিয়া চতুর গোস্বামী কিশোর-কিশোরী রচিয়াছেন। যে মহাগৌরবের জ্যোতি মহাভারত ও ভাগবতে কৃষ্ণচরিত্রের উপর নিঃসৃত হইয়াছিল, এখানে তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়পরতার অন্ধকার ছায়া আসিয়া প্রখরসুখতৃষাতপ্ত আর্য পাঠককে শীতল করিয়াছে।'

বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণভক্ত এবং বৈষ্ণব কাব্যের অনুরাগী ছিলেন। তিনি গীতগোবিন্দের লালিত্য এবং রচনাচাতুর্য স্বীকার করেছেন। তাঁর একাধিক উপন্যাসে এই কাব্য থেকে উদ্ধৃতিও দিয়েছেন। কিন্তু জয়দেবের রচনায় তিনি পারমার্থিক তত্ত্ব কিছুই পান নি। তাঁর আরাধ্য শূরশ্রেষ্ঠ দার্শনিক রাজনীতিজ্ঞ কৃষ্ণ গীতগোবিন্দে নেই।

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সুপণ্ডিত ভক্ত এবং বৈষ্ণব শাস্ত্রে অশেষবিৎ। তাঁর গ্রন্থের মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩৮৪, তার মধ্যে ১৬০ পৃষ্ঠা সটিক সানুবাদ গীতগোবিন্দ কাব্য এবং অবশিষ্ট ২২৪ পৃষ্ঠা ভূমিকা। এই বৃহৎ ভূমিকায় গ্রন্থকার জয়দেবের দেশ, কাল ও চরিত বিবৃত করেছেন এবং বৈষ্ণব ধর্ম ও সাধনার পদ্ধতি সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। তিনি বহু যুক্তি এবং নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিকূল মত খণ্ডন করে দেখিয়েছেন যে জয়দেবের কাব্য ভাগবতেরই অনুবর্তী, কামগ্রন্থ নয়, ভক্তিগ্রন্থ।

আধুনিক শিক্ষিত বাঙালীর সংস্কৃতে অনুরাগ নেই, কিন্তু প্রাচীন বাঙালী কবি জয়দেবের ভারতবিখ্যাত কাব্য সম্বন্ধে অনেকের কৌতূহল আছে। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই বহুতথ্যসংবলিত গ্রন্থ পড়লে তাঁরা উপকৃত হবেন এবং গীতগোবিন্দ কাব্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চিন্তা করবার অনেক উপাদান পাবেন। কাব্যের প্রথম যুগের তৃতীয় শ্লোকে জয়দেব তাঁর উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত করেছেন—যদি হরিস্মরণে মন সরস করতে চাও, যদি বিলাসকলায় কৌতূহল থাকে, তবে জয়দেবকথিত এই মধুর কোমল কান্ত পদাবলী শোন। বোধ হয় এর তাৎপর্য- শুদ্ধচিত্ত ধার্মিক বৈষ্ণব পদাবলী-বর্ণিত বিলাসকলাকে উপাস্য উপাসক-মিলনের রূপক ভাবেই নেবেন এবং ভক্তিভরে হরিস্মরণ করে রসাবিষ্ট হবেন। আর, কৌতূহলী সাধারণ পাঠক এতে পাবেন রাধাকৃষ্ণলীলাচ্ছলে বর্ণিত মানুষী প্রেমলীলারই মোহন চিত্র।

যারা সংস্কৃত জানেন না তাঁরাও গ্রন্থকারের প্রাঞ্জল বাংলা অনুবাদের সাহায্যে অল্পায়াসে মূল শ্লোকগুলিও বুঝতে পারবেন। আশা করি বহু যত্নে সম্পাদিত এই গ্রন্থের প্রচুর ক্রেতা ও পাঠক হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাধিকার এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য অর্থ সাহায্য করে প্রশংসাভাজন হয়েছেন।

*অগ্রহায়ণ ১৩৫৭*

# নাট্যরচনা

# অবাস্তব

## "বনফুল"

## (নাটিকা)

একটি প্রশস্ত কক্ষ। কক্ষের দুইটি ঘর। আসবাবপত্র বিশেষ কিছু নাই, কিন্তু অল্প যাহা আছে তাহা বেশ মূল্যবান। ঘরে দুইখানি টেবিল আছে। একটি অপেক্ষাকৃত বড়, সেটি কোণের দিকে রহিয়াছে। তাহার উপর রক্তবর্ণ শেড্ দেওয়া একটি ইলেক্‌ট্রিক বাতি এবং তিন-চারখানি পুস্তক ছাড়া আর কিছু নাই। পুস্তকগুলি উপর্য্যুপরি সাজানো আছে। টেবিলটির পাশে একটি আরাম-কেদারা এমনভাবে রহিয়াছে যে তাহাতে শুইয়া ইলেকট্রিক বাতিটির সহায়তায় বেশ পড়া যায়। আরাম কেদারার নিকট একটি চেয়ারও রহিয়াছে। দ্বিতীয় টেবিলটি ছোট। সেটি ঘরের মাঝামাঝি বাম দেওয়াল ঘেঁসিয়া রহিয়াছে। দুইটি টেবিল এমনভাবে আছে যে, একটি আর একটিকে আড়াল করিতেছে না। দ্বিতীয় টেবিলটির দুই পাশেও দুইখানি বেতের চেয়ার রহিয়াছে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ছোট টেবিলটির সামনে দাঁড়াইয়া বিখ্যাত লেখক অশোক দত্ত পাইপে তামাক ভরিতেছেন। টেবিল ল্যাম্পটি এখন জ্বলিতেছে না, শিলিং ল্যাম্প হইতে ঘরটি উজ্জ্বলভাবে আলোকিত। অশোকবাবু বেশ একটি মূল্যবান ড্রেসিং গাউন পরিধান করিয়া রহিয়াছেন। ভৃত্য সিতাবি একটি ট্রেতে করিয়া কফির সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিল।

অশোক। কি রে, কজনের সঙ্গে আলাপ-টালাপ করলি?

*একটু সলজ্জভাবে হাসিয়া সিতাবি ছোট টেবিলটিতে কফির সরঞ্জাম রাখিল*

আলাপ টালাপ বেশী কোরো না, বুঝলে?

*পাইপ ধরাইলেন*

সিতাবি। আজ্ঞে না।

অশোক। কারো সঙ্গে আলাপ হয় নি?

সিতাবি। মাত্তর একজনের সঙ্গে হয়েছে।

অশোক। হয়েছে!

সিতাবি। আজ যখন বাজার করতে যাচ্ছিলাম, তখন মাঠের ওপাশে যে বাড়িটা রয়েছে সেই বাড়ীরই একটি বাবু আমাকে ডেকে আমাদের কথা জিগ্যেসাবাদ করছিলেন।

*সিতাবি কাপে কফি ঢালিতে লাগিল*

অশোক। কি জিগোসাবাদ করছিলেন?

সিতাবি। আপনার নাম ধাম সব জিগ্যেস করছিলেন ; আর জিগ্যেস করছিলেন এখানে এসেছেন কেন, এই সব আর কি—

অশোক। তুই কি বললি?

সিতাবি। বললাম বাবুর শরীর খারাপ তাই এখানে এসেছেন হাওয়া বদলাতে। বাবুটি বেশ আলাপী লোক। আপনার সঙ্গে এসে আলাপ করবেন বললেন।

অশোক একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া উপবেশন করিলেন

অশোক। ও, সে সব বন্দোবস্তও ক'রে এসেছ তা হলে! আর কি কি আলাপ হ'ল তাঁর সঙ্গে?

সিতাবি কফিতে দুধ ঢালিয়া পেয়ালা আগাইয়া দিল

সিতাবি। এই সব আর কি, জিগ্যেস করছিলেন তোমার বাবু কি করেন।

অশোক। (স্মিত মুখে) কি বললি তুই?

সিতাবি। বললাম—বাবু বই নেকেন!

অশোক। বলেছ তো? সবাইকে ওই কথা বলে বেড়াও, আর দলে দলে লোক এসে বিরক্ত করুক আমায়।

কফিতে এক চুমুক দিলেন

সিতাবি। না, সবাইকে বলব কেন।

অশোক। আর কাউকে বোলো না। নিরিবিলিতে থাকবার জন্যে কোলকাতা থেকে পালিয়ে এসে শহরের বাইরে তেপান্তর মাঠে এই বাড়িটা ভাড়া নিয়েছি। তুমি লোক জুটিও না যেন!

সিতাবি। (একটু ইতস্তত করিয়া, চুপি চুপি) শুনছি এটা নাকি ভুতুড়ে বাড়ি বাবু!

অশোক। কে বললে?

সিতাবি। বাজারে শুনলাম। সেই জন্যেই নাকি কেউ ভাড়া নেয় না, আর সেই জন্যেই নাকি এতবড় বাড়ির ভাড়া এত কম।

অশোক। ওসব বাজে কথা। তুই যা রান্না কর গিয়ে—

সিতাবি চলিয়া গেল। অশোক দণ্ড পেয়ালা তুলিয়া আরও
দু-এক চুমুক কফি পান করিলেন। তাহার পর আপন মনেই বলিলেন

ভুতুড়ে বাড়ি—হাঃ—যত সব গাঁজাখুরি!

আরও দুই-এক চুমুক পান করিলেন। সিতাবি পুনঃপ্রবেশ করিল

সিতাবি। ভূদেববাবু দেখা করতে এসেছেন।

অশোক। ভূদেববাবু কে?

সিতাবি। ওই যে সকালে যিনি ডেকে জিগ্যেসাবাদ করছিলেন—

অশোক। ও। এই সুরু হ'ল! আচ্ছা ডেকে নিয়ে এস।

সিতাবি চলিয়া গেল ও ক্ষণপরে ভূদেববাবুকে লইয়া ফিরিয়া
আসিল। অশোকবাবু উঠিয়া সম্বর্দ্ধনা করিলেন

নমস্কার, আসুন, আসুন, বসুন। একটু কফি খান, সিতাবি আর একটা পেয়ালা নিয়ে আয়।

সিতাবি চলিয়া গেল, ভূদেববাবু উপবেশন করিলেন

ভূদেব। (স-সম্ভ্রমে) আপনিই কি বিখ্যাত লেখক অশোক দত্ত?

অশোক। (হাসিয়া) বিখ্যাত কি না জানি না, তবে লিখি বটে।

ভূদেব। আমি আপনার লেখার একজন বিশেষ ভক্ত।

অশোক স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন

আপনি এখানে এসেছেন কি বেড়াতে?

অশোক। ঠিক বেড়াতে নয়, চেঞ্জে। কোলকাতায় শরীরটা কিছুতেই ভাল থাকছে না। ভাবলুম বাইরে কিছুদিন কাটালে যদি—

ভূদেব। হয়েছে কি আপনার?

অশোক। ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, কিছুই হজম হয় না—এই চা কফি খেয়েই কাটাই!

সিতাবি আর একটি কাপ লইয়া আসিল এবং ভূদেববাবুকে কফি ঢালিয়া দিয়া চলিয়া গেল। ভূদেব কফি পান করিতে লাগিলেন। মিনিট খানেক পরে—

ভূদেব। আপনি এই বাড়িটা নিলেন কেন?

অশোক। কোলকাতায় একদিন এই বাড়ির প্রোপ্রাইটার রমেশবাবুর সঙ্গে আলাপ হল। তার কাছেই শুনলাম যে এ জায়গাটা ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার পক্ষে ভাল। তাছাড়া তিনি খুব শস্তায় দিতে চাইলেন বাড়িটা। এমন ইলেকট্রিক ফিটেড্ বাড়ির মাত্র কুড়ি টাকা ভাড়া—খুবই শস্তা।

অশোক পুনরায় পাইপ ধরাইলেন

ভূদেব। (একটু মৃদু হাসিয়া) বিনা পয়সায় থাকতে দিলেও এ অঞ্চলের কেউ এ বাড়িতে থাকতে রাজি হবে না।

অশোক। কেন, বলুন তো?

ভূদেব। বাড়িটার একটা ইতিহাস আছে--

অশোক। কি ইতিহাস?

ভূদেব। (হাসিয়া) সে আর নাই শুনলেন রাত্তির বেলা। নিয়েই যখন ফেলেছেন তখন দেখুন না দু চার দিন বাস করে। আপনি তো আজই এসেছেন না?

অশোক। হ্যাঁ। শুনিই না কি ইতিহাসটা।

ভূদেব। রাত্তিরে হয়তো ভয়টয় পাবেন, দরকার কি। (হাসিয়া) আমিও আসতাম না এখানে রাত্তিরে, কেবল আপনার নাম শুনে দেখা করতে এলাম। যদিও নিজের চোখে দেখিনি কখনও কিছু—তবু—

অশোক। শুনিই না ব্যাপারটা কি—

উভয়েব কফি পান শেষ হইল

ভূদেব। যদি ভয়টয় পান—

অশোক। ভয় আমি কাউকে করি না। কাউকে করি না অবশ্য ঠিক নয়, জন্তু-জানোয়ার চোর-ডাকাতকে করি এবং সে সবের জন্যে আমি প্রস্তুতও থাকি সর্ব্বদা।

টেবিলের ড্রয়াব টানিযা একটি ছোট পিস্তল বাহির করিয়া স্মিতমুখে সেটি তুলিয়া দেখাইলেন

ভূদেব। (সবিস্ময়ে) পিস্তলের লাইসেন্স আপনাকে দিয়েছে! সাধারণত কাউকে দেয় না

অশোক। আমার বাবা একজন রিটায়ার্ড বড় পুলিশ অফিসার। তাঁর খাতিরেই পেয়েছি আর কি—

ভূদেববাবু পিস্তলটি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিলেন

ভূদেব। বাঃ, চমৎকার পিস্তলটি, একেবাবে হাতের মুঠোর মধ্যে নেওয়া যায়।

অশোক। সাবধানে নাড়াচাড়া করবেন—লোডেড্ আছে—দিন আমাকে।

পিস্তলটি দস্ত টেবিলেব একধাবে সবাইযা বাখিলেন এবং প্রশ্ন কবিলেন

এইবার বলুন তো শুনি, বাড়ির ইতিহাসটা কি। কোন ভৌতিক ব্যাপার? আমার চাকরটা বলছিল সে কার কাছে নাকি শুনেছে এটা ভূতুড়ে বাড়ি।

ভূদেব। ও, আপনি শুনেছেন তা হলে?

অশোক। এখুনি শুনলাম। ব্যাপারটা কি বলুন তো—

ভূদেব। ওই ভৌতিক ব্যাপারই—

অশোক। ভূতে করে কি, ঢিল ছোঁড়ে?

ভূদেব। (হাসিয়া) ঢিল ছোঁড়ে না।

অশোক। তবে?

ভূদেব। তা হলে গোড়া থেকেই বলি শুনুন- -

অশোক। বলুন।

পাইপ নিবিযা গিয়াছিল, পুনবায ধরাইযা লইলেন

ভূদেব। এ বাড়িটা অনেক দিনের। শুনেছি মিস্টার চৌধুরি বলে একজন বিলেত-ফেরত বাঙালী প্রথমে তৈরি করান বাড়িটা। তিনি ছিলেন সেকেলে বিলেত-ফেবত, বিলেতে গিযে মেম বিয়ে করেছিলেন।

অশোক। তাই না কি।

ভূদেব। হ্যাঁ মেমসায়েবকে নিয়েও এসেছিলেন সঙ্গে করে এদেশে। তাঁকে নিয়ে সমাজে বাস করতে পারবেন না বলেই বোধ হয় লোকালয়ের বাইরে বাড়িটা করিয়েছিলেন। অগাধ টাকা ছিল তাঁর।

অশোক। কি ছিলেন তিনি, ব্যারিস্টার?

ভূদেব। না, তিনি পাটের ব্যবসা করে লক্ষপতি হয়েছিলেন শুনেছি।

অশোক। ও। তারপর?

ভূদেব। বিলেতে থাকতেই তাঁর একটি মেয়ে হয়েছিল। সেই মেয়ের তত্ত্বাবধান করবার জন্যে একটি নিগ্রো চাকর রাখেন তিনি। দেশে আসবার সময় নিগ্রো ছেলেটিকে সঙ্গে করেও এনেছিলেন।

অশোক। নিগ্রো?

ভূদেব। হ্যাঁ কুচকুচে কালো একটি নিগ্রো ছেলে।

অশোক। তারপর?

ভূদেব। তাঁরা সবাই এই বাড়িতেই ছিলেন—মিস্টার চৌধুরি, মিসেস চৌধুরি, মিস চৌধুরি আর সেই নিগ্রো ছেলেটি। আরও অবশ্য অনেক চাকর বাকর ছিল, রীতিমত সায়েবি কেতায় থাকতেন তাঁরা।

অশোক। তারপর?

ভূদেব। মিস্ চৌধুরি আর সেই নিগ্রো ছেলেটির বয়সের তফাৎ ছিল সাত আট বছর মাত্র। তারা দুজনে একসঙ্গে এই বাড়িতে মানুষ হতে লাগল। তারপর সাধারণত যা হয়—

অশোক। প্রেম?

ভূদেব। হ্যাঁ।

অশোক। (হাসিয়া) বেশ জমিয়ে এনেছেন তো, তারপর কি হল আত্মহত্যা?

ভূদেব। না, আত্মহত্যা ঠিক নয়, যা হল তা ভয়ানক।

অশোক। কি।

ভূদেব। মিস্টার চৌধুরি রগচটা রাগী মেজাজের লোক ছিলেন। ভয়ানক মদ খেতেন, রেগে গেলে দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকতো না। কেলেঙ্কারি যখন অনেকদূর গড়িয়েছে মিস্টার চৌধুরি হঠাৎ একদিন টের পেলেন। টের পেয়ে তিনি যা করলেন তা সাংঘাতিক। নিগ্রো ছেলেটাকে আর মিস চৌধুরিকে গুলি করে মেরে ফেললেন।

অশোক। বলেন কি মশাই, নিজের মেয়েকে খুন করলেন?

ভূদেব। তাই তো শুনেছি আমরা।

অশোক। তারপর?

অশোক। তারপর তাদের মৃতদেহ সঙ্গে সঙ্গে পুঁতে ফেললেন।

অশোক। কোথায়?

ভূদেব। এই বাড়িরই কোনখানে।

অশোক। তাই না কি। তারপর কি হল?

ভূদেব। তারপর তাঁরা বাড়ি ছেড়ে দিয়ে কোলকাতা চলে গেলেন এবং কোলকাতাতেই বাড়িটা জলের দামে এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানকে বিক্রি করে দিলেন। সেই

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানই এসে প্রথমে ইলেকট্রিক কানেকশান নিয়েছিল বাড়িটাতে। বেচারা কিন্তু বাস করতে পারে নি।

অশোক। কেন, কি হল?

ভূদেব। প্রথম প্রথম আবছা আবছা তারা নাকি ছায়া-মূর্ত্তি দেখতে পেত। প্রথমে ততটা গ্রাহ্য করে নি। কিন্তু একদিন সকালে উঠে দেখা গেল, তাদের সতেরো-আঠারো বছরের মেয়েটি বিছানায় মরে পড়ে আছে। কে তাব ঘাড়টি মুচড়ে রেখে গেছে।

অশোক। (সবিস্ময়ে) সে কি!

ভূদেব। হ্যাঁ। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সায়েব পালালো। বাড়িটা এমনি খালি পড়ে রইলো অনেক দিন। অনেক দিন পরে এক ভাটিয়া কিনলে বাড়িটা। কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার, ভাটিয়া যেদিন এসে পদার্পণ করলে বাড়িতে সেইদিনই তার মৃত্যু হল!

অশোক। সেই দিনই! কি করে?

ভূদেব। কি করে তা কেউ ঠিক বলতে পারে না। রাত্তিরে খেয়ে দেয়ে সবাই শুয়েছে—হঠাৎ গভীর রাত্তিরে তার-স্বরে চীৎকার! সবাই ছুটে গিয়ে দেখে বাড়ির মালিক মেজের উপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে, কান দিয়ে চোখ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে।

উভয়ে কিছুক্ষণ চুপ কবিয়া বহিলেন। সিতাবি আসিয়া প্রবেশ কবিল
এবং কফির সরঞ্জাম প্রভৃতি লইয়া চলিয়া গেল

অশোক। আর কোন ঘটনা আছে?

ভূদেব। অনেক ঘটনা আছে। তারপব বাড়িটা যায় উমাকান্তবাবুব হাতে। উমাকান্তবাবুর ব্যাপারটাও খুব আশ্চর্য্যজনক। তাঁকে এসে বাড়িতে বাসও করতে হয় নি। বাড়ি কেনবার সঙ্গে সঙ্গেই অর্থাৎ যেদিন ডকুমেন্ট রেজিস্টার্ড হয়ে গেল সেই দিনই তাঁব বড় ছেলে কলেরায় মারা গেল। তিনি অলুক্ষণে বাড়ি রাখিলেন না, সঙ্গে সঙ্গে বেচে ফেললেন। কিনলে বেহারের এক জমিদার। বাড়িটা কেনবার পর মাস ছয়েক তিনি আসেন নি। যেদিন এলেন সেদিনটা কিছু হল না, কিন্তু তাব পব দিন তিনিও মাবা গেলেন। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! সর্পাঘাতে মাবা গেলেন ভদ্রলোক।

অশোক। কি রকম?

ভূদেব। তাব চাকরটা বললে যেদিন রাত্রে তিনি মারা যান সেদিন দুটো প্রকাণ্ড সাপ— একটা টকটকে লাল আর একটা কুচকুচে কালো সমস্ত রাত সাবা বাড়িময় দাপাদাপি করে বেড়িয়েছে। এত ভীষণ তাদের তর্জন যে রাস্তাব লোক পর্য্যন্ত থমকে দাঁড়িয়ে গেছে!

অশোক। অদ্ভুত তো।

ভূদেব। সত্যিই অদ্ভুত!

অশোক। তারপর?

ভূদেব। তারপর বাড়িটা কিনলেন রমেশবাবু। ঠিক কিনলেন না, পেলেন। তিনি ওই বেহারি জমিদারদেব উকিল ছিলেন, ফি হিসেবে তাঁদের কাছে অনেক টাকা বাকী পড়েছিল; জমিদাব মাবা যাওয়াব পর তারা আব টাকা দিতে পারলে না, তার বদলে এই

বাড়িটা পেলেন তিনি। নিজে তিনি অবশ্য কখনও এসে এ বাড়িতে বাস করেন নি, করবার সাহসই হয় নি। কিন্তু ভাড়াটে পেলে তিনি ছাড়েন না, বাড়িটা বাড়া দিয়ে দেন, আর যে ভাড়াটে আসে—

সহসা থামিয়া গেলেন

অশোক। কি হয় তাদের?

ভূদেব। একটা না একটা কিছু হয়!

অশোক। (হাসিয়া) আপনি বিশ্বাস করেন এসব?

ভূদেব। আমি নিজেই তো তিনজন ভাড়াটের খবব জানি—একজন পাগল হয়ে গেল, একজনকে ছাত থেকে ঠেলে ফেলে দিলে আর একজনের ছোট ছেলেটি যে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না। আব একটা কি বিশেষত্ব জানেন, প্রত্যেকবার আলাদা রকম কিছু একটা হয়।

অশোক পাইপ ধবাইয়া একমুখ ধোঁয়া ছাড়িলেন

অশোক। (হাসিয়া) আপনি অবশ্য যা বললেন তাব থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না। এ বাড়িতে উপর্য্যুপরি কয়েকটা মৃত্যু ঘটেছে তা ঠিক, কিন্তু প্রত্যেক মৃত্যুবই তো একটা না একটা সঙ্গত কারণও রয়েছে। কেউ সাপে কামড়ে, কেউ কলেবায়, কেউ ছাত থেকে পড়ে, কেউ য্যাপোপ্লেক্সিতে। এ সবেব দ্বাবা এটা প্রমাণ হয় না যে এটা ভূতুড়ে বাড়ি!

ভূদেব। তা অবশ্য ঠিক।

নিজেব হাত ঘড়ি দেখিলেন

এ অঞ্চলেব কিন্তু সব্বাই ভয় কবে এই বাড়িটাকে। আপনাকে বাত্তিব বেলা এসব গল্প শোনালাম, আপনার ভয় টয় করবে না তো?

অশোক। কিছুমাত্র না। ভূতের গল্প শুনে ভয় পাবার বয়স আর নেই—

ভূদেব পুনরায় হাত-ঘড়ি দেখিলেন

ভূদেব। আজ তা হ'লে এবার উঠি। রাত প্রায় দশটা হল।

অশোক। আচ্ছা।

অশোক ভূদেবের সঙ্গে সঙ্গে দ্বাব পর্যন্ত আগাইয়া গেলেন। ভূদেব যথাবিধি নমস্কারান্তে বাহির হইয়া যাইবাব পর অশোক খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর ধীর-পদ-সঞ্চারে ফিরিয়া আসিয়া ছোট টেবিলের নিকট চেয়ারে উপবেশন করিলেন এবং চিন্তিতমুখে রিভলভারটি তুলিয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন। তাহাব পর পাইপে তামাক ভরিলেন এবং পাইপটি ধরাইয়া চিন্তা করিতে করিতে অন্যমনস্ক ভাবে পাইপে টান দিতে লাগিলেন। সহসা চতুর্দিক অন্ধকার হইয়া গেল। ক্ষণ পরেই যখন আলো জ্বলিল তখন দেখা গেল অশোকবাবু কোণের দ্বিতীয় টেবিলটির নিকট আরাম কেদারায় শুইয়া একটি বই পড়িতেছেন, গাঢ়রক্তবর্ণ শেড দেওয়া টেবিল ল্যাম্পটি কেবল জ্বলিতেছে। ঘবের অন্ধকাব শেডের আভায় রক্তাভ হইয়া

উঠিয়াছে। দ্বারপ্রান্তে খুট করিয়া শব্দ হইল। অশোক তড়িৎস্পৃষ্টবৎ উঠিয়া বসিলেন। দেখা গেল দ্বারপ্রান্তে একটি কালো কাফ্রি যুবক আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার পরিধানে ধপধপে সাদা সাহেবি পোষাক। অশোকের পানে নিষ্পলক নেত্রে চাহিয়া আছে।

অশোক। সিতাবি, সিতাবি?

পুনরায় চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া গেল। পর মুহূর্তেই শিলিং ল্যাম্পটি জ্বলিয়া উঠিল। দেখা গেল অশোক আরাম কেদারায় নয়, ছোট টেবিলটির কাছে বেতের চেয়ারেই বসে আছেন। সিতাবি আসিয়া প্রবেশ করিল।

সিতাবি। কি বলছেন বাবু?

অশোক যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন। চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলেন

অশোক। কি আশ্চর্য্য—জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখলুম না কি। দেখ্ তো বাইরে কেউ এসেছে কি-না?

সিতাবি চলিয়া গেল ও ক্ষণ পরেই ফিবিয়া আসিল।

সিতাবি। না, কেউ নেই তো।

অশোক। ভাল ক'রে দেখিচিস্?

সিতাবি। আজ্ঞে হ্যাঁ। এখন আবার কে আসবে!

অশোক। রান্নার কত দেরি?

সিতাবি। বেশী দেরি নেই আর। আমি যাই, সুপটা চড়িয়ে এসেছি—

চলিয়া গেল

অশোক। আশ্চর্য্য। ঠিক মনে হচ্ছিল আমি যেন খাওয়া দাওয়ার পর আরাম কেদারায় শুয়ে বই পড়ছি আর সেই নিগ্রো ছেলেটা যেন এসে দাঁড়িয়েছে। ফানি!

একটু অস্বাভাবিক ভাবে হাসিলেন

না, এ রকম কল্পনা করা তো ঠিক নয়! আশ্চর্য্য ব্যাপার, ঠিক কিন্তু মনে হচ্ছিল—

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া খানিকক্ষণ পদচারণা করিলেন। তাহার পর আসিয়া ছোট টেবিলটায় বেতের চেয়ারে বসিলেন। পুনরায় পাইপ ধরাইলেন এবং রিভলভারটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন। খানিকক্ষণ পরে পুনরায় আবার সমস্ত অন্ধকার হইয়া গেল। ক্ষণ পরেই আলো জ্বলিলে দেখা গেল আগেকার মতো অশোকবাবু কোণের বড় টেবিলটার কাছে আরাম কেদারায় শুইয়া বই পড়িতেছেন। গাঢ় রক্তবর্ণ শেড দেওয়া টেবিল ল্যাম্পটি কেবল জ্বলিতেছে। পুনরায় দ্বার প্রান্তে খুট করিয়া শব্দ হইল, অশোকবাবু তড়িৎস্পৃষ্টবৎ উঠিয়া বসিলেন; দেখা গেল সাদা সাহেবি পোষাক পরা কাফ্রি যুবকটি দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া অশোকের পানে নির্নিমেষে চাহিয়া আছে।

অশোক। কে?

কাফ্রি যুবক আগাইয়া আসিল এবং আকর্ণবিশ্রান্ত হাসি হাসিয়া দত্তকে ঝুঁকিয়া সেলাম কবিল। অশোক খোলা বইখানা টেবিলেব উপব উপুড় কবিয়া বাখিয়া সোজা হইয়া বসিলেন।

কি চাই?

কাফ্রি যুবক আবও আগাইয়া আসিল, আব একবাব সেলাম কবিল এবং পকেট হইতে একটি ভিজিটিং কার্ড বাহিব কবিয়া অশোকেব হাতে দিল। অশোক টেবিল ল্যাম্পেব আলোয কার্ডটি পডিয়া দেখিলেন।

মিস্ চৌধুবি। কি চান তিনি?

কাফ্রি। (অস্বাভাবিক মোটা গলায) মো-লা-কা-ৎ।

অশোক ক্ষণকাল নির্ব্বাক থাকিয়া উত্তব দিলেন

অশোক। বেশ, ডেকে নিযে এস তাঁকে?

কাফ্রি মুর্ত্তি অন্ধকাবে মিলাইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি ষোল সতেবো বৎসবেব সুন্দবী মেযে দ্বাবপ্রান্তে দেখা দিল। মেযেটিব পবিধানে ধপধপে সাদা গাউন, পাযেব মোজা এবং জুতাও সাদা। পিঠে টকটকে লাল বিবন বাঁধা বেণী দুলিতেছে।

কি চান আপনি?

মেযেটি মুচকি হাসিতে হাসিতে আগাইয়া আসিল

আসুন, বসুন।

মেযেটি আসিয়া চেযাবে বসিল, কিন্তু কোন কথা কহিল না, কেবল মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল

কি চান আপনি?

মেযেটি নীবব

কথা বলছেন না কেন?

মেযেটি নীবব

কি চাই আপনাব?

মেযেটি নীবব

কোন দবকাব যদি না থাকে যেতে পাবেন আপনি।

বলিবাব সঙ্গে সঙ্গে মেযেটি উঠিল। চলিয়া গেল। অশোক পুনবায পডিতে যাইবেন এমন সময আবাব দ্বাবপ্রান্তে সেই কাফ্রি মূর্ত্তি আবির্ভূত হইল। ঠিক সেইরূপ আকর্ণবিশ্রান্ত হাসি হাসিয়া আগাইয়া আসিল এবং সেলাম কবিয়া পুনবায তাঁহাব হাতে কার্ড দিল।

মিস চৌধুবি। কি চান তিনি?

কাফ্রি। (পূর্ব্ববৎ মোটা গলায) মো-লা-কা ৎ।

অশোক। যদি কিছু দরকার থাকে আসতে বল! কিন্তু—

অশোকের কথা শেষ হইতে না হইতে কাফ্রি মিলাইয়া গেল এবং মিস চৌধুরি দ্বারপ্রান্তে দেখা দিয়া পূর্ব্ববৎ মুচকি হাসিতে হাসিতে আগাইয়া আসিয়া চেয়ারে বসিল

আমার কাছে কি দরকার আপনার বলছেন না তো!

মেয়েটি নীরবে মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল

কি, দরকারটা কি?

মেয়েটি নীরব

বলুন না, গোপনীয় কিছু?

মেয়েটি নীরব

আপনি বোবা না কি!

মেয়েটি নীরবে মুচকি হাসিল

কিছুই যদি বলবেন না, তা হলে এসেছেন কেন?

মেয়েটি নীরব

উদ্দেশ্য কি আপনার?

মেয়েটি নীরব

কি আশ্চর্য্য! কিছু যদি বলবার থাকে বলুন, আর না থাকে তো যান।

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া গেল। আবার দ্বারপ্রান্তে কাফ্রি-মূর্ত্তি দেখা দিল এবং পূর্ব্ববৎ হাসিতে হাসিতে আসিয়া সেলাম করিয়া সে কার্ড দিল

আবার মিস্ চৌধুরী! কি আশ্চর্য্য, কি চান তিনি?

কাফ্রি। (পূর্ব্ববৎ মোটা গলায়) মো-লা-কা-ৎ।

অশোক। কিন্তু মোলাকাতের উদ্দেশ্য কি! আচ্ছা বিপদে পড়লাম তো! দরকার থাকে তো আসতে বল—আর

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কাফ্রি অন্তর্হিত হইল এবং মুচকি হাসিতে হাসিতে মিস্ চৌধুরি আসিয়া চেয়ারে বসিলেন—

দেখুন আমি পড়ছি, আমাকে এ রকমভাবে বিরক্ত করা উচিত নয় আপনাদের।

হাত দিয়া টেবিলে উপুড় করা বইটি দেখাইলেন। মেয়েটি কোনই উত্তর দিল না

সত্যি সত্যি আপনার দরকারটা কি বলুন দেখি খুলে।

মেয়েটি নীরব

এমন ভাবে বিরক্ত করবার মানে কি?

মেয়েটি নীরব। অশোকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি উচ্চতর কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন

কোন উত্তর দেবেন না আপনি?

মেয়েটি নীরব

আপনি কি মনে করেন আমি ভয় পেয়ে যাব?

মেয়েটি নীরব

দেখুন ভয় পাবার ছেলে আমি নই। ভূতটুতে আমি বিশ্বাস করি না। তা ছাড়া, এই দেখুন আমার পিস্তল আছে, আমাকে বেশী রাগাবেন না। রেগে গেলে দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না আমার!

পিস্তল দেখিবামাত্র মেয়েটি পাশের দরজা দিয়া সহসা অন্তর্হিত হইয়া গেল এবং পরমুহূর্তেই একটি মরা শিশু আনিযা সেটা টেবিলে শোয়াইয়া দুই কোমরে হাত দিয়া বিকট রবে হাসিয়া উঠিল

মিস চৌধুরি। হা-হা-হা-হা-হা—

সঙ্গে সঙ্গে অশোকের পিস্তল গর্জন করিয়া উঠিল—পুনরায় চতুর্দিক অন্ধকার হইয়া গেল। ক্ষণপরে যখন ঘরের শিলিং ল্যাম্পটি জ্বলিয়া উঠিল তখন দেখা গেল, অশোকের রক্তাক্ত দেহটা ছোট টেবিলটার উপর উপুড় হইয়া রহিযাছে, ডান হাতে মুষ্টিবদ্ধ পিস্তলটা হইতে ধোঁয়া বাহির হইতেছে। কোণের বড় টেবিলটায় ইলেকট্রিক বাতি জ্বলিতেছে না এবং সেখানকার একটি পুস্তকও স্থানচ্যুত হয় নাই।

যবনিকা

*আশ্বিন ১৩৪৭*

# পরিহাস বিজল্পিতম্

## প্রমথনাথ বিশী

(নাটক)

রাজনীতিক ও অধ্যাপক মল্ল-বেশে টাগ-অফ্-ওয়ার করিবাব জন্য প্রস্তুত হইলেন ; দড়ির দুই প্রান্ত দুইজনে ধরিয়া দাঁড়াইলেন—ডিরেক্টার ইঙ্গিত করিলে টান সুরু হইবে ; যে হারিবে তাঁর সঙ্গে তাঁর ভাষাকে রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করিবার দাবীও হুঁচোট খাইয়া পড়িয়া যাইবে।

রাজনীতিক। হুকুম দিন।

অধ্যাপক। হঃ প্রস্তুত আছি।

ডিরেক্টর। দেখুন, আমি ওয়ান, টু, থ্রি, বললেই আপনারা টানতে সুরু করবেন।

অধ্যাপক। বেবাক্ বুঝছি।

ডিরেক্টর। ওয়ান, টু—

আধুনিক নারী। (সবেগে ও সা বেগে) থামুন, থামুন! এ আমি হ'তে দেব না! এ রজ্জু দেখে হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল—সেই নন্দন বনের আদিম শয়তান সর্পের কথা...

সাহিত্যিক। ইভের বংশধর না হ'লে একথা আর কে ভাবতে পারতো!

আধুনিক নারী। মনে পড়ে গেল—সেই শয়তান এসেছে আজ রজ্জুর রূপ ধ'রে, রাষ্ট্রভাষার স্বর্ণ আপেল মুখে করে বাংলা দেশ ও ভারতবর্ষের মধ্যে কলহ বাধিযে দিতে। এতদিন আমরা সম্মিলিত জাতীয় পতাকার জ্ঞান-বৃক্ষের ছায়ায় বেশ সুখে ছিলাম—শয়তান চায় আমাদের এই স্বর্গ থেকে বহিষ্কার—আনতে চায় আমাদের নামিয়ে—

সাহিত্যিক। প্রভিন্সিয়াল অটোনমির দগ্ধ পৃথিবীতে—

আধুনিকা। এতদিন আমাদের লজ্জা নিবারণ করতো বঙ্গলক্ষ্মীর মোটা খাটো ডুমুরের পাতায়—এখন সে আমাদের পরাতে চায়—

ডাক্তার। বোম্বে আর আমেদাবাদের ক্যালিকো মিলের বসনের উদ্দেশ্য-ব্যর্থকারী ছায়াশরীরী বস্ত্র—

আধুনিকা। সেই শয়তান আমাদের শান্তিতে ঈর্ষিত হয়ে রক্তপাতহীন পৃথিবীতে বর্ষণ করতে চায়...

ডিরেক্টার। হিন্দুমুসলমানের ভ্রাতৃঘাতী প্রথম রক্তস্রোত...

আধুনিকা। সে চায় আমরা অনায়াস-লব্ধ স্বর্গত্যাগ করে কোন্ দূরাশার মধ্যে—কোন্ অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে—অজ্ঞাত কুলশীল—

সম্পাদক। অনির্শ্চিত ফেডারেশেনেব স্বর্গেব সিঁড়ির অগণিত সোপান ভেঙে উঠতে আরম্ভ করি!

ডিরেক্টার। ব্রেভো। ব্রেভো! মিস বেঙ্গল, আপনিই সেই ইভ।

সম্পাদক। এমন ইভ পেলে সকলেই আদম হ'তে চাইবে।

ডিরেক্টার। আজ আমার বিশ্বাস হচ্ছে যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন বটে আদম আর ইভ! তাদের রক্ত আজও আমাদের ধমনীতে ছুটোছুটি করে মরছে—আর সেই সূত্রে আমরা ভাই-বোন্। কি বলেন মিস্ বেঙ্গল?

সম্পাদক। এ যে আপনি বিশ্বভ্রাতৃত্ব-বোধে গিয়ে পৌঁছলেন।

ডিরেক্টার। এতে বিস্মিত হচ্ছেন কেন? বিশ্বভ্রাতৃত্ব সবচেয়ে সহজ—আর দ্রুত সেই যুগ আসছে। আমি প্রমাণ করে দিচ্ছি, তার আগে দুটো কথা বলে নি।—মিস বেঙ্গল, আপনার মধ্যে অলৌকিক অভিনয়-প্রতিভা নীহারিকারূপে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, একটু চেষ্টা করলেই সুসংহত হয়ে একটি নক্ষত্র রূপে তা ফুটে উঠবে—যাকে বাংলায় বলে ফিল্মষ্টার!

আধুনিক। সেও কি সম্ভব?

ডিরেক্টার। সবচেয়ে যা অসম্ভব তাই যখন সম্ভব হয়েছে—

আধুনিকা। সেটা কি?

ডিরেক্টার। আপনার—সৃষ্টি।

"কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে
ধরণীর তলে—ফুটিয়াছে আজি এ মাধবী—
এ আনন্দচ্ছবি—যুগে যুগে ঢাকা ছিল
অলক্ষ্যের বক্ষের আঁচলে।"

অধ্যাপক। ওটা কি বাংলা কবিতা আওড়ালেন? তা আজকাল মন্দ কবিতা লেখা হচ্ছে না তো?

ডিরেক্টার। মিস্ বেঙ্গল, এই যে আপনি এখনি কথাগুলি বললেন—এতে আমার কার কথা মনে পড়ে গেল জানেন? কুইন গ্রেটার! গ্রেটা গার্ব্বো! অমন উদ্দীপনাময়ী কথা তো আর কাউকে বলতে শুনিনি।

আধুনিকা। আমি কি গ্রেটার সমকক্ষ?

ডিরেক্টার। সমকক্ষ! এক বৃন্তে আপনারা দু'টি ফুল! কেবল কথার পরিমাণ কিছু কমিয়ে আনতে হবে, সিনেমাতে অত কথা মানায় না। আচ্ছা এক কাজ করুন তো—এই চেয়ারটায় বসুন; এই কাগজখানা হাতে নিন; মনে করুন একখানা প্রেমপত্র এসেছে, পড়লেন, কিন্তু পছন্দ হলো না—কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। এমন সময় শূন্য খামখানা খস্ খস করে উঠল—তুলে দেখলেন ভিতরে একখানা মোটা টাকার চেক্। বাস্, তখনি মনে এক অপূর্ব্ব অনুশোচনা। আবার সেই চিঠির টুকরাগুলি কুড়িয়ে কুড়িয়ে জোড়া দিতে লাগলেন। সবই পেলেন—কেবল ঠিকানাটা পেলেন না। তখন চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে তীব্র আবেগের সঙ্গে চীৎকার করে উঠলেন—"ঠিকানা! ঠিকানা! ওগো ঠিকানা কই!" করুন দেখি—

মিস্ বেঙ্গল মূকভাবে যথাসম্ভব পারদর্শিতার সঙ্গে এই ভাবটি লইয়া অভিনয় করিতে লাগিলেন ; ডিরেক্‌টার প্রয়োজন মত উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং অবশেষে দাঁড়াইয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন--

আধুনিকা। ঠিকানা! ঠিকানা! ওগো আমার প্রিয়তমের ঠিকানা কই!

সকলে। বাহবা! ব্রেভো! ওয়াণ্ডারফুল!

রাজনীতিক। খুবসুরৎ।

অধ্যাপক। মারছস্ পাগ্‌লী।

ডিরেক্টার। সম্পাদক মশায়, এবার আপনার কথার উত্তর দিই। বিশ্বভ্রাতৃত্ব যদি কোন প্রতিষ্ঠান প্রমাণ করতে পারে ত কেবল সিনেমা-জগৎই পারবে?

সম্পাদক। সিনেমা?

ডিরেক্টার। হ্যাঁ সিনেমা! ইউরোপ আমেরিকার বড় বড় অভিনেত্রীদের চেহারা দেখুন—সবই এক ছাঁদে ঢালা; জন্ম থেকে হয়নি; চর্চ্চার দ্বারা হয়েছে। আবার বড় বড় অভিনেতাদের চেহারা দেখুন—সব এক ছাঁচে ঢালা— চেষ্টার দ্বারা হয়েছে। অভিনেত্রীদের মূল ছাঁদ হচ্ছে— গ্রেটা গার্বো; অভিনেতাদের—ম্যারিস বয়ার। তার পরে দেখুন সিনেমার দর্শক আর দর্শিকারাও বাড়ীতে গিয়ে আয়নার সম্মুখে নিজেদের মুখের ছাঁচকে এই দুই ছাঁদে ঢালাই করবার চেষ্টা করছে! ইতিমধ্যেই অসামান্য সাফল্য হয়েছে। যে কোন লিলিতি মেয়ের ছবি দেখলেই গ্রেটা গার্বোকে মনে পড়ে যায়—পুরুষের ছবি দেখলেই ম্যারিস বয়ারকে মনে পড়ে যায়। আর এ ঢেউ আমাদের দেশেও এসে পৌছেচে। আমি হিসেব করে দেখেছি, পঞ্চাশ বছর এ রকম চললে পৃথিবীর দুশো কোটী অধিবাসীর চেহারা—দুটি মাত্র টাইপে এসে পরিণত হবে। তখন মনে করুন, অন্য কোন গ্রহ থেকে যদি এক জীব আসে তবে সে চেহারার এক সাম্য দেখে পৃথিবীর সব নরনারীকে ভাই-বোন মনে করবে। মনে করবে—এরা কোন আদিম দম্পতীর পুত্রকন্যা। বিশ্বভ্রাতৃত্ব আর কাকে বলে?

সাহিত্যিক। অহো মহতী ধারণা।

ডিরেক্টার। আর এই নব বিশ্বভ্রাতৃত্বের জন্ম ইডেন অরণ্যে নয়। পবিত্র এক অরণ্যে যার নাম হচ্ছে হলিউড্।

সম্পাদক। আপনি তো কেবল বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাইরের ঐক্যের কথা বললেন! জ্ঞানের ঐক্য করবো আমরা—আমরা যারা জর্নালিষ্ট। আর পঞ্চাশ বছর খবরেব কাগজ চললে দেখবেন, এই বিশ্বপরিবারে ভাই-বোনদের জ্ঞান এক লেভেলে এসে দাঁড়িয়েছে—সবাই এক কথা বলছে, সবাই এক কথা ভাবছে, সবাই এক পথে চলছে। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক যুগের কথা পড়েছেন—গোলডেন্ এজ, কপার এজ, ষ্টোন এজ, ব্রোঞ্জ এজ, আয়রণ এজ—এবারে আসছে পেপার এজ।

রাজনীতিক। আপনারা একজন দিলেন চেহারা, একজন দিলেন জ্ঞান—আর এই বিশ্বপরিবারে আমি দেবো ভাষা--আর পঞ্চাশ বছর এমন চললে সবাই রাষ্ট্রভাষা বলতে আরম্ভ করবে—নইলে পৃথিবীর উন্নতি নেই—

ডিরেক্টার। পৃথিবীর উন্নতি ভাষায় হবে! অসম্ভব।

রাজনীতিক। তবে কিসে?

সম্পাদক। আমি জানি—আমার জীবন-চরিত প্রচারে—

সাহিত্যিক। আমি জানি—আমার কাব্যগ্রন্থ প্রচারে—

অধ্যাপক। আমি জানি—কেতাবী ভাষার কেল্লায় গ্রাম্য শব্দের প্রবেশে—

ডাক্তার। আমি জানি—পৃথিবীর লোককে আমার ডাক্তারখানায় এনে হাজির করাতে—

সকলে। কেন?

ডাক্তার। চিকিৎসা করে সবগুলোকে মেরে ফেলবো। আর পৃথিবী জনশূন্য হলেই পৃথিবী সমস্যাশূন্যও হবে।

আধুনিকা। আমি জানি—আমাব পঞ্চাশ লক্ষ ছবির বিতরণে—

ডিরেক্টার। আপনারা কেউ জানেন না।

সকলে। কি রকম?

ডিরেক্টার। কখনো ভেবে দেখেছেন কি? ইউরোপ কেন উন্নত আর ভারতবর্ষ উন্নত নয়? ভেবেছেন? ইউরোপের এমন কি বৈশিষ্ট্য আছে, যা ভারতের নাই? যা ইউরোপের প্রত্যেক নরনারীর আয়ত্ত, অথচ ভারতের নয়? জানেন?

আধুনিকা। জানি বই কি? লিপষ্টিক—

সাহিত্যিক। জানি বই কি? অভিধান—

রাজনীতিক। জানি বই কি? লিঙ্গুয়া ফ্র্যাঙ্কা।

সম্পাদক। জানি বই কি, খবরের কাগজ—

অধ্যাপক। জানি বই কি? গ্রাম্য ভাষা—যাকে বলে স্ল্যাং—

ডাক্তার। জানি বই কি, জন্মনিয়ন্ত্রণ—

ডিরেক্টার। কিচ্ছু জানেন না—কেউ জানেন না—

সকলে। তবে আপনিই বলুন।

ডিরেক্টার। ইউরোপের উন্নতির কারণ নাচ, নৃত্য— যাকে বাংলায় বলে ড্যান্স। ওই একটিমাত্র বস্তুর দ্বারা ইউরোপ আর ভারতবর্ষ স্বতন্ত্র! নাচ, নৃত্য, ড্যান্স।

সম্পাদক। নাচ?

ডিরেক্টার। আজ্ঞে হ্যাঁ! আমার বাণী ভারতবর্ষ এখনো শুনুক, নাচতে শিখুক! পায়ের বেরি বেরি সারবে, কোমরের বাত সারবে, মনের ঘুণ দূর হবে!

সম্পাদক। সে কি মশায়!

ডিরেক্টার। বিশ্বাস তো হবেই না। আচ্ছা বলুন, ইউরোপ আমাদের চেয়ে এমন বেশী কি আর জানে? আমার কথা এখনো শুনুন—আমি আগামী কংগ্রেসে একটা প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেবো—এতে বোমা নেই, বন্দুক নেই, চরকা নেই, খদ্দর নেই; এতে শ্রমিক নেই, ধনিক নেই; এতে বুর্জোয়া নাই, কম্যুনিষ্ট নাই; যেখানে যে আছেন নাচতে সুরু

করুন! আর সে নাচও এমন কিছু নয়—ওয়ালৎস, পলকা আর ফক্স ট্রট্।

এই বলিয়া সে একটি গানের কলি গুন্‌গুন্ করিয়া ভাঁজিতে ভাঁজিতে হঠাৎ নাচিতে আরম্ভ করিল।

আসুন না? আজ এখান থেকেই আরম্ভ করা যাক্। কে আসবেন আসুন।

এই বলিয়া সে এক একজনকে ধরিতে যায়—আব সে পলাইয়া যায়—অবশেষে সে স্থূলকার সম্পাদককে ধবিয়া ফেলিল

আসুন সম্পাদক মশায়! দেশের জন্য নাচা যাক্।

সম্পাদক। আহা ছাড়ো।

ডিরেক্টার। ছাড়বো কেন? দেশের জন্য কত জনে কত কঠিন কাজ করেছে, জেলে গিয়েছে, প্রাণ দিয়েছে— আর আপনি নাচতেও পারবেন না! ধিক্!

সম্পাদক। আহা কর কি!

কিন্তু কে-কার কথা শোনে, ডিরেকটার আড়াইমণি সম্পাদককে জড়াইয়া ধরিয়া ইউরোপীয় নৃত্যের প্যাঁচে বন্ বন্ করিয়া পাক খাইতে লাগিল।

ডিরেক্টার। 'তরঙ্গে তরঙ্গে নাচে নদী—এক, দুই, তিন'।

সম্পাদক। আহা লাগে যে!

ডিরেক্টার। লাগে লাগুক। মনে রাখবেন, এ নাচ সখের নাচ নয়—'তরঙ্গে তরঙ্গে নাচে নদী—এক, দুই, তিন!'

সম্পাদক সশব্দে ছুটিয়া পড়িয়া গেল

ডিরেক্টার। নাঃ আপনি কোন কাজের নয়! আসুন দেখি মিস বেঙ্গল!

তখন মিস বেঙ্গল ও ডিরেকটার দ্বৈতনৃত্য আরম্ভ করিল; মিস বেঙ্গলের ধাপ ফেলা দেখিয়া বোঝা যায়—এ বিদ্যা তার অনায়াত্ত নয়; দুইজনে বন্ বন্ করিয়া ঘরময় পাক খাইতে লাগিল—অন্যান্য সকলে সম্ভ্রমে ও ভয়ে পথ ছাড়িয়া দিয়া মরিয়া যাইতে লাগিল

উভয়ের দ্বৈতনৃত্য

কিছুক্ষণ পরে উভয়ে পরিশ্রান্ত হইয়া থামিল, তখন সকলে আশ্বস্ত হইল

রাজনীতিক। (উত্তেজিত ভাবে) নাচো, নাচো, খুব নাচো। এই জন্যই বাংলাদেশ আজ ভারতবর্ষের বিদূষকের স্থান অধিকার করেছে। নাচ, গান, সিনেমা, থিয়েটার, খেলা, খেলা আর খেলা! বাঙ্গালীর মত নাচতে আর কেউ পারে না। এখন আর থিয়েটারের নটীদের নাচ বাঙ্গালীর ভাল লাগে না; কলেজের মেয়েদের নাচ চাই! স্কুলের মেয়েদের নাচ চাই! নাচ আর গান; জোরে, আরও জোরে; অন্য দেশের কে কি বলছে সেকথা যেন কানে ঢুকতে না পায়। 'নঙ্গাশির বঙ্গালী!' 'কেরানী ঔর গোলাম বঙ্গালী!' কে কি বলছে শুনেও শুনো না। প্রবাসী বাঙ্গালীদের আবার দেশে ফিরে আসবার সময় উপস্থিত; স্বদেশবাসী বাঙ্গালীর স্বদেশে জায়গা নেই! না—না—এসব দেখেও দেখো না! চোখ দিয়েছ

সিনেমাতে বাঁধা; হাত দিয়েছ মাড়োয়ারীকে বাঁধা; মুখ দিয়েছ গজলে বাঁধা; কাণ দিয়েছ রেডিওতে বাঁধা; পা দুটো খালি আছে—তাই বা খালি থাকে কেন? নাচো—নাচো—খুব নাচো! হিন্দি শিখবে কেন? শিখ্‌লে যে বিদেশের গালাগালি বুঝতে পারবে—ও সব না শেখাই ভাল!

ডিরেক্টার। আর মরি তো নাচতে নাচতেই মরবো।

রাজনীতিক। শীঘ্র মরো—ভাঁড়ের নাচ বেশীক্ষণ ভাল লাগে না।

এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া সম্পাদকেব কাণে কাণে কি যেন বলিয়া গেল

সম্পাদক। এবার সকলে চলুন! আহারের ডাক পড়েছে। তার আগে আমি একটা কথা বলি। বাঙ্গালীর এত অপদস্থ বোধ করবাব কোন কারণ নেই! ভারতবর্ষের সভ্যতায় বাঙ্গালীর দান তুচ্ছ নয়, ভারতবর্ষ যদি বাঙ্গালীকে রাষ্ট্রভাষা দেয়—বাঙ্গালী ভারতবর্ষকে দিয়েছে 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত।

রাজনীতিক ছাড়া সকলে। হুর্‌রে!

সম্পাদক। আর যদি রাষ্ট্রভাষা অন্য প্রদেশের হাত থেকেই গ্রহণ করতে হয় বাঙ্গালী তা বিনা মূল্যে নেবে না-- বাঙ্গালী দেবে ভাবতের জাতীয়তার অভিযানের যুদ্ধ সঙ্গীত।

অধ্যাপক। সে তো আছেই—বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত—

সম্পাদক। কালক্রমে তাতে ফাটল দেখা দিয়েছে। ও গান এখন অচল!

অধ্যাপক। তবে?

সম্পাদক। আমি বলছি—আপনারা সকলে সারবন্দি হয়ে দাঁড়ান—যেন যুদ্ধক্ষেত্রে চলেছেন!

সকলে তথা দাঁড়াইল

সম্পাদক। উঁহু হ'ল না—লেডিস ফার্স্ট!

সেই বকম ভাবেই দাঁড়াইল, সম্পাদক সাবিব
পার্শ্বে নায়কেব স্থান অধিকার করিয়া দাঁড়াইল।

সম্পাদক। মিস বেঙ্গল, আপনার চাবির গোছাটা আমাকে দিন তো।

গ্রহণ

নিন্, এইবাব সকলে আরম্ভ করুন! আমি আগে একছত্র গাইবো—আপনারা আমার অনুসরণ করবেন!

সকলে অবহিত হইয়া দণ্ডায়মান হইল

সম্পাদক। দূর থেকে তাবে বাসবো ভাল জানতে দেবো না!
লেফ্‌ট, রাইট্, লেফট্ .!

সকলে মার্চ করিতে লাগিল

সম্পাদক। 'রাশি রাশি লিখবো চিঠি পোষ্ট করবো নাঃ, লেফট্ রাইট্, লেফট্...

সকলের মার্চ্চ ও গান

সম্পাদক। জানলা দিয়ে মারবো উঁকি। দেখতে পাবে না! লেফট্, রাইট্ লেফট্

সকলের মার্চ্চ ও গান

সম্পাদক। 'বাসের পাশে পাশে বাইক চালাবো— বুঝতে পাবে না!'

**লেফট্, রাইট, লেফট্...***

সকলের মার্চ্চ ও গান ; এইরূপে সকলে ষ্টেজটা একবার ঘুরিয়া আসিয়া সম্পাদকের নির্দেশে ধীরে ধীরে সারিবন্দী ভাবে নিস্ক্রান্ত হইল। তাহারা বাহির হইয়া গেলে যবনিকা পড়িল।

## তৃতীয় দৃশ্য

প্রথম অঙ্কের বর্ণিত হল ঘর। অভিনয়ান্তে দর্শকগণ অর্থাৎ মেয়ব, ক্রিটিক, প্রকাশক, রিপোর্টার সবেগে সোল্লাসে প্রবেশ করিলেন। মুখ দেখিয়া মনে হয় এমন নাটক তাঁরা কখনো দেখেন নি।

মেয়র। ওয়াণ্ডারফুল!

ক্রিটিক। এক্সেলেন্ট!

প্রকাশক। সুপার্ব্ব।

রিপোর্টার। গ্র্যাণ্ড!

মেয়র। কি চমৎকার প্লট!

ক্রিটিক। কি তীক্ষ্ণ বাক্যভঙ্গী।

প্রকাশক। কাঁদিয়ে ফেলে এমন হাস্যরস—

রিপোর্টার। কি সুনিপুণ অভিনয়।

রিপোর্টার সকলের মতামত লিখিয়া লইতে থাকিবে

মেয়র। বাংলা নাটক বহুকাল দেখিনি—এর মধ্যে নাট্যকলা কতদূর এগিয়ে গিয়েছে—

ক্রিটিক। আপনার এ কথা আমি স্বীকার কবতে পারলেম না ; এ নাটকখানাকে সাধারণ বাংলা নাটকের টাইপ বলে গ্রহণ করবেন না—এ একটা অসাধারণ কিছু।

প্রকাশক। ফর্মা-পিছু চার আনা দাম ফেললেও এ বই হু হু করে বিক্রী হয়ে যাবে।

ক্রিটিক। একটা বিষয় লক্ষ্য করেছেন—চিন্তার খোরাক আর হাস্যবস কেমন কৌশলে মিশিয়ে দিয়েছে।

---

এই গানটি আমার কোনো বন্ধুব রচনা।

মেযব। ওযাণ্ডাবফুল! রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে অত্যন্ত সাবগর্ভ আলোচনা।

প্রকাশক। আমি তো অধ্যাপকেব সঙ্গে এ বিষযে একমত, বাংলাকে বাষ্ট্রভাষা কবতে হবে।

ক্রিটিক। নাট্যকাব যেই হোক, সে এ কথা বুঝেছে, বাঙ্গালী দর্শককে ভাববাব কথা বললেই তাবা ঘুমিযে পডবে—তাই হাসাতে হাসাতে অজ্ঞাতসাবে ভাবিযে তুলেছে।

মেযব। নাট্যকাব কে তা আমি ধবে ফেলেছি— নিশ্চয গিবিশ ঘোষ।

প্রকাশক। সে কি! তাঁব তো অনেকদিন তিবোধান হযেছে!

মেযব। তা হবে! আমাদেব সভাতে শোকপ্রস্তাব পাশ না হলে কে মবল, আব কে বাঁচল ঠিক থাকে না।

ক্রিটিক। কি বলছেন! গিবিশ ঘোষ? অসম্ভব! এ নাটক ববীন্দ্রনাথ ছাডা আব কাবও পক্ষে লেখা অসম্ভব। দেখলেন না এতে 'চিবকুমাব সভা'ব বাক্‌ভঙ্গী কেমন স্পষ্ট!

প্রকাশক। 'চিবকুমাব সভা'ব অনুকবণ কবলেও তা সম্ভব হতে পাবে! আমাব দৃঢ ধাবণা, এ ববি মৈত্রেব বচনা!

মেযব। ওযাণ্ডাবফুল! আমি তাঁব সঙ্গে দেখা কববো। আব যদি সত্যি হয, তাঁব নামে একটা পার্কেব নামকবণ কবে দেবো!

প্রকাশক। নামকবণ কবতে পাবেন কিন্তু দেখা হবে না।

মেযব। আলবৎ হবে! মেযব দেখা কবতে গেলে দেখা কববে না এমন জীবিত মানুষ কে আছে?

প্রকাশক। ঠিক ধবেছেন। সে অনেক দিন হল মাবা গেছে।

ক্রিটিক। ওসব বাজে কথা! এ নাটক শচীন সেনেব এবং মন্মথ বাযেব। নাটকেব সমালোচনা কবে চুল পাকালাম—আমাব চোখ এডানো সহজ নয!

মেযব। দুজনেব একসঙ্গে হওযা সম্ভব নয।

ক্রিটিক। কেন নয? একজনে প্লট বচনা কবেছে, আব একজনে কথোপকথন লিখেছে। তবে কে কোনটাব জন্য দাযী তা এখন বলতে পাবছি না।

মেযব। দুজনে একসঙ্গে নাটক লিখবে কি মশায!

প্রকাশক। আপনি বাংলা নাট্যসাহিত্যেব ইতিহাস সম্বন্ধে খোঁজ বাখেন না বলেই বিস্মিত হচ্ছেন। আমি একখানা যুগান্তবকাবী বাংলা নাটকেব নাম জানি যা সাতান্ন জনে লিখেছে।

সকলে। সাতান্ন?

প্রকাশক। হ্যাঁ সাতান্ন। থিযেটাবেব ম্যানেজাব থেকে আবম্ভ কবে স্টেজেব ঝাড়ুদাব পর্যন্ত সবাই দু-চাব লাইন কবে ভবে দিযেছে!

মেযব। শত্রুবা মিথ্যা বলে যে বাঙ্গালীবা একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ কবতে পাবে না। কিন্তু তা হলে দেখা যাচ্ছে যে গ্রন্থেব উপবে যাব নাম থাকবে সে গ্রন্থকাব না হতেও পাবে।

প্রকাশক। ওর উল্টোটাই সাধারণ নিয়ম বলে ধরে নেবেন! গ্রন্থের উপরে যার নাম, সাধারণত সে গ্রন্থকার নয়!

মেয়র। এমন জানলে তো আমিও বই লিখতে আরম্ভ করতে পারি।

প্রকাশক। অবশ্যই পারেন। বিশেষ স্কুল-কলেজের টেক্সট বইয়ের গ্রন্থকার-হিসাবে যার নাম, নিশ্চয় জানবেন সে বই লেখেনি। যে সব লোক তিন-চার বছর হল মারা গেছেন—প্রতিদিনই তাঁদের নূতন নূতন বই বেরোচ্ছে।

মেয়র। কিন্তু তা হলে নাটকের অথার কাকে ঠিক করলেন?

রিপোর্টার। আমি একটা সাজেস্‌শন্ দিতে পারি!

সকলে। কি? কি?

রিপোর্টার। সেই যে একজন লেখক আছে—নামটা ঠিক মনে আসছে না—যে বার্নার্ড শ'র নকল ক'রে লেখে, আর নিজেকে—

ক্রিটিক। ঠিক নিজেকে বার্নার্ড শ'—মলিয়েরের সমকক্ষ মনে করে—কি নামটা যেন—

প্রকাশক। হাঁ, হাঁ, নামটা, তাই তো নামটা—

মেয়র। যখন নাম কারোরই মনে আস্‌ছে না—তখন নিশ্চয় নামকরা লোক নয়—

রিপোর্টার। ঠিক বলেছেন! আমার মনে হয় তারই লেখা!

ক্রিটিক। কি যে বলছেন তার ঠিক নেই! তার নাটক আমি পড়েছি, দেখেছি, সে কি লিখতে পারে? না আছে পারস্‌পেকটিভ জ্ঞান, না আছে চরিত্রবোধ, আর না আছে এমন বাক্‌ভঙ্গী!

রিপোর্টার। কিন্তু তার নামটা কি?

ক্রিটিক। নাম যাই হ'ক—লোকটার Intellectual hydrocaphaulocs হয়েছে!

রিপোর্টার। কথাটা এখনি নাটক থেকে শিখলেন।

ক্রিটিক। অপমান করবেন না মশায়!

রিপোর্টার। কাকে অপমান করলাম?

ক্রিটিক। আমাকে, বাংলা নাটককে, বাংলা দেশকে।

রিপোর্টার। সে কি মশায়?

ক্রিটিক। তবে কেন বললেন যে, আমি বাংলা নাটক থেকে এটা শিখলাম!

রিপোর্টার। তাতে কি হয়েছে?

ক্রিটিক। কি হয়েছে? বাংলা নাটক থেকে কেউ কখনো কিছু শিখেছে?

প্রকাশক। হিয়ার! হিয়ার!

ক্রিটিক। নাটক থেকে কোন দিন কিছু শেখা যায়! নাটক কি স্কুল নাকি?

মেয়র। তবে নাটকের উদ্দেশ্য কি?

ক্রিটিক। আর যাই হোক শিক্ষা দেওয়া নয়। সে জন্য স্কুল আছে, কলেজ আছে, ফ্রি প্রাইমারী স্কুল আছে, ব্রাহ্মসমাজ আছে, শ্রদ্ধানন্দ পার্ক আছে! নাটক দেবে আনন্দ।

মেয়র। সে যে মস্ত কথা হল।

ক্রিটিক। মস্ত ভেবেই সমস্ত নষ্ট করেছেন!

মেয়র। তবে আনন্দ কি?

ক্রিটিক। আনন্দ যে কি তা একবার বাংলা থিয়েটারে গিয়ে দেখে আসুন। আনন্দ হচ্ছে—অন্ধগায়কের গান, সাধ্বী বারাঙ্গনার উৎকণ্ঠা, গৃহী বারাঙ্গনার নৃত্য, আর নারীর অশ্বারোহী বেশে আবির্ভাব। আনন্দের প্রকাশ হচ্ছে ড্রেসিং গাউনে, হোস পাইপে গঙ্গার অকস্মাৎ অবতরণে; আর সমস্যানাটকের নামে কতকগুলো অসমস্যার ভেজাল বিতরণে! ওই যে লেখকটার নাম কারো মনে পড়লো না—আমার অবশ্য পড়েছে, কিন্তু ভদ্রলোকের সামনে বলবার মত মরাল কারেজ আমার নেই, সেই লোকটার প্রধান দোষ—সে নাটকে শিক্ষা দিতে চায়! আমার বিশ্বাস, লোকটা স্কুল মাস্টার—তাই দর্শকদের উপরও মাস্টারি করতে চায়।

মেয়র। আহা রাগ করবেন না মশায়—আমরা তো ভুলভ্রান্তি করবোই—আমরা যে সাধারণ লোক। আচ্ছা, এই নাটকটাকে আপনি কোন্ শ্রেণীর মনে করেন?

ক্রিটিক। এ তো মস্ত ট্র্যাজেডি।

মেয়র। ট্র্যাজেডি!

ক্রিটিক। ট্র্যাজেডি বই কি? বাংলাদেশ আর ভারতবর্ষের মধ্যে যে-দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী, তারই পূর্ব্বাভাস!

প্রকাশক। একথা আমার মনে ধরছে না। এ তো নিছক রাজনৈতিক নাটক। মহাত্মাজী আর সুভাষবাবুর দ্বন্দ্ব এর উপজীব্য।

মেয়র। আর আমার কথা যদি বিশ্বাস করেন—তো বলতে পারি নাটকখানা রূপক ছাড়া আর কিছুই নয়! জীবাত্মা হচ্ছে অধ্যাপক, আর পরমাত্মা হচ্ছে রাজনীতিক; আর সকলে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি রিপু।

রিপোর্টার। ওসব কিছু নয় মশায়! আমার বিশ্বাস, নাটকখানা একটা স্যাটায়ার! আমাদের নিয়ে বিদ্রূপ করা হয়েছে।

ক্রিটিক। প্লিজ মাইণ্ড ইয়র অউন বিজনেস্! যে বিষয়ে কিছু জানেন না তা নিয়ে আলোচনা করতে আসবেন না!

রিপোর্টার। ভেরি সরি!

> মিনি ও মিনির প্রণয়ীর প্রবেশ; তাদের দেখিয়া সকলে আগ্রহাতিশয্যে মুখর হইয়া উঠিল; কে আগে অভিনন্দন জানাইবে, কে কি ভাবে অভিনন্দন জানাইবে—ভাবিয়া পাইতেছে না।

মেয়র। কনগ্র্যাচুলেশনস মিস্ সোম!

ক্রিটিক। বহু ধন্যবাদ।

প্রকাশক। আন্তরিক অভিনন্দন!

রিপোর্টার। চমৎকার!

মেয়র। এমন নাটক আমি জীবনে দেখিনি!

ক্রিটিক। বাংলা নাট্য-জগতে যুগান্তর এনেছে!

প্রকাশক। এরকম নাটক প্রকাশিত হলে সাহিত্যে বিপ্লব উপস্থিত হবে।

রিপোর্টার। আমি আগাগোড়া কেবল নোট নিয়েছি।

মিনি। আপনার ভাল লেগেছে জেনে আশ্বস্ত হলাম।

মেয়র। ভাল ব'লে ভাল! বলুন না ক্রিটিক, কিরকম ভাল!

ক্রিটিক। আমি শুধু এই মাত্র বলতে পারি, বাংলা নাটকের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিককে বলতে হবে যে এখানে, আজ আপনার বাড়ীতে বাংলা নাটকের গোড়া পত্তন হল।

মিনির প্রণয়ী। নিজেদের গুণেই আপনাদের ভাল লেগেছে। সত্যি কি আর যত ভাল বলছেন তত ভাল হয়েছে?

ক্রিটিক। কি বলছেন মশায়! পারফেক্ট পার্‌স্‌পেক্‌টিভ্‌। এমনটি কখনো দেখিনি।

মেয়র। আর মিস বেঙ্গল ও ডিরেক্টারের দ্বৈতনৃত্যকে আমি রূপক বলে মনে করি। ওটা আর কিছু নয়, ইউরোপ ও এশিয়ার মিলনের নৃত্য।

মিনির প্রণয়ী। এ কথা আমাদের মনে হয়নি।

প্রকাশক। আর রাজনীতিক যে বাঙ্গালীকে এমন করে গাল দিলেন—আপনি কি ভাবতে পারেন, বাঙ্গালী ছাড়া বাঙ্গালীকে আর কেউ এভাবে গাল দিতে পারত?

মিনি। ওতে কি শিখবার কিছু নেই?

ক্রিটিক। নাটক থেকে আবার শিখলেন কি? নাটক হচ্ছে নাটক!

মিনি। নাটক কি জীবনের ছায়া নয়?

ক্রিটিক। ও সব আপনাদের পোষ্টগ্র্যাজুয়েট ক্লাসের শেখা বুলি! শুনতে বেশ লাগে! কাজের নয়। আর বাংলা পেশাদার নাটক দেখেন নি বলেই ওকথা বলতে পারলেন! আমার কথা যদি শোনেন—তবে বলি, নাটক আর জীবন দুই সতীন। সর্ব্বদা চুলো-চুলি, ঝগড়া, একদণ্ড দুইজনের বনে না—

মিনির প্রণয়ী। সে বোধ হয় বিশেষ করে বাংলা নাটক!

ক্রিটিক। বাংলা দেশ ছাড়া আর কোথাও নাটক আছে নাকি?

মেয়র। মিস সোম, এবার বলুন নাট্যকারের নাম কি?

মিনি। নামটা এখনো বলব না। পাছে নাম শুনে আপনারা বিচার করেন এই ভয় করচি।

মেয়র। সে একটা কথা বটে। কিন্তু নামটা না শুনলে ভাল লাগাটা যে উচিৎ হয়েছে তা বিশ্বাস করতে পারছি না।

ক্রিটিক। নাম বলুন আর নাই বলুন—রচনার ষ্টাইল তো লুকোতে পারেন নি—এ আমার পরিচিত ষ্টাইল।

মিনির প্রণয়ী। তা হলে তো দেখছি আমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে—ধরে ফেলেছেন।

ক্রিটিক। ধরে না ফেললেই বিস্মিত হতাম।

মিনি। কিন্তু আপনাদের আর একটু কষ্ট দেবো।

মেয়র। আজকের এই আনন্দের পরে কোন কষ্টই আর কষ্ট বলে মনে হবে না।

মিনি। অভিনেতাদের মধ্যে যে তিন জন সব চেয়ে ভাল অভিনয় করেছেন, তাদের তিনটি পদক উপহার দিতে হবে।

মেয়র। এ তো নিতান্ত উচিত। অভিনেতারা কোথায়?

মিনি। আমরা তাঁদের নিয়ে আসছি। আপনারা ততক্ষণ নামগুলো নির্ব্বাচন করে রাখুন।

মিনির প্রণয়ী। এই রাখুন পদক তিনটি।

*মেয়রের হাতে তিনটি পদক দিল*

মিনি। তা হলে আমরা আসি।

*দুজনের প্রস্থান*

মেয়র। বলুন ক্রিটিক, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা তিন জন কে কে?

ক্রিটিক। এ তো সহজ কথা। বীররসের জন্য অধ্যাপক, করুণরসের জন্য রাজনীতিক, আর হাস্যরসের জন্য সম্পাদক! আপনাদের কি মত শুনি?

মেয়র। বাস্তবিক সম্পাদক যে এমন আশ্চর্য্য বিদূষকের অভিনয় করবে ভাবতে পারিনি।

প্রকাশক। আর অধ্যাপকের বীররসের পার্ট! উনি পেন্সন নেবার পরে যাত্রাদলের ভীমের অভিনয় করতে পারবেন!

মেয়র। কিন্তু আমি কি ভাবছি জানেন যে দেশের অধ্যাপকেরা এমন বীর, সে দেশের ছাত্রেরা কিন্তু সে মাপের হচ্ছে না!

রিপোর্টার। কি বলছেন! ফরাসীদুর্গ বাস্তিল আক্রমণের ছবি দেখেছেন?

মেয়র।

রিপোর্টার। তবে একদিন হরতালের সময় কলেজের দৃশ্য দেখে আসবেন।

মেয়র। আচ্ছা সম্পাদককে বেছে বেছে কেন বিদূষকের পার্ট দেওয়া হল!

ক্রিটিক। এটা আর বুঝলে না! আধুনিক ডিমোক্রেসীর গণরাজের সভায় সম্পাদক হচ্ছে বিদূষক। নইলে অমন প্রলাপ কি আমরা আর কারো মুখ থেকে সহ্য করতে পারতাম।

*এমন সময় তথাকথিত অভিনেতাদলকে লইয়া মিনি ও মিনির প্রণয়ী প্রবেশ করিল*

মেয়র। আসুন! আসুন! ওয়াণ্ডারফুল!

ক্রিটিক। সুপার! এমনটি আমি আর দেখিনি!

প্রকাশক। কি চমৎকার ডায়োলগ্‌।

রিপোর্টার। আমি একটি কথাও বাদ দিইনি।

সম্পাদক। কি বলছেন?

মেয়র। আপনাদের অভিনয়ের কথা।

সম্পাদক প্রভৃতি অভিনেতাগণ। অভিনয়? অভিনয় কোথায়?

ডাক্তার। বুঝেছি, আমাদের কথাবার্ত্তাগুলো—

মেয়র। ওকে আপনারা যে নামই দিন না কেন—গুণ সমানই থাকে!

সম্পাদক। আমরা যা করলুম সেটা কিন্তু মোটেই নাটক নয়।

মেয়র। সে তো আমরা আগেই জানি।

ক্রিটিক। মিস বেঙ্গল, আর মিঃ ডিরেক্টার! এমন সুন্দর দ্বৈতনৃত্য আর কখনও দেখিনি!

মেয়র। কনগ্র্যাচুলেশনস্‌ অধ্যাপক! আপনার বীররসের ভূমিকা অনবদ্য!

অধ্যাপক। জয় ১৯০৫! এতদিনে লোকে আমাকে বুঝতে পারছে!

রিপোর্টার। আপনি কি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক?

অধ্যাপক। দেখে কি মনে হয়?

রিপোর্টার। আমি আড়াই কাঠা জমির উপরে তেতোলা একখানা বাড়ী তৈরি করবো—ক'হাজার ইট লাগবে বলতে পারেন?

অধ্যাপক। আমাকে এ প্রশ্ন কেন?

রিপোর্টার। আমি তো শুনেছি—বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা এ বিষয়ে সবাই বিশেষজ্ঞ।

মেয়র। বাংলাদেশ যদিও হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা বলে গ্রহণ করবে না, কিন্তু আপনার থিওরিটা মান্‌তে রাজি আছে।

রাজনীতিক। এর চেয়ে বেশী আর কি আমি আশা করতে পারি। কংগ্রেসও এর বেশী আশা করে না—সে ইংরেজকে বলছে—স্বাধীনতা দাও আর নাই দাও—অন্তত দেবে বলে মুখে একবার স্বীকার কর।

মেয়র। আমি এই পদকটি বিদূষকের ভূমিকায় শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের জন্য সম্পাদক মহাশয়কে উপহার দিতেছি।

সম্পাদক। আমি বিদূষকের ভূমিকায় অভিনয় করতে যাবো কেন?

ক্রিটিক। ঠিক! আপনি অভিনয় করতে যাবেন কেন? ওটাই আপনার স্বাভাবিক ভূমিকা।

সম্পাদক। দাঁড়ান ভেবে দেখি—আমাকেই বিদূষক বললেন নাকি?

ক্রিটিক। বলা আর না বলাতে কি আসে যায়!

মেয়র পিন দিয়া সম্পাদকের বুকে আঁটিয়া দিলেন

মেয়র। বীবরসের জন্য অধ্যাপক মহাশয়কে এই পদক, আর করুণরসের জন্য রাজনীতিককে এই পদক উপহার দিতেছি।

তাহাদের বুকে আঁটিয়া দিলেন

ডাক্তার। আমাদের আলাপ-আলোচনাকে কি অভিনয় বলে মনে হচ্ছিল?

ক্রিটিক। মোটেই হচ্ছিল না, সে-ই তো ওব বৈশিষ্ট্য। দেখুন না কেন, সাধাবণ লোকের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে অভিনয় বলে মনে হয, আর আপনাদের অভিনয়কে সাধাবণ জীবনযাত্রা বলে মনে হচ্ছিল—

ডাক্তাব। আমাকে বেশী বিরক্ত করবেন না। আমি ডাক্তার! আপনাকে খুন করে ফেললেও আপনারই দোষ হবে। পোস্ট-মর্টেম-এ প্রমাণ হবে, হয় আপনার হার্ট দুর্ব্বল ছিল, নয় তো লিভার পচে গিয়েছিল!

মিনি। (অভিনেতা-দলের প্রতি) আপনার দয়া করে আসুন—ওই ঘরে আপনাদেব বসবাব জাযগা হয়েছে।

অভিনৈতাবা যাইতে আবম্ভ কবিল—হঠাৎ বাহিব হইযা ফিরিযা আসিযা সম্পাদক বলিল

সম্পাদক। মশাযবা, আমাকে ঠাট্টা কবলেন কি-না বুঝতে পাবছি না। বাড়ী ফিবে গৃহিণীব সঙ্গে একবাব আলোচনা কবব--যদি ঠাট্টা বলে মনে হয়—তবে হাঁ, দেখতে পাবেন।

মেযব। কি দেখব?

সম্পাদক। কালকেব কাগজেব সম্পাদকীয স্তম্ভটা একবাব দেখবেন—এবাবে স্তম্ভিত হয়ে যাবেন—।

প্রস্থান

মেযব। নাঃ, সম্পাদকেব বিরুদ্ধে কিছু বলা উচিত হযনি। সামনেই আমাব ইলেকসন্ --

প্রকাশক। ঠিক বলেছেন—পুস্তক-পবিচয নাম দিযে আমাব প্রকাশিত বইয়ের যে বিজ্ঞাপনগুলো বেব হয়—এর পবে হয়তো তা হবে না।

ক্রিটিক। ওহে রিপোর্টার! ওগুলো চেপে দিও।

বিপোর্টার। বলাই বাহুল্য, আমারও প্রাণের ভয আছে।

মিনি ও মিনিব প্রণযীব প্রবেশ

মেযর। মিস সোম, এইবার বলুন নাটকটার লেখক কে?

ক্রিটিক। যেই হোক, সে একজন গ্রেট ড্রামাটিস্ট্।

মেযর। গ্রেট ড্রামাটিস্ট্! সর্ব্বনাশ!

ক্রিটিক। চমকিয়ে উঠলেন কেন?

মেযব। চমকাবো না? আমার তো আর রাস্তা নেই।

ক্রিটিক। রাস্তা? কিসেব?

প্রকাশক। পালাবাব?

মেয়র। না মশায়। বাংলা দেশে কেউ গ্রেট কিছু হয়েছে কি, আমার দুর্ভাবনা উপস্থিত হয়। এইবারে সবাই বলবে, তার নামে একটা রাস্তার নামকরণ করে দাও! এখন বাংলা দেশে প্রতি বছরে ডজনখানেক গ্রেট ম্যান্ বেরুচ্ছে—এত রাস্তা আমি পাই কোথায়? হায়! হায়! সামনে আবার ইলেকসন্ আসছে!

অত্যন্ত মুহ্যমান হইয়া বসিয়া পড়িলেন

মিনির প্রণয়ী। আপনি বৃথা ভয় করছেন—এর কোন লেখক নেই।

প্রকাশক। লেখক নাই। তার মানে?

ক্রিটিক। মানে অত্যন্ত স্পষ্ট। বেদ যেমন অপৌরুষের—এ নাটকও তেমনি অপৌরুষের! স্বর্গীয় প্রেরণা ব্যতীত এমন জিনিষ লেখে কার সাধ্য?

প্রকাশক। ওসব বুঝিনে! লেখক নেই তো নাটক এলো কোথা থেকে?

মিনি। এ তো মোটেই নাটক নয়।

প্রকাশক। হাঁ—নাটকের নাম তো তাই বটে।

মিনি। নাটক কোথায় দেখলেন?

মিনির প্রণয়ী। ওটা যে নাটক তা কে বললে?

প্রকাশক। তার মানে?

মিনির প্রণয়ী। ওঁরাও আপনাদের মত অতিথি। আপনারা ছিলেন উইংসের আড়ালে—ওঁরা ছিলেন ষ্টেজের উপরে—এইটুকু বা প্রভেদ!

মিনি। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিলেন—আপনারা তাকেই নাটক বলে মনে করেছেন।

মিনির প্রণয়ী। আপনাদের সঙ্গে পরিহাস করেছি—সে অপরাধ মার্জনা করবেন।

প্রকাশক। আপনাদের কোন্‌টা যে পরিহাস, তা ঠিক বুঝতে পারছি না।

ক্রিটিক। ইম্‌পসিব্‌ল্! অমন পারস্-পেকটিভ্ জ্ঞান! আর বলছেন ওটা নাটক নয়।

মেয়র। (সোল্লাসে লাফাইয়া উঠিয়া) সার্টেন্‌লি নাটক নয়। আঃ! বাঁচা গেল! আমার আর রাস্তা নেই।

প্রকাশক। আমাদের সকলকে বোকা বানিয়ে দিলেন!

মেয়র। তাই বলে আমরা কম আনন্দ অনুভব করিনি। কি বলেন ক্রিটিক?

ক্রিটিক। আনন্দ অনুভব করেছিলাম বটে! কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আনন্দ অনুভব করা উচিত হয়নি!

মেয়র। কেন?

ক্রিটিক। ওটা যে মোটেই নাটক নয়।

মিনির প্রণয়ী। মাফ করবেন—নাটক হলেই আনন্দ অনুভব করতে পারতেন না।

ক্রিটিক। কেন?

মিনির প্রণয়ী। বাংলা থিয়েটারে নাটক বলে যা দেখে থাকেন তা সার্কাস, ভোজবাজি

আব যাত্রাব তে-আঁশলা অপসৃষ্টি। এদেশে এতদিনে বড জোব ফ্যামেচাব নাটকেব যুগ উপস্থিত হযেছে—ব্যবসাযী নাটকেব যুগ আসতে এখন অনেক বিলম্ব।

মেযব। তাই বলে আমবা কম আনন্দ পাইনি।

বিপোর্টাব। আঃ। সব বাংলা নাটকই যদি এমন হত।

ক্রিটিক। ওহে বিপোর্টাব, আমাব মতামত যা প্রকাশ কবেছিলাম সেগুলো চেপে দিও।

মিনি। দযা কবে সকলে ওঘবে চলুন—খাবাব জাযগা হযেছে।

সকলে চলিতে আবম্ভ কবিল

মেযব। মিস সোম, মাঝে মাঝে এই বকম চিত্তবিনোদনেব ব্যবস্থা আছে বলেই এত বড নগবেব দাযিত্ব পালন সম্ভবপব হয।

প্রস্থান

ক্রিটিক। (স্বগত) আমাব আনন্দ অনুভব কবা উচিত হযনি।

বিপোর্টাব। সব নোট কবে নিযেছি। কেবল দেযালগুলো ক'ইটেব গাঁথুনি—বুঝতে পাবলাম না।

প্রস্থান

বাকি সকলেব প্রস্থান

পাশেব দবজা দিযা মিনিব মাযেব প্রবেশ

মিনিব মা। না০, সব গেল কোথায? আজ আবাব সেই ব্যথাটাও বেশি কবে পেযে বসেছে। ও হবিচবণ, কোথায গেলি বাবা? এদিকে একবাব আয না।

মিনিব প্রণযীব প্রবেশ

মিনিব প্রণযী। কি হযেছে মাসিমা?

মিনিব মা। তোমাকে কি যেন একটা কথা বলবো বাবা। এখনি ভাবলাম—আব এখুনি মনে পডছে না।

মিনিব প্রণযী। আব বলতে হবে না—আমি বুঝে নিযেছি—এই নিন জাম্বক।

এই বলিযা পকেট হইতে জাম্বকেব কৌটা বাহিব কবিযা দিল

মিনিব মা। এই দেখ। ঠিক এই জন্যই মনটা ছট্‌ফট্ কবছিল—বুঝতে পাবছিলাম না।

মিনিব প্রণযী। চলুন উপবে যাওযা যাক।

মিনিব মা। চল তো বাবা।

উভযেব প্রস্থান

মিনিব পবেশ

মিনি। কোথায গেল?

মিনিব প্রণযীব প্রবেশ

মিনির প্রণয়ী। এই যে!

মিনি। কোথায় গিয়েছিলে?

মিনির প্রণয়ী। মাসির সঙ্গে উপরে। মিনি'

মিনি। এতক্ষণ তো বেশ কথা বলছিলে! এখন আবার কথায় ও কি রকম সুর লাগলো—

মিনির প্রণয়ী। বেসুরো তো লাগবেই! চুক্তিপত্রের আমায় অংশ সুসম্পন্ন করেছি—এবার তোমার অংশের পালা কি-না!

মিনি। আমার অংশটা আবার কি?

মিনির প্রণয়ী। এরই মধ্যে ভুলে গেলে! আমার সেই কথাটা শুনবে কথা ছিল।

মিনি। কথা তো ছিল, কিন্তু আজ থাক না—রাত অনেক হয়েছে।

মিনির প্রণয়ী। রাতের অন্ধকারেই তো সে কথা মানায়।

মিনি। অন্ধকারে মানায়? ভূত নাকি?

মিনির প্রণয়ী। না, চাঁদ। সে-কথা চাঁদের আলোতেই বলবার মত; যে শুনবে তার মুখখানি দেখা যাবে, অথচ কানের ডগা দুটি রক্তিম হয়ে উঠলে দেখা যাবে না—এমন আলো তো শুধু চাঁদেরই আছে।

মিনি। এত আয়োজন চাই তোমার ওই একটি কথার জন্যে।

প্রণয়ী। চাই বই কি। আর সেই জন্যই তো অপেক্ষা করতে পারিনে। সেকালের সৌভাগ্যবানদেব মত যদি যাট হাজার বছর পবমায়ু হত তা হলে কি এত তাড়া ছিল! দশ হাজার বছরের মহাকাশে আমার সেই কথাটি অদৃশ্য নীহারিকারূপে বিছিয়ে দিতাম—আর কখন্ যে তার অলক্ষ্য উত্তরীয়ে তুমি বাঁধা পড়ে যেতে—তা নিজেই জানতে না। এ যে বাঙ্গালীর পরমায়ুর সাড়ে বাইশ বছব— যা পনেরো আনাই যায় স্কুল, কলেজ, আর অফিসের মরুভূমিতে! সেই জন্য অপেক্ষা করতে পারিনে—তুমি রাগবে জেনেও পারিনে।

মিনি। এত কথা না বলে সেই আসল কথাটি বললেই হতো না--

প্রণয়ী। ঠিক কথা মনে করিয়ে দিয়েছ (কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া)। মিনি...মিনি.. (কাশিয়া লইয়া) আমি...আমি...

এমন সময দেয়ালের ঘড়িতে টং টং কবিয়া দশটা বাজিল

দেখলে মিনি, বিশ্বসুদ্ধ সবাই আমার ওই একটা কথা বলবার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। হঠাৎ ঠিক এই সময় ঘড়িটা বাজবাব কি দরকাব ছিল?

মিনি। ঘড়িটা মনে করিয়ে দিল তার মত সময়নিষ্ঠ হও—

প্রণীয়। সময়নিষ্ঠা কেন? তাড়াতাড়ি বলবার জন্য?

মিনি। না, রাত হয়েছে বাড়ী ফিরবার জন্য।

প্রণয়ী। (হঠাৎ মনোভাবে পরিবর্ত্তন ঘটিল) ঠিক কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। ধন্যবাদ মিস্ সোম, রাত হয়েছে, বাড়ী চল্লাম।

মিনি। (অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া) শোন, শোন, ফিরে এস, শুনে যাও।

বিমর্ষ হইয়া বসিয়া পড়িল
সে মাথায় হাত দিয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

মিনি। আজকের দিনে সবাইকে সুখী করলাম—কেবল ওকেই কষ্ট দিলাম। ওকে দেখলেই আমার কষ্ট দিতে ইচ্ছা করে।

হঠাৎ সে গালে হাত দিতেই এক ফোটা জল তার হাতে
ঠেকিল—সে চমকিয়া উঠিল

এ কি! তবে কি আমি ওকে ভালবেসে ফেলেছি?...

এমন সময় পাশের দ্বার দিয়া মিমির মা প্রবেশ করিল . সে
মিনির 'ফেলেছি' শব্দটা কেবল শুনিতে পাইযাছে

মা। এত রাত্রে আবার কি ভেঙ্গে ফেল্‌লি মা!

মিনি কিছু না! কিছু না! একটা ফুলদানি ভেঙ্গে ফেলেছি! তুমি আবার এত রাতে উঠে এলে কেন? কালকে ব্যথা বাড়বে—সে আমাব ভোগান্তি—যাও শোওগে—

তাডা খাইযা তাহাব মা প্রস্থান কবিল ; মিনি দবজাটা বন্ধ করিযা দিল

মিনি। মা'কে নিয়ে মহা মুস্কিল...

এমন সময অন্য দ্বার দিয়া মিনির প্রণযীর প্রবেশ

প্রণীয়। সবি মিস্ সোম্ ছডিখানা ফেলে গিয়েছিলাম।

মিনি গিযা দরজাটা বন্ধ করিযা দিল

মিনির প্রণয়ী। ও কি?

মিনি। আমার একটা কথা বলবার আছে—শুনতে হবে।

মিনিব প্রণযীব অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ভাব—না জানি কি ফাঁসিব হুকুম শুনিবে

প্রণযী। (সঙ্কোচে ও ভয়ে) কি বল?

মিনি। (দ্বিধার ভাবটা কাটাইবাব জন্য দ্রুত ও উন্মাদের মত) ভালবাসি! ভালবাসি! ভালবাসি!

প্রণীয়। (ভীষণ ভীতভাবে) কা'কে?

মিনি। তোমাকে! তোমাকে! তোমাকে! এবার তোমার কি কথা শুনি।

প্রণয়ী। আমি? আমি ..আমার...মানে। ওই কথাই.. কিন্তু...আচ্ছা মিনি, আমি সে কথাটা কতদিন বলতে চেষ্টা ক'রেও পারিনি—তুমি এমন সহজে তা বললে কি ক'রে?

মিনি। কারণ, তোমরা নির্ব্বোধ! মেয়েদের ভালবাসা তীরের মত সোজা গিয়ে লক্ষ্যে বেঁধে। আর পুরুষদেব ভালবাসা বুমেরাং-এর মত বাতাসে গোলকধাঁধা সৃষ্টি করতে করতে এগোয়—শেষে লক্ষ্য পর্যন্ত গিয়ে আবার তোমাদের কাছেই ফিরে আসে! অমন উদ্বিগ্ন হ'চ্ছ কেন?

মিনির প্রণয়ী। তোমার ঘড়িটার কথা মনে করে। প্রতি সেকেণ্ডে মনে করিয়ে দিচ্ছে বাড়ী ফিরতে হবে—সময় নেই।

মিনি।　সময় নেই—সময় নেই, একশবার সময় নেই। জীবনে আর কোন কাজেরই যথেষ্ট সময় নেই। কেবল একটুখানি ভালবাসবার সময় আছে—

প্রণয়ী।　তা হ'লে?

মিনি।　তা হ'লে এই নাও—দুটি ফুল, লাল আর শাদা—

এই বলিযা খোঁপা হইতে দুটি ফুল খুলিয়া তাহার হাতে দিল

প্রণয়ী।　আর কিছু দিলে না?

মিনি।　মানুষে সব সময়ে সব কথা বলতে পারবে না জেনেই ভগবান ফুলের সৃষ্টি করেছিলেন। আর যা কিছু বলবার ওরাই বলবে।

প্রণযী ফুল দুটি লইযা একত্র জড়াইয়া বাঁধিতে বাঁধিতে দু ছত্র গান গাহিল

প্রণয়ী।　লালফুল সখী জীবন আমার
শাদাফুল সখী মরণ মোর,
জীবনমরণ যুগল করিয়া
রাখিলাম এই চরণে তোব।

মিনি।　গানটাব স্বত্ব যেন কোন্ প্রসিদ্ধ কবির।

প্রণয়ী।　তাদের স্বত্ব লেখা পর্যন্ত। গানের আসল মালিক—যাদেব প্রয়োজন তারা—

মিনি।　চল, অনেক রাত হয়েছে; তোমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি

উভযেব প্রস্থান

যবনিকা

*আষাঢ়, ১৩৪৫*

# বহুরূপী

## মন্মথ রায়

(এক দৃশ্যের কথানাট্য)

[ মৃত্যুশয্যায় শয়ান সুধীর রায়। সুধীর অচেতন। পার্শ্বে ডাক্তার। শিয়রে সুধীরের স্ত্রী তরলা। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। ]

তরলা। কেমন বুঝছেন ডাক্তার বাবু?

ডাক্তার। শুধু লক্ষ্য রাখবেন কোন কারণেই যেন মনে এতটুকু আঘাত উনি না পান...ওঁর খেয়াল মত চলবেন, যখন যা চান...দেবেন...।

তরলা। যখনি জ্ঞান হচ্ছে তখনি শুধু জিজ্ঞেস করছেন, মা কই, খোকা কোথায়? রাণীকে আসতে লিখেছ? বিরজা কি ভুলেই গেল?...এই সব। ...কি হবে ডাক্তার বাবু?

ডাক্তার। খোকাকে নিয়ে আপনার শাশুড়ীর আজ রাত্রেই তো পৌঁছবার কথা ছিল...এখনো এলেন না কেন?

তরলা। ট্রেন ফেল হয়েছেন হয় তো!...কিন্তু সে কথা ওঁকে এখনো জানাইনি।...রাত দুটোর গাড়ীর অপেক্ষায় বসে আছি।

ডাক্তার। খোকা বুঝি আপনাদের ঐ একই সন্তান?

তরলা। হাঁ ডাক্তার বাবু, সে তার ঠাকুরমার সঙ্গে দেশের বাড়ীতে থেকে পাঠশালায় পড়াশুনা করে, ওরা দুজনে কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না। শাশুড়ীও বাড়ী ছেড়ে এখানে আসতে চান না...দেশে গৃহদেবতা ঠাকুর-সেবা নিয়ে পড়ে আছেন।

ডাক্তার। রাণী কে?

তরলা। ওঁর দেশের বাড়ীর এক প্রতিবাসিনীর মেয়ে। সে অনেক কথা...ছোটবেলার খেলার সাথী।...দুজনে বর-কনে সেজে খেলতেন।...কিন্তু...পরে আর সত্যি করে বিয়ে হওয়া ঘটল না...।...রাণীর বাবা টাকার মায়ায় ভুলে এক বুড়ো জমিদারের হাতে রাণীকে সঁপে দিলেন। ...আর...উনি রাগ করে বিনাপণে বিনা যৌতুকে এক কালো মেয়ে বিয়ে করে বসলেন। আমি ওঁর সেই বৌ!...কিন্তু সেই রাণী বিয়ের বছরেই বিধবা হয়ে বাপের বাড়ী ফিরে এল।...উনি চাকুরি নিয়ে পাটনায় চলে এলেন।

ডাক্তার। আর ঐ বিরজা?

তরলা। জানিনে ডাক্তার বাবু, জানিনে... [ক্ষণেক থামিয়া] ... জানি ডাক্তার বাবু জানি!...কিন্তু ঐ যে...আবার বুঝি জ্ঞান হচ্ছে...

সুধীর। তরলা!

তরলা। [ সুধীরের হাত দুখানি হাতে লইয়া সস্নেহে ] ...কি?

সুধীর। ও কে?

তরলা। ডাক্তার বাবু।

সুধীর। আমি ওষুধ খাবো না।...ডাক্তার, তোমার ওষুধ আমি ফেলে দিয়েছি।...তুমি এখান হতে পালাও বলছি...

ডাক্তার। [ বিনা বাক্যব্যয়ে কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন ]

সুধীর। মাকে ডাক...

তরলা। এখনো তো দুটো বাজে নি...

সুধীর। কত বাকী?

তরলা। আরো আধ ঘণ্টা।...এখন না হয় ঘুমাও... ঘুম হতে জেগে উঠলেই তাঁদের দেখতে পাবে....তাঁরা এলেন বলে...

সুধীর। ....তারা?

তরলা। মা আর খোকা—খোকার কথাটি বুঝি ভুলেই গেছ?

সুধীর। আমার দুষ্টু খোকা আমার পাজী খোকা... আসবে?... সেও আসবে?

তরলা। বাঃ... সে আসবে না? বল কি?

সুধীর। ওরে... সে যদি ট্রেনের জানলায় মুখ বাড়িয়ে দিতে গিয়ে চলতি গাড়ী হতে ছিটকে নীচে পড়ে যায়!... সে যেন আসে না... সে যেন আসে না...না...না..না...

তরলা। মা তাকে কড়া পাহারা দিয়ে নিয়ে আসছেন..কোনো ভয় নেই...। তাকে কিন্তু চুমু খাবো আগে...আমি।...হাঁ—

সুধীর। আমার দুষ্টু খোকা...আমার পাজী খোকা...ছুটে এসে লাফিয়ে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে! তুমি তখন মাকে প্রণাম কবতে ব্যস্ত থাকবে...পাবে না...পাবে না...খোকাকে পাবে না!

তরলা। ...কিন্তু মাকে তবে আমিই আগে প্রণাম করছি...তুমি পাচ্ছ না...

সুধীর। ...সেই ফাঁকে,...যদি রাণী আসে...তবে, সেই ফাঁকে...রাণী আমারি কাছে আগে চলে আসবে...আসবে কি না?...

তরলা। [ নীরব রহিলেন। ]

সুধীর। কি?...রাণী কি তবে আসছে না?

তরলা। [ নীরব রহিলেন। ]

সুধীর। রাণীকে তবে আসতে লেখো নি?

তরলা। লিখেছি।

সুধীর। তবে সে আসবে। আসবে, সে আসবে। নিশ্চয়ই আসবে। আসবেই আসবে। হাঁ...সে...না এসে পাবে না!

তরলা। একটু বেদানার রস দি?

সুধীর। ওরে রাণী...ঘোষেদের বাগানে লিচু যা পেকেছে...।...দেখলে তোর মুখ জলে ভরে যাবে..কথাটি কইতে পার্ব্বি নে....আয়...চলে আয়...

তরলা। [ পাখা করিতে লাগিলেন। ]

সুধীর। আর তোর জন্য এই জামরুল এনেছি।... পদ্ম? আজ পারি নি ভাই...কাল যাব।

দীঘির মাঝখানে নীলপদ্ম আছে স্বপ্ন দেখেছি...নিবি ভাই নিবি? যাবি ভাই যাবি?...আয় রাণী আয়। চল রাণী চল! ছুটে আ—য়! ছুটে আ—য়! [ বোধ করি ঘুমাইয়া পড়িলেন। ]

ডাক্তার। [ কক্ষান্তর হইতে প্রবেশ করিয়া ] ঘুমিয়েছেন?

তরলা। বুঝছিনে!

ডাক্তার। থাক্। কিন্তু...আপনি একলাটি আর কত রাত জেগে রইবেন?

তরলা। এ তো আজ নতুন নয় ডাক্তারবাবু!

ডাক্তার। দুটো বাজতেও তো আর বিলম্ব নেই...যাব আমি ষ্টেসনে?

তরলা। কেউ গেলে ভালো হ'ত..., কিন্তু আপনাকে তাই বলে যেতে বলতে পারি নে...যেতেও দিতে পারিনে...

ডাক্তার। তার মানে আপনাব বড় ঈর্ষা। আপনার স্বামীকে আর কেউ ভালোবেসে সেবা করুক...বা তার বিপদে তার কাজে লাগুক এটা আপনি সহ্য কর্ত্তে পারেন না!...কিন্তু দেখুন...সুধীর আমার প্রতিবাসী বন্ধু...আপনার সঙ্কোচের কোনই আবশ্যক নেই। ...আমি চললুম।...আলোটা কমিয়ে দিন.. ওঁর চোখে ওটা বড্ড বেশী লাগে। নমস্কাব—

[ডাক্তার চলিয়া গেলেন।...তরলা উঠিয়া প্রদীপটি খুব ছোট করিয়া দূরে রাখিয়া আসিলেন। একটা জানলা দিয়া খানিকটা জ্যোৎস্না মেজেতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। আলোছাযার আবছায়াতে মৃত্যু-শয্যা রহস্যময় হইয়া উঠিল।...তরলা আর একটা জানলার পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন। সেখানটা অন্ধকাব। তরলাকে ভালো করিয়া দেখাই যাইতেছিল না।]

সুধীর। কে...বিরজা?...এসেছে? এসো!...কিন্তু...কেন এলে তুমি?...তরী যে এখনো ঘুয়োয় নি!...তাঁর ওপর মা এসেছেন!...পালাও তুমি পালাও!...না গো না...ভালোবাসি...সত্যি. .এই মর্ত্তে বসেও সে কথা বলছি।...কিন্তু...তরী কি বলবে...কি? চুমো?...শুদ্ধ...একটি চুমো?...তবে চট্ করে চলে এস...তরী ও-ঘরে রয়েছে...এই ফাঁকে...এই ফাঁকে...দাও...একটি চুমো দাও...মরণের পথে ঐ একটি চুমো আমার বড় ভালো লাগবে. .হাঁ...আমাব চোখে তোমার ঐ পাতলা ঠোঁটে একটি ছোট্ট চুমো দাও...

[চুম্বন শব্দ] আঃ আঃ আমার চোখ জুড়িয়ে গেল!...একি! তুমি কি কাঁদছ?...কেঁদো না...শব্দ কোরো না...পালাও...পালাও...শীগ্‌গীর পালাও .

[ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিল।]

...ঐ দুটো বাজ্‌ল। মা! মা!...কোথায় আমার মা! ওগো আমাব মা!. .কোথায মা, তুমি কোথায়? শীগ্‌গীর এস...কোলে নাও আমায়...আমার হয়ে এসেছে...বড় জ্বালা...কোথায় তুমি!...একটি চুমো দাও মা...একটি চুমো দাও।...কই?...কোথায় তুমি? ..আমি যে চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে!...গেলুম মা, গেলুম! তোমার একটি চুমো পেলে আমি বেঁচে যাব...আবার বেঁচে উঠব...আবার সারব...আবার হাসবো...আবার আঁপিস কর্ব্ব...আবার টাকা রোজগার কর্ব্ব...আবার তোমার পায়ে টাকা ঢেলে দেব। কোথায় তুমি...তবে কি তুমি আসো নি! ...তবে কি...তবে কি...আমি স্বপ্ন দেখছি.. ও—হো—হো...কোথায় তুমি...কোথায় তোমার হাত দুখানি...কোথায় তোমার মুখখানি ..কোথায় তোমার ঠোঁট্ দুটি...কোথায় তোমার আদবের একটি চুমো? [চুম্বন শব্দ] আঃ...ওগো আমাব লক্ষ্মী মা। একটি চুমু দিয়ে ..তুমি আমায় আজ

বাঁচালে...আমার প্রাণ জুড়িয়ে গেল! আমার ঘুম পাচ্ছে...খোকা আসে নি? ...দেখো...তাকে সামলে রেখো...ঘরের নীচেই পুকুর...কিন্তু ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে!...ত— র—লা! আমি ঘুমুলুম...তুমি শুধু খোকাকে নিয়েই থেকো না...মার কাছে এস...ওরে খো—কা! ...তুই এখন ঘু—মি—য়ে পড়...কাল সকালে জেগে দুজনে গল্প করব...বাঘের গল্প...চোরের গল্প...তেপান্তরের মাঠে ডাকাতের গল্প...সাত ভাই চম্পার গল্প...আমার রাণীর গল্প...সেই ঘু—মি—য়ে—প—ড়া রা—জ—রাণীব গ—ল্প! [আবার অচেতন হইলেন।]

*　　　*　　　*

[দরজায় মৃদু করাঘাত হইতে লাগিল। আলো বাড়াইয়া দিয়া তরলা দরজা খুলিলেন। ডাক্তার ঘরে ঢুকিলেন।]

তরলা। খোকা কই? মা কই?

ডাক্তার। —বলছি...

তরলা। বলুন...শীগগির বলুন—

ডাক্তার। সুধীর আর জেগেছিল?

তরলা। আপনি বলুন শীগগির...তাঁরা কোথায়?

ডাক্তার। সুধীর আর জেগেছিল?

তরলা। জেগেছিলেন...কিন্তু...তবে কি তাঁরা এ ট্রেনেও আসেন নি?

ডাক্তার। সুধীর জেগে কি তাঁদের কথা জিজ্ঞেস করেছিল?

তরলা। ডাক্তাব বাবু! ডাক্তার বাবু!

ডাক্তার। তারা আসে নি!

তরলা। আসে নি?

ডাক্তার। না—!

তরলা। সর্ব্বনাশ! তবে উপায়? এবার জাগলে...কিম্বা...ভোর হলে..কি বলব? ...আম কি বলব?

ডাক্তার। এর পরের গাড়ী কটায়?

তরলা। সকাল বেলায়! ...ডাক্তার বাবু...আপনি এই মুহূর্ত্তে আপনার বাড়ী ফিবে যান। ...আমার কথা রাখুন। ...যদি আপনার রোগীকে অন্ততঃ এই রাতটুকু বাঁচিয়ে রাখতে চান...তবে আপনি অবিলম্বে বাড়ী ফিরে যান...

ডাক্তার। সে কি!...আপনি একলা!

তরলা। হাঁ...আমি একলা...একাকী...ঐ মুমূর্ষুকে শান্তি দিতে পার্ব্ব...আপনি তাতে বাধা দেবেন না...আপনি যান...আমি আলো নিবিয়ে দিলুম...[দীপ নির্ব্বাণ]

ডাক্তার। [আর তাহার সাড়া পাওয়া গেল না। তিনি চলিয়া গেলেন। তরলা সশব্দে দুয়ার বন্ধ করিলেন।]

সুধীর। মা!

[উত্তর হইল "এই যে আমি!"]

*কার্ত্তিক ১৩৩৪*

# কবিতা

## অস্ফুট

### কুমুদরঞ্জন মল্লিক

ফুটে, গন্ধ বিলিয়ে যারা পড়্‌লো ঝ'রে পড়্‌লো গো,
তাদের লাগি আকুল সারা কুঞ্জ রে;
গন্ধ বুকে বন্ধ ক'রে না ফুটে যে ঝর্‌লো গো,
তাদের তরে কই না ভ্রমর গুঞ্জরে।

২

পালিয়ে গেল যে পিক, ক'রে সুধার ধারা বৃষ্টি গো,
হয় যে সে সুর শতেক-প্রাণে ঝঙ্কৃত,
না গেয়ে যে পড়্‌লো লুটি', বিফল কি তার সৃষ্টি গো;
কোথায় ব্যথা রয় বা তাহার অঙ্কিত?

৩

যে বীজটী হ'য়ে গড়্‌লো তরু, সফল তাহার জন্ম গো,
হারিয়ে গেল বিরাটমাঝে ক্ষুদ্র সে:
বুঝ্‌বে কে তাব গুপ্ত-ব্যথা, বুঝ্‌বে কে তার মর্ম্ম গো,
ক্ষুদ্র ক'রে রাখলে যে তাব রুদ্রকে?

৪

হয়ে রাজার পুত্র, সে যে রইল হ'য়ে ভৃত্য গো,
পর্ণবাসে কাট্‌লো জীবন দুঃখেতে,
গাণ্ডীবী হায় বৃহন্নলা রইল ল'যে নৃত্য গো,
তূণীর তোলা রইল শমীবৃক্ষেতে।

৫

শ্রীবৎসরাজ বইল মিশে কাঠুরিয়াব সঙ্গে গো,
নলরাজের কাট্‌লো জীবন রন্ধনে,
কৌস্তুভে হায় চিন্‌লে না কেউ, উঠল না শ্রীঅঙ্গে গো,
চন্দন হায়, লাগ্‌লো ধরার ইন্ধনে।

৬

রইল হ'য়ে খেলার ধনুক হরের পিণাক চণ্ড গো,
পাঞ্চজন্য ক্ষুদ্র পাণিশঙ্খ যে;
শ্যামের বাঁশী রইল প'ড়ে হ'য়ে বাঁশের খণ্ড গো,
মহাপদ্ম রইল ঢাকা পঙ্কতে।

৭

ত্রিদিব-পারিজাতের কুঁড়ি শুকিয়ে গেল বৃন্তে গো,
স্বর্ণমরালকণ্ঠে ছিল পত্রটী;
অমৃতের সে বার্ত্তাবহ, নার্‌লে তারে চিন্‌তে গো,
পেলে না তার পড়্‌তে লিপির ছত্রটী।

৮

সে যে কালের জতুগৃহে দারুণ তাপটা সইলো গো,
কর্‌লে নাকো দিনেক তরে রাজ্যভোগ;
বিরাটগৃহে ক্ষুদ্র হ'য়ে রইল সে যে বইল গো,
জীবনে আর আস্‌লো না কই ইন্দ্রযোগ।

*পৌষ, ১৩২২*

# আদর

## কিরণধন চট্টোপাধ্যায়

ওরে পরাণ প্রিয়। ওরে অমিয় মাখা। তুই কল্পলতা। তুই মর্ত্ত্যে পরী।
ওরে নয়ন মণি। ওরে নয়নে-রাখা। দিলি তৃপ্তি প্রাণে সুখ শান্তি ভরি।
ওরে চাঁদের আলো। ওরে ফুলের হাসি। তুই মিষ্টি মধু। তুই সৃষ্টি সেরা।
আমি বোঝাব কিসে?—তোরে কী ভালবাসি, দিল রোশনী করা আরে দোস্ত মেরা।
বুকে হৃদয়ে আঁকা। ওরে আমরি মরি
ওরে পরাণ প্রিয়। ওরে অমিয় মাখা। তুই কল্পলতা তুই মর্ত্ত্যে পরী।

তোর উজল আঁখি কালো কাজল পরা তুই প্রলয় শিখা। তুই মলয় হাওয়া।
যেন সজল মেঘে থির দামিনী ভরা। —লাখো মালতী যূথী প্রাণে ফুটিয়ে যাওয়া
পাড়ে ডালিম ফেটে রাঙা গোলাপী গালে। মেশা অমৃতে বিষে ওরে হীরের ছুরি।
নাচে চরণ দুটি সুরে ছন্দে তালে। তুই মোহের ফাঁসি। তুই মায়ার ডুরি।
প্রাণ পাগল করা মন— দুরন্ত পাওয়া।
তোর উজল আঁখি কালো কাজল-পরা। তুই প্রলয় শিখা তুই মলয় হাওয়া।

তুই সাগর সেঁচা মোর অতুল নিধি। ওরে জীবনে আশা। ওরে মরণে স্মৃতি।
বহু পুণ্যে মোরে তোরে মিলালো বিধি। তোরে ঘিরিয়া গাহে যত কাব্য গীতি।
চির রঙ্গময়ী। তোর সঙ্গসুখে ওরে সোহাগে গলা। পড়া— আদরে গাথে
যতি দুঃখ শত উৎস যুগ্মমুখে। জল চলকে ওঠা চোখে ফুলের ঘায়ে।
ওরে জুড়ানো হৃদি। তুই নতুন নিতি।
তুই সাগর সেঁচা মোর অতুল নিধি। ওরে জীবনে আশা। ওরে মরণে স্মৃতি।

পৌষ ১৩৩৮

# ইস্পাত

### রত্নেশ্বর হাজরা

কঠিন মৃত্যুর তরে উদ্ধত ধারালো এ-সঙ্গীণ ঃ
কে তুমি এখানে? সরিয়ে নাও।
এ সীমান্তে তুমি কি প্রহরী?
কিসের প্রহরী তুমি—শান্তি না যুদ্ধের?

আমার মায়ের কান্না শুনেছ কি।
অন্ধকারে এখনও গ্রামের সীমানা ছেড়ে আসে
বুলেটে রক্তাক্ত বুক লাল হয়ে ভিজে গেছে মাটি।
আমাকে যেতেই হবে আজ।

তোমার সঙ্গীণ নিয়ে দাঁড়াও
চূর্ণ যদি হয় হোক বুক
রক্ত যদি ঝ'রে যায় থাক তবে সীমান্তের এই অন্ধকারে
বিবর্ণ হিমেল রাতে জমে থাক বনের প্রহরে;
একা তবু যাবো আমি
আমি আজ মায়ের সান্ত্বনা।
আমার শিরায় আজ আশ্বিনের ঝড়
প্রহরী তোমার শক্তি থাকে থামাও
বিদ্রূপে চীৎকাবে কিংবা সঙ্গীণে বুলেটে।

*ভাদ্র, ১৩৩৬*

# উজ্জ্বলা

## প্রভাতকিরণ বসু

লিপির মুখে পেয়েছি যার প্রথম পরিচয়,
চোখের দেখা পাইনি আজো তার।
খবর গেছে—আস্‌ছে, বেশী দেরী হবার নয়;
ড্রয়িংরুমে কোমল অন্ধকাব।

ঐ দিকের ঐ পর্দ্দাখানি হঠাৎ যাবে সরে,
দাঁড়াবে সে ঐখানে ঐ চেয়ারখানি ধ'রে,
ঈষৎ হেসে হাত তুলে সে নমস্কাবটি ক'বে
আঁচল টেনে সরিয়ে দেবে হার।

আজ্‌কে তাকে দেখ্‌ব প্রথম, দীর্ঘদিবস ভ'রে
লিপির মধ্যে সঙ্গ পেলাম যার।
চিঠিতে সে বল্‌ত 'তুমি', 'আপনি' হবে আজ,
চার্‌দিকে যে হিতাকাঙ্ক্ষীগণ!

লজ্জানিবারণেব মতন দূব কবেছি লাজ
সাঙ্গ যত প্রণয়-সম্ভাষণ।

খামের মধ্যে গেছে আমার প্রেমের লিপি যত,
জবাবগুলি এসেছে ঠিক অগ্নিবাণের মত,
আজ্‌কে ট্রেনে চ'ড়ে এসে পুরাণো সেই ক্ষত
রক্তধারায় ঝর্‌লো অনেকক্ষণ।

এবারে তার দেখা পেলে বলব—অনুগ্রহ
করো আমায়, ক'রোনা বর্জ্জন।

শব্দ ক'রে ঘড়িব কাঁটা এগিযে চলে আগে,
দ্বারের পথে সজাগ কবি কান।

বাইরে ও কার পায়ের শব্দ বিশ্রীমতন লাগে!
পুরুষ গলা 'মশায় কাকে চান?'

'উজ্জ্বলাকে'—মিষ্টি ক'রেই করুণ ক'রেই শোনাই
কোথায় আলাপ? আপনি কি তার দাদা—আমার বোনাই
'আজ্ঞে না স্যর'—রাগ না ক'রে জানাই অন্যমনাই
চিঠির সূত্রে চেনাশোনার ভাণ।
'চাইনা আমি' বলেন তিনি এসব আনাগোনাই!
'আস্‌বে না সে, আপনি উঠে যান!'

উজ্জ্বলাকে দেখ্‌তে পেলাম জান্‌লা ধ'রে আছে,
টুক্‌রো কাগজ পড়লো মাটির 'পরে।
কুড়িয়ে নিতে হল্‌দে কুকুর এগিয়ে এলো কাছে
লোকটা খাড়া দাঁড়িয়ে সে চত্বরে।

কি লিখেছে—বাইরে গিয়ে দেখ্‌ব মনে ভেবে
এগিয়ে চলি—চাকর এলো লিখনখানি নেবে!

পথের ওপর কাগজ ছিঁড়ে পায়ের তলায় দেবে
ব'লে দিলাম—'নেই তোমাদের ঘরে
কাগজ আমার এখন' দেখি এই ব'লে সংক্ষেপে—
বাতায়নে পর্দ্দা ওড়ে ঝড়ে!

*আশ্বিন, ১৩৫০*

# উদাসী

## দিলীপকুমার রায়

হে উদাসি!
তুমি বল হাসি
"এ ধরার
"ঐশ্বর্য্য সম্ভার
"সবই না ত্যজিলে কভু
"জীবনে বাঞ্ছিত বর নাহি দেন প্রভু"।
বুঝিব কি তবে,
বিসর্জ্জিতে হবে
যাহা কিছু কাম্য, যাহা কিছু প্রিয় ভবে?
এই যদি সত্য হয়, তবে
বল কেন রত্নাকর
ধরে রত্ন থরে থর!—
প্রকৃতির অক্ষয় ভাণ্ডার যদি সবই মিছে মায়া,
কেন তবে এ সৌরভ, গীতি, আলো, ছায়া?
মঞ্জরিত সুষমার রাশি,
কেন বা প্রকৃতি হাসে আলো করা হাসি?
দুহাতে বিলোনো তাঁর অফুরন্ত সম্পদ্ ভাণ্ডার।
বর্ণে, গন্ধে,
গানে, ছন্দে,
ফলফুলে সবুজের প্রান্তর, কান্তার,
অরণ্যানী নানা রঙে রাঙিয়া বিরাজে—
যেন দেবী তৃপ্ত নন নানারূপ মাঝে
আপনারে বিলাইয়া নিতি নব সাজে
রূপে ঢল ঢল
সৌন্দর্য্য-বিহ্বল
নারী সম নিত্য কেন প্রসাধন তাঁর
যদি সবই মিছে ইহা, যদি বৃথা এ জীবন-ভার!
যদি এ জগৎ মাঝে সাধনার, সত্যের মিলন হয় অঘটন,

তবে কেন প্রকৃতির এ বিরাট অপচয় করে মুগ্ধ মন?
কেন তবে যুগ যুগ ধরি এই দুঃখ-তাপ ভাব
রোগ শোক নিরাশার
গুরুভারও স'য়ে শ্লথ চরণবিক্ষেপে চলে ক্লান্ত দেহী আব?
যদি এ জগৎ মায়া, কেন তবে আজিও সে হাসে?
কেন ঢালে সুধারাশি কুসুম সুবাসে,
মলয় বাতাসে,
সদাই অবোধ মন হয় আত্মহারা!
কেন তবে আসা এ জগতে! যদি শুধু পথহারা
চলে লক্ষ লক্ষ হিয়া অন্তবের নিভৃত কামনা
অপূর্ণ বাসনা
শত শত
দীর্ঘশ্বাসি চাপি অবিরত
তবুও বিদ্রোহী প্রাণ তার
কেন বল, জপে বার বার ঃ—
"আছে আশা; সত্য—শুভ; দুঃখ কভু নহেক চরম,
"যাহা কিছু দৃশ্যমান তার অন্তবালে আছে মঙ্গল পরম।
'করুণানিধান কোনও কর্ণধার
"করিবেন পার
"জীবনের দিশেহারা এ পাথারে
"অন্বেষু সবারে।
"যদিও না বুঝি আজ
"মহারাজ,
"তোমার এ রচনার অন্তর্গূঢ় সুর,
"যেন তবু তার রেশ,
"নিখিলেশ,
"স্বপ্ন সম
"চিত্তে মম
"ভেসে আসে মাঝে মাঝে মঙ্গল মধুর
"সে উদাত্ত তালে
"ছন্দে শিল্পে গানে
"বীণার ঝঙ্কারে আর স্নেহ, প্রেমে প্রাণে
"নানা স্রোতে আনে
"ভাসায়ে যখন

"চিব পুবাতন
"কোনও দূব অতীতেব চবম মধুব স্মৃতি,
'এক অসমাপ্ত গীতি,
"হাবায়েছি যদি শেষে
'আজি সে সুবেব বেশে
' সে কেবল আমি আজ বিগত-বৈভব
"বিহীন সৌবভ
"হৃতধন
"এ কাবণ"
—এই কথা বলে খিন্ন মন।

সে বিস্মৃত সুব
উজ্জ্বল মধুব
আব কি গো না বর্ষিবে শান্তি বাবি
হতাশাবহ
মাঝে মম দিশেহাবা অন্তবেতে আজ,
কহ মহাবাজ!
এই কি গো সৃষ্টিব মহান,
গবীয়ান
নিগূঢ় চবম অর্থ? অবোধ পবাণ
তবে কেন মানিতে না চাহে
বলে 'নহে নহে' অন্তর্দাহে?
কেন বা সে কাণে মম বলে বাব বাব :-
"জগতেব মাঝে সাধনাব
"আছে পথ, আছে আছে শুধু আবিষ্কাব
"কবিবাব অপেক্ষায মাত্র আছে বসে
"আছে মোব মানসী প্রতিমা আছে চেযে অনিমেষে
"মোব পানে যুগ যুগ ধবি
'আমাবেই ববি
"নির্মাল্য চন্দনে স্নাত সস্মিত আননে
"আছে যেন শুধু মোব চিনিবাব প্রতীক্ষায, যবে অন্য মনে
"আমি খুঁজিতেছি এই অকূল পাথাবে
"সে ধ্রুব তাবাবে,
"যাব মধু স্পর্শে মোব মন-প্রাণ সমগ্র অন্তব

"উঠিবে গো উছসিয়া যবে দেবে বর
"তাহার কল্যাণ কর;
"রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেইদিন এ চাওয়ার হবে সমাধান
"মুহূর্ত্তেক মাঝে"—বলে প্রাণ।

কিম্বা মোর বৃথা বৃথা আশা এ সকল,
আকাশ-কুসুম সম
নিরমম
সকলই বিফল?
কে বলিবে? কে বলিবে
চাহিলে মিলিবে?
সৃষ্টির আদিম কাল হতে
এ জগতে
বহু উচ্চ প্রাণ হয়ে গেছে নিষ্পেষিত
নিয়তির অবোধ্য নিহিত
নিষ্ঠুর ও কৃপা-হিম ব্যঙ্গ হাস্যে আব
পদে পদে মানুষের শত ভাঙাগড়া সবই করি একাকার।
হে নিয়তি! নিরদয়।
এ বিরাট্ অপচয়
সত্যই কি অর্থহীন,
সবই শূন্যে হবে লীন!
সত্যই কি বৃথা হবে অন্তর্গূঢ় আশা
যাহারে যতনে পালি
হৃদয়ের রক্ত ঢালি
আসিয়াছি এতদিন, শুধুই হতাশা?
পরিণাম সব আশা ভবসার?
সবই কি গো হাহাকার?
এ জগৎ মরীচিকা
অথবা এ প্রহেলিকা
নিদাঘের তপ্ত বক্ষে বর্ষিবে না কভু কি গো সুস্নিগ্ধ আসার?

তুমি কহ হাসি
হে উদাসি ঃ—
"সমাধান চাও যদি ত্যজ এ সংসার

"দুঃখের আধার,
"শোন তবে মূঢ় নর বাণী এ আমার।
"মায়াময় সহস্র বন্ধন আর আকুল কামনা
"নিহিত বাসনা
"বাধা দেয় শান্তিলাভে তব; তাই বৃথা এ কল্পনা
"পরিণামে হবে সবই ব্যর্থ এ জল্পনা
"বৃথা আশা তাই; তবে নূতন আলোক
"চাহ যদি ত্যজ এই অসাব নির্ম্মোক।
"পরম তত্ত্বের অন্বেষণ
"দুর্লভ সে ধন,
"মেলে এক নিরালায়
"অরণ্যানী স্নিগ্ধচ্ছায়
"যেথায় বিরাজে
"নিবিড় আঁধার মাঝে
'সেই প্রাণারাম
"নিত্য অভিরাম
"শাশ্বত সুন্দব
"চির মনোহব
"মানবের হৃদয়েব মানসী প্রতিমা,
"যাঁহার মহিমা
"যুগে যুগে গেয়েছেন ত্যাগী ঋষি কবি,
"যে নির্ম্মল ছবি
"উদাসিযা আসিয়াছে যুগে যুগে প্রেমিক মানবে
"যাঁহারা লভিয়াছেন বিধাতার কৃপা এই ভবে।
"না সম্ভবে
"এই স্বার্থমগ্ন ঈর্ষা-কোলাহল রবে
"মহিয়সী কল্পনাব রাজ্যে বসে; তবে
"কেন মিছে সে প্রয়াস
"কেন সদা দীর্ঘশ্বাস
"আশা-ভঙ্গে ঈপ্সিত বিয়োগে
"রোগ শোক ভোগে?
"বৃথা হেথা অন্বেষণ মানসী প্রতিমা
"যখন এ সীমা
"সান্তেব রাজ্যেতে তারে পাওয়া শুধু আকাশ-কুসুম,

"বৃথা খোঁজ এ সংসারে তাহার মিলন সব ভ্রম ভ্রম ভ্রম।"
সত্যই কি এই সমাধান
হৃদয়ের চিরন্তন প্রশ্নের মহান্?
কেমনে বা কহি হে উদাসি,
ভ্রান্ত তুমি, আলেয়া অন্বেষু' যবে দেখি দুঃখরাশি
তোমারে স্পর্শিতে নাহি পারে,
এ সংসারে
যা কিছু ঈপ্সিত তাহা তুমি ঠেল পায়
নিশ্চিন্ত ঔদাস্যে অবজ্ঞায়
যাহা রাজেন্দ্রেরও কাম্য, তারে তুমি তৃণসম দলি
যবে যাও চলি
প্রশান্ত আননে—যবে দাও তুমি বলি
জীবনে যা কিছু প্রিয় আদর্শের পায়,
নিন্দাস্তুতি সমজ্ঞান, না ভ্রূক্ষেপি তায়,
তখন কেমনে কহি তুমি শুধু মরীচিকা পানে
বিকল পরাণে
ধাবমান ভাঙাহাল
ছিন্নপাল
তরীখানি প্রায়,
সত্যের পরশ বিনা কভু কি গো সবই ছাড়া যায়?
নহিলে এ অন্তরের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা কি কভু
রোধ করা যায় সদা?—নহে নহে প্রভু!

তবু কি গো তব মনে সংশয়ের ছায়া
পড়ে নাকো কভু এসে?—যদি সবই মায়া,
তবে তব মনে কি গো সন্দেহ না জাগে—
তোমার সাধনা হ'ত সম্ভব কি আগে
শত শত ব্যথাতুর
বিয়োগ-বিধুর
ক্লান্তিভারে অবনত অশ্রুপ্লুত নরনারী যদি
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে সংসারের নিত্য নিরবধি
যতনে না পালিত গো সবে:
যদি এই ভবে
জননী সন্তান-স্নেহ দিত বিসর্জ্জন

দুহিতা কলত্র পুত্র হয়ে আনমন
কবিত বৈবাগ্য-চর্চ্চা, তবে কি গো তুমি
তব চিব-আকাঙ্ক্ষিত মানসী-প্রতিমা তবে এই মর্ত্ত্যভূমি
এই সাধনাব স্থানে লভিতে জনম
পাইতে সে মোক্ষ, যাহা বল তুমি জীবনে চবম
বহু সাধনাব ধন
শৈশবে কখন
হয না যে ধন লাভ আসি এই ভবে
বহু যত্নে তবে
এ জীবন সন্ধিপথে
সত্যেব দবশ হয সম্ভব জগতে।
তাই ভাবি আমি
হে সৌম্য নিষ্কামি।
তব মনে
জেগেছে কি না জেগেছে বাবেক ও জীবনে
উৎকণ্ঠা সংসাবী তবে
যাবা সদা মোহ ভবে
অন্ধ, যাবা কহে সবে—'সামান্য মানব
কিন্তু তবু যাহাদেব
স্নেহ কোল প্রসাদেব
দান বিনা জীবন সাধনা তব
হ'ত না সম্ভব
এ চিন্তা কি প্রভু
মনে তব সংশযেব বেখাপাতও কবে নি কি কভু?

না না কভু নহে,
বিধি যদি বহে
যদি মানবেব
হৃদযে স্নেহেব
প্রীতিব নির্ঝব
কলকণ্ঠস্বব
বঙীন আশাব
মাযা মমতাব
শত বিযোগেব মাঝে প্রণযেব পুবে

সান্ত্বনার সুরে
নিভৃত অন্তরে
লহরে লহরে
শান্তি উৎস নিরন্তর করে গো বিরাজ
যদি জীবনের হাটে শত কর্ম্মকাজ
দেয় ব্যথা—দেয় না কি সার্থকতা তবু?
অনন্ত বেদনামাঝে অশ্রুধারা কভু
নাহি আনে
কি গো প্রাণে
তৃপ্তির পরম সুর
প্রেমের নূপুর
ধ্বনি সুমধুর—
নহে কি গো উদাত্ত গম্ভীর তার বাণী?
যার স্পর্শ আনি
বাজায় এ হৃদে নিত্য প্রশান্ত রাগিণী?
যাহার সজল সুর
বিয়োগ-বিধুর
জীর্ণ প্রাণে তপ্ত ভালে বুলায় সে কোমল পরশ
যাহার আভাষে
প্রাণে আসে
শত বাধা মাঝে সুখ বিষাদের মাঝেও হরষ
রুদ্র বৈশাখের মাঝে আশীষে যেমতি
জলদের নির্ম্মল বরষ।

*মাঘ, ১৩৩১*

# একাকার

## গিরিজাকুমার বসু

এলো-খোঁপা, সুরু দুটি বালা
একগাছি প্রাণবাঁধা হার,
রূপ—জিনি' নব মেঘমালা,
বাণী—জিনি' নির্ঝর ঝঙ্কার,
বড় বড় দুটি কালো চোখ্
ঢল' ঢল' আমারি সোহাগে,
আজি মোর তাই সুধালোক,
আজি মোর তাই প্রাণে জাগে।
বুকে তার লেখা মোর ছবি,
প্রাণে মোর বিছানো শয়ন,
ধন্য আমি ধন্য রে গরবী,
করিল যে মোরে সে চয়ন।
"প্রিয়তম, স্পর্শমণি তুমি"
কহে, রাখি' অধরে অধর,
"প্রিয়তম", কহি স্নেহে চুমি
"তুমি মোর অমিয়-সাগর"

আষাঢ়, ১৩৩১

## কবিতার জন্ম

**প্রভাকর মাঝি**

আমার কবিতা তোমারে ঘিরিয়া নাচে,
সাম্‌নে চলার বাড়ে দুরন্ত গতি।
তোমার নয়নে কি আলো লুকানো আছে—
জাগালে যে মোর ছন্দ-সরস্বতী।
অধরের কোণে চির-চেনা স্মিত হাস,
কণ্ঠটি আছে স্নেহে ও সোহাগে সাধা।
যত দেখি তত বেড়ে উঠে উল্লাস—
লাগেনি কি গায় পৃথিবীর ধূলা-কাদা?

তোমারে নেহারি ছন্দ আমাব মেলে,
যুগ যুগ ছিনু তোমাবি প্রতীক্ষায়।
আঁধার-কারায় শত মণি দীপ জ্বেলে
আজ এলে তুমি, এলে মোব আঙিনায়।
এলো সুর চারু চরণের মঞ্জীরে,
কবির কবিতা জন্ম লভিল ধীরে।

*মাঘ, ১৩৬১*

# ছায়া-ঘর

### বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

সোনালী বোদেব ছাযা ঘবে
মেঘ আলো হবিণেব আযু বং-খেলা
কোনদিন তুমি দেখেছ কি?
নূপুবেব বুডি-ছোঁযা ঘ্রাণে
সাগবেব উৎসবে, প্রাণে
লতা, ফুল, পাখীদেব ছবি।

নক্ষত্রেব, জোনাকীব আলো—
যে নযনে জ্বলে সাবাবাত,
মাধবীব সেই মধু তিথি
কখনও বেসেছ নাকি ভালো?

এ-নদীব ছবি আঁকব না।
সীমাহীন ভূগোলেব স্ববে -
জানি সব স্মৃতি আছে গাঁথা।
প্রত্যহেব প্রবল হাওযায,
ভীব পাতা ক্রমে ঝবে যায
সঙ্গীত-সুবভি আনে কবি।

তবু, চাওযা - পাওযা এই নিযে
পৃথিবীব রূপ চলে গডা।
দূর্বা বোঝে না তাব শিশিবেব আযু,
হয না যে হৃদযেব শেষ বই পডা॥

*আশ্বিন ১৩৭১*

# জীবন-ভিক্ষা

## করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

"দেউলে দেউলে কাঁদিয়া ফিরি গো     দুলালে আগলি বক্ষে,
বিয়োগ-উৎস     উষ্ণ-সরিতে     দর-বিগলিত     চক্ষে,
শতচুম্বনে মেলে না নয়ন!
চুরি গেছে মোর আঁচলের ধন"; —
অভাগী বিহগী দারুণ আহত     মরণ-শ্যেনের পক্ষে।

"স্তন-ক্ষীর-ধার অধরে বাছার     আজি কি লেগেছে তিক্ত?
রসনা-প্রসূন কোন্ পরসাদ—     মধু-রসে পরিষিক্ত!
মুখ-চম্পকে মকব বর্ণ,
শুষ্ক অধর-কমল-পর্ণ—
কি পাপে আমার প্রাণের ইন্দু     সুধার-বিন্দু-রিক্ত!

"স্বর্গ-মাধুরী আধ-আধ বুলি!     কুন্দ বৃন্ত-ছিন্ন
দন্ত-রুচিতে কই সে কান্তি,     পুণ্য-হাসির চিহ্ন!
জানি, প্রভু, তব পাণির পরশে
ননীর পুতলি জাগিবে হরষে!—
কোন্ পাষাণের বিষ-মাখা বাণে     নয়নের মণি ভিন্ন!

"কানন হয়েছে আমার ভুবন     সুখশশী রাহুগ্রস্ত,
ধাই দিশাহারা, রোদনের রোলে     ধ্বনিযা উদয়-অস্ত।
যেদিকে তাকাই, বাছা মোর নাই!
প্রাণ দিলে যদি প্রাণ ফিরে পাই; —
উড়িয়া উড়িয়া শ্মশানের ছাই     ভরিল বিকল হস্ত!

"অবনীর এই পদ্ম-বেদীতে,     হবিলে ত্রিতাপ-দুঃখ,
যাত্রা করেছ—দুরগম পথ     ক্ষুর-ধার-সম সূক্ষ্ম!
দিলে তপোবল, মহানির্ব্বাণ,
কুমারে আমার কর প্রাণদান -"

লুটায যুবতী বুদ্ধ-চবণে, আলুথালু কেশ রুক্ষ।

চাহেন শুদ্ধ, সৌম্য, শান্ত গৌতম ধ্যান-ভঙ্গে,
অখিল-পাবন করুণা-জ্যোৎস্না ববষি' বালক অঙ্গে,—
নিমেষেব তবে মেলিবে কি চোখ—
উথলি অরুণ-পুলক-আলোক
নিবাবে আগুন কিসা-গোতমীব শিশুহাবা উৎসঙ্গে?

কহেন বুদ্ধ—"তনয তোমাব নীবব-সমাধি-মগ্ন,
ববণ কবেছে চিবসুন্দব মবণেব মহালগ্ন,
থাকে যদি কোথা অশোক-আলয,
ভিখ মাঙ্গি' আন সষপচয,
পবশে তাহাব দুলিযা উঠিবে পবাণ-মৃণাল ভগ্ন।"

বিশাল পুবীব দ্বাবে দ্বাবে ঘুবে, কেহ নাহি দেয ভিক্ষা'
নিবেদিল শেযে গুরু পদে এসে— "শিখাইলে শেষ শিক্ষা,
জীযাতে চাহি না তনযে আমাব,
ভবনে ভবনে ওঠে হাহাকাব।
তিবোহিত মোহ-বিবহ-আঁধাব, দাও গো অমৃত দীক্ষা।"

চৈত্র, ১৩২০

---

*পবে কবিতাটি পবিমার্জিত কবা হয সম্পাদক।

## দৃষ্টি-স্মৃতি

### নিরুপমা দেবী

আমার এ ধ্যানলোকে তুমি শুধু আছ দৃষ্টি হয়ে,
অনন্তের ছায়াখানি লয়ে;
ছোঁয়া নয়, পাওয়া নয়, শুধু দুটি আঁখি দিয়ে চাওয়া;
আঁখি বাতায়ন পথে নিরুদ্দেশ অভিসারে বাহিরিয়া যাওয়া!
অসহ্য পুলক ভরা ও যে ব্যাকুলতা,
ভাষাহীন প্রলাপের অর্থহারা কথা,
ও যে গুপ্ত আশা,
ও যে সর্ব্বজীবনের বিমথিত সুপ্ত ভালবাসা!
দৃষ্টি নয় ও যে বাণী,
যৌবন বসন্ত জাগা উন্মাদনাখানি
তুমি কি তুলেছ ধবে মোর ওষ্ঠপুটে?
তোমারই কি প্রাণখানি উঠিয়াছে ফুটে
নয়নের কূলে কূলে দৃষ্টিরূপ ধরি?
নিভৃত ও অন্তরের গানখানি গিয়াছে কি মরি
ঐ আঁখিতলে?
সুরটুকু ঢেলেছে কি দৃষ্টি সুধাজলে?
এ কি প্রেম, এই কি সোহাগ?
এ কি স্নিগ্ধ চুম্বনের লাজরক্তরাগ
এ আমার আঁখিপুটে? এ কি মুগ্ধ মন?
নীরবে একান্তে এ কি আত্মনিবেদন?
এ কি ঐ আকাশের বাঁশী
ধরণীর কাণে কাণে ঘুরে ঘুরে কহে যে আশ্বাসি
তাপিত নিদাঘ শেষে বরষার বাণী?
মলয়ের মাদকতা? বসন্তের ফুলভার আনি
দিয়ে যায় প্রকৃতির হাতে?
এ কি মোর জীবনের অধ্যায়ের পাতে
পুণ্য দুটি শ্লোক?
জীবনের স্তিমিত আলোক

প্রশান্ত গগন
মবণেব আবতির নামিছে লগন
আমাব জীবন শেষে এই বেদীমূলে
তুমি কি অঞ্জলি ভরি ধবিযাছ তুলে
শান্ত অচঞ্চল
দুটি নয়নেব তব ও দুটি উৎপল?

চৈত্র, ১৩৩৪

# নিঃসঙ্গ

## প্রিয়ম্বদা দেবী

মনের সাগর পারে নির্জ্জনের দেশ,
সেথা আমি নিঃসঙ্গ একেলা,
তরল জীবন 'পরে লহরী অশেষ৺
কত বর্ণ ভঙ্গী কত; সঙ্গীতের মেলা।
আমার উষর তটে, গুল্ম বীথিকায়,
বায়ুর হিল্লোল নাই, পাখী নাহি গায়!
নীরবে ভাসিয়া যায় ঊষার রক্তিমা,
নিঃশব্দে নিবায় দীপ নিশীথ চন্দ্রিমা॥

অপার সে পারাবারে তরঙ্গ স্পন্দন,
রাত্রি দিন বিনা-শেষ বাণী,
কভু মত্ত কভু মৃদু, ব্যাকুল নন্দন
স্তুতি নতি, কেবা জানে কাহারে বাখানি?
জ্যোৎস্নালোকে অতলেব উচ্ছ্বসিত চিত,
অমার আঁধার বক্ষ নক্ষত্র-খচিত।
তট বালুকায় তার স্মৃতি বিস্মরণ,
কোন প্রতিবিম্ব অরে করে না বরণ।

আকাশের মুখ চাওয়া প্রতিধ্বনিহীন
অখণ্ড সে অশেষ স্তব্ধতা,
সমীর পরশ স্মৃতি লুক্কায়িত লীন,
লেখা হয় না ক তার আলেখ্য-বাবতা,
ছন্দোহীন নিস্পন্দতা, নিশ্চিহ্ন আলোক,
অনিমেষ অন্ধকার, পদশব্দ শ্লোক
অশ্রুত সুদূর, যুগ যুগান্ত ধরিয়া,
এ সাধনা প্রতীক্ষার কাহারে স্মরিয়া?

*আশ্বিন, ১৩৩৫*

# পূজার চিঠি

## কুমারী নবনীতা দেব

কবি-দম্পতি শ্রীনবেন্দ্র দেব ও শ্রীমতী বাধাবাণী দেবী তাঁহাদেব ১২ বৎসবেব কন্যা কুমাবী নবনীতাকে সঙ্গে লইয়া ইউবোপ ভ্রমণে গিয়াছেন—এ সংবাদ ভাবতবর্ষেব পাঠকগণ অবগত আছেন। পূজাব সময় কুমাবী নবনীতা লণ্ডনে বসিয়া তাঁহাব মাতুলানী শ্রীমতী প্রতিমা ঘোষকে একখানি এবং মাতুল-পুত্র শ্রী অভীক ঘোষ (১০ বৎসবেব) ও মাতুল-কন্যা কুমাবী প্রমীতা ঘোষ (৭ বৎসব বযসেব) কে একখানি পত্র লিখিযাছেন—উভয পত্রই কবিতায লেখা। আমবা নিম্নে পত্র ২ খানি প্রকাশ কবিলাম—ইহা পাঠ কবিলে কবিদম্পতিব কন্যা নবনীতাবও অসাধাবণ কবিত্ব প্রতিভাব সম্ভাবনাব পবিচয পাওযা যায। (ভাঃ সঃ)

### (ক)

শাবদ পূজায পত্র পপুযা
পাঠাই বচিযা গীতি,
গুবজনে দিও প্রণাম আমাব
ছোটদেব দিও প্রীতি।
এইতো প্রথম দেশ ছেড়ে দূবে
বহিনু পূজাব কালে,
পবিনি নূতন পূজাব পোষাক
কুঙ্কুম ফোটা ভালে।
নূতন জুতা তো নেই পাযে আজ
পূজাব হর্ষ কই গো?
ইংবাজী সবই, পাইনি এবাব
পূজা বার্ষিকী বই গো।
দেশে ফিবে যেতে মন যে ব্যাকুল
ফিবিব এ মাস শেষে,
ভাবি মনে আজ থাকতাম যদি
তোমাদেব কাছে দেশে।

মহা উৎসব—কোলাহলে যেথা
পূজার বাদ্য বাজে,
মন যে আমার ছুটে চলে আজ
সেই বাংলার মাঝে।
পাড়ায় পাড়ায় পূজা মণ্ডপে
ছোট ছেলে মেয়ে নাচে,
বিজয়ার সাঁঝে মিষ্টি খাবার
গুরুজনদের কাছে।
বন্ধুরা মোর নূতন বসনে
সজ্জিত হয়ে আজ,
পূজা মণ্ডপে হাসি-কলরবে
করিছে কত না কাজ।
সুদূর সাগর পারে বসে আমি
ভাবি স্বদেশের কথা,
বহু সুখে আছি, তবু মনে হয়
কি-জানি কি নেই হেথা।
দেশেব প্রতিটি পথ-ঘাট বাড়ী
আত্ম বন্ধু যত,
অভু, খুকু আর দুষ্টুর কথা
মনে জাগে অবিরত।
হিন্দুস্থান-পার্কেব মত
এত সুন্দর স্থান
এই পৃথিবীতে আর তো কোথাও
গড়েননি ভগবান।
সুইজারল্যাণ্ড, প্যারিস, ইটালী,
অষ্ট্রিয়া, জার্ম্মাণী—
বালিগঞ্জের কাছে, মোব কাছে
সব যায় হার মানি।

* * *

এবারে পুজোতে কিন্তু পপুয়া
প্রকাণ্ড চিঠি দিনু,
আবার লিখিব, এইবারে আসি,
ইতি— তোমাদের মিনু।

## (খ)

অভু সোনা। লক্ষ্মী আমার, সোনার খুকুন ভাই
দিদিটাকে ভুলেই গেছিস, একটু মনে নাই?
দাওনা অভীক একটা চিঠি, নাওনা খবর নিজে
তাইতো মনে দুঃখ আমার, জানাই তোদের কী যে।
প্রত্যেক দিন সবার কাছেই, গল্প তোদের করি
খুকুবাণীর কথা এবং অভুর কথা স্মরি।
দুষ্টু বাবুর দুষ্টুপনার, খবর কিছু পাই,
কিন্তু তোদের হাতের লেখায়, তাহার খবর চাই।
এবার পুজোয় ভীষণ আমার, মন কেমন যা করছে,
বারে বারেই চোখের পাতা, কেবল জলে ভরছে।
তোমরা কি ভাই দিদির কথা, একটী বারও ভাবছ,
মোটর থেকে সর্ব্বজনীন, দেখতে যখন নাবছো?
পূজোর এবার জামা জুতো, সব পুরানো পরছি,
মায়ের কাছে বলতে গেলেই, ধমক হজম কর্‌ছি।
এবার পূজোয় ধমক ছাড়া, আর তো কিছুই পাইনি,
মায়ের মেজাজ গরম দেখে, বাবুর কাছেও যাইনি।
মা বলছেন তিনটী বছর, পূজোর নাম না কর্‌বে,
এই পুরাণ ফ্রক ও জুতা, তিনটি বছর পরবে।
তাই তো আমি চালাক হয়ে, লম্বা এমন হচ্ছি,
তিনটি মাসও আর না যাতে, এ সব জামা পর্‌ছি।
অনেক কথাই বলবো গিয়ে হচ্ছে পেটে জমা,
পদ্য লিখছি, এ জন্যে ভাই, করিস্ কিন্তু ক্ষমা।
লণ্ডন পুলিশের হ্যাট, কিনেছি তোর জন্যে,
মা কিনেছেন বই, খেলনা, দেখেননি তা অন্যে।
বার্ষিক পরীক্ষার ফল, শুভ খবর দিও,
দিদি ভাই এর বিজয়ারই, আশীষ [illegible] নিও।

ইতি— তোদের দিদিভাই
*অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭*

## প্রতিদান

### সুনির্মল বসু

পথিক আমি চলেছিলাম গাঁয়ের বাটে বাটে
সন্ধ্যা-বেলায় গ্রাম-নিরালায় কেউ না যেথা হাঁটে—
চলেছিলাম আপন মনে, আপন তালে গুন্‌গুনিয়ে,
হঠাৎ এলে ঝুন্‌ঝুনিয়ে
বাজিয়ে বাঁকা-মল
সন্ধ্যা-বেলার অন্ধকারে জাগিয়ে কুতূহল।

বল্লে শেষে সাম্‌নে এসে ছড়িয়ে খুশীর হাসি—
—'পথিক তুমি আবার বাজাও বাঁশী'—
আমি বলি 'ছি ছি
যাবার বেলা আমায় বাধা দিচ্ছ মিছিমিছি—
অনেক দেরী হোলো—
দিনের বেলার বাঁশীর কথা রাতের বেলা ভোলো।
সে সুর এখন যে-সুর হবে, তাই
যাই গো তবে যাই।—'

পূবের কোণে জাগলো ধীরে চতুর্দ্দশীর শশী—
তুমি আমার আন্‌লে বাধা পথের পরে বসি'—
বল্লে আচম্বিতে
—'ওগো আমার মিতে
এসেছিলাম তোমার গলায় এই মালাখান্ দিতে—
তুমি আমায় সুর শুনালে তার এ প্রতিদান্—
বলেই গলায় পরিয়ে দিল হেনার মালাখান।
তার পরেতে হায়—
মিলিয়ে গেল অন্ধকারে নির্জ্জন সন্ধ্যায়।

সাম্‌নে বহে দুকূল ছাপি' অশ্রুমতীর জল্—
জ্যোৎস্নাধারার রোশ্‌নায়েতে করতেছে ঝল্‌মল্;

তাবই তীবে বসে ভাবি—কে তুমি আজ প্রিযে,
কোন্ দাবীতে পথ চলা মোব বন্ধ কবে' দিযে,
আমাব কাছে এসে,
গভীব ভালোবেসে
ছল কবে' মোব পথ ভুলালে আজ
ভুলিযে দিলে কাজ।

তোমাব মালা গলায শুধু বাড়িযে দিল জ্বালা—
আমাব বাঁশীব সুবেব কি গো এই প্রতিদান,—বালা?

*অগ্রহাযণ ১৩৩৫*

## ফাগুনে

### কালিদাস রায় কবিশেখর

আজ ফাগুনে বাউল বাতাস
বেণুর বনে বাজায় বাঁশী,
ও তার—ঝাঁক্‌ড়া চুলে ঠিক্‌রে পড়ে
কিষণ চূড়া বাশি রাশি।।
খোলামাঠের তলাট ভরে
গোঠের পথে ধুলোট করে
ও সে—বেবাক উলট পালট করে।
গোধন হারায় রাখাল চাষী।।
বাউল বাতাস হয়েছে আজ
মউলবনে মাতোয়ালা,
আম বউলের বৌলি কাণে,
গলায় দোলে অশোক মালা।
ঐ দেখ তার পাগল নাচে
আট্‌কে গেল পলাশ গাছে
ও তার—গেরুয়া আলখাল্লাখানি;
বনবাগানে ছুটল হাসি।।
পানকৌড়ী ডুব দিয়ে ঐ
ডুব্‌কি বাজায় তালে তালে,
গাব্‌গুবাগুব বাজায় ঘুঘু
রঙীন গাবের ডালে ডালে,
চরণে তার হাজার ভ্রমর
ঘুঙুর বাজায় ঝমর ঝমর,
শুনে—উদাস বিভোর পরাণ আমার
চায় হতে তার সেবাদাসী।।

*ফাল্গুন ১৩২৯*

# বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র

## যতীন্দ্রমোহন বাগচী

আষাঢ়ের অমারাত্রি। শিবাকণ্ঠে ঘোষিল প্রহর
সূচিতে দ্বিতীয় যাম। দিনব্যাপী বর্ষণের পর
ক্ষণিক ক্ষান্তিতে যেন বারিধর লভিল বিশ্রাম।
ঝিল্লীস্বনে রঙ্গমঞ্চে। মেঘভাবে স্তম্ভিত আকাশ।
নক্ষত্রের নাহি দেখা। রুদ্ধপ্রায় বিশ্বের নিঃশ্বাস;—
বহে কি না বহে বায়ু—মূর্চ্ছার লক্ষণ যেন তার!
মুহুর্ম্মুহু বিদ্যুদ্দীপ্ত তপোবনে আশ্রমের দ্বার
বন্ধ সব চারিধাবে—যেন-বা তাবাও যোগাসনে
রুধি' যত চিত্তবৃত্তি—ধ্যানমগ্ন এ নিশি-নির্জ্জনে।
বশিষ্ঠ-কুটীবে শুধু একটী আলোক দেখা যায়
উন্মুক্ত গবাক্ষ-পথে, বশ্মি যায় ফুটে না কুণ্ঠায়।

উঠিলা ব্রহ্মর্ষিবর সন্ধ্যা পূজা করি' সমাপন
বাত্রির বিশ্রাম লাগি'; শ্রান্তদেহে ছাড়ি' দর্ভাসন
সম্ভাষিলা স্নিগ্ধ কণ্ঠে—"অরুন্ধতি, কোথা অরুন্ধতি?
(পরক্ষণেই তৎপ্রতি দৃষ্টি পড়ায় মন্দ পদক্ষেপে দেবীর পার্শ্বে
গমন ও ভূমিতলেই উপবেশনান্তে)
—অন্ধকার কোণে হেথা একান্তে বসিয়া কেন সতী,
কুণ্ঠিত বিষণ্ণ মূর্ত্তি? শোন' কথা, কহি পুনর্ব্বার,
পুত্রশোক বক্ষে পুষি' কতদিন কাটাইবে আর
অঞ্চলে বহ্নির মতো?—সময়ে সকলই যদি যায়,
তোমারই এ চিত্তভার—সেই কি অনন্ত এ ধরায়?
—জানো তো নিয়তিধর্ম্মে! দেহধর্ম্মে অবহেলা করি'
কেন তবে অনুক্ষণ দুঃখ পাও পুনঃপুনঃ স্মরি'
গত শোচনার কথা?—বহু কার্য্যে মানবজীবনে,
ঋষি-পত্নী তুমি শুভে, শান্ত হও, ধৈর্য্য ধরো মনে।

—ঊর্দ্ধে ঐ দেখ চেয়ে দিগ্বিদিক্-ঘেরা অন্ধকার,—

মুক্তকেশী মহামায়া সৃষ্টি জুড়ি' অধিকার যার,
আজিকার কুহূরাত্রে; তা বলিয়া ভাবিছ কি মনে
নব সূর্য্যোদয় আর হেরিবেনা পুনঃ এ নয়নে?
—সবই হেথা ক্ষণস্থায়ী—বিচিত্র লীলা এ ধরিত্রীর,
সত্য-শুভ-সুন্দর সে ব্রহ্ম ছাড়া সকলই অস্থির—
সকলই অনিত্য ভবে—সেই কথা ধ্রুব জানি' মনে
তাঁরই ধ্যানে আত্মজ্ঞান লাভ' কর কর্ত্তব্যসাধনে।"

শুনি' সে সান্ত্বনা-বাণী সতী-চক্ষে দ্বিগুণিত ধারা
বহিল নয়ন-পথে, নদী যেন সেতুবন্ধহারা!
—"একসঙ্গে শতপুত্র একে-একে গেল যে আমার!
মোর মতো অভাগিনী এ জগতে কেবা আছে আর?
কহ, প্রভু,"—
রুদ্ধকণ্ঠে আর বুঝি ফুটিলনা স্বর,—
গুমরি' উঠিল যেন ভগ্ন বক্ষে বিদীর্ণ পঞ্জর!
—সেই ক্ষণে পর্যণেরও আর্ত্ত বক্ষ গেল যেন ফাটি',—
ভীষণ বজ্রের শব্দে দিগ্দিগন্ত, নদী, গিরি, মাটি'—
কাঁপিল নিখিল পৃথ্বী বিদ্যুতে ধাঁধিয়া চবাচর!
মহাবীর বিশ্বামিত্র,—সেই শব্দে তাঁহারও অন্তর
উঠিল কাঁপিয়া—যেথা, লুকাইয়া গবাক্ষের নীচে
উন্মুক্ত কৃপাণ-হস্তে মুহূর্ত্তের সুযোগ মাগিছে
চিরশত্রু বশিষ্ঠের হত্যাপণে চিত্ত করি' স্থিব;
—মহাতপা বিশ্বামিত্র, মহারাজা যে-বা পৃথিবীর!

কহিল বশিষ্ঠ-ঋষি পত্নীশিরে স্নেহ-হস্ত রাখি;
'ভাবিওনা তুমি সতী, এ জগতে তুমিই একাকী
সহিছ এ অরুন্তুদ বহুপুত্র-বিয়োগের ব্যথা,—
ভেবে দেখ, ক্ষণকাল, তোমারই সম্মুখে পতিব্রতা,
আমিও যে অংশভাগী! এ জগতে সর্ব্বহারা যে-বা,
মায়াবদ্ধ,—সে জনও যে নিত্য করে নিয়তির সেবা।
তোমার অজ্ঞাত নয়—এ বিশ্বের দুঃখ-ইতিহাস;—
বিশ্বস্রষ্টা—জানো তুমি শাস্ত্রপাঠে, তিনিও যে দাস,
আপন নিয়মবদ্ধ বিধিনিষেধের চক্রতলে,
কর্ম্মাকর্ম্ম দুঃখ-সুখ-রহস্যের দুর্ব্বোধ্য শৃঙ্খলে।"

উত্তরিলা অরুন্ধতী, স্বামীপদে রাখিয়া নয়ন,
"কিন্তু কেন তুমি প্রভু, হেন শত্রু করিলে সৃজন?
সমগ্র ভারত যাঁবে শ্রেষ্ঠ মানে সভয়ে শ্রদ্ধায়,
অস্বীকার করি' সেই তপস্বীর ব্রহ্মর্ষি-আখ্যায
করনি কি অসম্মান বারম্বাব সভামধ্যখানে?
সে-দুঃসহ অপমানে বন্ধুরও শত্রুতা জাগে প্রাণে।"
"সত্য, সত্য, অরুন্ধতি, বাক্য তব সত্য অনুমানি;—
ভক্তির না হোক্, তাঁর শক্তির তপস্যা-তেজ জানি।
তাই তো বন্ধুবে বরি' রাজর্ষির যোগ্য প্রতিষ্ঠার
নন্দিত কবেছি তাঁয়ে আর্য্যাবর্ত্তে তপস্বী-সভায;—
তথাপি ব্রহ্মর্ষি বলি' সম্মানিতে পাবিনি যে তাঁবে,
সেই অভিমানে বুঝি অনিষ্ট সাধিছে বারে বারে।'

উৎকর্ণ আগ্রহভরে বিশ্বামিত্র শুনিলেন কাণে
উভয়েব বাক্যালাপ ব্যাতায়নমাত্র ব্যবধানে,
অন্ধকাব অন্তরালে।
শত্রুর সে উগ্র তপোবল
শুনিযা স্বামীব কণ্ঠে, তাঁবই লাগি' আতঙ্কবিহ্বল
কহিলেন পতিপ্রাণা—
"তবু কেন করনা স্বীকার
ব্রহ্মর্ষি মানিতে তাঁরে? শতপুত্র-নিধন আমাব--
সেও এই কর্ম্মফলে! হায় প্রভু, নিষ্ঠুর দেবতা.
সংশয জাগে যে চিত্তে.—কহ এর রহস্য-বারতা,—
একান্ত অধীবা আমি"--
দুটি চক্ষে ভবি' এল বারি।
কহিলেন ঋষিবর সে বেদনা সহিতে না পাবি',
"শোন' তবে অরুন্ধতী, বুদ্ধিমতী তুমি, আমি জানি;--
নহে মোর অহঙ্কার, এ আমাব অন্তরের বাণী—
—বিশ্বামিত্র মিত্র মোর: কে যে শত্রু.—বুঝিনাক তাই,
সত্ত্বগুণে বঞ্চিত সে, তাই বুঝি ঈর্ষা ভালে নাই!
তবু তার তপস্যার গুণমুগ্ধ—আমি তারে বড় ভালবাসি,
সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ তারে দেখিবারে তাই তো প্রয়াসী!
যে বাজসি শক্তি তাব পূর্ণতার প্রতিবন্ধকামী.
তারই প্রতিকার তরে ব্রহ্মর্ষি বলিনি আজও আমি।

অদূরে বিপুল শব্দে কি যেন পড়িল ভূমিতলে;—
চমকি' উঠিলা দোঁহে সহসা বিস্ময়ে-কৌতূহলে।
মুহূর্ত্তে করিয়া চূর্ণ দুর্ব্বল সে উটজের দ্বার
উন্মাদের মতো যে-বা প্রবেশিল,—যোদ্ধবেশ তার,—
দস্যু বা তস্কর নয়, চকিতে চিনিল দোঁহে চোখে;—
—মহারাজ বিশ্বামিত্র। কুটীরের স্বল্প দীপালোকে।
বিমূঢ় দম্পতীদ্বয়ে মুহূর্ত্ত না দিয়া অবসর
বশিষ্ঠের পদতলে মুক্ত অসি রাখি' যুক্তকর
কহিলেন আগন্তুক,—"যে কথা শুনিনু আজ কাণে,
ধর্ম্ম জানে, কোনও ইচ্ছা নাই আর এ লাঞ্ছিত প্রাণে
বহিতে পাপের ভার। প্রভু মোর, এই অসি লহ,
নিজ হস্তে হানো মোরে—এ জীবন হয়েছে অসহ।
প্রভু মোর, বন্ধু মোর, এত দয়া তোমার অন্তরে
মহাশত্রু 'পরে তব।—নতুবা এ অভিশপ্ত করে
নাশিব এ ঘৃণ্য প্রাণ, শেষ পাপ সমাপ্তির লাগি।
– অরুন্ধতি, মাতা মোর, পুত্রহারা হায় রে অভাগি।
—আর নয় গুরুদেব, অসহ্য এ জীবন যন্ত্রণা
দূর কর এ মুহূর্তে,—কৃতঘ্নের এ শেষ প্রার্থনা।"

কহিলা বশিষ্ঠ ঋষি বিশ্বামিত্রে দিয়া আলিঙ্গন,
বন্ধুবর, আজি তুমি রাহুমুক্ত সূর্য্যের মতন
ব্রহ্ম ঋষি এক সঙ্গে, তপস্যার বিশ্বে তুমি রাজা।
একান্ত প্রার্থনা যদি,—এই তব দিনু
যোগ্য সাজা।
প্রিয়তম, আজি তুমি অনুতাপ দহনে নির্ম্মল,
সত্ত্বগুণে বিভূষিত নবধর্ম্মে উদার উজ্জ্বল।

আষাঢ়ের অমারাত্রি পুনরায় ঘনতর মেঘে
ঘনাইল চারিধারে। বর্ষাসাথে বায়ু বহে বেগে।
ঊর্দ্ধে মেঘাজিনে বসি' তপস্বী যতেক ব্যোমচর
ধারা উপবীতধারী বৃষ্টিমন্ত্রে হইল মুখর।
বিদ্যুতের দীপ্ত আঁখি ঘন ঘন দৃষ্টি মেলি' তার
মর্ত্ত্যলোকে দেখে চাহি' যুগ্মমূর্ত্তি সত্য-সাধনার।

*আষাঢ়, ১৩৫৪*

# বাস্তু-ত্যাগী

## জসীমউদ্দীন

দেউলে দেউলে কাঁদিছে দেবতা পূজাবীবে খোঁজ কবি,
মন্দিবে আজ বাজেনাক শাঁখ সন্ধ্যা সকাল ভবি।
তুলসীতলা সে জঙ্গলে ভবা, সোণাব প্রদীপ লযে,
বচে না প্রণাম গাঁযেব বূপসী মঙ্গল কথা কযে।
হাজবা তলায শেযালেব বাসা, সেওডা গাছেব গোডে,
সিঁদুব মাখান, সেই স্থান আজি বুনো শুযোবেবা খোঁডে।
আঙিনাব ফুল কডাইযা কেউ যতনে গাঁথে না মালা,
ভোবেব শিশিবে কাঁদিছে পূজাব দূব্বা শীষেব থালা।
দোল-মঞ্চ সে ফাটলে ফাটিছে, ঝুলনেব দোলাখানি,
ইঁদুবে কেটেছে নাট মঞ্চেব উডেছে চালেব ছানি।
কাক চোখ জল পদ্মদীঘিতে কবে কোন বাঙা মেযে,
আলতা ছোপান চবণ দুখানি মেলেছিল ঘাটে যেযে।
সেই বাঙা বঙ ভোলে নাই দীঘি, হিজলেব ফুল বুকে,
মাখাইযা সেই বঙিন পাযেবে বাখিযাছে জলে টুকে।
আজি ঢেউ হীন অপলক চোখে কবিতেছে তাহা ধ্যান,
ঘন বন তলে বিহগ কণ্ঠে জাগে তাব স্তব গান।
এই দীঘি জলে সাঁতাব খেলিতে ফিবে এসো গাঁব মেযে,
কলমি লতা যে ফুটাইবে ফুল তোমাবে নিকটে পেযে।
ঘুঘুবা কাঁদিছে উহু উহু কবি ডাহুকেব ডাক ছাডি,
গুমবাব বন সবুজ শাডীবে দীঘল নিশাসে ফাডি।
ফিবে এসো যাবা গাঁও ছেডে গেছো, তরু লতিকাব বাধে,
তোমাদেব কত অতীতদিনেব মাযা ও মমতা কাঁদে।
সুপাবীব বন শূন্যে ছিডিছে দীঘল মাথাব কেশ,
নাবকেল তব ঊর্ধ্বে খুঁজিছে তোমাদেব উদ্দেশ।
বুনো পাখীগুলি এডালে ওডালে কই কই কবে কাদে
দীঘল বজনী খণ্ডিত হয পোযা কুকুবেব নাদে।
কাব মাযা পেযে ছাডিলে এদেশ, শস্যেব থালা ভবি,
অন্ন-পূর্ণা আজো যে জাগিছে তোমাদেব কথা স্মবি।

আঁকা বাঁকা বাঁকা শত নদী পথে ডিঙ্গি তরার পাখী,
তোমাদের পিতা পিতা-মহদেব আদরিয়া বুকে রাখি,
কত নাম হীন অথই সাগরে জুঝিয়া ঝড়ের সনে,
লক্ষ্মীর ঝাঁপি লুটিয়া এনেছে তোমাদের গেহ কোণে।
আজি কি তোমরা শুনিতে পাও না সে নদীর কল গীতি,
দেখিতে পাওনা ঢেউএর আখরে লিখিত মনের প্রীতি?
হিন্দু মুসলমানেব এ দেশ, এ দেশের গাঁর কবি,
কত কাহিনীর সোনার সূত্রে গেঁথেছে যে রাঙা ছবি।
এ দেশ কাহারো হবে না একার, যতখানি ভালোবাসা,
যতখানি ত্যাগ যে দেবে, হেথায় পাবে ততখানি বাসা।

বেহুলার শোকে কাঁদিয়াছি মোরা গংকিনী নদী সোঁতে,
কত কাহিনীর ভেলায় ভাসিয়া গেছি দেশে দেশ হতে।
এমাম হোসেন শকিনার শোকে ভেসেছে হলুদ পাটা,
রাধিকাব পার নূপুরে মুখর আমাদের পাব-ঘাটা।

অতীতে হযত কিছু ব্যথা দেখি পেযে বা কিছুটা ব্যথা,
আজকেব দিনে ভুলে যাও ভাই সেসব অতীত কথা।
এখন আমরা স্বাধীন হযেছি, নূতন দৃষ্টি দিয়ে,
নূতন রাষ্ট্র গড়িব আমরা তোমাদের সাথে নিয়ে।
ভাঙ্গা ইস্কুল আবার গডিব, ফিরে এসো মাষ্টার।
হুঙ্কারে ভাই তাড়াইযা দিব কালি অজ্ঞানতার।
বনের ছায়ায় গাছের তলায় শীতল স্নেহের নীড়ে,
খুঁজিয়া পাইব হারাইয়া যাওয়া আদরের ভাইটিরে।

চৈত্র, ১৩৫৬

# অবিনশ্বর

## গোপাল ভৌমিক

বাতের পাখায় ভর দিয়ে গেছে চলে'
আমার মনের সোনালী বনের পাখী,—
আসিবে কি ফিরে', তারে স্মরি' যদি কাঁদে
বাসা বেঁধেছিল যার বুকে, সেই শাখী?
বহুদিন হ'ল লুকোচুরি খেলা শেষ—
মন-ঠকানোর পালা হ'ল অবসান
একদিন ছিল, সে কথা ত ভাল জানি,
তাইত রচিলা করুণ বিষাদ গান।
স্মৃতির পরিখা একদা ভরাট ছিল—
একদা সেখানে ছিল বহু বীরবর,
এখন সেখানে নাই অসি ঝনঝন্—
মাটির পরিখা, শুধুই বালুর চর।
ধূ-ধূ করা সেই বালুচরে তবু শুনি—
দূরাগত কোন নিশীথের কলরব,—
আমার জীবনে সে মহা লগন ভাবি—
যখন সেখানে চলেছিল উৎসব।
সে-দিন এখন বাতাসে মিলায়ে গেছে
কালের কোঠায় জমা আছে তার ফল,
তাই আমি কভু গাহি না বিষাদ গীতি—
তাইত ফেলিনা করুণ আঁখির জল।

মাঘ, ১৩৪৬

# মৃত্যু-সুধা

(হাকিম আজমল খাঁর তিরোভাবে।)

গোলাম মোস্তফা

কোন্ হাকিমের হুকুম পেয়ে হায়গো 'হাকিম' অবেলায়
এমন ক'রে বিদায় নিলে রুগ্ন রেখেই ভারত-মা'য়?
বিকার-মোহে কাম্‌ড়ে দেহ করছে যে নিজ রক্ত পান
তার বুকেতেই হান্‌লে নিঠুর বিষ-মাখানো ব্যথার বাণ!

হঠাৎ তোমায় এমন ক'রে ক'রল কে সে গেরেফতার,
আইন-কানুন ভাঙলে তুমি কোথায় কবে কোন্ রাজার?
'অন্তরীণের' চেয়েও এ যে ভীষণ সাজা—নির্ব্বাসন,
অপরাধ এ? অথবা এ জালিম রাজার উৎপীড়ন?

অপরাধই! -ভীষণ কসুর!—এই অপরাধ হয় না মাফ,
এই অভাগা দেশের সেবায় প্রাণ দেওয়া—সে ভীষণ পাপ!
'হাকিম' তুমি, টিপ্‌বে নাড়ী, দাওয়াই দেবে রুগ্নদের,
টিপ্‌তে কেন আসলে নাড়ী ভাগ্যহীনা এই দেশের?

এই ত তোমার রোগের গোড়া—হাকিম হ'যেও বুঝলে না?
এই বিমারের নিদান-কথা শাস্ত্রে কিছুই খুঁজলে না?
'দাশ' হ'ল যেই দেশের দাস—অমনি দেখ মর্‌ল' সে,
কেউ র'ল না এই ভাবতে— এই অপরাধ কর্‌ল যে।

আকাশ হ'তে আল্লা যেদিন ক'রল জারি এ ফর্‌মান—
কেউ থেক না অধীন হ'য়ে, হও গো স্বাধীন—মুক্ত-প্রাণ,
দিকে দিকে জাগল সাড়া, ভর্‌ল' গানে ভূমণ্ডল,
আমরা শুধুই ঘুমের ঘোরে রইনু পড়ে অচঞ্চল!

আলোর দূতী ব্যর্থ হ'য়ে ফির্‌ল যখন গগন গা'য়,
মুক্তি-বাণী শুন্‌ল না কেউ, পড়ল' বাঁধা শিকল পা'য়!

আল্লা রেগে কসম খেয়ে ক'রল তখন কঠোর পণ—
এদের সেবায় লাগবে যারা—তাদের সাজা ঠিক মরণ।

ভাগ্য-বিধির এই যে আইন, ভাঙলে কেন হাকিম সা'ব।
জেনে শুনেই কর্‌লে এ পাপ। দেখলে রঙিন কোন্ খোয়াব,
করতে যদি ফেরেববাজী, দেখতে যদি নিজের সুখ,
বাঁচতে তুমি অনেক দিনই—ছিল নাকি এ জ্ঞানটুক।

রুগ্ন-ভারত—হাকিম তুমি—দিলেই যখন আপন প্রাণ,
মৃত্যু এ নয়, দিয়েই গেলে ইউনানী কোন্ দাওয়াই দান।
দেশের নাড়ীর গতিক খারাপ, মৃত্যু সুধাই চাই কি তার?
পান ক'রালে সেই সুধা কি কণ্ঠ ভরি' ভারত-মা'র?

মর মর, সেবক যারা—এমনি করেই শহীদ হও,
দেশ-জননীর সব অভিশাপ সন্তানেরাই সওগো সও।
মৃত্যু এ নয়—পরীক্ষা এ—পাশ কর এই পরীক্ষায়,
গলবে আবার খোদার হৃদয়, মুক্তি দেবে ভারত মা'য়।

কাঁদছ কেন ভারতবাসী হিন্দু এবং মুসলমান?
মুক্তি রতন কিনবে যদি—করবে না তার মূল্য দান?
মৃত্যু তোরণ-দ্বার ছাড়া আর মুক্তি জয়ের পথ যে নাই,
এ পথ দিয়েই চল্‌তে হ'বে, দুঃখ করা ব্যর্থ তাই।

"মরছে যারা এমন ক'রে দেশ-বিদেশে সেবক দল
তাদের ত কেউ হারায়নি ভাই, মরণ তাদের নয় বিফল,
মরণ দিয়েই জাতির দেহে ক'রছে তারা জীবন দান
ম'রেই তারা রইল বেঁচে অমর হ'ল তাদের প্রাণ!"

গড়ব মোরা নূতন ক'রে স্বাধীন-ভারত-'তাজমহল',
কে হ'বে তার ভিত্তি-মূলের শক্ত পাথর থির অটল।
'মিনার' যারা চায় হ'তে হোক—গড়ল যারা ভিত্তি-মূল
গর্ব্ব তাদের সবার 'পরে—নাইক ধরায় তাদের তুল।

*ফাল্গুন ১৩৩৪*

# যযাতি-দেবযানী

## কামিনী রায়

যযাতি। আমি আসিয়াছি দেবি!

দেবযানী। জয় মহারাজ,
দেখা দিয়া বাঞ্ছা মোর পুরাইলে আজ।

যযাতি। ডেকেছে আমারে প্রিয়ে?

দেবযানী। ডেকেছি তোমারে?—
ডেকেছি—প্রভুরে যদি ডাকিবারে পারে
দীনা দাসী; মৃত্যুকালে যথা বারে-বারে
পাপ-ক্ষমা লাগি পাপী ডাকে দেবতাবে।

যযাতি। কি এ ব্যাধি? মৃত্যুভয় কেন মহারাণি?

দেবযানী। মহারাজ, শুক্রকন্যা এই দেবযানী
মৃত্যুর করে না ভয়। জরাভার দিয়া
তব দেহে, জান না তো লয়েছি বরিয়া
কি ভীষণ আধি-ব্যাধি, আত্মার ভিতর—
দহিতেছি মর্ম্মে-মর্ম্মে। মৃত্যু প্রিয়তর
অনুতাপ-জ্বালা হতে। মৃত্যু শান্তিময়,
প্রাণ জুড়াবার পথ, তাহে নাহি ভয়।

যযাতি। কি কথা বলিতে চাহ?

দেবযানী। সব কথা হায়
সুদীর্ঘ ক্রন্দন হয়ে বাহিরিতে চায়।
একটু অপেক্ষা কর। প্রভু জানি আমি
বহু রাজকার্য্য আছে; নহ শুধু স্বামী
দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠার; তুমি হও পতি
সসাগরা ধরণীর। শর্ম্মিষ্ঠা সে সতী,
নিজ গুণে বাঁধিয়াছে তব চিত্তখানি;
বাঁধ ছিঁড়ে ছুটিয়াছে দূরে দেবযানী
উন্মত্তা উল্কার মত। ব্রাহ্মণ্য-দর্পিতা,
ক্রোধে চণ্ডালিনী, বক্ষে জ্বালিয়াছে চিতা
নিজ হাতে। ঈর্ষা, ক্ষোভ, ঘৃণা অভিমান

বিষ-দগ্ধ শরে বিঁধি নিজ মর্ম্ম-স্থান।
ক্ষমাহীন নির্ম্মম সে দুর্ব্বলে লাঞ্ছিতে
দলিয়াছে পদতলে আপন বাঞ্ছিতে,
অজ্ঞাত অদৃষ্ট দোষে। আজ সুপ্রকাশ
চক্ষে তার জীবনের দীর্ঘ ইতিহাস।
আপনার যত দোষ, যত ভ্রান্তিজাল
তোমারে দেখাব প্রিয়, রহ কিছুকাল
এই অপ্রিয়ার কাছে।

শৈশব, কৈশোর
জান কি আমার তুমি? পিতৃদেব মোব
দৈত্যরাজ-গুরু তাঁর চিত্ত অবিবত
দৈত্যের কল্যাণ-ধ্যানে থাকিত নিবত;
তবু বেগবতী এক স্নেহ স্রোতস্বতী
নিবন্তর বহিয়াছে তনয়ার প্রতি,
মানে নাই কোন বাধা। বাজ-সভামাঝে
সুরাসুব-যুদ্ধে, যজ্ঞে, পাঠে—সর্ব্ব কাজে
তাঁব অন্ধ চক্ষু যেন তনয়ার লাগি
সর্ব্ব দৃষ্টি অন্তরালে বহিয়াছে জাগি।
ক্ষুদ্রতম, তুচ্ছতম অভিলাষ তাব
হইয়াছে পূর্ণ সদা। না করি বিচার,
যা চেয়েছে পেয়েছে সে। শুক্র মহাজ্ঞানী
দৈত্যের ভরসা বল, তাঁর দেবযানী
দুর্ব্বিনীতা, জানে নাই নিজ ইচ্ছা বিনা
এ জগতে আর কোন ইচ্ছা আছে কি না;
আছে কিনা না লজ্জা, মান ভাবে নাই কভু।
তাব মান রেখেছেন দৈত্যকুল-প্রভু,
সেই দর্পে আশৈশব আছিল দর্পিণী
পূর্ণ অভিমান-বিষে। পালিতা সর্পিণী
দুগ্ধ-পুষ্টা, সামান্য আঘাতে অকস্মাৎ
দংশে রোষে দুগ্ধদাতা পালকেব হাত।
ব্রাহ্মণ সংযমী, শুদ্ধ; দৈত্য অনাচাবী;
আমি ব্রাহ্মণেব কন্যা, তাই মনে ভারী
গর্ব্ব ছিল সংযমের আর শুদ্ধতার।
তাই অসংযত ক্রোধে এই উদ্ধতাব

ভেসে গেল সব সুখ। যত ব্রত, স্নান,
শাস্ত্র পাঠ, দেবস্তুতি, দীনে ভিক্ষা-দান
ব্যর্থ সব, পুণ্যহীন। সেথা পুণ্য রহে,
শ্রদ্ধা স্নেহ ক্ষমা যথা নিরন্তর বহে
বিনয়ে আবৃত হয়ে।

ক্ষুদ্র অপরাধ
তাই লয়ে সখী সনে করিনু বিবাদ;
তীক্ষ্ণ বাক্যবাণবিদ্ধা, ক্রুদ্ধা সে তরুণী
ফেলে দিলা কূপে মোরে। আর্ত্তনাদ শুনি
আর্ত্তবন্ধু, ক্ষাত্রধর্ম্ম যেন মূর্ত্তিমান্,
দেহে বল, চিত্তে দয়া, চক্ষুঃ জ্যোতিষ্মান্,
আসিলে নিকটে মোর, বাড়াইয়া হাত
উদ্ধার করিলে মোরে। সকল আঘাত,
দেহের মনের, সেই বাহু-স্পর্শে তব
ভুলে গেনু, লভিনু সে কি আনন্দ নব।
সে আনন্দ-নীরে কেন ডুবিল না হায়,
হীন ক্রোধ? কেন শাস্তি দিনু শর্ম্মিষ্ঠায়?
বিবাদের বিপদের সমগ্র কাহিনী
কহিনু পিতারে কেন? কন্যা-প্রাণ তিনি,
ক্ষিপ্ত প্রায় কহিলেন, "ত্যজি দৈত্যালয়,
যাব চলি এ মুহূর্ত্তে।"

"তাও না কি হয়।
দৈত্যকুল বাঁচে কভু শুক্রাচার্য্য বিনা?
এত বড় কুল ধ্বংস শেষে হবে কি না—
এক বালিকার দোষে! প্রায়শ্চিত্ত তার
করুক সে। রোষ, দেবি, কর পরিহার
শাসি সেই দুর্বৃত্তারে; দাসী কর তারে,
অপমান করেছে যে আচার্য্য-কন্যারে।"
কহিলেন পায়ে ধরি দৈত্যকুলরাজ,—
স্মরিয়া লজ্জায় আমি মরিতেছি আজ।

পিতার আদেশে সখি মাথা নত করি
করিলা মার্জ্জনা-ভিক্ষা, মোর পায়ে ধরি।
সেই দিন হতে হল নানা গুণযুতা
অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী বৃষপর্ব্ব-সুতা

আচার্য্য-কন্যাব দাসী। বাজাব নন্দিনী
সৌধ ত্যজি পর্ণশালে হইল বন্দিনী।
তাব পব তুমি যবে মোবে এলে লযে
তোমাব ঐশ্বর্য্য মাঝে, সেও দাসী হযে
এল মোব সাথে। আমি কৃপণেব মত
যত সুখ, যত ভোগ, স্বামি-গর্ব্ব যত,
দুহাতে বাখিনু ধবে, আপনাব তবে,
না দেখিনু পার্শ্বে মোব কাব আঁখি ঝবে
বিগত গৌবব স্মবি, ছাড়ি প্রিযজন
বৃন্তচ্যুত পুষ্প সম, কবি বিতবণ
মৃদুল সৌবভ, কে যে শুকাইছে ধীবে,
তুমি দেখেছিলে,—তাও দেখি নাই ফিবে।
তব গৃহে দাসীব কি ঘটিত অভাব?
তাহা নহে, এ কেবল দীনেব স্বভাব,
বাজকন্যা দাসীরূপে দেখাব সকলে,
তাই আনিলাম সাথে, সখী স্নেহ-ছলে।
সখিরূপে দিযাছিনু স্নেহ কতখানি?
সে আমাব দাসী, আব আমি বাজবাণী,
এই জানাযেছি তাবে। শত ক্ষুদ্র কাজে
মোব প্রসাধন-কর্ম্মে, মোব গৃহ সাজে
তাব কাছে এতটুকু ত্রুটি পাই নাই।
সে ছিল বাজাব কন্যা সে জানিত তাই
ঐশ্বর্য্যেব ব্যবহাব। তপস্বিনী আমি
শুধু জানিতাম আমি পাইযাছি স্বামী
মহাবাজ যযাতিবে। নিশ্চিন্ত সে জ্ঞানে
বাখি নাই স্বামী চিত্ত সদা সাবধানে।
যে করুণা উদ্ধাবিল, তোবে দেবযানি,
কূপ হ'তে তাই তোব দযিতেবে আনি
মুছাইল শর্ম্মিষ্ঠাব নযনেব নীবে,
তাব পব গুণমুগ্ধ প্রেম ধীবে ধীবে
মিশিল করুণা সাথে।
মূঢা বুঝি নাই
আমি যে নির্গুণা, হীনা, শর্ম্মিষ্ঠাব ঠাঁই।
কঠোব ভর্ৎসনা কবি পতি, সপত্নীবে

ঈর্ষা-দগ্ধ পিতৃগৃহে আসিলাম ফিরে।
এতদিনে বুঝিয়াছি সব নিজ দোষ,
অযথা ভর্ৎসনা, মোর অযথা সে রোষ
ঢালিনু পিতার প্রাণে।

যযাতি। ন্যায্য সে ভর্ৎসনা
যাহা কিছু কহিয়াছ, তার এক কণা
নহে মিথ্যা, তেজস্বিনি! যোগ্য তারে ক্রোধ,
যে অসীম বিশ্বাসের দেছে প্রতিশোধ
বিশ্বাসঘাতক হয়ে—হোক্ যে কারণ।
তুমি যে অখণ্ড প্রেমে বরিলে এ জনে
তাহার অযোগ্য ছিল, ক্ষত্র তব পতি,
বলেছিলে তুমি—সে তো সত্য কথা অতি।

দেবযানী। তুমি চেয়েছিলে ক্ষমা, আমি ক্রোধ-ভরে
বলেছিনু,—ক্ষমা নাই রমণীর তরে
যে পাপের, সেই পাপ করি, চিরদিন
অসংযত পুরুষ সে ধৃষ্ট, লজ্জাহীন
অদণ্ডিত রহে সুখে এই পৃথিবীতে;
সতীত্বেরে বাখানিয়া চাহে তা দেখিতে
কেবলি নারীর মাঝে; নারী তারে ক্ষমি
করে নিজ সর্ব্বনাশ, তার পায়ে নমি।
পুরুষ প্রবৃত্তি'পরে না লভিলে জয়,
নারীর সতীত্ব রবে? হোক্ সে নির্দ্দয়,
হোক্ ক্রোধে অগ্নিশিখা, হোক্ ক্ষমাহীনা,
দেখিবে এ নরকুল শুদ্ধ হয় কি না।

যযাতি। নহে অর্থহীন কথা। তবু ক্ষমা চাই,
যা হয়েছে তার যবে প্রতিকার নাই,
ক্ষমার কি নাহি যুক্তি?

দেবযানি। আছে কুলাচার,
দেশ-কাল-পাত্র ভেদ, কত কিছু আর।
ইহাও ভাবিতে ছিল, করিতে স্মরণ,
বিপ্রকন্যা ক্ষত্রিয়েরে করেছি বরণ—
বহুপত্নীকের জাতি। ব্রাহ্মণের রীতি,
নিয়ম, সংযম, তার এক-পত্নী-প্রীতি—
ক্ষত্রিয়ানী দেবযানী সে সবের লোভ

কেন রাখে? কেন হেন ক্রোধ আর ক্ষোভ
উন্মত্ত করিবে তারে?

যযাতি। "আর নাই ক্রোধ?
বল প্রিয়তমে! তবে রাখ অনুবোধ,
চল নিজ গৃহে তব। তব সিংহাসন
শর্ম্মিষ্ঠা চাহে না কভু। দাসীব মতন
চিরদিন পদসেবা কবিবে তা জানি;
ফিরে চল দেবযানি, মোর মহারাণী!

দেবযানী। ফিবিবাব পথ মোর নাই, আব নাই।
শর্ম্মিষ্ঠাব পতিগৃহে আমি নাহি চাই
পত্নীত্বের অধিকাব। স্বামী-গৃহ মম
ছিল যা হৃদযে আজ ভগ্ন-চূর্ণতম,
আর উঠিবে না গড়ি। সেথা সমাদবে
স্বামী ব'লে বসাইতে নাবি প্রেমভবে।

যযাতি। আছে পুত্রদ্বয় তব, তাহাদেব স্নেহে
ফিবে চল স্নেহময়ি, তব পুত্র-গেহে।

দেবযানী। পুত্র কথা শুনাইলে। বল হে বাজন্,
হয়েছে কি তাবা তব স্নেহেব ভাজন?

যযাতি। তাতেও সন্দেহ আছে?

দেবযানী। বড ক্ষোভ প্রাণে,
শর্ম্মিষ্ঠাব পুত্র পুরু আত্ম সুখ দানে
তোমারে করেছে সুখী, ধন্য আপনাবে,
যশস্বিনী জননীবে। আমি বাবেবাবে
নিজেবে জিজ্ঞাসি কেন আমাব সন্তান
পাবে নাই সাধিতে এ [illegible] সুমহান?
অসহিষ্ণু দেবযানী আত্ম-সুখ মাগি
ফিবিয়াছে চিবদিন; অপবের লাগি
কি কবে দিয়াছে ছাড়ি? কি দিযাছে বলি
প্রেমেব চরণে? শুধু আপনারে ছলি
শুদ্ধি সংযমের নামে পূর্ণ অভিমান
ফিরিযাছে, অসন্তোষে বোষে ভরি প্রাণ,
শুনায়ে কঠোরা বাণী, দিয়া অভিশাপ
বাড়ায়েছে চারিদিকে আশ্রম-সন্তাপ।
যে মহাপ্রাণতা পুত্র পুরুব মাঝাব,

যদুর অন্তরে আমি কোন্ বীজ তার
পেরেছি রোপিতে কভু? আমি বটে সতী?
কি কবেছি করণীয় পতি-পুত্র প্রতি?
শর্ম্মিষ্ঠা সুন্দরী, শান্তা, শিল্প-কলাবতী,
যত হোক্ সে গৌরব, প্রেম তার অতি
না থাকিলে, হেন পুত্র জনমে কি তার?
তাই শর্ম্মিষ্ঠারে করি শত নমস্কার।
সে কথাই মহারাজ, চাহি জানাইতে,
তার প্রতি আব রোষ নাহি মোর চিতে।
শর্ম্মিষ্ঠাই ভার্য্যা তব, যোগ্য প্রজাবতী,
তাবে লয়ে থাক সুখে। দেবযানী-পতি
হোক্ অতীতের স্মৃতি। মুক্ত জরাভার,
বলিষ্ঠ কর্ম্মিষ্ঠ তনু ল'য়ে পুনর্ব্বার
হও দেবকার্য্য-বত, প্রজাহিতকামী,
বীরভোগ্যা ধরণীর অসপত্ন স্বামী।
পিতার ক্রোধাগ্নি জ্বালি দহি তব দেহ,
আমি যে জ্বলেছি কত, জানিবে না কেহ,
যাও ক্ষমি ক্ষুব্ধ প্রেমোত্থিত হলাহল,
তীব্র ঈর্ষা, যাও ক্ষমি দীপ্ত রোষানল।
আজ তোমা নিরাময় হেরি, প্রিয়তম!
নির্ব্বাপিত মোর জ্বালা, স্বস্থ চিত্ত মম।

*আশ্বিন,* ১৩২৯

# শরদাগমে

## নরেন্দ্র দেব

কোন অলকাব আলোকে প্রপাতে অবগাহী উঠে এলে
হে শবৎবাজ, একি রূপ আজ ত্রিভুবনে দিলে মেলে?
অরুণ কিবণে সিঞ্চিত তব কুঞ্চিত কেশদাম,
করুণ কান্ত কমনীয মুখ অনিন্দ্য অভিবাম,
নির্ম্মল নীল নযন-প্রান্তে উজ্জ্বল জ্যোতি জাগে,
দীপ্ত স্নেমাব দিব্য-মূবতি আনন্দ অনুবাগে।
তরুণ তাপস, তনু-তটে তব নব-চম্পক প্রভা,
হোমশিখা প্রায উন্নতকায উদ্বাহু মনোলোভা,
পীত পবিত্র কৌষেয বাস সোনালী উত্তবীয,
ললাটে লিপ্ত চন্দন লেখা ভুবন বন্দনীয,
ওগো ঋত্বিক ঋতুকুল ঋষি তব অক্ষন-বেশ
শুভ্র-শুচিতা সংযমে হেবি দেবতাব উন্মেষ,
সুরু কবিযাছ একি মহাবতি বিশ্ব-প্রকৃতি ঘিবে,
সপ্ত-বর্ণ ববি-কব-দীপ তব করে নাচে ধীবে,
কাশেব চামব চৌদিকে আজ লীলাযিত লযে দোলে
অগুব ধূপেব সুগন্ধ বহে সুমন্দ হিল্লোলে
তাবি সুবভিত শুভ্র ধোঁযা কি উঠেছে ধবণী বেযে,
লঘু মেঘ-বথে বলাকাব প্রায চলেছে আকাশ ছেযে?
দেখেছো ধৌত ধবণীব 'পবে শ্যাম তৃণাসন পাতি
বিশাল চন্দ্রাতপ তলে জ্বেলে লক্ষ তাবাব বাতি,
জ্যোৎস্না-উজল আল্‌পনা আঁকা দেবীব পূজাব পাটে,
পূর্ণ সলিলা শত সবসীব ভবাঘট ঘাটে ঘাটে,
বাজে মাঝে মাঝে দামামা ডমরু গুরু গুরু গর্জ্জনে,
ঝরে ঝঝব শান্তিব ধাবা ত্রিলোকেব তর্পণে।
দামিনী দমকে চমকিযা ওঠে তড়িৎ-খড়্গ তব,
অঞ্জলিপুটে বিপুল অর্ঘ্য অপূর্ব অভিনব,
মৃণালেব কোলে কমল কুমুদ কুরুবক কবতলে
গববী কববী সুবভি বিলায কামিনী কেতকীদলে,

কুন্দ কলির মন্দার হার অপরাজিতার মালা
নন্দন-বন পারিজাতে আজ পূর্ণ পূজার ডালা।
কনক ধান্য-মঞ্জরী সনে নবীন দূর্ব্বাদল
তোমার রজত অর্ঘ্য-পাত্র করেছে সমুজ্জল!
তব কণ্ঠের স্তুতি-গীতি-গাথা অরণ্য মর্ম্মরে,
শঙ্খ তোমার ধ্বনিত সঘনে দিগন্ত অম্বরে!
তোমার বিরাট পূজা-মণ্ডপে সুখ-মুখরিত দিশা
পুণ্য প্রভাত, প্রমোদ প্রদোষ উৎসবময়ী নিশা;
ডাকে যেন তারা ডাকে যেন আজ পরিচিত কোন্ সুরে
আয় ফিরে আয় হিয়ায় হিয়ায় মিলিবি কে সুরপুরে?
ফেলে সব কাজ ছুটে আয় আজ, বল্লভ বন্দনে,
দু'বাহু বাড়ায়ে দাঁড়ায়ে দুয়ারে দরদী যে দিন গোণে!

*কার্ত্তিক, ১৩৩০*

# শারদ লক্ষ্মী

## বন্দে আলী মিয়া

পরীর সাদা মেঘ, ভেলাতে অথই ঘন গগনে
নামলে যদি, ঘরকে এস আজকে শুভ লগনে।
বেণুর বনে বাজচে দূরে তোমার আশা বাঁশরী,
তমাল তালে ঢেউ লেগেচে আঁচল তব না সরি'।
গমকে চলা কাঁপন আনে মুকুট ঝলে বাতাসে,
কাশের বনে চামর দোলে আসন চির পাতা সে।
শিউলি ঝরে অঝোর ধারে হাসির চাপা মাধুরী,
কনকচাপা খোঁপায় পাড়া কবির প্রিয়া আদুরী।
উতল বায়ে মাতাল নদী লাসের লীলা গমকে
সুদূর হতে ডাক্‌তে গিয়ে পরশ লাগি চমকে।
ভোরের রাঙা তরুণ আলো হানচে কি সে বেদনা,
পরবাসীর জমাট করা ভোলায় দুখ চেতনা।
সবুজ তব আল্‌তা রেখা উদাস চলা চরণে,
শিমূলতলে যাচ্চে মুছে উড়চে শাড়ী পবনে।
কাদচে কে গো প্রিয়ের লাগি রুদ্ধ ঘরে একাকী,
সেই ব্যথাতে জাগচে মনে স্মৃতির-ধোয়া লেখা কি?
পথিক কে সে বাসতো ভালো সোহাগ ভীরু নয়নে,
দুইটি চোখে একটি দিঠি কাঁপতো মায়া বয়নে।

*কার্তিক ১৩৩১*

# সুখ শেষের গান

**অন্নদাশঙ্কর রায়**

সুখের দিনের গান গাই, আর
দুখের কথা ভাবি—
হাল্‌কা পাখায় নামবে যখন
বিষয় বোঝার দাবী,
যখন তলার টানে
টান্‌বে ধূলার পানে,
মেঘের ভারে শ্বস্‌বে আকাশ
বেলা শেষের তানে,
তখন পাখী কর্‌বে কি?
কণ্ঠে লয়ে গানের সুধা
দুঃখকেও বরবে কি?
—সুখ শেষের গানে?

চপল সুরের গান গাই, আর
গভীর কথা ভাবি—
মুক্ত পাখায় ঘিরবে যখন
বাঁধা নীড়ের দাবী,
যখন বাহুর টানে
টান্‌বে বুকের পানে,
রঙে রঙে রাঙবে আকাশ
বেলা শেষের তানে,
তখন পাখী করবে কি?
কণ্ঠে লয়ে গানের সুধা
বদ্ধ হৃদয় ভরবে কি?
—মুক্তিশেষের গানে?

সহজ হাসির গান গাই, আর
কঠিন কথা ভাবি—
চোখের পাখায় জমবে যখন

চোখের জলের দাবী,
যখন ভাঁটার টানে
টানবে বিচ্ছেদ পানে,
ফুলে' ফুলে' কাঁদবে আকাশ
বেলা শেষের তানে,
তখন পাখী কর্‌বে কি?
কণ্ঠে লয়ে গানের সুধা
আশায় জীবন ধরবে কি?
প্রেমে শেষের গানে?

তরুণ প্রাণের গান গাই, আর
জরার কথা ভাবি—
অধীর পাখায় লাগবে যখন
ক্লান্তি কালের দাবী,
যখন শিথিল টানে
টানবে আরাম পানে,
তন্দ্রাযোগে ঢলবে আকাশ
বেলা শেষের তানে,
তখন পাখী করবে কি?
কণ্ঠে লয়ে গানের সুধা
যৌবন লোক গড়বে কি?
— স্বপ্ন শেষের গানে?

ক্ষণিক আলোর গান গাই, আর
ঝরার কথা ভাবি—
ফুলের পাখায় বাজবে যখন
সাঁঝের হাওয়ার দাবী,
যখন নিবিড় টানে
টান্‌বে ধরার পানে,
আঁধার হয়ে আসবে আকাশ
বেলা শেষের তানে
তখন পাখী করবে কি?
কণ্ঠে লয়ে গানের সুধা
তৃপ্ত মরণ মরবে কি?
—সর্ব শেষের গানে?

অগ্রহায়ণ ১৩৩৫

# স্মরণে

## কান্তিচন্দ্র ঘোষ

আমার ললাটে তব মঙ্গল পরশ
পেয়েছিনু কত দিন প্রভাতে সন্ধ্যায়,
কর্মহীন, খ্যাতিহীন মধ্যাহ্ন অলস
শীতলি' রাখিলে তুমি তব স্নেহছায়।
কত না সুদীর্ঘ রাতি বসেছিলে জাগি'—
বাহিরে আঁধার ঘন, ঘরে দীপ জ্বালা,
একটি চরণ-শব্দ শুনিবার লাগি'—
উন্মুক্ত দুয়ার-পাশে একান্ত নিরালা।

আজো আসিয়াছি ফিরে মৌন সন্ধ্যাবাতে,
অবসন্ন দেহভার, ক্লান্ত খিন্ন মনে—
দুয়ারে দাঁড়ায়ে নাই গন্ধ-দীপ-হাতে
কল্যাণ মুরতিখানি পূজা সমাপনে।
আমার যা' কিছু চাওয়া—স্নেহ, সেবা, প্রীতি—
তুমি নিয়ে গেছ চলে'—আছে শুধু স্মৃতি!

* * *

বাদল নিশীথে আজো চমকিয়া জাগি'- -
রুদ্ধ ঘরে দেখি যেন—ঝঞ্ঝার প্রলয়ে
ফিরে আসিয়াছ তুমি; অপলক-আঁখি---
শিয়রে দাঁড়ায়ে আছ অনিশ্চিত ভয়ে।
স্বপনে ললাট 'পরে নিঃশ্বাস পরশ
পাই যেন মনে হয়—যেন মোর লাগি'
বসে' আছ ধ্যানরতা নিস্পন্দ অবশ—এ
দেবতা-চরণে মোর শুভ ভিক্ষা মাগি'।

যেন শুনিবারে পাই অশরীরি বাণী—
মরতের স্নেহ-ভীত আকিঞ্চনে ভরা—
সুদূর স্বরগ হতে'—জানি, ওগো জানি—

বহে' আনে বার্ত্তা তব সর্ব্বভয়হরা।
যেন বলিবারে চাহে আমারেই 'যাচি'—
বেঁচে আছি--বেঁচে আছি—আমি বেঁচে আছি।
ভালবেসেছিলে তুমি—চাহ নাই কভু
বিনিময়ে আনন্দের তুচ্ছ আয়োজন,
পাও নাই স্নেহ স্পর্শ—মেনেছিলে তবু
বিদ্রোহী চিত্তটি—তার নিঠুর শাসন।
শুনেছিলে, স'হেছিলে প্রসন্ন বয়ানে
কত না কঠোর বাণী, বুঝেছিলে মোর
অশান্ত হিয়াটী যাহা ক্ষুব্ধ অভিমানে
জানে নাই—আপনার গরবেতে ভোর।

ফুটেছিল কণ্ঠে তব শেস আশীর্ব্বাণী,
মরণ-আহত করে স্নেহের পরশ
লয়েছিনু শিরে তুলি পুণ্য বলে মানি-
শুষ্ক হিয়া অশ্রু মোর রসনা অবশ।
তবু কেন মনে হয়—অন্তিম শয়ানে
মু'খানি জাগিয়া ছিল মৌন অভিমানে।

* * *

অপমান-ক্ষত হিয়া নতাশরে ফিরি'
শূন্য ঘরে বসে থাকি নীরবে একেলা—
বিশ্বের আনন্দটুকু কল্পনাতে ঘিরি'
কেটে যায় অন্তরের শুষ্ক দীর্ঘ বেলা।
তোমারে তো বলি নাই রুদ্ধকণ্ঠে কভু
ক্ষুব্ধ হিয়াটির মোর দীর্ঘ ইতিহাস
গোপন ব্যথাটী তার, বুঝেছিলে তবু—
অভিমানে ছিল কত অতৃপ্ত পিয়াস।

আজি জেগে নাই কারো পথ চাওয়া আঁখি
মোর গৃহ-বাতায়নে—তপ্ত অশ্রু দিয়া
মুছিতে লাঞ্ছনা-ক্ষত বক্ষপুটে ঢাকি
মোর তরে চিররুদ্ধ নিখিলের হিয়া।
অভিমান? কার 'পরে? শুধিব কি দিয়ে
সর্ব্বহারা আজ আমি সবটুকু নিয়ে।

*বৈশাখ, ১৩৩২*

## দুঃখ

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

এই যে ঘিবিয়া মোরে নাচে ঢেউগুলি
গরজি গভীর হাহাকারে,
আঁকড়ি রাখিতে চাহে ধরণীর ধূলি
কিনারে আছাড়ি বারে বারে—
তুমি যে অন্তরে মোরে রয়েছ আগুলি
ওরা কি তা' পারে জানিবারে?
এ মোরে করালে খেলা এই সারারাত
সাগরের সাথ,
এ পারে যে দিয়েছে প্রভাত।

১৩৩১

# গান ও স্বরলিপি

কথা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুর—(মিশ্র তিলক কামোদ—বেহাগ ঝাঁপতাল)—দিলীপকুমার রায়

তোমার বীণা আমার মনোমাঝে
কখনো শুনি, কখনো ভুলি,
কখনো শুনিনা যে ॥ ধ্রু॥
আকাশ যবে শিহরি উঠে গানে
গোপন কথা কহিতে থাকে
ধরার কানে কানে,
তাহার মাঝে সহসা মাতে
বিষম কোলাহলে
আমার মনে বাঁধনহারা
স্বপন দলে দলে।
হে বীণাপাণি, তোমার সভাতলে
আকুল হিয়া উন্মাদিয়া বেসুর হয়ে বাজে,
তোমার বাণী কখনো শুনি কখনো শুনিনা যে।।
চলিতেছিনু তব কমলবনে,
পথের মাঝে ভুলালো পথ উতলা সমীরণে।
তোমার সুর ফাগুন রাতে জাগে,
তোমার সুর অশোকশাখে অরুণ রেণু রাগে।
যে সুর বাহি চলিতে চাহি আপন ভোলা মনে
গুঞ্জরিত ত্বরিতশাখা মধুকরের সনে,—
কুহেলি কেন জড়ায় আবরণে,
আঁধারে আলো আবিল করে, আঁখি যে মরে লাজে।
তোমার বাণী কখনো শুনি কখনো শুনিনা যে।।

* গত ১২ই এপ্রিল তারিখে কবিবর শান্তিনিকেতনে আমাকে তাঁর এই স্বরচিত গানটিতে সুর দিতে বলেন। তার পর দিন গানটিতে এই সুরটি সংযোজিত করে তানালাপ শুদ্ধ আমি তাঁকে শোনাই। বাহুল্যভয়ে বর্ত্তমান গানটিতে সে সব তানালাপের স্বরলিপি দিলাম না। কেবল এই কথা বলে রাখা দরকার মনে করছি যে সেরূপ তানালাপ কবিবরের সুর সংযোজন ভঙ্গীর প্রতিকূল হওয়া সত্ত্বেও তিনি খুব খুসি হয়েছিলেন ও বলেছিলেন যে তাঁর যে-কোনও গানে অপরে স্বরচিত সুর সংযোজন করে গাওয়া সম্পর্কে তাঁর পূর্ব্ব মতের পরিবর্ত্তন হয়েছে। অর্থাৎ এখন তাঁর মত এই যে তাঁর গানে কেউ সম্পূর্ণ নূতন সুর দিয়ে গাইলে সেটা অনুচিত হয় না। এ সূত্রে তাঁর সঙ্গে যে কথাবার্ত্তা হয়েছিল তা ভারতবর্ষে প্রকাশিত হবে।

+ ৩ ১

|| { না পা -া না সা | রগা রা সনা সা | নসা রগা মপা ধপা মগা | সরা গমা গরা গরা সন্‌। } ||
তো মা র বী ণা আ মা র ম নো মা ঝে

মা রা মা মা মা পা ধা ^ধপা মা গমা | ^রগা রা পা মা গা || সরা গমা গরা সনা ধ্‌না | || ||
ক খ নো শু নি ক খ নো ভু লি ক খ নো শু নি না যে

মা পা পা না না | না র্সা পা না র্সা | র্রা না র্সা । -া -া ||
আ কা শ য বে শি হ রি উ ঠে গা নে

রর্গা র্রা র্মা র্গা র্গা | র্সার্রা র্গর্রা সনা র্সা | র্পা না । সার্রা নরা সার্সা ণা ধা পা |
গো প ন ক থা ক হি তে থা কে ধ রা র কা নে কা নে

ম রা । মা মা | পা পা ধা পমা পা ধা সা সা ণা পা | মপধা মপা মগা মরা-া |
তা হা র মা ঝে স হ সা মা তে বি স্ম কা লা হ লে

গা রগা । মা ^ধপা | মা গা মা রা সা | সা গা গমা গরা গা | মা পক্ষা পা । । |
আ মা র ম নে বা র ন হা রা স্ব প ন দ লে দ লে

গা মা পা না না | না না । না সা | ধনা রসা সা । । |
হে বী ণা পা ণি তো মা র স ভা ত লে

সা সা র্রর্সা পা পা | পা ধা ু পা মা গা | সা রা গা মগা রগা | ^রনা ^রসা না । । |
আ কু ল হি য়া উ ন মা দি য়া বে সু র যে বা জে

মা মা রা মা মা | পা পধা ^গপা মা গমা | ^রগা রা পা ‿ গা | সরা গমা গরা সনা ধনা | || ||
তো মা র বা ণী ক খ নো শু নি ক খ নো নি না যে

সা সা সা গা গমা | পা পা' পা ^। পা ^সগা | মা । গা । । |
চ লি তে ছি নু ত ব ক ম ব নে

পা পা । ক্ষা পা | না না ন ক্ষরা পপা | মা গা ^রগা ম পধা | পমগা ^পমা ণা । । |
প থে র মা ঝে ভু লা লো প থ উ ত লা স মী র ণে

গা মা পধা নর্সা না | না না না না র্সা | ণর্সা -া র্সা -া -া |
তো মা র সুর ফা গু ন রা তে জা - গে - -

র্সা র্সা -া না পা | পা না ধা র্সা না | পা পা ধপা গা পা | গা -া ধগা -া া |
তো মা র সু র অ শো ক শা খে অ রু ণ রে ণু বা - গে -

সা সা গা গা মা | পা না না না র্সা | র্সা র্সা র্সা র্সা ণধা | ধনা র্সনা ধা পা ক্ষপা |
যে সু র বা হি চ লি তে চা হি আ প ন ভো লা ম - - নে -

র্সা া র্সা ণা ণধপা | পা ধা পগপা মা গমা | ধগা ধগা মা ধপা মা | গা -া ধসা া া |
গু - ঞ্জ রি ত ত্বরি ত পা খা ম ধু ক বে ব স - নে - -

সা সা গা গা মা | পা না না র্সা র্রা | র্সা নর্সা র্রর্সা নধা | নর্রা র্সনা ধপা মগা রসা |
কু হে লি কে ন জ ড়া য় আ ব র - ণে - - - -

সা সা গা গা মা | পা না না র্সা গর্রা | র্সা না র্রর্সা নর্সা না | ধনা র্সবা নর্সা া -া |
কু হে লি কে ন জ ড়া য় আ ব র ণে - - -

র্সা র্গা র্গা র্গা র্গর্মা | ধর্গা ধর্গা ধর্গা র্রর্স না র্সা | পা না না না র্সা | ধনা ধর্সা না া -া |
আঁ ধা রে আ লো আ বি ল ক বে আঁ খি যে ম রে লা - জে -

র্সা নর্বা র্সসা পা পা | পা পধা পগপা মা গমা | ধগা বা পা মা গা |
তো মা র বা ণী ক খ নো শু নি ক খ নো শু নি

সরা গমা গা সন্‌া ধন্‌া | || ||
না - - যে -

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩

# রসরচনা

# খেতাব-বিভ্রাট

## শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

কোন এক শুভ মুহূর্তে শহর হইতে বহু দূরে যাদবপুর গ্রামে তিনকড়িবাবু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্থানীয় গণৎকার পঞ্চানন ঠাকুর বলিয়াছিলেন, এ-ছেলে বাঁচিয়া থাকিলে রাজা-উজির একটা কিছু না হইয়া যায় না। সে আজ প্রায় চার যুগ আগের কথা, তখন পিসিমা জীবিতা। ঠাকুর মহাশয়ের ভবিষ্যৎ বাণীর উপর তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল।

পিতৃমাতৃহীন এই ক্ষণজন্মা শিশুটিকে মানুষ করিবার ভার পড়িয়াছিল পিসিমার উপর। ভবিষ্যৎ বাণীতে দৃঢ় বিশ্বাস থাকায় বালক তিনকড়িকে পরিপক্ক বয়স পর্যন্ত যাবতীয় মাদুলি, গাছের শিকড় এবং ফুল ভূষিত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত থাকিতে হইত। বিভিন্ন মাদুলির ক্ষমতা দৈবদুর্বিপাকের উপর বিভিন্নভাবে কায করে, সুতরাং কাহাকেও অবহেলা করিবার উপায় ছিল না। কোনটিকে প্রাতে ধৌত করাইলেই যথেষ্ট হইত, কোনটি তুলসীতলায় তিনবার স্পর্শ করাইলেই চলিত, কোনটিকে সামনে রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ইস্টদেবতাকে স্মরণ করার ব্যবস্থা ছিল।

কাপ্তেন সাহেব কুচকাওয়াজে যেভাবে প্যারেড দেখেন পিসিমা প্রত্যহ প্রাতে তিনকড়িকে সামনে দাঁড় করাইয়া উক্ত সাধনায় নিযুক্ত করিয়া ছাড়িতেন। ফলে শান্তিতে ভ্রাতুষ্পুত্রের বয়স বাড়িতেছিল। বিঘ্ন আসিল প্রাপ্ত বয়সে—অকস্মাৎ রায় বাহাদুর খেতাব-প্রাপ্তির সম্ভাবনায়।

রাজসম্মান আগতপ্রায় হইবার পূর্বে তিনকড়িবাবুর পুরাতন কথা কিছু জানা দরকার। তাহার পিতা সাতকড়ি বাঁড়ুজ্যেকে গ্রামের সকলেই বিশেষভাবে চিনিত। তাহার আর্থিক স্বচ্ছলতার উপর কাহারও ভ্রূর কটাক্ষ যে একেবারে ছিল না একথা নিশ্চিতভাবে বলা চলে না—যদিও গ্রাম্য স্বচ্ছলতার অর্থে যাহাই হউক না কে চার-পাঁচটি গরু, মরাই ভরা ধান, একটি নিজস্ব স্ত্রী ও ঢেঁকি ছাড়া আর কিছু বুঝায় না , অধিকন্তু কিছু থাকিলে অবৈতনিক একটি বিকলাঙ্গ চাকর যোগ দেওয়া চলিতে পারে। পিতা গত হইবার পর উক্ত সম্পত্তির মালিক হইয়াছিলেন পিসিমার ভ্রাতুষ্পুত্র। স্বচ্ছলতার প্রভাব ও পিসিমার নিত্য বাঁধা স্নানের প্রয়োজন উপযুক্ত সময় উভয়ের স্কন্ধ ভর করিল। স্থির হইল তিনকড়ির উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ—অন্তত একটা পাশ না করিলে ভবিষ্যৎ জীবন মাটি হইয়া যাইতে পারে। গ্রামে পাশ করা চলে এমন একটি পাঠশালা নাই, সুতরাং শহরে যাওয়া সাব্যস্ত হইল। চরিত্র নিষ্কলঙ্ক রাখিবার নিমিত্ত তিনকড়ি কৈশোর অবস্থাতেই পাণিগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শ্বশুর মহাশয়ের জমিদার মিঃ রেই আজীবন কলিকাতাবাসী। অফুরন্ত সময় ভোগ করিবার জন্য নিত্য নব কৌশল আবিষ্কার করিয়া আসিতেছেন। বয়স পিসিমার নাগাল

ধরিলেও ঘসামাজার ফলে তাহা আড়াল পড়িয়া গিয়াছে। মিঃ রেই আসলে বাঙালি হইলেও ধর্মত স্বভাবটি সাহেবি। ইহার জন্য তাঁহার বিবাট সম্পত্তি ও ভগ্নাংশভাবে ইংরেজি শিক্ষা দায়ী। হস্তবুদ হইতে সরকারি পেশকস দিয়া তাঁহাব যাহা মুনাফা থাকিত তাহাতে তিনটি বিরাটকায় নামজাদা মোটর গাড়ি ও তদুপযুক্ত পারিপার্শ্বিক সব কিছু সাজাইয়া না বাখিলে তাঁহার ইজ্জৎ হানি হইবাব সম্ভাবনা ছিল। বাড়ির বাহির মহলে পদার্পণ করিলে খাস বিলাতি কোন লর্ডের প্রাসাদ বলিযা ভ্রম হইত। ডাইনিং রুম্, বিলিয়ার্ড রুম্, ড্রইং রুম্ ছাড়া সীমার মধ্যে অসীম ধরনের নাচঘর—যাহাতে ফরাসের চিহ্নমাত্র নাই। কাঠের ফ্লোর কাঁচের মত মসৃণ, অনভ্যস্তের পা পড়িলে শ্যাওলার মত পিছলাইয়া যায়। কারণ অকারণে তাঁহার বাড়িতে পার্টি ও মজলিশ হইত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিমন্ত্রিতেরা সাহেবি মহল হইতে আসিতেন। এহেন মহাপুরুষেব বিবাট অট্টালিকায় পিসিমা ভ্রাতুষ্পুত্র সহ বাসবাস আরম্ভ করিয়া দিলেন কোন এক দূর আত্মীয়তার দাবি সূত্রে।

স্নেহের আতিশয্যে পিসিমার দখল ছিল, যাহার সময়োপযুক্ত প্রয়োগকে ফাইন আর্ট বলা চলে। এই আর্ট অতি অল্প সময়ের ভিতর মিঃ রেইকে এমন ভাবেই নিস্তেজ করিয়া আনিল যে, অন্দরমহলেব সব কাজে পিসিমাব তত্ত্বাবধান না থাকিলে সাহেবের মনস্তুষ্টি হইত না। কানাঘুসা শুনা যায়, তিনি নাকি যথেষ্ট কাবণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও টেবিলের বিলাতি খানা ছাড়িয়া অন্দরমহলে খাঁটি পুঁইডাটা, শুক্তনিব ঝোল ইত্যাদির আস্বাদ লইতে আরম্ভ করিয়াছেন। কথাটা বিশ্বাস করিবার দুঃসাহসিকতা সকলের না থাকিলেও নূতন বাহাল করা ভিয়ান ঠাকুর সত্য বলিয়া জানিত।

সময় কাহারও অপেক্ষা রাখে না, সে তার চিরন্তন গতির ধর্ম বক্ষা করিয়া চলিয়াছে। রেই সাহেব রাজা মহারাজা ইত্যাদি বড় বড় খেতাবের ধাপ উত্তীর্ণ হইযা বার্দ্ধক্যের সীমানায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। নাচঘরে ক্বচিৎ বাতি জ্বলে, পার্টি ও ভোজের ভিড় কমিয়া গিয়াছে, কারণ তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য যাহা ছিল তাহা যতটা সম্ভব মহারাজা আদায় করিয়া ছাড়িয়াছেন, তদুপরি খেতাবের উপর ঋণ ভর করিলে যাহা হইয়া থাকে মহারাজা তাহার পীড়নের বাহিরে থাকিবার অবসর পান নাই, ফলে ধর্ম চিন্তায় তাঁহাব আসক্তি দেখা দিয়াছে। লোকের মুখ বন্ধ করা যায় না। তাহারা বলাবলি করিতেছে মহারাজা নাকি পিসিমার সহিত কাশীবাসী হইবেন ঠিক করিয়াছেন।

অন্যদিকে তিনকড়ি আর তিনকোড়ে নাই। মহারাজার সুপারিশে কোন প্রকারে এন্ট্রান্স পাশ করার পরই সবডেপুটির পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন (উপরওয়ালাকে খুশি রাখিবার টেকনিক তিনি পরম নিষ্ঠার সহিত আয়ত্ত কবিয়াছিলেন সুতরাং ফান্ডামেন্টাল রুলস্-এর অনেক আইনপাশ কাটাইয়া তাঁহার ডেপুটি হইতে সময় লাগে নাই)। ডেপুটি খাঁটি হাকিম—সাধারণে তাঁহাকে জজ ও বোনার্জি সাহেবের আসনে উঠাইয়া দিয়াছে।

ডেপুটির পদপ্রাপ্তির পর হইতে তাঁহার সহজ জীবনযাত্রার পরিবর্তন ঘটিল। একদিন প্রাতে অযথা সাহেবদের মত আঁট সাঁট পোশাক পরিয়া মরনিং ওয়াকের প্রবল ইচ্ছা

তাঁহাকে পাইয়া বসিল। হাঁটুর শর্ট তদুপরি বহু কষ্টে বেল্ট আঁটিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। হাঁটা অভ্যাস নাই অথচ হাঁটিতে পারিলে এবং দৈব সহায় থাকিলে উপর আলা কলেক্টার সাহেবের সহিত করমর্দন করিবার সুযোগ মিলিতে পারে। মনকে দৃঢ় করিয়া তিনি চলিতে লাগিলেন।

মিঃ গোনার্জী মর্ণিং ওয়াক করিতেছেন।

সুদর্শন না হইলেও মা-লক্ষ্মীর কৃপায় তাঁহার ব্যক্তিত্বে আকর্ষণী শক্তি ও বৈশিষ্ট্য ছিল যাহা নিঃসন্দেহে আরাম ভোগের পরিচয় দিত, অর্থাৎ—উদরের পরিধি এমন একটি আকার ধারণ করিয়াছিল যাহার সঠিক মাপের কোন কিছুই বাজারে পাওয়া যাইত না। জামা কাপড় ত দূরের কথা, ঈশ্বরদত্ত শরীরে যেটুকু সামঞ্জস্য ছিল তাহাও ভুলে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এখন তিনি ইচ্ছা করিলেই করজোড়ে নমস্কার করিতে পারেন না, রীতিমত চেষ্টা করিলে অঙ্গুলি প্রান্ত স্পর্শ করে মাত্র।

উক্ত দেহকে মরনিং ওয়াকে নিযুক্ত করা যে কি বিড়ম্বনা, ভুক্তভোগী মাত্রেই অনুমান করিতে পারেন। ঘর্মাক্ত কলেবরে তিনি চলিয়াছেন অথচ মনস্কামনা পূর্ণ হইবার কিছুমাত্র লক্ষণ দেখিতেছেন না। অবশেষে দুত্তোর বলিয়া মাঠের উপরই বসিয়া পড়িলেন। ক্লান্তি দূর হইবার পূর্বেই হৈ হৈ করিতে করিতে সওয়ার সহ বিরাটাকার এক ঘোটক--তাঁহার ঘাড়ে আসিয়া পড়ে আর কি।

যথাসম্ভব ক্ষিপ্রগতিতে পাশ কাটাইয়া হাঁটু জানু ইত্যাদি অঙ্গে ভর করিয়া যখন প্রায় সোজা হইয়াছেন তখন সাহেবি সওয়ার ক্রুদ্ধ ভাষায় অর্দ্ধ-উচ্চারিত বিশেষণগুলি সংযত করিয়া বলিলেন, তুমি! তোমার জন্য উচিত ছিল এটা টার্ফ—যেখানে আমাদের ঘোড়া ছোটে, সেখানে আরাম করিতে যাও কোন্ সাহসে!

মস্তক উত্তোলন করিয়া যখন দেখিলেন, মিষ্টভার্ষ সাহেব স্বয়ং ভগবান কালেক্টার, তখন তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল—'গুড মরনিং' বলিবেন কি ক্ষণিকের বিশ্রামের জন্য ত্রুটি স্বীকার করিবেন, স্থির হইবার পূর্বেই সাহেব ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন।

ইতিমধ্যে আর একটি গোল বাধিয়াছে। কালেকটারকে সম্মান দেখাইবার জন্য ব্যস্ততার

প্রয়োজন ছিল। তাড়াতাড়ি শরীরের গুরুভার উত্তোলন কালীন সাহেবি স্মার্ট (smart) ফিটিং তাঁহার বিপুল দেহের চাপ সহ্য করিতে পারে নাই। ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক, কারণ স্মার্ট ফিটিং লইয়া দেশিভাবে বসিবার কথা ছিল না। কুকার্য করিলে দণ্ডভোগ করিতে হয়। দুর্ভোগ কপালে যাহা ছিল তাহা ঘটিল। এমৎ অবস্থায় বাস্তায় হাঁটা যায় কি ভাবে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্ধ গাড়ি সামনে থাইকলেও তাহাতে ঢুকিবার সাহস নাই কারণ অল্পদিন আগের অভিজ্ঞতায় বাহির হইয়া আসিতে প্রাণান্ত হইয়াছিল ; তাহার পর শপথ করিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ি চড়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। একমাত্র উপায় গাড়োলি মনকে যদি কোন প্রকারে উদার করা যায় তাহা হইলে তাহার সাহায্যে একটি ট্যাক্সি জুটিতে পারে। এ চেষ্টাও বিপদসঙ্কুল। বেলা তখন প্রায় আট ঘটিকা, রাস্তার লোকের ভিড়ের সহিত দুই-একটি জ্যাঠা ছেলে চলিতে শুরু করিয়াছে। দুইশত গজ হাঁটিবার সময় পিছনে যে কোন জ্যাঠা ছেলের আবির্ভাব কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। আতঙ্কে তিনি আড়ষ্টভাবে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভক্তের জন্য ভগবান ডারবি সুইপ পর্যন্ত জোগাইয়া থাকেন, এ বিপদ ত কিছুই নয়। হঠাৎ এক ছাতাওয়ালার দর্শন পাইলেন। বুদ্ধিও আসিল তৎক্ষণাৎ। সে যৎসামান্য দক্ষিণা লইয়া এমন একটি ব্যবস্থা করিয়া দিল যাহাতে পিছনে গোরা থাকিলেও দুর্গানাম করিয়া অগ্রসর হওয়া চলে। এ যাত্রা মিঃ বোনার্জি সুস্থ দেহে বাড়ি ফিরিলেন।

শরতের হাওয়ায় পূজার আগমনী সুর বাঙলার সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বোনার্জি সাহেব এবার উৎসবে যোগ দিবেন ঠিক করিয়াছেন। আর্থিক অবস্থার সহিত কিছুমাত্র মিল না থাকিলেও দীর্ঘকাল একত্র বসবাসেব ফলে মহারাজার অভিজাতসুলভ আচরণ ও বাবুগিরি বোনার্জি সাহেব সস্তায় ভোগ করিবার সুবিধা পাইলে ছাড়িতেন না। তিনকোড়ে নামে যাঁহারা তাঁহাকে সম্বোধন করিতেন তাহাদের উপর এযাবৎকাল মস্ত ক্রোধ পুষিয়া রাখিয়া ছিলেন। তাহারাই সর্বাগ্রে চায়ের নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইলেন। চায়ের জন্য কখন কেহ নিমন্ত্রণ করে একথা অনেক প্রাচীনপন্থী জানেন না। তদুপরি এক পক্ষ আগে 'আর-এস-ভি-পি'-যুক্ত কার্ড আসিয়া উপস্থিত হইলে আদালতের সমনজারির মত হইয়া দাঁড়ায়। এতদিন ধরিয়া সামান্য চা খাইবার কথা মনে বাখা সকলের পোষায় না।

দেশি আচরণ মানিতে হইলে ইহা দোষণীয় মনে করি না, কারণ চা ত অতিথি হইলেই পাওয়া যায়, তাহা আবার দিন-ক্ষণ দেখিয়া খাইতে হইবে না কি?

মোটের উপর চায়ের পার্টি জমিয়াছিল ভাল। পবিচিত সাহেবি দোকানদার কেহ বাদ পড়েন নাই। ছোটখাট মহল অন্তর্ভুক্ত রায়তদারও অনেক উপস্থিত ছিলেন।

আবহাওয়া (weather), ঘোড় দৌড় ও পাশের বাড়ির কেলেঙ্কারির কথা লইয়া চায়ের আসর জমিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় কে একজন চিৎকার করিয়া উঠিলেন—ওহে তিনকোড়ে—

সম্বোধনটা বজ্রাঘাতের মত কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। কি সর্বনাশ, এ যে যাদবপুরেব হরে খুড়োর গলা। লোকটির আকাট বুদ্ধি ও স্বভাবের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই। সেই সবল দীর্ঘকায় ও ভীতিপ্রদ দেহটি এখনও ঠিক রাখিয়াছেন, হস্তেও সেই পুরাতন বাঁশের সোঁটা—যাহার ইতিহাস গ্রামে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে।

ভদ্রাচাবে দীক্ষিত মিঃ বোনার্জি মুখে সাহোব কাযদায অঙ্গুলি স্পর্শ কবিযা অত্যন্ত বিনীত ভাবে ইঙ্গিত কবিলেন—চিংকাব কবিও না। মার্জিত ইঙ্গিত হবে খুডো বুঝিলেন না। সোঁটা সহ জজ সাহেবেব দিকে অগ্রসব হইতে লাগিলেন।

খুডা মহাশয পার্টির খবব জানিতেন না, তিনি কালীঘাটে আসিযাছিলেন, তথা হইতে বৈদ্য বাডিতে কিছু পুবাতন গব্য ঘৃত ক্রয কবিযা—জীবন্ত যাদুঘব দেখিযা তিনকোডেব বাডি উঠিযাছেন—ইচ্ছাটা বাত্রিবাস এখানে সাবিযা লইবেন।

বাডিব প্রবেশ-পথে অর্ধদগ্ধ সাদা চামডা দেখিযা একটু ইতস্তত কবিযা ছিলেন কিন্তু সোঁটাব প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিতেই আত্মসম্মান সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইযাছিলেন। বিনা আডম্বরে গামছা স্কন্ধে কপালে সিন্দুবেব ফোঁটা সহ একেবাবে চাযেব আসবে আসিযা উপস্থিত। এক হস্তে মা কালীব প্রসাদ, অন্য হস্তে সদ্যক্রীত সিগাবেটেব টিনে দোদুলামান পুবাতন গব্য ঘৃত। বাবংবাব ওষ্ঠে অঙ্গুলি স্পর্শিত হইতেছে দেখিযা খুডা মহাশয ঠিক

সামান্য দক্ষিণা লইযা ছাতাওযালা এমন একটি ব্যবস্থা কবিযা দিল

কবিযা লইলেন বেচাবা তিনকোডেব ঠোঁট ফাটিযাছে। বাল্যকাল হইতে খুডা মহাশয তিনকোডেকে অত্যন্ত স্নেহেব চক্ষে দেখিতেন। নিকট আসিযাই তিনি জাপটাইযা ধবিলেন—কতকালেব পব দেখা, চক্ষে তাঁহাব জল আসিযা পডিল।

জজ সাহেব লৌহভীম চূর্ণের অবস্থায় পড়িয়া গিয়াছেন। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বাহু বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিলেন না। খুড়া মহাশয়ের ঘর্মে-গলিত সিন্দূর বিন্দু ও তৎসহ চোখের জলে বোনার্জি সাহেবের দুগ্ধফেননিভ সাদা কলার রঙিন হইয়া উঠিল। ফ্যাসান যাঁহারা মানেন তাঁহারা বুঝিবেন ইহা কি দারুণ সঙ্কট অবস্থা। বিশেষ করিয়া লেডিজ্‌দের সামনে।

এইখানে দৃশ্যের পট পড়িলে রক্ষা হইত, কিন্তু খুড়া কালীঘাটের সিন্দূর জোর করিয়া কপালে এবং গব্য ঘৃত ওষ্ঠে মাখাইয়া দিলেন। বয়স বাড়িলে কি হয়, খুড়ার কাছে তিনকোড়ে তিনকোড়েই আছেন—এই ত সেদিনকার কথা—তিনিই ত সাঁতলতলার মাদুলি দিয়ে সেবার তিনকোড়ের প্রাণ বাঁচান।

ঘৃত ও সিন্দুর ভূষিত হইয়া যখন বোনার্জি সাহেব দ্যু হস্তের বন্ধনমুক্ত হইলেন তখন তিনি জানিতে পারেন নাই—তাহার মুখশ্রীর কতখানি পরিবর্তন ঘটিযাছে।

নব সমাজে সজ্জিত হইয়া বোনার্জি সাহেব সমবেতদের আপ্যায়িত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন—হঠাৎ দেখা গেল, সময়ের আগে আধা-সাহেবদের দল কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের সাহেব তাহাতে বিচলিত হইলেন না, কারণ কাঁচা হাতের অনেক এপয়েন্টমেন্ট থাকিতে পারে। উঠিয়া যাওয়া ত খুব স্বাভাবিক—কিন্তু সত্যের গূঢ় রহস্য প্রকাশিত হইল বিদায়কালীন মেম সাহেবের সহিত গুড্‌ বাই করিতে গিয়া। মহিলাটির কি উগ্র মূর্তি—তিনি জোর দিয়া বলিলেন, তুমি খাঁটি হিন্দু আমি জানিতাম না, তোমাকে enlightened ভাবিয়াছিলাম—

সব কথা শেষ হইবার পূর্বেই যেমন উঠিতে যাইবেন, অমনি চায়ের তেপায়া টেবিলে যাহা কিছু ভক্ষণীয় ও অভক্ষণীয় ছিল সব আসিয়া পড়িল মিঃ বোনার্জির পাৎলুনের উপর। নিম্ন অঙ্গে আইসক্রিমের শেষাংশ—চায়ের জলের নির্ভুল চিহ্ন ও ঊর্ধ্বাঙ্গে সিন্দূর ও গব্যঘৃতের মিলনে তিনি অসুর সাজে সজ্জিত হইলেন।

তাহার পর যে সব ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা ভদ্র সমাজে বর্ণনা করিবার বাধা আছে।

উৎসব শেষ করিয়া জজ সাহেব এবার দেহ মন উৎসর্গ করিয়া পাবলিক্ ওয়ার্কসে লাগিয়া গিয়াছেন। কালেক্টর হুঙ্কার দিলেও প্রত্যহ প্রাতে তাঁহাকে 'গুড্‌মরনিং' না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। অধ্যবসায়ে আন্তরিকতা থাকিলে সুফল অবশ্যম্ভাবী। যথাসময়ে বোনার্জি সাহেবের উপর বাজারের তত্ত্বাবধান হইতে মোটর গাড়ির রক্ষণা-বেক্ষণের ভার আসিয়া পড়িল।

দেখিতে দেখিতে পয়লা জানুয়ারি আগতপ্রায়। অথচ কালেক্টরের নিকট হইতে এখন পর্যন্ত খেতাবের কিছুমাত্র আভাস পান নাই। খেতাবের হিসাব চিরকাল গোপনে হইলেও চালাক পিয়নদের ধরিতে পারিলে আসল খবর জানিয়া লওয়া যায়—কিন্তু বোনার্জি সাহেব এমন একটি আসনে অধিষ্ঠিত যে পিয়নদের সহিত প্রকাশ্যে ঘনিষ্ঠতা করিবার সাহস নাই। মনের ভিতর তর্ক উঠিল—বড় বড় সাহেবরা যখন সামান্য সহিসদের নিকট ঘোড়দৌড়ের

টিপ লইতে পাবে তখন তাঁহাব খববটা জানিয়া লওযায কি দোষ থাকিতে পাবে। কিন্তু সুবিধাব অভাবে তিনি উৎকণ্ঠায জর্জবিত হইযা উঠিলেন। বায বাহাদুব খেতাব প্রাপ্তিব কথা সকলেই বলাবলি কবিতেছে, অথচ নিদযেবা সূত্রটি ধবাইযা দেয না কেন। ইতিমধ্যে একদিন কালেক্টব সাহেব নিজেব কামবায ডাকাইযা পৃষ্ঠে মৃদু আঘাত সংযোগে এমন একটি গোপন কথা জানাইযা দিলেন, যাহাব ফলে গৃহদাহেব পুবাপুবি ব্যবস্থা হইযা গেল।

পিতৃদত্ত নাম ভুলাইতে দেশি খেতাব অপেক্ষা সহজ উপায আব কিছু আবিষ্কাব হইযাছে কি-না জানি না—মি০ বোনার্জি নাম উচ্ছেদ অথবা ডুবাইবাব জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

আপিস হইতে ফিবিযাই কালেক্টবেব অনুকবণে বাশভাবি গলায ভৃত্য ভগাকে ডাকিলেন। ভগা গ্রাম হইতে আসিযাছে এবং আজীবন কাল আমাদেব সাহেবেব সংসাবেই ভৃত্যগিবি কবিতেছে। কোন সময হসন্ত যুক্ত নামে কেহ তাহাকে ডাকে নাই। এই পবিবর্তনেব গোডায যাহাই থাকুক না, কোন অশুভ লক্ষণেব সঙ্কেত নিশ্চিত জানিযা প্রভুব সামনে আসিযা দাঁডাইল।

প্রভু—এতক্ষণ ধবে ডাকছি—কবছিলি কি?

ভৃত্য—বাবু -

প্রভু—তালব্য শ —আমি বাবু!

কিছুদিন হইতে বাবু সম্বোধনে তাঁহাব বীতবাগ আসিযা পডিযাছিল এত বড অপমান সহ্য কবিতে হইবে সাহেব ধাবণা কবিতে পাবেন নাই। নিবীহ হসন্তযুক্ত ভগকে অনেক কটূক্তি সহ্য কবিতে হইল, তথাপি যে বুঝিল না তাহাব নাম ভগা হইতে ভগ হইল কেন।

অদৃষ্টেব উপব দোষাবোপ কবিযা ভগ সোজা গিন্নিমাব কাছে গিযা উপস্থিত হইল। নালিশ কবিবাব সাহস না থাকিলেও দুঃখ জানাইবাব ইচ্ছা দমন কবিতে পাবিল না।

এযাবৎকাল ভগাব পৃষ্ঠপোষণ স্বযং সাহেব কবিতে আসিতেছিলেন, হঠাৎ সেই ভগা কর্তাব বিরুদ্ধে কিছু বলিতে চায দেখিযা শ্রীশ্রীঠাকুবাণী প্রসন্না হইযা উঠিলেন।

এই ভগা সম্বন্ধে কত নালিশ সাহেব অগ্রাহ্য কবিযাছেন, সাহেবেব ভগা-প্রীতি এককালে এমনই ছিল যে তাঁহাকে স্বামীব ভালবাসা সম্বন্ধে সন্দেহ কবিতে হইযাছে। আজ সেই ভগাই কর্তাব বিরুদ্ধে কিছু বলিতে চায- তিনি ভগবানেব নিবপেক্ষ বিচাবকে সশ্রদ্ধে নমস্কাব কবিলেন।

বিবাহেব পব হইতে স্বামীব সহিত পাল্লা দিযা তিনি গতবটি ঠিক বাখিযাছিলেন, সুতবাং উঠিতে বসিতে তাঁহাব কাপড গুছাইযা না লইলে অসুবিধায পডিতে হইত। তিনি কোমবে স্কুল গার্লেব মত কাপড আঁটি কবিযা পবিযা লইলেন 'দশ দেহি'ব মত। সোজা সাহেব যে ঘবে কাপড ছাডিতে ছিলেন সেইখানে আসিযা উপস্থিত হইলেন এবং কিছুমাত্র আডম্বব না কবিযাই বলিলেন—ওগো, এ কি কাণ্ড, ভগাকে যাচ্ছেতাই তুমি সব কি বলেছ? এতদিনকাব পুবান চাকব যদি চলে যায ত আমি তোমাব সংসাব চালাতে পাবব না। আমায বাপু ভাযেব বাডি পাঠিযে দাও।

চাকরের একটু রুচিসম্পন্ন নামকরণ কবিয়াছেন—তাহার জন্য একটা বাড়াবাড়ি তিনি সমর্থন করিতে পারিলেন না। হসন্তযুক্ত নাম সাহেববা ত প্রায় ব্যবহাব করিয়া থাকে। গড—হগ্—বোস্—ইহারা কি মানুষ নয়! ভগাকে ভগ্ বলিয়া ডাকিলে দোষের কি থাকিতে পাবে। আজ বাদে কাল তিনি রায় বাহাদুব হইতে চলিয়াছেন, আর তাঁহাব বাড়িব খানসামা কি না ভগা--ইহা হইতে পাবে না। মনে মনে যতই যুক্তিব আশ্রয় গ্রহণ করুন না কেন, গৃহিণীব দিকে নিশ্চিন্তভাবে তাকাইবার সাহস ছিল না। কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে উত্তর করিলেন—অনেকক্ষণ ধবে ডাকছি, সাড়া দেয় নি—বোঝ না সমস্ত দিন কোর্টে কাজ কবাব পব জামাকাপড না ছাডতে পাবলে কত কষ্ট হয।

কর্ত্রীঠাকুবাণী ঝঙ্কাব দিযা উত্তর কবিলেন—আহা কি জামাকাপড় ছাড়াই গো—এক

আবার উভয়ে বলপ্রয়োগ করিলেন

বালিশের খোল ছেড়ে আর এক বালিশের খোলে ঢোকা। বাঙালির ছেলে, বাড়ির ভিতব সাহেব সেজে থাক কেন বাপু। কিছুদিন থেকে তোমার অনেক বিষয়ে মতিভ্রম দেখছি—এর আগে আমায় কত কাছে এসে 'ওগো' বলতে, এখন...

আপিস-ফেবতা কেরানিরাও স্বস্তিব নিশ্বাস ফেলতে পারলে বাঁচে—আর তুমি সব সময় গলায় ফাঁস না লাগিয়ে থাকতে পাব না। গলায় ফাঁসটা কি?—কেন তোমবা টাই না কি বল—ও ত গলায় দড়ি দেবারই মত। এই ত সেদিন নারকেল নাড় করে তোমাকে খাওয়াতে এলাম, কি-না তোমার হাঁটুব ভাবে একটু ভব করে দাঁড়িয়েছিলাম—তুমি একেবাবে অগ্নিশর্মা চেহারা করে চেঁচিয়ে উঠলে—ক্রিজ্ ক্রিজ্—

ইংরেজিতে গালাগালি আমরা না হয় বুঝতে পারি না, তাই বলে ক্রিজ বলবে কেন?

সাহেব কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন—ক্রিজ মানে কাপড়ের ভাঁজ, গালাগালি নয়।

কর্ত্রীঠাকুরাণী—হ্যাঁ ক্রিজ মানে কাপড়ের ভাঁজ—আমি কচি খুকি, কিছু বুঝি না—তোমাকে সোজা বলে দিচ্ছি—ট্রাউজ ভগ্ চলবে না। তোমার কাজ ত কোর্টে যাওয়া এবং সেখান থেকে বাড়ি ফেরা—সংসার চালান কি জিনিস যদি বুঝতে তা হলে মেজাজ দেখাবার চেষ্টা করতে না।

সাহেব দুরবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইবার ফাঁক খুঁজিতেছিলেন, অথচ দরজা আগলাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন সশরীরে মহিয়সী মহাশক্তি, এমৎ অবস্থায় একমাত্র দীনত্রাতা ভগবান উদ্ধার করিতে পারেন, কিন্তু সে দিক দিয়াও ইনার ম্যান কোন সাড়া দিতেছে না। কি করিবেন, কিছু স্থির করিতে না পারিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। গৃহিণীর দিকে একবার গদগদভাবে তাকাইলে কি হয় ভাবিতেছিলেন, এমন সময় ভগা আসিয়া একটি ভিজিটিং কার্ড দিয়া গেল। গোদের উপর বিষ ফোড়া--বেচারা ভগা কয়লা ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে কার্ডটি তাহার কর কমলে অভ্যন্তরস্থিত করিয়াছিল—ফলে কার্ডের মালিকের নাম নিরাকার প্রাপ্ত হইয়াছে। জলে ভাসিয়া যাইবার সময় সামান্য তৃণও নাকি হতভাগ্যের আশ্রয় দেয়, তাই মনে করিয়া জজ সাহেবের কার্ড সহায় করিয়া ঘর হইতে বাহির হইবেন ঠিক করিয়াছেন, ইতিমধ্যে ভগা এক ফিরিঙ্গি মহিলাকে লইয়া তথায় উপস্থিত। দেখিতে মন্দ নয়--তাহার উপর বয়স উত্তেজক, বেশভূষা মাদকতায় পূর্ণ। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া কর্ত্রী ঠাকুরাণী এমন একটি মুখভঙ্গি করিলেন যাহার অর্থ ভুল করা যায় না, ভগা যে এতবড় বোকা ও পাষণ্ড হইবে জজ সাহেব অনুমান করিতে পারেন নাই। দুই চার মিনিট পরে আনিলে মহাভারত কি অশুদ্ধ হইত। খেতাবপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে একজন লেডি স্টেনোগ্রাফার রাখিবেন ঠিক করিয়াছিলেন—আপিসের কাজ এত বেশি যে

সাহেবের বুঝিতে বাকি রহিল না, মহিলাটি বন্ধু প্রেরিত স্টেনোগ্রাফার। আকর্ষণের দিকে মুখ ফিরাইয়া একবার অভিনন্দন জ্ঞাপন করিবেন এমন সাহস নাই, অথচ মেম সাহেবের বয়স কম বলে সাহেবের মন বিগড়াইয়া গেল। সাহেব কপাল মুছিবার ছলে নিজের দৃষ্টি আড়াল করিয়া মহিলাটিকে ভিতরে আসতে ইঙ্গিত করিলেন। কর্ত্রীঠাকুরাণী তখন সবে গা ধুইয়া আসিয়াছেন। মেম সাহেব নির্বিকার চিত্তে তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ভিতরে ঢুকিবার পথ চাহিলেন। যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যা হয়, এতটা গড়াইবে কে ভাবিয়াছিল। ম্লেচ্ছগাত্র স্পর্শ করায় অসংখ্যবার দুর্গানাম করিতে করিতে কর্ত্রীঠাকুরাণী পুনরায় গামছা পরিয়া স্নানের ঘরে ঢুকিলেন। এই ঘটনায় ফলাফল কি হইল শুনিতে হইলে হৃদয়কে পাষণের মত কঠিন করিয়া লইতে হয়। এইটুকু বলিতে পারি—দুর্বল মেষ হিংস্র শার্দূল দ্বারা আক্রান্ত হইবার পূর্বে যে অবস্থায় থাকে—আমাদের জজ সাহেব তাহা অপেক্ষা কিছু মাত্র ভাল মনে ছিলেন না। নবাগতা মহিলাটির সহিত বিজনেসের কথা ছাড়া আর কিছু কথা হইয়াছিল কি-না জানিবার সুযোগ ছিল না। মহিলা জজের স্টেনোগ্রাফার হইবার পর এক সপ্তাহ কাটিতে চলিল—কর্তা-গৃহিণীর বাক্যালাপ বন্ধ।

সাহেবেরও নানা রকম চাঞ্চল্য দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে, অনেক বিষয়ে কেমন একটা কাঁচা কাঁচা ভাব দেখাইবার জন্য অত্যধিক ব্যস্ততা দেখা দিল। হঠাৎ অনেক বৎসর পরে ড্রেসিং টেবিলের উপর ফরাসি দেশীয় লেভেণ্ডার আসিয়া হাজির। যাঁহারা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত তাঁহারা এই সব লক্ষণ রহস্যময় মনে করিতে লাগিলেন। জজ সাহেবের সেদিকে দৃকপাত নাই, তিনি নির্ভীকভাবে আনন্দকে বরণ করিয়া লইয়াছেন এবং প্রত্যহ বিজনেসের জন্য তাঁহাকে আদালতের ছুটির পরেও দীর্ঘকাল থাকিতে হইতেছে। আজকাল তিনি নিজে ফাইলের মর্ম বুঝাইয়া না দিলে চলে না। ওদিকে পুঁটিকে (তৃতীয়া কন্যা) দেখিবার জন্য বরকর্তারা নোটিশ পাঠাইয়াছেন—অমুক দিন সন্ধ্যা অত ঘটিকার সময় তাঁহারা মেয়ে যাচাই করিতে আসিবেন।

নির্দিষ্ট সময় বরকর্তারা জজ সাহেবের গৃহে উপস্থিত, অথচ অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার কিছু মাত্র ব্যবস্থা নাই। সাহেব তখন কোর্টে স্টেনোগ্রাফারের সহিত জরুরি কাজে ব্যস্ত। বাড়ি হইতে কর্ত্রীঠাকুরাণী তাগিদের পর তাগিদ পাঠাইতেছেন, কিন্তু খাস-আর্দালি কড়া হুকুম অমান্য করিয়া সাহেবের কামরায় ঢুকিতে সাহস পাইতেছে না। হঠাৎ সশব্দে সাহেবের ঘরের কপাট খুলিয়া গেল। লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইত, মেম সাহেবের চির-নৃত্যপরায়ণা ভ্রূযুগল ভীতির সঙ্কেত দিতেছে—চলার গতিও বেশ দ্রুত—সাহেব তাঁহার পিছনে সমান বেগে আসিতেছেন। আর্দালিকে সামনে দেখিয়া নিজেকে সংযত করিলেন। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় সাহেব জানিতেন সব কাজে সাক্ষী রাখা বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। স্থির করিলেন পরে মিটমাট করিয়া লইবেন। জরুরি কাজ করিতে গিয়া উপরন্তু যে সব কাজ তিনি করিয়াছিলেন তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক, অর্থাৎ আনুমানিক যৌবনের তাড়া তিনি সামলাইতে পারেন নাই—উপযুক্ত সময়ের আগেই মনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

আর্দালির নিকট কর্ত্রীঠাকুরাণীর তাগাদার কথা শুনিয়া তিনি প্রথমটা রাগিয়া উঠিবার চেষ্টায় ছিলেন, তাহার পর যখন মনে পড়িল আজ পুঁটিকে বরকর্তাদের দেখিতে আসার কথা, তখন তাঁহার টনক নড়িল। এ বিস্মরণের ত ক্ষমা নাই—কি কুক্ষণেই তিনি বুড়া বয়সে স্টেনোগ্রাফার রাখিতে গিয়াছিলেন। স্টেনোগ্রাফারই বা রাখিতে যাইবেন কেন—যদি না তাঁহার অনতিবিলম্বে রায় বাহাদুর হইবার সম্ভাবনা থাকিত? যত শীঘ্র পারিলেন বাড়ি ফিরিলেন। অভ্যাগতদের গম্ভীর মুখ দেখিয়া নানাভাবে তাঁহাদের খুশি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভাবী জামাতা একটি সচল রত্ন। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সদ্য ব্রিলিয়ান্ট স্কলার ছাপ মারিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। অবশেষে এমন ছেলে ফসকাইয়া যাইবে না ত? ভিতর-বাড়িতে কি হইতেছে জানিবার উপায় নাই। বিপদে পড়িলে অনেকেই দার্শনিক হইয়া থাকেন—সাহেব বুঝিলেন, যথাস্থান হইতে ধূম নির্গত হইতেছে, সুতরাং আগ্নেয়গিরির অস্তিত্ব সুনিশ্চিত। অগ্নির শিখা কতখানি জানিতে পারিলে সাবধানে অগ্রসর হইতে পারেন, কিন্তু উপদেশ দিতে পারে এমন কাহাকেও সামনে দেখিতেছেন না। ভগার পুরাতন নাম ধরিয়া ডাকিলে হয়ত সে প্রথমবারেই সাড়া দিতে পারে, কিন্তু তাহার টিকি দৃষ্টিগোচরের বাহিরে। বিপুল অরণ্যে দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। একটু বসুন, আপনাদের বড় কষ্ট হয়েছে

ইত্যাদি রসাল কথায় কতক্ষণ চিনি ভেজে। বরকর্তারা অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছেন। প্রথম মেয়ে দেখাইবার নাম নাই, দ্বিতীয়ত তামাক পান সিগারেট কেহ দেয় নাই, তৃতীয়ত এখানে জলযোগ করিতে বাধ্য হইবেন জানিয়া সমস্ত বিকালটা নিজেদের অভুক্ত রাখিয়াছেন। শেষের প্রয়োজনীয়তা সকলেই মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছিলেন, অথচ ও বিষয়ে কন্যাকর্তার ঔদাসীন্যই বেশি প্রকাশ পাইতেছে। সংক্ষেপে- ত্র্যহস্পর্শ যোগ ঘটিল। একজন ভদ্রতার আইন অগ্রাহ্য করিয়া বলিলেন কি মশাই, আর কত দেরি?

জজ সাহেব নিজের প্রত্যুৎপন্নমতির উপর নির্ভর করিয়াও সঠিক উত্তর জোগাইতে পারিলেন না, বলিলেন—এ --এ---এই যে। বিদায়ের কাজ করা রূপার ফরসি থাকা সত্ত্বেও ভগা দুই ছিলিম তামাক দুইটি নোংরা শ্রাদ্ধের বেঁটে হুঁকার উপর চড়াইয়া আনিল। স্বচক্ষে এই কাণ্ড দেখিয়াও কিছু বলিতে পারিলেন না।

দরজার আড়ালে ভগাকে ডাকিয়া প্রথমেই একটি মুদ্রা বকশিস দিলেন, তাহার পর অত্যন্ত উ ঃকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন – ওরে পুঁটির আসতে আর কত দেরি, বাবুদের জলখাবার দেওয়া হয়েছে ত? এঁনারা অনেকক্ষণ এসেছেন বুঝি ইত্যাদি—মনের এই অপ্রত্যাশিত আবেগ দেখিয়া ভগা সাহেবের মানসিক সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়িল। কখনও ত সে এই রকম ব্যবহার বাবুর নিকট পায় নাই, তবে কি বাবুর কিছু হইল নাকি। বিমর্ষভাবে মা ঠাকরুণকে জানাইল —বাবুর কি হয়েছে?

দূর হইতে কর্ত্রীঠাকুরাণী দেখিলেন, সাহেব অস্থিরভাবে পায়চারি করিতেছেন এবং শীতকালের কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া সত্ত্বেও ঘন ঘন কপালের ঘাম মুছিতেছেন। ব্যাপার কি অনুমান করিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। চরিত্রদোষ ঘটিলে তাহার আনুষঙ্গিক সব কিছুই পিছু লইবে তাহা আর বিচিত্র কি। এই রকম ঘটনা আগেও একবার ঘটিয়াছিল, তখন মেমসাহেবের খবর জানিতেন না। বিলাতি খানার রাত্রের নিমন্ত্রণে কি সব ছাইভস্ম খাইয়া আসিয়াছিলেন। সে রাত্রে যমের সহিত টানাপোড়েন করিয়া বাচাইতে হইয়াছিল—চক্ষুর সে কি দৃষ্টি, রক্ত যেন ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল---কথা বলার ভঙ্গিই বা কি চমৎকার। ঘটনার সূত্রগুলি যতই বাড়িতে লাগিল, ততই পুরাতন বীভৎস দৃশ্যগুলি একের পর এক চাক্ষুষ করিতে লাগিলেন। অবশেষে যতক্ষণ না বেহুঁশ অবস্থায় পড়িয়াছিলেন, আজও সেই দিনকার ব্যবস্থা করিতে হইবে নাকি—ছি ছি, কি কেলেঙ্কারির কথা। পুঁটির বিবাহ কিছুতেই পণ্ড হইতে দিবেন না। পাশের বাড়ির অরুণের আসিতে দেরি হইতেছে দেখিয়া আবার তাহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। কর্তার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া ঠিক করিয়াছিলেন, অরুণকে দিয়া সব ব্যবস্থা করিয়া লইবেন। অরুণ শহরের হাল-ফ্যাসানের ছেলে—বেশের পারিপাট্য তাহার কাছে একটা বড়দরের কৃষ্টি—গায়ে ইকনমিক দেশি কোর্তা—গলার সামনে রুদ্রাক্ষের একটি বোতাম। দৃষ্টিভ্রমে কোর্তাটি খাট শার্ট ও ফতুয়ার মাঝামাঝি লাগে। সযত্নে রাখা রুক্ষ কেশ, থান-ধুতি কোঁচান, পায়ে রেশমি বোতামযুক্ত কাবুলি চটি। ভদ্রলোক হাসিতে হাসিতে আসিতেছিলেন, হঠাৎ পাতান-খুড়িমার মুখ দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। আগাগোড়া সমস্ত শুনিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। খুড়িমা অস্থির হইয়া বলিলেন—এখন কি আর মাথা চুলকাবার সময় আছে বাবা—আয় দুজনায় মিলে ভিতরে নিয়ে আসি, ওখানে থাকতে দিলে শেষ পর্যন্ত

একটা কেলেঙ্কারী না হয়ে যাবে না। অরুণ প্রস্তুত, আগে আগে চলিল এবং নিকটে আসিয়াই বিনা বাক্যব্যয়ে সাহেবের হাত ধরিয়া টান মারিল। ততক্ষণে খুড়িমা আর একহাত ধরিয়াছেন। সাহেব হতভম্ব হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— হয়েছে কি?

কর্ত্রীঠাকুরাণী ওষ্ঠ চাপিয়া উত্তর করিলেন—চেঁচামেচি করো না, দোহাই তোমার ভিতর-বাড়িতে এস, সব বলছি।

সাহেব টানা হেঁচড়ায় বিরক্ত হইয়া বলিলেন—এখন আব্দার ভাল লাগে না।

—বাবা অরুণ, শুনলি ত বুড়া বয়সে কথার ভঙ্গি—এখন আর সন্দেহ আছে, ভিতরে নিয়ে চল্ বাবা, কেলেঙ্কারির হাত থেকে বাঁচা।

দুই জনে আবার বলপ্রয়োগ করিলেন। প্রথমটা সাহেব বেঁকিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন কিন্তু হৃদরোগের কথা মনে পড়িতেই হাল ছাড়িয়া দিলেন। ইহার পর দম্পতির শুভমিলনে কি হইয়াছিল বর্ণনা করিব না, কারণ তাহা শুনিবার শক্তি আনিতে হইলে পাষাণের মত হৃদয় শক্ত করিতে হয়।

পয়লা জানুয়ারি। ভোর হইবার পূর্বেই উপযুক্ত স্থান হইতে অভিনন্দনসহ তার আসিল— তাঁহার রায়বাহাদুর খেতাবপ্রাপ্তির বার্তা লইয়া। একই ছত্র বহুবার পড়িলেন, তথাপি আশ মিটিতে চায় না। গৃহিণীকে খবরটা জানান দরকার, কিন্তু সংসার ধর্মের যে সব বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, তাহাতে খেতাব-সংবাদ ত তুচ্ছ, জড়োয়ার কাজসহ দুইটি নিরেট সোনার অনন্ত ঘুষ দিলেও কোপের উপশম হইবার সম্ভাবনা নাই। রাগ আসিয়া পড়িল পুঁটির উপর, তাহাকে দেখিতে না আসিলে এ বিপদে পড়িতে হইত না। মনকে স্তোক দিলেন, ছেলেটা এমন কি আহা মরি—ও রকম ছেলে অনেক জুটিবে। পুঁটি ওদিকে শত্রুর মুখে ছাই দিয়া বাড়ন্তের ডেঞ্জার জোন্-এ আসিয়া পড়িয়াছে। রং-এর জৌলস আব্লুস কাঠ পাশে না রাখিলে বুঝিবার উপায় নাই। এ ছাড়া আরও অনেক শুভলক্ষণ আছে—যাহা বিবাহের বাজারে মোটা টাকা নজর না দিলে মালিকানী স্বত্ব হস্তান্তর করা চলে না। রায় বাহাদুর সবই জানিতেন। তবু মনে বল পাইবার জন্য তর্ক উঠাইতেছিলেন। অবশেষে পুঁটুর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

আজ মহাআনন্দের দিনে তিনি সবার মাঝে একা গৃহলক্ষ্মী আইন অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন। পুত্রকন্যারা এখনও বাবা বলিয়া ডাকে, স্ত্রী ওগো ছাড়া অন্য কিছু বলিতে প্রস্তুত নন। স্বগৃহে রাজসম্মানের যদি এতটা আদর পান, ত বাহিরের লোক রায় বাহাদুরের জন্য মাথা ঘামাইবে কেন। আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম—উপর-আলার নির্দয় অত্যাচার সবই সহ্য করিয়াছেন খেতাবপ্রাপ্তির আশায়, সেই খেতাব যখন তিনি পাইলেন তখন কেহই তাঁহার ক্ষমতার উপযুক্ত মূল্য দিল না—রায় বাহাদুর টেলিগ্রামটি নাড়াচাড়া করিতে করিতে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

*কার্তিক, ১৩৪৬*

# নব রামায়ণ

## সন্তোষ দে

নাবদ ঋষিব মর্ত্যেব সঙ্গে সংযোগটা কিছু বেশি, দেশে দেশে ঘবে ঘবে তাহাব সম্বন্ধ। তাই যাওযা-আসাটাও কিছু ঘন ঘনই ঘটিযা থাকে। এবাব ঋষি সম্প্রতি মর্ত্য হইতে ফিবিযা আসিযা যে কার্যে মনোনিবেশ কবিযাছেন তাহাতে স্বর্গধামে বেশ সাডা পডিযা গিযাছে। নাবদ কুবেবকে ধবিযাছেন, স্বর্গে একটি ফিল্ম কোম্পানি খুলিতে হইবে। কুবেব প্রথমে বাজি হন নাই, তাবপব অনেক হিসাব নিকাশ দেখাইযা বুঝাইযা পডাইযা তাহাকে বাজি কবান গিযাছে। বিশ্বকর্মাকে আমেবিকা ঘুবিযা আসিতে পাঠান হইযাছে এবং কৈলাসে একটি নিভৃত শৈলশিখবে স্টুডিও নির্মাণ শুরু হইযাছে।

এই সংবাদে স্বর্গেব দিকে দিকে হর্ষধ্বনি উঠিতে লাগিল। নাবদ যাহাতে লাগেন তাহাব একটা হেস্তনেস্ত না কবিযা ছাডেন না। দেখিতে দেখিতে সকল ব্যবস্থা হইল। যন্ত্র আসিল,

তাডকা বধ
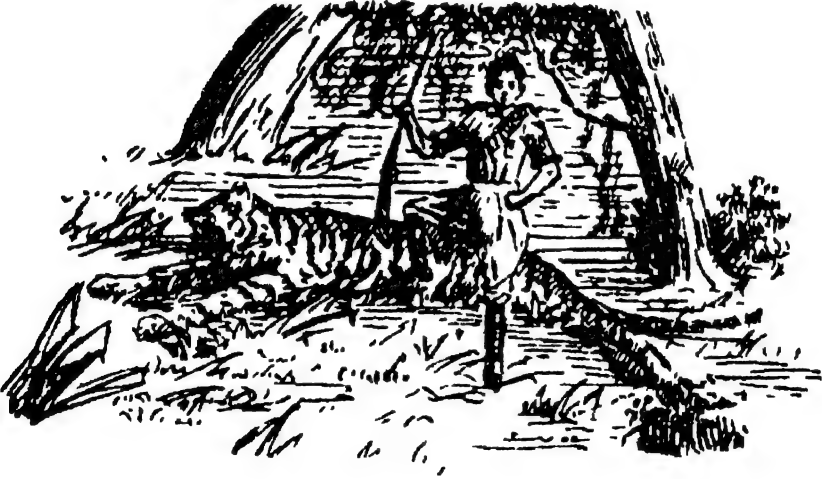
যন্ত্রী আসিল। পৃথিবীব বাছা বাছা বিশেষজ্ঞেব স্বর্গগমনে মর্ত্যে হাহাকাব উঠিল। ভালো ভালো অভিনেতা অভিনেত্রী সকল দেশ হইতে বাছিযা আনা হইল। বিশ্বকর্মাব কর্মকুশলতায সকল বিষযেব ব্যবস্থা হইল, নাবদ মর্ত্যে দেখিযা গিযাছেন ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ চিত্রাবতবণ কবিতেছেন। তাঁহাব পবামর্শে একদল দেবদেবীও সাজিলেন— তাঁহাবা চিত্রাবতবণ কবিবেন।

সমস্ত স্থিব হইল—এখন প্রযোজন উপযুক্ত কাহিনি। এক ঘবোযা বৈঠকে নানা মুনি নানা মত প্রকাশ কবিতে লাগিলেন। খ্যাত অখ্যাত, বিখ্যাত, সুখ্যাত, পবিখ্যাত, অপখ্যাত যত লেখকলেখিকা স্বর্গ মর্ত্য পাতালে ছিলেন সকলেব নাম উচ্চাবিত হইল, কিন্তু দাকণ ভোটাভুটিতে কোনটিই টিঁকিল না। এত নামেব মধ্যে আদি কবিব নামটাই কাহাবও মনে পড়ে নাই। অবশেষে মিস্ সবস্বতী দেবী প্রস্তাব কবিলেন—বাল্মীকিব বামাযণ।

নাবদ শুনিযা হাসিযা আব বাঁচেন না। লেখক ত্রিকালেব বৃদ্ধ, ততোধিক পচা পুবাতন বামাযণেব কাহিনি। তবু বাল্মীকিব নামেব কিছু দান আছে। বিচাব কবিযাই বামাযণেব প্রতি কৃপা কবা হইল। স্থিব হইল চিত্রনাট্যকাব কিছু বদবদল কবিযা উহা কালোপযোগী কবিযা লইলেই চলিবে।

চিত্রগুপ্ত তাহাব পাহাডপ্রমাণ খতিযান খুঁজিযা এ যুগেব শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকালেব নাম বাহিব কবিযা ফেলিলেন এবং তাহাব উপব চিত্রনাট্য বচনাব ভাব পডিল। বামাযণেব গল্পটি চিত্রোপযোগী কবিতে কিছু বর্তমানেব ছাদ না দিলে মনোবম হইবে না। চিত্রনাট্যকাবকে সে স্বাধীনতা দেওযা হইল।

যথাসময়ে স্বর্গধামেব দেওযালে দেওযালে শৈলে শৈলে পোস্টাব পডিল, প্রচাবপত্র প্রকাশিত হইল। বহুল প্রচাবেব জন্য মর্ত্যেও কিছু আসিল। আমবাও জানিলাম— কুবেব ফিল্ম কর্পোবেশনেব নবতম অবদান "নববামাযণ" বিচিত্র ভূমিকা সমাবেশে শী" ই আত্মপ্রকাশ কবিবে।

স্টুডিও হইতে মাঝে মাঝে যে সব সংবাদ আসিতে লাগিল তাহাতে আমবা নিঃসন্দেহ হইলাম যে, "নব বামাযণ" একালেব একখানি শ্রেষ্ঠ চিত্র হইবে।

যথাকালে ট্রেড শোব নিমন্ত্রণ আসিল। আমাদেব কাগজেব অফিসে সিনেমা সম্পাদক—সদ্য বিবাহ কবিযাছেন। তিনি স্বর্গাবোহণে বাজি হইলেন না। আব কেহই ভবসা কবিল না। অগত্যা আমিই বাজি হইলাম। প্রসঙ্গ ক্রমে বলিযা বাখি—গিযা দেখিলাম, স্বর্গ জাযগাটা বিশেষ খাবাপ নয, কলিকাতাব অপেক্ষা তো নযই। আব বাজি হইযাছিলাম বলিযাই তো আজ সেই বিচিত্র চিত্রেব কথা আপনাদেব কাছে বলিতে পাবিতেছি।

প্রেক্ষাগৃহে সেদিন অধিক জন বা দেবসমাগম হয নাই। জন বা জীবিত ভূলোকবাসী বলিতে আমি একা ছিলাম। আব অন্য অন্য লোকবাসী সাংবাদিক ও অন্যান্য গণ্যমান্য দেবদেবী ছিলেন। দাডিওযালা কযেকজন ঋষিও পিছন দিকেব সিটে বসিযাছিলেন দেখিযাছিলাম।

প্রেক্ষা গৃহে চন্দ্র কিবণ দিতেছিলেন। চন্দ্র অস্তমিত হইলেন, ঘোব অমাবস্যাব মাঝে বিদ্যুৎ জ্বলিল, ছবি ফুটিল। দেখিলাম হান্টিং শ্যুটে বাম বন্দুক লইযা চলিযাছেন। সঙ্গে অনেক লোকজন, কিন্তু উহাব মধ্যে লক্ষ্মণকে চিনিলাম না। বাম তাডকাবধে আসিযাছেন। বহু গোলযোগেব মধ্যে তাডকাবধ সমাধা হইল। লোকজন আনন্দে চিৎকাব কবিযা উঠিল যে ব্রাহ্মণ বামকে ডাকিযা আনিযাছিলেন তাহাব মুখেও হাসি ফুটিল। একটা লোক জঙ্গল হইতে হিড হিড কবিযা তাডকাকে টানিযা বাহিব কবিল। দেখিলাম একটা কেঁদো বাঘ। সে নাকি উক্ত ব্রাহ্মণেব একটি ছাগল মাবিযাছিল।

নিকটে জমিদাববাড়ি। জমিদাব বাজা জনক বায বামকে মহাসমাদবে নিজগৃহে স্থান দিলেন। সেখানে একটি লিকলিবে বোগাপানা যুবক—গাযে ঢোলা হাতাব পাঞ্জাবি, চোখে চশমা—আধ আধ উদাস ভাব, দিনকযেক পূর্বে আশ্রয নিযাছে। সঙ্গে ছিল চিত্রাঙ্কিত জনক বাজাব ভাগিনেয। পবে শুনিলাম ঐ বোগাপানা ছোঁড়াই লক্ষ্মণকুমাব, বন্ধু চিত্রাঙ্কিতেব সঙ্গে তাহাব মামাবাড়ি বেড়াইতে আসিযাছে।

প্রেম চক্র
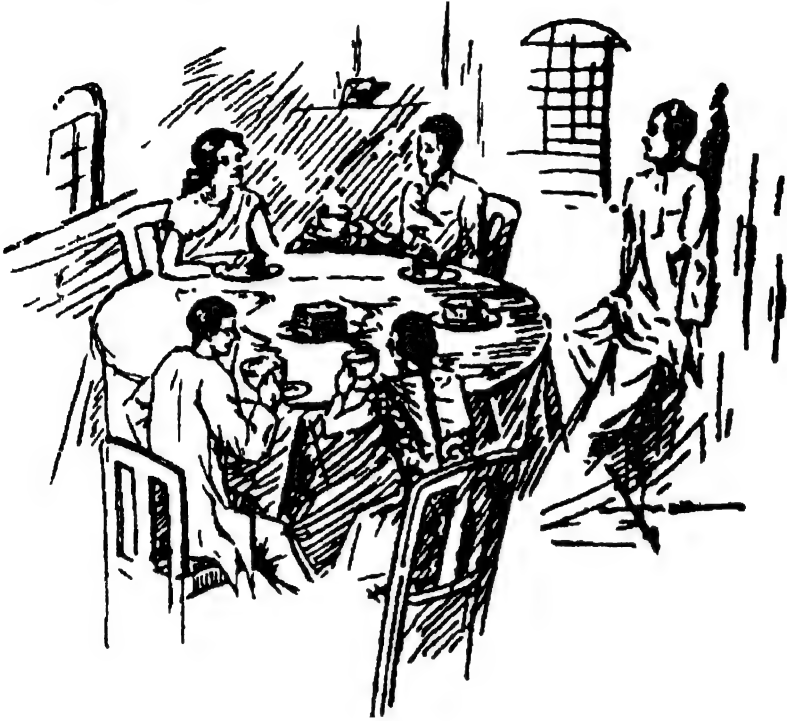
বামেব সঙ্গে দেখা হইতেই বাম বলিযা উঠিলেন- আবে, তুই এখানে?

লক্ষ্মণ বীতিমত বিবক্ত হইল, বলিল —ভদ্রলোকেব বাড়ি একটু ভদ্রভাবে কথাবার্তা কইতে শেখ। জানো এখানে সব শিক্ষিতা মহিলাবা বযেছেন। কি ভাববেন তাঁবা শুনলে। কেবল গোঁযাব ভাব - বনে বনেই ঘুবে বেড়াও বন্দুক নিযে, বাণই তোমাব মানায ভালো। এটা ভদ্রসমাজ।

বাম এতটুকু হইযা গেলেন। শিক্ষিত ভাই লক্ষ্মণ তাহাব দাদাকে শিক্ষা দিযা গেল।

জনক বাজাব এক পালতা কন্যা—নাম সীতা, যেমন নবম প্রকৃতি তেমনি লাজুক। সে এই কবি লক্ষ্মণকে ভালোবাসিযা ফেলিযাছে। কিন্তু লক্ষ্মণেব ভালো লাগে উর্মিলাকে। যেন বিদ্যুল্লতা, চোখে জ্বালা ধবাইযা দেয। এক মুখে দশটা কথা বলে। জমিদাব-কন্যাব এলিগ্যান্স আছে, লক্ষ্মণ তাহাব মূল্য জানে, তাহাব সাহিত্যিক বর্ণনা ওব কণ্ঠস্থ।

লক্ষ্মণকে উর্মিলা নাচাইয়া লইয়া বেড়ায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে উহাকে করুণা করে, ভালোবাসে না, শ্রদ্ধা করে না। পুরুষ হইবে সংযমে অটুট, দৃঢ়তায় হিমাচল—নতুবা তাহার চরণে আত্ম বিলাইয়া প্রণাম কবিয়া, তাহাকে সাবা মনপ্রাণে শ্রদ্ধা করিয়া ভালোবাসিয়া মন ভরিবে কেন? সেই দৃঢ়তা ও ব্যক্তিত্ব লক্ষ্মণ রক্ষা কবিয়া চলিতে জানে না।

বৃদ্ধ জনক রায় বামচন্দ্রকে তাহাব উভয় কন্যা, চিত্রাঙ্কিত ও লক্ষ্মণের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। লক্ষ্মণ যে রামচন্দ্রেব ভাই তাহাও জানা গেল না। সিনাবিও লেখকের কৃতিত্ব আছে দেখিলাম। এরূপ না হইলে কি আর আধুনিক ভাই।

রামচন্দ্র গম্ভীবপ্রকৃতি, বেশি কথা বলিতে ভালোবাসেন না। শিকাবী মানুষ, স্মার্ট এবং ম্যানলি—যাহাকে বলে পুরুযোচিত—দেহে, কণ্ঠে, ব্যবহারে, সীতাকে তাহাব ভালো লাগিল। তাহাব লাজুক প্রকৃতিটা বেশ স্নিগ্ধকব এবং স্বল্প আলাপেও ব্যবহাব মনোরম মনে হইল। বামচন্দ্রের সঙ্গে পবিচয় গভীর হইলে জনক জানিতে পাবিলেন দশরথ তাঁহার বাল্যবন্ধু। সুতরাং দাশরথিকে তিনি সহজে ছাড়িলেন না। রামচন্দ্র দিনকয়েক বিদেহ নগরে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বিদেহ নগরেব জলহাওয়ার গুণেই হউক বা স্বভাববশেই হউক বামচন্দ্র একদিন দৃঢ়তা হারাইয়া সীতাকে মনোভাব জানাইতে গিয়া তিরস্কৃত হইলেন এবং অপব ঘটনায বুঝিতে পারিলেন উর্মিলা তাহার পুরুষ প্রকৃতিটাকে ভালোবাসিয়া বসিযাছে। উর্মিলা ছন্ ছন করিয়া বেড়ায়। সাবা পবিবেশটি সে জীবন্ত করিয়া বাখিযাছে এমনই তাহাব চলা বলাব ভঙ্গিমা! দেখিয়া প্রথম অবধি মনে হইতেছিল ইনি এবার আর কাব্যেব উপেক্ষিতা থাকিতে রাজি নহেন। মনে মনে চিত্রনাট্যকারকে সাধুবাদ দিলাম—তাহার মৌলিক মত প্রবর্তনের জন্য। বাল্মীকিব একটা মাবাত্মক ভুল শুধরাইযা গিয়াছেন বটে! রামচন্দ্র জানিতে পাবিয়া জনক রায়ের নিকট উর্মিলাব পাণিপ্রার্থী হইলেন। জনকও রামেব উপব সন্তুষ্ট হইযাছিলেন—বাম একবার মাত্র স্টার্টার চাপিয়া মোটরবাইকে স্টার্ট দিতে পাবেন, একা একটা বাঘ মাবিতে পারেন, শুনা গেল বামচন্দ্র নাকি নিজে ভালো উড়িতেও পারেন (pilot), অতএব এ হেন শৌর্যবীর্যশালী পাত্রকে কন্যা সম্প্রদান করিতে কে দ্বিধা করে। বিশেষ দশবথ তাঁহাব বাল্যবন্ধু—তাঁহাব জ্যেষ্ঠ পুত্র বাম।

এদিকে চিত্রাঙ্কিত সমস্ত ঘটনা চক্ষুর উপব পরিষ্কার দেখিতে পাইলেন। যে গোলটেবিলে রাম লক্ষ্মণ সীতা উর্মিলা ও তিনি চা পান করিতে বসেন তাহা হইতে নিজেকে সরাইয়া নিলে উহা একটি প্রেমচক্রে পরিণত হয—সে চক্রটি বিষম বেগে ঘুরিতেছে—আর তন্মধ্যে শ্রীবামচন্দ্র সীতাব দিকে, সীতা লক্ষ্মণেব দিকে, লক্ষ্মণ উর্মিলার দিকে আর উর্মিলা রামচন্দ্রের দিকে ভয়ঙ্কব গতিতে ছুটিতেছেন। দেখিয়া দেখিয়া ভাবিয়া ভাবিযা চিত্রাঙ্কিত চিত্রাঙ্কিতের মত নিস্পন্দ ও স্তব্ধ হইয়া গেলেন, এ গতিব তো বিবাম নাই, শেষ নাই। কি জটিল তত্ত্ব! এমনভাবে জোট ধরিয়া জট পাকাইতে বাল্মীকির মাথার জটাও পরাস্ত হইয়াছে—আর বর্তমান চিত্রনাট্যকাব কিরূপ কৌশলে এমন পরিস্থিতির সৃজন করিয়াছেন। মৌলিকতা আছে বটে, না হলে আব এ যুগ!

মাসিমাব কাছে বামচন্দ্রেব পেটেব খবব শুনিতে পাইযা ভাগিনেয চিত্রাঙ্কিত কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল এবং কবি লক্ষ্মণকুমাবকে একদিন শ্রান্ত বোষকণ্ঠে ডাকিয়া লইযা সমগ্র অবস্থা সংবিশ্লেষণ কবিযা বুঝাইযা দিল—উর্মিলা একটা মানুষই নহে, সে বর্বব, ইতব—প্রেমেব মর্যাদা সে কি বুঝিবে। তবে হ্যাঁ, সীতা একটা মেযে বটে, যাকে বলে হ্যাঁ, একেবাবে ইযে —তাই। স্ত্রীসুলভ লাজুকতায, অন্তবেব সৌন্দর্যে, প্রেমেব গভীবতায সে একেবাবে খাঁটি স্বর্গেব পাবিজাত। (উপমাটায মর্ত্যলোকেব গন্ধ থাকিয়া গিযাছে—কাবণ বোধ হয চিত্রনাট্যকাব সদ্য সদ্য মর্ত্যলোকে হইতে আসিযাছেন)। সীতা মনে প্রাণে লক্ষ্মণকেই ভালোবাসে– অথচ বাম চাহেন সীতাকে। সীতাকে যদি লক্ষ্মণ লুফিযা নেয তবে বামকে উচিত সাজা দেওযা হইবে। লক্ষ্মণ শেষেব কথায বাজি হইলেন। এমন না হইলে আব এ যুগেব লক্ষ্মণ ভাই। চিত্রনাট্যকাবকে দশবাব সাধুবাদ দিলাম —অবশ্য মনে মনে– কাবণ তখন লিখিবাব সুযোগ পাই নাই।

অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাব পব যাহা হইল তাহাতে মোটমাট বুঝা গেল, বামচন্দ্র ও উর্মিলাব এবং লক্ষ্মণ ও সীতাব উদ্বাহ মহাসমাবোহে সুসম্পন্ন হইল।

অথ বিমানকাণ্ড। নব বামাযণে বোধ হয এই একটি নূতন কাণ্ড ঘটিযাছে, অথবা অন্য কাণ্ড খণ্ডখণ্ড কবিযা এই কাণ্ড সংযোজনা কবা হইযাছে, সঠিক বুঝিতে পাবিলাম না। যাহা হউক, দেখিলাম বাপ মাযেব সঙ্গে ঝগডা কবিযা বামচন্দ্র উর্মিলাকে লইযা বিমান যানে সিংহলযাত্রাব আযোজন কবিতেছেন। কিষ্কিন্ধ্যায বানবেব ব্যবসায না কি কবিবেন— সিংহলে হইবে তাহাব হেড অফিস। বিবাহ কবিযাছেন, এখন একটা কাজ কাববাব কিছু না কবিলে চলে না —এই রূপ একটা কি কথা লইযা পিতাব সঙ্গে বচসা হইযা বামচন্দ্র শেষে বানবেব ব্যবসায কবিবেন স্থিব কবিযাছেন।

কেবল বিমানঘাটিব ছবি পর্দায ফুটিযা উঠিযাছে – ইহাব মধ্যে অন্ধকাব অডিটবিযামে 'হা সীতা হা বাম হায বে আমাব সাধেব বামাযণ" বলিযা ক্রন্দনধ্বনি শুনা গেল এবং পবমুহূর্তে কি একপতনেব শব্দ হইল। ... জ্বলিযা উঠিলেন। ছবি বন্ধ হইযা গেল, দেখা গেল, শ্মশ্রুমণ্ডল অশ্রুজলে সিক্ত হইযা টপ টপ ধাবায জল গডাইতেছে। আব এক জন মূর্ছা গিযাছেন। বাল্মীকিকে বত্নাকব বা ঋষি কোনরূপেই দেখা ছিল না শুনিলাম যিনি মূর্ছা গিযাছেন -তিনিই বাল্মীকি। পবন বাতাস কবিলেন, বরুণ শৈত্য সম্পাদন কবিলেন— তবুও পূর্ণ জ্ঞান হইল না—কেবল মাঝে মাঝে বিলাপ স্বব উঠিল– হায বে আমাব বামাযণ।

বঘুবংশ, ভট্টিকাব্য, উত্তববামচবিত প্রভৃতিব গ্রন্থকাবেবাও অশ্রুমোচন কবিতে লাগিলেন।

শো বন্ধ হইযা গেল। জানান হইল,—মহর্ষি বাল্মীকিব অসুস্থতানিবন্ধন আজ শো আব হইবে না। অপব দিবসেব নিমন্ত্রণ বক্ষা কবিতে আব যাই নাই। সেই দিনই কর্তৃপক্ষেব কানে কানে বলিযা আসিযাছিলাম- -যেটুকু দেখিলাম তাহাতেই বুঝা গেল, সকল দিক

দিয়াই ছবিটি প্রথম শ্রেণীর মধ্যেও শ্রেষ্ঠ হইবে। চিত্রনাট্যকারকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ জানাইতে বলিয়া আসিলাম।

ফিরিবার পথে শরৎচন্দ্রের ওখানে একবার গিয়াছিলাম। দেখিয়া চিনিলেন, এটা ওটা নানাপ্রকার গল্প করিলেন। পরে কথায় কথায় "নব-রামায়ণ"-এর কথা উঠিল। সকল শুনিয়া শরৎচন্দ্র বাল্মীকির জন্য উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করিলেন এবং শেষে আমাকে বলিলেন-—আমার কমল, সাবিত্রী, কমললতাদের তো তোমাদের হাতেই রেখে এসেচি। দেখো যেন তাদের নিয়ে এমন কেলেঙ্কারি না ঘটে।

ভরসা দিতে পারিলাম না—যে পরিমাণে পথে ঘাটে ফিল্ম কোম্পানি গজাইতেছে! একটা প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

*কার্তিক ১৩৪৫*

# একটা ভাঙ্গা দাঁত

## সমরেশচন্দ্র রুদ্র

গেল ছমাস ধবে আমাব একটা পাশেব দাঁত নডছিল, আজ সেটা পড়ে গেল। এব আগে আমাব আব কোন দাত পড়েনি, এইটিই প্রথম, তাই মন কেমন কবছে। ছত্রিশ বছবেব সঙ্গীটিকে আজ আমি হাবালুম।

কচি বয়সেব দাতগুলি একটাব পব একটা প্রকাশিত হয়ে স্বজন-সমাজে কি পবিমাণ কৌতূহল ও আনন্দেব হিল্লোল তুলেছিল, তাব কথা আমাব পাবস্কাব ভাবে মনে নেই, অবশ্য, মনে বাখবাব মত বয়সও সেটা নয়, তবে একথাটা মনে আছে যে কচি দাঁতগুলি একটিব পব একটি অন্তর্হিত হবাব সময় কিন্তু আমায় যথেষ্ট লজ্জা ও দুশ্চিন্তাব হাতে ফেলে গেছে। পবিপাটি ভাবে সজ্জিত দন্তবাজিব মধ্যে থেকে সামনেব একটা যখন পড়ে গেল, তখন লজ্জায় যেন কথা বলতে পাবি না, ফাকাটা বেব কবে তাব উপস্থিতি ঘোষণা কবে আমায় মুস্কিলে ফেলেছে। যেন সুন্দব একটা হাবমোনিয়ামেব মাঝখানেব একটা বিড ভেঙ্গে গিয়ে তাব সুবেব সামঞ্জস্য নষ্ট কবে দিয়েছে, সঙ্গীতেব আসবে আব সেটা উপস্থিত কবা যায় না। ফোকলা হয়ে সকলকে হাসিব খোবাক জুগিয়ে আমাব প্রাণান্ত। তা ছাডা আবাব মহা দুশ্চিন্তা, ফাকা জায়গাটিতে আবাব নব দন্ত দেখা দেবে কিনা। সখাদেব পবামর্শ মত সেই ছোট সাদা ফুলেব কুঁডিব মত দাতটিকে একটি ইঁদুবেব গর্তে দিয়ে তাকে তাব একটি দাত আমাকে দিতে অনুবোধ জানিয়েছি।

ক্রমশ কচি দাতগুলি একটিব পব একটি অন্তর্হিত হয়েছে, এবং তাদেব স্থলে উদ্‌গত হয়েছে একটিব পব একটি করে দৃঢ় শক্ত দাত যাদেব দুটি পঙ্‌ক্তি আজ আমাব এই ছত্রিশ বছব বয়স পর্যন্ত অটুটভাবে আমাব সঙ্গে এগিয়ে এসেছে —সেনাপতিব সঙ্গে সেনাবাহিনীব মত।

দাতেব যত্ন অবশ্য আমি ববাববই নিয়েছি, যদিও আমাব দাত সম্পূর্ণ বোগমুক্ত নয়। বাল্যকালেব অবহেলায় সামান্য একবাব দাত খাবাপ হলে তাকে সম্পূর্ণভাবে সাবান যথেষ্ট শক্ত, এ কথা বেশি বয়সে জেনে অনুতপ্ত হয়েছি। হয়তো সেইজন্যে আমাব মাত্র এই ছত্রিশ বছব বয়সে দাঁতটা পড়ে গেল, নাহলে কে বলতে পাবে, ছবট্টি পর্যন্ত সেটি আমাব মুখ গহ্বরকে উজ্জ্বল, উচ্চাবণকে সুস্পষ্ট, হাসিকে বেগবান, তথা পবিপাকশক্তিকে প্রখব কবতে পাবত।

এমন সুন্দব ও এত প্রযোজনীয় যে দাঁত, তাব সম্বন্ধে আমবা যে যথেষ্ট অনুবাগ দেখাই না, সে কথা ভাবলে আশ্চর্য লাগে। বেশি বয়স পর্যন্ত পবিচ্ছন্ন এবং শক্ত দন্তপঙ্‌ক্তি মুখমণ্ডলেব শোভাবর্ধন কবছে, এ সব দেশেই অসুলভ। যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় নিয়ে আমাদেব

এত ব্যাকুলতা, তাদের মধ্যে একমাত্র চক্ষুকে বাদ দিয়ে অপর কোনটির চেয়ে দাঁতের স্থান নিচে কিনা, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। তবে ইন্দ্রিয়গ্রামের মত দাঁত যে মর্যাদা পায়নি, তার কারণ বোধ হয় ইন্দ্রিয়রা শরীরের অংশ হিসেবে জন্মলাভ করে এবং প্রচণ্ড আঘাত বা কঠিন কোন অসুখের হাতে না পড়লে শরীরের সঙ্গে এগিয়ে চলে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত, সে পঞ্চাশ বৎসরেই হোক, বা নব্বই বৎসরেই হোক; কিন্তু দাঁতের উৎপত্তি হয় জন্মলাভের পাঁচ ছমাস পরে এবং স্থিতিকালও সুদীর্ঘ নয়, প্রৌঢ়ত্ব আসার সঙ্গে সঙ্গেই একটির পর একটি সরতে থাকে, বার্দ্ধক্যে একেবারে মুখবিবর শূন্য করে দিয়ে চলে যায়।

চলে যায় বলেই কি তাকে যথেষ্ট অনুরাগ দেখান হবে না, যথোপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হবে না? দাঁত - সে কি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কারুর চেয়ে মুখমণ্ডলের কম শোভা বৃদ্ধি করে, না কারুর চেয়ে কম প্রয়োজনীয়?

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যে কোন বিষয়ে সার্থকতা বা অসার্থকতা প্রকাশ করতে গেলে ইন্দ্রিয়দলের দশন-সহযোগিতা প্রার্থনা করা ছাড়া উপায় নেই।

ইন্দ্রিয়শ্রেষ্ঠ চক্ষুর কথাই ধরা যাক। যে কোন সুন্দর দৃশ্য নয়নসমক্ষে উপস্থিত হলে সহাস-আনন দন্তরাজিকে প্রকাশিত করে প্রশংসা জানায়। যখন মৃদু আলোকিত নির্জন কক্ষে প্রণয়িনী ধীরপদে অপরের শ্রবণ এড়িয়ে দয়িতের পাশে এসে দাঁড়ায়, সে তনুমন চকিতকর দর্শনের পুলক দশনশ্রেণীকেই প্রকাশ করতে হয় সর্বপ্রথম; মুখে ভাষা না থাকলেও যায় আসে না, কারণ দর্শন ও দশন একসঙ্গে মিলে অনুচ্চারিত কাব্য সৃষ্টি করে। আবার যখন বেদনাকর দৃশ্য দেখে আত্মহারা হবার উপক্রম হয়, তখন দাঁতে দাঁতে চেপে কষ্ট সহ্য করতে হয়; অবমাননাকর ব্যাপার দেখে যখন রাগে শরীর জ্বলতে থাকে, তখন দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে ধৈর্য রক্ষা করতে হয়, এবং সময় সময় জিভ কামড়ে ধরে প্রত্যুত্তরে কটুভাষণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হয়।

শ্রবণেরও নয়নের মত একই অবস্থা। ছায়ানুসারী লক্ষ্মণ ভাইটির মত দশনকে সকল সময়েই চাই। আনন্দধ্বনি এসে কানে স্পর্শ করা মাত্র শরীরের অন্য কোন অংশের দন্তদাম বিকশিত হয়ে স্বাগত জানাবে। আবার দাঁতের কোন অসুস্থতায় শ্রবণ যে কতটা আর্তবোধ করে, তা তো সর্বজনগোচর ব্যাপার।

জিহ্বার তো দন্তদামের জন্যে ব্যাকুলতার সীমা নেই, সে ব্যাকুলতার তুলনা দিতে গেলে একমাত্র মায়ের পুত্রদের প্রতি স্নেহের কথা বলতে হয়। এত বড় নিবিড় আত্মীয়তা বড় একটা দেখা যায় না। নিয়ত পাশে থেকেও স্বস্তি নেই, কারণে অকারণে দাঁতগুলির বিভিন্ন স্থান স্পর্শ করে দেখছে, ঠিক আছে কিনা, সামান্য একটু ব্যথা হলে কি অস্থিরতা! আবার দাঁত যখন কাজ করে, অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য চর্বণ করে, তখনও খাদ্যগুলোকে বিভিন্ন দাঁতের কাছে কর্তন চর্বণের জন্যে এগিয়ে দিয়ে কাজকে সহজ করে দেবার জন্যে কি চঞ্চলতা! শিশুরা যেমন ভুল করে মাতৃস্তন কামড়ে দিলে মা কিছু মনে করেন না, তেমনি দন্তদাম অন্যমনস্কতায় জিহ্বাকে কামড়ে দিলেও জিহ্বা কিছু মনে করে না, পূর্বের মত সস্নেহে তার কাজ করে যেতে থাকে, শব্দজগতের প্রায় সব কিছুই তো দাঁতের ও জিহ্বার যুক্ত

অধিকারে। বাক্যের সুস্পষ্ট উচ্চারণের জন্যে দাঁতের যে কি প্রয়োজন, তা বলার দরকার হয় না। যে চিত্তমোহন ধ্বনিউচ্ছল হাসি শোনাবার জন্যে মন এত চঞ্চল হয়, তার এক প্রধান উৎস তো সুন্দর দন্তপঙক্তি। তাই বেশি বয়সে যখন মুখবিবর খালি করে দিয়ে দাঁতগুলি চলে যায়, তখন মুখমণ্ডলের হয় এক মস্ত বড় দৈন্য এবং জিহ্বার তখন মুখাভ্যন্তরে মাথা কুটে মরতে থাকে, তার উচ্চারিত কথাগুলি তখন হয়ে দাঁড়ায় বিকৃত, যার কথা শোনবার জন্যে সহস্র লোক ব্যগ্র হয়েছে একদিন, আজ তার কাছে একটি লোকও আসে না।

নাসিকা ও ত্বকের ব্যাপারও প্রায় একই রকম। আনন্দে ও নিরানন্দে, অধিকাংশ সময়েই দাঁতের সহযোগিতা প্রয়োজন।

এমন যে দাঁত, তা একটির পর একটি স্খলিত হয়ে পড়ে কপোলদ্বয়কে করবে কুঞ্চিত, অধর ও ওষ্ঠকে করবে লোল, এ কথা ভাবলে আমার ভয় হয়। কৃত্রিম দন্ত পরে বা গোঁফদাড়ি রেখে তো সে অভাবটা দূর করা যায় না, হয় তো কিছুটা ঢাকা যায়, তাছাড়া কৃত্রিম দন্তটা অনেকটা বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যার মত, কিছুতেই ভাল করে পাশ খায় না। যতই যত্ন নিয়ে রাখা যাক না কেন, ঐকান্তিকতা পাওয়া যায় না।

তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী আজকাল না থাকলেও সুমুখীদের মানরক্ষার জন্যে এক আধটা পান মাঝে মাঝে খেতে হয়। তাতে অধর, ওষ্ঠ এবং তাঁর সঙ্গে দন্তদামকে রঞ্জিত করে নিজেদের কতটা ভাল দেখায় বলা শক্ত, তবে শ্রীমতীদের, যাদের দাতগুলি ফুলের পাপড়ির মত শুভ্র তাঁদের মাঝে মাঝে পান খেলে মন্দ দেখায় না কিন্তু, দন্তরুচিকৌমুদী তখন কুন্দকুসুমসঙ্কাশ হয়ে মনকে রাঙিয়ে তোলে।

তবে এর অত্যধিকটা ভাল নয়, তাম্বুলবিলাস মাত্রাতিরিক্তে দাঁড়ালে দাঁতগুলির যে রূপ দাঁড়ায়, তা দেখে কারুরই উৎসাহ বোধ হয় না, তা সে দন্তদাম শ্রীমতীর কমল মুখমণ্ডলেই বিরাজ করুক, বা শ্রীমানের মুখমণ্ডলেই অবস্থান করুক।

যে যৌবন নিয়ে এত কাব্য, এত শিল্প, এত আর্ট তার তো এক প্রধান পরিচয়ই হল সুন্দর সুদৃঢ় দাত। দাঁত পড়তে শুরু করলেই এই জন্যে মানুষ ভয় পায়, তার কাছে বার্ধক্য আসছে, মুখে মুখে আলাপন, চুম্বন আদর—সমস্তকে বিপর্যস্ত করে দেবে দন্তহীনতা, ভাবলে ভয় আসবার কথা বইকি।

তাইতো, হোক একটা পাশের দাত, তাহলেও এত অসময়ে পড়ে গেল' মনটা বড় খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কবিরা দেখছি, দাঁতকে শুধু শুধু মুক্তার পাঁতি বলেননি।

ভাদ্র, ১৩৫৪

# প্রজাপতির ক্রিকেট ম্যাচ

**দেবেশচন্দ্র দাশ**

রেখা-শিল্পী—ম্যালকম ম্যাসন

বিয়ে আর ক্রিকেট খেলা যে একই জিনিস সে আবিষ্কারটা হল হঠাৎ।

জ্ঞাননেত্র অবশ্য এবকম হঠাৎই খুলে যায়। বাদলা দিনেব শ্যাওলা ছাতা থেকে পেনিসিলিন আবিষ্কারেব মতই আকস্মিক ভাবে।

তা পেনিসিলিনের মত বিষয়বুদ্ধিঘটিত বস্তুতন্ত্রের আবিষ্কাব আমাদের অধ্যাত্মবাদেব দেশে শোভা পায় না। তাই আমাদের পবমার্থ প্রাপ্তিব পথে এগিযে যাওযা যাতে সহজ হয, এমন একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই আপনাদের আজ পরিবেশন করছি।

কলকাতায় ইডেন গার্ডেনে বসে টেস্ট ম্যাচ দেখছি। সারা সকাল "কিউয়ে" দাঁড়িযে কয় বন্ধুতে মিলে অনেক কষ্টে ভিতরে ঢুকেছিলাম। সেই কষ্টের উপব সাবাদিন বিদেশ দলের ব্যাটসম্যানদেব তুড়ং ঠোকা সহ্য করে যাচ্ছি।

তাতেও শেষ নেই। আমাদের দেশের খেলোয়াড়বা টপাটপ গোল গোল বসগোল্লা মুখে ফেলে দেওয়ার মত করে বসাল ক্যাচগুলো মাটিতে ফেলে দিচ্ছে।

সান্ত্বনা দিল নীহার। বলল—এতে দুঃখ কবছ কেন। আমবা সনাতন অতিথি সৎকাবই ত করে যাচ্ছি খেলার মধ্যে দিয়েও। সবগুলো ক্যাচ ধবে ফেলা, চট কবে আউট করে দেওয়া, দেশে নিমন্ত্রণ কবে ডেকে এনে হারানর চেষ্টা করা—এগুলি ত শত্রুতার কাজ হত। বোঝ না কেন তোমরা।

শুকনো স্বরে বললাম—ঠিকই বলেছ। যতদূর মনে পড়ছে। বছরেব পর বছব আমরা এই ধরনের বন্ধুত্বেব কাজই করে যাচ্ছি। আমরা বিশ্ববন্ধু, তাই বিদেশে গিয়েও এই রকমই করে আসি।

নীহার হেসে ফেলল—নাঃ, তোমাকে দিযে আশা নেই। তোমাব স্মৃতিশক্তি বড খাবাপ।

কেন? কোন্ বছরের খেলার ফল ভুলে গেছি দেখিযে দাও। সবগুলোই মনে আছে—প্রতিবাদ করে বললাম আমি।

ঠিক সেই জন্যই ত বলছি যে তোমার স্মৃতিশক্তি খাবাপ। কিছুই সুবিধাজনক ভাবে ভুলে যেতে পার না।

নীহাবেব উত্তরেব মধ্যে এই যুযুৎসুর প্যাঁচ দেখে হতভম্ব হয়ে গেলাম।

ইতিমধ্যে আমাদের ফিল্ডারদের নন্দদুলালের মত হেলে দুলে গোঠে ধেনু চরাবাব ভঙ্গিতে বিচরণ কবতে দেখে গদাধর গাইতে শুরু কবল গুন গুন করে,—

"কানু কাছে বাই
কহিতে ডবাই
ধবলী চবাই মুই"

ভাবেব আবেগে সে—আমি তোমাব প্রেমেব কিবা জানি— এই মোক্ষম লাইনটাতে পৌঁছান মাত্র আবাব একটা হৃদয় বিদাবক ব্যাপাব হয়ে গেল। আমাদেব একজন নন্দদুলাল ননীমাখান হাত দিয়ে আকাশেব চাঁদ দেখবাব জন্য উপবে মাথা তুলে দাঁড়াল। কিন্তু হায় হায় ওটা চাঁদ নয়, সূর্যেব আলোয় পবিষ্কাব দেখা যাচ্ছে সামান্য খেলাব একটা বল। কিন্তু দুলাল তখন বোধহয় ননিচোবাব বাল্যাবস্থা কাটিয়ে কিশোব প্রেমিকেব দশা প্রাপ্ত হয়েছে। গদাধবেব গানেব সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেও ভাবল- আমি তোমাব প্রেমেব কিবা জানি। বল ধবাব আমি কিবা জানি? আমি ছেলেবেলায় বালগোপাল সেজে উদুখল নিয়ে খেলেছি। কিন্তু তা বলে বল? এমন অশাস্ত্রীয় কথা?

নৈব নৈব চ।

বল ততক্ষণে বাউন্ডাবিব কাছে দাড়ান ফিল্ডাবেব কাছে এসে বিশেষ অন্যায়ভাবে একটা প্রতাবণা কবল। আমাদেব খেলোয়াড় ফুটবলেব বল কবাব জন্য হাত দুখানা তৈবি কবে বেখেছিল, কিন্তু মায়াবী বলটা ক্রিকেটেব বল সেজে নাড়ুগোপালেব ভঙ্গিতে দাড়ান শ্রীমানেব দু হাতেব মাঝখান দিয়ে একান্ত অন্যায় কবে মর্ত্যে অবতবণ কবল। শুধু তাই নয়, অত্যন্ত unsportsman like ভাবে অখেলোয়াড়ী মনোভাব দেখিয়ে গড়াতে গড়াতে বাউন্ডাবি পাব হয়ে ওদেব খেলোয়াড়কে চাব বান পাইয়ে দিল।

এব পব আব সহ্য কবতে না পেবে গদাধব গান থামিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ওই গানেবই উপযুক্ত গলা উচিয়ে হেকে বলল বেবিয়ে যাও মাঠ থেকে।

সবাই বাঁকা চোখে ওব দিকে তাকাল—সম্ভবত মনে মনে সায় দিলেও মুখে কোন বকম অখেলোয়াড়ী ভাব দেখাতে বাজি নয়।

কিন্তু পাশেব দু ছোকবাব চোখে বাগ ফুটে উঠল। ওদেব ফিস ফিস মন্তব্যে বুঝতে পেবেছিলাম যে ওবা পদার্থে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পাবে, আব বিদেশাদেব শুধু বিনা খবচে কিছু 'বান' পাইয়ে দেওয়া অতি সামান্য ব্যাপাব।

উত্তেজনায় গদাধব দাঁড়িয়ে উঠেছিল। পদ্মাব ওপারেব গবম ভাবটা এখনো ওব কেটে যায় নি। তাই হাব মানতে ও বাজি হয় না বুঝলে। ব্যাপাব বেগতিক হতে পাবে দেখে হাত ধবে টেনে বসিয়ে দিলাম।

বললাম কবছ কি? চুপ কবে বসে খেলা দেখো যাও।

গজবাতে গজবাতে বলল—কি? এই খেলা দেখাব জন্য পয়সা খবচ কবে কিউএতে দাঁড়িয়ে দণ্ডভোগ কবতে এসেছি?

নীহাব লড়াই কবতে বাজি নয়। শান্তি স্থাপন কববাব আশায় বলল- আঃ ও বেচাবাবা যথাসাধ্য চেষ্টা কবছে। কেন চটছ ওদেব উপব?

ওই দু ছোকবাব মধ্যে একজন ঝালছোলা চিবাতে চিবাতে চোখেব চাহনিতে ঝাল

হড়াতে ছড়াতে বলল—মশায়, ওরা খেলতে নেমে আমাদের কৃতার্থ করেছে সেটা মনে রেখে কথা কইবেন। ওরা যদি সেই ইন্দোর বোম্বাই থেকে না খেলতে আসত দয়া করে—তাহলে কি আর মেন টেস্ট ম্যাচটা হত কলকাতায়? চেপে যান মশায়। আর স্পিক টি নট।

নীহার বলল—ঠিক বলেছ ভাই, আমরা শুধু খেলা দেখতে আসি পয়সা খরচ করে, নিজেরা খেলবার মত হাঙ্গামে আমরা নেই। সারাদিন মাঠে মেহনত করা, রোদে পোড়া, অসভ্য দৌড় ঝাঁপ। ছ্যাঃ, ওসব কি ভদ্রলোকের কাজ?

যাতে ছোকরারা না শুনতে পায় সেজন্য গদাধর আমার কানে কানে বলল—নীহার একটা কথার মত কথা বলেছে। কিন্তু ভেবে দেখ, আমরাই আসল খেলোয়াড়। কেমন বুদ্ধি করে সেই পেশোয়ার থেকে মাইশোর পর্যন্ত সব জায়গার লোকদের জড়ো করে এনে কিস্কিন্ধ্যা কাণ্ড করছি, আর নিজেরা তোফা আরামসে পায়ের উপর পা তুলে বসে তাদের খেলা দেখছি।

ওর মনের রাগটি অন্যদিকে সরে না গেলে আবার দু-চারবার দাঁড়িয়ে উঠে সবার নেক নজরে পড়তে পারে এ ভয় আমার ছিল। তাই জন্য কথায় ওকে ভুলাবার চেষ্টা করলাম। বললাম—জানই ত আমাদের দৌড় কতদূর। কেন আর ওসব নিয়ে মাথা ঘামাও। এই কাল দেখলাম ছাদে উঠে গত দশ বার দিন যে দুই ছোকরা একসারসাইজ করছে বলে মনে করত—ওরা রাস্তায় নেমে সবার সামনে নিজের হাতের প্যাকাটি দেখিয়ে দেখিয়ে হাকছে--দেখ হরে, আমার আজীবন সাধনা।

আর আজ ওরা কি করছে?

আমার আজীবন সাধনা

বুঝে নিতে কোন কষ্ট হল না। এরই মধ্যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়ে গেছে। আজ ছাদে উঠে সাধনায় সময় ওদের টিকির পাত্তা পেলাম না। ভাবলাম বোধ হয় এগজামিনের তাগিদ এসে গেছে। কিন্তু হরি হরি। দেখি সেই গলির মোড়ে কোন ইনকিলাবের দল ভিড়ে সেই প্যাকাটি হাত দুলিয়ে ঝাণ্ডা কাধে চলেছে। সাধনার স্বর্গপ্রাপ্তি হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে আমাদের অতিথিরা তাদের ভানুমতীর খেল সাঙ্গ করে ভারতীয় দলকে মাঠে নামিয়েছেন। ট্রাফালগারের যুদ্ধে এগিয়ে আসা ইংরেজ জাহাজের মত হেলতে দুলতে নেমে এল আমাদের দুই ধুরন্ধর। কিন্তু ওরা মোটেই স্বার্থপরের মত মাটি আঁকড়িয়ে পড়ে থাকায় লোক নন। অন্য সঙ্গী খেলোয়াড়দেরও ত নিজেদের লোকের চোখ তুলে ধরার সুযোগ দিতে হবে। তাই চটাপট তারা পরের জন্যই প্রাণ দিতে লাগল।

আমরা বসে দেখতে লাগলাম। এইটুকু খেলাই বা আমাদের দেখাচ্ছে কে? ভাগ্যিস, ওবা নানা দূব প্রদেশ থেকে এসেছে খেলতে।

পিছন থেকে ফিস ফিস করে কথা এল। সামনে দেখাব মত কিছু নেই দেখে পিছনেব কথাই শুনতে লাগলাম।

ভাই, চাকবিটা এবাব নির্ঘাৎ যাবে। খেলাটা দেখার জন্য 'সিক লিভের' দরখাস্ত দিয়ে এসেছি কিন্তু বড়সাযেব ব্যাটা কি আব বিশ্বাস করবে? এ খেলাটা বা দেখতে আসাই উচিত ছিল।

তা, চাকরিটার মুরুব্বি ছিল কে? তকে ধবলেই ত এবাবকার মত বেঁচে যেতে পার।

কথাটায় কোন ভবসা পেল না অফিস পালানো লোকটি। বলল—মুরুব্বি একজন নিশ্চযই ছিল তখন। না হলে দোরে দোরে ধরনা দিযে চাকবি পাওয়া কি আব আমাব কাজ? বুড়ো বাবা নিজেরই গরজে ছুটোছুটি কবে একজন মুরুব্বি জোগাড় করেছিলেন। তা বাবা ত আর কারো চিবকাল থাকে না।

- তবে ত মুস্কিলই হল। আব চাকবিব যা বাজার। উমেদারেবও লেখা-জোখা নেই। একটি চাকরিব জন্য হাজারটা উমেদার।

নীহাব চুপি চুপি মন্তব্য করল—অর্থাৎ এ যুগেব উদার তপস্যা। মহাদেবেব অর্থাৎ মহাসাহেবেব কবে ধ্যানভঙ্গ কবতে পারবে তাব জন্য সাধনা।

এ যুগেব উমাব তপস্যা

হঠাৎ পিছনেব আব একটি জাযগা থেকে ফিসফিসানি কানে এল। "বেড়ে আছে ব্যাটা, একটা ভাল চাকবি বাগিয়েছে ত হাতে স্বর্গলাভ হযেছে। চায়ের আসর মাৎ কবে বেড়াচ্ছে বোজ। আজ এখানে, কাল ওখানে। মেয়েদেব মা গুলোও যেমন বোকা।"

নীহাব কানে কানে বলল -চুপ কবে শুনে যাও। একটা মজাব কিছু বেব হবে মনে হচ্ছে।

আমি কিন্তু লোক সামলাতে পাবলাম না। কার দিকে লক্ষ্য করে কথাটি আসছে তাকে খুঁজে বের কববাব জন্য এদিক ওদিক তাকাতে লাগলাম। গদাধরের সঙ্গে পরামর্শ করে লোক বাছাই শুরু করলাম।

চিনতে বেশি দেরি হল না। চেকনাই মার্কা তরুণ, হালেই চাকরি পেয়েছে মনে হচ্ছে। মুখে একটি পরম সুপ্রসন্ন ভাব। একেই নিশ্চয় মেয়েব মাযেরা চাযের আসরে ডাকাডাকি করে থাকে।

তরুণেব চেহারা দেখে চবিত্র বাঁচাই করতে শুরু করলাম আমরা। শার্লক হোমস্ কি এর সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের ধার কাছ দিয়েও গিয়েছিল কখনো?

আমি বললাম—মনে হচ্ছে শ্রীমান একটি আসল রাজহংস। কন্যাবতীর ঘাটে ঘাটে পাখা মেলে ভেসে বেড়াচ্ছে, ভিড়বার নামটি নেই।

নীহারও সায় দিল। বলল—ঠিক বলেছ, একেবারে প্রেমের পরমহংস। এরা হচ্ছে খেলোয়াড়, যদিও স্পোর্ট নয়। নীর থেকে শুধু ক্ষীরটুকু চেখে সরে পড়বার তালে থাকে।

কন্যাবতীর ঘাটে ঘাটে রাজহংস

হরিহর এতক্ষণ খেলার মধ্যে আর কোন মজা না পেয়ে একটা টহল দিতে বেরিয়েছিল। এক প্যাকেট চানাচুর হাতে নিয়ে আমাদের মধ্যে আবার ফিরে এসে কথাবার্তায় যোগ দিল। বলল—ঠিক বলেছ আমিও এই নটবরটিকে লক্ষ্য করেছি অনেকক্ষণ থেকে। মনে হচ্ছে ওই যেন কোন বড় ক্রিকেট খেলোয়াড়। আমায় দেখে বেখো হে—এমনি একটি ভাব দেখিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিশেষ করে যেখানে যেখানে মেয়েরা বসেই সে জায়গা গুলিতে।

বললাম—সার্থক নাম এ জায়গাটির—গার্ডেন অব ইডেন। স্বর্গের বাগান নিশ্চয়ই।

একটু নড়ে চড়ে বসল নীহার। বুঝলাম যে একটি আইডিয়া এসেছে ওর মাথায়। এদিকে আমাদের খেলোয়াড়দের পরার্থে প্রাণ উৎসর্গ করার উৎকট বাসনা আর সহ্য হচ্ছিল না। তাই ক্রিকেটের চেয়ে ভাল—কিছু সময় কাটানর পথের অত্যন্ত দরকার পড়ে গেল।

প্রজাপতির ক্রিকেট।

নীহার বলল—তাই, এই তরুণকে দেখে দিব্য দৃষ্টি খুলে গেছে আমার। এই দেবতাদের বাগানে যে ক্রিকেট খেলা হয় তা হচ্ছে প্রজাপতির ক্রিকেট। ধরে নাও ওই নিটোল নিভাঁজ পুরুষ্টু নবচাকুরে একজন ব্যাটস্‌ম্যান। আমাদের কীর্তিমানদের জায়গায় যদি ওকে দাঁড় করিয়ে দাও নেহাৎ বেমানান হবে না। তবে বেচারা চিরকালই যে এমন চতুর নটবর ছিল তা নাও হতে পারে।

ঠাট্টা করে বললাম—অর্থাৎ বাঘ প্রথম থেকেই ত আর নর-খাদক হয় নি।

ঠিক বলেছ ভায়া—সমর্থন করল হরিহর ও চানাচুরের প্যাকেটটা এগিয়ে দিল।

আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু শোনই না কথাটি আমার।

নীহারের কণ্ঠে তাড়া দেবার সুর পেয়ে আমরা চুপ করে গেলাম। সারাটা মাঠই চুপ করে আছে মা বলভারতীর অবলা অবস্থায় সঙ্গে সমবেদনায়। গীত-ভারতী নৃত্যভারতী মায় বিশ্বভারতী পর্যন্ত হল গিয়ে সব অবদান বিশ্বের প্রতি আমাদের। কিন্তু বলভারতীর সেবায় আমরা শুধু দর্শক, স্পর্শদোষ আমাদের হয় নি।

বেচারা তরুণ প্রথমে সম্ভবত প্রেমারণ্যে নিরীহ হরিণ শাবকের মতই প্রবেশ করেছিল।

কিন্তু চিত্রাঙ্গদারা—

বাধা দিয়ে বললাম—সে কি? এ যুগে চিত্রাঙ্গদা?

অবশ্য—গম্ভীরভাবে বলল নীহার। অবশ্য, চিত্রাঙ্গদারা—আহা স্নো পাউডার রুজ লিপস্টিকে চিত্রিত অঙ্গ তাদের—শিকারে বেরিয়ে এদিক সেদিক শর নিক্ষেপ করতে শুরু করলেন।

প্রেমারণ্যে হরিণ শাবক

কিন্তু ঘায়েল করতে পারলেন না—টিপ্পনী কাটল গদাধর।

আহা চুপ কর না গদাই। বেচারা হরিণশাবক শিকারের সন্ধানে প্রেমারণ্যে চারদিক থেকে বাণ খেতে খেতে অস্থির হয়ে পড়ল। শেষে এমন দিন এল যখন তার বন্ধুরাও আর চায় না যে সত্যি সত্যি ওর বিয়ে নামক কাণ্ডটি ঘটে যায়। একদিন একজন বন্ধু ওকে জিজ্ঞেস করল কি হে ভায়া, শুনছি কুমারী মৃগয়া মিত্রের সঙ্গে তোমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

তরুণ।—না তা হয় নি। তবে এই কানাঘুষোটির জন্যও আমি কৃতজ্ঞ।

বন্ধু। শুনে বড় দুঃখিত হলাম।

তরুণ। সে কি? তুমি আমার এমনি বন্ধু যে আমার শুভবিবাহ হয়, তাও তুমি চাও না?

বন্ধু। না হলেই সুখী হয়। কারণ বিয়ে হলেই যে ফুরিয়ে গেল। এর মুখরোচক খবর আর খাবার দুই ই যে বন্ধ হয়ে যাবে তার পর থেকে।

তরুণ অর্থাৎ গুড নাইট ভিয়েনা?

বন্ধু। এগজাকটলি সো। অতএব বুঝেছ—ভায়া—কখনই বিয়ে না, কারণ তাহলেই ভিয়েনা বন্ধ হয়ে যাবে। ছাদনা তলায় একবার গেলেই এ জীবনের মত বাড়ি মজাসে ছানার ডালনা মারা বন্ধ হয়ে যাবে

তরুণের মনে কথাটা এমন ভাবে গেঁথে গেল যে কোন তরুণীর কথা সে রকম ভাবে ওর মনে ঢুকলে ওর আখেরের বন্দোবস্ত হয়ে যেত। যাই হোক, শিক্ষা বেচারার খুব ভাল করেই হয়ে গেল। এখন থেকে শুরু হল ক্রিকেট খেলা। পঞ্চশরের লক্ষ্যভেদ যখন ব্যর্থ হল, এগিয়ে এল প্রজাপতির ক্রিকেট।

আর প্রত্যেক ম্যাচই হচ্ছে এক একটা টেস্ট ম্যাচ।

এই শীতের পড়ন্ত দিনেও আমরা একটু গরম আমেজ বোধ করতে লাগলাম।

ইডেন গার্ডেনের বদলে খেলার আসর হবে চায়ের বৈঠকে। অবশ্য ব্যাটস্‌ম্যান গরদের গ্লাভস (দস্তানা), নাগরার প্যাড—এসব দরকারি সাজে সেজে কাউন্টি ক্যাপের বদলে কবির

পাশনে চশমা পরে নিজের উইকেট বক্ষা করতে রঙ্গভূমিতে নামবে। সেখানে আগে থেকেই অপেক্ষা করছে খেলাব অন্যান্য ফিল্ডসম্যানরা। যথা কনের বোন. বৌদি, পাড়াতুতো বন্ধু প্রভৃতিবা। তাদের ফিসফাস কথা উসখুস কানাঘুষো এসবে স্যাটমোসফিযারে একটা আবেশ বইয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাউন্ডারির পাশে পাশে, উইকেট থেকে দূরে স্ক্রিনের আবরণেব পিছনে দর্শক হচ্ছে প্রতিবেশিনী ও আত্মীয়ারা। কখনো বাজান হয় না এমন একটা কটেজ পিযানো বা কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের বইও ছড়ান আছে।

কেন আমবা? নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রশ্ন কবল হবিহব। কেন আমবা দর্শক হব না কেন? বন্ধুরা কি ফেলনা?

না হে না, তোমারও ফেলনা না—হেসে উত্তর দিল নীহার। তোমবা হচ্ছ বদলি অর্থাৎ সাবস্টিটিউট। অথবা 'ডিড নট ব্যাট' সেই দলে। যদি খেলা খতম হয়ে যায়. তাহলে তোমরা আর মাঠে নামবাব সুযোগ পেলে না। তবে তোমাদের দিকেও নজর আছে জেনে রেখো। বিশেষ করে ওই সব বাড়তি (একস্ট্রা) ফিলডাবদেব। ওদেব মধ্যে আজকাল বয়স হয়ে যাওয়াব জন্য টেস্ট ম্যাচে ভাগ্য পবীক্ষা করবাব সুযোগ আর পায না এমন কয়েকজন খেলোযাড়ও থাকতে পাবে।

আচ্ছা এমন খেলাটা শুরু করে দাও। মনে হচ্ছে এই টেস্ট ম্যাচেব চেযে ওই টেস্ট ম্যাচটাই বেশি মজাব হবে।— বললাম আমি।

কোন তুলনাই হয় না এই দুটোতে। পাত্র উইকেটেব সামনে এসেই মাপ জোক শুরু করল অবস্থাটায়। এক চোখে দেখেই বুঝে নিল যে টিপয়ে যে কেকটা সাজান আছে সেটি হচ্ছে কনের নিজেব হাতে তৈবি বলে পরিচিত ফাবপোব কেক। যে কটেজ পিযানোটা সাজান আছে, সেটি শুধু একটা আসবার হিসাবেই শোভা পায। ওই বাশ্যান সাহিত্যেব বইগুলি শুধু কথাবার্তায় বসান যোগায , ভেতরেব পাতাগুলিও কাটা হয নি। কনেব হাতেব সূচিশিল্পেব নমুনাগুলো কমরেডিভাবে সব হবু-কনে মেয়েব চায়েব আসবে কুটিবশিল্প বিপণি থেকে এসে হাজিবা দেয।

আমিও একটু একটু প্রেবণা পেতে আবম্ভ করেছিলাম। বলে ফেললাম—যাদেব বিয়েব উপক্রমণিকাতেই এত, তাদের উপসংহারে না জানি কেমন হবে।

কেন? তোমাব এ সন্দেহেব কাবণ কি? - গল্পেব স্রোত নামিয়ে জিজ্ঞাসা কবল নীহাব।

বললাম খুলে কারণটা। মাত্র গত কালই আমাদেব পাশের বাড়িতে দেখেছিলাম। অনেক দিন পূর্বরাগ করে দুজনে বিয়ে হয়েছিল। কাল স্বকর্ণে শুনলাম ওদের অনুরাগের কথাবার্তা। সেদিনের ষোড়শী এদিনেব সাঁড়াশি হয়ে জিভ চালাচ্ছে ছুরির মত। মনের মানুষটিরও রঙের ফানুস চুপসিয়ে গিয়েছে চিরকালের জন্য।

সে দিনের মানসী মা-মনসার মত বলছে—আমি যদি তোমার স্বামী হতাম. তোমায় বিষ দিতাম।

সেদিনের প্রিয়তমা ফণা তুলে বলল—আব আমি যদি তোমার স্ত্রী হতাম, সে বিষ আমি খেতাম।

সান্ত্বনা দিয়ে নীহার বলল—না, মা, এত নিরাশ হবার কারণ নেই। আর এটা হচ্ছে বিয়ের আগের অবস্থা। দিল্লির লাড্ডু পরে কি জিনিসে দাঁড়াবে সেটা এখন না ভেবে—

দুর্গা বলে ঝুলে পড়াই ভাল—ফোড়ন কাটলাম আমি।

প্রজাপতির ক্রিকেট খেলা

না না, ঝুলেই যে পড়তে হবে তেমন কাঁচা ছেলে আমাদের ব্যাটসম্যান নয়—বলল নীহার। সে চারদিকে নজর রেখে নিজের উইকেট সামলাতে লাগল। এমন সময় খেলায় মাঠে নামল ভাবী শাশুড়ি— উইকেট কিপিং করবার জন্য।

ওঃ, সেই ইংরেজিতে যাকে বলে মাদার-ইন-ল' বাবা বাঃ। সেই ভয়ে ওরা বিয়ে করতেই চায় না। মনে পড়ল সেই মর্মান্তিক কথাটা। জান, খৃস্টানদের বিগামির (দুই বিয়ের) শাস্তি কি? প্রশ্ন করলাম আমি।

হরিহর বলল—জেল।

মাথা নাড়লাম। উঁহু, হল না।

গদাধর বলল—জেলের উপর সমাজে নিন্দা।

তবু হল না। উঁহুঃ, অত সহজ শাস্তি নয়।

নীহার বলল—বলছি। দু দুখানা শাশুড়ি।

সাবাস। ঠিক বলেছ। আমেরিকাতে নাকি আজকাল গুণ্ডারা বৌয়ের বদলে শাশুড়িকে কিডন্যাপ করে লোপাট করে নিয়ে যায়। তার পর চিঠি লিখে শাসায়—দাও পাঠিয়ে পাঁচ হাজার ডলার জলদি। না হলে এই পাঠালাম শাশুড়িকে ফেরৎ।

আবার ক্রিকেটের কাহিনি শুরু হল। শাশুড়ি ঘরে ঢুকে ব্যাটসম্যানের মতিগতি হাব-ভাব স্বভাব এসব তীক্ষ্ণ নজরে দেখতে লাগল। কখনো মাথা উঁচুতে তুলে, কখনো হামাগুড়ি দিয়ে দেখাব মত পাত্রের পা থেকে মাথা মায মতিগতি পর্যন্ত যাচাই করতে লাগল। তারপব খেলাতে নামল কনে। চারদিকে চোখে চোখে হাততালি পড়ে গেল! পাত্রের চোখের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই পাত্র ব্যাটের মত করে হাত তুলে ছোট্ট একটু নমস্কার জানাবে। মেয়ে তখন দেখাবে করপদ্মের একটু নাচন। তার ভিতরে যে বল আছে সেটাকে পাত্র ছিটকে ছুঁড়ে বাউন্ডারি করে বেরিয়ে যাবে, না কট-আউট বা ক্লিন-বোল্ড হবে জানা নেই কারো। কনে বল ছুড়ল, কিন্তু প্রতিবেশিনী বা আত্মীয়া অন্য কেউ সে বলে ক্যাচ ধরে ব্যাটসম্যানকে সাবাড় করে দিল এমন অঘটনও ঘটতে পারে কখনো বখনো।

তা, কনে খেলতে নামার পর অন্য ফিল্ডাররা কি তখনো সমান দরকারি নাকি?—প্রশ্ন করল হবিহর।

অবশ্য জরুরি দরকারি। ওরা আবো বেশি হুঁশিয়ার হয়ে মাখামাখি হয়ে কাছাকাছি এগিয়ে আসবে—যাতে কনেব সঙ্গে মা ওদের সঙ্গে সব কথাবার্তাতেই এক আধটা ক্যাচেব ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দরকার মত পিছিয়ে গিয়ে মাঝের মাঠটা খালি করে দিতেও আপত্তি নেই। যাতে বল করতে করতে বাউন্ডারি হয়ে বল না বেরিয়ে যায় সেজন্য সতর্ক পাহাবা।

বেচারা! দুঃখ হচ্ছে ওর অবস্থা ভেবে— বললাম আমি।

কেন, আমার ত একটু হিংসাই হচ্ছে—প্রতিবাদ করল হবিহর।

তবে শোন বলছি। সেদিন আমি তিন জন পোস্ট গ্রাজুয়েটের পাকা ছাত্রের কথাবার্তা শুনছিলাম। সত্যি সত্যিই পাকা অর্থাৎ আশুতোষ বিল্ডিং-এর বেঞ্চিতে পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট করেছে।

একজন বলল—দেখ ভাই, আমাদের সুখেন্দুব বরাত বড় ভাল। প্রেমের ব্যাপারে খুব ভাগ্যবান।

অন্য একজন বলল—কেন? ও বুঝি সর্বদাই ওব 'লেডি লভ'কে পেয়ে যায়।

উত্তর হল—না, ও এখনো অবিবাহিত রয়ে যেতে পেরেছে। প্রেমে পড়ে, কিন্তু পাকড়াও হয় না।

হো হো করে হাসিতে সবাই গড়িয়ে পড়ল। এক নীহাব বাদে।

সে বলল--সেটা দুর্ভাগ্যও হতে পারে। কারণ ভেবে দেখ, তার মতন শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়ে যাবে তখন বর সে একদিন ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের খেলা দেখতে গিয়েছে স্ত্রীর সঙ্গে—এমন সময় যদি কোন আগেকার বান্ধবী এসে বলে হ্যালো—তখন কেমন হবে?

বললাম—এমন আর কি? তার চেয়ে ভেবে দেখ—সে তাব আগেকার বান্ধবীকে নিয়ে খেলা দেখতে গিয়েছে, এমন সময় তার স্ত্রী এসে বলল—হ্যালো। তখন কেমন হবে?

নীহার হার স্বীকার করল সবিনয়ে।

কিন্তু তা বলে তার ক্রিকেটের গল্প শোনানর দায়িত্ব থেকে সে মুক্তি পেল না। আবার শুরু করল।

মেয়ে দেয় বল, ছেলে ঠেকায় ব্যাট, মেয়েব মা বাখে উইকেট, আব পাত্রীপক্ষ কবে ফিল্ডিং। তবে প্রত্যেক ওভাবে ছটিব বদলে মাত্র পাঁচটি বল। পঞ্চশবেব কাববাব কিনা।

আব আম্পায়াব?

আম্পায়াব হচ্ছে ঘটক ঠাকুব, অথবা কনেব পক্ষেব কোন হিতৈষী বা ববেব কোন বন্ধু। মোট কথা খেলাব মাঠে তাকে থাকতে হয় অলক্ষিতে। অবশ্য আসলে অলক্ষিত আম্পায়াব হচ্ছে পঞ্চশব। চট কবে হৃদয়ে আহত হয়ে হিট-উইকেট হবে না, সোজাসুজি ভদ্রলোকেব মত বোল্ড-আউট হবে, না বেকায়দায় পড়ে এল বি-ডবলিউ হবে এ সম্বন্ধে এক আম্পায়াবই বায় দিতে পাবে। মোট কথা নট-আউট হয়ে মাঠ থেকে বাঁধনছেড়া গরুব মত বেবিয়ে যেতে না দেওয়াব দিকে সবাই কড়া লক্ষ্য বাখে।

ঠিক বলেছ ভাই, সে খেলাই আসল খেলা। ইংবেজবা তাই বলেছে যে নেপোলিয়নেব সঙ্গে ওয়াটার্লুব যুদ্ধ ওবা ইটন স্কুলেব খেলাব মাঠেই জিতেছিল।

আমাব কথায় ভাবে কোন যুদ্ধং দেহি ভাব আব ছিল না, কাবণ টেস্ট ম্যাচেব যুদ্ধও ততক্ষণে প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল চাবদিকে লোক গুটি গুটি উঠে সবে পড়তে আবম্ভ কবেছে।

শুধু গদাধব বলল —চল আমবাও ইটনেব খেলাব মাঠেব মহড়াটা ইডেন গার্ডেনেব বাইবে গিয়ে দিতে শুরু কবি। প্রজাপতিব ক্রিকেট থাকতে ভাবনা কি। আমাদেব খেলাব সুযোগেব অভাব হবে না।

ফাল্গুন, ১৩৫৯

# বানর-সমস্যা সমাধান

## শ্রীগঞ্জিকাসেবী

### উদ্যোগ পর্ব

বৃন্দাবনে বড়ই বাঁদরের উপদ্রব। বাঁদরের জ্বালায় বাড়িতে বৌঝিদের টেকা দায়। বানরগণ নারীর সম্মান তো কিঞ্চিন্মাত্র জানেই না, পরন্তু ভয়ও করে না। ইহাদের বোধ করি পুরুষানুক্রমিক একটা ধারণা আছে যে মেয়ে মাত্রই সীতার মত নিরীহ গোবেচারা, ছিঁচকাঁদুনে। উহাদের কিছুমাত্র পৌরুষ নাই। আমার ইচ্ছা হয়, বালিগঞ্জের গোটাকতক বাছা বাছা মেয়ে বৃন্দাবনে ছাড়িয়া দিয়া বানরদের এই পর্বতপ্রমাণ ভুলটা (Himalayan blunder) ভাঙ্গিয়া দিয়া দেখি ব্যাপারটা কিরূপ দাঁড়ায়। বাঁদরের অত্যাচারের পুরুষেরাও ব্যতিব্যস্ত। ছোট ছেলে মেয়েগুলিও দেখিয়া দেখিয়া নানাপ্রকার বাঁদবামি শিখিতেছে। অথচ পাণ্ডাদের বাধায় ইহার কোন প্রতিকার করিবাব উপায় নাই। ইহাদেরই পূর্বপুরুষ হনুমানচন্দ্র (নামটি বোধ হয় মান্দ্রাজি হনুমন্তরাওএর আর্য সংস্করণ) নাকি রামচন্দ্রের লঙ্কাযুদ্ধেব সময় বিলক্ষণ সাহায্য করিয়াছিলেন, সুতরাং রামচন্দ্রেব বংশধরগণেরও ইহাদিগেব বিরুদ্ধে কোন প্রকার ঝামেলা করিবার এক্তিয়ার নাই।

সদ্য বৃন্দাবন হইতে বায়ুপরিবর্তন করিয়া ফিরিয়াছি। বালিগঞ্জে ডোভার লেনের বাড়ির বৈঠকখানায় বসিয়া নিজেদেরই বাঁদর ঘটিত কয়েকটি দুর্ঘটনাব কথা স্মবণ কবিয়া সকালবেলা মনটা খারাপ হইয়া গেল। চিত্তবিনোদনার্থে একটা মাসিক পত্রিকায় মনঃসংযোগ কবিলাম।

নাঃ, ইহাদের এড়াইবার উপায় নাই। মাসিকের দু-চার পৃষ্ঠা উল্টাইয়াই চোখে পড়িল---একটি ক্ষুদ্র নাটিকা। আরম্ভেই লেখা : স্থান--অরণ্য, কাল---প্রাগৈতিহাসিক, পাত্র---বিশ্বামিত্র, পাত্রী---মেনকা। বিশ্বামিত্র সবে ধ্যান সমাপন করিয়া উঠিয়াছেন। মেনকা বেদিং স্যুট পরিয়া আসিয়া বড়ই বাহানা ধরিয়াছেন, আজ মিক্সড বেদিং-এ যাইতেই হইবে। বিশ্বামিত্র অনেক করিয়া বুঝাইতেছেন যে এ নিবিড় অরণ্যে মিক্সড বেদিং-এ গিয়া কোনও লাভ নাই। একে তো অরণ্যের নদীতে স্নানার্থে অধিক লোকসমাগম হয় না। যাহারাও আসে, তাহারা অত্যন্ত হুঁসিয়ার ঋষি অথবা ঋষিপুত্র। মেনকা মুখনাড়া দিয়া বলিলেন, ওসব ঢের ঢের ঋষি আমার দেখা আছে। কিন্তু বিশ্বামিত্র তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া বলিয়া চলিলেন, হয়ত তাঁহারা তোমাকে দেখিলেই চক্ষু বুঁজিয়া মন্ত্রতন্ত্র শুরু করিয়া দিবেন। বিভাণ্ডক মুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ থাকিলেও হয়ত কিছু না বুঝিয়া-সুঝিয়া তোমাব সহিত আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু কিছুদিন হইল লোমপাদ রাজার আড়কাটিরা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। মেনকা সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, চা-বাগানে না কি?

সিপিং স্যুটেব উপবে বেশমেব ড্রেসিং গাউন চাপাইযা দুইটি যুবক ঘবে ঢুকিলেন। মুখ তুলিযা চাহিযা দেখি সজনে ডাটা ও যোগী গুহা। গুটিপোকা অবস্থায ইহাদেব নাম ছিল সজনীকুমাব দত্তগুপ্ত ও যোগেন্দ্রনাথ গুহ। সম্প্রতি বিলাত হইতে কোকুন কাটিযা সজনে ডাটা ও যোগী গুহা হইযা ফিবিযাছেন।

ডাটা একটু উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, "বীবেনদা, একটা গুরুতব কাজে আপনাব কাছে এসেছি। আপনাব এ আযেসি জীবন কিছুদিনেব মত ছাডতে হবে। আমাদেব একটা কাজে আপনাব সাহায্য বিশেষ দবকাব।"

জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিলাম।

ডাটা বলিযা চলিলেন, 'বৃন্দাবনে বাদবেব অত্যাচাবে জীবন দুর্বিসহ—আপনিও তো সদা সদা দেখে এলেন। কিন্তু পাণ্ডাদেব বাধায এব কোন প্রতিকাব কববাব উপায নেই। তাই আমবা কজনে মিলে ঠিক কবেছি, আমবা একটা দল কবে বৃন্দাবনে যাব। গিযে পাণ্ডাদেব বুজিযে সুঝিযে হয তো ভালই, তা নইলে সত্যাগ্রহ কবে বৃন্দাবনকে এ অত্যাচাব থেকে মুক্ত কববাব চেষ্টা কবব। অমন একটা হলিডে বিসর্ট তো এমন কবে কুসংস্কারেব বশে নষ্ট কবতে দেওযা যায না। কি বলেন?

আমি একটু হাসিযা বলিলাম 'হলিডে বিসর্ট হিসেবে যা বললে তা কিছু মিথ্যে নয। দ্বাপবযুগ থেকে ওব প্রসিদ্ধি আছে স্বয শ্রীকৃষ্ণ নাকি ওখানে অনেক দিন কাটিযেছিলেন। তেমন ফূর্তি নাকি আজকাল মন্টিকর্লোতেও হয না। কিন্তু সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে কংগ্রেসেব বিবৃতি পডেছ তো? সত্যাগ্রহ যদি আবম্ভ কবতে হয তবে কববেন হয মহাত্মা স্বযং, নয নিদেন এ. আই. সি. সি। তুমি আমি সত্যাগ্রহ শুরু কবলে ডিসিপ্লিনাবি য়্যাকশন্ নেওযা হবে।'

ডাটা ক্ষুণ্ন হইযা বলিল, 'আপনাকে নিযে ঐ তো মুস্কিল, বীবেনদা। এলাম একটা গুরুতব কথা বলতে, আব আপনি ঠাট্টা কবেই উডিযে দিচ্ছেন।'

তাহাকে ঠাণ্ডা কবিবাব অভিপ্রাযে বলিলাম আবে না না- তা আমাকে কি কবতে হবে তা তো কিছুই বললে না।

ডাটা ঠাণ্ডা হইযা বলিল, আপনাকে আমাদেব দলেব সভাপতি হতে হবে।

আমি প্রমাদ গণিযা হাসিযা বলিলাম, দেখ, তোমবা এই বালিগঞ্জেব ছেলেবা সাবা বাংলাব তথা ভাবতেব ফবওআর্ড ব্লক। সভাপতিব নিকুচি কবেছে—সব জাযগায সভাপতি শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হযে গেল— তোমবা একটি সভাপতিহীন আদর্শ দেখিযে দাও দেখি।

কিন্তু কথায চিডা ভিজিল না। আমাব ন্যায একটি দাযিত্বজ্ঞানসম্পন্ন বযস্থ লোক সভাপতি রূপে না থাকিলে নাকি কাজ কিছুই আগাইবে না। কাজেই আমাকে সভাপতি হইতেই হইবে। ববং নাবীপ্রগতিব নমুনাস্বরূপ একটি সম্পাদিকা রাখা হইবে।

আমি সভযে জিজ্ঞাসা কবিলাম, সম্পাদিকা কি হে? কাগজ টাগজ বেব কববে নাকি?

যোগী গুহা হাসিযা বলিল, না, না বীবেনদা, সম্পাদিকা মানে সেক্রেটাবি।

আমি অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, তা ভায়া, চল্লিশের ওপর বয়স হল, তোমাদের আধুনিক কৃষ্টির একখানা অভিধান না হলে সব সময় তাল রাখতে পারি না—দেখি কুড়লরামের গমস্তিকায় কাজ হয় কিনা।

যাহা হউক, সম্পাদিকাও স্থির হইয়া গেল। মিস্ নোরা শীল অপেক্ষা উপযুক্ত পাত্রী আর নাই। তাঁহাব বাবার পয়সাও অগাধ—আবশ্যক হইলে মোটা গোছের কিছু চাঁদাও পাওয়া যাইবে।

নোরা শীলের বাবা ফটিকচাঁদ শীল ১৯১৪ সালে হঠাৎ ফাঁপিয়া উঠিতে শুরু করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ডালভাত ছাড়িয়া ব্রেকফাস্ট ডিনার খাইতে আরম্ভ করেন ও ছেলেমেয়েদের জন্য ফিরিঙ্গি গভর্নেস্ রাখিয়া দেন। কিন্তু ছেলেমেয়েরা গোলমাল বাধাইল। তাহারা ইতিপূর্বেই কৈ মাছ-চচ্চড়ির স্বাদ পাইয়াছে। চাকরদের জন্য ঐরূপ একটা কিছু রান্না হইলেই বাহানা ধরিত, আমরা সার্ভেন্টদের খাওয়া খাব। ঠাকুমা নিস্তারিণী দেবী তাহাদের অনেক বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টা করিতেন—আরে, তোরা সাহেব হয়েছিস্, সাহেব হলে আর মাছ-চচ্চড়ি খেতে নেই। কিন্তু এসব বিশেষ ফলপ্রসূ হইত না। সাহেবির মর্যাদা রক্ষার্থে মাছ চচ্চড়ি ছাড়িবার মত বয়স তাদেব তখনও হয় নাই।

এই সময় মিস্ শীলের জন্ম হয়। নিস্তারিণী দেবীর ক্ষেমঙ্করী, ক্ষ্যান্তমণি, মোক্ষদা ইত্যাদি বাছা বাছা ক্ষ-সংযুক্ত সুলক্ষণ নামগুলি সমস্তই অপছন্দ করিয়া যখন ফটিক শীল আদর করিয়া মেয়ের ইংরাজি নাম রাখিলেন 'নোরা', তখন নিস্তারিণী দেবী বোমাব মত ফাটিয়া পড়িলেন, আহা কি নামই রাখা হল নোরা, এরপর নাম রাখবে, হামানদিস্তে, গুপ্তুট! বলি ও ফটিক, এর পর এই মেয়ে বড় হয়ে যখন 'তোরই শিল তোরই নোড়া, তোরই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া' করবে তখন সামলাতে পারবি তো? কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হইল না। বরং ফটিক শীল কন্যাকে গোড়া হইতেই ইংরেজি কায়দায় মানুষ করিতে লাগিলেন— যাহাতে এও বড় হইলে বিগড়াইয়া গিয়া সার্ভেন্টদের খাওয়া খাইবার বাহানা না ধরে।

ইহারই কিছুকাল পরে চাষাধোপাপাড়া লেনের পৈতৃক ভিটা ছাড়িয়া ফটিক শীল যখন সেন্ট্রাল এভিনিউতে ফ্ল্যাট্ লইয়া উঠিয়া আসেন তখনও নিস্তারিণী দেবী কিছু করিতে পারেন নাই। নিজের গোটা-বাড়িটা ছাড়িয়া দিয়া পরের বাড়ির খানকয়েক ঘব ভাড়া করিয়া থাকাকে তাঁহার বুদ্ধিতে উদ্‌বৃত্তি বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু এ ফ্ল্যাটও ছাড়িতে হইল। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর সেন্ট্রাল এভিনিউর নাম যখন চিত্তরঞ্জন এভিনিউ হইল তখন ফটিক শীল ল্যান্সডাউন রোডে বাড়ি কিনিয়া উঠিয়া আসিলেন। সম্প্রতি শোনা যাইতেছে যে, এই ল্যান্সডাউন রোডেরই কিয়দংশের 'বিপিন পাল রোড' নাম দেওয়া হইবে। ফটিক শীল শাসাইয়া রাখিয়াছেন যে তাঁহার বাড়ি এই অংশে পড়িলে তিনি কর্পোরেশনের নামে ক্ষতিপূরণের নালিশ করিবেন, কেন-না ল্যান্সডাউন রোডের পরিবর্তে বিপিন পাল রোড নাম হইলে তাঁহার বাড়ির মূল্য শতকরা নিদেন দশ-পনের টাকা কমিয়া যাইবে।

যাহা হউক, মাসখানেকের মধ্যে বাঁদর-নিবারণী সভায় একটা খসড়া প্রস্তাব পাশ হইয়া গেল। প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি ও সজনে ডাটা, যোগী গুহা, যোড়শী মহিলানবিশ প্রমুখ পাঁচ

জন মেম্বর বৃন্দাবনে গিয়া একটা কিছু হেস্তনেস্ত করিয়া আসিবে। মেম্বরগণ সকলেই নামের দ্বিতীয় পদ বর্জন করিয়া মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সাজিয়া বসিয়াছেন—কেবল মহিলারবিশ নিজের পুরুষত্ব বিজ্ঞাপনার্থে মধ্যে মধ্যে লুপ্ত অকারের চিহ্নের ন্যায় ব্র্যাকেটে 'কান্ত' লাগাইয়া থাকে। বৃন্দাবন যাইবার বন্দোবস্তও সমস্তই নির্বিঘ্নে ঠিক হইয়া গেল। কেবল বৃন্দাবনযাত্রী মেম্বর নির্বাচনের সময় সভাপতির আসনে বসিয়া স্থান-কাল-পাত্র ভুলিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিয়াছিলাম মেমের বর-মেম্বর, ষষ্ঠীতৎপুরুষ— তাহাতে সমস্ত মেম্বরগণই যারপরনাই মনঃক্ষুণ্ণ হন। যাহা হউক, এ সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করা গেল। কোনমতেই সভাপতির পদ হইতে অব্যাহতি না পাইয়া আমি পূর্বেই স্থির করিয়া লইলাম যে বৃন্দাবনে গিয়া যথাসম্ভব আড়ালে থাকিব।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

পথে প্রায় দুই দিন কাটাইয়া প্রত্যূষে বৃন্দাবনে পৌঁছিলাম। শীতকাল— বিলক্ষণ কোয়াশা হইয়াছে। বৃন্দাবনে নামিতেই বাঁদর তাড়াইব কি, পাণ্ডারাই আমাদের বাঁদর নাচাইতে শুরু করিল। ইহাদের নামের নির্ঘণ্ট প্রণালী অনুধাবনযোগ্য। আমার ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষের কেহ কখনও বৃন্দাবন গিয়াছিলেন বলিয়া আমার জানা ছিল না মেয়েরা কেহ কেহ গিয়াছিলেন বটে। পাণ্ডারা শুধুমাত্র নাম ও ধাম জানিয়া লইয়া ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মোটা মোটা খাতা সহ আমাদের বাড়িতে উপস্থিত হইয়া আমাদের পূর্বপুরুষদিগের নামধাম স্বাক্ষর ইত্যাদি অকাট্য প্রমাণ দিয়া দেখাইয়া দিল যে, বৃন্দাবনে কৃপানাথ আচার্য আমার ও কৃতপ্রসাদ বর্মা ডাটার কুলপুরোহিত। এই কৃপাচার্য ও কৃতবর্মার চরেরা আমাদের নামধাম শুনিয়া স্টেশনেই আমাদের গ্রাম ও বংশ ইত্যাদি সম্বন্ধে বহু তথ্য মুখস্থ বলিয়া সজনে ডাটাটাকেও চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিল।

স্টেশন হইতে বাড়ি যাইবার জন্য গাড়িতে উঠিয়া তিক্ত কণ্ঠে ডাটা বলিল, 'কত প্রতিভাই আমরা হেলায় নষ্ট করি বারেনদা। বংশ পরিচয় সম্বন্ধে এদের জ্ঞান ও স্মৃতিশক্তি বিলেতে হলে কত কাজেই লাগাত। ক্রিমিনাল পুলিশ বিভাগের মাথায় বসে হয়ত সারা ইংলণ্ডের বংশাবলি মুঠোর মধ্যে নিয়ে বসে থাকত -কারো সাধ্যি হত না একটু ট্যাঁ ফোঁ করে। এরাও মোটা মাইনে পেত, দেশেরও কত উপকার হত। আমাদের দেশে তো তা নয়, যত বোগাস কাণ্ড।'

যোগী গুহ সায় দিয়া বলিল, 'সত্যি বারেনদা, সেবার বদ্রিনাথ গিয়েছিলাম—এক জায়গায় দেখি একটা গরুকে তীর্থযাত্রীরা সব রসগোল্লা খাওয়াচ্ছে। জিজ্ঞেস করলুম, ব্যাপার কি? শুনলুম গরুটা নাকি কামধেনু, তার কাছে যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়, তাই তীর্থযাত্রীরা তাকে রসগোল্লা খাইয়ে তুষ্ট করছে —গরুটা নাকি রসগোল্লা খেতে বড় ভালবাসে। গরুটার বিশেষত্ব এই যে, তার কখনও বাছুর হয় না কিন্তু সম্বৎসর দিনে আধসের করে দুধ দেয়। আমি তো বুঝি এই কথা যে অত রসগোল্লা খাইয়ে যদি মোটে আধসের করে দুধ পাওয়া যায় তবে লাভের গুড় তো পিঁপড়েয় খেল। আবার বলে দুধ

নাকি ভারি মিষ্টি—আরে, অত রসগোল্লা খেলে যে আমাদের ঘামশুদ্ধ মিষ্টি হয়ে যেত। আজকাল বৈজ্ঞানিক উপায়ে পশুপালনের দিনে কি-না এই অপব্যয়! বিলেতে বসে ওর পেছনে অত পয়সা না ঢেলে সামার-এ ব্ল্যাকপুলে ঐ গরু দেখিয়ে কত পয়সা রোজগার করত।

ইহাদের বিলাতি গল্পে হাঁপাইয়া উঠিলাম। ও প্রসঙ্গ চাপা দিবার উদ্দেশ্যে বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিলাম, ওঃ কি কোয়াশাই হয়েছিল, এখন কিছুটা ফর্সা হচ্ছে।

কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। ডাটা একটু হাসিয়া বলিল, "এ আর-কি কোয়াশা বীরেনদা। কোয়াশা দেখেছিলাম সেই ম্যাঞ্চেস্টারে ১৯৩১ সালে—পনের দিন ধরে একটানা কী কোয়াশাই চলল! ডিনারের পর রাস্তায় বেরিয়েছি, ভাবলুম একটা সিগারেট ধরাই। পাঁচ-সাতখানা কাঠি পোড়ালুম কিন্তু সিগারেট আর ধরে না। ভাবলুম—ব্যাপার কি? হঠাৎ খেয়াল হল, সিগারেটটা মুখ থেকে খুলে চোখের কাছে ধরে দেখি সিগারেট দিব্যি জ্বলছে, আধখানা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে—কোয়াশা এমন যে তার মাথার আগুনটা এতক্ষণ চোখে দেখতে পাই নি।

আমি হাসিয়া বলিলাম, তোমার সিগারেটের গল্প শুনে আমারও যে বড় সিগারেট খাবার ইচ্ছে হচ্ছে—দাও দেখি দেশলাইটা, একটা ধরাই।

ষোড়শী মহিলানবিশ নিতান্ত ছেলেমানুষ—দূরসম্পর্কে আমার ভাগিনেয়। সুতরাং আমার সাক্ষাতে সে কখনও সিগারেট খায় না। একবার তাহাদের বাড়িতে হঠাৎ আমার গলার খাঁকার শুনিয়া তাড়াতাড়ি জ্বলন্ত সিগারেটটা পিছন দিকে লইয়া পাঞ্জাবির তিন ইঞ্চি পোড়াইয়া ফেলিযাছিল। কিন্তু সেদিকে লক্ষ না করিয়া বেশ সপ্রতিভভাবে বলিযাছিল, ঠাকুমাকে বলে বলে আর পারা গেল না—ধূপের ধোঁয়ায় ঘরটাকে কি করে রেখেছে, দেখুন না! আমি তখন ষোড়শীর পিছনে পাঞ্জাবির ধোঁয়া দেখিতে ব্যস্ত ছিলাম। দেখিলাম আর দেরি করিলে দমকল ডাকিতে হইবে—বলিলাম, গরম লাগছে না তোমার? পাঞ্জাবিটা গিয়ে খুলে ফেল না।

ডাটা এত বৃত্তান্ত জানে না—বলিল, আমার কাছে তো দেশলাই নেই—ষোড়শীর কাছে আছে। ষোড়শীও দেখি খেয়াল না করিয়া পকেটে হাত ঢুকাইয়া দিয়াছে। আমি তাড়াতাড়ি সজোরে বলিলাম, না, ওর কাছে নেই।—ষোড়শী সড়াক করিয়া খালি হাতটা পকেট হইতে বাহির করিয়া ফেলিল। তখন যোগী গুহার দেশলাইতে সিগারেট ধরাইতে ধরাইতেই গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া গেলাম।

দিন দশেক পরের কথা। পাণ্ডাদের বুঝাইয়া বুঝাইয়া হয়রান হইয়া আজ তিন দিন যাবৎ চারজন মেম্বর মন্দিরের দরজায় সত্যাগ্রহ শুরু করিয়াছেন। মিস্ নোরা শীল বেলা এগারটায় একবার সত্যাগ্রহটার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া আসিয়া বাড়িতে আভ্যুদয়িক নিয়মানুযায়ী মশলা না পিষিয়া কলম পিষিয়া পিষিযা—অর্থাৎ ডাটাদের বর্ণিত পূর্বদিনের সত্যাগ্রহবৃত্তান্ত রিপোর্ট আকারে লিখিয়া ফেলেন। সম্পাদিকার ফাউন্টেন পেনে কালি

ভরিয়া দিবার জন্য ষোড়শী মহিলানবিশ বাড়িতেই থাকেন। আমি সকাল সন্ধ্যা উত্তমরূপে আহার করিয়া দিবাভাগে নিদ্রা যাই। বাহির হইবার বড় একটা প্রবৃত্তি হয় না—পাণ্ডারা বদনাম রটাইয়াছে, পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী যৌথ সমভিব্যাহারে বৃন্দাবনে আসিয়া বড়ই ঝামেলা শুরু করিয়াছে। পাছে দ্বাপর যুগের ন্যায় জয়দ্রথ আসিয়া হঠাৎ কোনরূপ উৎপাত ঘটায়, তাই তৃতীয় পাণ্ডবকে দ্রৌপদীর পাহারায় রাখিয়া বাকি চারি ভাই দুপুরবেলা শিকার অন্বেষণে বাহির হন।

শিকার সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছুই জানি না। শুধু শুনিতে পাই সত্যাগ্রহীরা নাকি মহিলাদেরই বিশেষ করিয়া অনুরোধ করেন। কাল ডাটা ও গুহার মুখে শুনিলাম দুটি বাহিরের স্বেচ্ছাসেবিকার নিকট হইতে নাকি তাঁহারা বিশেষ সাহায্য পাইতেছেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি রকম দেখতে হে তারা?

ডাটা। ভয়ানক সুন্দরী বীরেনদা, আই-সি এসের সঙ্গে বিয়ে হতে পারে।

আমি গম্ভীর ভাবে বলিলাম, "তাহলে সুন্দরী বটে।" —বুঝিলাম সুন্দরীর থার্মোমিটারে আই-সি এসের সঙ্গে বিয়ে হওয়াই বয়লিং পয়েন্ট।

আমি। চুল কত বড়?

ডাটা। আমার মাথার চেয়ে বড় তাদের খোপা।

আমি।—বটে? কি জাত?

ডাটা। মিস গীতালি গুপ্তা—বৈদ্য।

গুহা। মিস চন্দ্রিকা চৌধুরি—কায়স্থ।

আমি।—কি গোত্র?

এইবার ডাটা চটিয়া উঠিল, ঐ তো আপনাকে নিয়ে মুস্কিল বীরেনদা—কাজের কথা নিয়ে ঠাট্টা জুড়ে দেন।

কিন্তু তবু জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিয়া লইয়াছিলাম, গীতালি গুপ্তার বাবা আমারই সহপাঠী বন্ধু সুরেশচন্দ্র গুপ্ত নিকটেই থাকেন। আজ বৈকালে তাঁহারই উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলাম।

সুরেশ গুপ্ত অমায়িক হাসি খুশি লোক। প্রৌঢ় হইলেও এখনও ছেলে-ছোকরাদের মত হাসিতামাসা করেন। পূর্বে রাসবিহারী এভিনিউতে থাকিতেন। বছরখানেক আগে স্ত্রীবিয়োগের পর হইতে একমাত্র কন্যাসহ বৃন্দাবনে আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছেন। কিছুক্ষণ খুঁজিয়া তাঁহার বাড়ি বাহির করিলাম। ফটকের সামনে কাঠের ফলকে সংযুক্তাক্ষরে লেখা আছে—শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত। ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম। বাহিরের বৈঠকখানা ঘর হইতে সুরেশের গলার আওয়াজ পাইলাম—বোধ করি কন্যাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন—আচ্ছা, তোর যদি এরকম একটি বর জোটে যে সবদিক দিয়ে ভাল—স্বাস্থ্যবান, ধনী, বিদ্বান—শুধু মাত্র এই দোষ যে সকাল সন্ধ্যে এক ছিলিম করে গাঁজা খায়—তা হলে তুই তাকে বিয়ে করবি?

বাস, আর শুনিতে হইল না। জানালা দিয়া হঠাৎ আমাকে দেখিতে পাইয়া সুরেশ প্রায় দৌড়াইয়া আসিয়া অভ্যর্থনা করিল। অভ্যর্থনা-পর্ব শেষ হইলে ফটকের দিকে হাত দিয়া

দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ভাই, রামমাণিক্য পণ্ডিত মশায় যে বলে গিয়েছিলেন যে শুধু হরিশ্চন্দ্র শব্দটিই যুক্তাক্ষরে হয়, তা ছাড়া দীনেশচন্দ্র, সুরেশচন্দ্র, নরেশচন্দ্র কোনটাই হয় না, তা কি ভুলে গেছ?

সুরেশ খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল :

সংস্কৃতর গণ্ডোপরি বিরাজ কর বিস্ফোটক
বাংলা ভাষায় কেউ তুমি নও হংস, সারস কিংবা বক।

তুমি আমায় কি পেয়েছ বল দেখি—আমরা কি সেই পুরোনো জিনিস নিয়েই পড়ে থাকব? আমি তো বাপু হয় নিজে একটা কিছু বের করব, আর নয় অপরের বিধিনিষেধ যদি মানতেই হয়, তবে সাহিত্যক্ষেত্রে আমার একমাত্র অবতার —বুদ্ধদেব।

আমি বলিলাম, ভাই, ঠিক বুঝতে পারছি না, একটু বুঝিয়ে বলবে কি? তুমি কোন বুদ্ধদেবের কথা বলছ? যিনি সেই বোধিদ্রুমের তলায় —

সুরেশ— আরে না না, কি বিপদ! সে বুদ্ধ তো কবে মরে ভূত হয়েছে।

'আমার চলি সমুখ পানে কে আমাদের বাঁধবে?
রইল যারা পিছুর টানে কাদবে তারা কাঁদবে।'

আমি আধুনিক বুদ্ধদেবের কথা বলছিলাম।

এ প্রসঙ্গ গেল। আরও অনেক প্রসঙ্গও গেল। শেষে বানর-প্রসঙ্গ উঠিল।

সুরেশ বলিল, গীতালি তো বাঁদরের জ্বালায় আর একদিনও এখানে থাকতে চায় না। একটি ভাল পাত্র পেলে ভাবছিলুম ওকে বালিগঞ্জে ফিরিয়ে পাঠিয়ে দি। অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ একটি পাত্র জুটেও গেছে- সবদিক দিয়েই ভাল— স্বাস্থ্যবান, ধনী, বিদ্বান শুধু কার্যকলাপ দেখে মনে হয় বোধ হয় সকাল সন্ধ্যে এক ছিলিম করে গাঁজা খায়।

বুঝিলাম লক্ষ্যটা সজনে ডাটার দিকেই। কিন্তু সুরেশ নামধাম বলিলেন না —আমারও মেয়ে আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম —লেখাপড়া কতদূর?

সুরেশ —বিলেত ফেরৎ।

আমি- ও বাব্বা, তা হলে দিয়েই ফেল। কিন্তু মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে তুমি থাকবে কি করে?

সুরেশ রহস্য করিয়া বলিল, আর একটি বিয়ে করব ঠিক করেছি।

আমি হাসিয়া বলিলাম, তোমায় আমায় আর কে মেয়ে দেবে বল? কুড়ি বছর তো এক বৌ নিয়ে ঘর করলুম।

সুরেশ বলিল, আমাদেরই তো দেবে হে, হাজার হোক অভিজ্ঞতার একটা দাম আছে তো?'

আমি—সে কি হে? তুমি না অ্যাকাউটেন্সি পড়েছিলে? এরই মধ্যে ভুলে গেলে? স্পষ্ট যে লেখা আছে—স্লিপিংপার্টনার এর অভিজ্ঞতার দরকার নেই।

গীতালিকেও দেখিলাম। সত্যই সুন্দরী—তবে আমার মনে হইল আই-সি-এস না হইয়া বি সি-এস গ্রেডের হইবে। বাঁদরামি বা উদ্দাম চাপল্য মোটেই নাই, কিন্তু খুবই স্মার্ট—দেখিয়াই বোঝা যায় বালিগঞ্জ-মার্কা —মেড্ ইন্ বালিগঞ্জ। সজনে ডাটাকে চিবাইয়া খাইতে ইহার অধিক দিন সময় লাগিবার কথা নয়। ডাটারও তাহাতে লাভ বই ক্ষতি নাই—মেয়েটিকে দিব্যি লক্ষ্মী বলিয়াই বোধ হইল। গীতালির কাছে শুনিলাম, চয়নিকা তাহারই বন্ধু, তাহারই নিমন্ত্রণে মাসখানেক হইল বৃন্দাবনে বেড়াইতে আসিয়াছে, কিন্তু বাঁদরের জ্বালায় অস্থির, তাই আর থাকিতে চায় না। অতঃপর চা-টা খাইয়া বাড়ি ফিরিলাম।

বাড়ি আসিয়া দেখি ডাটা ও গুহা পাশাপাশি দুখানি চেয়ারে বসিয়া আছেন। তাহাদের সে শ্রী আর নাই। পাঞ্জাবি ছিঁড়িয়া গিয়াছে, চুলগুলি উস্কো-খুস্কো, ঠোঁট কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে। শ্রীমতী চয়নিকা গুহার ও মিস্ নোরা শীল ডাটার শুশ্রূষায় ব্যস্ত। ষোড়শী মহিলানবিশ মিস্ শীলকে সাহায্য করিতেছেন। শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি হল হে?'

বিশেষ বিরক্তি মুখের উপর টানিয়া আনিয়া বদনব্যাদান করিয়া ডাটা জবাব দিল, 'দেখুন না খোট্টাই বুদ্ধি। পিঠটা রয়েছে কি জন্যে? তা নয়, মেরে দিলে ঠোঁটের ওপর—বুঝলে না যে রক্ত বেরিয়ে যাবে। এর নাম কি রকম ইয়ার্কি?'

গুহা বলিল, 'ওরা আগে মেঠাই খেয়ে পরে তরকারি খায়—পিঠে না মেরে ঠোঁটে মারবে এ আর আশ্চর্যি কি?'

দেখিলাম এখন আর জিজ্ঞাসাবাদ না করাই ভাল। ইহার উপর শুনিলাম গোদের উপর বিস্ফোটক হইয়াছে। তাড়াতাড়ি ঠোঁটের রক্ত বন্ধ করিতে গিয়া মিস নোরা শীল অতর্কিতে একটু আঘাত করিয়া ফেলিয়াছেন—তাহাতে ডাটার একটা দাঁতের গোড়া একটু নড়নড় করিতেছে।

## সৌপ্তিক পর্ব

সেদিন সকলেই সকাল সকাল খাইয়া শুইয়া পড়িলাম। রাত্রি গোটা নয়েকের সময় বাহিরে ডাক শুনিলাম। 'বাবুজি, এ বাবুজি!' সকলেই বোধ করি নিদ্রামগ্ন। আমি আলোটা জ্বালিয়া বাহিরে আসিলাম। দেখি কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা। ঘরে আনিয়া বসাইলাম। তাহারা দিনের ঘটনা বর্ণনা করিলেন। সত্যাগ্রহীরা মহিলাদের দিকটায় বড় বেশি উৎপাত ও বাঁদরামি আরম্ভ করেন। মেয়েদের আব্রু রাখা দায় হইয়া ওঠে। পাণ্ডাগণ প্রথমে নিষেধ করে—পরে কয়েকটি পর্দানশীন হিন্দুস্থানী পুণ্যার্থিনীর কাকা দাদার মিলিয়া উত্তম মধ্যম দিয়া ছাড়িয়া দেয়। পাণ্ডাদের কথা সত্যই বোধ হইল—বাঁদরামিটা সম্পূর্ণই একতরফা। শুনিতে শুনিতে মনটা তিক্ত হইয়া উঠিল। আনুপূর্বিক বর্ণনা করিয়া কৃতবর্মা বলিলেন, 'বাবুজি, আপকো কলকাত্তামে এত্তা বান্দর হ্যায়, তা সত্ত্বেও বৃন্দাবনের বাঁদর তাড়াইতে এদের এত উৎসাহ কেন? একেই কি কলোনিয়াল এক্সপেন্শন্ বলে?' লজ্জায় অধোবদন হইলাম।

কৃপাচার্য ও কৃতবর্মাকে বিদায় দিয়া আলোটা নিবাইয়া বিছানার উপর বসিয়া ভাসিতে

লাগিলাম। বিরক্তিভরে অনুচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলাম, মহাভারত, মহাভারত!

হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল। দ্রৌপদী ও পাণ্ডবগণ সুষুপ্ত। কৃতবর্মা ও কৃপাচার্য এইমাত্র শুইতে গিয়াছে। একা আমি অশ্বত্থামা জাগিয়া বসিয়া আছি। বিরক্তিতে মুখও পেচকের ন্যায় হইয়াছে। অতএব এইবেলা—কিন্তু কি করিব? বাঙালির ছেলে—পলায়নটাই আগে মাথায় আসে। স্থির করিলাম—আব নয়, এই বেলা পলায়ন করিব। স্টেশনে গিয়া এখন কলিকাতার ট্রেন না পাইলে পূর্বদিকগামী যে-কোন একখানা ট্রেনে উঠিয়া পড়িব—পরে ট্রেন বদলাইয়া কলিকাতা যাইবাব ব্যবস্থা করা যাইবে। আলো জ্বালিতে সাহস হইল না, অন্ধকারেই জিনিসপত্র গুছাইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। ঘণ্টাখানেক পরে একটা ট্রেনে উঠিয়া কম্বল বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম।

ট্রেনে একটা স্বপ্ন দেখিলাম। আনন্দমঠের দেশে গিয়া পড়িয়াছি। সম্মুখেই মন্দিব—"মা যা আছেন।" ঢুকিয়া পড়িলাম। দেখিলাম—বেদীর উপর গীতালি ও চয়নিকা যুগপৎ আসীনা। দুই পার্শ্বে যোড়হস্তে দণ্ডায়মান সজনে ডাটা ও যোগী গুহা। পদপ্রান্তে দুইটা মুমূর্ষু বৃহল্লাঙ্গুল বানর। সম্মুখে দণ্ডাযমান স্বামী সত্যানন্দ—নযনে দব-বিগলিতধারা, বলিতেছেন, হায় মা, তোমাদেব উদ্ধার কবিতে পারিলাম না। আবার তোমরা বানরের হস্তে পড়িলে।

পার্শ্বস্থিত মহাপুরুষ বলিলেন, বানর কই? বানর আর নাই। ইহাদিগের বানবত্ব মুমূর্ষু অবস্থায় মাতৃ-যুগলের পদপ্রান্তে পড়িয়া আছে। মালক্ষ্মীদেব কৃপায় ইহারা শীঘ্রই মানুষ হইয়া উঠিবে।

*অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬*

# শুভঙ্কর

## মানবেন্দ্রসুব রচিত—চক্রপাণি চিত্রিত

[ বাজসভা ]

১

-মহাবাজ।

—কি মন্ত্রী?

—এই হুকুম-নামাটায সই করে দিন।

-আঃ সবেতেই আমাকে সই কবতে হবে যদি তবে তুমি আছ কি কবতে মন্ত্রী?

—আজ্ঞে, আমিইত সবেতে সই কবি, কেবল এই অর্থ সম্বন্ধীয় ব্যাপাবগুলোয আমি নিজেব কোনও দাযিত্ব বাখতে চাইনে। ' কি জানেন মহাবাজ। অর্থই সকল অনর্থেব মূল। ওব মধ্যে থেকে কি এই বৃদ্ধবযসে শেষ একটা দুনাম হবে? টাকা কডিব সম্পর্কে থাকলেই খামকা লোকগুলো সন্দেহ করে মহাবাজ, এবং মিথ্যা চোব অপবাদ দেয।

—তা, কথাটা মিথ্যে নয। দেখনা, আগে যিনি এ বাজ্যেব দেওযানজি ছিলেন, বাজ্যেব লোক তাঁব নামে মিথ্যা অপবাদ দিযে তাঁকে তাডালে। তাঁব অপবাধ কি? না তাঁব সেই পালোযান ভাগ্নীযটি—মনে আছে তো তাকে? সেই যে আগে যে আমাব কোষাধ্যক্ষ ছিল, সে তাব মামাকেও বাজকোষ থেকে কিছু অর্থ সাহায্য কবেছিল, তাও, দান নয—ঋণ। সে বেচাবি হযত পবিশোধ কবতে পাবতো, কিন্তু, কি একটা অপবাধে শুনেছি তাব কাবাদণ্ড হওযাতে, সে আব টাকাগুলো পবিশোধ কববাব সুযোগ পাযনি।

—আজ্ঞে, মহারাজ যদি কথাটা তুললেন তাহলে বলি, সেই মাতুলটি বড় সাধারণ লোক ছিলেন না। তাঁর চেহারা দেখেছিলেন তো। সেই সুদীর্ঘ শাল্মলী তরুতুল্য ক্ষীণকায় ব্যক্তির গগনস্পর্শী মাথায় বিশাল জুয়াচুরি বুদ্ধির প্রতিবসতি ছিল। তিনি যদি কারাগারের বাহিরে থাকতেন, তাহলে রাজকোষ এতদিনে কপর্দক শূন্য হয়ে পড়তো।

–আহাঃ, সে কি আর আমি জানি নি? তাইত আমায় অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই দেওয়ানজিকে পদচ্যুত করতে হয়েছিল। কিন্তু, একথা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে মন্ত্রী যে দেওয়ানজি মহাশয় তো সে টাকা হিসেব করে নিজেই সব দণ্ড দিয়েছিলেন রাজকোষের ক্ষতি হতে দেননি।—তবু তো লোকে তাঁর বদনাম দিতে ছাড়লে না। সেই লম্বা আর চওড়া আত্মীয় দুটির জন্যই তাঁর উঁচু মাথা হেঁট হয়েছিল। দেওয়ানজি আমার সেই অভিমানেই অতশীঘ্র দেহত্যাগ করলেন।

–বর্তমান দেওয়ানজি কি মহারাজের রাজকোষ বেশ সুপরিচালনা করতে পারছে না।

–সে কি? তোমার জামাই সে, শ্বশুরের মতই অতি বুদ্ধিমান ছেলে। চমৎকার কাজ করছে। তাকে দেওয়ানজিপদে বাহাল করে আমি বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে আছি।

- আজ্ঞে, সে আপনার একান্ত অনুগ্রহ মহারাজ। আমার জামাই বলে নয়, কাজের লোক বলেই সে যে আপনার সুনজরে পড়েছে এইটেই তার পরম ভাগ্য, তাই তো প্রজারা সব তাদের বহু কষ্টার্জিত অর্থ, এমন কি, কারুর কারুর না খেয়ে না পরে জমানো টাকা দিয়ে তারা যে একটি আদর্শ শিল্পশালা প্রতিষ্ঠা করেছিল, সেটির সম্পূর্ণ ভার তুলে নিয়েছে আমার ঐ জামাইটির উপর।

- তবে যে, আমি শুনেছিলুম, প্রজারা ভার দিয়েছিল তোমার উপর মন্ত্রী, এবং তুমি সেটা তোমার জামায়ের ঘাড়ে চাপিয়েছো?

– আমি বুড়োমানুষ কি অত ঝঞ্ঝাট পোয়াতে পারি মহারাজ? তা জামাই আমার কি রকম কাজের লোক সেত' আপনি জানেনই, আর প্রজারাও কোনও আপত্তি করলেনা, তাই' ওটাতে তাকেই বসিয়ে দিয়েছি।

—তা বেশ করেছো মন্ত্রী, কিন্তু ওটাতে সে বেশি মনোযোগ দিলে রাজকোষের প্রতি লক্ষ্য রাখবে কি করে?

—আজ্ঞে মহারাজ, সে জন্য আপনি কিছুমাত্র ভাববেন না। রাজকোষের প্রতি আমাদের শ্বশুর জামায়ের সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি আছে। তা ছাড়া—বর্তমান কোষাধ্যক্ষ অতি যোগ্যলোক। আমাদের একান্ত অনুগত।

—বেশ, বেশ, শুনে নিশ্চিন্ত হলুম। কিন্তু, তোমার কোষাধ্যক্ষটির ওই কেমন যেন ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত চেহারা দেখেই আমার বড় ভয় হয়েছিল, বুঝিবা রাজকোষও এইবার ওরই আকৃতির মতো ক্রমশ ক্ষয় পেতে থাকবে। হাঃ হাঃ হাঃ।

—কিন্তু সে ভয় বোধ হয় আর আপনার নেই। রাজকোষে আগে-আগে উদ্বৃত্ত অর্থ প্রায় কিছু থাকতো না বললেই হয়। কিন্তু বর্তমান কোষাধ্যক্ষ রাজকোষের সে অভাব দূর করেছে। প্রজাদের ঐ শিল্পশালায় প্রায় তিরিশ লক্ষ টাকা আমার জামাই রাজকোষে তার

জিম্মাতেই বেখে দিয়েছে। কি জানি, বাজ্যে কখন কি অর্থেব প্রয়োজন হবে, তখন শূন্য বাজকোষ বলে আব আমাদেব আপশোস বা অনুতাপ কবতে হবেনা। ওই টাকাতেই বাষ্ট্রেব প্রয়োজন সুসম্পন্ন হতে পাববে।

—ঠিক বলেছো মন্ত্রী। ঐ বেঁটে সেঁটে বোগা বাঁকা ক্ষয়া ক্ষয়া কোষাধ্যক্ষটিব গাটে গাঁটে বুদ্ধি আছে দেখছি।

আজ্ঞে, মহাবাজ, আপনি আবও শুনলে খুশি হবেন, ওই লোকটি তাব পবিচিত বন্ধু বান্ধব আত্মীয় ব্যবসায়ী যে যেখানে ছিল সকলকে দেশেব কাজে সাহায্য কবতে উদ্বুদ্ধ কবে তাদেব সাবাজীবনেব সঞ্চিত অর্থ বাব কবে এনে বাজকোষে জমা কবেছে।—

এ্যাঁ! বল কি মন্ত্রী? এ যে দেখছি খুব ওস্তাদ! —তোমাব জামাইযেব চেয়েও ধড়িবাজ! —বেশ! বেশ! আমাব যদি মেয়ে থাকতো তাহলে আমি একেই জামাই কবতুম! —কিন্তু কে যেন বলছিল মন্ত্রী, যে আমাব ঐ কোষাধ্যক্ষটি নাকি "উর্বশী নাট্যশালা"ব — একজন প্রধান পাণ্ডা।
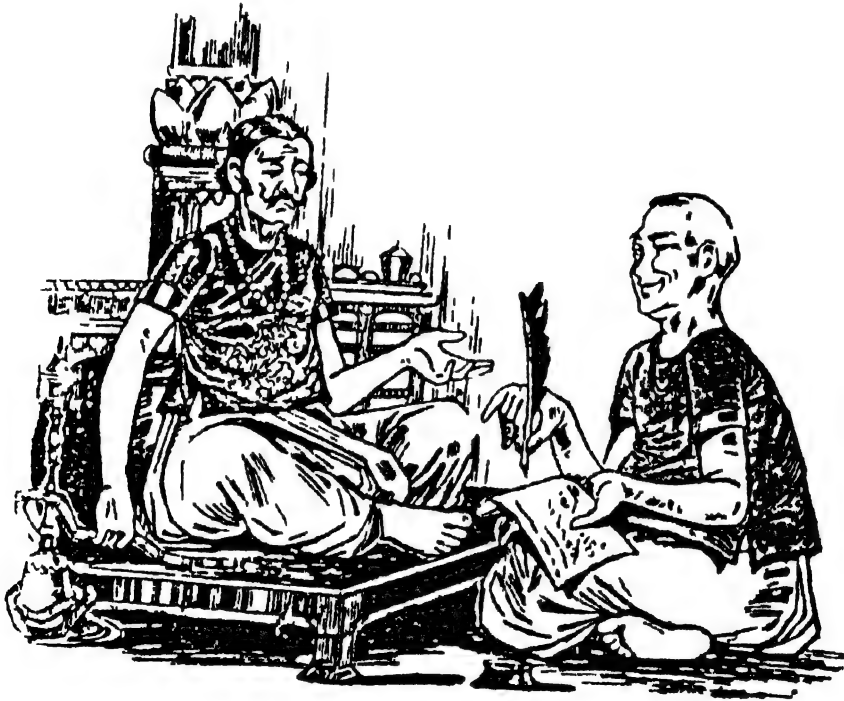
দাও, সই কবে দিই।

—মহাবাজ ঠিকই শুনেছেন।

—তবেই তো! আমাব একটা দুর্ভবনা হলো, মন্ত্রী!

— কেন মহাবাজ?

— যদি ঐ অপ্রাপ্ত-বয়স্ক কোষাধ্যক্ষটি নাট্যশালাব কোনও নর্তকীব প্রতি প্রেমাকৃষ্ট হয়ে পড়ে—তাহলে তো বাজকোষ গেল।

—আজ্ঞে মহারাজ, সে ভয় আপনি একেবারেই রাখবেন না! ওসব ছেলেরা একমাত্র ঐ 'রূপচাঁদ বিবি' ছাড়া জগতে আর কারুরই প্রেমে কখন পড়ে না!

—'রূপচাঁদবিবি!' হাঃ হাঃ হাঃ! মন্ত্রী বেশ কথা বলে!

—মহারাজের কি এই হুকুম নামাটায় এখন সই করে দেবার সুবিধে হবে?

—নিশ্চয় হবে!—কিন্তু কিসের হুকুম তাতো এখনও কিছু বললে না মন্ত্রী?

—আজ্ঞে, ওটা সেই 'শোষণ নদীর' সেতু মেরামতের বার্ষিক ব্যয়!

—ও বাবা! 'শোষণ' নদী আবার কি?—'শোন' নদী একটা আছে বটে শুনেছি—

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সে অন্য রাজ্যে, আমাদের রাজ্যের এ নদী তার চেয়ে ঢের বড়! এটার উপর ঐ পোল বাঁধাতে স্বর্গীয় মহারাজারা অকাতরে বহু অর্থব্যয় করেছিলেন। পাছে তাঁদের এই কীর্তি ধ্বংস হয়ে যায় এই আশঙ্কায় তাঁরা—প্রতিবৎসর ঐ 'শোষণ সেতুটি' মেরামতের ব্যবস্থা করে গেছেন! যন্ত্ররাজ স্বয়ং সেখানে উপস্থিত থেকে সেতুর মেরামতি কার্য পরিদর্শন করেন। তার সমস্ত ব্যয়তার রাজকোষ থেকেই দেওয়া হয়!

—উত্তম! কত টাকা পড়ে দেখতো মন্ত্রী! আমার আফিমের নেশাটা বড্ড ধরেছে—চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছিনি।

—আজ্ঞে, বাহান্ন হাজার-টাকা!

—এ্যাঁ! বলো কি? মেরামতি খরচ এত টাকা?

—আজ্ঞে, তা হবে বৈকি মহারাজ! আপনিই কেন বুঝে দেখুন না—শোন নদীর চেয়েও বড় নদী যখন—তার উপরে সেতু—সে বড় সোজা সেতু নয়। 'শোষণ সেতু' মেরামতে প্রতি বছরেই এইরকম ব্যয় হয়! হিসাব আমি সব মিলিয়ে দেখিছি, বাহান্ন হাজারই হয়েছে বটে।

—বাস্! তবে আর কি? যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন! দাও সই করে দিই!

মহারাজ হুকুমনামা সই করে দিতেই, মন্ত্রীমহাশয় বেশ প্রফুল্ল মুখে সেটা নিয়েই চলে যাচ্ছিলেন, এমন সময় আফিমের নেশায় মুদিত-চক্ষু মহারাজ আবার ডাকলেন—

—মন্ত্রী!

—আজ্ঞে?

—বৈদ্যরাজ আমার রাজধানীর আরোগ্য-নিকেতনের জন্য যে আরও দু'লক্ষ টাকা প্রার্থনা করে আবেদন জানিয়ে ছিলেন সেটা আমি মঞ্জুর করেছি জানো?—

—আজ্ঞে হ্যাঁ, পীড়িত আর্ত আতুরদের উপর আপনার অসীম অনুকম্পার কথা বিশ্ববিদিত!

—আহা! তারাইত যথার্থ দয়ার পাত্র মন্ত্রী! দেশের ঐ যণ্ডামার্ক, হোঁৎকা জোয়ান ছেলেগুলোকে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারিনি! কখন কি ফ্যাসাদ বাধায় কে জানে? হ্যাঁ, সে টাকাটা পাঠিয়েছো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আর বৈদ্যরাজ নিজে আরও একবৎসরের জন্য আরোগ্য-নিকেতনের অধ্যক্ষ পদে

বাহাল থাকবার জন্য মিনতি জানিয়েছেন, সেটাও আমি মঞ্জুর করিছি—বুঝলে!

—আজ্ঞে, অতি উত্তম কার্য করেছেন! কিন্তু, শিক্ষাপরিষৎ থেকে গুরুরাজ যে পাঁচলক্ষ টাকা বহুদিন হল বিদ্যা মহাপীঠের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, সে সম্বন্ধে তো আজও কোনও আদেশ দিলেন না? আর্থিক ব্যাপারে আমি একেবারেই নির্লিপ্ত আছি বলে আপনাকে সে কথা প্রত্যহ স্মরণ করিয়ে দিতে পারিনি, গুরুরাজ কিন্তু আবার তাঁর আবেদন জানিয়েছেন!

—দেখো মন্ত্রী, তোমায় স্পষ্ট কথা বলি শোনো—ওই শিক্ষা ব্যাপারে লোকগুলোকে বেশি উৎসাহ দেওয়া ভাল নয়। যত তারা লেখাপড়া শিখবে তত চালাক হয়ে উঠবে—চোখ কান ফুটবে—এরপর আর কাউকে মানতে চাইবে না—বুঝলে?—বরঞ্চ, শহর-কোটাল যে আরও তিরিশ লক্ষ টাকা বার্ষিক ব্যয় বৃদ্ধি করে দেবার জন্য আবেদন করেছে, সেটা বাড়িয়ে দাও। রাজ্যে 'শান্তি-রক্ষা' আগে দরকার।

—আজ্ঞে, এ যা বললেন—এ অতি যথার্থ কথা মহারাজ।

—আচ্ছা, বিন্ধ্যাচলে গ্রীষ্মকালটা কাটাবো বলে যে রাজপ্রাসাদ নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলুম সেটা কি সম্পূর্ণ হয়েছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এবার গ্রীষ্মে আপনি সপরিবারে সেখানে যেতে পারবেন।

—কত খরচ পড়ল মন্ত্রী?

—আজ্ঞে যৎসামান্য! মাত্র আটাশ লক্ষ টাকায় পাহাড়ের উপর অতবড় মর্মর-প্রাসাদ আজকালকার দিনে তৈরি হওয়া বড় কঠিন!

—তা বটে, -আচ্ছা যাও!

( ২ )

## যন্ত্র-রাজের বৈঠক

—যন্ত্ররাজ!

—কে! স্থপতি?

—হ্যাঁ।

—কি সংবাদ?

—দুঃসংবাদ। বড়ই দুঃসংবাদ! 'শুভঙ্কর আসছে!

—কি? কি? শীঘ্র বলো, এমন সন্দেহে রেখোনা!

—আরে—সন্দেহে রেখোনা বললেই কি সন্দেহ থেকে এড়াতে পারবে মনে করেছো? বছর বছর 'শোষণ সেতু'র মেরামতি খরচ পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা আদায় করছো, এবার রাজার সন্দেহ হয়েছে! সেতু কি রকম মেরামত হচ্ছে দেখবার জন্য লোক পাঠাচ্ছেন এবার। হিসেবের খাতা হাতে করে শুভঙ্কর স্বয়ং আসছেন সরে-জমিনে তদারক করতে!

—তাহলে উপায়!

—কিছু কবলাও। ভাগ দিলেই গোল চুকে যাবে!

—তুমি তাহলে শুভঙ্করকে চেনো না! ও বেটা কি রাজকোষের হিসাব-নবিশের মতো সুবোধ ছেলে? বেটা বড় পাজি! নগদ দুচার লাখ টাকা পাওয়ার চেয়ে—হিসেবে দু'চার লাখ টাকার ভুল বা চুরি ধরে দিতে পারলে তার ঢের বেশি আনন্দ হয়। তাইত দেশ বিদেশ থেকে তাকে সমস্ত খরচ দিয়ে লোকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে—হিসেব দেখে দেবার জন্য! তা মহারাজ হঠাৎ একে আনালেন কেন?—

দুঃসংবাদ! বড়ই দুঃসংবাদ। 'শুভঙ্কর' আসছে!

—মহারাজের বয়ে গেছে। তিনি আফিম খেয়ে বুঁদ হয়ে আছেন। এ মহারানি আনিয়েছেন।

—কেন, তাঁর এত মাথাব্যথা কিসের?

—ঐ ব্যাটা বুড়ো মন্ত্রীর দোষে! রাজ-বাড়ির হিরে জহরৎ মণি মাণিক্যের অলঙ্কার গুলোর লোভ সে কিছুতে ছাড়তে পারলে না! রাজকোষের জন্য হঠাৎ প্রয়োজন বলে ওগুলোকেও ফাঁকি দিয়ে বার করে নিতে গেছল, তাইত রানির টনক নড়েছে। প্রজাদের শিল্প-শালার তিরিশ লক্ষ টাকা যে রাজকোষে জমা আছে এ খবরটা মহারাজ বোধ হয় তাঁকে নেশার খেয়ালে বলে ফেলেছিলেন! তাই তিনি মন্ত্রী মহাশয়কে সন্দেহ করে একেবারে শুভঙ্করকে আনিয়েছেন।

—তাবপব? শুভঙ্কব এসে যখন দেখবে যে 'শোষণ' নামে বাজ্যে কোনও নদীই নেই—

–নেই কি বকম? ববং শুভঙ্কব এসে দেখবে যে বাজ্যে শুধু একটা নয অনেকগুলো 'শোষণ' নামে নদী প্রবল স্রোতে প্রবাহিত হচ্ছে –

—আহা, তা তো হচ্ছেই। কিন্তু, তাব কোনওটাব উপবই তো সেতু নেই। আমবা যে একটা সেতু কবেছি। ধবা পডলে মেবামতি বাবদ এই ক'বছবেব টাকাটা ত' উগবে দিতে হবেই উপবন্তু কাবাদণ্ড

আবে না না, ভয নেই, হযত খাতাপত্র দেখেই খুশি হযে 'শুভঙ্কব' ফিবে যাবে। 'সেতু' দেখতে আব চাইবে না। আমবা তো আব বৈদ্যবাজেব মতো নির্বুদ্ধিতাব কাজ কবিনি। আব যদি নিতান্তই যেতে চায - বলবেন পথ বড দুর্গম, ভাবি কষ্ট হবে।

আবে সে যা হোক একটা কিছু ধাপ্পা দিলে চলতো কিন্তু মুস্কিল হযেছে যে ঐ বৈদ্যবাজেব চুবিটা ধব পডে। এই সেদিন বাজকোষ থেকে দু'লক্ষ টাকা দেওযা হযেছে, এক বৎসবেব জন্য তাব চাকবিব মেযাদ বাডিযে দেওযা হযেছে -তা বৈদ্যবাজ যে একেবাবে পুকুব চুবি' কবছিলেন তা কি ছাই জানতুম।

তা ওখানে চুবিব যে অনেক সুবিধে বযেছে। লক্ষ লক্ষ কগি আসছে— চলে যাচ্ছে। খাতাব জমা খবচ কবে গেলেই হলো। ধববাব উপায নেই।

হ্যা, সেটা ঠিক বটে। আমাদেব চযে ওদেব অনেক সুবিধে ছিল। আমাদেব এই ইট কাঠ পাথবগুলো যে বৈদ্যবাজেব কগিব মতো চলে যায না। থেকে যায। বৈদ্যবাজ তাই জানতো যে তাব কীর্তি কলাপ কখনও ধবা পডবে না কিন্তু--

—কিন্তু, আব কি? সববিষযে ফাঁকি দিতে গেলে কি চলে? খাতাপত্র ঠিক বাখতে পাবেনি তাই ধবা পডে গেল। এদিকে যেমন হাত চালাচ্ছিল, তেমনি ওদিকে হিসেবটা দোবস্ত বাখা উচিত ছিলতো? শুভঙ্কব এসে ধাপ্পামেবে কসে' একটু চাপ দিতেই সব কথা ফাঁস হযে গেছে।

- তা যাক, কিন্তু 'বৈদ্যবাজ' বেঁচে গাছে। মহাবাজ এবং বৈদ্যবাজেব বেতন আবও হাজাব টাকা বৃদ্ধি কবে দিযেছেন।

—সে নেহাৎ নিজেদেব মান মর্যাদা বাঁচাবাব জন্য। বৈদ্যবাজ নাকি মহাবানিব কি বকম জ্ঞাতি ভাই হন, তাই বক্ষে পেযে গেলেন। আবে তুমিও তো ভাই দূব সম্পর্কে মহাবানিব আত্মীয হও, যদি নেহাৎ ধবাই পডো, তবু হযত বেঁচে যাবে, কিন্তু যন্ত্রবাজ, বিপদে পডবো দেখছি আমি। এ গবিব স্থপতি বেচাবাই মাবা যাবে।

—না না, তুমি কিছু ভয পেও না, আমি কাল বাজধানীতে গিযে মহাবানিব সঙ্গে সাক্ষাৎ কবে একটা ব্যবস্থা কবে আসবো' হ্যাঁ, তোমাকে বলতে ভুলে গেছলুম, কাল বাত্রে একটা সংবাদ পেযেছি যে দেওযানজি, আব কোষাধ্যক্ষ মশাই কি একটা বিশেষ জকবি প্রযোজনে আমাদেব সঙ্গে সাক্ষাৎ কবতে আসবেন—

—প্রযোজন আব কি?—'শোষণ-সেতুব মেবামতি খবচেব টাকাব ভাগটা এ বছব তাদেব দাওনি বলে, আদায কবতে আসছেন।

—কেন দেবো? ওঁরা যে শ্বশুব-জামা'য়ে গরিব প্রজাদের রক্ত উঠা পয়সায় তৈরি ওই শিল্পশালাব প্রায় তিরিশ লক্ষ টাকা হজম করেছেন—আমাদের কি তার ভাগ দিয়েছেন?

এই সময় রাজপথ দিয়ে এক পাগল গান গাইতে গাইতে চলেছিল। এই পাগলকে রাজ্যের সবাই চেনে, এর নাম ছিল প্রাণধন শেট্। এককালে সে একজন সওদাগর ছিল, আজ দেনার দায়ে দেউলে হয়ে গিয়ে তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সে গাইছিল—

"(শেষে কি) পড়নু ফাঁকি শুধুই আমি!
(সখী গো!) যত বারো ভূতের বারন্দরে
করলে তোমায় অধোগামী!
কত কেঁদে গেছি তোমাব দ্বারে
প্রাণেব দায়ে বারে বারে,
হয়নি দয়া অভাগারে
তাড়িয়ে দেছে তোমার স্বামী!
ওই যে বেঁটে, ওই যে বোকা
দিয়েছিল আমায় ধোঁকা,
কে জানে গো লুটছে থোকা
ওরাই মজা দিবাযামী!

—ভগবান করেন, ও বেটাদেব চুরিটাও ধরা পড়ে যায়!...এই যে ওঁবা এসে পড়েছেন দেখছি! একেবারে নাম করতে না করতেই, অনেক দিন বাঁচবে—

—হ্যাঁঃ, তা নইলে এ রাজ্যটাকে দেউলে করবে কারা?..

*　　　*　　　*

এই যে,—আসুন! আসুন! আসতে আজ্ঞা হোক্— প্রণাম হই দেওয়ানজি মশাই, নমস্কার কোষাধ্যক্ষ মশাই!

দেওয়ানজি ও কোষাধ্যক্ষ নিঃশব্দে প্রতি নমস্কার করলেন। তাঁদের মুখ আষাঢ়ের কালো মেঘের মতো অন্ধকার!

একটু পরে কোষাধ্যক্ষ বললেন—যন্ত্ররাজ, বড় বিপদে পড়ে আপনাদেব শরণাপন্ন হয়েছি! জানেন তো, প্রজাদের শিল্পশালায় দরুণ প্রায় তিরিশ লক্ষ টাকা রাজকোষে জমা ছিল, মহারাজ শুভঙ্করকে বলেছেন সেই টাকাটার একটা ব্যবস্থা করতে, শুভঙ্কর সেই টাকার খোঁজ করাতে আমরা তাকে বলেছি যে সে টাকাটা যন্ত্ররাজের হাতে দেওয়া হয়েছে তাঁর লাভবান স্থাপত্য ব্যবসায়ে সেটা নিয়োগ করে মূলধনের সঙ্গে রাজ্যেরও আয় বৃদ্ধি করবার জন্য।

যন্ত্ররাজ—সর্বনাশ! এ করেছেন কি? আমার খাতা-পত্র সব কেতা দোরস্ত রাখা হয়েছে, তার মধ্যে ওই তিরিশ লক্ষ টাকার জমাখরচ তো আর ঢোকাবার উপায় নেই।

দেওয়ানজি—উপায় যা হোক্ একটা কিছু করতেই হবে, তোমাকে সে জন্যে আমি একলক্ষ টাকা দেবো!

কোষাধ্যক্ষ—আর খাতাপত্র ঠিক থাকলেই বা কি হবে? আমরা তো রাজকোষের হিসাব নবিশকে মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে হাত করেছিলুম. কিন্তু তাতেই বা রক্ষে পাচ্ছি কই? এদিকে শুভঙ্কর যে তোমাদের 'সেতু'টা স্বয়ং পরীক্ষা করে দেখতে আসছে যন্ত্ররাজ।

যন্ত্ররাজ—এই দেখুন দেখি। এই বিপদের উপর আবার এক বিপদ আপনারা ঘাড়ে চাপাতে চাইছেন! আপনাদের—ইচ্ছে কি তবে আমাকেই ফাঁসানো?—

কোষাধ্যক্ষ—মোটেই না. বরং আপনাকে বাঁচানো এবং সেই সঙ্গে নিজেরা বাঁচা—

স্থপতি—সেটা কি করে সম্ভব হতে পারে তাতো আমার বোধগম্য হচ্ছে না—

কোষাধ্যক্ষ—মাপ করবেন। আপনার মাথায় কেবল চুন সুরকি পোরা কিনা, তাই বুঝতে পারছেন না—আপনি আজই রাজধানীতে সংবাদ পাঠান যে শোষণ নদীতে ভীষণ

আসতে আজ্ঞা হোক।

বন্যা হয়েছে, এবং সেই বন্যার বেগে সেতুটি হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ে গেছে।—

যন্ত্ররাজ—সে কথা লোকে বিশ্বাস করবে কেন?

দেওয়ানজি—সে ভার আমার রাজ্যের সমস্ত সংবাদপত্রে উপযুক্ত দক্ষিণা দিয়ে আমি ব্যবস্থা করিছি যে কাল সকালে ওই বন্যার শোচনীয় কাহিনি ও সেতু ভেঙে যাওয়ার বিবরণ প্রকাশ হবে।

কোষাধ্যক্ষ—দু একখানি পত্রিকাতে ভগ্ন সেতুর চিত্র দিয়ে সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশেরও ব্যবস্থা করেছি।

যন্ত্ররাজ—এ্যাঁ! বলেন কি? আপনারা দেখছি সব করতে পারেন। তাহলে তো শুভঙ্করকে

কলা দেখাবার ব্যবস্থা বেশ ভালরকমই হয়েছে। ওঃ বলিহারি যাই আপনাদের বুদ্ধি!

দেওয়ানজি—এসব কি আর আমাদের মাথায় এসেছিল?—না আসতো!—শুভঙ্করেব আতঙ্কে আমাদের মাথা ঘুরে গেছল। এ সমস্তই মন্ত্রীমহাশয়ের প্যাঁচ!

স্থপতি—তাইতো বলি! পাকামাথা না হলে এমন গোড়া বেঁধে কাজ করতে জানে কে? মন্ত্রীমশাই স্বয়ং ছিলেন এই 'শোষণ সেতুর' জন্মদাতা! তাঁরই পরামর্শে একদিন এটার নিরাকার অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছিল! আজ আবার তিনিই তাকে বন্যার জলে ভাসিয়ে দিয়ে তাঁর এই অকৃত্রিম ভক্তদের উদ্ধার করলেন!

কোষাধ্যক্ষ—এখনও করেননি! তবে করবেন, যদি যন্ত্ররাজ তাঁর জামাতাকে রক্ষা করেন!

যন্ত্ররাজ—কি করলে তিনি রক্ষা পেতে পারেন আমাকে আদেশ করুন, যদি অসাধ্য না হয় আমি অবশ্য প্রতিপালন করবো!

কোষাধ্যক্ষ—কালকে রাজ্যের সমস্ত সংবাদপত্রে সেতু ভেঙে যাওযার বিবরণের সঙ্গে এ খবরও থাকবে যে যন্ত্ররাজ নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে সেতুটি রক্ষা করতে গিয়ে বন্যাপ্লাবনে কোথায় যে ভেসে গেছেন, তার কোনও সন্ধানই পাওয়া যাচ্ছে না! বন্যায় দেশবাসীর এবং বিশেষ করে রাজ্যের সমূহ ক্ষতি হয়েছে। স্থাপত্য বিভাগের কাছারি-বাড়িটি একেবারে নদীর তীরে স্থাপিত থাকার বন্যায় প্রথম বেগেই তা ধ্বংস হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে রাজ্যের বহুমূল্যবান কাগজপত্র হিসাবের বই খাতা ও রাজকোষের প্রায় অর্দ্ধ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে!

স্থপতি—চমৎকার! চমৎকার! দিন—পায়ের ধুলো দিন! কী মতলবই ভেঁজেছেন। বলিহারি। বাঃ!

কোষাধ্যক্ষ—আমার পায়ের ধুলো নিয়ে আমাকে অপরাধী করবেন না! এ সমস্তই সেই মন্ত্রী মহাশয়ের সুব্যবস্থা—

যন্ত্ররাজ—সুব্যবস্থা কি করে বলি বলুন! আমাকে যে একেবারে বন্যায় ভাসিয়ে দিচ্ছেন! ...হ্যাঁ, কোথায় ভেসে যেতে হবে? আর কি ফিরে আসবার সম্ভাবনা থাকবে না?—

দেওয়ানজি—বিলক্ষণ! আপনার সন্ধানের জন্য রাজকোষ থেকে লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হবে। চারিদিকে লোক ছুটবে। কেবল শুভঙ্কর এ রাজ্য থেকে বিদায় না নেওয়া পর্যন্ত আপনাকে একটু আত্মগোপন করে থাকতে হবে। যেখানে গিয়ে আপনার থাকতে ভাল লাগে সেই খানেই থাকবেন। কিন্তু কেউ টের না পায়! আপনার খরচপত্র বাবদ আগাম আপনাকে আমরা কিছু টাকা দিয়ে দিচ্ছি...তারপর শুভঙ্করের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে আপনার স্ত্রীই প্রথম রাজ-সরকারে আপনার সন্ধান দেবেন, দিলেই, ওই লক্ষ টাকা পুরস্কারও আপনার ঘরেই গিয়ে উঠবে!—

যন্ত্ররাজ—বাহবা! দাদা বাহবা! ভগবান আপনাদের শ্বশুর জামাতাকে দীর্ঘজীবী করুন! আমি আজই বন্যায় ভেসে চললুম!

এই সময় বাইরে একটা গোলমাল শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে সসৈন্যে কোটাল প্রভু এসে

হাজিব হলেন, এবং বিনা বাক্যব্যয়ে সকলের হাতে হাতকড়ি দিয়ে বন্দি কবে ফেললেন।

দেওয়ানজি বোষকষায়িত নেত্রে জিজ্ঞাসা কবলেন—কাব হুকুমে তুমি আমাদেব বন্দি

দোহাই কোটাল প্রভু! আমায় কোনও দোষ নেই।

এবে সাহস কবেছো কোটাল

কোটাল (সবিনয়ে) আজ্ঞে রাজ আদেশে দেওয়ানজি। আপনাদেব সমস্ত কীর্তি কলাপই যে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। গুপ্তচর এসে যন্ত্রবাজেব 'শোষণ সেতু' থেকে আবম্ভ কবে আপনাব ঐ শিল্পশালাব ও অন্যান্য কাববাব বদ বাজকোষেব যা কিছু টাকা চুবি—সমস্তই গোপনে সন্ধান কবে ধবে ফেলেছেন।

কোষাধ্যক্ষ– (সকাতবে) দোহাই, কোটাল প্রভু! আমাব কোনও দোষ নেই, সব ঐ মন্ত্রীমশাই আব দেওয়ানজি মশাইয়েব কাজ

কার্তিক ১৩৩৪

# স্রেফ্ তেল দিয়ে

## অখিল নিয়োগী লিখিত ও চিত্রিত

তেলের বোতলটা ঠকাস্ করে মেঝেতে রাখতে গেল পঞ্চানন পাকড়াশি।

গিন্নি ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলে, ও কি? তেল না নিয়েই ফিরে এলে যে বড়? আমি এদিকে উনুনে কড়াই চাপিয়ে বসে আছি!

পঞ্চানন পাকড়াশি গোঁফ বেঁকিয়ে বল্লে, ওই কড়ায়ের তলা আগুনের আঁচে ফেঁসে যাবে তবু একফোঁটা তেল মিলবে না।

গিন্নির মেজাজ ততক্ষণে সপ্তমে চড়ে গেছে। তাই ফোঁড়ন কাটলে, এই কি তোমার রসিকতা করবার সময় হল? সেই সকাল থেকে আমি শুধু উনুনে কয়লা ঠাসছি। ছেলেরা ওদিকে হা-পিত্যেশ করে বসে আছে। আর তুমি কিনা এতক্ষণ বাদে খালি বোতল নিয়ে ফিরে এলে?

গিন্নি ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলে -ওকি? তেল না নিয়েই ফিরে এলে যে!

পঞ্চানন পাকড়াশি ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে উত্তর দিলে, ফিরে এলাম কি আর সাধে? যত সরষের তেলের দোকান ছিল—প্রত্যেক দরজায় গিয়ে জনে জনে খোসামুদ করেছি। বলে, একফোঁটা তেল নেই। আবার এক মোটা দোকানদার খ্যাক-খ্যাক করে হেসে রসিকতা করলে, সরষে নিয়ে আসুন, পিষে তেল তৈরি করে দিচ্ছি! শোনো কথা ব্যাটাদের! না হয় তেলই বিক্রি করিস! তাই বলে এত তেলাতে হবে তোদের। এতক্ষণ ওদের পেছনে না ঘুরে যদি ইলেকট্রিক ট্রেনে চেপে তারকেশ্বরে বাবার দোরে হত্যা দিতেম—তা হলে বাবা ভোলানাথ তুষ্ট হয়ে নিশ্চয়ই একটিন তেলের বর দান করত।

আসল ব্যাপারটার সূচনা হয়—সেইদিন রোববার খুব সকালবেলা।

পঞ্চানন পাকড়াশির একপাল ছেলেমেয়ে। প্রতিবেশীরা বলে, হাত গুণে শেষ করতে পারবেন না মশাই। পরিসংখ্যানতত্ত্ব অফিসে ছুটতে হবে।

সেই বালখিল্য দলে আজ খুব ভোরেই আনন্দ-কোলাহল জেগে উঠেছিল।

বহুদিন বাদে দেশ থেকে দাদু এসেছেন। সঙ্গে চিঁড়ের মোয়া, নারকেল নাড়ু আর আমসত্ত্বের টিন—দিদিমা পাঠিয়েছেন—নাতি-নাতনিদের জন্যে। যাদুকরের ইন্দ্রজালের মতো তা কয়েক মুহূর্তেই অদৃশ্য হয়ে গেছে।

তারপর নাতিরা দাদুকে বলেছে, দাদু, তুমি দিদিমার হাতের এত সব মজার মজার জিনিস খাওয়ালে,—আমরা এইবার তোমাকে কলকাতার এক আজব চিজ খাওয়াবো। তার স্বাদ তুমি জীবনে ভুলতে পারবে না।

দাদুর মুখে-চোখে তখন কৌতুক। তিনি নাতিনাতনিদের শুধোলেন, সে আবার কি খাবার? খুলে বল—

বড় নাতি বল্লে, হুঁ হুঁ। বাগবাজারের তেলেভাজা। একবার চাখলে—চিতেয় উঠেও লোকে ভুলতে পারে না।

দাদু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, অ্যাঁ। এখন আবার তোদের বাগবাজারে ছুটতে হবে নাকি?

আর এক নাতি বুদ্ধি বাতলে দিলে, না-না দাদু সে সব তোমার কিছু করতে হবে না। বাজার থেকে টাটকা তাজা বেগুন, পটল আর কুমড়ো নিয়ে এসো,- আর।

ভয় পেয়ে দাদু জিজ্ঞেস করেন,—আর?

নাতি জবাব দেয়, আর, একটিন সরষের তেলের দাম দাও। বাবাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি বাজারে। একটু বাদেই দেখবে- মার ল্যাবরেটরীতে কেমন—বেগুনি, পটলি, আর কুমড়ি ছ্যাক করে বেরিয়ে আসে- ।

নাতনি বল্লে, হ্যাঁ দাদু, মুখে দিয়েই মানস সরোবরে উধাও হয়ে উড়ে যাবে—

সঙ্গে সঙ্গে আর এক নাতি দার্শনিকের মতো বক্তব্য রবলে তখন তুমি নিজেই বলে উঠবে দাদু,—পৃথিবীতে যদি কোথাও স্বর্গ থাকে ঃ -তা- এখানেই- এইখানে- এইখানে!!!

শুনে দাদুর টেকো মাথায় যে কটি পাকা চুল ছিল—তা একেবারে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। বল্লে, অ্যা এমন পদার্থ বাগবাজারের বেগুনি –পটলি –আর কুমড়ি? তা হলে ত' আমায় চেখে দেখতে হচ্ছে। নইলে তোর দিদিমার কাছে গিয়ে কি গল্প করবো?

নাতি নাতনিদের নিয়ে দাদু ওই ভোরেই বাজার ঢুড়ে কচি কচি বেগুন— পটল আর কুমড়ো নিয়ে এলেন। আর ঝাঁজওয়ালা সরষের তেলের টিন আনতে কড়কড়ে একটা নোট বের করে দিলেন নাতির হাতে।

তার পরবর্তী যে নাটকীয় ঘটনা ঘটল—সে কথা গল্পের গোড়াতেই বিবৃত হয়েছে।

নাতি-নাতনিরা যখন জানতে পারল যে, বাজারে একফোঁটা সরষের তেল মিললো না—তখন ঝাঁঝের অভাবে তাদের লোচনগুলি অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল।

নাতনিরা আক্ষেপ করে উক্তি করলে দাদু, তোমাকে আমরা বেগুনি, পটলি আর কুমড়ি খাওয়াতে পারলাম না, তবে দিদিমার জন্যে চকোলেট পাঠিয়ে দেবো। দাঁত নেই বলে তাঁর কোনো অসুবিধে হবে না। ক্ষুণ্ণ মনে দাদু জবাব দিলেন, তাই দিস তোরা। আমিও হয় ত খানিকটা ভাগ পাবো। কিন্তু মনে দুঃখ রয়ে গেল—তোর মার ল্যাবরেটরির বেগুনি, পটলি, কুমড়ির সোয়াদ না পেয়েই বোধ করি দেশে ফিরতে হল। যা বয়েস হয়েছে— আর কি কখনো কলকাতায় ফিরতে পারবো? মনে অতৃপ্ত আশা নিয়েই চলে যেতে হবে।

হয়ত আবার এই বাগবাজারের তেলে ভাজার জন্যেই নতুন করে জন্ম নিতে হবে।

বড় নাতি সান্ত্বনা দিয়ে বল্লে, তুমি কিচ্ছু ভেবো না দাদু। আমার এক বন্ধুর বোনেব শ্বশুরের তেলের কল আছে। আমি সেইখান থেকে ঝাঁঝালো সরষের তেল জোগাড় করে নিয়ে আসবো। আগে থেকেই তোমায খবর দেয়া থাকবে। তুমি মায়ের ল্যাবরেটরির হাতে গরম বেগনি, পটলি, কুমড়ি খেতে কলকাতায় আসবে! তোমার নাতি-নাতনিব দল সব তোমার স্টেশনে 'রিসিভ' করতে যাবে। চিয়াব আপ দাদু—

বশম্বদবাবু বড় মাতৃ-ভক্ত-ব্যক্তি। প্রতিদিন মায়ের পাদোদক পান না করে বাড়ির বাইরে পা বাড়ান না।

মা বিশ্বম্ভরী দেবীও ছেলে বলতে অজ্ঞান। যখন দিনে একবার অন্নগ্রহণ করবেন---ছেলের জন্যে একটু প্রসাদ না রেখে উঠবেন না। ছেলেও তেমনি। অফিস থেকে ফিরেই সেই মায়ের প্রসাদ মুখে দিয়ে তবে তাব অন্য কাজ।

তবে বিশ্বম্ভরী দেবীর কি একটা মানত আছে। তাই তিনি প্রতি হপ্তায় 'শনিবার' কবেন।

বাজারে যত রকম আনাজ-তবকারি পাওয়া যায় সব একসঙ্গে আতপ চালের সঙ্গে তুলে দিয়ে মুখ ঢেকে সেদ্ধ করেন। দিনের শেষে তাই নামিয়ে নিযে 'এক ঢালা' করেন। এক ঢালা মানে ওতে আর দ্বিতীয় বস্তু মাখবেন না। এক সঙ্গে সব সেদ্ধ হবে। একবারে ঢেলে নিয়ে—তাই সারা দিনেব মতো খাওয়া। এর সঙ্গে শুধু চাই ঝাঁজালো সবষেব তেল আর কাঁচা লঙ্কা।

মায়ের পাতেব এই 'এক ঢালা' খেতে বশম্বদবাবুও খুব ভালো বাসেন। তাই প্রতি শনিবার অফিস ছুটি হলেই তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে আসেন,—মায়ের পাতের একঢালা খেতে হবে।

বশম্বদবাবুর স্ত্রী বসুন্ধরা দেবী এমনি খুব ঠাণ্ডা মানুষ। সাত চড়ে রা বেবোয না।

কিন্তু যখন শাশুড়ি বউতে লাগে---তখন কাক-চিল বাড়িব ত্রিসীমানায ঘেঁষতে পাবে না।

সেই শনিবারের কাহিনি বলি।

বশম্বদবাবু সাবা কলকাতা শহব চষে ফেলে—নতুন-বাজারের আলু, কলেজ স্ট্রিটেব সরেস পটল, মানিকতলার মান কচু, বউবাজারের পেঁপে, শেয়ালদর কুমড়ো আব চেতলাব বড় বেগুন কিনে দিয়ে গেছেন।

সেদিন মা-জননী বিশ্বম্ভরী দেবী 'এক ঢালা' করবেন। বশম্বদবাবু বার বার করে বলে দিয়ে গেছেন,—ন্যাকড়ায় বেঁধে ভাজা মুগের ডালও যেন সেদ্ধ দেয়া হয়। কেন না এই বস্তুটি মা-ব্যাটার অতি প্রিয় খাদ্য।

ছেলেকে টাকা দিয়ে গেছেন,—সে যেন মানিকতলা থেকে ঘানির খাটি সরষের তেল এনে মাকে দেয়। শ্রীমানী মার্কেটের লঙ্কায় খুব ঝাঁজ। সেখানে থেকেও ও বস্তুটি সংগ্রহ করতে হবে। সৈন্ধব লবণ ত' ঘরেই আছে।

নিশ্চিন্ত মনে মায়ের পাদোদক পান করে বশম্বদবাবু অফিসে চলে গেছেন। মা-জননী বিশ্বম্ভরী দেবী ঠাকুর-পুজো সমাপন করে এক ঢালা চাপিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু নাতি আর সরষের তেল নিয়ে ফেরে না! বশম্বদবাবুর স্ত্রী বসুন্ধরা দেবী উদ্বেগের সঙ্গে ঘর-বার করতে থাকেন।

কলকাতাব রাস্তায় এতটুকু বিশ্বাস নেই। যে দানবের মতো লরিগুলো ছুটে চলে। ঘরের মানুষগুলো ঘরে ফিরে না এলে প্রাণে শান্তি আসে কি করে!

ওদিকে "এক ঢালা"ও ফুটে উঠেছে।

বিশ্বম্ভরী দেবীও বড় অস্বস্তি বোধ করছেন। সারা দিন খাটা-খাটনি গেছে। বয়েস হয়েছে। উদরেব আগুনটাও বোধ কবি একটু বেশি জ্বলে উঠেছিল,—এমন সময় ভগ্নদূতের মতো নাতি খালি হাতে ফিরে এলো। ঠাকুরমাকে ডেকে বল্লে, কোনো দোকানে সরষের তেল পাওয়া গেল না। সারা কলকাতা শহর থেকে তেল উধাও হয়েছে।

ঠাকুমাকে ডেকে বললে, কোনো দোকানে সবষেব তেল পাওয়া গেল না।

বসুন্ধরা দেবী এই খবর শুনে প্রমাদ গণলেন। বল্লেন তা হলে উপায়? তোর ঠাকুমার এক ঢালা যে ফুটে গেছে!

নাতি চিৎকার কবে জবাব দিলে, ফুটে গেছে তার আমি কি করবো? সারা কলকাতা শহর টহল দিয়ে এলাম। সরষেব তেলেব পাখা গজিয়েছে। আমি আর অপেক্ষা করতে পারবো না। আজ আবার মোহনবাগানেব খেলা আছে। দেরি হয়ে গেলে জায়গা পাবো না! আমি চল্লাম—

—কিন্তু সরষেব তেল?

—চুলোয় যাক্, সরষের তেল। ভি, আই, পি-দের পায়ে মালিশ করে সবষেব তেল ফুরিয়ে গেছে! যা হয় করো তুমি, আমার আব দাঁড়াবার সময় নেই। ফব্ ফব্ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল নাতি।

আগ্নেয়গিরি বোধকরি এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল। এই বার ধীরে ধীরে তার ঘুম ভাঙছে বলে মনে হল।

বিশ্বম্ভরী দেবী এগিয়ে এলেন—বসুন্ধরা দেবীর কাছে।—বলি হ্যাঁ বৌমা, আমি বুড়ি বিধবা,—সংসারেব এক কোণে জঞ্জালের মতো পড়ে আছি,—তা বুঝি আর সইছে না! ঝাঁটার মুখে বাড়ির বার করে দিলেই হয়।

বসুন্ধরা দেবী লজ্জিত হয়ে বল্লেন, এ সব কথা আপনি কি বল্‌ছেন মা? আপনার ছেলে হল বাড়ির কর্তা। আপনি জঞ্জাল হতে যাবেন কোন্‌ দুঃখে।

বিশ্বম্ভরী দেবী উত্তর দিলেন, জঞ্জালই যদি না হবো তবে বিধবার জন্যে দিনান্তে এক ফোঁটা সরষের তেল জোটেনা তোমার সংসারে? এই যে তোমরা মা ব্যাটায় ইলিশ মাছের মুড়ো দিয়ে কচুঘণ্ট খেলে—আমি তা কিছু বলেছি?

বসুন্ধরা দেবীও এইবার তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। বল্লেন, আজ শনিবার, আপনি আমাকে আজ মাছ খাওয়ার খোঁটা দিলেন? আপনারা মা-ব্যাটায় যে এক ঢালা খাবেন—সেটাও কি আমার দোষ। আপনার ছেলে আজ মাছ খাবেনা। কিন্তু স্বামীর কল্যাণের জন্যেই ত' শনিবার আমাকে মাছ খেতে হয়। না খেলে আপনিই আমাকে কত অকথা কুকথা শোনাবেন।

বিশ্বম্ভরী দেবীও গলা উঁচু করে বলেন, বেশ কথা, ভালো কথা। শনিবার বাড়ির বৌয়ের এয়োতি রক্ষার জন্য মাছ মুখে দিতে হয়। কিন্তু এই যে বুড়ি বিধবা সারাদিনে গলায় এক ফোঁটা জল দেয়নি, তার জন্যে কি এতটুকু সরষের তেলও জোটেনা? তুমি জানো,—সরষের তেল আর কাঁচা লঙ্কা না হলে ভাত আমার গলায় নামে না;—তবু ছেলের সঙ্গে ষড় করে তুমি সেই সরষের তেল আনলে না! আমি উপোস করে থাকি—এই কি তুমি চাও?

বসুন্ধরা দেবী চুল এলো করে হাত নেড়ে উত্তর দিলেন, আমার বাবার কি সরষের তেলের ঘানি আছে যে, ফরমাশ করলেই আমি টিন ভর্তি করে বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে আস্‌বো? আর এতই যদি সরষের তেলের সক্‌সকানি—তাহলে একটি কলু মেয়েকে বৌ করে ঘরে আন্‌লেই পারতেন। আর কোনো দুঃখ থাক্‌ত না।

বিশ্বম্ভরী দেবী তখন সপ্তমে চড়ে গেছেন। কী? আমরা কলু? তাই কলুর মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেবো? তোমার মুখে যা আসে তাই আমার বল্‌বে? আচ্ছা, আজ আসুক বশম্বদ, তোমার সংসারের জলটুকু পর্যন্ত আমি মুখে তুল্‌তে চাইনে। আজই আমায় কাশী পাঠিয়ে দিক। এ পাপ পুরীতে আমি আর থাক্‌তে চাইনে। বিশ্বনাথের চরণে গিয়ে পড়ে থাক্‌বো। তোমরা মা-ছেলেতে খুব করে মাছ মাংস খাও। আমি উঁকি মেরে দেখ্‌তেও আস্‌বো না। যে সরষের তেলের খোঁটা তুমি আমায় দিলে, জেনে রাখো, বিশ্বনাথের রাজত্বে তার অভাব ঘটবে না।

হেড্‌ মাস্টার মশাই মাথায় হাত দিয়ে তাঁর খাসকামরায় বসে পড়লেন।

এবার এত ছেলে বার্ষিক পরীক্ষায় ফেল করল কি করে? মাস্টার মশাইরা কি সারা বছর ছেলেদের কিচ্ছু পড়ান নি?

এখন স্কুল কমিটির কাছে তিনি কি কৈফিয়ৎ দেবেন? এমনিতেই ত' নানা কারণে স্কুলের আয় কমে গেছে। ছেলেরা সময় মত মাইনে দেবেনা। বেসরকারি স্কুল চাঁদার ওপর চলে। অধিকাংশ অভিভাবক চাঁদা দেবার নামও করেন না। স্কুলবোর্ড থেকে যে সাহায্য

পাওয়া যায়—পরীক্ষার এই ফল দেখলে তাও বন্ধ হয়ে যাবে।

এখন উপায়।

অনেক উচ্চ-আদর্শের কথা ভেবে তিনি এই শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পা বাড়িয়েছিলেন।

শ্বশুরমশাই নামকরা ব্যবসায়ী। তিনি বহুবার জামাইকে তার সঙ্গে ব্যবসা করতে বলেছিলেন। কিন্তু আদর্শ চ্যুত হবার ভয়ে হেডমাস্টার মশাই সম্মত হননি। এখন যে শিক্ষিতসমাজে মুখ দেখাবার যো রইল না।

গৃহিণী প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠে খোঁটা দেন যে, বারো বছর মাস্টারি করে বুদ্ধি যা কিছু ছিল সব গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দিতে হবে। এখনো নাকি সময় আছে, এখনো তাঁর বাবাকে হাতে-পায়ে ধরলে তিনি তাঁর ব্যবসার মধ্যে ঢুকিয়ে নেবেন।

কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনি।

হেডমাস্টার মশাই নিজের পথে অচল অটল আছেন। তাঁকে সেখান থেকে এক চুলও নড়ানো যাবে না।

যাই হোক এইবার বুঝি হেড্মাস্টার মশায়ের আদর্শের খুঁটি একটুখানি নড়ে উঠল।

ইস্কুলে একজন ছোকরা আছে— সে প্রতি ক্লাশের পর ঘণ্টা বাজায়। এই ছেলেটিকে তিনিই চাকরি দিয়েছিলেন। বেশ বুদ্ধিমান বিশ্বাসী আর চটপটে। নামও তার চটপটি।

অনেক ভেবে চিন্তে হেডমাস্টার মশাই চটপটিকে ডেকে পাঠালেন।

চট্পটি স্কুলে হেড মাস্টার মশায়ের গুপ্তচরের কাজ করে। শিক্ষক মশাইরা তাঁর অবর্তমানে কি জাতীয় মন্তব্য করেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোথায় কি জাতীয় গলদ ঢুকেছে সব খবর চটপটি গিয়ে তাকে জানায়। এই জন্যেই চট্পটিকে তাঁর সময় মতো হাতের কাছে চাই।

হেডমাস্টার মশায়ের খাস কামরায় তখন আর কেউ উপস্থিত নেই।

চটপটি এসে প্রণাম করে কাছে দাড়ালো। হেডমাস্টার মশাই জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে ক্লাশ ঠিক মত চলছে ত?

চটপটি মাথা নেড়ে জবাব দিলে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তবে এত ছেলে এবছর ফেল্ করলে কেন? কেউ কি পড়াশোনা করেনি? সারা বছর ফাঁকি দিয়েছে?

চট্পটি বিনয়ের অবতার।

উত্তর দিলে, আজ্ঞে ভেতরের রহস্য জানতে আমাকে একদিনের সময় দিতে হবে।

হেড্মাস্টার মশাই বল্লেন, আচ্ছা, তাই হবে। কাল কিন্তু খাঁটি-খবর চাই।

চট্পটি কম কথা বলে। মাথা নেড়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পরদিন টিফিনের ঘণ্টায় চটপটির আবার ডাক পড়ল।

চট্পটি ঘরে ঢুকে গরুড়পক্ষীর মতো দুই হাত জড়ো করে মাথা নিচু করে নীরবে হেড্মাস্টার মশায়ের সাম্নে দাঁড়ালো।

—কারণ কিছু জান্তে পারলি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, জেনেছি।

—কি কারণ?

—আজ্ঞে কারণ তেল।

—তেল!!!

হেড্‌মাস্টার মশাই যেন আকাশ থেকে পড়লেন। অবাক হয়ে খানিকক্ষণ চট্‌পটির মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

—অ্যাঁ! তেল কী রে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ তেল। তেল ছাড়া আর কিছুই নয়।

—কি কারণ?
- আজ্ঞে কারণ তেল!

—তা হলে সেই তেলের ভাঁড়টা খোল্। আসল কারণটা বুঝিয়ে দে।

—আজ্ঞে, কারণ অতি সোজা। বাজারে এক ফোঁটা সরষের তেল পাওয়া যাচ্ছে না! মাস্টার মশাইরা গিন্নিদের কাছ থেকে কেবলি তাড়া খাচ্ছেন। তাই মরিয়া হয়ে ছেলেদের ডেকে বলেছেন, যারা একটিন করে সরষের তেল নিয়ে আসতে পারবে—তারাই পাশ। নইলে সব ফেল!

হেড্‌মাস্টার মশাই নিজের গৃহিণীর তাগিদের কথা মনে করলেন। নিজের হেঁসেলের খবরও তাঁর অজানা নয়। তাই নির্বাক হয়ে রইলেন। মাস্টার মশাইদের ডেকে আর ছেলেদের ফেল হবার কারণ জিজ্ঞেস করলেন না।

তেলের জন্যেই ইস্কুলটা তা হলে বন্ধ হবে!

সেদিন জোর ফুটবল ম্যাচ্।

মোহনবাগানের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের সেমি ফাইনাল খেলা।

সারা কল্‌কাতা শহরের মানুষ খেলার মাঠে ভেঙে পড়েছে।

টিপি-টিপি করে বৃষ্টি পড়ছে।

তাতে লোকদের ভ্রূক্ষেপ মাত্র নেই।

কখনো সমুদ্রের জল-কল্লোলের মতো তাদের মনোবাসনা উদ্বেল হয়ে উঠছে,—আবার পর মুহূর্তেই নিভে যাওয়া দেশালাই কাঠির মতো শু---স্ করে মিলিয়ে যাচ্ছে! কখনো অতি উল্লাসে ছাতা-জুতো নিক্ষিপ্ত হচ্ছে—ঊর্ধ্ব নীলাকাশে,—আবার তার পরক্ষণেই মানুষের সমবেত ক্ষোভের তীব্র দীর্ঘশ্বাস বাতাসে হারিয়ে যাচ্ছে।

বিজয়লক্ষ্মী কার অঙ্ক-শায়িনী হবেন কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

সেই বিরাট জন-সমুদ্রে ক্ষণে ক্ষণে উত্তাল-তরঙ্গ জাগছে। শেষ মুহূর্তে একটি পেনালটি সটে মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল—'বাঙাল' আর 'ঘটির' বাক্-যুদ্ধ। শেষকালে বাক্য বিনিময় ছেড়ে একেবারে হাতাহাতি। কত রসিকের নাক ভাঙ্‌ল, কত উদ্যোগীর চরণ যুগল মচ্‌কে গেল, কত পেটুকের পেটে অবিরাম ঘুঁষি বর্ষিত হল।

কেনারাম যখন এই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কৌশলে পশ্চাদপসরণ করে বাইরে বেরিয়ে এলো, তখন তার পাঞ্জাবির পিঠের অংশটি অপহৃত হয়েছে এবং আর দুটি পায়ের মধ্যে একটি জুতো অবশিষ্ট আছে।

কেনারাম খোঁড়াতে খোঁড়াতে গঙ্গার ধারে চলে গেল। সেখানে বহুক্ষণ শীতল সুরধুনী সমীরণ সেবন করে সুস্থবোধ করল।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখে নিচে গঙ্গার একেবারে কিনারায় জেলেরা একেবারে তাজা রুপোলি ইলিশ মাছ বিক্রি করছে।

গতরের সব গ্লানি গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়ে কেনারাম এক জোড়া ইলিশ মাছ কিনে ফেলল, তারপর একটি রিক্সা ভাড়া করে সগৌরবে গৃহে প্রত্যাবর্তন করল।

বাড়িতে পৌঁছেই সে সিংহ-গর্জন শুরু করে দিল।

দাদার চিৎকারে বই ফেলে বিনি ছুটে এলো। বল্লে, এমন করে পাড়া মাতিয়ে বিচ্ছিরি আওয়াজ বের করছ কেন দাদা? পাড়ার লোক অন্য কিছু ভাবতে পারে।

কেনারাম হুঙ্কার দিয়ে বল্লে, হুঁ! বিচ্ছিরি আওয়াজ! - এই নে একজোড়া ইলিশ। একটা এক্ষুণি ভেজে ফেল্, আমরা সবাই মিলে চা দিয়ে খাবো। বাকিটা দিয়ে ইলিশ ভাতে হবে। বিনি তার বেণী দুলিয়ে বল্লে, মোহনবাগান খেলায় জিতেছে বুঝি দাদা? নইলে তুমি হঠাৎ জোড়া ইলিশ কিনে আনো?

এই নে এক জোড়া ইলিশ

কেনারাম এবার আনন্দের আস্ফালন করলে। বল্লে, যা—যা, আর বখামি করতে হবে না। যা বল্লাম, তাড়াতাড়ি তাই করে ফেল। চায়ের জলও চাপিয়ে দে—

বিনি জবাব দিলে, তা না হয় দিচ্ছি। কিন্তু তুমি খোঁড়াচ্ছ কেন দাদা? অতি আনন্দে নাকি?

কেনারাম সে কথার আর কোনো জবাব দিলে না, হাত-পা ধুতে বাথরুমের দিকে চলে গেল।

একটু বাদেই বিনি বিচিত্র নাচ নাচতে নাচতে বেরিয়ে এলো। দাদার সাম্‌নে গিয়ে দুই হাত উঁচু করে ভগ্নদূতীর মতো বল্লে, ইলিশ মাছ ভাজা হবে না—

—কেন?

—বাড়িতে সরষের তেল এক ফোঁটা নেই।

—সে কি কথা? এই সে দিন একটিন তেল কিনে দিলাম!

বিনি ওরই ফাঁকে এক পাক ঘুরে নিলে। বল্লে, ঠাকুমার বাতের ব্যথা বেড়েছে। কবরেজদাদু এসেছিলেন, তিনি বল্লেন, কি একটা কবরেজি তেল তৈরি করে দেবেন রশুন ফুটিয়ে। তাই বাড়িতে যে সরষের তেল ছিল সব তাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন রান্নার জন্যেও এক ফোঁটা তেল নেই। ধিরু খানিক আগে দোকানে গিয়েছিল—ফিরে এসে বল্লে, বাজারে এক ফোঁটা সরষের তেল পাওয়া যাচ্ছে না!

—তাহলে এখন উপায়?

—চা আর মুড়ি দিচ্ছি খাও—

—হুঁ! মুড়ি খাবো। তুই খা মুখপুড়ি—। আমি ক্লাবে চল্লাম।

পায়ের ব্যথার কথা বেমালুম ভুলে কেনারাম ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

বিনি জোড়া ইলিশ হাতে নিয়ে সেই দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

জামাইষষ্ঠী এসে গেছে!

তাই গণপতি গোস্বামীর চোখে ঘুম নেই!

কিছুদিন আগেই একমাত্র মেয়ে মাধুরীর বিয়ে দিয়েছেন। মেয়ে-জামাইকে জোড়ে আনবেন, জামাই-ষষ্ঠীতে একটু ঘটা করবেন—কর্তা-গিন্নির বড় সাধ।

কিন্তু সব সাধে বাদ সাধল সরষের তেল। মুখপোড়ারা বাজার থেকে তেল লুকোলো কোথায়? সবই কি কি মন্ত্রীদের পায়ে মালিশ করতে ফুরিয়ে গেছে?

ভেবে ভেবে গণপতি গোস্বামীর অনিদ্রা রোগ হল। এক পরিচিত বন্ধুর ভেড়ি আছে. তিনি মাছ দেবেন কথা দিয়েছেন। ফলের দোকানের সঙ্গে দীর্ঘ কালের আলাপ। তারা ন্যাংড়া আম আর মর্তমান কলা পাঠিয়ে দেবে। বেহালায় এক বন্ধু পাঁঠার ব্যবসা করেন। তিনি জামায়ের জন্য কচি পাঁঠা পাঠিয়ে দেবেন। দৈ-সন্দেশেরও ভাবনা নেই। মানিকতলায় এক ময়রা ছেলেবেলায় এক সঙ্গে ইস্কুলে পড়ত। তাকে সব কথা বলা আছে। ছেলেবেলার বন্ধু খাতির করেই বলেছে, তোমার জামাই কি আর আমার জামাই নয়? না হয় তোমার বাড়ি একদিন পাত পেতে খেয়ে আসবো। দৈ মিষ্টির জন্যে তুমি কিছু ভেবোনা। আমি সরেস মাল পাঠিয়ে দেবো।

সব ব্যাপারে নিশ্চিন্ত আছেন গণপতি গোস্বামী। কিন্তু ওই সরষের তেলই তার চোখে সরষের ফুল ফুটিয়েছে!

গণপতি গোস্বামী ভেবে ভেবে কূল-কিনারা পান না! বাড়ির কর্তার অনিদ্রা—গিন্নির অরুচি, আর ছেলেমেয়েরা মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে...!

এমন সময় বেনারস থেকে একটি দেশোয়ালি লোক এসে হাজির। তার এক হাতে চিঠি, আর এক হাতে ইয়া বড়া একটি টিন!

গণপতি গোস্বামী শুধোলেন, কাঁহাসে আয়া ভাই?

লোকটি জবাব দিলে, চিঠিমে সব কুছ লিখা হায়। আপ পড় লিজিয়ে।

হাত বাড়িয়ে চিঠি নিলেন গণপতি গোস্বামী। আরে! এ যে তার বড়ছেলে নিরঞ্জনের পত্র। ছেলে লিখেছে—

"বাবা" কাগজে দেখলাম, কলকাতা থেকে সরষের তেল কালো বাজারে উধাও হয়ে গেছে। সামনে জামাই ষষ্ঠী। তোমরা নিশ্চয়ই বিপদে পড়েছ। আমাদের বিবিজলাল তার দোকানের জিনিস-পত্র কেনাকাটা করতে কলকাতায় যাচ্ছে। তার সঙ্গে বড় এক টিন সরষের তেল পাঠালাম। কাশীর তেল খুব ভালো। এখানে ভেজাল দেয়া হয়না। আশাকরি এই টিনেই তোমাদের জামাই ষষ্ঠীর ব্যাপার নির্বিঘ্নে সমাধা হবে। ততদিনে বাজারের আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে।

আর এক হাতে ইয়া বড়া একট টিন।

আমি এখানে ভাল আছি। পত্রোত্তরে সকলের কুশল প্রার্থনা করি। টিনের প্রাপ্তি সংবাদ দিও।

ইতি প্রণত নিরঞ্জন

কাশীর তেলের টিন পেয়ে বাড়ির কর্তা গিন্নির মুখ আবার খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠল।

গিন্নি কর্তার কাছে এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বল্লে, এইবার বাছাদের ভালো করে মাছের কালিয়া কোর্মা খাওয়াতে পারবো। সরষের তেল না হলে কি আর বাঙালির মনোমত রান্না হয়?

গিন্নি একটু চুপ করে থেকে কর্তার পিঠে হাত বুলিয়ে গদগদ কণ্ঠে কইলে, আচ্ছা, তোমার মনে আছে, প্রথম যে বছর জামাই ষষ্ঠীতে তুমি আমাদের বাড়ি গিয়েছিলে, মা তোমায় কত মাছের রান্না করে খাইয়েছিল -রুই, ইলিশ, পাবদা, আড়মাছ, শিলং, চিতোল –

কর্তা নিজের টেকো মাথায় একটা চাপড় মেরে বল্লে, সে সব কথা আর মনে করিয়ে দাও কেন গিন্নি? তোমার চেহারাটায় জৌলুষই বা তখন কেমন ছিল।

—মরণ আর কি।

বলে গিন্নি সরে গেল।

সেদিন অফিসে যেতেই গণপতি গোস্বামীকে বড়বাবু ডেকে পাঠালেন।

ঘরে ঢুকতেই বড়বাবু গণপতিবাবুর দুটো হাত জড়িয়ে ধরে বল্লেন, ভাই, তোমরা

অফিসের পুরোণো মানুষ, আমাকে একটা বিপদ থেকে উদ্ধার করতেই হবে।

বড়বাবুর মুখে এই জাতীয় কথা শুনে গণপতি গোস্বামী হক্‌চকিয়ে গেল!

আঁ! ব্যাপারটা কি? বড়বাবুর বিপদ?

বড়বাবু বল্লেন, শোনো গণপতি, হঠাৎ মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। এই জামাই ষষ্ঠীর দিন তারিখ পড়েছে। সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি। একটিন সরষের তেল আমায় জোগাড় করে দিতেই হবে। নইলে আমার মান ইজ্জত যায়!

গণপতি গোস্বামীর চোখে তখন কাশীর সেই বড় টিন সরষের তেল ভেসে উঠল। আবার পরমুহূর্তেই গিন্নির মুখ ভেবে চুপ করে রইল।

বড়বাবু বল্লেন, চুপ করে থেকো না গণপতি। যে করে হোক, ব্যবস্থা করে দিতেই হবে। আমি কথা দিচ্ছি, আসছে মাসে তোমার পঞ্চাশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেবো।

লাফাতে লাফাতে গণপতি গোস্বামী ঘরে ঢুক্‌লেন। গিন্নি বল্লেন, আজ এত খুশি কেন? জামায়ের চিঠি এসেছে বুঝি? কবে ওরা রওনা হচ্ছে?

কর্তা নিজের ছেঁড়া ছাতাটা টেকো মাথার ওপর একবার ঘুরিয়ে নিয়ে বল্লেন, চুলোয় যাক ওই জামাই ষষ্ঠী, আসছে মাসে আমার পঞ্চাশ টাকা মাইনে বাড়ছে। শিগ্‌গির ওই কাশীর তেলের টিনটা বের কর ত! বড়বাবুর আবার মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেল সাম্‌নের জামাই ষষ্ঠীর দিনে! এক্ষুণি আমায় ওই টিনটা নিয়ে ছুটতে হবে বড়বাবুর বাড়ি। ফিরে এসে তোমায় সব বুঝিয়ে বলব'খন!

*আশ্বিন, ১৩৭১*

# হুঁকো বন্ধ

বায শ্রী সুবেন্দ্রনাথ মজুমদাব বাহাদুব লিখিত

ও

পূর্ণ চক্রবর্তী চিত্রিত

১

হঠাৎ বিদ্যাধব দাদা এসে খবব দিযে গেল যে সমাজে আমাব হুঁকো বন্ধ হযে গিযেছে।

মাথায পড়ল বাজ।

হুঁকো নিযেই আমাদেব সমাজ।

শৈশবে সমাজ কি পদার্থ তাব ধাবণাই ছিলনা। সহপাঠীদেব সঙ্গে যখন খেলাধুলায দিন কাটত, তখন বুঝতে পেবেছিলেন যে তাদেব সঙ্গে একত্র হলে প্রাণে একটা আনন্দ হত, উৎসাহ হত, বিপদ আপদে সাহস হত। আমাদেব মধ্যে ঝগড়াঝাটি হলেও, বিদ্যাধব দাদাব একটু ধর্মজ্ঞান ছিল, কেন না, তিনি সকলকে সমান ভাবেই ভালবাসতেন, এবং তাঁব ন্যাযবিচাবে আমবা সকলে বাধ্য হযে পড়তেম। সেও একবকম সমাজ।

যখন ছিলাম ছাত্র, তখন পাত্রাপাত্র জ্ঞান ছিলনা। বন্ধুদেব মধ্যে নানা জাতিব সন্তান ছিল। জাতিব বিচাব তখন কবি নাই। বুকে জড়িযে ধবেছি, আদব কবে মুখে চুমোও

খেয়েছি, পাগলের মত প্রেম-পত্রিকাও লিখেছি, চিরজীবন ভালবাসব বলে খৎ লিখে দিয়েছি।

খানিকটা লেখাপড়া শিক্ষা হয়ে গেল, মামা বল্লেন 'রামদাস্, তোর বি-এ পাশ করবার দরকার নাই। জমিটমিগুলোর চাষবাস করলেই যথেষ্ট হবে। বাপ রেখে গিয়েছে প্রায় পাঁচশ' টাকা, বুদ্ধিশুদ্ধি থাকলে দিন চলে যাবে। সমাজে তোব মতন কর্মিষ্ঠ লোকেব দরকার হয়েছে।'

তখন মনে হল যে 'সমাজ' কথাটার একটা বিশেষ অর্থ আছে।

কলেজে যখন পড়ি তখন অনেক লোককে সিগারেট খেতে দেখি। কিন্তু না জানি কেন, আমার প্রবৃত্তি হয় নাই। যখন গ্রামে এসে সমাজে ঢুকে পড়্‌লেম, তখন দশজনকে জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হলেম, এখন করতে হবে কি?

সকলেই একবাক্য। বল্লে 'তামাক' ধরতে হবে। প্রথম চোটে দা-কাটা তামাক। দা-কাটা তামাক, ডাবা হুঁকো, ঘুঁটে—কয়লার আগুন! খরচ বেশি নয়। বিশেষত রৌদ্রতপ্ত মাঠে ভাদ্র আশ্বিন মাসে তামাক ছাড়া পিত্তরক্ষার অন্য কোন উপায় এ পর্যন্ত কেহ উদ্ভাবিত করেন নাই।

হুঁকোটাতে জল ফিরিয়ে, নলটার লেভেলিং সমতল ক্ষেত্রের সমান করে, ছিদ্রে ওষ্ঠাধর স্থাপন করা গেল। প্রথমে টান দিতেই সামান্য একটু জল উঠেছিল, কিন্তু বি-এ ক্লাসেব ছেলেব কাছে তাব তথ্য ঠিক করতে কতক্ষণ লাগে? একবার মনে হয়েছিল যে বিজ্ঞানের কোর্স নিলে ভাল হত। কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং না হলে সকলের বিদ্যাই সমান, যেমন মাসিকপত্রে বাল্যবিবাহের প্রবন্ধাবলি।

সুতরাং অনুতপ্ত না হয়ে দুর্গন্ধময় উচ্ছিষ্ট জলটুকু গলাধঃকরণ করে ফেল্লেম। হুঁকোটা বিশ্ব-বিশ্রুত 'খুড়ো খুড়ো' রব ছেড়ে দেওয়াতে বর্ণনাতীত আনন্দলাভ করলেম।

অতঃপর কলিকার ছিদ্রে ক্ষুদ্র মৃত্তিকাখণ্ড সংস্থাপন করতঃ এক আউন্স আন্দাজ দা কাটা তামাক স্তরে স্তরে আল্‌গাভাবে বসিয়ে দিলেম। তস্যোপরি কয়লার অগ্নিসংযোগে ধূম বাহির হওয়াতে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণপণে টান, ও সামাজিক নেশার উৎপত্তি!

বুঝিলাম পূর্বপুরুষদের অপূর্ব আবিষ্কার! সমাজের আরম্ভ কোথায়! আদিম অবস্থায়, যখন মানবমস্তিষ্কে সমাজবুদ্ধির অঙ্কুরোদগম হয় নাই, তখন বুদ্ধির মূলে ধূম্রপ্রয়োগ কিরূপে হয়, ও সেই যজ্ঞ হতে উল্কামুখী ছত্রিশজাতীয় প্রহরণ-বিশিষ্ট, সমাজদেবতা কি করিয়া বাহির হন!

টান চল্‌ছিল, চারিদিকে শ্যামলক্ষেত্র হেল্‌ছিল, দুল্‌ছিল, চরন্ত গাভীকুলের অবনত শিং ও উন্নত লাঙ্গুলরাজি দেখাচ্ছিল সুন্দর, শরতের মেঘ এদিক ওদিক হতে একত্র হয়ে জম্‌ছিল। সকলেই সঙ্ঘবদ্ধ। মাত্র আমি একাকী মাঠের মধ্যে!

সামাজিক নেশার উৎপত্তি হলে বোধ হয় একাকী থাকা নিতান্ত কষ্টকর।

একলা একছিলিম দা-কাটা তামাক নিঃশেষ কবা আমার সাধ্যাতীত। দ্বিতীয়ত নিঃস্বার্থপরতাই বোধ হয় তামাক-সেবনের মূলমন্ত্র।

'আপনি ইচ্ছা কবেন কি?'

এই কথা দ্বাবা কাহাকে নিমন্ত্রণ কবে কৃতার্থ হব, তাই ভাবছি। তামাকেব চতুর্থাংশও তখনও দগ্ধ হয নাই। সঙ্গে সঙ্গে ছটা বিপুব মধ্যে কটা দগ্ধ হযেছিল, তাবই হিসাব কবছি।

এমন সময একপশলা বৃষ্টি। তাডাতাডি গোশালাব চালেব নিচে সাবধানে হুঁকোটা হাতে কবে উপবিষ্ট হযে নিবিষ্টচিত্তে আকাশেব দিকে লক্ষ্য কচ্ছিলেম।

অনেকগুলো গাভীবও বৃষ্টিধাবা নাপছন্দ কবে গোশালায প্রবেশ। বোধ হল সবগুলো আমাদেব নয। সঙ্গে সঙ্গে একটি যুবতীব লাঠি হস্তে সেই গৰুগুলো তাডিযে বাহিব কববাব প্রচেষ্টা অর্থাৎ বীতিমত প্রাণপণে চেষ্টা।

আমি যুবতীব দিকে দৃষ্টিপাত না কবেই বল্লেম 'গোহত্যা কববেন না। বৃষ্টিটা থামুক'।

যুবতী সঙ্কুচিত ভাবে গোশালাব পশ্চিম প্রান্তে আশ্রয নিযে মাঠেব দিকে তাকাতে লাগল।

মুখ দেখাদেখি নাই, অথচ সমাজেব একজন অঙ্গ (অঙ্গিণী?) গোশালায বর্তমান, তামাকও যায দগ্ধ হযে। আমাব বুক ফেটে সমাজ-বুদ্ধি বেবিযে পডল— তাই অন্যমনস্ক ভাবে জিজ্ঞাসা কবলেম 'তামাক ইচ্ছে কববেন কি?'

আমাব চালচলন দেখে যুবতী নিশ্চযই তাব ধর্মবক্ষা সম্বন্ধে বিশেষৰূপে আশ্বস্ত হযেছিল, নচেৎ কখনই বলত না 'কল্‌কেটা বেখে দিন'।

ভাবলেম 'হুঁকোটা দোষ কল্লে কি?' তাই বল্লেম 'হুঁকোটাব অপমান কববেন না।

যুবতী। আপনি কি জাত?

আমি। বামদাস শর্মা। ব্রাহ্মণ।

যুবতী। কি সর্বনাশ, আমি ব্রাহ্মণেব হুকোতে তামাক খাব কি কবে।

আমি। আপনি কি জাত?

যুবতী। গযলাব মেযে।

আমি। সমীহ কববেন না, খেযে ফেলুন। এটা সামাজিক হুঁকো এখনও হয নাই। এই আমাব প্রথম তামাক খাওযা।

যুবতী। তাও কি কখনও হয, ব্রাহ্মণ যে দেবতা।

আমি। উচ্ছিষ্ট মনে কবে খাননা, কিংবা দুটো আঙ্গুল সম্মুখে বেখে টান দেন, এঁটো না হলেই হল। নিতান্ত পক্ষে আমি হুঁকোটা না হয ফেলে দেব। ভেবে দেখুন, শুধু কল্কেব তামাক টানলে দুটো কবতলই দুর্গন্ধময হবে।

যুবতী। আমাব অভ্যাস আছে। বাবা, মা, সকলেই খান। আমাকে সাজতে হয। চাষাভুষোব আবাব হাতে দুর্গন্ধ কি?

আমি। তবে আব এক ছিলিম সেজে ফেলুন। তামাকটা পুডে গিযে দুর্গন্ধ বেবিযেছে।

লজ্জা, ভয, প্রভৃতি নানাবিধ মানসিক উপসর্গ— যে গুলিব বিশ্লেষণ ক্ষুদ্র সাহিত্যিকেব পক্ষে অসম্ভব,—বোধ হয তখনও তোলপাড কবছিল। আমি তাই দেখে বল্লেম—

'বেশ আমিই সেজে দিই'।

যুবতী। না, আমিই সাজ্‌ব।

অতপর হুঁকা, কলিকা, তামাক, ঘুঁটে—কয়লার আগুন একত্র করে আমার ভাদ্রমাসের গোশালায় যুবতী অতিথি এক মনে তামাক সাজতে বসে গেলেন, কিংবা শুরু করলেন বল্লেও চলে।

শরৎকালের ক্ষণস্থায়ী বারিধারা বন্ধ হযে আকাশ পরিষ্কার হয়ে উঠ্‌ল। তামাকের সৌরভ গোশালায় ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। আমি হুঁকোতে এক টান দিয়েই বুঝতে পারলেম যে পাকা হাতের তামাক সাজা। প্রাণ খুলে বল্লেম 'চমৎকার, এইবার আপনি টেনে নিন্'। অদূরে একজন চাষা যাচ্ছিল।

যুবতী। ও মা, কে আস্‌ছে!

আমি। এক টান এই বেলা দিয়ে ফেলুন, নচেৎ ব্রহ্মশাপ লাগ্‌বে।

যুবতী সভয়ে দুটো টান দিয়ে বল্লেন, 'আমি এখন যাই'।
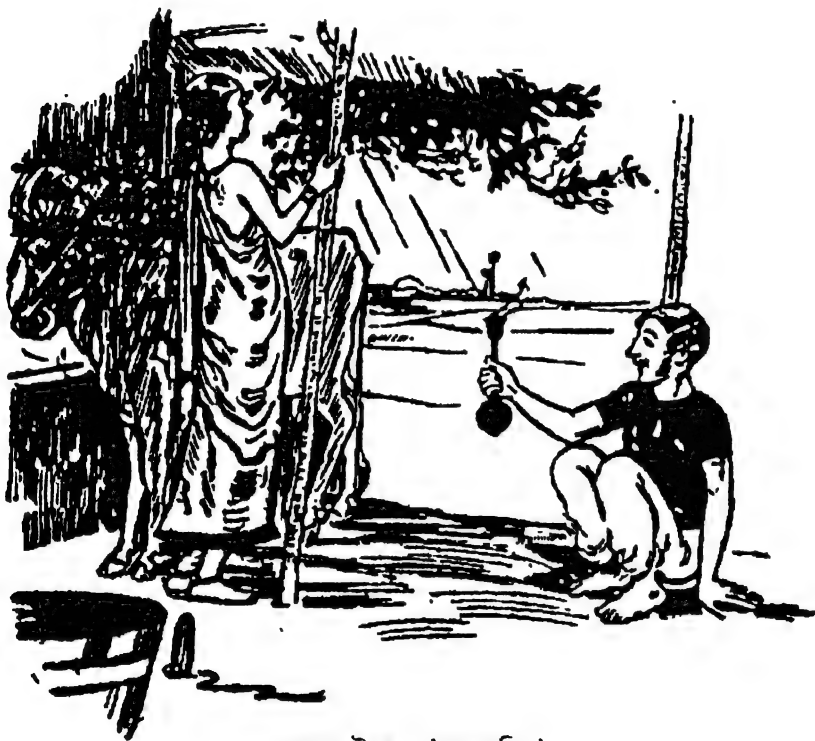
'তামাক ইচ্ছে ক'রবেন কি?'

চাষাটা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল, তা বুঝতে পাল্লেম না। আমি যুবতীর হাত হতে হুঁকোটা সযত্নে গ্রহণ করে গোটা তিন চার দম কষে দেখলেম যে তামাকটা মজে গিয়েছে। সুতরাং আগ্রহপূর্বক আবার তার হাতে দিলেম—

যুবতী। বেলা যে যায়।

আমি। বেলাব মুখে আগুন। তামাকটা নষ্ট হয়ে যাবে—টেনে নিন।

যুবতী। কি মুস্কিল! আমাব মুখেব হুঁকো আপনি টানলেন, জাত যে গেল!

আমি। ভাববাব কথা বটে—গেল কোথায়? ইত্যবসরে আপনি শেষ করুন।

যুবতীও ভাবছিল, কি মাথামুণ্ড তা জানিনা। মাঝে মাঝে সঙ্কুচিত হয়ে টান্‌ছিল, মাঝে মাঝে আকাশেব দিকে তাকাচ্ছিল, হঠাৎ একবাব আমাব দিকে চেয়ে সলজ্জ ভাবে বল্লে—'তবে এখন যাই'।

যদি হেসে ফেল্‌ত তবে সে সুন্দব অনিন্দ্য মুখশ্রী তত সুন্দব দেখাত' না, যত সুন্দব দেখাল' সেই লজ্জাজডিত কথায়।

আমি গম্ভীবভাবে জিজ্ঞাসা কবলেম, 'আপনাব নাম জিজ্ঞাসা কবতে পাবি কি'?

যুবতী। বামমণি। বাবা ডাকেন 'বামি' বলে'।

আমি। আমাব নামেব অর্দ্ধেকটাব সঙ্গে মিল আছে। আমি হচ্ছি বামদাস। মনে থাকবে ত?

যুবতী। আছে।

যুবতী সভয়ে দুটো টান দিয়ে বললেন, 'আমি এখন যাই'।

আমি। ঠিক। আমি ত পূর্ব্বেই পবিচয় দিয়ে ফেলেছি। আপনি থাকেন কোথায়?

যুবতী। ঐ যে বাস্তা দেখছেন যেটাব শেষেব দিকে আকাশ নুয়ে পডেছে—ঐ যে নীল বং, ঐ যে সাদা সাদা গরু বাছুব চলে যাচ্ছে—ঐ ঐ—একটা খেজুব গাছ।—

আমি। খেজুব গাছ হতে কত দূব?

যুবতী। দশ পাও নয়।

এই বলে সে তার গরু হাঁকিয়ে চলে গেল।

এই ত ঘটনা। তার সাক্ষী সেই চাষাটা, যে অদৃশ্য হয়ে পড়েছিল। গ্রামে গিয়ে স্ত্রীমহলে রটিয়ে দিয়েছিল যে 'তারক ভট্টাচার্যির ছেলে রামি গয়লানি ছুঁড়ির সঙ্গে এক হুঁকোতে তামাক টান্‌ছিল'।

প্রভাতবাতাহতকম্পিতার মতন স্ত্রীলোকমহল সেই বিগ্রহের কথা পুরুষসিংহদের নিকটে প্রচার করে দিলে, এবং ব্রাহ্মণ সমাজের যত হুঁকো খট্‌খট্‌ করে কেঁপে উঠল।

তার পরই হুকো বন্ধের মন্তব্য।

বিদ্যাধর দাদার অনুরোধে কেবল চক্রবর্তী মহাশয় বলেছিলেন 'যদি ভাল সাফাই দিতে পারে, কিংবা প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজি হয় তবেই রেহাই।' এমন কি, মুখুয্যে মহাশয় বলেছিলেন 'অস্বীকার করলেও চলে যাবে। লুকিয়ে অমন ধারা কত হয়ে থাকে। চাষার কথা অবিশ্বাস করতে আমাদের আপত্তি নাই'।

আমি কেয়ারই করতেম না, কিন্তু মা হাপুস-নয়নে কেঁদে ফেল্লেন। মামা লজ্জায় কাঠ হয়ে গেলেন।

আমি কাতর ভাবে তাঁদের বল্লেম 'আমি জেলেও যাই নাই, দ্বীপান্তরেও যাই নাই। যদি হুঁকো বন্ধ হয়, তবে আমি না হয় কল্‌কেতার চলে গিয়ে উপার্জন করব। শরীরে আছে শক্তি, হৃদয়ে আছে ভক্তি। এই দেশেই কত তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ বীভৎস কাণ্ড করে গিয়েছে, তখন ত এত বাচ্‌-বিচার ছিলনা। আমি ত চিরকালই আপনাদের থাক্‌ব, ভয় কি?'

এদিকে আমি ত হুকোমারার বিচারাধীন। আবার ওদিকে গয়লামহলে তার চেয়েও এককাঠি সঙ্গিন ব্যাপার। গোপ-দলপতি কানাই গয়লা সিদ্ধান্ত করলে যে রামি 'পতিতা'। সতের বৎসরের মেয়ের সঙ্গে বাইশ বৎসরের যুবক যখন এক হুঁকোতে গোয়ালের মধ্যে বাদলা-বৃষ্টির দিন নিঃসঙ্কোচে দা-কাটা তামাক পুড়িয়েছে, তখন সমাজ তাকে গ্রহণ করতে ধর্মত অক্ষম। এর এক উপায়, আমাদের গলায় যজ্ঞোপবীত দিয়ে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করা, কিংবা দুধের দাম টাকায় তিন সের করে চড়িয়ে দেওয়া।

কথাটা দাঁড়িয়ে গেল সমূহ গোলমালের উপর। আমি সকলকে ডেকে বল্লেম, 'দেখুন, ভগবানের নাম নিয়ে শপথ করে বলছি যে আমাদের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক। হুঁকোর আগুন ছুঁয়ে দিব্য করে বলছি।'

বিচারকগণ বল্লেন 'ওটা আধ্যাত্মিক কথা। আমরা সমাজের দিক দিয়েই দেখ্‌তে বাধ্য। যদি হুঁকোটাতে কড়ি বেঁধে গয়লার হুঁকো করে দিতে, তবে অনেকটা ভরসা ছিল। কিন্তু যখন হুঁকোর মধ্যে জাতির ব্যবধান রাখনি, তখন অন্তত প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া কোনো উপায় 'নাই।'

আমি বল্লেম, 'বেশ'।

বাটী ফিরে বিদ্যাধর দাদাকে জিজ্ঞাসা করলেম 'এখন উপায়'?

দাদা। প্রায়শ্চিত্ত করতে পারবে?

আমি। মিথ্যা কথাও বলতে পারব না, প্রায়শ্চিত্তও করতে পারব না। আসল কথা,

তাকে ভালবেসেছি। এই একটা মস্ত সুযোগ বিবাহ করবার।

দাদা। তবে তাকে নিয়ে সবে পড়।
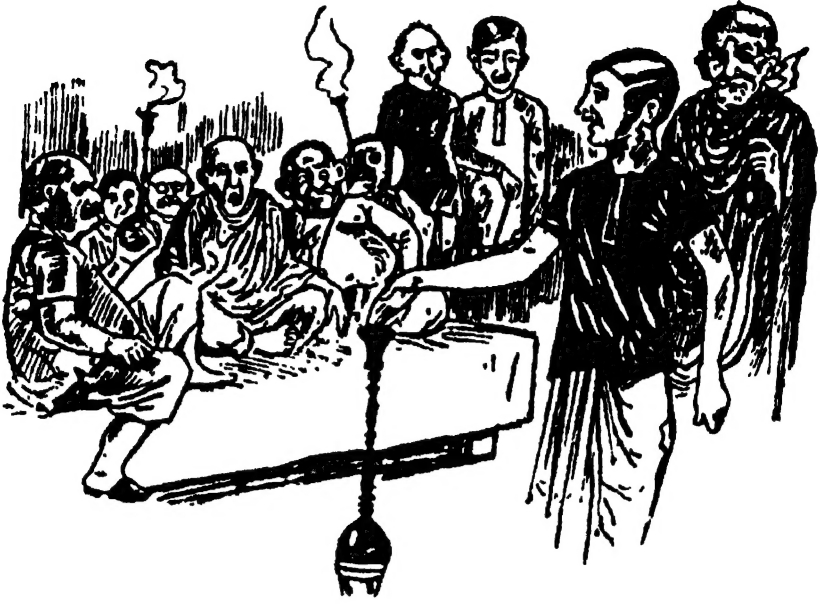
শপথ করে বলছি যে আমাদের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক। হুঁকোর আগুন ছুঁয়ে দিব্য করে বলছি।'

আমি। প্রস্থানের একটা সদুপায় করে দেও।

বিদ্যাধর। আমার একজন আত্মীয়ের কলিকাতার কাছে 'সেন্ট্রাল ডেয়ারি ফারমিং' বলে দুধের কারখানা আছে; সেখানে তোমাদের মতন লোককে লুফে নেবে। তোমার যে পাঁচশ' টাকা আছে সেটা মাকে দিয়ে যাও। আমি রামমণির বাপকে বলেছি, সে তার গরুগুলো কলিকাতায় পাঠিয়ে দেবে ও রামমণিকে নিয়ে আজই রেলে রওনা হবে। তুমি একবার তাদের সঙ্গে দেখা করে এস।

আমি বিদ্যাধর দাদাকে বুকের দিকে টেনে এনে তার গলা জড়িয়ে ধরলেম। মুখে কৃতজ্ঞতা জানাইনি, তবে আমার অশ্রুধারা দেখে সে বুঝতে পেরেছিল। সে ধীরে ধীরে, 'আচ্ছা এখন তুমি যাও'।

বন্ধু যদি যথার্থ বন্ধু হয় তবে বিদ্যাধর দাদার মতন যেন হয়। নিদ্রা নাই, আহার নাই, আমার কিসে ভাল হবে সেই জন্য সমস্ত দিন দৌড়ে বেড়াচ্ছিলেন। মাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে আমার ইতিমধ্যেই পঞ্চাশ টাকার চাকরি হয়ে গিয়েছে, উপরন্তু দুধ বিক্রি হলে লাভের দশাংশ আমার!

সেই যে খেজুর বৃক্ষ, গ্রাম্য রাস্তা ও অনন্ত নুয়ে পড়া আকাশের সন্ধিস্থলে আমাদের প্রণয় কাহিনির বহুদূরের নির্বাক ও নিস্পন্দ সাক্ষী! সেই খেজুর বৃক্ষের দিকে ব্যাগ হাতে

করে প্রায় একঘণ্টা ধরে হেঁটে গিয়ে উপনীত হলেম রামমণিদের বাটীতে।

সেখানে যা দেখলেম সেও আশ্চর্য। গয়লাদের এক দঙ্গল ছেলে-মেয়ে রামমণির সঙ্গে বিদায় নিচ্ছে। সকলেরই অশ্রুভরা চক্ষু!

তারাও শৈশব হতে' রামমণির সঙ্গে খেলাধূলা করে জীবনের আধ্যাত্মিক সময়টুকু আনন্দে অতিবাহিত করেছিল। বিদায় দিতে বড়ই কষ্ট হচ্ছিল। রামমণি তাদের সান্ত্বনা করে বলছিল 'আবার ফিরে আসব।'

রামমণির পিতারও হুঁকো বন্ধ! সজল-নয়নে হুঁকোটার দিকে তাকিয়ে ভাবছিলেন 'এটা আর কত দিন'?

আমি যাওয়াতে সকলের মুখ একটু প্রফুল্ল হল। তাঁদের বল্লেম, 'সাহস করে বুক বেঁধে

রামমণিকে আপনার হাতে আমরা সঁপে দিইছি, যেন জীবনে কষ্ট না পায়।'

ফেলুন। সংসার খুব বিস্তীর্ণ স্থান। একটা ছোট গ্রামের মধ্যে সমাজবদ্ধ হয়ে থাকার দিন আমাদের গিয়েছে। বড় সংসার আমাদের ডাক্‌ছে। যখন ডাক পড়েছে, তখন ভগবান তার মধ্যে আছেন নিশ্চয়'।

একজন সুন্দরী, তার সিঁথায় ছিল সিন্দূর, আমার সম্মুখে এসে কাতর ভাবে বল্লেন 'রামমণিকে আপনার হাতে আমরা সঁপে দিইছি, যেন জীবনে কষ্ট না পায। আমরা গয়লার মেয়ে, মুক্ষুসুক্ষু, আপনারা লেখাপড়া শিখেছেন, হয় ত সামান্য ত্রুটি হলেই বিরক্ত হবেন'।

আমি। ভয় নাই, নিশ্চিন্ত থাকুন। যদি বেঁচে থাকি তবে এই বৃন্দাবনেই এসে করব বাস।

অতঃপর রামমণি ও তার জনক জননী ও একটি ছোট ভাইকে নিয়ে আমরা দেশ ছেড়ে চল্লেম। তিন ক্রোশ হেঁটে গিয়েই স্টেশন।

বামমণি সাবা বাস্তা নববিবাহিতা কনেটিং মত চুপ কবে ছিল।

সেন্ট্রাল ডেযাবি ফার্মে গিযে পৌঁছাবাব আগেই দেখি বিদ্যাধব দাদা আমাদেব বাসাব বন্দোবস্ত কবে বেখেছেন।

কাবখানাব কর্তা হাসি মুখে বল্লেন 'আসুন, আমাব পবম সৌভাগ্য। খাঁটি লোক পেযেছি আজ'।

আপনাবা যদি জান্‌তে চান, তাব পব কি হল? সেই ভাবনায, এই উপসংহাবটা লিখছি।

প্রথমত বামদাস ভট্টাচার্যেব সঙ্গে বামমণিব বিবাহ হযে গেল। মনু ও পবাশবেব মতে বিবাহ খুব শাস্ত্রসম্মত হযে ছিল বলে' অনেকেবই ধাবণা।

২। বামমণি জানত যে স্বামী ও গরু উভযই দেবতা, অতএব প্রাণপণে তাদেব সেবা কবে সকলকে অবাক কবেছিল।

৩। 'আপনি' কথাটি ব্যাকবণেব বহির্ভূত বলিযা তাবা উভযে উভযকে এখন 'তুমি' বলিযাই সম্বোধন কবে।

৪। বামদাস তামাক ছেডে দিযে সিগাবেট ধবেছে, কাবণ হুকো দেখলে তাব পূর্ব যুগেব সমাজেব কথা মনে পডে, সেটা নিতান্ত কষ্টকব। বামমণিও তামাক খায না, সিগাবেটও খায না। কিন্তু তাব স্বামী তাকে মাথাব দিব্য দিযে চা ধবিযেছে। এক আউন্স আন্দাজ প্রত্যহ খায।

৫। দেখতে পাবেন যে বৈঠকখানায দুটো ডাবা হুঁকো ঝোলান থাকে। একটা কডি বাঁধা। সেইটে গোশালায প্রণয কাহিনিব হুকো। বামমণিব অনুবোধে বামদাস সেইটাতে মধ্যে মধ্যে এক ছিলিম তামাক খায। বামমণি যত্ন কবে দা-কাটা তামাক সেজে দেয। দু একদিন এমনও হযেছে যে বামদাসেব অনুবোধে বামমণিও তাতে দু এক টান দিযেছে।

৬। কাববাব উঠেছে ফেঁপে, মাসে প্রায তিন শত টাকা লাভ। সব টাকাগুলিই দেশে যায। গযলাপাডাতে একটা ব্যাবাকেব মতো কি আবম্ভ হযেছে। বামদাস এখন বড বাবুব শবিকদাব। মাইনে দু শ' টাকা।

৭। বিদ্যাধব দাদা অনবরত আসেন ও আনন্দে হাসেন। বাসবঘবেব এককোণে দেখতে পাবেন তাঁব স্বহস্তে লেখা-

'Here Mr Bhattacharya was married with Miss Gopp (বামদাস ও বামমণি গোপ, বামমণি ও বামদাস ভট্টাচার্য)— Happy ! Happy! Too happy coincidence

*কার্তিক ১৩৩৫*

**॥ ভারতবর্ষ সেরা সংগ্রহ সমাপ্ত ॥**